২য় খণ্ড

আল্লামা আবুল হাসান আহ্মাদ ইবনে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আহ্মদ ইবনে
জা'ফর ইবনে হামাদান আল বাগদাদী আল কুদূরী
[জন্ম : ৩৬২ হিঃ ও মৃত্যু : ৩৯৮ হিঃ]

উর্দূ অনুবাদ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম হোসাইনিয়া মাদ্‌রাসা ওলামা বাজার, ফেনী

বঙ্গানুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক

মাওলানা মোহাম্মদ আবুল কালাম মাসুম
ফাযেল দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত

মাওলানা মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক
এম. এম.

সম্পাদনায়

মাওলানা মোহাম্মদ মোস্তফা
এম. এম.

পরিবেশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

كِتَابُ النِّكَاحِ

বিবাহ পর্ব

كِتَابٌ শব্দের বিশ্লেষণ ঃ

كِتَابٌ এটা আরবি শব্দ فِعَالٌ-এর ওজনে مَكْتُوْبٌ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ লিখিত বা লিপিবদ্ধ বিষয় বা বস্তু অথবা مَجْمُوْعٌ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ সংগৃহীত, সংকলিত একত্রিত। যেমন- لِبَاسٌ টি مَلْبُوْسٌ অর্থাৎ পরিচ্ছদ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া كِتَابٌ শব্দটি সহীফা, চিঠি, গ্রন্থ, পরওয়ানা, হুকুমনামা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এসব অর্থ এখানে প্রযোজ্য নয়। كِتَابٌ-এর বহুবচন আসে- كُتُبٌ. كُتْبٌ. كَتَبَةٌ বাবে نَصَرَ থেকে মাসদার كِتَابَةٌ. كِتَابًا. كَتْبًا কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে, ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيْهِ

بَابٌ - كِتَابٌ ও فَصْلٌ-এর মধ্যকার পার্থক্য ঃ

كِتَابٌ বলা হয় যাতে একই বিষয়ের মাসআলাগুলোকে একত্রিত করা হয়। بَابٌ বলা হয় যাতে একই প্রকারের মাসআলাগুলোকে বর্ণনা করা হয়। আর فَصْلٌ বলা হয় যাতে ঐ সব বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয় যা পূর্বোক্ত প্রকার হতে সম্পূর্ণ পৃথক। গ্রন্থকারগণ আপন আপন গ্রন্থসমূহকে প্রথমে كِتَابٌ এরপর بَابٌ তারপর فَصْلٌ -এর দ্বারা বিভক্ত করাকে চিরাচরিত নিয়ম হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

نِكَاحٌ শব্দের বিশ্লেষণ ঃ

نَكَحَ يَنْكِحُ বাবে ضَرَبَ ও فَتَحَ মাসদার نِكَاحًا . نَكْحًا অর্থ- একত্রিত করা, বিবাহ করা, তার থেকে نَاكِحٌ অর্থ- বিবাহকারী, বর। আর مَنْكُوْحٌ অর্থ- বিবাহিত مَنْكُوْحَةٌ অর্থ- বিবাহিতা, বিবি, স্ত্রী।

نِكَاحٌ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ ঃ

نِكَاحٌ-এর فِعَالٌ-এর ওজনে আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ- মিলন, আর এই মিলন সহবাসের মধ্যে পাওয়া যায় বিধায় نِكَاحٌ-এটা অর্থ নেওয়া হয়েছে সহবাস। কেউ কেউ نِكَاحٌ-এর আভিধানিক অর্থে চারটি মত প্রকাশ করেছেন ঃ (১) نِكَاحٌ অর্থ- বিবাহবন্ধন ও সহবাস। গায়াতুল বয়ান কিতাবের গ্রন্থকার এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ نِكَاحٌ এটা مُشْتَرَكٌ শব্দ, আর مُشْتَرَكٌ শব্দ তার উভয় অর্থেই প্রকৃতভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে, (২) نِكَاحٌ-এর প্রকৃত অর্থ বিবাহ বন্ধন আর রূপক অর্থ সহবাস। উসূলীনরা এটাকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মত বলে ব্যক্ত করেছেন। (৩) نِكَاحٌ-এর মূল অর্থ- সহবাস, আর রূপক অর্থ হচ্ছে- বিবাহবন্ধন। আমাদের অধিকাংশ মাশায়েখগণের মত এটাই। মাগরিব কিতাবের গ্রন্থকার এ মতকেই অগ্রাধিকার দান করেছেন। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের যে স্থানেই نِكَاحٌ শব্দটি সম্বন্ধবিহীনভাবে ব্যবহৃত হবে সেখানে সহবাস অর্থ হবে, যেমন- আল্লাহর বাণী وَلَاتَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤئُكُمْ (الاية) আর যে স্থানে نِكَاحٌ শব্দটি নারীর দিকে সম্বন্ধ হবে সেখানে রূপক অর্থ তথা বিবাহ বন্ধনের অর্থে ব্যবহৃত হবে। যেমন- আল্লাহর বাণী حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ (الاية) এখানে نِكَاحٌ বিবাহ বন্ধন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (৪) نِكَاحٌ-এর প্রকৃত অর্থ একত্রিত করা, সংগ্রহ করা, যোগ করা। কবির ভাষায়- اِنَّ الْقُبُوْرَ تَنْكِحُ الْاَيَامٰى * اَلنِّسْوَةَ الْاَرَامِلَ الْيَتٰمٰى মুহীত্ব ও কাফী গ্রন্থকারদ্বয়ের অভিমত এটাই।

শরিয়তের পরিভাষায় বৈবাহিক বন্ধনকে نِكَاحٌ বলে। কারো কারো মতে পরিভাষায় نِكَاحٌ ঐ নির্দিষ্ট বন্ধনের নাম যার দ্বারা পুরুষ মহিলার থেকে উপকৃত হওয়া বৈধ হয়।

সার-সংক্ষেপে ঃ كِتَابُ النِّكَاحِ অর্থাৎ বিবাহ বন্ধন সম্পর্কীয় বিধি-বিধানসমূহ এ পর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার মুযারা'আত ও মুসাকাত তথা চাষ ও সেচ পর্বের অধ্যায়ের পর নিকাহ তথা বিবাহ পর্ব আনার যোগসূত্র ও পূর্বাপর সম্পর্ক এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কুরআনে কারীমে এরশাদ করেছেন- نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوْا حَرْثَكُمْ اَنّٰى شِئْتُمْ অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদেরকে শস্যক্ষেত্রের সাথে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। আর স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে বীর্য পতিত হওয়ার সাথে ও চাষে পানি দেওয়ার সাথে এক প্রকার মিল আছে; তাই গ্রন্থকার এ দু'টি পর্ব অর্থাৎ মুযারা'আত ও মুসাকাত-এরপর নিকাহ পর্বকে সংযোজন করেছেন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিবাহ ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এরশাদ করেছেন–

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَلَّا تَعُوْلُوْا .

অর্থ ঃ আর যদি তোমরা ভয় করো যে, এতিম মেয়েদের হক যথাযথভাবে পূরণ করতে পারবে না; তবে সেসব মেয়েদের মধ্যে থেকে যাদের ভাল লাগে তাদের বিয়ে করে নাও দুই তিন কিংবা চারটি পর্যন্ত। আর যদি এরূপ আশঙ্কা করো যে; তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত আচরণ বজায় রাখতে পারবে না; তবে একটি অথবা তোমাদের অধিকারভুক্ত দাসীদেরকে এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা। –(সূরা নিসা)

বিবাহের উদ্দেশ্য ঃ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের একুশতম পারায় এরশাদ করেছেন–

خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّ رَحْمَةً .

অর্থ ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্য জোড়া বানিয়েছেন; যাতে তোমরা তাদের নিকট স্বস্তি লাভ করতে পারো এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। তিনি আরও এরশাদ করেছেন– نِسَاۤؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ অর্থ ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের (সন্তান জন্ম দেওয়ার) জন্য ক্ষেত স্বরূপ।

অন্যত্র এরশাদ করেছেন– حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ অর্থ ঃ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের অনুপস্থিতিতে (তোমাদের সম্পদ, ইজ্জত ও দীনের) হেফাজতকারিণী।

ক. স্ত্রীকে বনানো হয়েছে আরাম ও প্রশান্তির জন্য, স্ত্রী সহমর্মিতা প্রকাশকারিণী, হাজারও চিন্তার সময় শান্তিদায়িনী। প্রেম ও ভালবাসা মানব স্বভাবের একটি সৃষ্টিগত অবিচ্ছেদ্য রূপ। প্রেম ও ভালবাসার জন্য স্ত্রী এক বিস্ময়কর অবলম্বন। নারীর দেহ পেলব-কোমল ও সৃষ্টিগতভাবেই সে দুর্বল। নারী সন্তান প্রসবকারিণী ও গার্হস্থ্য শৃঙ্খলা বিধানের এক অপরিহার্য অঙ্গ। তার বিষয়ে দয়ার্দ্রচিত্ত হও। দয়ার পাত্রী হিসেবেই তার সৃষ্টি। তার গাফিলতি ও স্বভাবগত দুর্বলতাগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে।

খ. সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে কাম প্রভৃতি বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীকে এই কাম নিবারণের ক্ষেত্র বানিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– স্ত্রী ক্ষেত্রস্বরূপ, আর তা বীজ বপনের উপযোগী। যেভাবে ক্ষেতে কর্ষণ ও পরিচর্যা করা হয় এবং এতে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, তেমনি স্ত্রীর মধ্যেও বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এগুলোর দ্বারা উপকৃত হওয়া উচিত।

গ. স্ত্রী সম্ভ্রম, পবিত্রতা এবং সম্পদ ও সন্তানের সংরক্ষক ও ব্যবস্থাপক।

ঘ. পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, বিবাহ করা হয় পবিত্রতা, খোদাভীতি এবং স্বাস্থ্য ও বংশ সংরক্ষণের জন্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ অর্থাৎ যারা বিবাহ করার সামর্থ্য রাখে না (যা নিষ্কলুষ থাকার মূল উপায়) তাদের উচিত অন্যকোনো উপায়ে পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকার প্রয়োগ পাওয়া।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হাদীসে হুযূর (সা.) এরশাদ করেন, যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই তাদের নিষ্কলুষ থাকার উপায় এই যে, তারা রোজা রাখবে। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যার বিবাহ করার সামর্থ্য আছে, সে যেন বিবাহ করে ফেলে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে খুবই সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে ব্যভিচার ইত্যাদি হতে হেফাজত করে। বিবাহ করা সম্ভব না হলে রোজা রাখো, রোজা কামনা শক্তিকে নিবৃত্ত করে রাখে। এর ব্যাখ্যা হলো, নারীর প্রতি পুরুষের বা পুরুষের প্রতি নারীর আসক্তি। মানুষের স্বভাবগত দাবি। এ কামভাবও পবিত্র চিন্তা-চেতনায় সৃষ্টি হয়। আর অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে এ কাম-আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করা হলে তা মানুষকে এক অপবিত্র অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায় এবং তার অন্তরে অসৎ চিন্তার সৃষ্টি করে দেয়। সুতরাং বিবাহ পবিত্রতার দিকে অগ্রসর করার এবং অপবিত্রতা হতে দূরে রাখার একটি উপায় ও মাধ্যম। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, নারী-পুরুষের অন্তরে পরস্পরের প্রতি যে সৃষ্টিগত কামনা-বাসনা বিদ্যমান, তাকে ঘৃণ্য ও অপবিত্র কামনারূপে চিহ্নিত করা একটি মারাত্মক ভুল। কেননা মানব প্রকৃতিতে এ কামনা স্বয়ং আল্লাহই সৃষ্টি

করেছেন। তিনিই তার প্রজ্ঞা ও হেকমতের বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে মানব সত্তায় এ কামনাশক্তি পুঞ্জীভূত করেছেন। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ প্রদত্ত এ বাসনার অপব্যবহার অর্থাৎ অবৈধ পন্থায় একে চরিতার্থ করা নিঃসন্দেহে মানুষকে অপবিত্রতা ও পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়।

মোটকথা, বিবাহের মহৎ উদ্দেশ্য তাই, যা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন কারীমে উল্লেখ করেছেন, পরহেজগারির উদ্দেশ্যেই বিবাহ করবে এবং নেক সন্তানের জন্য দোয়া করবে। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ অর্থাৎ "তোমাদের বিবাহ যেন তাকওয়া ও পরহেজগারির মজবুত কিল্লায় প্রবেশ করার নিয়তে হয়।" পশুর ন্যায় শুধুমাত্র কামভাব নিবারণই যেন তোমাদের উদ্দেশ্য না হয়।

তিনি আরও এরশাদ করেছেন– وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ অর্থাৎ "স্ত্রীর সাথে মিলন দ্বারা তোমরা সন্তান কামনা করো, যা আল্লাহ্ তোমাদের জন্য লিপিবদ্ধ করেছেন।" বিবাহের কারণে মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে জীবিকা উপার্জনে বাধ্য হয়, অযথা কোনো কাজ করতে ভয় পায়। তার মধ্যে ভালোবাসা, লজ্জাশীলতা ও আনুগত্যের উদ্ভব হয়। সে অত্যন্ত মিতব্যয়িতার সাথে জীবন-যাপন করে এবং অসংখ্য রোগ-ব্যাধি হতে নিরাপদ থাকে।

বিবাহ্ স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী, মনে প্রশান্তি আনয়নকারী, আরামদায়ক, আনন্দবর্ধক ও মিতাচারিতার সহায়ক এবং দুনিয়া ও আখিরাতে উন্নত জীবন লাভের মাধ্যম। নৈতিকতা ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে চিন্তা করলেও দেখা যাবে, বিবাহ্ বহুবিধ কল্যাণে ভরপুর। সামাজিকতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনের কোনো তুলনা নেই। এ দাম্পত্য জীবন দেশপ্রেমেরও মূল। এটা দেশ ও জাতির মহোত্তম সেবার অন্তর্ভুক্ত। অসংখ্য রোগ-ব্যাধি হতে মুক্ত ও সুস্থ থাকার এটা এক মহৌষধ। আল্লাহর এ বিধান যদি মানবজাতির মধ্যে কার্যকর না থাকতো, তাহলে পৃথিবী বিজন মরুভূমিতে পরিণত হতো। সুরম্য অট্টালিকা, সুশোভিত পুষ্প-কানন ও মানবজাতির কোনো চিহ্নও অবশিষ্ট থাকত না।

বিবাহের হিকমত ও যৌক্তিকতা ঃ বিবাহ এ দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার শিক্ষা দেয়। যে রকমভাবে মৃত ব্যক্তিকে খাটে উঠিয়ে কবরস্থানে নেওয়া হয়, তদ্রূপ নববধূকে দুলার ঘরে পাল্‌কি, গাড়ি ইত্যাদি দ্বারা নেওয়া হয়। মৃত ব্যক্তির যেরকমভাবে এটা বিশ্বাস হয় যে, এ দুনিয়া আমার আসল বাড়ি নয় এখন আমি আমার আসল বাড়ির দিকে সফর করছি, তদ্রূপ নববধূকেও এ অনুভূতি হওয়া চাই যে, আজকে যেমনিভাবে আমি আমার মা বাবার ঘর থেকে সফর করছি তেমনিভাবে একদিন আমাকে স্বামীর ঘর থেকে আখিরাতের দিকে সফর করতে হবে।

হযরত আশ্‌রাফ আলী থানবী (র.) বলেছেন, বিবাহবন্ধন এরূপ যে, এটার মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করার দ্বারা চক্ষু খোলে এবং সুলূকের রাস্তার পথিকের ছবক মিলে। কেননা বিবাহের বন্ধন আল্লাহর সাথে সম্পর্কের কিছু ব্যবহারের ন্যায়। যেমন– বিবাহের মধ্যে চারটা স্তর রয়েছে– (১) সম্পর্ক না হওয়ার যে কোনো মহিলার ব্যাপারে জ্ঞান আছে কিন্তু এখন পর্যন্ত তার প্রস্তাব দেওয়া হয়নি বরং মন বা অন্তর তার থেকে খালি। (২) দ্বিতীয় স্তর প্রস্তাব দেওয়ার। এ সময় কিছু সম্পর্ক হয়ে যায়। (৩) তৃতীয় স্তর বিবাহের প্রস্তাব দেওয়ার পর বিবাহ মঞ্জুর হয়ে যাওয়া এবং আত্মীয়তা হয়ে যাওয়া। এ স্তরে প্রথম থেকেই বেশি সম্পর্ক হয়ে যায় এবং পরস্পরের মধ্যে আসা-যাওয়ার হাদিয়া-তোহ্‌ফা শুরু হয়ে যায়। (৪) চতুর্থ স্তর বিবাহ্ হয়ে যাওয়া এবং উদ্দেশ্য অর্জন হওয়া। এখন বুঝা যায় যে, এ অবস্থা সুলূক এবং আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করার, যে এখানেও চারটি স্তর রয়েছে– সম্পর্ক না করার, যে আল্লাহ্ তা'আলার তলব নাই বরং ইলম আছে। এটা এরূপ যেমন আমাদের কোনো মহিলার সম্পর্কে ইলম আছে প্রকাশ থাকে যে এই ইলমের নাম সম্পর্ক নয় বরং সম্পর্ক তালাশ এবং প্রস্তাব দেওয়া থেকে শুরু হয়। এমনিভাবে এখানে ও বুঝা যায় যে, জ্ঞান বা ইলম ও মারেফাত তালাশ করার প্রথমে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বলা হয় না এরপরে একটা স্তর আছে যে, আল্লাহর তলব অনুসন্ধান সৃষ্টি হয়েছে এবং কোনো পরিপূর্ণ পীর থেকে দরখাস্ত করা হয়েছে যে আমাকে সঠিক গন্তব্যে পৌঁছার রাস্তা বলে দিন, তখন পীর সঠিক পথ বলতে শুরু করল এবং সে ঐ রাস্তার ওপর চলতে লাগল। অতঃপর কিছু শুরুতে কিছু মধ্যখানে এটা প্রস্তাব দেওয়ার মতো, কিন্তু এখনো এটা জানা হয়নি যে আল্লাহ্ তা'আলারও আমার সাথে সম্পর্ক আছে অথবা নেই। তারপর একটা স্তর আছে যে, এখন থেকে তার সাথে সম্পর্কের প্রকাশ হতে লাগল এবং রাজি হওয়ার নিশান এবং লেনদেন তার সাথে প্রকাশ হতে লাগল। এটা ঐ স্তর যা প্রস্তাব কবুল হওয়ার পর হবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলাকে পেয়ে যাওয়ার স্তর যে আল্লাহর সাথে নিসবত হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলাকে পেয়ে গেছে।

বিবাহ্ ও আধুনিক বিজ্ঞান ঃ আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, বিবাহ্ ছাড়া অবৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা পূরণ করার দ্বারা ও ব্যাভিচারের দ্বারা সিফিলিস ও প্রমেহ রোগের সৃষ্টি হয়। এ দু'টি ব্যাধি বর্তমান বিশ্বে অতিমাত্রায় বিস্তার লাভ করেছে।

এ দু'টি রোগ জন্ম নেয় বিশেষ ধরনের জীবাণু থেকে। যেগুলো যৌন মিলনের সময় সংক্রামক রূপে একজন থেকে অপর জনের দেহে প্রবেশ করে। অধুনা চিকিৎসাশাস্ত্রের দৃষ্টিতে উল্লিখিত ব্যাধি জনস্বাস্থ্যের জন্য কতটুকু ক্ষতিকর আমরা তার কতেকটা উল্লেখ করছি।

সিফিলিস ঃ সিফিলিসের তিনটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় ঃ বিষাক্ত জীবাণু শরীরের আবরণকে ছেদ করে অল্প সময়ের মধ্যে রক্তে প্রবেশ করে। সপ্তাহ খানেক পর তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। সিফিলিস ব্যাধির প্রথম লক্ষণ হলো, জীবাণু সংক্রমণের পর নয় দিন থেকে তিন মাসের মধ্যে এক ধরনের ফোঁড়া দেখা দেয়। সিফিলিসের ফোঁড়া বেশ শক্ত, যা পুরুষের যৌনাঙ্গে এবং নারীর যোনির অভ্যন্তরে দেখা দেয়। আর কখনো দেখা দেয় উভয় ওষ্ঠে, স্তনে, হাতের আঙ্গুলে অথবা সিনার আশপাশে। সিফিলিসের ফোঁড়া দশদিন থেকে চল্লিশ দিনের মধ্যে কোনো প্রকার চিকিৎসা ছাড়া বিলুপ্ত হয়। কোনো কোনো সময় এতে ব্যাধি মুক্তির ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। কেননা তা হয়তো একেবারেই দেখা যায় না কিংবা এত ক্ষুদ্র হয় যে, তা ফোঁড়া বলে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ সিফিলিসের দ্বিতীয় পর্যায়ে শরীরের কোনো কোনো অংশে ফোস্কা দেখা দেয়। অতঃপর তা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে উভয় হাতের তালুতে এবং পায়ের পাতায়ও দেখা দেয়। কোনো কোনো সময় ফোস্কা কাঁকরের ন্যায় জন্মে কিন্তু এতে চুলকানি হয় না এবং রক্ত পরীক্ষা করার পূর্বে তা সিফিলিসের ফোস্কা বলে নির্ণয় করা যায় না। আর কোনো কোনো সময় মুখের ভিতর, গলার ভিতর, যৌনাঙ্গ ও বুকের আশেপাশে ফোঁড়ার ন্যায় দেখা দেয়। এতে কাশি, জ্বর ইত্যাদি ব্যাধির সৃষ্টি হয় এবং হাড়ের ভিতর ও জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা অনুভূত হয়। আবার কোনো কোনো সময় মাথার চুলও ঝড়ে যায় এবং এনিমিয়া রোগের সৃষ্টি হয়। তখন চোখের দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পায়। ওষ্ঠে এবং মুখে সিফিলিসের ফোঁড়া থাকলে চুম্বনের মাধ্যমে তা সংক্রমিত হয়। এই ফোস্কা, ফোঁড়া বিলুপ্ত হওয়ার দুই মাস অথবা ছয় মাসের মধ্যে দেখা দিয়ে অন্তত দুই বছর স্থায়ী হয়। সিফিলিসের উক্ত পর্যায়ও দুই সপ্তাহ থেকে বারো সপ্তাহের মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

তৃতীয় পর্যায় ঃ এটা সিফিলিসের শেষ পর্যায়। এটা কোনো কোনো সময় দ্বিতীয় পর্যায় শেষ হওয়ার সাথে সাথে দেখা দেয়। আবার কখনো দেখা দেয় অনেক বছর পর। অর্থাৎ পাঁচ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে। এতে শরীরের মধ্যে জীবাণু থাকা সত্ত্বেও রোগী কোনো কোনো সময় তা অনুভব করতে পারে না। এই সিফিলিস সংক্রমিত হয় কম। কিন্তু রোগীর জন্য এটা খুবই মারাত্মক। এর জীবাণু শরীরের প্রতিটি অংশে ছড়িয়ে পড়ে। যদ্দরুন দৃষ্টিশক্তি হারানো এবং উভয় ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড, হাড়ের মগজ ইত্যাদি শরীরের আভ্যন্তরীণ অংশের মারাত্মক ধরনের রোগ সৃষ্টি হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জোড়ায় জোড়ায় হাড় এবং চামড়াতেও তা ছড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো সময় এতে হাঁটুর গিরায় মারাত্মক ধরনের ক্ষত দেখা দেয় এবং হাড্ডির মধ্যে জ্বালা পোড়া ও চিবুকের নিচে গর্তের সৃষ্টি হয়। সিফিলিস তার তৃতীয় পর্যায়ে যদি হৃৎপিণ্ড ও শ্বাস-নালীর কেন্দ্রে আক্রমণ করে তখন অধিকাংশ রোগী মারা যায়। অনেক সময় এতে শরীর অবশ হয়ে রোগী উন্মাদ হয়ে যায় ও দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, যার ফলে শরীর অনবরত কাঁপতে থাকে।

প্রমেহ ঃ ভিক্টিরিয়া নামক জীবাণু থেকে প্রমেহ সৃষ্টি হয়। যাকে বলা হয় جَوْنُوكُوْك এই জীবাণুর বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে এটা যৌনাঙ্গ ও প্রস্রাব নালীর আভ্যন্তরীণ আবরণে প্রবেশ করে, যার ফলে যৌনাঙ্গে জ্বালাপোড়া ও ক্ষত সৃষ্টি হয়। যৌন মিলনের সময় এই জীবাণু নারী পুরুষের একজন থেকে অপরজনের সংক্রমিত হয়। কোনো কোনো সময় উক্ত (جَوْنُوكُوْك) জীবাণু চোখের পর্দার ভিতর প্রবেশ করে। যদি দ্রুত এর চিকিৎসা না করে তাহলে রোগী প্রায়ই অন্ধ হয়ে যায়। প্রমেহ রোগের প্রাথমিক উপকরণগুলো এ রোগ সংক্রমণের এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশিত হতে অন্তত তিন সপ্তাহ সময় লাগে। পুরুষের মধ্যে এ রোগ প্রস্রাবের সময় জ্বালাপোড়া, ব্যথা-বেদনা অনুভূতি ও পুরুষাঙ্গের নালী থেকে পুঁজ অথবা সাদাবর্ণের এক ধরনের তরল পদার্থ বের হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা যায়। যদি উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে দুই মাস থেকে তিন মাস পর্যন্ত অনবরত পুঁজ বের হতে থাকে। এই রোগ যখন শরীরের অন্যান্য অঙ্গেও সংক্রমিত হয় তখন অণ্ডকোষ ও লজ্জাস্থানে জ্বালাপোড়া ও এক ধরনের শক্ত ফোঁড়ার সৃষ্টি হয়, যার ফলে অনেক সময় রোগী যৌন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

মহিলাদের মধ্যে যখন এই রোগ সংক্রমিত হয় তখন রোগের প্রাথমিক উপকরণ ও ব্যথা অনুভূত হয় না। তবে তারা পেটের নিচের অংশে ব্যথা অনুভব করে। প্রস্রাবের সাথে সাদা বর্ণের এক ধরনের পদার্থ বের হয় এবং কখনো প্রস্রাবের সময় ব্যথা অনুভব করে, আবার কখনো করে না। এ রোগ যখন শরীরের অন্যান্য অংশে সংক্রমিত হয় তখন যৌনাঙ্গে জ্বালাপোড়ার

সৃষ্টি হয় এবং রোগিণী বন্ধ্যা হয়ে যায়। প্রমেহের সংক্রমণ রোধ করা না হলে তা শরীরের অন্যান্য অংশেও প্রবেশ করে এবং তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। মূত্রাশয় ও ফুসফুস ইত্যাদিতে জ্বালা যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো সময় হাড্ডিতেও ব্যথা অনুভূত হয়। আবার কখনো তা মাথায় যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। আর যদি জীবাণু রক্তে ও হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে তখন অধিকাংশ রোগী মারা যায়। উল্লেখ্য, প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা করা হলে এ রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

কি কারণে একজন পুরুষকে নপুংসক আখ্যা দেওয়া যায়? এর লক্ষণ গুলোই বা কি? প্রথমত যদি কারো পুরুষাঙ্গ দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা যায়, তা পুরুষত্বহীনতার কারণ হতে পারে। কেউ বা হৃদরোগের জন্যও পুরুষত্ব হারাতে পারে। আবার ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সে হৃদরোগের কোনো উপসর্গ ছাড়াই অনেক যৌনব্যাধির শিকার হতে পারে। তবে রক্তের চলাচলে ধারা সৃষ্টি অবশ্যই এ রোগের অন্যতম লক্ষণ বলে ধরা যায়। হাইষ্টনবেলের মেডিক্যাল কলেজের ব্রান্টলি স্কট অধুনা আবিষ্কার করেছেন পেলিল ইমপ্লান্ড। তাঁর মতে যাদের মধ্যে এ রোগ এখনো প্রকট হয়ে ওঠেনি, ইমপ্লান্টের মাধ্যমে সহজেই তারা নিরাময় হয়ে উঠতে পারেন। দ্বিতীয়ত বহুমূত্র রোগ পুরুষত্বহীনতার অন্যতম কারণ। জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, প্রায় ৫০ ভাগ বহুমূত্র রোগী পুরুষত্বহীনতায় ভুগছে। কেননা এই রোগ ধীরে ধীরে পুরুষাঙ্গকে নিস্তেজ করে ফেলে, খর্ব করে তার ঋজুতা। এ সম্পর্কে একজন রোগীর স্বীকারোক্তি শুনুন ঃ প্রথমে আমরা বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ডাক্তারের পরামর্শ নিতে গেলে তিনি জানান, বহুমূত্র রোগের চাপ বৃদ্ধি পাওয়াই এটি ঘটেছে। ডাক্তাররা এর পরের কারণ হিসেবে হরমোনের স্বাভাবিকতার কথা উল্লেখ করেছেন। পুরুষ হরমোনের ক্ষেত্রে শুক্রাশয়ের একটি প্রধান ভূমিকা থাকলেও যৌন ব্যাধিগ্রস্ত লোকদের তা থাকে না। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের যৌন ক্ষমতা লোপ পেতে থাকে। চতুর্থ কারণ হিসেবে আমরা বলতে পারি; হৃদরোগসহ অন্যান্য ব্যাধি উপশমের জন্য অত্যধিক ঔষধ সেবন যৌন ক্ষমতা হ্রাস করে। এমন অনেক ঔষধ আছে রক্ত সঞ্চালনে যার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এ ছাড়া বেশি মাত্রায় মদ্য পানের ফলেও অনেকে পুরুষত্ব হারায়। মদ্যপায়ীদের ওপর এক পরিসংখ্যান চালিয়ে দেখা গেছে, তাদের ৮০ ভাগ যৌন রোগের শিকার। অন্যদিকে মদ স্নায়ুতন্ত্রী ধ্বংস করে দেয় এবং হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলে। এ ছাড়া সিগারেট, গাঁজা, আফিম প্রভৃতি সেবনকারীরাও কমবেশি যৌন রোগের শিকার হয়ে থাকে।

তবে পুরুষত্বহীনতার মূল কারণ মানসিক না শারীরিক এ নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে। মাস্টার্স ও জনসন জানিয়েছেন, পুরুষত্বহীন লোকের ৮০ থেকে ৮৫ ভাগকেই দেখা গেছে মানসিক রোগী। আবার কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এদের ষাট ভাগেরই রোগ শরীরে, মনে নয়। পুরুষত্বহীনতাকে যাঁরা প্রধানত মানসিক রোগ বলে মনে করেন, তাঁরা দেখেছেন যে, কিছু কিছু লোক প্রথমত পুরুষত্ব-হীনতায় ভোগে। বিয়ের পরও দীর্ঘদিন তারা কখনও যৌনমিলনে অংশ নেয়নি। নারীর স্পর্শ ছাড়াই তারা বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে। মাস্টার্স ও জনসন উল্লেখ করেছেন, এটা কড়া ধর্মীয় শাসন ও সামাজিক পশ্চাৎপদ পরিবার থেকে এসেছে। যারা যৌন মিলনকে একটি অপরাধ বলে মনে করে। অন্যদিকে বিয়ের আগে যারা মহিলাদের সংস্পর্শে এসেছে এবং বিষয়টি ভেতরে ভেতরে মনঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরবর্তীতে তাদের অনেকেই মাধ্যমিক পুরুষত্বহীনতায় ভোগে। এ ছাড়া দীর্ঘদিন অনভ্যাসের জীবন কাটলে, জেল খাটলে, সমাজে নিগৃহীত হলে তাদের মনে এক ধরনের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তাও অনেক সময় যৌন রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

জেনা ও এইডস রোগ ঃ বিবাহ করা ব্যতীত অবৈধ পন্থায় যৌন চাহিদা মিটানোর ফলে এবং জেনা ও পতিতালয়ে গিয়ে যৌন চাহিদা মিটানোর ফলে এখন ভয়ানক এইডস রোগ গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, এ রোগের পরিণাম মৃত্যু।

اَلنِّكَاحُ يَنْعَقِدُ بِالْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ بِلَفْظَيْنِ يُعَبَّرُبِهِمَا عَنِ الْمَاضِيْ اَوْ يُعَبَّرُ بِاَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِيْ وَالْاٰخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبِلِ مِثْلُ اَنْ يَّقُوْلَ زَوِّجْنِيْ فَيَقُوْلَ زَوَّجْتُكَ وَلَايَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا بِحُضُوْرِ شَاهِدَيْنِ حُرَّيْنِ بَالِغَيْنِ عَاقِلَيْنِ مُسْلِمَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ عُدُوْلًا كَانُوْا اَوْ غَيْرَ عُدُوْلٍ اَوْ مَحْدُوْدَيْنِ فِيْ قَذْفٍ فَاِنْ تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ ذِمِّيَّةً بِشَهَادَةِ ذِمِّيَّيْنِ جَازَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَاَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَايَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يَّشْهَدَ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَايَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّتَزَوَّجَ بِاُمِّهٖ وَلَابِجَدَّاتِهٖ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَابِبِنْتِهٖ وَلَابِبِنْتِ وَلَدِهٖ وَاِنْ سَفَلَتْ -

সরল অনুবাদ ঃ বিবাহ সংঘটিত হয় ইজাব ও কবুল-এর দ্বারা, এরূপ দু'টি শব্দের দ্বারা যার দ্বারা অতীতকালকে বিবৃত করা যায়, অথবা তার মধ্য থেকে একটি দ্বারা অতীতকাল আর অপরটি দ্বারা ভবিষ্যৎকালকে (বিবৃত করা যায়) যথা– এরূপ বলা, তুমি আমাকে বিবাহ করো, আর পুরুষ বলবে, আমি তোমাকে বিবাহ করেছি। আর মুসলমানদের বিবাহ সংঘটিত হয় না দু'জন স্বাধীন, প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানী মুসলমান সাক্ষীদ্বয়ের উপস্থিতি ব্যতীত, অথবা একজন পুরুষ, আর দু'জন মহিলার উপস্থিতিতে, তারা عَادِلْ বা ন্যায়পরায়ণ হোক বা না হোক অথবা অপবাদ দেওয়ার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হোক। সুতরাং যদি কোনো মুসলমান দুই জিম্মির (ইসলামি রাষ্ট্রের বিধর্মী প্রজার) সাক্ষীতে কোনো জিম্মি মহিলাকে বিবাহ করে নেয় তবে (শায়খাইন তথা) ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে জায়েজ হবে। আর ইমাম মোহাম্মদ (র.) বলেন, জায়েজ হবে না, হাঁ যদি দু'জন মুসলমানকে সাক্ষী বানায় (তখন জায়েজ হবে) এবং কোনো পুরুষের জন্য তার মাকে এবং তার দাদী (দাদী চাই পুরুষদের পক্ষ থেকে হোক বা মহিলাদের পক্ষ থেকে হোক অর্থাৎ নানী কে এবং স্বীয় কন্যাকে এবং কন্যার কন্যাকে যদিও নিম্নতম (কন্যা) হোক বিবাহ করা হালাল নয়। (অর্থাৎ আলোচ্য মহিলাদেরকে ও সামনে যে সব মহিলাদের আলোচনা আসছে এদেরকে বিবাহ করা সদা-সর্বদার জন্য হারাম ও নিষিদ্ধ।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিবাহ-এর রোকন ঃ

قَوْلُهُ اَلنِّكَاحُ يَنْعَقِدُ الخ ঃ বিবাহের রোকন দু'টি ঃ (১) اِيْجَابْ বা সম্মতি, (২) قَبُوْل বা গ্রহণ। অর্থাৎ اِيْجَابْ ও قَبُوْل এ দু'টি نِكَاحْ-র ভিতরগত বস্তু ও অঙ্গের সমতুল্য, এ দু'টি ব্যতীত বিবাহ সংঘটিত হবে না।

اِيْجَابْ ও قَبُوْل -এর সংজ্ঞা ঃ

অভিধানে اِيْجَابْ সাব্যস্ত করাকে এবং قَبُوْل মেনে নেওয়াকে বলে। আর পরিভাষায় عَاقِدَيْن -এর বা স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের মধ্যে প্রথম উক্তিকে اِيْجَابْ বলে এবং প্রতি উত্তরকে قَبُوْل বলে। اِيْجَابْ এবং قَبُوْل চাই উভয় প্রকৃত হোক বা অপ্রকৃত হোক। উল্লেখ্য যে, প্রকৃত ইজাব ও কবুলের সুরত হচ্ছে– স্বামী স্ত্রীকে বলল, আমি তোমায় এক হাজার টাকা মোহর ধার্য করে বিবাহ করলাম। তখন স্ত্রী বলল, আমি কবুল করলাম। অথবা স্ত্রী স্বামীকে বলল, তুমি আমাকে বিবাহ করো। স্বামী বলল, আমি কবুল করলাম। আর অপ্রকৃত ইজাব ও কবুলের সুরত হচ্ছে– স্বামী বা স্ত্রীর উকিল বা অভিভাবক বলল, আমি অমুক ব্যক্তির বিবাহ করানোর জন্য নিযুক্ত উকিল বা আমি আপনার পাত্রীকে এত টাকা মোহর ধার্য করে আমার মুয়াক্কেলের সাথে বিবাহ দিলাম, তখন পাত্রীর নিযুক্ত উকিল বলল আমি কবুল করলাম। অথবা উভয় পক্ষের অভিভাবকগণ এ জাতীয় কথোপকথনের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদন করে।

قَبُوْل ও اِيْجَابْ-এর বিশেষত্ব ঃ

قَوْلُهُ بِلَفْظَيْنِ يُعَبِّرُ بِهِمَا عَنِ الْمَاضِيْ الخ ঃ অর্থাৎ قَبُوْل ও اِيْجَابْ এরূপ দু'টি শব্দ দ্বারা হতে হবে যার উভয়টিকে مَاضِىْ বা অতীতকাল দ্বারা বা একটি ماضى দ্বারা আর অপরটি مُسْتَقْبِلْ বা ভবিষ্যৎকাল দ্বারা বিবৃত করা যায়। প্রকাশ থাকে যে, এখানে بِلَفْظَيْنِ শব্দ এনে এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, قَبُوْل ও اِيْجَابْ -এর শব্দের উচ্চারণ আবশ্যক। চাই উভয়পক্ষের একজন হতেই হোকনা কেন। উভয়ের পক্ষ হতে শুধু লিখিতভাবে اِيْجَابْ ও قَبُوْل হলে যথেষ্ট হবে না। আর এটাও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শব্দের মধ্যে বারবার হওয়া জরুরি নয়। এখন যদি ছোট পাত্র-পাত্রীর ওলী বা উভয়ের উকিল একথা বলে যে, আমি তার বিবাহ তার সাথে দিলাম তাহলে যথেষ্ট হবে।

টেলিফোনে বিবাহের বিধান ঃ আলোচ্য বাক্যের দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় যে, টেলিফোনে قَبُوْل ও اِيْجَابْ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না, কারণ টেলিফোনের মাধ্যমে যে শব্দের উচ্চারণ হয়েছে উহা যদিও স্বামী-স্ত্রী বা উভয়ের ওলীর শব্দের উচ্চারণ কিন্তু এ মূলনীতিতে যে, اَلصَّوْتُ يُشْبِهُ الصَّوْتَ অর্থাৎ আওয়াজ পরস্পর একটি অপরটির সাদৃশ্যও হয়ে যায়। অতএব এমনও হতে পারে যে, ঐ قَبُوْل ও اِيْجَابْ উচ্চারণ স্বামী-স্ত্রী বা উভয়ের ওলী ছাড়া অন্য কেউ প্রতারণামূলক করেছে।

ফ্যাক্স ও চিঠির মাধ্যমে বিবাহের বিধান ঃ উল্লিখিত আলোচনা দ্বারা এটাও প্রমাণিত হলো যে, আধুনিক ফ্যাক্স ও চিঠির মাধ্যমেও বিবাহ হবে না। কারণ এ ক্ষেত্রে যদিও স্বামী-স্ত্রী বা উভয়ের ওলীর মাধ্যমে قَبُوْل ও اِيْجَابْ লিখিত হয়েছে। কিন্তু এখানে قَبُوْل ও اِيْجَابْ উচ্চারণ পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া মূলনীতি আছে اَلْخَطُّ يُشْبِهُ الْخَطَّ অর্থাৎ হাতের লিখা অপরজনের লিখারও সদৃশ হয়ে থাকে। অতএব এমনও হতে পারে, এখানে عَاقِدَيْن -এর পক্ষ থেকে লিখা হয়নি, অন্য কেউ নকল করে প্রতারণা করেছে।

বিবাহ ও বেচাকেনার মধ্যে পার্থক্য ঃ উসূলে ফিকহের কিতাব 'তানক্বীহ' নামক গ্রন্থে বিবাহ ও ক্রয়-বিক্রয় উভয়টি قَبُوْل ও اِيْجَابْ এবং অনেক ক্ষেত্রে একই জাতীয় হওয়ার কারণে বলা হয়েছে যে, বিবাহ ক্রয়-বিক্রয়ের মতো, তাই আমরা এখানে বিবাহ ও ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করছি, যাতে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যদিও বিবাহ ও ক্রয়-বিক্রয় অনেক ক্ষেত্রে সদৃশ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয়ের মাঝে অনেক পার্থক্য আছে।

বিবাহ ও ক্রয়-বিক্রয়ে মধ্যে চারটি পার্থক্য ঃ (১) নিকাহ-এর মধ্যে ইজাব এবং কবুল উভয় শব্দ مَاضِىْ-এর হওয়া অথবা একটি مَاضِىْ অপরটি مُسْتَقْبِلْ হওয়া শর্ত কিন্তু بَيْع বা ক্রয়ের মধ্যে ইজাব কবুল উভয় শব্দ مَاضِىْ হওয়া শর্ত। (২) নিকাহ-এর মধ্যে একই ব্যক্তি ইজাব ও কবুল উভয় পক্ষের মধ্যস্থতা গ্রহণ করতে পারে কিন্তু ক্রয়ের মধ্যে একই ব্যক্তি উভয় পক্ষে মধ্যস্থতা গ্রহণ করতে পারে না। (৩) ক্রয়ের মধ্যে সম্পর্কীয় সম্পদ সম্পর্ককারীর দিকে ধাবিত হয়, চাই সে মূল হোক বা স্থলাভিষিক্ত হোক কিন্তু নিকাহ-এর মধ্যে সম্পর্কীয় অধিকার স্বামী-স্ত্রীর দিকে ছাড়া অন্য কারো দিকে ধাবিত হবে না। (৪) নিকাহ এমন স্থলে বৈধ যেখানে اِسْتِمْتَاعُ বা উপভোগ বৈধ, কিন্তু ক্রয়ের জন্য এমন স্থল শর্ত নয়।

বিবাহের মোট ইল্লত চারটি ঃ (১) عِلَّتِ فَاعِلِىْ উহাকে বলে যা হতে ক্রিয়া প্রকাশ পায়, (২) عِلَّتِ مَادِّىْ উহাকে বলে যার গঠন দ্বারা নতুন জিনিসের আবির্ভাবের যোগ্যতা সৃষ্টি হয়, (৩) عِلَّتِ صُوْرِىْ উহাকে বলে যা দ্বারা বস্তু বর্তমান সময়ে বাস্তবায়িত হয়। এই عِلَّتِ صُوْرِىْ প্রকৃত অর্থে عِلَّتِ مَادِّىْ -এর সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে, (৪) عِلَّتِ غَائِىْ এটা হলো বিবাহের সাথে যে সকল সৎ উদ্দেশ্য জড়িত।

نِكَاحُ-এর শর্তের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمُسْلِمِيْنَ الخ ঃ এখান থেকে ইমাম কুদূরী (র.) نِكَاحُ-এর শর্তের বর্ণনা ও তার মধ্যে মতভেদের আলোচনা করা আরম্ভ করেছেন। ইমাম কুদূরী (র.) এখানে শর্তের বর্ণনা করতে সংক্ষেপে বয়ান করেছেন, আসলে نِكَاحُ -এর শর্ত ৩টি– (১) নিকাহের জন্য সাধারণ শর্ত হলো এই যে, স্ত্রীলোকটি এমন হতে হবে যার সাথে নিকাহ সংঘটনে শরিয়তে কোনোরূপ নিষেধাজ্ঞা নেই। যেমন– স্ত্রীলোকটি স্বামীর জন্য মুহাররামাত-এর অন্তর্ভুক্ত নয় কিংবা উপস্থিত ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকটিকে উক্ত পুরুষ বিবাহ করার কোনো শরিয়তী অন্তরায় নেই। যেমন– স্ত্রীলোকটি তার স্ত্রীর সহোদরা নয়। অথবা স্ত্রীলোকটি ধর্ম বিশ্বাসে অমুসলিম নয়। (২) উভয় পক্ষ পরস্পরের শব্দ শ্রবণ করা। (৩) দু'জন স্বাধীন পুরুষ বা একজন

স্বাধীন পুরুষ ও দু'জন স্বাধীন নারীর স্বাক্ষী হওয়া। ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে দ্বিমত পোষণ করেছেন, তাঁদের মতে পুরুষ ভিন্ন মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না। আর সাক্ষীগণ শরিয়তের মুকাল্লাফ মুসলমান এবং উভয় পক্ষের শব্দ একই সাথে শ্রবণকারী হতে হবে। সুতরাং যদি তারা বিচ্ছিন্নভাবে শ্রবণ করে, তবে তাতে নিকাহ শুদ্ধ হবে না।

বিবাহের সাক্ষীদ্বয় স্বাধীন হওয়া এ জন্য শর্ত করা হয়েছে যে, কৃতদাসের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ সাক্ষী وَلَايَتْ তথা অধিকার ও ক্ষমতা ছাড়া হতে পারে না, আর কৃতদাস স্বয়ং নিজের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে সক্ষম নয় সে অন্যের ওপর কিভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

বিবাহের সময় সাক্ষীদ্বয় উপস্থিতি থাকতে হবে, অনুমতির সময় নয়।

সাক্ষীদ্বয় জ্ঞানী ও প্রাপ্তবয়স্ক এ জন্য শর্ত করা হয়েছে যে, জ্ঞানী ও প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষী না হলে বিবাহ বৈধ হবে না।

বিবাহের সাক্ষীদ্বয় মুসলমান হওয়া এ জন্য শর্ত করা হয়েছে যে, মুসলমানের ওপর কাফিরের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে- وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا

এ আয়াতে মুসলমানদের ওপর কাফিরের কর্তৃত্বকে নিষেধ করা হয়েছে।

বিবাহের সাক্ষীদ্বয়ের আবশ্যকীয় গুণাগুণ ঃ বিবাহের উভয় সাক্ষী স্বামী-স্ত্রী শব্দসমূহ একত্রে শুনতে হবে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, যদি উভয় সাক্ষী ঘুমিয়ে থাকে অথবা তারা কানে না শুনে, তাহলে বিবাহ সংঘটিত হবে না। কেননা যখন সাক্ষীগণ স্বামী-স্ত্রীর কথা না শুনে তখন তাদের উপস্থিত হওয়া না হওয়া সমান কথা। আর হাদীসের মধ্যে শুধু উপস্থিত হওয়া শর্ত নয়; বরং ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য শর্ত। আর ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য শ্রবণ ব্যতীত সম্ভব নয়। অনুরূপ সাক্ষীদের বুঝা ব্যতীত সাক্ষ্য হতে পারে না। এ জন্য বাহর ইত্যাদি কিতাবে সাক্ষীদের জন্য ইজাব কবুলের উক্তি বুঝাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। যেমন- যদি ইজাব ও কবুল আরবি ভাষায় হয়, আর সাক্ষী হিন্দী অথবা বাঙ্গালী হয়, যারা আরবি বুঝে না, তাহলে বিবাহ হবে না। তবে যদি ইজাব ও কবুলের শব্দের শাব্দিক অর্থ না বুঝেও মোটামুটি এতটুকু বুঝে যে, এটা ইজাব কবুলের শব্দ এবং এখন ইজাব ও কবুল হচ্ছে। তবে বিবাহ হবে অন্যথা হবে না। -(খুলাসা)

কতিপয় পারিভাষিক শব্দের ব্যাখ্যা ঃ

اِيْجَابٌ ঃ সম্পর্ককারীদের উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষে উক্তিকে اِيْجَابٌ বলে।

قَبُوْلٌ ঃ সম্পর্ককারীদের দ্বিতীয় পক্ষের উক্তিকে قَبُوْلٌ বলে।

رُكْنٌ ঃ কোনো বস্তুর ঐ বিষয়কে তার رُكْنٌ বলে যা বস্তুর অঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

شَرْطٌ ঃ কোনো বস্তুর ঐ বিষয়কে তার شَرْطٌ বলে, যা বস্তুর অঙ্গ নয়; বরং প্রাসঙ্গিক নির্ভরশীল বিষয়।

বিবাহের সাক্ষীর ব্যাপারে মতানৈক্য ঃ

قَوْلُهُ اِلَّا بِحُضُوْرِ شَاهِدَيْنِ الخ ঃ জমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামদের মতে সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না, কারণ হাদীস শরীফে আছে নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, لَانِكَاحَ اِلَّا بِحُضُوْرِ شَاهِدَيْنِ অর্থাৎ দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতি ব্যতীত বিবাহ শুদ্ধ হবে না। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে বিবাহের জন্য সাক্ষী শর্ত নয় ও তাঁর প্রমাণ এই হাদীস-

اَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوْا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ .

জমহুরদের পক্ষ থেকে ইমাম মালেক (র.)-কে এ উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, হাদীস দ্বারা শুধু اِعْلَانٌ প্রমাণিত হয়, এ হাদীসে সাক্ষী শর্ত হওয়াকে নিষেধ করা হয়নি।

সাক্ষীর ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতানৈক্য ঃ আমাদের ইমাম আজম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিবাহের সাক্ষীর ব্যাপারে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা হতে হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত এর ব্যতিক্রম, তথা তাঁর মতে সাক্ষী হিসেবে দু'জন পুরুষ হতে হবে, মহিলার সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো হাদীস- لَانِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ হাদীসে شَاهِدَيْ শব্দ مُذَكَّرٌ-এর জন্য তাই সাক্ষীর জন্য পুরুষ হতে হবে। আর আমাদের মতে সাক্ষীর জন্য নারী পুরুষের কোনো প্রভেদ নেই। আর হাদীসের মধ্যে বর্ণিত شَاهِدَيْنِ-এর শব্দ সাক্ষীর জন্য ব্যবহৃত হয়েছে, এখানে নারী পুরুষের দিক চিন্তা করা হয়নি।

বিবাহে সাক্ষী নির্ধারিত হওয়ার রহস্য ঃ সকল নবী রাসূল ও ইমামগণ এ বিষয়ে একমত যে, বিবাহের প্রচার হতে হবে; যাতে উপস্থিত লোকজনদের সামনে বিবাহ ও ব্যভিচারের পার্থক্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এ জন্য সাক্ষীও নির্ধারণ করা হয়েছে।

সাক্ষীর সংখ্যার ব্যাপারে কুরআনের বাণী ঃ সাক্ষীর সংখ্যা দু'জন হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার ঘোষণা হচ্ছে—

وَاسْتَشْهِدُوْا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ

অর্থাৎ তোমরা পুরুষদের মধ্যে হতে দু'জন স্বাক্ষী গ্রহণ করো। আর যদি সাক্ষী দু'জন পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা হতে হবে।

বিবাহে ফাসেকের সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য ঃ

قَوْلُهُ اَوْ غَيْرِ عَدُوْلٍ ঃ এ বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য غَيْرِ عَادِلٍ বা ফাসেকের সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য, কারণ غَيْرِ عَادِلٍ ব্যক্তি ফাসেক হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হিসেবে তার নিজের ওপর নিজের وَلَايَتْ বা অধিকার আছে। সুতরাং অন্যের ওপরও তার অধিকার হবে। যদিও সে ফাসেক হিসেবে তার এই وَلَايَتْ অসম্পূর্ণ হয়, তবু বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট। যদিও কাজির সম্মুখে তার এই সাক্ষ্য যথেষ্ট নয়। যেহেতু কাজির নিকট ফাসেকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

অপবাদ দেওয়ার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য কবুল হবে কিনা? পবিত্র ব্যক্তির ওপর জেনার অপবাদ দেওয়ার কারণে যার ওপর শরিয়ত অনুমোদিত শাস্তি প্রদান করা হয়েছে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য না হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা ঃ فَلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا প্রমাণ করে কিন্তু বিবাহ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে তাদের উপস্থিতি ও সাক্ষ্য প্রদান যথেষ্ট। কেননা তাদের উপস্থিতি ও সাক্ষ্য প্রদান যথেষ্ট। কেননা তাদের নিজেদের ওপর وَلَايَتْ অর্জিত আছে, যদিও কাজির দরবারে হদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

যাদেরকে বিবাহ করা হারাম তাদের বয়ান ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يَّتَزَوَّجَ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) حُرْمَتِ نَسَبِىْ ও حُرْمَتِ مُصَاهَرَةِ-এর আলোচনা আরম্ভ করেছেন। حُرْمَتْ মোট চার প্রকার ঃ (১) حُرْمَتِ نَسَبِىْ অর্থাৎ বংশানুক্রমে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম। যেমন– আপন মা, বোন, দাদী, নানী ইত্যাদি। (২) حُرْمَتْ مُصَاهَرَةْ অর্থাৎ বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম। এভাবে জেনা ও কামভাবের সাথে স্পর্শ করার কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম। যেমন– শ্বাশুড়ি ইত্যাদি। (৩) حُرْمَتِ رَضَاعِىْ অর্থাৎ দুগ্ধ পান ও দুগ্ধদানের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম। যেমন– দুধ-মা, দুধ-বোন ইত্যাদি। (৪) حُرْمَتِ مُعَلَّقِىْ অর্থাৎ একত্রে যে সব মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে রাখা হারাম। যেমন– দু'বোন, খালা ও তার বোনের মেয়েকে এবং ফুফু ও তার ভাই-এর কন্যাকে একত্রে কোনো পুরুষ বিবাহ বন্ধনে রাখা হারাম। এভাবে দাসী হিসাবে দু'বোনকে একত্রে সহবাস করাও হারাম, কারণ এটা حُرْمَتِ مُعَلَّقِىْ -এর অন্তর্ভুক্ত।

কুরআনের আলোকে উপরোক্ত চার প্রকার حُرْمَتْ-এর বয়ান ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ঘোষণা করেন—

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْاَخِ وَبَنَاتُ الْاُخْتِ وَاُمَّهَاتُكُمُ الَّتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ وَاَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ -

অর্থ ঃ তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃ কন্যা, ভগিনী কন্যা, তোমাদের ঐ মাতা যারা তোমাদেরকে স্তন্য পান করিয়েছে, তোমাদের দুধ বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা। অন্যত্রে এরশাদ হচ্ছে— (الاية) وَاَنْ تَجْمَعُوْا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ اِلَّامَاقَدْسَلَفَ অর্থ– এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে।

وَلَا بِأُخْتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أُخْتِهِ وَلَا بِعَمَّتِهِ وَلَا بِخَالَتِهِ وَلَا بِبَنَاتِ أَخِيهِ وَلَا بِأُمِّ إِمْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِابْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَلَا بِابْنَةِ إِمْرَأَةِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي حِجْرِهِ أَوْ فِي حِجْرِ غَيْرِهِ وَلَا بِامْرَأَةِ أَبِيهِ وَلَا أَجْدَادِهِ وَلَا بِامْرَأَةِ إِبْنِهِ وَلَا بَنِي أَوْلَادِهِ وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا بِأُخْتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِنِكَاحٍ وَلَا بِمِلْكِ يَمِينٍ وَطْئًا ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং (পুরুষের জন্য বিবাহ) হালাল নয় আপন বোনকে, আপন বোনের কন্যা অর্থাৎ ভগিনীকে, স্বীয় ফুফুকে, স্বীয় খালাকে, আপন ভাইয়ের কন্যা অর্থাৎ ভাতিজীকে, স্বীয় স্ত্রীর মাঝে অর্থাৎ শ্বাশুড়িকে স্ত্রীর সাথে সহবাস করুক চাই না করুক, স্বীয় ঐ স্ত্রীর কন্যাকে যে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে ঐ কন্যা নিজের লালন-পালনে হোক বা অপরের লালন পালনে হোক এবং নিজের পিতার স্ত্রীকে অর্থাৎ সৎমাকে, স্বীয় দাদার স্ত্রীকে অর্থাৎ সৎ দাদীকে, স্বীয় ছেলের স্ত্রীকে অর্থাৎ বৌ মাকে, স্বীয় নাতীদের স্ত্রীকে, স্বীয় দুধ-মাকে, স্বীয় দুধ-বোনকে এবং দু'বোনকে বিবাহের দ্বারা একত্র করা হারাম এবং দাসী হিসাবে সহবাস করাও হারাম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দুগ্ধদান ও দুগ্ধপানের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম ঃ

قَوْلُهُ وَلَا بِأُمِّهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) حُرْمَتِ رَضَاعِي তথা দুগ্ধদান ও দুগ্ধপানের কারণে যাদেরকে বিবাহ করা হারাম ও যাদের নিকট বিবাহ বসা হারাম তাদের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। এখানে গ্রন্থকার (র.) حُرْمَتِ رَضَاعِي -এর আলোচনা সংক্ষিপ্তাকারে করেছেন। ফিকহশাস্ত্রের অন্যান্য কিতাব ও সহীহ হাদীস দ্বারা حُرْمَتِ رضاعي–এর বিস্তারিত বিধানাবলী এই যে, যে সব আত্মীয়-স্বজনকে نَسَبْ -এর কারণে বিবাহ করা হারাম উপরে বর্ণনা করা হয়েছে। رضاع তথা দুগ্ধদান ও দুগ্ধপানের কারণেও তাদেরকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যাবে। হ্যাঁ দুগ্ধদানকারিণী নারী ও তাঁর অন্যান্য মহিলা আত্মীয়রা দুগ্ধ পানকারী পুরুষ ও তার ছেলেদের সাথে বিবাহ বসা শুধু হারাম হবে অন্যান্য পুরুষদের সাথে হারাম হবে না, এভাবে দুগ্ধ দানকারিণী নারী ও তার মহিলা আত্মীয়রা দুগ্ধপানকারিণীর স্বামী ও তার ছেলেদের সাথে বিবাহ বসা হারাম হবে। অন্যান্য পুরুষদের সাথে হারাম হবে না। কবির ভাষায় আলোচ্য বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে–

ازجانب شيرده همه خويش شونه * وازجانب شير خواره زوجان وفروع

অর্থাৎ দুগ্ধদানকারিণীর পক্ষের সকল নারী দুগ্ধপানকারীর ওপর আর দুগ্ধপানকারীর পক্ষে শুধু স্বামী-স্ত্রী ও ছেলে সন্তান দুগ্ধপানকারিণী ও অন্যান্য নারীদের জন্য হারাম হবে। হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন—

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

অর্থাৎ নসব-এর দ্বারা যারা হারাম হয় দুগ্ধ পান-এর দ্বারাও তারা হারাম হয়ে যায় অর্থাৎ তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম হয়ে যাবে।

যুক্তির আলোকে দুগ্ধপান-এর দ্বারা হারাম হওয়ার রহস্য ঃ এমনিভাবে আপন জনের মতো রেযাআত অর্থাৎ দুগ্ধ পানও হারাম হওয়ার কারণ। কেননা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা মায়ের মতোই হয়ে যায়। এ জন্য যে, তা দেহের পুষ্টি এবং তার আকৃতি গঠনের মাধ্যম হয়। সুতরাং সেও মূলত মায়ের পরে আরেক মা। দুধ-মার সন্তানগণ সাহোদর ভাইবোনদের ন্যায়ই তার আরেক ভাই বোন। অতএব, তার মালিক হওয়া, স্ত্রীরূপে তাকে গ্রহণ করা ও তার সাথে সহবাস করা এমন বিষয় যা সুস্থ বিবেকবান সকলেই ঘৃণা করে।

قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) حُرْمَتِ مُعَلَّقِي -এর আলোচনা আরম্ভ করেছেন, অর্থাৎ দু' বোনকে একই পুরুষ নিজের বিবাহে রাখা হারাম। হ্যাঁ, এক বোনকে তালাক দেওয়ার পর বা এক বোন মারা গেলে তারপর অপর বোনকে বিবাহ করা জায়েজ আছে। এভাবে এরূপ দু'জন দাসী যারা পরস্পর বোন তাদের সাথেও মনিবের সহবাস করা হারাম। কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে– وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ (الاية) অর্থাৎ এবং দু'বোনকে একত্রে বিবাহ করাও (হারাম)।

হাদীস শরীফে আছে নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা এবং আখেরাতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে তার জন্য উচিত, যেন নিজের বীর্য দু'বোনের বাচ্চাদানীতে একত্রিত না করে।

মাসআলা ঃ কোনো মহিলাকে نِكَاحِ فَاسِدْ করার পর তার বোনকে نِكَاحِ صَحِيْحِ করলে এটা বৈধ। কারণ نِكَاحِ فَاسِدْ -এর মধ্যে শুধু সহবাস হালাল হয় না।

যুক্তির আলোকে দু'বোনকে একত্রে বিবাহ্ করা হারাম ঃ দু'বোনকে একত্রে বিবাহ্ করা হারাম। কেননা এটা তাদের পরস্পরের সতীনসুলভ হিংসা ও শত্রুতা সৃষ্টির কারণ হবে। এতে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হবে। আত্মীয়দের মাঝে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া আল্লাহ তা'আলার অভিপ্রেত নয়। এমনিভাবে এই প্রকারের আত্মীয়তা সূত্রে ঘনিষ্ট মহিলাদের পরস্পরকে এক ব্যক্তির বিবাহ্ বন্ধনে আবদ্ধ করা হারাম করা হয়েছে। নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন— لَايُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَابَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا অর্থাৎ কোনো মহিলা ও তার ফুফুকে একত্রে বিবাহ্ বন্ধনে রাখা যাবে না। এমনিভাবে কোনো মহিলা ও তার খালাকে একত্রে বিবাহে আবদ্ধ করা যাবে না।

যুক্তির আলোকে حُرْمَتِ نَسَبِىْ وَمُصَاهَرَةْ ঃ সুস্থ মস্তিষ্ক ও মানসিকতার দাবি হলো, মানুষ সে মহিলার প্রতি আকর্ষণবোধ করবে না, যার গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করেছে বা তার ঔরসে যে মহিলা জন্মলাভ করেছে। অথবা তারা দু'জনের মধ্যে এমন সম্পর্ক যেন তারা একটি বাগানের দু'টি শাখা অর্থাৎ ভাইবোন। যদি কোনো আপনজন স্বয়ং তার নিকটাত্মীয়া কোনো মহিলাকে বিবাহ্ করতো, তবে স্ত্রীর পক্ষে এই আপনজনের নিকট বৈবাহিক অধিকার দাবি করার মতো কেও থাকতো না। অথচ মহিলাদের জন্য স্ত্রীর অধিকার ও দাবি আদায় করার জন্য কোনো অভিভাবক থাকা একান্ত জরুরি। আর যে সম্বন্ধের মাঝে এই দু'টি গুণ অর্থাৎ কামাসক্তি না হওয়া এবং অন্য কারও তার নিকট দাবি করতে না পারা পাওয়া যায়, উহা স্বভাবগতভাবেই পুরুষ এবং তার মা, বোন, কন্যা, ফুফু, খালা, ভাতিজী ও বোনঝির মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং এদের সকলকেই পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে বৈবাহিক সম্পর্কও অনেক মহিলার বিবাহ্ হারাম করে দেয়। কেননা মানুষের মধ্যে যদি এই প্রবণতা দেখা দেয় যে, যা নিজ কন্যার স্বামীর প্রতি, পুরুষ নিজ পুত্রবধূর প্রতি অথবা আপন স্ত্রীর (পূর্ব স্বামীর) কন্যাদের প্রতি এবং স্ত্রী স্বামীর (অন্য স্ত্রীর) পুত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যা বিবাহ্ হালাল অবস্থায় সম্ভব হতে পারে, তবে এই সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলার অথবা যার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হবে, তাকে হত্যা করে ফেলার চেষ্টা করা হবে।

نَسَبْ বা বংশগত কারণে হারামকৃতা নারীদের তালিকা ঃ (ক) মাতৃগণ, দাদী নানী ও বিমাতা মাতৃগণের অন্তর্ভুক্ত। (খ) কন্যাগণ, ছেলে ও মেয়ের কন্যাগণও কন্যাগণের অন্তর্ভুক্ত। (গ) ভগ্নিগণ, সহোদারা, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোন সকলেই এই ভগ্নির অন্তর্ভুক্ত। (ঘ) ফুফুগণ, পিতার সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোন সকলেই এই ফুফুর অন্তর্ভুক্ত। (ঙ) খালাগণ, মায়ের সহোদারা, বৈমাত্রেয়ী বৈপিত্রেয়ী ভগ্নিগণ খালাগণের অন্তর্ভুক্ত। (চ) ভাতিজীগণ, সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই এই ত্রিবিধ প্রকারের ভাইয়ের কন্যাই এই ভাতিজীর অর্ন্তভুক্ত। (ছ) ভাগিনীগণ, এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয়ী ও বৈপিত্রেয়ী বোন এই ত্রিবিধ প্রকার বোনের কন্যাই ভাগিনীগণের অন্তর্ভুক্ত।

رَضَاعَتْ বা দুগ্ধ সম্পর্কিত কারণে হারামকৃতা নারীদের তালিকা ঃ (ক) দুগ্ধ সম্পর্কিতা মা। (খ) দুগ্ধ সম্পর্কিতা বোন, যার প্রকৃত মা কিংবা দুগ্ধ সম্পর্কিতা মায়ের দুগ্ধপান করা হয়েছে। অথবা সেই বোন তার নিজের প্রকৃত মা কিংবা দুগ্ধ সম্পর্কিতা মায়ের দুধ পান করেছে। যদিও তা একই সময় না হয়।

مُصَاهَرَةْ ও مُعَلِّقِى-এর কারণে হারামকৃতা নারীদের তালিকা ঃ (ক) স্ত্রীগণের মা, চাই উক্ত স্ত্রী সঙ্গমকৃতা হোক কিংবা না হোক। কেননা উক্ত আয়াতে وَاُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ তোমাদের স্ত্রীগণের মাতৃগণের মাতৃগণ নিঃশর্তভাবে উল্লিখিত হয়েছে। (খ) সঙ্গমতা স্ত্রীর কন্যা, যে স্ত্রীর অন্য স্বামীর ঔরসে জন্ম লাভ করেছে। চাই সে কন্যা তারই লালন-পালনে হোক কিংবা না হোক। (গ) পুত্রবধূগণ, যেহেতু কুরআন মাজীদে এরশাদ হয়েছে— وَحَلَائِلُ اَبْنَائِكُمُ الَّذِيْنَ مِنْ اَصْلَابِكُمْ (الاية) (ঘ) দুই বোনকে বৈবাহিক সূত্রে একত্রিত করা। যদিও তা তালাকে বায়েনের ইদ্দতের মধ্যেই হোকনা কেন একইভাবে মালিকানা সূত্রেও দুই বোনকে সহবাসের সাথে একত্রিত করা নিষিদ্ধ। (ঙ) সাধবী মহিলাগণ। (চ) নিজের দ্বারা ব্যাভিচারিতা মহিলার মাতৃ ও কন্যাগণ। অর্থাৎ اُصُوْل ও فُرُوْع (ছ) কামাসক্তি বা কামোত্তেজনাসহ স্পর্শকৃতা মহিলার মাতৃ ও কন্যাগণ। অর্থাৎ উর্ধ্বতন ও অধঃস্তন মহিলাগণ। (জ) কামোত্তেজনাসহ লজ্জাস্থানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্তা মহিলার মাতৃ ও কন্যাগণ। (ঝ) এরূপ দুই মহিলাকে বিবাহে একত্রিত করা, যাদের একজনকে পুরুষরূপে কল্পনা করা হলে তাদের মধ্যে বিবাহ হারাম হতো।

وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا اَوْخَالَتِهَا وَلَا اِبْنَةِ اُخْتِهَا وَلَا اِبْنَةِ اَخِيْهَا وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ لَوْكَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا رَجُلًا لَمْ يَجُزْ لَهُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ بِالْاُخْرٰى وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يُّجْمَعَ بَيْنَ اِمْرَأَةٍ وَابْنَةِ زَوْجٍ كَانَ لَهَا مِنْ قَبْلُ وَمَنْ زَنٰى بِاِمْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اُمُّهَا وَابْنَتُهَا وَاِذَا اَطْلَقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا اَوْ رَجْعِيًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ بِاُخْتِهَا حَتّٰى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا وَلَا يَجُوْزُ لِلْمَوْلٰى اَنْ يَّتَزَوَّجَ اَمَتَهُ وَلَا الْمَرْأَةِ عَبْدَهَا ـ

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ এবং একই বন্ধনে স্ত্রী ও তার ফুফু অথবা খালা অথবা ভাগিনী ভাতিজী এবং এমন দু'জন মহিলাকে যাদের মধ্য থেকে একজন যদি পুরুষ হয় তবে তার জন্য দ্বিতীয় জন থেকে বিবাহ বন্ধন জায়েজ হয় না তাদেরকে বিবাহ বন্ধনে একত্রিত করবে না। মহিলা ও তার পূর্বেকার স্বামীর মেয়েকে এক বিবাহ বন্ধনে একত্রকরণ দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি কোনো মহিলার সঙ্গে জেনা করল তার জন্য উক্ত মহিলার মাতা ও তার মেয়ে হারাম। যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বায়েন তালাক অথবা তালাকে রজঈ দিল তাহলে উক্ত মহিলার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তার বোনের সাথে বিবাহ জায়েজ হবে না। মনিবের জন্য তার বাঁদিকে বিবাহ করা জায়েজ নয়। অনুরূপভাবে মহিলার জন্য তার গোলামের সাথে (বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েজ নেই)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ؛ وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ الخ এখান থেকেও গ্রন্থকার (র.) حُرْمَتِ مُعَلَّقِى -এর আর একটি বিধান বর্ণনা করছেন। এ বিধানটির মধ্যে ফুফু ও ভাই-এর কন্যাকে এবং খালা ও বোনের কন্যাকে একত্রে বিয়ে করা হারাম হওয়ার যুক্তি পিছনে বর্ণনা করা হয়েছে।

<u>حُرْمَتِ مُعَلَّقِى সম্পর্কীয় একটি মূলনীতি ঃ</u>

قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ لَوْ كَانَتْ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) حُرْمَتِ مُعَلَّقِى সম্পর্কে একটি মূলনীতি বর্ণনা করছেন, মূলনীতিটি এই যে, কোনো পুরুষের জন্য এরূপ দু'জন মহিলাকে একসঙ্গে বিবাহ করা জায়েজ নেই যাদের মধ্যে থেকে একজনকে পুরুষ হিসাবে মেনে নিলে তাদের মাঝে পরস্পর বিবাহ অবৈধ যেমন কোনো মহিলা (ভাতিজী) ও তার ফুফু এদের দু'জনকে কোনো পুরুষ একত্রে বিবাহ করতে পারবে না। কারণ ফুফুকে পুরুষ মানা হলে হয় চাচা, আর চাচার সাথে ভাই এর কন্যার বিবাহ অবৈধ। এরূপভাবে ভাই-এর কন্যাকে পুরুষ মানা হলে হয় ভাই-এর ছেলে (ভাতিজা), আর ভাতিজার সাথে ফুফুর বিবাহ অবৈধ। এরূপভাবে খালা ও বোনের কন্যার অবস্থা। খালাকে পুরুষ মেনে নিলে হয় মামা, আর বোনের কন্যাকে পুরুষ মেনে নিলে হয় ভাগিনা, আর মামার সাথে ভাগনীর এবং খালার সাথে ও ভাগ্নে বিবাহ অবৈধ। সার কথা হলো, উপরোক্ত মূলনীতি অনুযায়ী খালা ও ভাগিনীকে এবং ফুফু ও ভাতিজীকে একসাথে কোনো পুরুষের বিবাহ করা জায়েজ হবে না। কারণ নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন—

لَا تُنْكِحُوا الْمَرْأَةَ عَلٰى عَمَّتِهَا وَلَا عَلٰى خَالَتِهَا وَلَا عَلٰى اِبْنَةِ اَخِيْهَا وَلَا عَلٰى اِبْنَةِ اُخْتِهَا ـ

এ হাদীসে নবী করীম (সা.) حُرْمَتِ مُعَلَّقِى -এর বিবরণ দিয়েছেন।

উপরোক্ত দু'জন মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা এ জন্য হারাম যে, এতে রেহেমের বা রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।

হ্যাঁ, যদি এরূপ দু'জন মহিলা এমন হয়, যাদের কোনো একজনকে পুরুষ মেনে নেওয়া হলে তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহ হারাম হয় না, তখন ইমাম চতুষ্টয়ের মতে এরূপ দু'জন মহিলাকে একত্রে বিবাহ করা জায়েজ। যেমন– কোনো এক মহিলা ও তার স্বামী কন্যাকে একত্রে বিবাহ করা জায়েজ, কারণ তাদের একজনকে পুরুষ মেনে নিলে অপরজন হারাম হয় না।

তবে ইমাম যুফর, ইবনে আবী লায়লা, হাসান বসরী ও ইকরামা (র.)-এর মতে এ অবস্থায়ও জায়েজ হবে না, কারণ ঐ অবস্থায় যদিও মহিলাকে পুরুষ মেনে নিলে স্বামীর কন্যা হারাম হয় না কিন্তু স্বামীর কন্যাকে পুরুষ মেনে নিলে যেহেতু তাদের মাঝে বিবাহ হারাম এ জন্য একদিক থেকে حُرْمَتْ পাওয়া যাওয়ার কারণে حُرْمَتْ-কে অগ্রাধিকার দিয়ে তাঁরা বলেন حَرَامْ হওয়াই সাবধানতা। চার ইমাম (র.) তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ এ সম্পর্কে কুরআন কারীমের এ আয়াত وَاُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ (الاية) প্রমাণ পেশ করেন।

জেনার দ্বারা حُرْمَتِ مُصَاهَرَةْ সাব্যস্ত হওয়া সম্পর্কে মতভেদ ঃ

قَوْلُهٗ وَمَنْ زَنٰى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ الخ ঃ কোনো নারীর সাথে জেনা করলে অধিকাংশ সাহাবী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ তাবেঈগণের মতে حُرْمَتِ مُصَاهَرَةْ সাব্যস্ত হবে। প্রমাণে তারা নবী করীম (স)-এর এ হাদীস পেশ করেন,

مَنْ مَسَّ اِمْرَأَةً بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ اُمُّهَا وَبِنْتُهَا ـ

ইমাম শাফেয়ী (র.) এতে দ্বিমত প্রকাশ করে বলেন যে, حُرْمَتِ مُصَاهَرَةْ এটা একটি (আল্লাহর) অনুগ্রহ এতে অপরিচিত। নারী যার সাথে অপরিচিত পুরুষ পিতার সাথে মিলিত হয়ে যায়, অতএব এ নিয়ামত ও অনুগ্রহ অবৈধ পন্থায় লাভ হতে পারে না।

এর উত্তর হচ্ছে– প্রকৃতপক্ষে সহবাস হচ্ছে حُرْمَتِ مُصَاهَرَه -এর কারণ, আর সহবাসের দ্বারা حُرْمَتِ مُصَاهَرَه এ জন্য সাব্যস্ত হয় যে, উহার দ্বারা বাচ্চা পয়দা হয়, মূলত বাচ্চার মধ্যে কোনো দোষ নেই বরং বাচ্চা হচ্ছে সম্মানী ও মোহতারাম, অতএব বাচ্চা হওয়ার কারণের মধ্যে অর্থাৎ সহবাস-এর মধ্যেও কোনো দোষ নেই।

قَوْلُهٗ لَمْ يَجُزْ لَهٗ اَنْ يَّتَزَوَّجَ الخ ঃ যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে তালাকে রজঈ বা বায়েন প্রদান করে তবে ইদ্দত অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে তার বোনকে বিবাহ করা হারাম। হযরত আলী, ইবনে মাসউদ, যায়েদ ইবনে ছাবেত ও ইবনে আব্বাস (রা.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও ইবনে আবী লায়লার মতে যদি তার ইদ্দত তিন তালাকের বা তালাকে বায়েনের হয় তবে ইদ্দতের মধ্যে তার অপর বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ। কেননা এ সুরতে বিবাহ একেবারেই শেষ হয়ে গেছে। আর এ কারণেই حُرْمَتْ-এর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও স্বামী যদি বায়েন বা তিন তালাকের ইদ্দত পালনরতা স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে তার ওপর হদ ওয়াজিব হবে। আলোচ্য মাসআলায় আমাদের প্রমাণ এই হাদীস–

اِنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْتَمِعُوْا عَلٰى شَيْءٍ كَاجْتِمَاعِهِمْ عَلٰى اَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَاَنْ لَاتَنْكِحَ اِمْرَأَةٌ فِيْ عِدَّةِ اُخْتِهَا ـ

আর বিবাহ এখনো শেষ হয়নি কেননা বৈবাহিক বিধানাবলী এখনো অবশিষ্ট রয়েছে। যথা– স্বামীর ওপর স্ত্রীর খোরপোশ ওয়াজিব হওয়া, স্ত্রীর জন্য স্বামীর বাড়িতেই ইদ্দত পালন করা ইত্যাদি। আর হদ ওয়াজিব হওয়াকেই আমরা অস্বীকার করি। যেমনটি মাবসূত কিতাবের তালাক পর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, হদ ওয়াজিব হবে তবে তা এ কারণে যে, বৈধতার দিক হতে তার মালিকানা তিরোহিত হয়ে গেছে। এ জন্য তার সাথে সহবাস করলে ব্যভিচার সাব্যস্ত হবে। কিন্তু খোরপোশ ওয়াজিব হওয়া এবং স্বামীর বাড়িতে ইদ্দতকালীন সময় কাটানো হিসেবে মালিকানা এখনো অবশিষ্ট রয়েছে তাই এ সময়ের মধ্যে তার অপর বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে– جَمْعٌ بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ অত্যাবশ্যক হয়ে পড়বে। এ জন্যই আমরা বলি যে, ইদ্দতকালীন সময়ে তার অপর বোনের সাথে বিবাহ বন্ধন অবৈধ।

وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الْكِتَابِيَاتِ وَلَايَجُوزُ تَزْوِيجُ الْمَجُوْسِيَّاتِ وَلَاالْوَثَنِيَاتِ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّابِيَاتِ إِنْ كَانُوا يُؤْمِنُوْنَ بِنَبِيٍّ وَيُقِرُّوْنَ بِكِتَابٍ وَإِنْ كَانُوا يَعْبُدُوْنَ الْكَوَاكِبَ وَلَاكِتَابَ لَهُمْ لَمْ يَجُزْ مُنَاكَحَتُهُمْ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ أَنْ يَتَزَوَّجَا فِيْ حَالَةِ الْإِحْرَامِ وَيَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِرِضَائِهَا وَإِنْ لَّمْ يَعْقِدْ عَلَيْهَا وَلِيٌّ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَقَالَا لَايَنْعَقِدُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيٍّ وَلَايَجُوزُ لِلْوَلِيِّ إِجْبَارُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ وَإِذَا اِسْتَاْذَنَهَا الْوَلِيُّ فَسَكَتَتْ أَوْضَحِكَتْ أَوْبَكَتْ بِغَيْرِ صَوْتٍ فَذٰلِكَ إِذْنٌ مِنْهَا وَإِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَإِذَا اِسْتَاْذَنَ الثَّيِّبَ فَلَابُدَّ مِنْ رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং কিতাবিয়া (ইহুদি খ্রিস্টান) মহিলার সঙ্গে বিবাহ বন্ধন জায়েজ আছে। অগ্নিপূজক ও মূর্তিপূজক মহিলার সাথে বিবাহ জায়েজ নেই। আর সাবিয়া মহিলা যদি সে কোনো নবীর ওপর ঈমান রাখে এবং কিতাব মানে তবে বিবাহ জায়েজ। আর যদি নক্ষত্রাবলী পূজা করে এবং তাদের কাছে কোনো কিতাব না হয় তাহলে তার সাথে বিবাহ জায়েজ হবে না। মুহরিম পুরুষ ও মহিলার জন্য এহরাম অবস্থায় বিবাহ জায়েজ। জ্ঞানী, বালেগ, আজাদ মহিলার বিবাহ তার সম্মতিক্রমে সংঘটিত হয়ে যাবে যদিও তার অভিভাবক তাকে বিবাহ না দেয়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে। চাই সে মহিলা বাকেরা হোক অথবা ছাইয়েবাহ্। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, অভিবাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ সংঘটিত হবে না এবং অভিভাবকের জন্য বাকেরা (কুমারী) সাবালিকা মহিলাকে বিবাহের জন্য জবরদস্তী করা জায়েজ নেই। যখন কুমারী মহিলা থেকে তার বিবাহের অনুমতি চাইল, অতঃপর উক্ত মহিলা চুপ রইল, অথবা হেসে দিল, অথবা আওয়াজ ছাড়া কাঁদল তাহলে এ সকল কর্ম তার পক্ষ থেকে বিবাহের অনুমতি বলে গণ্য হবে। আর যদি সে অস্বীকার করে তাহলে তাকে বিবাহ দেওয়া (জায়েজ) হবে না। আর যদি কোনো ছাইয়েবাহ মহিলা থেকে অনুমতি চাইল তাহলে তার সন্তুষ্টি তার মুখের বাক্য দ্বারা হওয়া জরুরি (মুখের বাক্য ব্যতীত গ্রহণযোগ্য নয়)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَزْوِيْجُ الْكِتَابِيَاتِ الخ ঃ এ মাসআলার প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী—

وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ (الاية) ـ

অর্থাৎ আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সাধবা স্ত্রীলোককে (বিবাহ করা বৈধ)। আলোচ্য মাসআলাটির যুক্তি সামনে বর্ণনা করা হবে।

قَوْلُهُ وَلَايَجُوزُ تَزْوِيْجُ الْمَجُوْسِيَّاتِ ঃ এ মাসআলার প্রমাণ মহান আল্লাহর বাণী—

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ـ

অর্থাৎ ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ্ করোনা এবং রাসূলুল্লাহ (স.)-এর বাণী—

سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرَ نَاكِحِىْ نِسَائِهِمْ وَلَا أٰكِلِ ذَبَائِحِهِمْ ـ

ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে আছে যে, সূর্য, চন্দ্র ও মূর্তিপূজক, মোআত্বত্বালাহ নাস্তিক, বাত্বেনীয়্যা (তথা শিয়াদের একটি দল যাদের নেতা হচ্ছে হাসান ইবনে সাবা) এবং আমাজীয়্যা এসব দল মূর্তিপূজক-এর অন্তর্ভুক্ত।

সাবিয়া নারীদের বিবাহকরণ প্রসঙ্গে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ تَزْوِيجُ الصَّابِيَاتِ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে সাবিয়া নারীদেরকে বিবাহ করা জায়েজ। সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে জায়েজ নেই। এ মতভেদের ভিত্তি এ কথার ওপর যে, সাবিয়া দল তারা আহ্লে কিতাব-এর অন্তর্ভুক্ত, না অন্য ধর্মের? সাহেবাঈন (র.) বলেন যে, সাবিয়া এরা মূর্তিপূজকদের অন্তর্ভুক্ত কারণ তারা তারকা পূজা করে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর রিসার্চ অনুযায়ী সাবিয়া এরা যাবূর কিতাবকে মানে, তারকা পূজা করে না; বরং তারকার সম্মান করে যেরূপ মুসলমান কাবার সম্মান করে থাকেন। উল্লিখিত মতভেদের কারণেই গ্রন্থকার (র.) বলেন, যদি সাবিয়া নারীগণ কোনো নবী এবং আসমানী কিতাবের ওপর বিশ্বাস রাখে তবে তো তাদের সাথে বিবাহ জায়েজ আছে, অন্যথা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ الخ ঃ অর্থাৎ যে মহিলা হজ অথবা ওমরা হজের এহ্রাম বাঁধল তাহলে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এহরাম অবস্থায় তাকে বিবাহ করা জায়েজ আছে। মহিলার অভিভাবক ও বিবাহকারী চাই মুহরিম হোক অথবা হালাল হোক। হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর মধ্যে হযরত ইবনে মাসউদ ও আনাস ইবনে মালেক (রা.) এটাই বলেন, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট মুহরিমের বিবাহ জায়েজ নেই। তাঁর দলিল এই হাদীস لَايَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَايُنْكَحُ অর্থাৎ মুহরিম ব্যক্তি নিজেও বিবাহ করবে না এবং তাকেও বিবাহ করানোও হবে না। আমাদের দলিল হচ্ছে– রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মাইমূনা (রা.)-কে এহ্রাম অবস্থায় বিবাহ করেছেন। কিন্তু যদি কোনো ব্যক্তি এ প্রশ্ন করেন যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে তিবরানী শরীফের রেওয়ায়তে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত মাইমূনা (রা.)-কে এহরাম অবস্থায় বিবাহ করেননি; বরং হযরত মাইমূনা (রা.) যখন হালাল ছিলেন, তখন বিবাহ করেছেন। তাহলে এর উত্তর হচ্ছে যে, স্বয়ং হাফেজ তিবরানীই হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে অসংখ্যভাবে রেওয়ায়াত করেছেন যে, হুযূর (সা.) যখন মাইমূনাহকে বিবাহ করেন তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। এ কথা বলার পর তিনি বলেছেন— هٰذَا هُوَ الصَّحِيْحُ

তারপরও যদি কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে ইয়াযীদ ইবনে আছাম স্বয়ং হযরত মাইমূনা (রা.) থেকে তাঁর কথা নকল করেছেন– হযরত মাইমূনা (রা.) বলেছেন– হুযূর (সা.) আমাকে বিবাহ করেছেন যখন আমি হালাল ছিলাম। তাহলে তার উত্তরে বলা হবে যে, ইয়াযীদ ইবনে আছাম যা রেওয়ায়ত করেছেন তা ঐ দরজায় নয় যে দরজায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়ত। কেননা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়ত ছয় ইমামের রেওয়ায়াতের সাথে মিলে; কিন্তু ইয়াযীদ ইবনে আছাম-এর রেওয়ায়ত এর বিপরীত। কেননা তাঁর রেওয়ায়তকে ইমাম বুখারী ও ইমাম নাসায়ী গ্রহণ করেননি। এমনকি স্মরণ শক্তির দিক দিয়েও হযরত ইয়াযীদ ইবনে আছাম হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর সাথে সমকক্ষ নয়। তবে এখানে যদি কোনো ব্যক্তি এ প্রশ্ন করে যে, যে সমস্ত রেওয়ায়তসমূহের মধ্যে وَهُوَ مُحْرِمٌ শব্দ রয়েছে ঐ সমস্ত রেওয়ায়তের মধ্যে এ শব্দ দ্বারা ইবনে হাববানের উক্তি অনুযায়ী এটাও হতে পারে যে রাসূলুল্লাহ (সা.) হেরেমের ভিতরে ছিলেন, এটা বুঝায় না যে তিনি মুহরিম ছিলেন। দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে– ইমাম বুখারী (র.)-এর হাদীসে تَزَوَّجَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ এবং بَنَالَهَا وَهُوَ حَلَالٌ এরপর এ তাবীলকে ফিরানো হয়েছে। সারকথা হচ্ছে যে, যে সমস্ত ওলামায়ে কেরাম হযরত মাইমূনাহ (রা.)-এর বিবাহকে মুহরিম অবস্থায় নকল করেছেন তারা আহলে ইলম, অতি মজবুত, বড় ফকীহ, পূর্ণ স্মরণ শক্তিশীল এবং আমানতদার ব্যক্তি। যথা– সাঈদ ইবনে জুবায়ের, ত্বাউস, মুজাহিদ, আকরামাহ এবং জাবের ইবনে যায়েদ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ। এমনকি হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)-এর রেওয়ায়ত হযরত আয়েশা সিদ্দীকাহ (রা.)-এর বর্ণনা দ্বারা সমর্থন পুষ্ট। এ জন্য এটাই গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ فَلَابُدَّ مِنْ رِضَائِهَا بِالْقَوْلِ الخ ঃ এখানে জানা উচিত যে ছাইয়েবাহ মহিলা থেকে যদি তার বিবাহ সম্পর্কে অনুমতি চায় তাহলে উক্ত মহিলার জন্য তার সন্তুষ্টমূলক উক্তি নিজ মুখে ব্যক্ত করা জরুরি। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন– اَلْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَالثَّيِّبُ تُعْرِبُ مِنْ نَفْسِهَا

রাসূলুল্লাহ (সা.) আরো এরশাদ করেছেন যে, বাকেরা মহিলাকে তার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দেওয়া হবে না। এই রেওয়ায়তের ব্যাপকতার দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, নাবালিকা বাকেরা মহিলার ওপর কারো বিবাহের জন্য জবরদস্তী করার আধিপত্য নেই, না পিতার জন্য এবং না অন্য কোনো ব্যক্তির। হানাফী মাযহাবের সুফিয়ান ছাউরী, আওযায়ী, আবূ ছাউর ও আবূ উবায়দাহ সকলে এটাই বলেন। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) এ সমস্ত দলিলসমূহের ব্যাপকতার অর্থকে ছেড়ে اَلثَّيِّبُ اَحَقُّ بِنَفْسِهَا -এর মাফহুমকে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি বলেন যে, বাকেরা মহিলার ওপরও জবরদস্তী করার আধিপত্য আছে

অথচ ইবনে রুশদ-এর উক্তি অনুযায়ী মাফহুম থেকে ব্যাপকতার অর্থ সবচেয়ে ভালো যার মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। এখন যদি কোনো ব্যক্তি প্রশ্ন করে যে, যদি আহনাফ لَاتُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ-এর উমূমের ওপরই আমল করে তা সত্ত্বেও ছোট বাকেরা মেয়ের ওপর জবরদস্তী করার আধিপত্য আছে বলার কারণ কি?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, সহীহ্ হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে তাঁর স্বল্প বয়সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে বিবাহ দিয়েছেন। সুতরাং এটা উমূম তথা সাধারণ অবস্থা থেকে পৃথকী।

আহ্লে কিতাব মহিলার সহিত বিবাহ্ জায়েজ হওয়ার যুক্তি ঃ

قَوْلُهُ ؛ اَلْكِتَابِيَاتِ আহলে কিতাব তথা কোন ইহুদি ও খ্রিস্টান মহিলাকে বিবাহ্ করা মুসলমান পুরুষের জন্য এ জন্য বৈধ করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা পুরুষকে বিজয়ী ও নারীকে বিজিতা সাব্যস্ত করেছেন। তাই এই বিবাহের মাধ্যমে যেন একত্ববাদের চিত্রকে ঊর্ধ্বে ও বিজয়ীরূপে চিত্রিত করা হয়েছে এবং শিরক ও কুফরকে হীন ও বিজিত হিসেবে দেখানো হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, একত্ববাদ শিরকের ওপর বিজয়ী। আর প্রকৃতপক্ষেও এমনই হয়ে থাকে। কেননা পুরুষের প্রভাব প্রবল হয়। সুতরাং স্ত্রী ইহুদি হোক বা খ্রিস্টান হোক, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান হয়ে যায়। কিন্তু কখনও এর বিপরীত হতে পারবে না। অর্থাৎ কোনো বাধ্যবাধকতার কারণে মুসলমান মহিলাকে ইহুদি অথবা খ্রিষ্টান পুরুষের সাথে বিবাহ দেওয়া জায়েজ হবে না। কেননা এটা আল্লাহর হেকমতের খেলাফ। কারণ যদি এরূপ বিবাহ জায়েজ হতো, তবে চিত্রটি এমন হতো যে, শিরক ঊর্ধ্বে উঠেছে, আর একত্ববাদ নিম্নমুখী হয়েছে। অথচ আল্লাহর মর্যাদাবোধ তার বিধান ও হেকমত এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আযমত ও শ্রেষ্ঠত্ব এ ধরনের অপমানজনক বিবাহের অনড় প্রতিবন্ধক। কেননা এরূপ বিবাহের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী, আদম সন্তানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দীনকে নীচু ও পরাজিত রূপে দেখাতে হয়। অথচ এটা আল্লাহর অভিপ্রেত নয়। কবির ভাষায় ঃ

یار احمد شو کہ تا غالب شوی * یارمغلوباں مشو تو اے غوی

অর্থাৎ আহ্মাদের বন্ধু হও, তা হলেই তুমি বিজয়ী হবে, বিজিতদের বন্ধু হয়ো না হে ভ্রষ্ট।

<u>একটি সাবধানতা ঃ</u> বর্তমান যুগের ইহুদি খ্রিস্টানরা যদিও আভিধানিক অর্থে আহলে কিতাব; কিন্তু তাদের সাথে মুসলমান পুরুষ-নারীর বিবাহ বৈধ হবে না, কারণ তারা স্বীয় আসমানী গ্রন্থকে বিকৃত করে ফেলেছে এবং স্বীয় ধর্মকে বিকৃত করে ফেলেছে। হাঁ, তারা কেবলমাত্র ইসলাম গ্রহণ করলেই তাদের সাথে বিবাহ বৈধ হতে পারে।

وَإِذَا زَالَتْ بِكَارَتُهَا بِوَثْبَةٍ أَوْحَيْضَةٍ أَوْجِرَاحَةٍ أَوْتَعْنِيْسٍ فَهِيَ حُكْمُ الْاَبْكَارِ وَإِنْ زَالَتْ بِكَارَتُهَا بِالزِّنٰى فَهِيَ كَذٰلِكَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ هِيَ فِيْ حُكْمِ الثَّيِّبِ فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْبِكْرِ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ قَالَتْ بَلْ رَدَدْتُّ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا يُسْتَحْلَفُ فِيْهِ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيْجِ وَالتَّمْلِيْكِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْاِجَارَةِ وَالْاِعَارَةِ وَالْاِبَاحَةِ وَيَجُوْزُ نِكَاحُ الصَّغِيْرِ وَالصَّغِيْرَةِ إِذَا زَوَّجَهُمَا الْوَلِيُّ بِكْرًا كَانَتِ الصَّغِيْرَةُ أَوْثَيِّبًا وَالْوَلِيُّ هُوَ الْعَصَبَةُ فَإِنْ زَوَّجَهُمَا الْاَبُ أَوِ الْجَدُّ فَلَا خِيَارَ لَهُمَا بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَإِنْ زَوَّجَهُمَا غَيْرَ الْاَبِ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَقَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যখন কোনো মেয়ের সতীচ্ছেদ খেলাধুলা অথবা মাসিক স্রাব অথবা বয়সাধিক্যের কারণে দূর হয়ে যায় তখন সে কুমারীর হুকুমে হবে। আর যদি জেনা করা দ্বারা বাকারাত দূর হয়ে যায় তাহলেও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে উক্ত মেয়ে বাকেরার হুকুম হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে উক্ত মহিলা ছাইয়েবার হুকুমে হবে। যখন স্বামী বাকেরা মহিলাকে বলল যে, তোমার কাছে তো বিবাহের সংবাদ পৌঁছেছে এবং তুমি চুপ ছিলে। এতদশ্রবণে উক্ত মহিলা বলল না, আমি তো অস্বীকার করে দিয়েছিলাম, তখন মহিলার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে। এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বিবাহের মধ্যে কসম নেওয়া হবে না, আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) উভয়ে বলেন, কসম নেওয়া হবে। নিকাহ, তাযবীয, তামলীক, হেবাহ ও সদকা শব্দগুলো দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়ে যায়। এজারাহ, এ'আরাহ ও এবাহাত এসব শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। ছোট মেয়ে ও ছোট ছেলের বিবাহ যখন তার অভিভাবক করিয়ে দেয় তখন জায়েজ হবে। মেয়ে বাকেরা হোক বা ছাইয়েবা হোক। আর ওলী হচ্ছে আসাবা। সুতরাং যদি তার পিতা অথবা তার দাদা বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে তার জন্য বালেগ হওয়ার পর এখতিয়ার নেই, আর যদি পিতা ও দাদা ব্যতীত অন্য ব্যক্তি বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে প্রত্যেকের জন্য এখতিয়ার। ইচ্ছে করলে বিবাহ ঠিক রাখবে, আবার ইচ্ছে করলে বাতিলও করে দিতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে সব শব্দাবলী দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয় ঃ

قَوْلُهُ وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَفْظِ الخ ঃ যে সকল শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হয়, তা এই نِكَاحٌ (বিবাহ), تَزْوِيْجٌ (বিবাহ করা), تَمْلِيْكٌ (অধিকারী করা), هِبَه (দান করা), صَدَقَه (সদকা করা), بَيْعٌ (বিক্রয়), شِرَاء (খরিদ) ইত্যাদি। কেননা এ সকল শব্দ স্থায়ী ও বাস্তব অধিকার সৃষ্টির অর্থ বহন করে।

যে সব শব্দাবলী দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ الخ ঃ যে সব শব্দাবলী বিবাহ সংঘটিত হওয়ার জন্য স্থায়ী ও বাস্তব অধিকার সৃষ্টিকারী না, তা দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। যথা– إِجَارَه (ভাড়া করা), إِعَارَه (ধার করা), إِبَاحَتْ (বৈধ সাব্যস্ত করা), وَصِيَّتْ (অবর্তমানের অধিকারী নিয়োগ করা) ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না। অবশ্য ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিবাহ এবং تَزْوِيْج এ দু'শব্দ ব্যতীত অন্য কোনো শব্দ দ্বারা বিবাহ সংঘটিত হবে না।

শফয়ী (র.)-এর এ মতের প্রতিবাদে বলা হয় যে, هِبَه শব্দ দ্বারা বিবাহ্ হওয়া কুরআনে প্রমাণিত আছে। যেমন– আল্লাহর বাণী— وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

এখানে هِبَه শব্দ বিবাহের জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এটার উত্তরে বলা হয়েছে যে, এখানে هِبَه শব্দ দ্বারা বিবাহ সহীহ হওয়া নবী করীম (সা.)-এর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং মহানবী (সা.) ব্যতীত অন্য কারো বিবাহ এই শব্দ তথা هِبَه দ্বারা শুদ্ধ হবে না। هِبَه শব্দ দ্বারা বিবাহ হওয়ার ব্যাপারে আহনাফের অভিমত ঃ প্রকাশ থাকে যে, هِبَه শব্দ দ্বারা নবী করীম (সা.)-এর জন্য বিবাহ কার্যকর হওয়া নিঃসন্দেহে সিদ্ধ। আর এটা রূপক অর্থে সাধিত হবে। তবে রূপক অর্থ নবী করীম (সা.)-এর জন্য নির্দিষ্ট বিবেক সম্মত নয়। কেননা নবী করীম (সা.)-এর বৈশিষ্ট্য আহকাম দ্বারা হবে, শব্দ প্রয়োগ দ্বারা নয়। আর প্রকৃত ও রূপক অর্থ ব্যবহার দ্বারাও হয় না। কেননা এটা সকলের জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

ওলী বা অভিভাবক-এর পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ الْعَصَبَةُ الخ ঃ বিবাহের অধ্যায়ের মধ্যে অভিভাবক ঐ ব্যক্তিই হয় যে ওয়ারিসের অধ্যায়ে সরাসরি আসাবা হয় অর্থাৎ ছেলে, নাতি, পর নাতি, অতঃপর পিতা, দাদা, পরদাদা এরপর ভাই, এরপর চাচা, এরপর দাদার চাচাগণ, এরপর মাওলার আসাবা, এরপর আত্মীয়-স্বজন। হযরত ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট পিতা ব্যতীত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট পিতা ও দাদা ব্যাতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বিবাহের অভিভাবক হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ زَوَّجَهُمَا الخ ঃ এটা হযরত ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট। হযরত কাজি আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট এ এখতিয়ার নেই। তিনি বাপ দাদার ওপর কিয়াস করেন। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, পিতা ও দাদা ব্যতীত কোনো ব্যক্তির মধ্যে অতটুকু মেহেরবানী হয় না যতটুকু বাপ ও দাদার মধ্যে হয়। সুতরাং যদি তাদের আক্দকে লাযেম করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের উদ্দেশ্যাবলী পূরণে ব্যাঘাত ঘটবে।

وَلَا وِلَايَةَ لِعَبْدٍ وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا لِمَجْنُونٍ وَلَا لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ وَقَالَ اَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى يَجُوزُ لِغَيْرِ الْعَصَبَاتِ مِنَ الْاَقَارِبِ التَّزْوِيجُ مِثْلَ الْاُخْتِ وَالْاُمِّ وَالْخَالَةِ وَمَنْ لَاوَلِيَّ لَهَا اِذَا زَوَّجَهَا مَوْلَاهَا الَّذِى اَعْتَقَهَا جَازَ وَاِذَا غَابَ الْوَلِيُّ الْاَقْرَبُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً جَازَ لِمَنْ هُوَ اَبْعَدُ مِنْهُ اَنْ يُّزَوِّجَهَا وَالْغَيْبَةُ الْمُنْقَطِعَةُ اَنْ يَّكُوْنَ فِى بَلَدٍ لَاتَصِلُ اِلَيْهِ الْقَوَافِلُ فِى السَّنَةِ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং গোলাম, ছোট ছেলে, পাগল ও কাফিরের জন্য মুসলমান নারীর ওপর কোনো ওলায়েত নেই। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন, আত্মীয়দের মধ্য থেকে আসাবা ব্যতীত যারা আছে এদেরকে বিবাহ দিয়ে দেওয়া জায়েজ আছে। যথা– বোন, মা ও খালা। আর যে মহিলার কোনো অভিভাবক না থাকে এবং তার বিবাহ এমন মাওলা করিয়ে দিল যে মাওলা তাকে আজাদ করেছে তবে (এ বিবাহ) জায়েজ আছে। আর যখন নিকটতম অভিভাবক غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً-এর সাথে অনুপস্থিত হয়, তখন দূরবর্তী ওলী বা অভিভাবক-এর জন্য তাকে বিবাহ দেওয়া জায়েজ আছে। 'গায়বতে মোনআত্বেআহ' বলা হয় যে, ওলীর এমন শহরে থাকা যেখানে সফরকারী দল বৎসরে মাত্র একবার পৌঁছতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গায়বতে মোনকাত্বেআহ-এর বিবরণ ঃ

قَوْلُهُ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً الخ ঃ যখন নিকটবর্তী অভিভাবক গায়বতে মোনকাত্বেআহ্ বা বিচ্ছিন্নমূলক অনুপস্থিতির সাথে অনুপস্থিত হবে তখন দূরবর্তী অভিভাবক-এর জন্য বিবাহ করিয়ে দেওয়া জায়েজ আছে। এরপর যদি বিবাহের পর নিকটবর্তী অভিভাবক চলে আসে তাহলে দূরবর্তী অভিভাবকের করানো বিবাহ বাতেল হবে না। কেননা সে তার পরিপূর্ণ অভিভাবক হয়েছে। আর গায়বতে মুনকাত্বেআহ অর্থাৎ ছিন্নমূলক অনুপস্থতি বলতে গ্রন্থকার হযরত ইমাম কুদূরী (র.)-এর মতে হচ্ছে যে, সেখানে পুরো বৎসর-এর মধ্যে একবারের চেয়ে বেশি কাফেলা যেয়ে পৌঁছতে সক্ষম হয় না। কিন্তু কানয, যাইলাঈ ইত্যাদি কিতাবসমূহের মধ্যে আছে সে নিকটবর্তী ওলীর শরয়ী মুসাফাত-এর পরিমাণ দূর হওয়াটাই ধর্তব্য আর এটার ওপরই ফতোয়া। হযরত ইমাম যুফার (র.)-এর নিকট দূরবর্তী ওলীর জন্য বিবাহ পড়ানো জায়েজ নয়। আর ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, বাদশাহ তার বিবাহ পড়িয়ে দেবে। আহনাফদের দলিল হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন—

اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ـ (الحديث)

আর ওলি আবআদও তার ওলী। সুতরাং সুলতানের ওলী হওয়া তার ওপর ছাবেত হবে না। আর ইমাম যুফার (র.)-এর ওপর আমাদের দলিল এই যে, অনুপস্থিত ওলী উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত বিবাহকে বিলম্ব করার মধ্যে এবং তার অনুমতির এতেবার করার মধ্যে সগীরার ওপর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটা কি লক্ষণীয় বিষয় নয় যে, সর্বাবস্থায় কুফু পাওয়া সম্ভব নয়। আর যখন ওলী হওয়ার এতেবার করার মধ্যে ক্ষতি হয় তখন ওলী হওয়াটা ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন– ওলী যখন পাগল হয়ে যায় অথবা মারা যায় তখন তার ওলী হওয়া বিলুপ্ত হয়ে যায়। হযরত ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল এই যে, নিকটবর্তী ওলীর আধিপত্য তার অনুপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও বাকি থাকে এই দলিল দ্বারা যে, যদি সে বিবাহ দেয় তাহলে বিবাহ জায়েজ হবে যখন তার ওলী হওয়া জায়েজ আছে, তাহলে অতিশয় দূরবর্তী ওলীর জন্য তার বিবাহ দেওয়া জায়েজ হবে না। যেমন– যখন সে উপস্থিত হয়। উত্তর হচ্ছে এই যে, তার ওলী হওয়া ক্ষতি হয় এ জন্য রহিত হয়ে যাবে ঐ ক্ষতি যেই ক্ষতি তার অপেক্ষা করা দ্বারা হয়। আর যখন নিকটবর্তী ওলী বিবাহ দিল তখন ক্ষতি দূরীভূত হয়ে গেল। সুতরাং তার ওলী হওয়ার ক্ষমতা আবার ফিরে এসেছে।

وَالْكَفَاءَةُ فِى النِّكَاحِ مُعْتَبَرَةٌ فَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ كُفْوءٍ فَلِلْاَوْلِيَاءِ اَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَهُمَا وَالْكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ فِى النَّسَبِ وَالدِّيْنِ وَالْمَالِ وَهُوَ اَنْ يَّكُوْنَ مَالِكًا الْمَهْرِ وَ النَّفَقَةِ وَتُعْتَبَرُ فِى الصَّنَائِعِ وَاِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْاَوْلِيَاءِ الْاِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يَتِمَّ لَهَا مِثْلَهَا اَوْ يُفَرِّقَهَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর বিবাহের মধ্যে সমকক্ষতা (অর্থাৎ বর ও কনে উভয়ের পক্ষ বরাবর ও সমান হওয়া) ধর্তব্য। সুতরাং যখন কোনো মহিলা কুফু ব্যতীত বিবাহ করে তখন অভিভাবকদের জন্য তাদের দু'জনের থেকে বিবাহ ছিন্ন করার অধিকার রয়েছে এবং কুফু হওয়া বংশ, ধর্ম ও মাল-দৌলত এসব দিক দিয়ে ধর্তব্য করা হয়। সুতরাং ধন-সম্পদের মধ্যে কুফু হচ্ছে যে স্বামী, স্ত্রীর মোহর ও খোরপোশ (পরিমাণ অর্থের) মালিক হওয়া এবং পেশা সমূহের মধ্যেও কুফু গ্রহণীয় এবং যখন কোনো মহিলা বিবাহ করে এবং তার মোহরে মিছিল হতে মোহর স্বল্প করে তাহলে অভিভাবকদেরকে তার ওপর আপত্তি উত্থাপন করার অধিকার রয়েছে। (আর এটা) হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মাযহাব (ঐ পর্যন্ত এতেরাজ করার হক আছে) যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তার মোহরে মিছিলকে পূর্ণ করে দেবে অথবা তার থেকে পৃথক হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كُفُوْ-এর গুরুত্ব এবং তার বিধানাবলী ঃ

قَوْلُهُ وَالْكَفَاءَةُ تُعْتَبَرُ الخ ঃ বিবাহের পর্বে কাফাআত অর্থাৎ সমকক্ষতা হওয়ার গ্রহণযোগ্য করা হয়েছে যার এতেবার পুরুষের পক্ষ থেকে হয়। কেননা সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা নীচু মানের পুরুষের বিছানা হতে অপছন্দ করে। পুরুষ এর বিরপীত, কেননা পুরুষ বিছানা অন্বেষণকারীর জন্য বিছানার নীচুমান হওয়াটা লজ্জার কোনো কারণ নয়। এরপর কাফাআত অভিভাবকদের হক মহিলার হক নয়। সুতরাং যদি কোনো মহিলা কুফু ব্যতীত বিবাহ করে তাহলে অভিভাবকগণ এ বিবাহকে পৃথক করতে পারবে। গ্রন্থকার ইমাম কুদূরী (র.) চার জিনিসের মধ্যে কাফআতের আলোচনা করেছেন, (১) বংশ। কেননা মানুষ বংশের ওপর গর্ব করে থাকে। কাজেই কুরাইশ বংশ একে অপরের কুফূ হবে, চাই তারা হাশেমী হোক কিংবা নওফালী কিংবা আদউঈ। আর কুরাইশ ব্যতীত অবশিষ্ট আরবগণ একে অপরের কুফূ হবে। কিন্তু তবে আজমী অর্থাৎ অনারবি লোক আরবি লোকদের কুফূ নয়। (২) দীন ধর্ম। কেননা দীনদারি এটা সবচেয়ে গর্বের বস্তু। নেককার মহিলা ফাসেক, ফাজের পুরুষের মধ্যে কাফাআত হবে না; এটাই বিশুদ্ধ অভিমত বলে গণ্য। হযরত ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তার কোনো ধর্তব্য নেই। কেননা এটা পরকালের কর্মের সাথে সম্পর্ক রাখে। হ্যাঁ, তখনই ধর্তব্য হবে যখন স্বামী এ পর্যায়ের হয় যে, ছোট ছোট ছেলে তার সাথে পথে ঘাটে দুষ্টামী করে, হাততালি বাজায় এবং মদ, শরাব পানে আসক্ত হয়। (৩) ধন, দৌলত, অর্থাৎ স্বামী রীতি নীতি অনুযায়ী মুহরে মুআজ্জাল ও তার খোরপোশের ওপর সামর্থ্য হওয়া। (৪) "সানায়ে" অর্থাৎ চাকরি পেশা এগুলোর মধ্যেও বরাবর হতে হবে। কেননা মানুষ উচ্চ চাকরির ওপরও গর্ব করে থাকে। সুতরাং মেথর ব্যক্তি স্বর্ণ ব্যবসাকারীর, কসাই ব্যক্তি বস্ত্র ব্যবসায়ীর এবং তৈল বিক্রেতা আতর সুগন্ধি ব্যবসায়ীর কুফূ হবে না। কেননা এদের একজনের পেশা অপর ব্যক্তির চেয়ে উর্দ্ধের বরাবর নয়। জাহেরী রেওয়ায়তেও এ রকমই রয়েছে। কিন্তু হযরত ইমাম শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী (র.) হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর বর্ণনার ওপর ফতোয়া দিয়েছেন যে, চাকরি, পেশা যদি মুতাকারেব হয়

তাহলে সামান্যতম পরিবর্তনের কোনো ধর্তব্য নেই। কিছুসংখ্যক আলেম আজাদ হওয়া ও মুসলমান হওয়ার মধ্যে কুফু সম্পর্কে আলোচনা করেছেন অর্থাৎ এ দু'টোরও ধর্তব্য করা হবে। হযরত হামউঈ (র.) এ সবগুলোকে দু'টি কবিতার দ্বারা খুব সুন্দর করে ব্যক্ত করেছেন এবং বলেছেন—

(১) إِنَّ الْكَفَاءَةَ النِّكَاحِ تَكُونُ فِى * سِتٍّ لَهَا بَيْتٍ بَدِيعٍ قَدْ ضَبَطْ

(২) نَسَبٌ وَإِسْلَامٌ كَذٰلِكَ حِرْفَةٌ * حُرِيَّةٌ وَدِيَانَةٌ مَالٌ فَقَطْ

অর্থাৎ বিবাহে ছয় জিনিসের মধ্যে কাফাআত হয়ে থাকে। আর এগুলোর জন্য একটি চমৎকার কবিতা রয়েছে এবং সবগুলো সমন্বয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। যথা— (১) বংশ, (২) ইসলাম, এমনিভাবে, (৩) পেশা, (৪) আজাদ হওয়া, (৫) দীনাদারি এবং (৬) ধন -সম্পদ।

كُفُوْ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ كُفُوْ শব্দের আভিধানিক অর্থ অনুরূপ বা সমতুল্য। বিবাহের ব্যাপারে বর ও কনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সমতাকে كُفُوْ বলা হয়।

যুক্তির আলোকে মোহর ঃ বিবাহে এ কথা নির্দিষ্ট হয়েছে যে, মোহর নির্ধারণ করতে হবে। যাতে স্বামী এই বন্ধন ও সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সম্পদের ক্ষতি হওয়ার ভয়ে আশঙ্কাগ্রস্থ থাকে এবং একান্ত অনিবার্য কারণ ব্যতীত এই সম্পর্ক ছিন্ন করার দুঃসাহস না করে। অতএব মোহর নির্ধারিত হওয়ার মধ্যে এক প্রকারের স্থায়িত্বের নিশ্চয়তা রয়েছে।

লজ্জাস্থানের বদলে যে সম্পদ নির্ধারিত হয়ে থাকে, তা ব্যতীত বিবাহের মর্যাদা প্রকাশ পায় না। কেননা সম্পদের প্রতি মানুষের যে লোভ থাকে আর কোনো জিনিসের প্রতি এত লোভ থাকে না।

মোহরের কারণে বিবাহ ও ব্যভিচারের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسَافِحِيْنَ .

অর্থাৎ তোমরা তাদেরকে স্বীয় অর্থের বিনিময়ে গ্রহণ করবে বিবাহে আবদ্ধ করার জন্য, ব্যভিচারের জন্য নয়।

এ সকল কারণেই হুযূর (সা.) পূর্ববর্তী কালের মোহর ওয়াজিব হওয়ার বিধানটিকে যথাযথ অবশিষ্ট রেখেছেন।

وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ اِبْنَتَهُ الصَّغِيْرَةَ وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ اِبْنَهُ الصَّغِيْرَ وَ زَادَ فِيْ مَهْرِ اِمْرَأَتِهِ جَازَ ذٰلِكَ عَلَيْهِمَا وَلَايَجُوْزُ ذٰلِكَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ إِذَا سَمّٰى فِيْهِ مَهْرًا وَيَصِحُّ النِّكَاحُ وَإِنْ لَّمْ يُسَمِّ فِيْهِ مَهْرًا وَاَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ سَمّٰى اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَهَا عَشَرَةٌ وَمَنْ سَمّٰى مَهْرًا عَشَرَةً فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ الْمُسَمّٰى اِنْ دَخَلَ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمّٰى وَإِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا اَوْتَزَوَّجَهَا عَلٰى اَنْ لَّامَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا اِنْ دَخَلَ بِهَا اَوْمَاتَ عَنْهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَهِيَ ثَلٰثَةُ اَثْوَابٍ مِنْ كِسْوَةِ مِثْلِهَا وَهِيَ دِرْعٌ وَخِمَارٌ وَمِلْحَفَةٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যখন পিতা তার ছোট মেয়েকে বিবাহ দেয় আর ছেলে স্ত্রীর মোহরে মিছিল থেকে কম করে দিল। অথবা পিতা তার ছোট ছেলেকে বিবাহ দিল এবং ছেলে তার স্ত্রীর মোহর বৃদ্ধি করে দিল তাহলে উভয় সুরতে এটা তাদের দু'জনের মধ্যে জায়েজ আছে। আর পিতা ও দাদা ছাড়া এটা অন্য কারো জন্য জায়েজ হবে না। এবং বিবাহে মোহর নির্ধারণ করলেও বিবাহ হয়ে যাবে, আর মোহর ধার্য না করলেও বিবাহ সহীহ হবে। এবং মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। যদি মোহর দশ দিরহাম থেকে কম নির্ধারণ করে তাহলে মহিলা দশ দিরহামই পাবে। আর যদি দশ অথবা তার চেয়ে অধিক নির্ধারণ করে তাহলে নির্দিষ্ট মোহর পাবে যদি তার সাথে সঙ্গম করে থাকে অথবা মারা যায়। সুতরাং যদি তাকে সঙ্গম করার পূর্বে অথবা নির্জনবাসের পূর্বেই তালাক দিয়ে দেয় তাহলে মহিলা নির্দিষ্ট মোহরের অর্ধাংশ পাবে। আর যদি মহিলাকে শাদী করল এবং মোহর নির্দিষ্ট করল না, অথবা এ শর্তের ওপর শাদী করল যে, তার জন্য মোহর দেওয়া হবে না তাহলে উক্ত মহিলা মোহরে মিছিল পাবে যদি তার সাথে সঙ্গম করে থাকে অথবা মারা যায়। আর যদি সঙ্গম অথবা নির্জনবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে সে মুত'আহ্ পাবে, আর মুত'আহ্ হচ্ছে তিন কাপড় তার পোশাকের ন্যায়, আর সেগুলো হচ্ছে জামা, ওড়না ও চাদর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মোহরের সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهُ مَهْرِ مِثْلِهَا الخ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গ উপভোগ করার বিনিময়ে স্বামীর পক্ষ হতে বিবাহের স্ত্রী যে সম্পদ প্রাপ্ত হয় অথবা সম্পদ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি লাভ করে তাকেই মোহর বলে। আমাদের হানাফীগণের মতে মোহর সম্পদ কিংবা সম্পদের হুকুম বৈশিষ্ট্য কিছু হওয়া আবশ্যক। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মূল্য বিশিষ্ট যে কোনো বস্তুই মোহর হওয়ার যোগ্যতা রাখে। চাই তা দশ দিরহামের সমতুল্য মূল্য হোক, কিংবা তার চেয়ে কমবেশি হোকনা কেন।

মোহরে মিছিল-এর সংজ্ঞা ঃ মোহরে মিছিল বলতে এমন মেয়ে লোকের মোহরকে বুঝানো হয়েছে যে তার অনুরূপ এবং সেই অনুরূপ মহিলাটি স্ত্রীর পিতার বংশীয় হতে হবে। আর নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে তুল্যতা বিবেচিত হবে। (ক) বয়স অর্থাৎ প্রচলিতভাবে যেই বয়স গৃহীত। (খ) রূপ, সুতরাং পিতৃবংশীয় ঐ মহিলা সমতুল্য হবে যে রূপে ও রঙে তার সমকক্ষ। (গ) সম্পদ। (ঘ) শিক্ষা-দীক্ষা, আদব-কায়দা, সভ্যতা-ভদ্রতা, সৎ ও অসৎ ইত্যাদি। (ঙ) ধার্মিকতা, সুতরাং ধর্মের দিক থেকেও পিতৃবংশীয় মহিলার অনুরূপ মোহরে মিছিলের জন্য গৃহীত (চ) স্থান ও কাল এবং (ছ) কুমারিত্ব।

মোহর সম্পদ ছাড়া অন্য কিছু হওয়া সম্পর্কে মতভেদ ঃ হানাফীদের মতে মোহর সম্পদ অথবা এমন বস্তু হওয়া জরুরি, যা সম্পদ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মোহর মাল হওয়া জরুরি নয়, বরং কুরআন মাজীদ পড়িয়ে দেওয়া; অনুরূপ বস্তুও মোহর হতে পারে। ইমাম শাবী (র.) দলিল হিসাবে ঐ হাদীসগুলো উল্লেখ করেন যা বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে। নবী করীম (সা.) কুরআন শরীফ শিক্ষা দেওয়াকে মোহর হিসাবে নির্ধারণ করেছেন। আর আমাদের হানাফীদের দলিল আল্লাহর বাণী– وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ

আল্লাহ বিবাহ বন্ধনকে মালের সাথে সংযুক্ত করেছেন– بِاَمْوَالِكُمْ -এর بَاء বর্ণটি اِلْصَاقْ -এর জন্য, এটা দ্বারা বুঝা গেল যে, মালবিহীন বিবাহবন্ধন শুদ্ধ হবে না।

মোহরের নিম্নতম পরিমাণ ঃ

قَوْلُهُ وَاَقَلُّ الْمَهْرِ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলায় আমাদের দলিল হচ্ছে– হুযূর (সা.) বলেছেন, لَامَهْرَ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ অর্থাৎ দশ দিরহামের কমে মোহর হয় না– كَمَا رَوَاهُ الدَّارُ قُطْنِي وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ جَابِرٍ (رض)

আর হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে, দশ দিরহামের কম চুরি হলে হাত কাটা যাবে না এবং দশ দিরহামের কম মোহর হতে পারে না। এ বিষয়বস্তুর পক্ষে আরো অনেক হাদীস রয়েছে যা সনদের দিকে দুর্বল হলেও রেওয়ায়ত অনেক হওয়ায় উহারা حَسَنْ -এর পর্যায়ে পৌঁছে দলিলযোগ্য হয়েছে।

خَلْوَةْ কাকে বলে? ঃ

قَوْلُهُ وَالْخَلْوَةُ الخ ঃ স্বামী স্ত্রী উভয়ই এমন স্থানে একত্রিত হবে যেখানে তাদের সাথে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি থাকবে না। আর তারা এমন স্থানে থাকবে যেখানে তাদের অনুমতি ব্যতীত কেউই সেখানে পৌঁছতে পারবে না। অথবা অন্ধকারের কারণে কেউই তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারে না। আর স্বামী বুঝতে হবে যে, এই রমণী তার স্ত্রী, এটাকেই ফিকাহ শাস্ত্রের পরিভাষায় خَلْوَةْ বা خَلْوَةِ صَحِيْحَة (একান্ত নির্জনবাস) বলা হয়।

وَاِنْ تَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ عَلٰى خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَاِنْ تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلٰى تَسْمِيَةِ مَهْرٍ فَهُوَ لَهَا اِنْ دَخَلَ بِهَا اَوْ مَاتَ عَنْهَا وَاِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ وَاِنْ زَادَ فِى الْمَهْرِ بَعْدَ الْعَقْدِ لَزِمَتْهُ الزِّيَادَةُ اِنْ دَخَلَ بِهَا اَوْمَاتَ عَنْهَا وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فَاِنْ حَطَّتْ مِنْ مَهْرِهَا صَحَّ الْحَطُّ وَاِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِاِمْرَأَتِهٖ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطْئِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ مَهْرِهَا وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا مَرِيْضًا اَوْ صَائِمًا فِىْ رَمَضَانَ اَوْ مُحْرِمًا بِحَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ اَوْكَانَتْ حَائِضًا فَلَيْسَتْ بِخَلْوَةٍ صَحِيْحَةٍ وَلَوْطَلَّقَهَا فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ وَاِذَا خَلَا الْمَجْبُوْبُ بِاِمْرَأَتِهٖ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَتَسْتَحِبُّ الْمُتْعَةُ لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ اِلَّا مُطَلَّقَةً وَاحِدَةً وَهِىَ الَّتِىْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি মুসলমান ব্যক্তি মহিলাকে কোনো শরাব অথবা শূকরের বিনিময়ে (অর্থাৎ এগুলোর পরিবর্তে) বিবাহ করে তাহলে এ বিবাহ জায়েজ হবে এবং মহিলাকে মোহরে মিছিল আদায় করে দেবে। আর যদি পুরুষ মহিলাকে বিবাহ করল মোহর ধার্য করা ব্যতীত, এরপর তারা উভয়েই মোহরের কোনো এক নির্ধারণ এর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল (পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক যে কোনো পরিমাণ ধার্য করল এবং এতে দু'জন রাজিও আছে) তাহলে তার জন্য ঐ মোহরই মিলবে যা ধার্য করা হয়েছে, এটা হবে যদি স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গম করে অথবা স্বামী তাকে রেখে মৃত্যুবরণ করল তাহলে। আর স্বামী যদি সঙ্গম ও নির্জনবাসের আগেই স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তাকে মুত'আহ্ দিতে হবে। আর যদি বিবাহের আক্বদের পর স্বামী মোহরের (পরিমাণ) বৃদ্ধি করে দেয় তবে বৃদ্ধিকৃত মোহর স্বামীর ওপর কর্তব্য যদি তার সাথে সঙ্গম করে, অথবা স্ত্রীকে রেখে স্বামী যদি মারা যায়। আর যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করার পূর্ব মুহূর্তে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে বর্ধিত মোহর তাকে দিতে হবে না। আর যদি স্ত্রী তার স্বামী থেকে তার মোহর কমিয়ে দেয় তাহলে এই কমিয়ে দেওয়াটা সহীহ্ হবে। আর যদি স্বামী তার স্ত্রী নির্জনবাস করে এবং তথায় যৌন সম্ভোগের কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে, অতঃপর সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল তাহলে স্বামীকে তার স্ত্রীর পূর্ণ মোহর আদায় করতে হবে (অর্থাৎ স্ত্রী তার পূর্ণ মোহর পাবে)। আর যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে কোনো একজন রোগাক্রান্ত, অথবা রমজানে রোজা অবস্থায় ছিল অথবা হজ অথবা ওমরার এহ্রাম অবস্থায় ছিল অথবা স্ত্রী হায়েয অবস্থায় ছিল তাহলে এ খোলওয়াত সহীহ হবে না, আর যদি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে স্বামীর ওপর মোহরের অর্ধাংশ দেওয়া ওয়াজিব হবে। আর যখন লিঙ্গ কর্তনকৃত ব্যক্তি তার স্ত্রীর সঙ্গে নির্জনবাস করল এরপর তাকে তালাক দিয়ে দিল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে। আর প্রত্যেক তালাকপ্রাপ্তর জন্য মুত্'আহ মোস্তাহাব, কিন্তু এক জাতীয় তালাকপ্রাপ্ত ব্যতীত সে হচ্ছে ঐ মহিলা যাকে সঙ্গম করার পূর্বে তালাক দিল এবং তার জন্য মোহর নির্ধারণ করেনি। (এ জাতীয় মহিলার জন্য মুত্'আহ নেই)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَهَا الْمُتْعَةُ الخ ঃ متعه (মুত্'আহ্) বলতে তিনটি কাপড়কে বুঝায় ঃ (১) জামা, (২) ওড়না, (৩) চাদর, মুত'আহ স্বামীর অবস্থার বিবেচনায় হবে। অবশ্য ইমাম কারখীর মতে মুত'আহ স্ত্রীর অবস্থার বিবেচনায় নিরূপণ করা হবে। এটা স্ত্রীকে এ জন্য দেওয়া হয় যাতে এই মহিলার কিছু উপকার হয় এবং সে আনন্দ পায়।

وَتُسْتَحَبُّ الْمُتْعَةُ الخ-এর আলোচনা ঃ মুত'আহ্ প্রাপ্তির বিবেচনায় তালাকপ্রাপ্ত মহিলাগণ চার প্রকার ঃ (১) مُفَوَّضَه তথা মোহর বিনে যে মহিলার বিবাহ্ হয়েছে এর সঙ্গম বা নির্জনবাসের পূর্বেই তাকে তালাক দেওয়া হয়েছে। তাকে মুত'আহ্ প্রদান করা ওয়াজিব। (২) مُطَلَّقه موطُوْئه তথা সঙ্গমকৃতা তালাকপ্রাপ্ত এমন স্ত্রী যার মোহর নির্দিষ্ট আছে। (৩) সঙ্গমকৃতা তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যার মোহর নির্দিষ্ট নেই। এই দু'শ্রেণীর স্ত্রীলোকের জন্য মুত'আহ্ মোস্তাহাব। (৪) مُطَلَّقَه غَيْر مَوْطُوْئَه তথা এমন তালাকপ্রাপ্ত যার সাথে সহবাস করা হয়নি এবং তার মোহর নির্দিষ্ট। এমন মহিলার জন্য মুত'আহ্ প্রদান করা ওয়াজিবও নয় এবং মোস্তাহাবও নয়। মাবসূত, সারাখসী এবং মুহীতে অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তবে কুদূরী কিতাবের গ্রন্থকার এবং তুহ্ফাতুল ফুকাহার লেখকের মতে চতুর্থ প্রকারের তালাকপ্রাপ্তর জন্য মুত'আহ্ প্রদান করা মোস্তাহাব।

خَلْوَة صَحِيْحَة-এর অর্থ ঃ خَلْوَة صَحِيْحَة অর্থাৎ একান্ত নির্জনবাস।

خَلْوَة مَجْبُوْب-এর অর্থ ঃ খালওয়াতুল মাজবূব ঐ লোকের خَلْوَت-কে বলে, যার পুরুষাঙ্গ এবং অণ্ডকোষ কাটা, কেউ কেউ বলেন, মাজবূবের বেলায় অণ্ডকোষ কর্তন করা শর্ত নয়।

خَلْوَة عِنِّيْن-এর অর্থ ঃ خَلْوَة مَجْبُوْب-এর অর্থ বুঝার পর خَلْوَة عِنِّيْن-এর অর্থ বুঝে নেওয়া চাই। কারণ সামনে এ সম্পর্কে আলোচনা আসবে। খালওয়াতে ইন্নীন অর্থাৎ পুরুষাঙ্গহীন ঐ লোকের خَلْوَة কে বলা হয়– বার্ধক্যের কারণে অথবা অসুস্থতার কারণে যে শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

خَصِى-এর অর্থ ঃ প্রসঙ্গক্রমে এখানে خَصِى-এর অর্থ জেনে নেওয়া চাই। خَصِى (খাসী) ঐ লোককে বলা হয় যে পুরুষাঙ্গ অক্ষত থাকা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক কারণে শক্তিহীন হয়।

وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ اِبْنَتَهُ لِيَكُونَ أَحَدُ الْعَقْدَيْنِ عِوَضًا عَنِ الْآخَرِ فَالْعَقْدَانِ جَائِزَانِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَ حُرٌّ اِمْرَأَةً عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ جَازَ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَ عَبْدٌ اِمْرَأَةً حُرَّةً بِإِذْنِ مَوْلَاهُ عَلَى خِدْمَتِهِ سَنَةً جَازَ وَلَهَا خِدْمَتُهُ وَإِذَا اجْتَمَعَ فِي الْمَجْنُونَةِ أَبُوهَا وَابْنُهَا فَالْوَلِيُّ فِي نِكَاحِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى أَبُوهَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি কোনো ব্যক্তি তার মেয়েকে বিবাহ দিল এই শর্তের ওপর সে যে তার বোনকেও বিবাহ করবে অথবা তার মেয়েকে যাতে চুক্তিদ্বয় একটি অপরটির বিনিময় হয় তবে উভয় আকদই জায়েজ এবং তাদের প্রত্যেকের জন্যই মোহরে মিছিল হবে। আর যদি কোনো আজাদ ব্যক্তি কোনো মহিলাকে তার এক বছর খেদমত করার ওপর অথবা তাকে কুরআন শিক্ষা দেবে এটার ওপর বিবাহ করল তাহলে স্ত্রী মোহরে মিছিল পাবে। আর যদি কোনো গোলাম পুরুষ তার মাওলার অনুমতিক্রমে আজাদ মহিলাকে এক বছর খেদমত করবে এ শর্তের ওপর বিবাহ করল তাহলে জায়েজ হবে এবং মহিলা অত্র স্বামী থেকে খেদমত নেওয়ার হক থাকবে। আর পাগলিনীর ক্ষেত্রে তার পিতা ও পুত্র একত্রে বিদ্যমান থাকলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে তার বিবাহের অভিভাবক ছেলে হবে, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে তার পিতা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

نِكَاحِ شِغَارْ -এর সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ اِبْنَتَهُ الخ ঃ এ মাসআলায় আলোচ্য বিবাহকে نِكَاحِ شِغَارْ বা বদলী বিবাহ বলে। যার অর্থ খালী হওয়া অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি নিজের কন্যা বা বোনকে অন্য পুরুষের নিকট এ শর্তে বিবাহ দেয় যে, ঐ ব্যক্তি তার মেয়ে বা বোনকে তার নিকট বিবাহ দেবে এবং এই বিনিময়ই বিবাহের মোহর হবে।

نِكَاحِ شِغَارْ সম্পর্কে মতভেদ ঃ আমাদের হানাফীদের মতে এই বিবাহ বন্ধনের হুকুম এই যে, বিবাহ শুদ্ধ হবে এবং তাস্‌মিয়াহ ফাসেদ হবে। মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, এই বিবাহ বন্ধন সম্পূর্ণ বাতিল। দলিল হচ্ছে– বুখারী শরীফের মধ্যে হযরত ইবনে ওমর (রা.) হতে বর্ণিত আছে– নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিগার করতে নিষেধ করেছেন এবং এটাও বলেছেন لَاشِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ ইসলামের শিগারের কোনো স্থান নেই।

আমরা হানাফীদের পক্ষ হতে প্রথম হাদীসের উত্তরে বলি যে, হুযূর (সা.) যা নিষেধ করেছেন তা হলো উল্লিখিত বিবাহের মধ্যকার মোহরহীনতা ও নারীর গুপ্তাঙ্গকে মোহর স্থির করা। আমরাও শিগার বাতিল বলে থাকি। কিন্তু এতে বিবাহ বহাল থাকবে, তবে যা মোহর হওয়ার যোগ্য নয় তা মোহর নির্ধারণের কারণে মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে। যেমন– মদ ও শূকরের বিনিময় বিবাহ দিলে মোহরে মিছিল ওয়াজিব।

وَلَايَجُوزُ نِكَاحُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ اِلَّا بِاِذْنِ مَوْلَاهُمَا وَاِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِاِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْمَهْرُ دَيْنٌ فِي رَقَبَتِهٖ يُبَاعُ فِيْهِ وَاِذَا زَوَّجَ الْمَوْلٰى اَمَتَهٗ فَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُّبَوِّئَهَا بَيْتًا لِلزَّوْجِ وَلٰكِنَّهَا تَخْدِمُ الْمَوْلٰى وَيُقَالُ لِلزَّوْجِ مَتٰى ظَفِرْتَ بِهَا وَطِئْتَهَا وَاِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً عَلٰى اَلْفِ دِرْهَمٍ عَلٰى اَنْ لَّايُخْرِجَهَا مِنَ الْبَلَدِ اَوْ عَلٰى اَنْ لَّايَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا اِمْرَأَةً فَاِنْ وَفٰى بِالشَّرْطِ فَلَهَا الْمُسَمّٰى وَاِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا اَوْ اَخْرَجَهَا مِنَ الْبَلَدِ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَاِنْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى حَيَوَانٍ غَيْرَ مَوْصُوْفٍ صَحَّتِ التَّسْمِيَةُ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ اِنْ شَاءَ اَعْطَاهَا ذٰلِكَ وَاِنْ شَاءَ اَعْطَاهَا قِيْمَتَهٗ وَلَوْ تَزَوَّجَهَا عَلٰى ثَوْبٍ غَيْرَ مَوْصُوْفٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَالْمُوَقَّتِ بَاطِلٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং গোলাম ও বাঁদির বিবাহ তাদের মাওলার অনুমতি ব্যতীত জায়েজ হবে না। আর যখন গোলাম তার মাওলার অনুমতি নিয়ে বিবাহ করে, তাহলে মোহর তার ওপর ঋণ হবে যার পরিশোধ কল্পে তাকে বিক্রি করে দেওয়া হবে। আর যদি মাওলা তার বাঁদিকে বিবাহ দিয়ে দেয় তাহলে মাওলার জন্য তার স্বামীর রাত্রি যাপনের জন্য প্রস্তুত করা দেওয়া আবশ্যক নয় বাঁদি তার মাওলার খেদমত করতে থাকবে এবং স্বামীকে বলা হবে যে যখন তোমার সুযোগ মিলে তখন সঙ্গম করে নেবে। আর যদি কোনো মহিলা এক হাজার টাকার ওপর এ শর্তে বিবাহ করল যে তাকে শহর থেকে বের করে নেবে না। অথবা সে থাকা অবস্থায় অন্য কোনো মহিলাকে বিবাহ না করে, সুতরাং স্বামী যদি শর্তপূর্ণ করে তবে স্ত্রী নির্ধারিত মোহর পাবে। আর যদি কোনো মহিলাকে বিবাহ করল অথবা তাকে শহর থেকে বাহিরে নিয়ে গেল তাহলে স্ত্রী মোহরে মিছিল পাবে। আর যদি গুণাগুণ বর্ণনা ব্যতীত কোনো পশুকে মোহর ধার্য করে বিবাহ করল, তাহলে এটা নির্দিষ্ট করা বৈধ। অতএব স্ত্রী মধ্যম ধরনের পশু পাবে আর স্বামীর জন্য এখতিয়ার আছে যদি চায় সেই পশু ও দিতে পারবে আর যদি চায় তার মূল্যও দিতে পারবে। আর যদি কোনো গুণাগুণ বর্ণিত হয়নি এমন কাপড়ের ওপর মহিলাকে বিবাহ করল তাহলে মহিলা মোহরে মিছিল পাবে। এবং নিকাহে মুত্‌'আহ্ ও নিকাহে মুওয়াক্কাত বাতিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُتْعَه বিবাহের বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَنِكَاحُ الْمُتْعَةِ الخ ঃ مُتْعَة বিবাহ জায়েজ নেই, যদিও এটা ইসলামের প্রথম দিকে জায়েজ ছিল। কিন্তু পরে এটা নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর পুনঃ অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তারপর আবার নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে। যেমন- বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম (সা.) খায়বারের যুদ্ধে মহিলাদের সাথে মুতা বিবাহ করতে এবং পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করে দিয়েছেন। খায়বারের যুদ্ধ সপ্তম হিজরিতে সংঘটিত হয়েছে

ইমাম মুসলিম হযরত সাবুরা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) আমাদেরকে মুতার অনুমতি দিয়েছেন। আর মক্কা বিজয়ের তারিখে তা নিষেধ করে দিয়েছেন। এটা ৮ম হিজরির ঘটনা। হযরত সাবুরা এক রেওয়ায়ত এরূপও বর্ণনা করেছেন যে, আমরা নবী করীম (সা.)-এর সাথে জিহাদ করেছি। আমরা মক্কা বিজয়ের বৎসর যখন মক্কায় প্রবেশ করলাম তখন নবী করীম (সা.) মুতার অনুমতি দিলেন এবং নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন যে, হে লোকজন! আমি তোমাদেরকে মহিলাদের সাথে মুতা' করার অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং যার নিকট এই ধরনের কোনো মহিলা আছে সে যেন তাকে পৃথক করে দেয়। আর তোমরা তাকে মুত'আর ভিত্তিতে যা কিছু দিয়েছ তা হতে কিছুও ফেরত নেবে না। মুসলিম শরীফে অন্য এক রেওয়ায়তে আছে যে, তিনি আওতাস যুদ্ধের বছর তিন দিনের জন্য মুতার অনুমতি দিয়েছেন। তারপর তিনি তা নিষেধ করে দিয়েছেন। আওতাসের যুদ্ধ এবং মক্কা বিজয় একই বছর হয়েছে। তা ছাড়া মুতা বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে অনেক হাদীস বিদ্যমান আছে।

مُتْعَة ও مُوَقَّت বিবাহের মধ্যকার পার্থক্য ঃ

قَوْلُهُ وَالْمُوَقَّتِ بَاطِلٌ الخ ঃ শায়খুল ইসলাম (র.) মুতা এবং মোয়াক্কাতের মধ্যে এই পার্থক্য বর্ণনা করেছেন যে, মোয়াক্কাতের মধ্যে نِكَاح এবং تَزْوِيج -এর সাথে সময়ের উল্লেখ থাকে, আর মুতার মধ্যে نِكَاح শব্দের পরিবর্তে اِسْتِمْتَاع বা اَتَمَتَّعُ শব্দের উল্লেখ থাকে, তা ছাড়া মুতার মধ্যে সাক্ষী এবং সময়ের নির্ধারণ থাকে না এবং মোয়াক্কাতের মধ্যে সাক্ষী হয়ে থাকে এবং সময়েরও নির্ধারণ হয়ে থাকে।

যুক্তির আলোকে مُتْعَة বিবাহ হারাম হওয়ার রহস্য ঃ

(ক) নিকাহে মুত্'আর প্রথা হলে বংশ ধারা সংমিশ্রিত হয়ে ক্রমে উহার বিলুপ্তি ও ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। কেননা মুত'আর সময়কাল অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রী নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত হয়ে যায় এবং সে তখন নিজের এখতিয়ারে চলে। তাই সে যখন গর্ভবতী হবে তখন কি করবে জানা নাই। মূলত ইদ্দতের ব্যাপারটি সহীহ বিবাহ, যা সর্বদার জন্য হয়ে থাকে সেখানেই একটি জটিল ও দুরূহ বিষয় হয়ে দেখা দেয়। অতএব, মুতআর ইদ্দতের বিষয়টি যে আরো কঠিন ও দুর্বোধ্য হবে, যা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না।

(খ) মুত'আর মধ্যে এই অনিষ্টও রয়েছে যে, এই কুপ্রথার প্রচলন ঘটলে শরিয়ত সম্মানিত বিবাহকে অকার্যকর করে দেওয়া হয়। কেননা সাধারণত অধিকাংশ বিবাহকারীর অভিলাষ হয় যৌন চাহিদা পূরণ করা।

(গ) শুধু যৌন মিলনের জন্য পারিশ্রমিক প্রদান একটি অশ্লীল ব্যাপার। এতে মানুষ মানবীয় স্বভাব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কোনো সুস্থ মানবাত্মাই তা পছন্দ করে না। এই বিশ্রী অনিষ্ট সত্ত্বেও প্রাথমিক যুগে অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে সীমাহীন যৌন রোগে এবং বিবাহে অসামর্থ্যের কারণে উহার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। যেমন, জীবনের চরম সংকট মুহূর্তে মৃত জানোয়ারের গোশ্ত ভক্ষণের অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে। অতঃপর এই অনিষ্টসমূহের কারণে সর্বকালের জন্য তা রহিত হয়ে যায়।

হাদীসের আলোকে মুত্'আহ বিবাহ্ হারাম হওয়ার প্রমাণ ঃ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُنِيْرِ حَدَّثَنَا اَبِيْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَ اَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَااَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ كُنْتُ اَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ ذٰلِكَ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهَا وَلَاتَاْخُذُوْا مِمَّا اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا -

অর্থাৎ হযরত (সা.) এরশাদ করেন, হে লোক সকল! আমি তোমাদেরকে নিকাহে মুত্'আর অনুমতি দিয়েছিলাম। এখন আল্লাহ তা'আলা উহা কেয়ামত পর্যন্ত হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার নিকট মুত্'আহ্ বিবাহ সূত্রে কোনো মহিলা রয়েছে, তাকে ছেড়ে দাও। তোমরা তাদেরকে যা কিছু দিয়েছ তা ফেরত নিও না।

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِيْ اَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيَّ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَاَخُوْهُ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُوْمِ الْحُمُرِ الْاَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ -

অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) ইবনে আব্বাস (রা.)-কে বললেন, নবী করীম (সা.) খায়বারে অবস্থানকালে মুত'আহ্ ও পালিত গাধার গোশত্ খাওয়া নিষেধ করেছেন।

মুত'আহ্ বিবাহ হারাম হওয়ার ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রমাণ ঃ যে কোনো অসুস্থ বিবেকসম্পন্ন ভদ্র ও সভ্য জাতির নেতৃবর্গ নিজের বিবেকের আদালতে প্রশ্ন করে দেখুন, মুত'আহ্ যদি শরিয়তে বৈধ হয়; বরং ছওয়াবের কাজ হয়, তবে বিবাহ ও মুত্'আর মধ্যে এই পার্থক্য হবে কেন যে, নিজের কন্যা ও বোনকে বিবাহের প্রতি সম্পৃক্ত করা হলে কোনো লজ্জা অনুভূত হয় না; কিন্তু উচ্চস্তরের কোনো বড় ধরনের মজলিসে কোনো শরীফ ব্যক্তি কি এটা বলতে পারবেন যে, আমাদের মাতা, কন্যা ও বোনেরা এতগুলো মুত্আহ্ বিবাহ করেছেন। মনস্তাত্ত্বিকভাবে এটা একটি লা-জওয়াব দলিল। নিশ্চিতরূপেই একথা বলা যায় যে, বিবাহ-শাদীতে মানুষ যেভাবে মুবারকবাদ গ্রহণ করে, এমনভাবে কেউ নিজের নিকট আত্মীয় মহিলাদের মুত্'আহ্ সম্পর্কে মুবারকবাদ বরদাশ্ত করতে পারবে না। এগুলো হলো যৌক্তিক দলিল। পূর্বে শরয়ী দলিল বয়ান করা হয়েছে। এখানে আরও একটি শরয়ী দলিল পেশ করা হয়েছে ঃ

অর্থাৎ "হযরত আলী মুর্তাজা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) মহিলাদের সাথে মুত্'আহ্ বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন।" ইমাম তিরমিযী (র.) ও অন্যান্য হাদীসবিদগণ এ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। মুত্'আহ্ হারাম হওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ঐকমত্য ছিল। তবে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রচলিত রীতির কারণে অতি স্বল্প সময় মুত্'আহ্ জায়েজ হওয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু শরিয়তের হুকুম অবগত হওয়ার পর তিনিও মুত্'আহ্ জায়েজ হওয়ার মত পরিত্যাগ করেন। মুত্'আহ্ হারাম হওয়ার ব্যাপারে হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, আহলে হাদীস ও সুফিয়ায়ে কেরাম সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেন।

وَتَزْوِيْجُ الْعَبْدِ وَ الْاَمَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَوْلَاهُمَا مَوْقُوْفٌ اِنْ اَجَازَهُ الْمَوْلٰى جَازَ وَاِنْ رَدَّهُ بَطَلَ وَكَذٰلِكَ اِنْ زَوَّجَ رَجُلٌ اِمْرَأَةً بِغَيْرِ رِضَاهَا اَوْ رَجُلًا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَيَجُوْزُ لِابْنِ الْعَمِّ اَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَ عَمِّهٖ مِنْ نَفْسِهٖ وَاِذَا اَذِنَتِ الْمَرْأَةُ لِلرَّجُلِ اَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ نَفْسِهٖ فَعَقَدَ بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ جَازَ وَاِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ لِلْمَرْأَةِ صَحَّ ضِمَانُهُ وَلِلْمَرْأَةِ الْخِيَارُ فِيْ مُطَالَبَةِ زَوْجِهَا اَوْ وَلِيِّهَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর গোলাম ও বাঁদিকে তার মাওলার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ দিলে তা মওকুফ থাকবে। যদি মনিব এ বিবাহ অনুমোদন করে তাহলে জায়েজ হবে, আর যদি তা প্রত্যাখ্যান করে (ফিরিয়ে দেয়) তাহলে বাতেল। তদ্রূপ যদি কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলাকে তার সন্তুষ্ট ব্যতীত বিবাহ করিয়ে দেয় অথবা কোনো পুরুষ তার সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করিয়ে দেয় তাহলে বিবাহ নিজেই মওকুফ থাকবে। আর চাচাতো ভাইয়ের জন্য তার চাচাতো বোনকে বিবাহ করা জায়েজ আছে। আর যখন মহিলা কাউকে তার সাথে নিজের বিবাহের অনুমতি দিল এবং সে দু'জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে আক্দ করে নিল তাহলে (এটা) জায়েজ হবে। আর যখন ওলী অভিভাবক মহিলার জন্য মোহরের জামিন হয়ে যাবে তখন জামিন হওয়াটা বৈধ। এমতাবস্থায় মহিলাটির জন্য আপন স্বামী বা তার অভিভাবকের নিকট তা দাবি করার অধিকার থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَتَزْوِيْجُ الْعَبْدِ الخ ঃ অর্থাৎ যদি কোনো ফুযুলী ব্যক্তি মাওলার অনুমতি ব্যতীত গোলাম অথবা বাঁদিকে বিবাহ করাল তাহলে এ বিবাহ মাওলার অনুমতির ওপর মাওকুফ থাকবে।

قَوْلُهُ وَاِذَا ضَمِنَ الْوَلِيُّ الْمَهْرَ الخ ঃ বিবাহের মধ্যে ওলী মহিলাদের মোহরের জামিন হতে পারবে। কেননা আক্দকারী ওলী এ স্থলে শুধু দূত হয়, বিবাহের হকসমূহ তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। যেন একই ব্যক্তির আকেদ ও জামিন হওয়া আবশ্যক হয়, যা ক্রয়-বিক্রয়ের আক্দের খেলাফ। কেননা তার মধ্যে ওলী আকেদ ও মুবাশের হয়। সুতরাং তার মধ্যে ওলীর জন্য আকেদ ও জামিন হওয়া বৈধ হবে না। কিন্তু জামিন বৈধ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত আছে ঃ (১) ওলী তার সুস্থ অবস্থায় জামিন হতে হবে, যদি মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় জামিন হয় তাহলে এটা বৈধ হবে না, (২) যদি মহিলা সাবালিকা হয় তাহলে সে নিজে, আর যদি ছোট হয় তাহলে তার কোনো ওলী জামিন হওয়ার মজলিসে ওলীর জামিন হওয়া মেনে নিতে হবে। এ সমস্ত শর্তগুলোর সাথে জামিন হওয়ার পর মহিলার জন্য এই স্বাধীনতা রয়েছে যে, যদি ইচ্ছা করে তাহলে ওলীয়ে জামিন থেকে মোহর দাবি করবে, আর ইচ্ছা করলে স্বামী থেকে মোহর দাবি করতে পারবে। কিন্তু যদি স্বামী নাবালেগ হয় তাহলে শুধু ওলী থেকেই মোহর দাবি করবে।

মোহর পরিশোধযোগ্য ঋণ ঃ মোহরের উদ্দেশ্য লৌকিকতা নয় বরং এটি অবশ্যই পরিশোধযোগ্য ঋণ। এটি বিবাহ বন্ধনের সূচনাতেই স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ ও তাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আগে হোক পরে বা হোক এটি পরিশোধ করতেই হবে। বিবাহে যদি ঘটনাচক্রে এর উল্লেখ নাও হয়, অথবা এই বিবাহে মোহর নাই বলে যদি পাত্র-পাত্রী দু'পক্ষই চুক্তি করে নেয় তবুও মোহরানা মাফ হবে না। অবশ্য বিবাহের পর যদি স্ত্রী স্বেচ্ছায় নিজের মোহরের দাবি ছেড়ে দেয়, তবে মাফ হবে এবং স্বামী এই মোহরের দায় থেকে অব্যাহতি লাভ করবে।

মোহরের পরিমাণ উভয় পক্ষের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্থিরকৃত হবে। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই এই পরিমাণ টাকা অথবা অন্যকোনো বস্তু যা সম্পদ হিসাবে পরিগণিত তাই মোহর হতে পারবে। এত অল্প পরিমাণ পয়সা-কড়ি অথবা এমন বস্তু যা অর্থ-সম্পদ হিসাবে সমাজের কাছে আদৌ গ্রহণযোগ্য নয়; সে রকম কোনো বস্তু বিবাহের মোহর হতে পারবে না। এ জন্যই এক হাদীসে দশ দিরহাম প্রায় আড়াই তোলা রৌপ্য অথবা সে পরিমাণ মূল্যের কোনো বস্তু মোহরের সর্বনিম্ন পরিমাণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রতারণামূলক মোহর নির্ধারণ করলে ব্যভিচারী বলে সাব্যস্ত হবে ঃ নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, কোনো মু'মিনের জন্য উচিত নয় নিজেকে লাঞ্ছিত করা। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে নিজেকে লাঞ্ছিত করে? নবী করীম (সা.) বললেন, এমন বিপদ সে বহন করে যার সাধ্য তার নেই।

এ হাদীস থেকে এ কথাই বুঝা যাচ্ছে যে, সাধ্যের বাইরে মোহর ধার্য করা উচিত নয়, যা সে পরিশোধ করার ক্ষমতা রাখে না। অন্য হাদীসে বলা হয়েছে, উত্তম মোহর হলো তাই যা সহজে আদায়যোগ্য এবং পরিমাণে স্বল্প। আরেক হাদীসে বলা হয়েছে, মোহরানা ধার্য সহজ করো।

উল্লিখিত হাদীসে এ কথা সহজেই বুঝা যাচ্ছে, মোহরানার পরিমাণ ন্যূনতম হওয়াই ইসলামি শরিয়তের মর্মকথা। এতে আরেকটি ব্যাপারও লক্ষ্যণীয়। আর তা হচ্ছে, পুরুষরা বিয়েতে মোহরানা পরিমাণে অত্যধিক ধার্য করে কিন্তু তা সাধ্যাতীত হওয়ার দরুন তারা তা পরিশোধে ব্যর্থ হয় ফলে স্ত্রীর মনে স্বামীর ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব জাগ্রত হয়, ভক্তি-শ্রদ্ধা হ্রাস পায়। এ ছাড়া শুরুতেই যদি স্বামী পরিশোধ না করার নিয়তে মোহর ধার্য করে থাকে, তাহলে তো সে খেয়ানতকারী ব্যভিচারী বলে সাব্যস্ত হয়ে যাবে। হযরত সুহাইব (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি কোনো নারীকে বিবাহ করে এবং তার জন্য কিছু মোহরানা ধার্য করে তারপর সে নিয়ত করে যে, পূর্ণ কিংবা আংশিক মোহর স্ত্রীকে প্রদান করবে না, তাহলে সে ব্যভিচারী হয়ে মারা যাবে এবং ব্যভিচারী হিসাবেই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে।"

বস্তুত আল্লাহর পক্ষ থেকে মোহরানা ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয় যে, অনেকেই তা আদায় করার ইচ্ছাই অন্তরে পোষণ করে না। উপরন্তু মোহরানা অধিক ধার্য করে নির্দ্বিধায় বলে বসে, মোহরানা কে দেয়? কে নেয়? অথচ উল্লিখিত হাদীসে এ ব্যাপারে কত কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

স্ত্রীর জন্য মোহর দাবি করা দূষণীয় নয় ঃ মেয়েদের জন্য নিজের স্বামীর কাছে মোহরানা দাবি করা মোটেই অযৌক্তিক কিছু নয়। কারণ শরিয়তের দৃষ্টিতে নিজের অধিকার আদায় করে নেওয়া দূষণীয় নয়।

وَإِذَا فَرَّقَ الْقَاضِى بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ فِى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَكَذٰلِكَ بَعْدَ الْخَلْوَةِ وَإِذَا دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا وَلَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمّٰى وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا مِنْهُ وَمَهْرُ مِثْلِهَا يُعْتَبَرُ بِاَخَوَاتِهَا وَعَمَّاتِهَا وَبَنَاتِ عَمِّهَا وَلَا يُعْتَبَرُ بِاُمِّهَا وَخَالَتِهَا اِذَا لَمْ تَكُونَا مِنْ قَبِيْلَتِهَا وَيُعْتَبَرُ فِى مَهْرِ الْمِثْلِ اَنْ يَّتَسَاوِى الْمَرْأَتَانِ فِى السِّنِّ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِ وَالْعَقْلِ وَالدِّيْنِ وَالْبَلَدِ وَالْعَصْرِ وَيَجُوْزُ تَزْوِيْجُ الْاَمَةِ مُسْلِمَةً كَانَتْ اَوْكِتَابِيَّةً وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ اَمَةً عَلٰى حُرَّةٍ وَيَجُوْزُ تَزْوِيْجُ الْحُرَّةِ عَلَيْهَا وَلِلْحُرِّ اَنْ يَّتَزَوَّجَ اَرْبَعًا مِّنَ الْحَرَائِرِ وَالْاِمَاءِ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَا يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ اَكْثَرَ مِنْ اِثْنَتَيْنِ فَاِنْ طَلَّقَ الْحُرُّ اِحْدَى الْاَرْبَعِ طَلَاقًا بَائِنًا لَمْ يَجُزْ لَهُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ رَابِعَةً حَتّٰى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ যখন নেকাহে ফাসেদের মধ্যে সঙ্গমের পূর্বেই কাজি সাহেব স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে পৃথক করে দেয় তাহলে স্ত্রী মোহর পাবে না। যদি নির্জনবাসের পরে হয় তবেও অনুরূপ বিধান হবে এবং যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে ফেলে তাহলে স্ত্রী মোহরে মিছিল পাবে। সেটা নির্দিষ্ট মোহর থেকে অতিরিক্ত দেওয়া হবে না এবং তার ওপর ইদ্দত আবশ্যক হয়ে গেছে এবং তার ছোট বাচ্চার বংশ তার থেকেই সাব্যস্ত হবে। মোহরে মিছিলের ধর্তব্য হবে তার বোন, ফুফু ও চাচাতো বোনদের থেকে, তার মা ও খালা থেকে ধর্তব্য হবে না যখন তারা তার খান্দান থেকে না হয়। এবং মোহরে মিছিলের মধ্যে উভয় মহিলার বর্ণ, সৌন্দর্য, মাল দৌলত, আকল (জ্ঞান), দীন, বংশ, শহর ও জামানার বরাবর হওয়ার ধর্তব্য হবে। বাঁদিকে বিবাহ করা চাই মুসলমান হোক অথবা আহলে কিতাব হোক জায়েজ আছে এবং আজাদ মহিলাকে বিবাহ বন্ধনে রাখা অবস্থায় বাঁদিকে বিবাহ করা জায়েজ নেই। আর বাঁদি বিবাহ বন্ধনে থাকা অবস্থায় আজাদ মহিলাকে বিবাহ করা জায়েজ আছে। আর আজাদ পুরুষের জন্য আজাদ মহিলা বা বাঁদি থেকে চারজন বিবাহ করা জায়েজ আছে। এর চেয়ে বেশি বিবাহ করা জায়েজ নেই এবং গোলাম দুই থেকে বেশিকে বিবাহ করবে না। সুতরাং যদি স্বাধীন পুরুষ চার স্ত্রী থেকে একজনকে বাইন তালাক দেয় তাহলে তার জন্য উক্ত তালাককৃতা মহিলার ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চতুর্থ কোনো মহিলাকে বিবাহ করা জায়েজ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিকাহে ফাসেদের সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهُ فِى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ الخ ঃ নিকাহে ফাসেদ ঐ আকদকে বলে, যে আকদের মধ্যে বিবাহের শর্তসমূহ পাওয়া যায় না। যেমন– সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করা, দুই বোনকে এক সঙ্গে বিবাহ করা, এক বোনের ইদ্দতের মধ্যে অপর বোনকে বিবাহ করা এবং চতুর্থ স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে পঞ্চম স্ত্রী বিবাহ করা, এরূপ বিবাহ ভঙ্গ করা ওয়াজিব।

মোহরে মিছিল-এর সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهُ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا الخ ঃ মোহরে মিছিল বলতে এমন মেয়েলোকের মোহর উদ্দেশ্য যে তার অনুরূপ এবং সেই অনুরূপ মহিলাটি স্ত্রীর পিতার বংশীয় হতে হবে।

যুক্তির আলোকে একাধিক বিবাহের রহস্য ঃ

قَوْلُهُ وَلِلْحُرِّ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَرْبَعًا الخ ঃ একাধিক বিবাহের কারণসমূহের মধ্যে সর্বপ্রথম কারণ হলো তাকওয়া অবলম্বন অর্থাৎ সংযমী হওয়া এবং গুনাহ্ হতে বেঁচে থাকা। তাকওয়া এমন এক প্রিয় বিষয় যে, প্রতিটি মানুষের পক্ষে এ বিষয়টিকে সকল কিছুর ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো মানুষকে সাধারণ মানুষের তুলনায় অধিক কামশক্তি দিয়ে তৈরি করেছেন। এরূপ মানুষের জন্য একজন স্ত্রী যথেষ্ট হতে পারে না। সুতরাং এই পুরুষকে যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় বা চতুর্থ বিবাহ করতে বাধা দেওয়া হয়, তাহলে এর ফল এই হবে যে, সে পূত-পবিত্র জীবন পরিত্যাগ করে পাপ পঙ্কিলতায় লিপ্ত হয়ে যাবে।

ব্যভিচার এমন এক জঘন্য পাপ যা মানুষের অন্তর হতে যাবতীয় পবিত্র চিন্তা বিদূরিত করে দেয় এবং তার মধ্যে এক মারাত্মক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। তাই যারা অধিক যৌনশক্তির অধিকারী, তাদের জন্য এমন কোনো প্রতিকার ব্যবস্থা থাকা উচিত, যদ্বারা সে পাপ-পঙ্কিলতা হতে বেঁচে থাকতে পারে।

একাধিক বিবাহ বন্ধ করার কারণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহের তৃতীয় উদ্দেশ্য অর্থাৎ বংশধারা চালু থাকার উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে না। যেমন– স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয় এবং তার বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসার অযোগ্য হয়, তবে একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ অবস্থায় বংশধারা ছিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। এই রোগ মহিলাদের মধ্যে সাধারণত দেখা যায়, এই শূন্যতা পূরণের জন্য একাধিক বিবাহ ব্যতীত ভিন্ন কোনো পন্থা নেই। এই অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ারও কোনো কারণ বিদ্যমান থাকে না। অ ছাড়া এটাও সম্ভব যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন মহব্বত থাকবে যে, পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না, সুতরাং উপরোক্ত অবস্থাগুলোতে স্বামীকে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দেওয়াই বংশ টিকিয়ে রাখার একমাত্র উপায়। এতদ্ব্যতীত আরও বহু কারণ রয়েছে, যেগুলো একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করে।

যুক্তির আলোকে পুরুষের একাধিক বিবাহ চার পর্যন্ত সীমিত হওয়ার রহস্য ঃ পুরুষের জন্য বিবাহিতা স্ত্রী চারজনে সীমিত হওয়ার কারণ আল্লাহর মহান হেকমত, নেয়ামতের পরিপূর্ণতা ও বিচক্ষণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। নারীর তুলনায় পুরুষকে শক্তি ও সামর্থ্য অধিক দেওয়া হয়েছে। এ জন্য সে একই সময়ে কয়েকজন মহিলাকে বিবাহ করতে পারে। সর্বপ্রথম বিবাহের উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া, পবিত্রতা ও সন্তান লাভ। যেহেতু সকল মানুষের শক্তি সমান হয় না, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদের শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী তাদের জন্য উপকরণ চয়ন করেছেন। সুতরাং যে সব লোকের যৌন উত্তেজনা ও কামাসক্তি প্রবল তাদের সততা ও পাবিত্রতার হেফাজতের জন্য চারজন স্ত্রী থাকা প্রয়োজন। এ সকল লোকদের জন্য 'চার'-এর এই সংখ্যা আল্লাহর বিধানের সম্পূর্ণ অনুকূল।

একাধিক বিবাহের হিকমতসমূহের সারকথা ঃ (ক) তাকওয়া ও খোদাভীতি, (খ) স্বাস্থ্য ও শক্তির সংরক্ষণ, (গ) স্বামী-স্ত্রীর অমিল এবং তালাকের সুযোগ না থাকা, (ঘ) বন্ধ্যা হওয়া, (ঙ) কোনো দেশ ও বংশের অধিক কন্যা সন্তানের জন্ম, (চ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন, (ছ) সাধারণত পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সী মহিলাদের গর্ভধারণে অক্ষমতা। পক্ষান্তরে নব্বই বছর বয়স পর্যন্ত পুরুষের গর্ভদান ক্ষমতা বিদ্যমান থাকা, (জ) যে সকল দেশে একাধিক বিবাহ আইন সিদ্ধ নয়, সে সকল দেশে প্রয়োজনের তাগিদে ব্যভিচারের আধিক্যের বাস্তবতা। ওপরে উল্লিখিত কারণগুলো একাধিক বিবাহের প্রয়োজনীয়তাকে সুস্পষ্ট করে তোলে।

সাধারণ লোকদের চেয়ে হুযুর (সা.)-এর অধিক বিবাহ করার কারণ ঃ হুযুর (সা.) যেমন বনী আদমের পুরুষের রাসূল ছিলেন, তেমনি নারীদেরও রাসূল ছিলেন। সুতরাং প্রয়োজন ছিল যে, কিছুসংখ্যক মহিলা হযরত (সা.)-এর সার্বক্ষণিক সান্নিধ্যে থেকে তাঁর নিকট হতে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করত অন্যান্য মহিলাগণকে ইসলামের তাবলীগ ও তা'লীম দেবে। মূলত এই উদ্দেশ্যেই হযরত (সা.) তাঁর উম্মতের তুলনায় অধিক বিবাহ করেছিলেন।

হুযূর (সা.)-এর দৈহিক ও আত্মিক শক্তি অন্যান্যদের তুলনায় অনেক বেশি ছিল। তিনি সওমে বেসাল অর্থাৎ লাগাতার রোজা রাখতেন। কিন্তু উম্মতগণকে তা করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা তাঁর নিকট আরজ করল, আপনি তো লাগাতার রোজা রাখেন। তিনি এরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে আমার ন্যায় কে আছে?

اَبِيْتُ عِنْدَ رَبِّىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِىْ

অর্থাৎ, আমি আমার প্রভুর নিকট রাত্রি যাপন করি। তিনি আমাকে পানাহার করান।

নবী করীম (সা.)-এর বহু বিবাহ সম্পর্কে খ্রিস্টান ও অন্যান্য আহলে বাতেলগণ মারাত্মক একটা ভুল বুঝাবুঝিতে নিপতিত রয়েছে। অথচ তাঁর বহু বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র সহমর্মিতা ও অনুগ্রহ অথবা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীকে একত্র করার প্রয়াস। এতদ্ব্যতীত আরও বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কল্যাণ ও দীনি মহৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা একে তাঁর প্রবৃত্তির কামনা বলে অভিহিত করে। (নাউযুবিল্লাহ্)

ইতিহাস সাক্ষী যে, হযরত (সা.) পঁচিশ বৎসর বয়সে যখন বিবাহ করেন, তখন তিনি পবিত্রতা ও সাধুতায় সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতঃপর দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত অর্থাৎ হযরত খাদিজা (রা.) যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন আর দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। অথচ আরবে লাগামহীনভাবে একাধিক বিবাহের রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। সুতরাং যারা অনর্থক মহৎ কাজে মন্দ উদ্দেশ্য খুঁজে বেড়ায় এগুলোর কারণ অনুসন্ধান করাও তাদের দায়িত্ব। কেননা হযরত (সা.) পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বার্ধক্যে উপনীত হওয়া পর্যন্ত একের অধিক বিবাহ করেননি। যদি কোনো সময় কোনো ব্যক্তির অন্তরে রৈপিক কামনা প্রবল হয়ে উঠেই, তবে তা যৌবনকালেই হয়ে থাকে, যখন যৌবনের উদ্যম বিক্ষুব্ধ থাকে।

কিন্তু এই যৌবনকালেই তিনি এক স্ত্রীর ওপর এমন তুষ্ট থাকলেন যে, যখন কুরাইশরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে প্রস্তাব করেছিল যে, আপনি যদি মূর্তি পূজাকে মন্দ বলা হতে বিরত থাকেন, তবে আমরা আপনাকে আমাদের সর্দাররূপে গ্রহণ করব এবং আপনার বিবাহ করার জন্য পরমা সুন্দরী নারী এনে হাজির করব। কিন্তু তিনি তাদের এই প্রস্তাবের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেননি। একথা কে অস্বীকার করতে পারেন না যে, যৌবনকালই হলো রৈপিক কামনা প্রবল হয়ে উঠার প্রকৃত সময়। যেহেতু হুযূর (সা.)-এর এই যৌবনকাল সম্পর্কে তাঁর ঘোর শত্রুরাও স্বীকার করে যে, এ সময় তিনি পাক-পবিত্রতা, সততা ও নিষ্কলুষতার দৃষ্টান্ত ছিলেন, তাই রৈপিক কামনা পুরা করার জন্য তিনি বহু বিবাহ করেছিলেন, এই অভিযোগ উত্থাপন করা তাঁর পূত-পবিত্র ও নিষ্কলুষ সত্তার প্রতি এক চরম অপবাদ বৈ কিছু নয়।

হযরত (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির প্রথম জমানা ও শেষ জমানার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। প্রাথমিক বছরগুলোকে তিনি যখন তাবলীগের কাজ আরম্ভ করেন, তখন যদিও কাফিরদের পক্ষ হতে মুসলমানগণ বিভিন্ন প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতেন; কিন্তু তখনও আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট ছিল। বিশেষত যারা মর্যাদা ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন, তারা তুলনামূলকভাবে কাফিরদের আক্রমণ হতে নিরাপদ ছিলেন। কাফিররা তাদের সাথে সম্পর্কও বজায় রাখতো। স্বয়ং হুযূর (সা.)-এর এক কন্যার বিবাহ এক কাফেরের সঙ্গে হয়েছিল। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর মেয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহও এক কাফিরের ছেলে জুবাইর ইবনে মুতইমের সঙ্গে স্থির হয়েছিল, কিন্তু এই বিবাহের কারণে ছেলে নতুন ধর্ম গ্রহণ করতে পারে, এই আশঙ্কায় মুতইম বিবাহ করাতে অস্বীকার করে। এরপরই হযরত আয়েশার বিবাহ হুযূর (সা.)-এর সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

যদিও প্রাথমিক অবস্থায় এরূপ সম্পর্ক বিরাজমান ছিল; কিন্তু আস্তে আস্তে এ সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় কোনো মুসলিম মহিলার কাফিরের হাতে পতিত হয়ে তার জীবন ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াতেন। অতঃপর হুযূর (সা.)-এর হিজরতের কারণে এই অবশিষ্ট ক্ষীণ সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং মুসলমান কুমারী মেয়ে ও বিধবা নারীদের জন্য মুসলমান স্বামীরই একান্ত প্রয়োজন ছিল। আমাদেরকে এ সকল ঘটনাবলী সমানে রেখে হযরত (সা.)-এর বহু বিবাহের বিষয়টি ভেবে দেখা উচিত। তা ছাড়া সকলেই স্বীকার করেন যে, একমাত্র হযরত আয়েশা (রা.) ব্যতীত হযরত (সা.)-এর সকল স্ত্রীই ছিলেন বিধবা।

ইসলাম একাধিক বিবাহে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়নি ঃ প্রকাশ থাকে যে, ইসলাম ধর্মে একাধিক বিবাহ অনুমোদন করলেও এতে পূর্ণ স্বাধীনতা দান করেনি। বিবিধ শর্ত আরোপ করে বহু বিবাহের নামে স্বেচ্ছাচারিতার এবং নারীর প্রতি অন্যায়-অবিচারের কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে। ইসলাম একাধিক স্ত্রীর প্রতি সমব্যবহার এবং ন্যায়বিচারে সমর্থ পুরুষকেই শুধু প্রয়োজনে একাধিক বিবাহ করার অনুমতি দিয়েছে। এ ধরনের ন্যায়বিচার যে সহজ সাধ্য নয় এদিকেও সতর্ক করে একাধিক

বিবাহের উগ্র কামনাকে সংযত রাখার প্রয়াস চালিয়েছে। বলা হয়েছে যে, "ন্যায় বিচার করতে পারবে না বলে যদি আশঙ্কা করো তবে এক বিবাহেই তৃপ্ত থাকো" এবং "শত ইচ্ছা থাকলেও তোমরা মেয়েদের মধ্যে যথাযথভাবে ইনসাফ কায়েমে সমর্থ হবে না" বলে কুরআনের ঘোষণাই উপরোক্ত উক্তির জ্বলন্ত প্রমাণ। হাদীসে নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, যার দু'জন স্ত্রী আছে, সে যদি তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার না করে, তবে কেয়ামতের ময়দানে অর্ধাঙ্গ অবস্থায় হাজির হবে।"

হাদীসে এই ঘোষণা যেমন বহু স্ত্রীর মধ্যে ইনসাফ এবং ন্যায় দর্শিতায় বাধ্য করেছে, তেমনি বহু বিবাহ যে কঠিন পরীক্ষা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করে বহু বিবাহের বাসনাকে সংযত রাখতেও প্রয়াস পেয়েছে।

ইসলামে বহু বিবাহ অনুমোদিত থাকলেও যত ইচ্ছা বিবাহ করার অধিকার নেই। একই সময়ে চারজনের অতিরিক্ত স্ত্রীর দাম্পত্যবন্ধন একজন পুরুষের পক্ষে ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যত প্রয়োজনই হোকনা কেন স্বাভাবিকভাবে চারজনের বেশি বিবাহবন্ধনে পুরুষ বাধ্য হয় না, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে চারজনই যথেষ্ট। তাই ইসলাম চারের সংখ্যা পর্যন্ত বহুবিবাহকে সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছে।

কুরআন পাকের ঘোষণা অনুসারে নবী করীম (সা.)-কেউ চারের অতিরিক্ত বিবাহের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল। কিন্তু তবুও প্রিয় নবী (সা.) এই অবাধ অধিকারের অপব্যবহার করেননি। একসাথে নয়জনের বেশি স্ত্রীর তাঁর বিবাহে ছিল না।

যৌন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে নারীকে একই সময় একাধিক স্বামী দিতে আপত্তি ঃ এখানে প্রশ্ন হয় যে, যে সমস্ত অনিবার্য কারণে পুরুষ যুগপৎ বহু বিবাহ করতে বাধ্য হয়, নারী জীবনে তার কতখানি প্রয়োজন আছে? তদুপরি এহেন অবস্থায় আছে নারীর আত্মসম্মানে আঘাত লাগার আশঙ্কা এবং একাধিক পুরুষের ভোগের পাত্রী হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার দরুন অপমান বোধের বহিঃপ্রকাশ। শুধু ইন্দ্রিয় সম্ভোগ ও যৌনতৃপ্তিই তো বিবাহ বন্ধনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়; একথা যদি স্বতঃসিদ্ধ হয় তবে জিজ্ঞাস্য যে, একাধিক স্বামীর স্ত্রী হিসাবে সকলের প্রতি নারী কি তার যথা কর্তব্য ও নারীত্বের কঠিন দায়িত্ব পালনে সমর্থ হবে? সকলের ঘর-সংসার, ধন-দৌলত সামলে গৃহকর্ত্রীর মহিমা-মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে পারবে তো?

নারীর একাধিক স্বামী গ্রহণের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়, আর তা হচ্ছে, এ ক্ষেত্রে সন্তান কার হবে? একটি লোক যদি একাধিক ক্ষেত্রে চাষাবাদ করে, তবে উৎপাদিত ফসল যে তারই পরিশ্রমের ফল এ কথা নিশ্চিত; এ বিষয়ে কারো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু যদি একই ভূমিতে একাধিক ব্যক্তি পানি সরবরাহ করে ফসল ফলানোর চেষ্টা করে, তবে উৎপন্ন ফসলের অধিকার এবং ভাগাভাগি নিয়ে মস্ত বড় গোল বাঁধবে। এ কথা বলার বোধ করি অপেক্ষা রাখে না। উৎপন্ন ফসল যে সকলেরই পরিশ্রমের ফল এ কথাও নিশ্চিত করে বলা যায় না। তবু হয়তো সেখানে একটা সমঝোতা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু সন্তান-সন্ততির বেলায় যে তাও সম্ভব নয়। একাধিক স্বামী-সংসর্গ প্রাপ্ত স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান যে, কোন স্বামীর ঔরসজাত এ কথা কে বলে দেবে? আর যদি সন্তান একটি মাত্র হয় তবে তাকে নিয়ে সকলের লড়াই থামাবে কে? তা ছাড়া একাধিক সন্তানের বেলায় সুন্দর অসুন্দর ছেলে মেয়ে নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধবে না এ কথাও নিশ্চিত নয়। তদুপরি ছেলে কার ঔরসজাত, মেয়ে কোন স্বামীর, অসুন্দরের প্রকৃত জনক কে? এসব কিছু যখন নিশ্চিতভাবে জানার উপায় নেই, তখন কার সন্তান কাকে দেওয়া হবে? আইন এ অবস্থায় কখনও প্রকৃত সত্যের উদ্ধার ও প্রকৃত পিতার পরিচয় দিতে সক্ষম নয়। মোট কথা, বহু স্বামীর বেলায় ভূমিষ্ঠ সন্তানের যথার্থ জনকের প্রকৃত পরিচয় উদ্ধার অসম্ভব থেকে যাবে। বলা বাহুল্য যে, এ বিষয়টি সন্তানের সম্মানের পক্ষে অতীব লজ্জাজনক। যৌন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও নারী জীবনে যৌথভাবে একাধিক স্বামীর প্রয়োজন নেই বলা যায়। বহু বিবাহে বাধ্য বা একাধিক স্বামী গ্রহণ অপরিহার্য, এমন প্রশ্নই উঠে না। প্রকৃতিই তাদেরকে এহেন অবাধ অধিকার প্রদানের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। নারীর ঋতু এবং গর্ভকাল, প্রসব পরবর্তী স্রাব, নবজাতককে স্তন্যদানকাল প্রভৃতি বিচার করে দেখলেই সূক্ষ্মদর্শী পাঠক শ্রোতা এর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন। ইসলামে ঋতুকালে (যা সর্বোচ্চ দশদিন) সন্তান জন্মের পর স্রাব বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত (তবে চল্লিশ দিন পরে নয়) স্ত্রী সহবাস হারাম। স্ত্রী গর্ভকাল এবং স্তন্যদানকালে সহবাস নিষিদ্ধ না হলেও স্বভাবতই মেয়েদের যৌন তাগাদা তখন অপেক্ষাকৃত সংযত ও স্তিমিত থাকে। কিন্তু পুরুষদের বেলায় প্রকৃতিগত এ ধরনের কোনো বাধা-বিপত্তি নেই; বরং নারীর ঋতু, প্রসব পরবর্তী স্রাবকাল, গর্ভকাল, স্তন্যদান কালের প্রতি একটুখানি লক্ষ্য করলেই বুঝতে বাকি থাকে না যে, এহেন নারীর পক্ষে একই সময়ে একাধিক স্বামী গ্রহণ তার শরীর-স্বাস্থ্য, জীব-যৌবন, সুখ-শান্তির জন্য জ্বলন্ত অভিশাপ।

এ সমস্ত কারণেই ইসলাম মেয়েদের বহু বিবাহ তথা যৌথ স্বামী গ্রহণ অনুমোদন করে না। নারী কল্যাণ ও মানবকল্যাণের খাতিরেই একে ব্যভিচার সদৃশ বলে ইসলাম ঘোষণা করে।

وَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَلَهَا الْخِيَارُ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا وَكَذٰلِكَ الْمُكَاتَبَةُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ أَمَةٌ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ لَهَا وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ إِحْدٰهُمَا لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا صَحَّ نِكَاحُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا وَبَطَلَ نِكَاحُ الْأُخْرٰى وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجَةِ عَيْبٌ فَلَا خِيَارَ لِزَوْجِهَا وَإِذَا كَانَ بِالزَّوْجِ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَلَا خِيَارَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهَا الْخِيَارُ وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عِنِّيْنًا أَجَّلَهُ الْحَاكِمُ حَوْلًا فَإِنْ وَصَلَ فِي هٰذِهِ الْمُدَّةِ فَلَا خِيَارَ لَهَا وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِنْ طَلَبَتِ الْمَرْأَةُ ذٰلِكَ وَالْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ إِذَا كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا وَإِنْ كَانَ مَجْبُوْبًا فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فِي الْحَالِ وَلَمْ يُؤَجِّلْهُ.

সরল অনুবাদ ঃ যখন বাঁদিকে তার মাওলা শাদী করিয়ে দিল অতঃপর উক্ত বাঁদি আজাদ হয়ে গেল; তাহলে তার জন্য স্বাধীনতা থাকবে চাই তার স্বামী আজাদ হোক কিংবা গোলাম হোক। এমনিভাবে মুকাতাব বাঁদির হুকুমও। আর যদি কোনো বাঁদি মাওলার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করল, অতঃপর সে আজাদ হয়ে গেল তাহলে বিবাহ সঠিক থাকবে এবং তার স্বাধীনতা থাকবে না। আর যে ব্যক্তি দুই মহিলাকে এক আকদের মধ্যে বিবাহ করল এবং দু'জনের মধ্যে একজনের বিবাহ তার জন্য হালাল নয়; তাহলে ঐ মহিলার বিবাহ বৈধ হবে যে মহিলা তার জন্য হালাল এবং অপরটি বাতিল হয়ে যাবে। আর যখন স্ত্রীর মধ্যে কোনো দোষ হবে তাহলে স্বামীর জন্য স্বাধীনতা থাকবে না। আর যদি স্বামীর উন্মাদনা, কুষ্ঠ অথবা শ্বেত রোগ থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট মহিলার জন্য স্বাধীনতা থাকবে না। আর ইমাম মুহাম্মাদ (র.) বলেন, তার জন্য স্বাধীনতা থাকবে। আর যখন স্বামী নামরদ, পুরুষত্বহীন হবে তখন হাকিম তাকে এক বছরের সুযোগ দেবে যদি সে সঙ্গমের যোগ্য হয়ে যায় তাহলে ভাল এবং মহিলার স্বাধীনতা থাকবে না। আর যদি যোগ্য না হয় তাহলে দু'জনের মধ্যে পৃথক করে দেবে যদি স্ত্রী এটাই চায়। আর এ পৃথকতা বায়েন তালাকের ন্যায় হবে। আর স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে যখন স্বামী তার সাথে খোলওয়াত করে। আর যদি স্বামীর পুরুষত্ব কর্তিত হয় তাহলে কাজি সাহেব তখনই তাদের মধ্যে পৃথক করে দেবেন এবং সুযোগ দেবেন না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا زَوَّجَ الْأَمَةَ الخ ঃ মাওলা তার বাঁদি অথবা মুকাতিবাকে কোনো ব্যক্তির সাথে বিবাহ করিয়ে দিল, অতঃপর মাওলা তাকে মুক্ত করে দিল তাহলে বাঁদির বিবাহ বহাল রাখার মধ্যে স্বাধীনতা থাকবে, চাই তার স্বামী আজাদ হোক কিংবা গোলাম হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি স্বামী আজাদ হয় তাহলে স্বাধীনতা থাকবে না। কিন্তু এ কথাটি হাদীসের দৃষ্টিতে সঠিক নয়। কেননা হযরত বারীরা (রা.) যখন আজাদ হলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁকে বলেছিলেন–

قد اعتق بضعك معك فاختاري এর মধ্যে মিলকে বুঝার সাথে তালীলটা ব্যাপক। সুতরাং স্বামী আজাদ হোক অথবা গোলাম হোক উভয় সুরতকেই শামেল করে, হাঁ আজাদ এর স্বাধীনতা থাকার জন্য শর্ত হচ্ছে– সে বাঁদির ঐ মাসআলার ইলম থাকতে হবে যে শরয়ীভাবে তার জন্য স্বাধীনতা রয়েছে। সুতরাং যে মজলিসের মধ্যে বাঁদির আজাদ হওয়ার ইলম হবে তারই মধ্যে তার খিয়ার হাসিল হবে। সুতরাং যদি আজাদের ইলম হয় আর মাসআলার ইলম না হয় তাহলে সে মজলিসে ইলম হবে তার মধ্যে খেয়ারও হাসেল হবে। আর এ পৃথকতা তালাক ব্যতীত।

قَوْلُهُ وَإِنْ تَزَوَّجَتْ اَمَةٌ الخ : এ সুরতের মধ্যে বিবাহ এ জন্য জারি হবে সে বাঁদির মধ্যে বিবাহের যোগ্যতা আছে। অপরাধ শুধু এতটুকুই যে মাওলার হকের ভিত্তিতে তার বিবাহ হয়নি। সুতরাং যখনই সে আজাদ হয়ে গেল তখন মাওলার হক চলে যেতে থাকবে। এ জন্য বিবাহ হবে। আর খেয়ার না হওয়া এ জন্য সে তার বিবাহ মুক্ত হওয়ার পর প্রযোজ্য হয়েছে। সুতরাং স্বামীর জন্য তালাকের মালিক হওয়ার জন্য কোনো অতিরিক্ত অধিকার অর্জিত হয়নি অর্থাৎ প্রথম সুরতে বাঁদির এখতিয়ার এ জন্য ছিল যে, সে মুক্ত হওয়ার পূর্বে শুধু দুই তালাকের মহল ছিল। আর মুক্ত হওয়ার পর তার স্বামীর জন্য অতিরিক্ত এক তালাক দেওয়ার অধিকার অর্জিত হয়েছিল আর এখানে এই সুরত নেই। এ জন্য বাঁদি বিবাহকে ভঙ্গ করার মধ্যে তার স্বাধীনতা থাকবে না।

قَوْلُهُ وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَتَيْنِ الخ : এ সুরতের মধ্যে যেই মোহর নির্ধারণ করা হয় সে সমস্ত মোহর তার সাথেই মিলবে অর্থাৎ সেই পাবে যার সাথে বিবাহ বৈধ আছে। আর হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট উভয়ের মোহরে মিছিলের ওপর বণ্টন হবে।

قَوْلُهُ اَجَّلَهُ الْحَاكِمُ الخ : হযরত আলী (রা.), ওমর (রা.) ও ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে এটাই বর্ণিত আছে। এ জন্য যে বৎসর বিভিন্ন চারটি ঋতুর ওপর আবর্তিত হয়ে থাকে। যদি নপুংসকতা জন্মগত না হয় কোনো অসুস্থতার কারণে, তাহলে এটাও ঋতুর আবর্তনে পুরো বৎসরের মধ্যে তা দূর হতে পারে। সুতরাং পুরো বৎসরের মধ্যে যদি সে সুস্থ হয়ে যায় তাহলে ভাল অন্যথা কাজির পৃথকীকরণ দ্বারা মহিলা বায়েনা হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يُؤَجِّلْهُ الخ : ইন্নীনকে এক বৎসরের সুযোগ এ জন্যই দেওয়া হয় যাতে জানা হয়ে যায় যে, সে তার সঙ্গম থেকে অপারগ হওয়াটা সৃষ্টিগতভাবেই নাকি অসুস্থতার কারণে; যাতে করে বছরের চারটি ঋতু অতিক্রান্ত হওয়া দ্বারা এ সন্দেহ দূরীভূত হয়ে যায়। আর যৌনাঙ্গ কর্তিত ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া দ্বারা কোনো ফায়েদা নেই।

وَالْخَصِيُّ يُؤَجَّلُ كَمَا يُؤَجَّلُ الْعِنِّيْنُ وَإِذَا اَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَ زَوْجُهَا كَافِرٌ عَرَضَ عَلَيْهِ الْقَاضِى الْإِسْلَامَ فَإِنْ اَسْلَمَ فَهِىَ اِمْرَأَتُهُ وَاِنْ اَبٰى عَنِ الْإِسْلَامِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَكَانَ ذٰلِكَ طَلَاقًا بَائِنًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُوَ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَاِنْ اَسْلَمَ الزَّوْجُ وَتَحْتَهُ مَجُوْسِيَّةٌ عَرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامَ فَإِنْ اَسْلَمَتْ فَهِىَ اِمْرَأَتُهُ وَاِنْ اَبَتْ فَرَّقَ الْقَاضِى بَيْنَهُمَا وَلَمْ تَكُنِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا طَلَاقًا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا -

সরল অনুবাদ ঃ আর অণ্ডকোষবিহীন ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া হবে যেভাবে পুরুষত্বহীন ব্যক্তিকে সুযোগ দেওয়া হয়। আর যখন স্ত্রী মুসলমান হয়ে যায় এবং স্বামী কাফির হয়, তাহলে কাজি তার নিকট ইসলাম পেশ করবে; যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে সে তার স্ত্রী থাকবে আর যদি অস্বীকার করে তাহলে দু'জনের মধ্যে পৃথক করে দেওয়া হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মাদ (র.)-এর নিকট এটা বায়েন তালাক হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এটা তালাকবিহীন বিচ্ছেদ হবে। যদি স্বামী মুসলমান হয়ে যায় এবং তার বিবাহ বন্ধনে অগ্নিপূজক স্ত্রী থাকে তাহলে তার নিকট ইসলাম পেশ করবে, যদি সে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সে তার স্ত্রী থাকবে। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে কাজি তাদের মধ্যে পৃথক করে দেবে। আর এ পৃথকতা তালাক হবে না। যদি স্বামী তার সঙ্গে সঙ্গম করে থাকে তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে, আর যদি সঙ্গম না করে থাকে তাহলে স্ত্রী মোহর পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْخَصِىُّ يُؤَجَّلُ الخ ঃ খাসী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার উভয় অণ্ডকোষকে বের করে দেওয়া হয়েছে, আর তার লিঙ্গ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। খাসীকে সুযোগ দেওয়ার কারণ এই যে, তার থেকে সঙ্গমের আশা করা যায়।

قَوْلُهُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا الخ ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সঙ্গমের পূর্বে যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে সাথে সাথেই বায়েনা হয়ে যাবে। আর যদি সঙ্গমের পরে মুসলমান হয় তাহলে বিবাহ ভঙ্গন ইদ্দত পর্যন্ত মওকুফ থাকবে। এখন যদি ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়া পর্যন্ত স্বামী মুসলমান না হয় তাহলে তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল ঐ রেওয়ায়ত যে বনী তাগলবের এক ব্যক্তি ছিল যার খ্রিস্টান স্ত্রী মুসলমান হয়ে গেছে, অতঃপর হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট এ ঘটনা পেশ করা হলো। তিনি স্বামীকে বললেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও; অন্যথা তোমাদের দু'জনের মধ্যে আমরা পৃথক করে দেব। অতঃপর স্বামী মুসলমান হওয়া থেকে অস্বীকার করল, তখন তাদের দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হলো। আর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এ রকমই বর্ণিত আছে। আর হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) -এর কারো থেকে ইদ্দতের এতেবার কথা বর্ণিত নেই। আর এ ঘটনা সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সম্মুখেই ঘটেছিল। অথচ তাদের কেউ এ রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি উত্থাপন করেননি। সুতরাং এটার ওপর ইজমায়ে সুকূতী সংঘটিত হয়েছে।

মোহর মাফ চাওয়া স্বামীর আত্মমর্যাদার পরিপন্থী ঃ

قَوْلُهُ كَمَالُ الْمَهْرِ الخ ঃ স্ত্রীকে মোহরানা মাফ করে দেওয়ার কথা বলা স্বামীর সূক্ষ্ম আত্মমর্যাদা বোধের পরিপন্থী। এতেদসত্ত্বেও স্ত্রী যদি সন্তুষ্ট চিত্তে মাফ করে দেয় তবে তা মাফ হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে যদি স্ত্রীকে আল্লাহর ভয় দেখিয়ে মৌখিক মাফের অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে, কিংবা ধোঁকাবাজির আশ্রয় নেয় বা হুমকি ধমকির পথ অবলম্বন করে, কিংবা এমন কোনো বিষয়ের ওপর জোর-জবরদস্তি করে যার দ্বারা সে মাফ করতে বাধ্য হয়, তাহলে এ ধরনের মাফ আল্লাহর নিকট কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না। স্ত্রী মোহরানা দাবি পরিত্যাগ করলেও স্বামীর আত্মমর্যাদার দাবি হচ্ছে স্ত্রীর মোহরানা পরিশোধা করে দেওয়া।

স্ত্রীকে মোহর না দিয়ে উল্টো যৌতুকের চাপ দেওয়া প্রচণ্ড জুলুম ঃ অভিশপ্ত যৌতুক প্রথা তথা বর বিক্রয়ের নিয়ম ইসলামে নেই। এটি ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ড, অনৈসলামিক কু-প্রথা। ইসলাম পাত্রের সঙ্গে পাত্রীর, নরের সঙ্গে নারীর, বরের সাথে কনের বিবাহ দিতে আগ্রহী, ধন-সম্পদের সঙ্গে বরের বিবাহ নয়। যে শুভ বিবাহের সূচনাতেই মনের চেয়ে সম্পদের, মানবের চেয়ে জড়বস্তুর, শান্তির চেয়ে অর্থ কড়ির গুরুত্ব প্রকাশ পায়, তার ভবিষ্যৎ কখনো কল্যাণপ্রসূ হতে পারে না। যারা মূলত যৌতুকের অর্থ অনুমান করে বিবাহ করে তাদের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে সম্পদের সঙ্গে। যৌতুকের অর্থের সাথেই তাদের প্রকৃত পরিণয়। স্ত্রীর ওপর তাদের অধিকার খাটে না, দাবি চলে না। যৌতুকের জঘন্য প্রাচীর দাঁড়িয়ে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে। স্বামী-স্ত্রীর সত্যিকার মনের মিল এতে সম্ভব হয়ে উঠে না। বস্তুত কোনো আত্মসম্মান সচেতন নারীই যৌতুকের পাত্র বা তার আত্মীয়-স্বজনকে মনের সিংহাসনে প্রীতির আসনে বসাতে পারে না। ভেসে উঠে তার মনের মুকুরে সদা পাত্রপক্ষের অর্থ-লোলুপতার বীভৎস দৃশ্য।

আর যে ক্ষেত্রে কন্যা দায়গ্রস্ত পিতামাতা অনূঢ়া মেয়েকে পাত্রস্থ করার জন্য ভিটেমাটি ছাড়া সর্বস্বান্ত হয়েছেন, কিংবা অবর্ণনীয় কষ্ট স্বীকার করে শুধু মেয়ের মুখ দেখে, আঁখিজল মুছে, অনাহারে থেকে যৌতুকের টাকা যোগাড় করেছেন, সেখানকার অবস্থা আরো করুণ, আরো মর্মন্তুদ সে দৃশ্য। এহেন পাত্রে পাত্রীপক্ষ যৌতুক দিতে পারে কিন্তু মন দিতে পারে না। মেয়ে দিতে হয় তাই বাধ্য হয়ে দেয়, কিন্তু ভালবাসা দেয় না। পাত্র ও পাত্র পক্ষকে প্রিয়-পরিজন একান্ত আপনজন না ভেবে নরহন্তা কসাই বলে ভাবতে বাধ্য হয় নারী।

وَإِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ تَقَعِ الْفُرْقَةُ عَلَيْهَا حَتّٰى تَحِيْضَ ثَلٰثَ حِيَضٍ فَإِذَا حَاضَتْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَإِذَا أَسْلَمَ زَوْجُ الْكِتَابِيَّةِ فَهُمَا عَلٰى نِكَاحِهِمَا وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إِلَيْنَا مِنْ دَارِ الْحَرْبِ مُسْلِمًا وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ سُبِيَ أَحَدُهُمَا وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ سُبِيَا مَعًا لَمْ تَقَعِ الْبَيْنُوْنَةُ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي الْحَالِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتّٰى تَضَعَ حَمْلَهَا وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْبَيْنُوْنَةُ بَيْنَهُمَا وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الْمُرْتَدُّ وَقَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ وَإِنْ لَّمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ هِيَ الْمُرْتَدَّةُ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَإِنْ كَانَتِ الرِّدَّةُ بَعْدَ الدُّخُوْلِ فَلَهَا الْمَهْرُ.

সরল অনুবাদ ঃ আর যখন মহিলা দারুল হরব-এর মধ্যে মুসলমান হয়ে গেল তখন তার ওপর বিচ্ছেদ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার তিন হায়েয চলে আসে। এরপর যখন হায়েয এসে যায় তখন স্ত্রী স্বামী থেকে ভিন্ন হয়ে যাবে। আর যখন কিতাবিয়াহ মহিলার স্বামী মুসলমান হয়ে যায় তখন তারা উভয়েই স্বীয় বিবাহের ওপর অটল থাকবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে হতে কোনো একজন মুসলমান হয়ে দারুল হরব থেকে আমাদের নিকট চলে আসে তাহলে ঐ দু'জনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর যদি দু'জনের কোনো একজনকে বন্দী করা হয় তাহলেও বিচ্ছেদ হয়ে যাবে। আর যদি উভয়জনকে একই সাথে বন্দী করা হয় তাহলে বিচ্ছেদ হবে না। আর যখন মহিলা হিজরত করে আমাদের কাছে চলে আসে তখন তার জন্য বৈধ হবে যে, সে তখনই বিবাহ করে ফেলে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট উক্ত মহিলার জন্য ইদ্দত পালন করারও প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি হিজরতকারী মহিলা গর্ভবর্তী হয় তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সন্তান প্রসব না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে বিবাহ করবে না। আর যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্য হতে কোনো একজন ইসলাম থেকে ফিরে গেল তাহলে দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। আর এ বিচ্ছেদ তালাক হবে। সুতরাং যদি সেই মুরতাদ স্বামী হয় এবং সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গমও করে থাকে তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে, আর যদি সঙ্গম না করে থাকে তাহলে অর্ধেক মোহর পাবে। আর যদি মুরতাদ স্ত্রী হয় এবং মুরতাদ হওয়া সঙ্গমের পূর্বে হয় তাহলে সে মোহর পাবে না। আর যদি সঙ্গম হওয়ার পর মুরতাদ হয় তাহলে স্ত্রী পূর্ণ মোহর পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ دَارِ الْحَرْبِ الخ ঃ دَارُ الْحَرْبِ বলতে সাধারণত ঐ রাষ্ট্র বুঝা যায় যার মধ্যে কাফিরদের ক্ষমতা চলে এবং ঐ দেশকেও বুঝা যায় যার মধ্যে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে এর বিপরীত دَارُ الْإِسْلَامِ বা ইসলামি রাষ্ট্র।

قَوْلُهُ وَإِذَا خَرَجَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الخ ঃ স্বামী-স্ত্রীর মধ্য থেকে কোনো একজন যদি দারুল হরব থেকে মুসলমান হয়ে আমাদের কাছে এসে যায় অথবা বন্দী করে আনা হয়, তখন তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিচ্ছেদ ঘটবে না। আর যদি স্বামী স্ত্রী উভয়কে বন্দী করে আনা হয় তখন আমাদের হানাফীদের মতে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে না; কিন্তু শাফেয়ী (র.)-এর মাজহাব অনুযায়ী বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

মুরতাদের সংজ্ঞা ও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার অর্থ ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য মাসআলা বুঝার জন্য মুরতাদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্ম বর্জন করে অন্যকোনো ধর্ম গ্রহণ করে বা ধর্মহীন হয়ে যায় তাকে শরিয়তের পরিভাষায় মুরতাদ বলে। কিন্তু যদি অন্যকোনো ধর্মালম্বী ধর্মমত পরিবর্তন করে। যেমন– হিন্দু খ্রিস্টান হয়ে গেল তবে মুরতাদ বলা হবে না।

ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করার অর্থ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো অস্বীকার করা। যেমন–আল্লাহর তাওহীদ ও গুণাবলী, ফেরেশতাগণের অস্তিত্ব, রিসালাত, খতমে নবুয়ত, কুরআন, হাশর, বেহেশত, দোযখ ইত্যাদি অস্বীকার করা।

ধর্ম ত্যাগের বহিঃপ্রকাশ কয়েক ভাগে বিভক্ত ঃ (ক) জেনে বুঝে ইসলামকে সজ্ঞানে অস্বীকার করা। (খ) হাসি-তামাশার মাধ্যমে অস্বীকার করা। (গ) ভুলবশত অযথা ফাহেশা কথা বলা এতে যদিও মুরতাদ হয় না কিন্তু শাস্তির যোগ্য হবে। (ঘ) বেহুঁশ অবস্থায় বা জোরপূর্বক ধর্ম ত্যাগ করা। এটা অবশ্যই ক্ষমাযোগ্য। (ঙ) জ্ঞানগর্ব বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে গিয়ে অস্বীকারমূলক বাক্য প্রয়োগ করা। এটাও চরম অপরাধমূলক ব্যাপার, মুরতাদ হওয়া নয়।

মোহরের শর্তে আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহ বৈধ করেছেন ঃ

قَوْلُهُ فَلَهَا كَمَالُ الْمَهْرِ الخ ঃ প্রকৃতপক্ষে বিবাহ উপলক্ষে পাত্রই দান করবে পাত্রীকে মোহর বা অর্থ সম্পদ, এ শর্তেই আল্লাহ্ তা'আলা বিবাহের বৈধতা দান করেছেন। তিনি বলেছেন, "অর্থ দ্বারাই তোমরা নারীকে কামনা করবে, নারীর প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে।" আর এই অর্থের নামই মোহরানা।

পুরুষই ব্যয় করবে নারীর জন্য, পুরুষই দেবে নারীকে এটাই কুরআনের ঘোষণা, এটাই হলো জগৎ সংসারে পুরুষের নেতৃত্বের অন্যতম কারণ। যৌতুক প্রথা তাই কুরআন বিঘোষিত পুরুষের এই নেতৃত্বের বিপক্ষেও অন্যতম চ্যালেঞ্জ। পাক কুরআনে বিঘোষিত দাম্পত্য জীবনে প্রীতি ভালবাসা এবং দয়া-মায়ার অন্তরায় বলেও ইসলামে যৌতুক প্রথা অবৈধ।

মুসলিম সমাজে এ ধরনের ঘৃণ্য প্রথা কখনোই প্রচলিত ছিল না। তাদের ধর্মেও এর অবকাশ নেই। কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে মুসলমানদের মধ্যে এই দুষ্ট ব্যাধি বাসা বেঁধেছে। বিজাতীয় রীতি-নীতি হিসাবেও এটি ইসলামে নিষিদ্ধ। নিশ্চিতভাবে ইসলাম এহেন ঘৃণ্য প্রথার উৎসমুখ বন্ধ করে দিয়েছে আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে। আর আমাদের এই ঘুনে ধরা সমাজে অত্যন্ত আশার কথা এই যে, বর্তমান কালের সমাজ বিজ্ঞানীগণও এটিকে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলার পথে অন্তরায় হিসাবে উপলব্ধি করছেন এবং এ অভিশপ্ত প্রথা রোধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে উদ্বুদ্ধ করে যাচ্ছেন।

وَاِنِ ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ اَسْلَمَا فَهُمَا عَلٰى نِكَاحِهِمَا وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ الْمُرْتَدُّ مُسْلِمَةً وَلَا مُرْتَدَّةً وَلَا كَافِرَةً وَكَذٰلِكَ الْمُرْتَدَّةُ لَا يَتَزَوَّجُهَا مُسْلِمٌ وَلَا كَافِرٌ وَ لَا مُرْتَدٌّ وَاِذَا كَانَ اَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مُسْلِمًا فَالْوَلَدُ عَلٰى دِيْنِهٖ وَكَذٰلِكَ اِنْ اَسْلَمَ اَحَدُهُمَا وَلَهٗ وَلَدٌ صَغِيْرٌ صَارَ وَلَدُهٗ مُسْلِمًا بِاِسْلَامِهٖ وَاِنْ كَانَ اَحَدُ الْاَبَوَيْنِ كِتَابِيًّا وَالْاٰخَرُ مَجُوْسِيًّا فَالْوَلَدُ كِتَابِيٌّ وَاِذَا تَزَوَّجَ الْكَافِرُ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ اَوْ فِيْ عِدَّةِ كَافِرٍ وَذٰلِكَ فِيْ دِيْنِهِمْ جَائِزٌ ثُمَّ اَسْلَمَا اُقِرَّا عَلَيْهِ وَاِنْ تَزَوَّجَ الْمَجُوْسِيُّ اُمَّهٗ اَوِ ابْنَتَهٗ ثُمَّ اَسْلَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَاِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ اِمْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ اَنْ يَّعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ بِكْرَيْنِ كَانَتَا اَوْ ثَيِّبَيْنِ اَوْ اِحْدٰهُمَا بِكْرًا وَالْاُخْرٰى ثَيِّبًا وَاِنْ كَانَتْ اِحْدٰهُمَا حُرَّةً وَالْاُخْرٰى اَمَةً فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ وَلِلْاَمَةِ الثُّلُثُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি স্বামী স্ত্রীর উভয়জন একই সাথে মুরতাদ হয়ে যায়, এরপর আবার একই সাথে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে দু'জনই তাদের বিবাহের ওপর থাকবে। মুরতাদ ব্যক্তির সাথে মুসলমান মহিলার বিবাহ জায়েজ নেই অনুরূপ মুসলমান পুরুষ মুরতাদ মহিলার সাথে, কাফিরা মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না। এ রকমভাবে মুরতাদ মহিলাও মুসলমানকে বিবাহ করতে পারবে না। এ কাফিরও পারবে না এবং মুরতাদ পারবে না। আর যখন স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কোনো একজন মুলমান হয়, তাহলে বাচ্চা ঐ ইসলাম ধর্মের ওপরই হবে। এমনিভাবে যদি দু'জনের মধ্যে কোনো একজন মুসলমান হয়ে যায় এবং তার ছোট বাচ্চাও আছে, তাহলে উক্ত ছোট বাচ্চা মুসলমান হবে তার ইসলাম ধর্মের অনুসারী হয়ে। আর যদি দু'জনের একজন আহলে কিতাব অপরজন অগ্নিপূজক হয়, তাহলে বাচ্চা কিতাবিয়ার মধ্য থেকে হবে। আর যদি কোনো কাফির সাক্ষী ব্যতীত বিবাহ করে ফেলে, অথবা কোনো কাফিরের ইদ্দতের মধ্যে এবং এটা তাদের ধর্মে জায়েজও আছে, এরপর উভয়েই মুসলমান হয়ে গেল তাহলে তাদেরকে তাদের বিবাহের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা হবে। আর যদি কোনো অগ্নিপূজক তার মা অথবা বোনের সাথে বিবাহ করল এরপর মুসলমান হয়ে গেল, তাহলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে। আর যদি কারো স্বাধীনা দুই স্ত্রী থাকে তাহলে স্বামীর ওপর ঐ দু'জনের বণ্টনের মধ্যে ইনসাফ করা জরুরি। চাই দু'জনই বাকেরাহ হোক বা ছাইয়েবাহ্, অথবা একজন বাকেরা অপরজন ছাইয়েবাহ্ হয়। আর যদি দু'স্ত্রীর মধ্যে একজন স্বাধীনা অপরজন বাঁদি হয়ে থাকে, তাহলে স্বাধীনা স্ত্রীর জন্য বণ্টনের দুই-তৃতীয়াংশ হবে, আর বাঁদির জন্য এক-তৃতীয়াংশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَجُوْزُ الخ ঃ মুরতাদ পুরুষ কোনো মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে না। চাই উক্ত মহিলা মুসলমান হোক অথবা কাফির অথবা কিতাবিয়াহ। কেননা তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তাকে শুধু এ জন্য অবকাশ দেওয়া হয় যে, যেন সে চিন্তা-ফিকির করে নেয়। আর বিবাহ করার ফলে সে গাফেলতির মধ্যে নিপতিত হয়। মুরতাদ্দাহ মহিলার অবস্থাও এরূপই।

সে কারো সাথে বিবাহ করতে পারবে না। কেননা তাকেও চিন্তা ভাবনার জন্যই বন্দী করা হয়। এ ছাড়া তাদের মধ্যে বিবাহের উদ্দেশ্যাবলী প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। অথচ বিবাহকে শরিয়তে স্থির করা হয়েছে স্বামী স্ত্রীর মাঝে দাম্পত্য জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দের জন্য ও উদ্দেশ্যাবলী প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।

قَوْلُهُ وَاِذَا تَزَوَّجَ الخ ঃ যখন কোনো কাফির ব্যক্তি কাফির মহিলাকে সাক্ষী ব্যতীত অথবা তার ইদ্দত অবস্থায় বিবাহ করে ফেলে। আর এটা তাদের ধর্মে জায়েজ ও আছে। এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে ফেলল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তার বিবাহ অটল থাকবে। আর ইমাম যুফার (র.) বলেন, বিবাহ ফাসেদ হয়ে যাবে। হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) প্রথম সুরতে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর সাথে। আর দ্বিতীয় সুরতে হযরত যুফার (র.)-এর সাথে। ইমাম যুফার (র.) বলেন যে, لَا نِكَاحَ اِلَّا بِشُهُوْدٍ ইত্যাদি রেওয়ায়তসমূহ সকলের জন্যই ব্যাপক, এজন্য উক্ত কাফির স্বামী ও কাফির স্ত্রীর জন্যও সাক্ষী আবশ্যক। ইমাম আযম (র.)-এর দলিল হচ্ছে– ইদ্দতরতা বা সাক্ষীবিহীন করা দ্বারা শরয়ী বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে, এ কথাটি অযৌক্তিক। কেননা তখন তারা মু'মিন না হওয়ার কারণে তাদের ওপর শরয়ী বিধান আরোপিত হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। আর বিধান আরোপ না হলে লঙ্ঘিত হয় কি করে? আর ইদ্দত পালনের নীতি তাদের ধর্মে নেই। বিধায় পূর্ব স্বামী নিজ অধিকার বলে বিশ্বাসই রাখে না। কাজেই তার স্ত্রী ইদ্দতের বিয়ে বসে আর অধিকার খর্ব করেছে হেতু গোড়াতেই তাদের বিয়ে শুদ্ধ হয়নি বলারও কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং, স্বীকার করতেই হবে যে বৈধভাবেই তাদের বিবাহ সংঘটিত হয়েছে। কাজেই যখন সূচনালগ্নে বিবাহ বৈধ ছিল। আর ইসলাম গ্রহণের পর হচ্ছে বিবাহের চলমান অবস্থা। আর বিবাহের চলমান অবস্থার জন্য সাক্ষী বিদ্যমান থাকা জরুরি নয়। আর ইদ্দতও চলমান অবস্থার বিপরীত নয়।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণের শর্তাবলী ঃ

قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ اَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا ঃ প্রথমত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের শর্ত হচ্ছে স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করা, এটি ওয়াজিব। তিরমিযী শরীফে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, যার দু'জন স্ত্রী রয়েছে এবং সে তাদের মাঝে সমতা রক্ষা করে না এবং ইনসাফ কায়েম করে না। কেয়ামতের দিন সে অর্ধাঙ্গ হয়ে উঠবে।

মিশকাত শরীফে আছে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) কোথাও সফরের ইচ্ছা করলে স্ত্রীদের মাঝে লটারী করতেন । লটারীতে যার নাম উঠত, তিনি তাকে নিয়ে সফরে যেতেন। বস্তুত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্য দ্বিতীয় বিবাহের মোটেই অনুমতি নেই।

কুরআন মাজীদে আল্লাহ তা'আলা একাধিক বিবাহের অনুমতি দানের পর এ আশঙ্কার কথাই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন– فَاِنْ خِفْتُمْ اَنْ لَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً ـ অর্থাৎ "একাধিক বিবাহ করে ইনসাফ কায়েমের ব্যাপারে যদি তোমাদের আশঙ্কা হয়, তবে একজন নিয়েই তৃপ্ত থেকো।" এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। ফলে এতে একাধিক স্ত্রীর মাঝে ক্ষমতা ও ইনসাফ কায়েম করতে না পারার বাস্তব দিকটির প্রতিই জোরালোভাবে ইঙ্গিত করা হচ্ছে। সুতরাং একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করাই উত্তম। বিনা প্রয়োজনে দ্বিতীয় বিবাহ না করাই উত্তম। তবে যদি কেউ ইনসাফ কায়েমের আশা রাখে এবং এর সাথে সাথে প্রথম স্ত্রী দুঃখ পাবে ভেবে দ্বিতীয় বিবাহের আশা পরিত্যাগ করে, তবে এতে সে ছওয়াবের অধিকারী হবে। আর যদি এ ক্ষেত্রে ইনসাফ কায়েমের আশাই না থাকে তবে এতে সে গুনাহের ভাগীদার হবে। আসলে স্ত্রীদের মাঝে সমতা রক্ষা করার ব্যাপারটি রাষ্ট্র পরিচালনার চেয়েও কঠিন। কারণ প্রচলিত আইন ও সংবিধানের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে রাষ্ট্র। অপরদিকে স্বামী স্ত্রী ব্যাপারটি হচ্ছে হৃদয় কেন্দ্রিক। এটি দেশ পরিচালনার চেয়েও কঠিন।

وَلَاحَقَّ لَهُنَّ فِى الْقَسْمِ فِىْ حَالَةِ السَّفْرِ وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَّقْرَعَ بَيْنَهُنَّ فَيُسَافِرُ بِمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهَا وَاِذَا رَضِيَتْ اِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ وَلَهَا اَنْ تَرْجِعَ فِىْ ذٰلِكَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর সফর অবস্থায় স্ত্রীদের জন্য বণ্টনের হক নেই যার সাথে চায় তার সাথে সফর করবে এবং উত্তম হচ্ছে যে লটারীর মাধ্যমে সফর সঙ্গিনী নির্ধারণ করা যার নাম লটারীর মধ্যে উঠে তাকেই সফরে নিয়ে যাবে। আর যখন এক স্ত্রী তার বণ্টনকে তার সতীনকে দেয়ার ওপর রাজি হয়ে যায় তাহলে এটাও জায়েজ হবে এবং সে তার এ কৃপা প্রত্যাহারও করে নিতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সফর অবস্থায় স্ত্রীদের বণ্টনের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَا حَقَّ لَهُنَّ فِى الْقَسْمِ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) একাধিক স্ত্রী সফর অবস্থায় বণ্টনের বিধান বর্ণনা করতেছেন, যে সফর অবস্থায় স্বামী একাধিক স্ত্রীর মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা তাকে নিয়ে সফর করা বৈধ। সফর অবস্থায় স্ত্রীদের বণ্টনের কোনো অধিকার নেই।

একাধিক স্ত্রীর ক্ষেত্রে স্বামী স্বাভাবিকভাবে কোনো এক স্ত্রীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে ঃ

قَوْلُهُ وَيُسَافِرُ الزَّوْجُ بِمَنْ شَاءَ الخ ঃ সফর অবস্থায় যদিও স্বামীর ওপর বণ্টন ওয়াজিব নয়, তারপরও একাধিক স্ত্রী থাকলে সবার মন জয় করার জন্য লটারী দেওয়া উত্তম যাতে তাদের মাঝে হিংসা-বিদ্বেষ না হতে পারে। কারণ একাধিক স্ত্রী হলে তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ, আর ঝগড়া-ফ্যাসাদ অনিবার্যরূপে পরিলক্ষিত হয়। তদুপরি স্বামী স্বাভাবিকভাবেই যখন কোনো এক স্ত্রীর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে তখন অন্যান্য স্ত্রীদের মাঝে জ্বলে উঠে হিংসার আগুন। এ আগুন নেভাতেই স্বামীর জীবন তরণী হয়ে উঠে সংজ্ঞা-বিক্ষুব্ধ, মরণাপন্ন।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে লটারীর প্রমাণ ঃ

قَوْلُهُ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَّقْرَعَ بَيْنَهُنَّ الخ ঃ কুরআন কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন–

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ اِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُوْنَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ এ হলো গায়েবী সংবাদ যা আমি আপনাকে পাঠিয়ে থাকি। আর আপনি তো তাদের কাছে ছিলেন না যখন প্রতিযোগিতা করছিল যে, কে প্রতিপালন করবে মারইয়ামকে এবং আপনি তাদের কাছে ছিলেন না যখন তারা ঝগড়া করেছিল। —(সূরায়ে আলে ইমরান)

হাদীস শরীফে আছে নবী করীম (সা.) যখন সফরের ইচ্ছা করতেন, তখন স্বীয় স্ত্রীদের মাঝে লটারী দিতেন। যাঁর নাম লটারীতে আসতো তাঁকে নিয়ে সফর করতেন।

আধুনিক লটারী ও ইসলামি লটারীর মধ্যে পার্থক্য ঃ আধুনিক যে সব লটারী সরকারি ও বেসরকারিভাবে আমাদের দেশে আছে যেগুলোতে টাকার বিনিময়ে কুপন ক্রয় করা হয়, এগুলো কেমার অর্থাৎ জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। এগুলো আদৌ বৈধ নয়। বাকি ইসলামি শরিয়ত সম্মত লটারীর বিধান সামনের শিরোনামে বর্ণনা করা হবে। কেমার তথা জুয়া হারাম হওয়া সম্পর্কে কুরআন কারীমে এরশাদ হচ্ছে– اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ

এ আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জুয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে তার থেকে বাচাঁর নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামে লটারীর বিধান ঃ ইসলামি শরিয়তে লটারী সম্পর্কিত বিধান হলো, ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে যে সমস্ত হক ও অধিকারের কারণসমূহ শরিয়ত অনুযায়ী জানাও নির্দিষ্ট রয়েছে, লটারী যোগে সেগুলোর মীমাংসা করা নাজায়েজ এবং জুয়ার অন্তর্ভুক্ত। যেমন– শরিকানা সম্পদে যার নাম লটারীতে আসে সম্পূর্ণ সম্পদ তাকে দিয়ে দেওয়া অথবা যে শিশুর পিতৃত্বে মতভেদ দেখা দেয়, তাতে লটারীর মাধ্যমে যার নাম আসে, তাকে পিতা মনে করে নেওয়া। পক্ষান্তরে যেসব হক ও অধিকারের কারণাদি জনগণের রায়ের ওপর ন্যাস্ত, সেগুলোতে লটারী করা জায়েজ। যেমন– শরিকানা ঘরের পূর্ব অংশ একজনকে এবং পশ্চিমাংশ অপরজনকে দিয়ে দেওয়া। এটা এ জন্যে জায়েজ যে, উভয় শরিকের সম্মতিক্রমে অথবা বিচারকের ফয়সালার মাধ্যমে লটারী ছাড়াও এরূপ করলে জায়েজ হতো।

একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি বৈধ ব্যবস্থা মাত্র ঃ প্রকাশ থাকে যে, এ কথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ ইসলামের স্বাভাবিক নির্দেশ নয়, এটি ফরজও নয়, ওয়াজিবও নয়, সুন্নতও নয় বরং বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি ব্যবস্থা মাত্র। তবে এর কিছু নেতিবাচক প্রভাব এমন রয়েছে যা পারিবারিক জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, স্বামী গৃহে নতুন স্ত্রী আগমনের দরুন যখন প্রথমা স্ত্রী উপেক্ষিত হয়, তার প্রতি স্বামীর মনযোগ ব্যাহত হয়, কিংবা স্বামী স্বাভাবিকভাবেই প্রথম স্ত্রীর প্রতি সম্পূর্ণরূপে নজর সরিয়ে ফেলে, তখন সঙ্গত কারণেই প্রথমা স্ত্রী তা বরদাশ্ত করতে পারে না এবং এ ক্ষেত্রে সে হয়ে উঠে প্রতিহিংসা পরায়ণ। যে কোনো উপায়ে সতীন ও তার স্বামীর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টির সর্বাত্মক অপপ্রয়াস চালাতে সে অগ্রসর হতে থাকে। ক্রমে ক্রমে হিংসার আগুন ও ঝগড়া বিবাদ শুধু স্ত্রীদের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এটি সংক্রমিত হয় পরিবারের সন্তানদের মাঝে। ফলে পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয় মারাত্মকভাবে। পুত্র-কন্যারাও বঞ্চিত হয় আদর-সোহাগ মায়া-মমতা থেকে। একাধিক স্ত্রী গ্রহণের এ সকল নেতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও যেহেতু ক্ষেত্র বিশেষ তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তাই ইসলামি শরিয়ত এর অনুমতি দিয়েছে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) مَامَعْنَى النِّكَاحِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟ وَمَاحُكْمُهُ فِى الشَّرِيْعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا .

(٢) رُكْنَا النِّكَاحِ مَا هُوَ وَمَاشَرْطُهُ ؟ بَيِّنْ مَالَهَا وَمَاعَلَيْهَا .

(٣) مَاالْفَرْقُ بَيْنَ النِّكَاحِ وَالْبَيْعِ ؟ بَيِّنْ بِالْإِيْضَاحِ التَّامِّ .

(٤) مَا مَعْنَى الْمُحَرَّمَاتِ وَكَمْ قِسْمًا لَهَا ؟ بَيِّنْ بِالْيَقْظَةِ التَّامِّ .

(٥) مَامَعْنَى الْوِلَايَةِ شَرْعًا ؟ هَلْ تَصِحُّ الْوِلَايَةُ لِلْبِكْرِ وَالثَّيِّبِ ؟ وَمَا الْخِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ بَيِّنْ مُوْضِحًا .

(٦) مَامَعْنَى الْمَهْرِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا ؟ وَمَا الْخِلَافُ فِىْ تَعْيِيْنِ اَقَلِّ الْمَهْرِ وَاَكْثَرِهِ .

(٧) هَلْ يَصِحُّ الْمَهْرُ بِمَا لَايَكُوْنُ ثَمَنًا وَمَا الْخِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ؟ بَيِّنْ مُدَلَّلًا .

(٨) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ نِكَاحِ الْفَاسِدِ وَالْبَاطِلِ وَالْمُتْعَةِ وَالْمُوَقَّتِ؟ بَيِّنْ مُوْضِحًا .

(٩) هَلْ يَجُوْزُ تَزْوِيْجُ الْمُحْرِمِ اَوِ الْمُحْرِمَةِ ؟ وَمَا الْخِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا وَمُمَثِّلًا .

(١٠) بِاَيِّ الْفَاظٍ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ وَبِاَيِّ الْفَاظٍ لَا؟ بَيِّنْ مَعَ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ .

كِتَابُ الرِّضَاعِ

দুগ্ধপান পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) বিবাহ পর্বের পর দুগ্ধপান পর্ব আনার কারণ এই যে, বিবাহের আসল উদ্দেশ্য সন্তান জন্ম দেওয়া, আর বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর সাধারণত দুগ্ধপানের দ্বারাই তাকে লালন-পালন করা হয়; এ জন্য বিবাহ পর্বের পর দুগ্ধপান পর্বকে এনেছেন। এ ছাড়া বিবাহ পর্বের সাথে দুগ্ধ পর্বের অনেক বিধানাবলী সম্পৃক্ত, এক কথায় দুগ্ধ পর্বের বিধানাবলী বিবাহের পরের বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

رِضَاعٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ رِضَاعٌ এটা رَاءٌ-এর যবর ও যের উভয়টিই শুদ্ধ। অর্থ– স্তন চোষা।

رِضَاعٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় رِضَاعٌ বলা হয় দুগ্ধপানকারী বাচ্চার নির্ধারিত সময়ে নারীর স্তনকে চোষা।

কুরআনের আলোকে দুগ্ধপান ঃ কুরআনে করীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন–

وَالْوَالِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ ـ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ـ

অর্থ ঃ আর সন্তানবতী নারীরা তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ দু'বছর দুধ খাওয়াবে, যদি দুধ খাওয়ার পূর্ণ মেয়াদ সমাপ্ত করতে চায়, আর সন্তানের অধিকারী অর্থাৎ পিতার ওপর হলো সে সকল নারীর খোরপোশের দায়িত্ব প্রচলিত নিয়মানুযায়ী সন্তোষজনকভাবে করতে হবে। – (সূরা বাকারা)

যুক্তির আলোকে حُرْمَتِ رِضَاعٌ-এর হিকমত ও রহস্য ঃ আপন জনের মতো রেযাআত অর্থাৎ দুগ্ধ পান ও হারাম হওয়ার কারণ, কেননা দুগ্ধদানকারিণী মহিলা মায়ের মতোই হয়ে যায়। এ জন্য যে, উহা দেহের পুষ্টি এবং তার আকৃতি গঠনের মাধ্যম হয়। সুতরাং সেও মূলত মায়ের পরে আরেক মা। দুধ-মার সন্তানগণ সাহোদের ভাই বোনদের পর তার আরেক ভাই বোন। অতএব তার মায়ের হওয়া স্ত্রীরূপে তাকে গ্রহণ করাও তার সাথে সহবাস করা এমন বিষয় যা সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি মাত্রই ঘৃণা করে।

মনো বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে মায়ের দুধের উপকারিতা ঃ মনোবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞগণের মতে যখন মা তার শিশুকে দুধপান করান (তখন) দুধের সাথে অনুভূতিহীন তরঙ্গ ও স্পন্দন তার শিশুর মধ্যে চলে যেতে থাকে। ফলে এই স্পন্দন ও তরঙ্গই শিশু ও মায়ের মধ্যে ভালবাসা, স্নেহমমতা, আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধাবোধের কারণ। চিন্তা করুন যে মা শিশুকে দুধপান করান না; বরং কৃত্রিম দুধ অর্থাৎ ডিব্বার কৌটার দুধ সাদা বিষ পান করান, সেবিকা ও আয়া দ্বারা লালন-পালন করে এভাবে একদিনে সে বড় ও যুবক হয়ে যায়। অতঃপর মায়ের মিষ্টি দুধপান করে না। তার মায়া-মমতা লাভ করে না, মায়ের কোলের উষ্ণতা অনুভব করে না, পায় না! এমন বাচ্চার থেকে মায়ের মহব্বত মাতা পিতার প্রতি শ্রদ্ধা ও মর্যাদাবোধের আশা কিভাবে করা যায়? ইউরোপের ছেলেরা বস্তা ঝুলিয়ে বাজারে গিয়ে বার্গার এনে খায়। অতঃপর স্কুলে দৌড়ায়। বর্তমানে আমাদের দেশের অভিজাত পরিবারেরও একই অবস্থা। এটা এমন এক ব্যবস্থা যে বাচ্চাকে হাতে নাস্তা তৈরি করে খাওয়াতে পারে না। (কেননা মা ছেলে মেয়েদের নাস্তা তৈরি করে খাওয়ালে নাস্তার মধ্যে মহব্বত মায়া মমতা আবেগ উদ্দীপনা স্নেহশীলতা ইত্যাদির স্পন্দন ও শিহরণ ছেলে মেয়েদের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে।) তবে উক্ত মা তার স্নেহবঞ্চিত ছেলে মেয়ে দ্বারা কিভাবে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সেবা ও উপকার আশা করতে পারে? যাই হোক, মায়ের দুধ বাচ্চাদের সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্যের জন্য বড় নিয়ামত। বর্তমানে তো রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদিও চিৎকার করে শুষ্ক দুধের অপকারিতা বর্ণনা করছে। মনে রাখবেন, সুস্থ ও সামর্থ্যবান মা আল্লাহর কুদরতে দুধ পান করান। হাজার হাজার মায়ের মধ্যে এমন আছে যে মাকে মহান আল্লাহ দুধ দেয় না বা কম দেয়? দুই একজনের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেও বাস্তবিক সে মাকে চিকিৎসা করালে সব কিছু ঠিক হয়ে যায়। এমতাবস্থায় অনেক মা নিজের ইচ্ছা মতো অথবা ডাক্তারের পরামর্শ মতে বাচ্চাকে দুধ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। বস্তুত এটাও একটি মারাত্মক ভুল। আবার অনেক সুশ্রী, রূপসী নিজের সৌন্দর্য ও রূপ লাবণ্য চলে যাওয়ার ভয়ে বাচ্চাদের দুধ দেয় না। তাই এ নিষ্ঠুরতা ও চালাকি প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা তাদের সীনার মধ্যে ক্যান্সার ঢুকিয়ে দেন।

প্রকৃতপক্ষে মায়ের উদর ও দুগ্ধপোষ্য শিশুর মধ্যে সুস্থতা, অসুস্থতা, দুর্বলতা বা রোগব্যাধি ইত্যাদির ভিত্তি থেকে যায়। শিশুদের স্বাস্থ্যরক্ষার ধারাবাহিকতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো তার বিশুদ্ধ খাদ্য। এতে অলসতা বা উদাসীনতা প্রকাশ করলে সারা জীবন ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। বাস্তবে জন্মলগ্নে মাটির কীট-পতঙ্গ ও আরও কয়েকটি প্রাণী ছাড়া মানব শিশু সবচেয়ে বেশি দুর্বল হয়। দুই একটি প্রাণী ছাড়া এই দুর্বলতা এত দীর্ঘ হয় যে, অন্যকোনো প্রাণী জন্মের পর তাদের দুর্বলতা দীর্ঘ হয় না। সুতরাং উক্ত সময়কালে এমন বিশুদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন যা কুদরতিভাবে স্বেচ্ছায় বাচ্চার দুর্বলতায় উপযুক্ত ও পরিমাণ মতো হবে এবং তার গ্রহণের ব্যবস্থাও হবে সুন্দর, মনোরম, অধিকতর সহজ বরং সীমাহীন দুর্বলতার সময় বিশুদ্ধ খাদ্য কুদরতির ব্যবস্থাপনায় বর্তমান থাকতে হবে। দুনিয়ায় যত খাদ্য আছে তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা দুধকে সবচেয়ে উপকারী, দুর্বলতায় শক্তিবর্ধক, স্বাস্থ্যসম্মত ও সহজপাচ্য হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। দুগ্ধদানকারী, সকল প্রাণীর দুধের মধ্যে বাচ্চার দৈহিক বৃদ্ধি ও গঠনের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় উপাদান ও উপকরণ উপযুক্ত পরিমাণে থাকে। এ বিষয়ে কারো মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। দুগ্ধ পানকালে মায়ের দুধ ছাড়া শিশুর জন্য আর কোনো উৎকৃষ্ট, উপযোগী ও বিশুদ্ধ খাদ্য নেই বরং হয় না। ভেড়া, বকরির বাচ্চার জন্য গাভী মহিষের দুধ ততটা উপযোগী নয় যতটা উপযোগী স্ব স্ব শ্রেণীর মায়ের দুধ।

অনুরূপ মানুষের বাচ্চার জন্য মায়ের দুধে শক্তি, উপকরণ, পরিমাণ ইত্যাদি ঠিকমত থাকে। অন্যকোনো দুধ এমনকি অন্যকোনো মহিলার স্তনের দুধেও তদনুরূপ থাকে না। প্রাণীর দুধে পানি, ঔষধ ইত্যাদি মিশিয়ে দুগ্ধ আমিষ থেকে কৃত্রিম দুধ তৈরি করা হয় তা মায়ের দুধের মতো হয়– এ কথা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। হাজারো চেষ্টা-গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, যতই করা হোকনা কেন কৃত্রিম দুধ মায়ের দুধের মতো হয় না, হতে পারেই না। এটা যদি সম্ভব হতো তবে আল্লাহ মায়ের স্তনের মধ্যে দুধ পয়দা করতেন না এবং ডিম দানকারী পাখির মতো মায়ের শরীরের পরিবর্তে পৃথকভাবে বাহ্যিক বা প্রাকৃতিক কোনো খাদ্যের দিকে বাচ্চাকে মুখাপেক্ষী করে দিতেন। মায়ের শরীরের সাথে শিশুর খাদ্যের সম্পর্ক করে দেওয়ায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, এর চেয়ে উৎকৃষ্ট মূল্যবান ও উপযোগী কোনো খাদ্য দুনিয়াতে বাচ্চাদের জন্য নেই। শিশু তার মায়ের শরীরের গোশত ও রক্ত থেকে গঠিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, বাস্তবে যেহেতু মায়ের শরীরের রক্তের কুদরতি রাসায়নিক পরিবর্তন ও সংযোগ প্রথমে ভ্রূণ ও পরে পূর্ণ আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তখন প্রাথমিক দুর্বলতার সময় চিকিৎসার দৃষ্টিতে দুধ শিশুর জন্য উপকারী ও সুবিধাজনক। অন্য মেয়ের দুধ থেকেও তা অতি উত্তম। যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে দুধ যেমন উপকারী ও উপযোগী তেমন নরম, সহজপাচ্য এবং তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয়। সুঘ্রাণ জাতীয় খাদ্য উহার সাথে রাখলে উহা সঙ্গে সঙ্গে ফলোৎপাদক হয়। স্বাস্থ্য রক্ষায় পারদর্শী ব্যক্তিরা বলে যে, স্তন থেকে দুধ বের হওয়ার সাথে সাথে বাইরের পরিবেশ দ্বারা প্রতিক্রিয়াশীল হতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর মাত্র এক বর্গ ইঞ্চির মধ্যে ছয় লক্ষ জীবাণু সৃষ্টি হয়। আগুনে জালালে উক্ত জীবাণু নষ্ট হয় বটে, কিন্তু ঠাণ্ডা হলে আবার জীবাণু পয়দা হতে শুরু করে।

বোম্বে শহরে এক বাজারের দুধ একাধিকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছিল। এতেও অনেক রোগ জীবাণু পাওয়া যায়। প্রত্যেক বড় শহরে বাজারের দুধের একই অবস্থা। কুরআন মাজীদে দুধের কোমলতা, সুস্বাদ ও উৎকৃষ্টতা সম্পর্কে কয়েকটি আয়াত আছে। ইসলামি শরিয়তের কাণ্ডারী হযরত রাসূলে কারীম (সা.)-ও দুধের কোমলতা ও বাইরের পরিবেশে প্রভাবিত হওয়া সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত ছিলেন। একবার তিনি বলেন, দুধ গরম করো যদিও এক টুকরা কাঠ দ্বারা জ্বালাতে হয়। স্তন থেকে বের হলেই দুধের ওপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব আরম্ভ হয়ে যায়। স্তনের ভিতরের দুধ ও স্তনদ্বয় হতে সদ্য নির্গত দুধের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। এমনকি উভয়ের স্বাদ গন্ধ প্রভাব সতেজতা সব মিলিয়ে লাখো প্রকার পার্থক্য বিদ্যমান থাকে। তাই স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি মতে প্রাণীর দুধ যদি স্তন বা বোটায় মুখ দিয়ে পান করানো হয় তবে তা অতি উত্তম পন্থা। সরাসরি পানকৃত দুধ সংরক্ষিত নিরাপদ ও সতেজ হওয়ার কারণে খুব উপকারী।

পাঞ্জাবেরও কোনো কোনো অঞ্চলে এরূপ সঠিক পন্থায় গাভী মহিষ ইত্যাদির দুধ পান করানোর প্রথা প্রচলিত আছে। এভাবে পানকৃত বাচ্চা বেশ স্বাস্থ্যবান সুস্থ ও শক্তিশালী হয়। কোনো কোনো গ্রাম্য অভিজ্ঞ লোক সাধারণত শারীরিক দুর্বলতা ও কতিপয় রোগের চিকিৎসায় উক্ত পন্থায় দুধ পান করতে বলে। ক্ষয় জ্বরের চিকিৎসায় উল্লেখ করা হয় যে, মহিষের দুধ এর বোটা থেকে মুখ দ্বারা পান করবে। তদনুরূপ মানব শিশুর জন্য মায়ের স্তন থেকে মুখ দিয়ে দুধ পান করা অন্যান্য প্রাণীর নির্গত দুধও প্রাকৃতিক পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত দুধ থেকে বেশি উত্তম এবং বলকারক। মানুষের দুধের সাথে মিশ্রিত দুধ চিকিৎসক গবেষণায় যে অবগত তাঁর দৃষ্টিতে উহা সাধারণ দুধ, এ ছাড়াও যখন আল্লাহর কুদরত বাচ্চাদের কাছেই সর্বোৎকৃষ্ট ও সুবিধা মতো দুধের ঝরনা প্রবাহিত করে দিয়েছে, তখন কোনো কারণ বা প্রয়োজন ছাড়া অন্যকোনো কৃত্রিম খাদ্যবস্তু অনুসন্ধান করা সুলভ কুদরতি নিয়ামতকে পদাঘাত (প্রত্যাখ্যান) করা এবং এর প্রতি বিরোধিতা করা বরং বাচ্চার স্বাস্থ্যের প্রতি অবিচার করার নামান্তর।

ইদানিং দুধভরা বক্স হাক ডাকের সাথে সরবরাহ করা হয়। কিন্তু নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, এসব ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে করা হয়। তারা প্রচার করে হাত না লাগিয়ে স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি মেনে চলে বিশেষ সতর্কতায় দুগ্ধ পোষ্য বাচ্চাদের উপযোগী ও নিরাপদ করে তৈরি করা হয়। যাই হোক না কেন আমরা পঞ্চইন্দ্রিয়, কুদরতী অবস্থাকে কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও প্রত্যাখ্যান করতে পারি? তদ্রূপ টিনজাত মাছ, তরি-তরকারি, ফল-ফলাদি ইত্যাদি খুব প্রশংসা করা হয় ও ঢাক-ঢোল পেটানো হয়। অথচ আমাদের দেশে এসব টাটকা পাওয়া যায়। সুতরাং সাধারণভাবে এসব পছন্দ করা হয় না। এ জাতীয় মাছ গোশত ইত্যাদি দস্তরখানে পরিবেশিত হলে গন্ধে আমাদের অনেকের জীবন বের হতে চায়, অনেকে খুব বমি করে। মূলত এ থেকে এক রকম দুর্গন্ধ বের হয়, যা আমরা সহ্য করতে পারি না। কিন্তু পরন্ত আমাদের অনুভূতি আসে না। ডেনমার্ক ও হল্যান্ডের টিনজাত পনির যখন কাটা হয় তখন কখনো কখনো পোকা-মাকড় বের হয়, কিন্তু তারপরও অনেকে খায়। পক্ষান্তরে যে সকল ডাক্তার ও চিকিৎসক ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন না তারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বলেন যে, এ জাতীয় টিনজাত খাদ্য, দুধ, মাছ গোশত ফল ইত্যাদির পরিবর্তে টাটকা জিনিসপত্র সর্বাধিক উপকারী ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়। তারা এটাও বলেন যে, টিনজাত দ্রব্য অনেক সময় রোগ-ব্যাধি বিশেষ করে ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কুদরতী খাদ্য প্রত্যাখ্যান করায় বাচ্চার শক্তি বৃদ্ধি ও গঠনে কু-প্রতিক্রিয়া পড়ে। মোদ্দাকথা আমরা বলতে পারি, মায়ের দুধ পানকারী শিশুকে ভালভাবে লালন-পালন করলে অন্য দুধপানকারী বাচ্চা থেকে ক্ষয়জ্বর ইত্যাদি মারাত্মক রোগের শিকার অনেক কম হয়। এসব মাতৃদুগ্ধ পানকারী শিশুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধি বিনাশ করার শক্তি মওজুদ থাকে। কতিপয় অভিজ্ঞ মাতা বলেন যে, মায়ের দুধ ত্যাগ করলে বাচ্চার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়া ছাড়া আরও একটি ঘাটতি শূন্যতা সৃষ্টি হয়, তা হলো মায়ের সাথে সংযোগ ও সম্পৃক্ততা অনেক কম হয় এবং মাতাপিতার স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য স্বল্পই পায়। মায়ের দুধ ত্যাগ করার অপর একটি বড় অর্থনৈতিক ক্ষতি হলো, বাচ্চার স্বাস্থ্যতে হুমকির সম্মুখীন হয়। এমতাবস্থায় দরিদ্র ও মধ্যবৃত্ত শ্রেণীর পরিবারে দুদ্ধপোষ্য বাচ্চার জন্য সুখে-দুঃখে সর্বদা বিশুদ্ধ ভাল দুধ সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্ম ও শীত প্রধান দেশে যেখানে দুধ ২/১ ঘণ্টাও নিরাপদ নিরাপদ থাকে না সেখানে বিষয়টি জটিল ও প্রকট আকার ধারণ করে।

আল্লাহ তা'আলা মায়ের শারীরিক গঠনকে এমনভাবে তৈরি করেছেন যে, সে নিজে যে কোনো খাদ্য পরিবারের প্রথা ও সামর্থ্য মোতাবেক খেলেও এর এক অংশ তার শারীরিক শক্তি বজায় রাখার কাজে এবং আরেক অংশ বাচ্চার সুবিধামতো উপযোগী দুধ তৈরি করার কাজে ব্যয় হয়। সুতরাং কি দরকার আছে ঘরের খরচের খাত বৃদ্ধি করার। মায়ের পক্ষে অপরের দুধ সামলিয়ে রাখার কি দরকার। অপর পক্ষে কুদরতীভাবে প্রস্তুত প্রক্রিয়া থেকে উপকার না নিয়ে কি লাভ? সুতরাং মা চানাবুট, ডাল, ভাত, শুষ্ক রুটি ইত্যাদি যাই ভক্ষণ করুক না কেন দুধ দিতে থাকলে তাতে বাচ্চা কখনও অভুক্ত থাকবে না এবং মরবেও না। পক্ষান্তরে বিকল্প দুধ কখনও না পাওয়া গেলে নষ্ট দুধ পাওয়া গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে ইত্যাদির কারণে বাচ্চা না খেয়ে মরে অথবা রোগগ্রস্ত হয়ে যায়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে গরমে দুধ বিনষ্ট হয়ে যায় অজান্তে মা উহা বাচ্চাকে পান করান, ফলে বাচ্চা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। শীত প্রধান দেশসমূহে প্রতিবার দুধ পান করানোর সময় স্বল্প গরম করে পান করানোর প্রয়োজন হয়। গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে কোনো কোনো বিজ্ঞ চিকিৎসক ও নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ এ পরামর্শ দেয়। কিন্তু এটাতে মূলত দুনিয়ার অধিকাংশের সাধারণ জীবনের প্রতি ভ্রূপেক্ষ করা হয় না। ধনী লোকেরা তো এর ব্যবস্থা করতে পারবে কিন্তু যারা ভাত-রুটি খেতে পারে না তারা হাজার টাকার রেফ্রিজারেটর ক্রয় করবে কিভাবে? এখানেই শেষ নয় রেফ্রিজারেটরের মধ্যে গরম দুধ রাখলেও দ্রুত উহা নষ্ট হয়ে যায়। তবে তা ঠাণ্ডা করে বরফ দিয়ে রাখলে কাজে আসে। মাতৃদুগ্ধ পান না করলে দাঁতও দুর্বল হয়ে যায় পরবর্তীতে এ সকল লোক দাঁতের বিভিন্ন প্রকার জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়। এভাবে দাঁতের রোগ থেকে আরো রোগের উৎপত্তি হয় এবং কষ্ট ও দুর্ভোগ বৃদ্ধি পায়। যখন মাতৃ জঠরে (রেহেমে) নুতফা (বীর্য) স্থিতিশীল হয়ে যায় তখন থেকে নাড়ীর মাধ্যমে বাচ্চার খাদ্য শুরু হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ভেতরে ভেতরে নয় মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ সময় বাচ্চা যে খাদ্য খায় তা মায়ের শরীরের একটি অংশ থেকে হয়। সুতরাং ভূমিষ্ঠ হতেই তাকে বিকল্প খাদ্য দিলে নিশ্চয়ই স্বাস্থ্যের ওপর মন্দ প্রতিক্রিয়া পড়ে। এ সময় বাচ্চাতো খুবই পাতলা ও দুর্বল হয়। একজন সুস্থ যুবক ব্যক্তিকেও তো তার অভ্যস্ত খাদ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে দিলে সেও অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত হয়ে যাবে।

১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। তখন এখানকার লোকেরা চির অভ্যস্ত ভাতের পরিবর্তে বাধ্য হয়ে সকাল সন্ধ্যা রুটি খায়। ফল এই হয় যে, আমাশয় এবং অন্যান্য মারাত্মক রোগ মহামারী আকার ধারণ করে ফলে লাখো লোক মারা যায়। বর্তমান কাল এমন যে, জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকারের জন্য কোনো না কোনো দেশ অপর দেশের কাছে মুখাপেক্ষী ও নির্ভরশীল হয়। এক দেশ তার তরকারি, শাক-সব্জি, ফল-ফলাদি ইত্যাদি উৎপাদন করে নিজেদের প্রয়োজন পূর্ণ করে অতিরিক্ত জিনিস বিদেশে রফতানি করে। আবার সে দেশ গোশত, কলকব্জা ইত্যাদির জন্য আরেক দেশের কাছে হাত পাতে। ইদানিং আন্তর্জাতিক সংযোগ, সম্পর্ক ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় থাকলে বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত উন্নত ও সহজতর যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্য-সামগ্রী ও জীবন ধারণের যাবতীয় উপকরণ অতিদ্রুত আদান-প্রদান করা

যায়। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধে ইউরোপ ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে দুধ, গোশত ইত্যাদি আমদানি করতো। কারণ তারা বিত্তশালী জার্মান অবরোধের কঠিন সমস্যায় ফেঁসে গিয়েছিল। হাজারও অসহায় মায়েরা ক্ষুধায় কাতর হয়ে যেতো। দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদেরকে কোলে করে প্লেট হাতে নিয়ে কঠিন ঠাণ্ডা বৃষ্টি বা তুষার পাতের মধ্যে সারিবদ্ধ হয়ে দুধের কোটার সম্মুখে দৈনিক দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত। কিন্তু এ সমস্যা আরও মারাত্মক আকার ধারণ করে যখন পরিবহণ মাধ্যম তথা রেল, বাস সার্ভিস, নৌ জাহাজ ইত্যাদির শ্রমিকরা ব্যাপকভাবে হরতালের ডাক দেয়, শত্রুদের অবরোধে বিদেশী আমদানিও সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। দেশের অভ্যন্তরীণ হরতালের কারণে কেবল আমদানি বন্ধ হয়নি বরং দেশীয় পণ্য সামগ্রীও একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছার বিন্দুমাত্র সম্ভবপর ছিল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে বর্তমান পর্যন্ত ছোট বড় সকল দেশ অনুরূপ হরতালের কবলে পড়ে। লন্ডন, নিউইয়র্কে এমতাবস্থায় দুধের সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লাখ লাখ বাচ্চা ক্ষুধার কষ্টে কাতরাতে থাকে। অথচ দুধ এমন নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা অগ্রগণ্য ও প্রাধান্য রাখে। বর্তমানে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার হয়েছে এবং দিনের পর দিন এক্ষেত্রে বিশ্ব উন্নতির চরম স্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। গত বিশ্বযুদ্ধে ডেনমার্ক, হল্যাণ্ডের মতো ছোট ছোট দেশ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বিজিত হয়। কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া আমেরিকার মতো বিরাট পরাশক্তি সম্পন্ন দেশের অস্তিত্ব এক পর্যায়ে শেষ হয়ে যাবে। তাদের রাষ্ট্রীয় শান্তি-শৃঙ্খলা ধ্বংস হয়ে যাবে। না খাদ্য-সমাগ্রী থাকবে, না জীবন উপকরণ দুধের কৌটা ও কৌটার মালিক উৎপাদন করা (জীবিত) থাকবে। জীবিত মায়েরা কলিজার টুকরা দুগ্ধপোষ্য বাচ্চাদেরকে ক্ষুধার কষ্টে কাতরাতে দেখে একেবারে বেহুঁশ হয়ে যাবে এবং বাচ্চার জন্য কুদরতের পয়দাকৃত মিষ্টি ঝরর্নার (দুধের উৎস) বন্ধ করে কষ্টদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

ইউরোপীয় সভ্যতার ভক্ত এশিয়া ও আফ্রিকার (লোকেরাও পাশ্চাত্য দেশের ব্যবসায়ীদের ব্যাপক প্রোপাগান্ডায় প্রভাবিত হয়ে কুদরতী খাদ্য (দুধ) ত্যাগ করে আমদানিকৃত টিনজাত দুগ্ধ বাচ্চাদের পান করানো আরম্ভ করে দিয়েছে এবং অহেতুক কষ্ট-ভোগান্তি ও সমস্যা মাথায় তুলে নিয়েছে। নিঃসন্দেহে প্রাচীনকালে সামর্থ্যবান লোকেরা বাচ্চাকে কিছুদিন মাতৃদুগ্ধ পান করানোর পর তাকে অন্য মায়ের দুধ পান করিয়ে বাঁচিয়ে রাখতো। পক্ষান্তরে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা সর্বদা মায়ের দুধই পান করাতো। বাচ্চার মা ইন্তেকাল করলে বা অসুস্থ হলে অন্য মহিলার দুধ পান করানোর পরিবর্তে কোনো প্রাণী গাভী বা বকরির দুধ পান করাতো। অবশ্য তখন মায়ের দুধ পান করানোর পরিবর্তে সর্বক্ষণ অন্য মহিলার দুধ পান করানোকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। কিন্তু আজকের বিশ্বে প্রথম দিন থেকেই কোনো কারণ ও প্রয়োজন ছাড়া টিনজাত কৌটার দুধ পান করানো শুরু করে দেওয়া হয়। অনেকে এও দাবি করে যে, বাচ্চাকে দুধ পান করালে মায়ের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। আল্লাহর কুদরত কি এ বিষয় অবগত ছিল না? তিনি তবে শরীরে অহেতুক এ ব্যবস্থাপনা কেন পয়দা করে দিলেন? লক্ষণীয় যে, মানুষের শরীরের কোনো অঙ্গের, কোনো বিন্যাস, কোনো গঠন ইত্যাদি বিনা কারণে অহেতুক সৃষ্টি করা হয়নি। কোনো অঙ্গ অকেজো হলে তার প্রভাব অন্য অঙ্গের ওপর পড়ে। যেমন– কিছু হিন্দু সন্ন্যাসী নিজের বাহুকে খাড়া রেখে শুষ্ক করে পূর্ণরূপে বেকার অকেজো করে দিতো। ফলে উহার প্রভাব শরীরের সাধারণ স্বাস্থ্য ও শক্তির ওপর পড়তো। তদ্রূপ কুদরতের প্রবাহকৃত দুধের স্রোত ধারা বন্ধ করে দিলে স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব না পড়ে পারে না। কোনো রমণী এ নিয়ামতকে প্রত্যাখ্যান করে যদি লম্বা ও চওড়া থাকতে চায় তবে তা কেবল মাত্র ৩/৪ বছর। অতঃপর সে ঢিলে ঢালা হতে শুরু করে। যার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় না (নিঃসন্তান) সেও তো একদিন তারুণ্য হারিয়ে বসে। অনুরূপ কৃত্রিম উপায়ে বন্ধ্যাত্ব গ্রহণকারিণী মহিলা বার্ধক্যের যৌবনের মোহনীয় রূপ-লাবণ্য ও স্বাস্থ্য হারায়। উল্লিখিত সাধারণ অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় মধ্যম পন্থায় জীবন যাপনকারী এবং বাচ্চাকে দুধ পানকারিণী মায়েদের জীবন দীর্ঘস্থায়ী ও স্বাস্থ্যসম্মত হয়। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্‌র ইলমের মধ্যে সমস্ত যুগে মানুষের মধ্যে যে সব সমস্যা, বিপদাপদ ও জটিলতা আসবে তা ভালভাবেই আছে। নিজের সুদৃঢ় কিতাব কুরআনের মধ্যে এরশাদ করেন, যা মানুষকে তার কষ্ট সহ্য করে ধারণ করে এবং কষ্টে প্রসব করে, কষ্টে প্রতিপালন করে এবং দুধপানের সময়কাল ত্রিশ মাস। (অর্থাৎ উক্ত সময়কাল ৩০ মাস) বাচ্চা মায়ের গোশত ও রক্ত দ্বারা প্রতিপালিত হয়। উহার মেয়াদ ৩০ মাস বা আড়াই বছর। গর্ভধারণের ৮/৯ মাস সময় এবং সব মিলিয়ে আনুমানিক ২ বছর হয়।) যেমন– অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেন, "মায়েরা স্বীয় বাচ্চাদেরকে দুই বছর পর্যন্ত দুধপান করাবে।" উক্ত সময়কালের মধ্যে বা পরে বাচ্চা অন্যান্য খাদ্য খাওয়া শুরু করে দেয়। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কুরআনী শিক্ষার ওপর আমল করলে অনেক পারিবারিক বিষয় যেমন–অর্থনীতি ও অন্যান্য সমস্যা সমাধান হয় এবং বাচ্চা কুদরতি খাদ্য খেয়ে প্রতিপালিত হয়ে স্বাস্থ্যসম্মত জীবন যাপন করে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে দুগ্ধপোষ্য বাচ্চার বিকল্প দুগ্ধের পরিবর্তে যদি মায়ের দুধপান করানো হয় তবে মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর ভাল প্রভাব পড়ে। অপর পক্ষে বাচ্চাও প্রাকৃতিক বা বাইরে দুধের বিষাক্ত প্রভাব থেকে নিরাপদ থাকে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে সকল বিশেষজ্ঞগণ টিনজাত দুধকে 'সাদা বিষ' নামে অভিহিত করে থাকেন।

قَلِيْلُ الرِّضَاعِ وَكَثِيْرُهُ اِذَا حَصَلَ فِىْ مُدَّةِ الرِّضَاعِ تَعَلَّقَ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَمُدَّةُ الرِّضَاعِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا وَعِنْدَهُمَا سَنَتَانِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ স্তনের দুগ্ধ চাই স্বল্প পরিমাণে পান অথবা অধিক পরিমাণে পান করুক যদি এটা رضاعت (রেজাআত)-এর সময়সীমার মধ্যে অর্জিত হয় তাহলে এই দুগ্ধ পানের দ্বারা 'হুরমত' সাব্যস্ত হবে। রেজায়াতের মুদ্দত তথা সময়সীমা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ত্রিশ মাস এবং সাহেবাইন-এর নিকট দু'বৎসর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দুধের পরিমাণ ঃ

قَوْلُهُ قَلِيْلُ الرِّضَاعِ الخ ঃ حُرْمَتِ رِضَاعْ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দুধ কম বা বেশি পান করা সমান, অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রকাশ করেন। ইমাম শাফেয়ী এবং আহমদ (র.) বলেন যে, পাচঁবার স্তন চুম্বন করা ব্যতিরেকে رِضَاعَتْ সাব্যস্ত হবে না। কেননা হুযুর (সা.) এরশাদ করেছেন যে দু' একবার স্তন চোষণের দরুন حُرْمَتِ رِضَاعَتْ সাব্যস্ত হয় না।

আমাদের দলিল তথা প্রমাণ হলো যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, وَاُمَّهَاتُكُمُ اللّٰتِىْ اَرْضَعْنَكُمْ এবং হুযুর (সা.) -এর বাণী- يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ দ্বয়ের মধ্যে কোনো বিশ্লেষণ নেই আর كِتَابُ اللّٰهِ কর্তৃক خَبَرِ وَاحِدْ -এর ওপর বৃদ্ধি করণ জায়েজ নেই।

ইমাম শাফেয়ী প্রদত্ত হাদীসের জবাব ঃ

ইমাম শাফেয়ী (র.) যে হাদীস দ্বারা প্রমাণ দিয়েছেন উহা مَنْسُوْخْ হয়ে গেছে, যার نَسْخْ হওয়াটা اِبْنِ عَبَّاسْ (রা.)-এর বর্ণনা থেকে প্রকাশ পায় যে, কোনো এক ব্যক্তি (رض) اِبْنِ عَبَّاسْ কে প্রশ্ন করল– যে, স্তনে একবার চোষণের ফলে তো رِضَاعَتْ হয় না। তিনি উত্তর দিলেন এটা প্রাথমিক যুগে ছিল, এরপর مَنْسُوْخْ হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَمُدَّةُ الرِّضَاعِ الخ ঃ رِضَاعَتْ-এর সময়সীমার ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য ঃ مُدَّتِ رِضَاعَتْ কতকাল এ ব্যাপারে ইমামগণের কঠিন মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মতানুসারে رِضَاعَتْ-এর সময়কাল আড়াই বৎসর। صَاحِبَيْن এবং اِمَامْ شَافِعِىْ (র.)-এর মত অনুযায়ী দু'বৎসর এবং কোনো কোনো ইমাম পনেরো বৎসর এবং কারো কারো অন্যান্য মতও আছে।

صَاحِبَيْن -এর দলিল ঃ (১) আল্লাহ তা'আলার বাণী وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا -এর মধ্যে حَمْل এবং فِصَالْ দু'টোর مُدَّتْ ত্রিশ মাস নির্ধারণ করা হয়েছে আর حَمْل-এর নিম্ন مُدَّتْ হচ্ছে ছয়মাস। সুতরাং فِصَالْ-এর জন্য দু' বৎসর অবশিষ্ট রয়েছে।

(২) دَارِقُطْنِىْ কর্তৃক হযরত اِبْنِ عَبَّاسْ (রা.) হতে مَرْفُوْعًا এবং مَوْقُوْفًا আর হযরত عُمَر (রা.) হতে مَوْقُوْفًا বর্ণনা করেন যে, তারা বলেন, দু' বৎসরের পর কোনো رِضَاعَتْ নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল ঃ

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রমাণ ও ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর দলিলে উপস্থাপিত আয়াত وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ الخ কিন্তু প্রমাণ পদ্ধতি হলো ভিন্নরূপ। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা উক্ত আয়াতের মধ্যে দু' জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন এবং বস্তুত উভয়টির জন্য সময় নির্ধারণ করেছেন। সুতরাং এ مُدَّتْ বস্তুদ্বয়ের মাঝে প্রত্যেকটার জন্য পুরোপুরী ভাবে অর্পিত হবে। সুতরাং مُدَّتِ رِضَاعَتْ এবং مُدَّتِ حَمْل উভয়টি আড়াই বৎসর করে হবে। কিন্তু مُدَّتِ حَمْل কম হওয়ার ব্যাপার হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর মুদ্দতে رِضَاعَتْ -এর কম হওয়া ثَابِتْ নেই। অতএব তার مُدَّتْ পূর্ণ আড়াই বৎসর রয়ে গেছে।

وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةُ الرِّضَاعِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِالرِّضَاعِ التَّحْرِيْمُ وَيَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ الرِّضَاعِ فَإِنَّهُ يَجُوْزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ النَّسَبِ. وَأُخْتُ إِبْنِهِ مِنَ الرِّضَاعِ يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَ إِبْنِهِ مِنَ النَّسَبِ وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِمْرَأَةَ إِبْنِهِ مِنَ الرِّضَاعِ كَمَا لَا يَجُوْزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِمْرَأَةَ إِبْنِهِ مِنَ النَّسَبِ وَلَبَنُ الْفَحْلِ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ.

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি رِضَاعَتْ-এর সময় অতিবাহিত হয়ে যায় তাহলে দুধপান করার দ্বারা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে না। رِضَاعَتْ রেজায়াত-এর দ্বারা ঐ সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম হয়ে যায় যেগুলো نَسَبْ তথা বংশের কারণে হারাম হয়ে যায়। কিন্তু رِضَاعِىْ বোনের মা ব্যতীত। কেননা رِضَاعِىْ বোনের মাকে বিবাহ করা জায়েজ আছে কিন্তু نَسَبِىْ বোনের মাকে বিবাহ করা জায়েজ নেই। رِضَاعِىْ ছেলের বোন ব্যতীত, কেননা তাকে বিবাহ করার অনুমতি আছে। কিন্তু نَسَبِىْ ছেলের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ নেই এবং رِضَاعِىْ ছেলের স্ত্রীকেও বিবাহ করার অনুমতি নেই যেরূপভাবে স্বীয় সন্তানের স্ত্রীকে বিবাহ করার অনুমতি নেই। দুগ্ধ পান করার দ্বারা পুরুষের সাথেও حُرْمَتْ সংযোজিত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رِضَاعِىْ বোনের মা হারাম না হওয়ার কারণ ঃ

قَوْلُهُ إِلَّا أُمَّ أُخْتِهِ مِنَ الرِّضَاعَةِ ঃ উপরোক্ত إِسْتِثْنَاء مُنْقَطِعْ কে إِسْتِثْنَاء বলা হয়। কেননা رِضَاعِىْ বোনের মা مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর رِضَاعِىْ বোনের মাঝে বিবাহ করা হারাম না হওয়ার কারণ। যেহেতু نَسَبْ এর প্রেক্ষাপটে نَسَبِىْ বোনের মা হয়তো নিজের মা হবে অথবা বাপের শয্যাসঙ্গিনী হবে, এ জন্য হারাম বলা হয়েছে, আর رِضَاعِىْ বোনের মা যেহেতু নিজের মাও না এবং স্বীয় পিতার সাথেও কোনো সম্পর্ক নেই এ কারণে হারাম বলা হয়নি।

لَبَنُ الْفَحْلِ-এর তাৎপর্য ঃ

لَبَنُ الْفَحْلِ -এর অর্থ হলো ঐ দুধ যা কোনো পুরুষের সঙ্গমের দরুন মহিলার স্তনে সৃষ্টি হয়। لَبَنُ الْفَحْلِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যদি কোনো মহিলা কোনো মেয়েকে দুধ পান করায় তাহলে ঐ মেয়ে মহিলার স্বামীর ওপর এবং স্বামীর পিতা, দাদা ও সন্তানাদির ওপর হারাম হয়ে যাবে।

وَهُوَ اَنْ تَرْضِعَ الْمَرْأَةُ صَبِيَّةً فَتَحْرُمُ هٰذِهِ الصَّبِيَّةُ عَلٰى زَوْجِهَا وَعَلٰى اٰبَائِهِ وَاَبْنَائِهِ وَيَصِيْرُ الزَّوْجُ الَّذِىْ نَزَلَ بِهَا مِنْهُ اللَّبَنُ اَبًا لِلْمُرْضَعَةِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِاُخْتِ اَخِيْهِ مِنَ الرِّضَاعِ كَمَا يَجُوْزُ اَنْ يَّتَزَوَّجَ بِاُخْتِ اَخِيْهِ مِنَ النَّسَبِ وَ ذٰلِكَ مِثْلُ الْاَخِ مِنَ الْاَبِ اِذَا كَانَ لَهٗ اُخْتٌ مِنْ اُمِّهٖ جَازَ لِاَخِيْهِ مِنْ اَبِيْهِ اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا عَلٰى ثَدْيٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجُزْ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يَّتَزَوَّجَ الْاٰخَرَ وَلَايَجُوْزُ اَنْ تَتَزَوَّجَ الْمُرْضِعَةُ اَحَدًا مِنْ وَلَدِ الَّتِىْ اَرْضَعَتْ وَلَايَتَزَوَّجُ الصَّبِىُّ الْمُرْضَعُ اُخْتَ زَوْجِ الْمُرْضِعَةِ لِاَنَّهَا عَمَّتُهٗ مِنَ الرِّضَاعِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর তা হলো, যে মহিলা কোনো মেয়ে সন্তানকে দুধ পান করায়, তাহলে ঐ সন্তান সে মহিলার স্বামীর ওপর হারাম হয়ে যাবে এবং স্বামীর পিতা এবং সন্তানাদির ওপর হারাম হয়ে যাবে। আর ঐ স্বামী, যার অছিলায় মহিলার স্তনে দুধের আবির্ভাব হয়েছে সে দুগ্ধপানকারী বাচ্চার পিতা হয়ে যাবে। আর এটা জায়েজ আছে, যে মানুষ তার رِضَاعِىْ ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করবে যেরূপ نَسَبِىْ ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ আছে। نَسَبِىْ ভাইয়ের বোনকে বিবাহ করা জায়েজ। তার উপমা হলো, যে এক বাপ শরিক ভাই আছে (অর্থাৎ যাদের বাপ একজন কিন্তু মা দু'জন) এবং তার মা শরিক একটা বোন আছে (অর্থাৎ ছেলে মেয়ে দু'জনের মা একজন কিন্তু ছেলের বাপ একজন এবং মেয়ের বাপ আরেকজন, অর্থাৎ মায়ের আগের ঘরের) তাহলে বাপ শরিক ভাইয়ের জন্য ঐ বোনকে শাদী করার অনুমতি আছে। আর যে দু'সন্তান একই মায়ের স্তন থেকে দুধ পান করেছে তাদের উভয়ে একে অন্যকে বিবাহ করা বৈধ নয় এবং দুগ্ধ পানকারীর বিবাহ ঐ মহিলার সন্তানদের সাথে বৈধ নয়, যে তাকে দুধ পান করিয়েছে। আর দুগ্ধ পানকারীর জন্য, যে মহিলা তাকে দুধ পান করিয়েছে তার স্বামীর বোনকে বিবাহ করা জায়েজ নেই। কেননা এটা তার رضاعى ফুফু।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দু' সন্তান কর্তৃক এক মহিলার দুগ্ধ পান করা ঃ

قَوْلُهٗ وَكُلُّ صَبِيَّيْنِ اجْتَمَعَا ঃ যদি দুই ছেলে মেয়ে এক মহিলার স্তন থেকে দুধ পান করে, তবে তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বৈধ হওয়ার কোনো পন্থা নেই। কেননা যদি দুই সন্তানের পানীয় দুধ দুই স্বামীর অছিলায় স্তনে আসে, তাহলে তারা উভয়ে পরস্পর মা শরিক ভাই, আর যদি এক স্বামীর অছিলায় হয়, তাহলে তারা মাতাপিতা উভয় শরিক ভাই বোন। সুতরাং কোনো অবস্থাতেই বিবাহের কোনো সুযোগ নেই।

মা কর্তৃক ছেলে বৌকে দুধ পান করানো ঃ মহিলার স্তন হতে আগে বা পরে অথবা কমবেশি পান করার দ্বারা حُرمتِ رِضاعت -এর মধ্যে কোনো প্রভাব ফেলবে না। শুধু مُدَّتِ رِضَاعَتْ-এর মধ্যে একই স্তন হওয়া অবশ্যকীয়। এর ওপর ভিত্তি করে মাসআলা হলো, যদি কোনো ব্যক্তি বাচ্চা মেয়েকে বিবাহ করল এবং স্বামীর মা ঐ মেয়েকে দুধ পান করিয়ে দিল, তাহলে স্বামীর ওপর ঐ মেয়ে হারাম হয়ে যাবে। কেননা ঐ মেয়ে এখন তার رِضَاعِىْ বোন হয়ে গেছে। আর যদি কোনো ব্যক্তি দু'টি বাচ্চা মেয়েকে বিবাহ করে অতঃপর কোনো মহিলা বাচ্চা দু'টিকে একসাথে অথবা একের পর এক দুধ পান করিয়ে দিল, তাহলে মেয়ে দু'টো পরস্পর বোন হয়ে যাবে। এর স্বামীর ওপর হারাম হয়ে যাবে এবং মেয়ে দু'টো হতে প্রত্যেকটি অর্ধেক মোহরের প্রাপ্য হবে। কেননা সঙ্গমের পূর্বে কোনো স্পর্শ ব্যতীত তারা আলাদা হয়ে গেছে। এখন যদি মহিলা অঘটনের উদ্দেশ্যে দুধ পান করায় তাহলে ঐ মহিলার ওপর মোহরের জরিমানা বর্তাবে। আর যদি না জেনে খাওয়ায় এবং অঘটনের উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে ঐ মহিলার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ وَاللَّبَنُ هُوَ الْغَالِبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ فَإِنْ غَلَبَ الْمَاءُ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالطَّعَامِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِنْ كَانَ اللَّبَنُ غَالِبًا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِذَا اخْتَلَطَ بِالدَّوَاءِ وَاللَّبَنُ غَالِبٌ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاُوْجِرَ بِهِ الصَّبِيُّ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِلَبَنِ شَاةٍ وَلَبَنُ الْمَرْأَةِ هُوَ الْغَالِبُ يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِنْ غَلَبَ لَبَنُ الشَّاةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيْمُ.

সরল অনুবাদ ঃ যদি দুধ আর পানি একত্রিত হয়ে যায় এবং দুধের পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে এটা দ্বারা حُرْمَتْ সম্পৃক্ত হবে। আর যদি পানির পরিমাণ বেশি হয় তাহলে এটা দ্বারা حُرْمَتِ رِضَاعَتْ সাব্যস্ত হবে না। আর যদি খাদ্যের সাথে মিশে যায়, তবে حُرْمَتْ হবে না, যদিও দুধের পরিমাণ বেশি হয়। এটা ইমাম আবূ হানীফার (র.) অভিমত। আর صَاحِبَيْن (র.)-এর নিকট এটা দ্বারা حُرْمَتْ সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি দুধ ঔষধের সাথে মিশ্রিত হয়ে যায় এবং দুধের পরিমাণ বেশি হয় তাহলে এটা দ্বারা حُرْمَتْ সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। আর যদি মহিলা মৃত্যুবরণ করার পর তার স্তন থেকে দুধ বাহির হয় এবং বাচ্চা তা পান করে, তাহলে এটা দ্বারা حُرْمَتْ সংঘটিত হয়ে যাবে। আর যদি মহিলার দুধ ছাগলের দুধের সাথে মিলে যায় এবং মহিলার দুধ বেশি হয় তাহলে حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে। আর যদি ছাগলের দুধ বেশি হয় তবে حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মিশ্রিত দুধের ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য ঃ

وَإِذَا اخْتَلَطَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ الخ ঃ ইমাম শাফিয়ী (র.) বলেন, যদি দুধ আর পানির সাথে মিশে যায় এবং তন্মধ্যে দুধের পরিমাণ যদি পাঁচ ঢোক হয় তাহলে এটা দ্বারা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে। কেননা এখানে حَقِيْقِيْ দুধ মওজুদ আছে (অর্থাৎ যতটুকু দুধের দ্বারা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হয়)

ইমাম আবূ হানীফার (র.) পক্ষ হতে উত্তর ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যদিও এখানে حَقِيْقِيْ দুধ মওজুদ আছে, এতদসত্ত্বেও حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে না। কেননা অধিকতর অপেক্ষা স্বল্প পরিমাণ বস্তু حُكْمًا না থাকার পর্যায়। যার দরুন অধিকের সম্মুখে স্বল্পতার প্রকাশও ঘটে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) উপমা স্বরূপ يَمِيْن -এর কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি যদি 'হলফ' তথা 'কসম' করে যে, দুধ পান করব না অতঃপর সে পানি মিশ্রিত দুধ পান করল যার মধ্যে পানির পরিমাণ বেশি। এটার দ্বারা তার কসম ভঙ্গ হবে না। যেহেতু এখানে পানির পরিমাণ বেশি। অতঃপর পানির পরিমাণ বেশি এ জাতীয় দুধ পান করার দ্বারা যেরূপ কসম ভঙ্গ হবে না। তদ্রূপ এটা পান করার দ্বারা حُرْمَتْ ও সাব্যস্ত হবে না।

খাদ্য মিশ্রিত দুধের ব্যাপারে মতানৈক্য ঃ দুধ মিশ্রিত খাদ্যকে যদি আগুনে পাকানো হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু যদি আগুনে দেওয়া না হয়, তার ব্যাপারে মাতনৈক্য দেখা দিয়েছে। সাহেবাই (র.) বলেন, যেন এটা দ্বারা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে।

সাহেবাইন-এর দলিল ঃ যেহেতু প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রে অধিক অংশকে গণ্য করা হয়, অতএব এখানেও অধিকাংশের গণ্য করা হবে। যেরূপ ভাবে পানির মাসআলার মধ্যে পানিকে যদি তার পূর্ব অবস্থা থেকে কোনো জিনিস পরিবর্তন না করে তাহলে তার দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যাবে। তদ্রূপ এখানে যেহেতু দুধের পরিমাণ বেশি সুতরাং এ দুধের দ্বারাও حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) দলিল ঃ আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে খাদ্যে মিশ্রিত দুধের দ্বারা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে না। চাই দুধের পরিমাণ বেশি হোক অথবা কম। কেননা খাদ্যদ্রব্যের মাঝে খাদ্য হলো মূলধাতু আর অন্যান্য জিনিস হচ্ছে তার সংমিশ্রণ। সুতরাং দুধ যত বেশি হোক তার মূল্যায়ন হবে না। কেননা এখানে খাদ্য হলো আসল।

মৃত্যুর পরে মহিলার স্তন থেকে দুধ পান করা ঃ

وَإِذَا حُلِبَ اللَّبَنُ مِنَ الْمَرْأَةِ بَعْدَ مَوْتِهَا الخ ঃ যদি কোনো ছেলে মহিলার মৃত্যুর পর স্তন থেকে দুধপান করে তাহলে ইমাম শাফয়ী (র.)-এর মত অনুসারে حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে না। কেননা حُرْمَتْ-এর মধ্যে আসল কারণ হলো মহিলা। কেননা তার মাধ্যমেই حُرْمَتْ টা অন্যের পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। আর মৃত্যুর পর তার মধ্যে حُرْمَتْ -এর কোনো মহল বাকি থাকে না। এ কারণেই মৃত মহিলার সাথে সঙ্গম করার দ্বারা حُرْمَتِ مُصَاهَرَه সাব্যস্ত হয় না।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতো বর্ণনা ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত অনুযায়ী মৃত মহিলার দুধ পান করার দ্বারা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে। কেননা حُرْمَتِ رِضَاعَتْ -এর কারণ হলো বাচ্চার শরীরের পরিবর্তন হওয়া, যেটা দুধের মধ্যে মওজুদ আছে, যেহেতু দুধের দ্বারা বাচ্চার অঙ্গে পরিবর্তন ঘটে; চাই এটা জীবিতের হোক বা মৃতের। আর حُرْمَتِ رِضَاعَتْ-এর সাথে حُرْمَتِ مُصَاهَرَتْ-এর তুলনা সঠিক না। কেননা সেখানে স্বয়ং সঙ্গম-এর দ্বারা جُزْئِيَّتْ-এর সম্ভাবনা থাকে, যা মৃত্যুর পরে বিনষ্ট হয়ে যায়।

وَإِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ امْرَأَتَيْنِ يَتَعَلَّقُ التَّحْرِيْمُ بِأَكْثَرِهِمَا عِنْدَ أَبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَتَعَلَّقُ بِهِمَا التَّحْرِيْمُ وَإِذَا نَزَلَ لِلْبِكْرِ لَبَنٌ فَأَرْضَعَتْ صَبِيًّا يَتَعَلَّقُ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِذَا نَزَلَ لِلرَّجُلِ لَبَنٌ فَأَرْضَعَ بِهِ صَبِيًّا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ التَّحْرِيْمُ وَإِذَا شَرِبَ صَبِيَّانِ مِنْ لَبَنِ شَاةٍ فَلَا رِضَاعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ صَغِيْرَةً وَكَبِيْرَةً فَأَرْضَعَتِ الْكَبِيْرَةُ الصَّغِيْرَةَ حَرُمَتَا عَلَى الزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِالْكَبِيْرَةِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَلِلصَّغِيْرَةِ نِصْفُ الْمَهْرِ وَيَرْجِعُ بِهِ الزَّوْجُ عَلَى الْكَبِيْرَةِ إِنْ كَانَتْ تَعَمَّدَتْ بِهِ الْفَسَادَ وَإِنْ لَمْ تَتَعَمَّدْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ الصَّغِيْرَةَ امْرَأَتُهُ وَلَا تُقْبَلُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مُنْفَرِدَاتٍ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি দুই মহিলার দুধ একত্রিত হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফের (র.) মতনুসারে যার দুধের পরিমাণ বেশি তার সাথে حُرْمَتْ সংযোজিত হবে, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, উভয় মহিলার সাথে حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে, যদি কুমারী তথা অবিবাহিতা মহিলার দুধ বের হয় এবং সেটা বাচ্চাকে পান করানো হয়, তবে حُرْمَتْ সম্পৃক্ত হয়ে যাবে। আর যদি কোনো পুরুষের দুধ হয় এবং সেটা ছোট বাচ্চাকে পান করায় তাহলে এটার দ্বারা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে না। আর যদি দুই শিশু এক ছাগলের দুধ পান করে, তাহলে উভয় বাচ্চার মধ্যে رِضَاعَتْ সাব্যস্ত হবে না। যদি কোনো ব্যক্তি একটি শিশু এবং একজন মহিলাকে বিবাহ করল, অতঃপর মহিলা শিশুটিকে দুধ পান করিয়ে দিল এমতবস্থায় উভয় মেয়ে স্বামীর ওপর নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে। এখন যদি বয়সপ্রাপ্ত মহিলার সাথে সঙ্গম না করে তবে সে কোনো মোহর প্রাপ্ত হবে না। এবং শিশু মেয়েকে অর্ধেক মোহর দেওয়া স্বামীর ওপর কর্তব্য। এখন যদি মহিলা বিবাহ বিচ্ছেদের উদ্দেশ্য দুধ পান করায়, তাহলে তার থেকে স্বামী অর্ধেক মোহর আদায় করে নেবে আর যদি সে এ ধরনের কুমতলব না করে তবে তার ওপর কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না। আর رِضَاعَتْ -এর মধ্যে শুধু মহিলার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং رِضَاعَتْ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুমারী মেয়ে কারা?

قَوْلُهُ وَإِذَا نَزَلَ بِالْبِكْرِ لَبَنٌ الخ ঃ উপরোক্ত মাসআলায় "بِكْر" তথা কুমারী দ্বারা নয় বা ততোধিক বয়সের মেয়েদের বুঝানো হয়েছে, যদি নয় বৎসর এর কম বয়সের মেয়েদের দুধ বের হয় এবং তা অন্য বাচ্চাকে পান করানো হয়, তাহলে حُرْمَتْ সাব্যস্ত হবে না।

স্ত্রী কর্তৃক সতীনকে দুধ পান করানো ঃ যদি কোনো ব্যক্তি প্রাপ্তবয়স্ক এবং শিশু মেয়েকে বিবাহ করে অতঃপর বড় মেয়ে ছোট মেয়েকে দুধ পান করিয়ে দেয়, তবে উভয়ে স্বামীর ওপর হারাম হয়ে যাবে। কেননা তারা উভয় رِضَاعِىْ মা-বেটি, অতএব তাদের সাথে সঙ্গম করা হারাম হবে।

ثُبُوْتِ رِضَاعَتْ -এর সাক্ষ্য নিয়ে মতানৈক্য ঃ

قَوْلُهُ وَلَا تُقْبَلُ فِى الرَّضَاعِ ঃ আমাদের মাযহাব মতে رِضَاعَتْ সাব্যস্ত হবে ঐ সব প্রমাণাদির দ্বারা, যা দ্বারা মা হওয়া সাব্যস্ত হয় অর্থাৎ দু'জন নীতিবান পুরুষ বা একজন সৎপুরুষ এবং দু'জন মহিলার সাক্ষ্য আবশ্যক। ইমাম মালেক (র.)-এর মতানুযায়ী শুধু একজন ন্যায়পরায়ণ মহিলার দ্বারা رِضَاعَتْ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

মালেক (র.)-এর দলিল ঃ কেননা حُرْمَتِ رِضَاعَتْ হচ্ছে শরয়ী বিধানাবলী সমূহের মধ্য হতে অন্যতম একটি বিধান। خَبَرِ وَاحِدْ বা কোনো ব্যক্তির একক সাক্ষ্যের দ্বারা এটা সব্যস্ত হয়ে যাবে। যেমন– কোনো ব্যক্তি গোশত ক্রয় করল অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তাকে খবর দিল যে, এটা বেদীন-এর জবাইকৃত, তখন তার জন্য এ গোশত খাওয়া বৈধ হবে না।

আহনাফের দলিল ঃ বিবাহের মধ্যে حُرْمَتْ সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে আধিপত্যও দূর হয়ে যায়। কেননা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হওয়ার সাথে সাথে বিবাহবন্ধন বৈধ থাকার কথা কখনো কল্পনাও করা যায় না। আর বিবাহ বাতিল হওয়াটা দু'জন নীতিবান পুরুষ বা একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলার সাক্ষ্য ছাড়া গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং حُرْمَتِ رِضَاعَتْ ও উক্ত সাক্ষ্য ছাড়া সাব্যস্ত হবে না। আর গোশতের মাসআলা হলো এর ব্যতিক্রম। কেননা গোশত খাওয়া হারাম হওয়া সত্ত্বেও সে তার মালিক হওয়া থেকে বঞ্চিত হয় না। যে রকমভাবে শরাব হারাম হওয়া সত্ত্বেও তার مِلْكِ يَمِيْن বাকি থাকে। (অথচ حُرْمَتِ رِضَاعَتْ সাব্যস্ত হলে স্ত্রীর ওপর স্বামীর কোনো অধিকার থাকবে না। এমনকি সে স্ত্রীর মালিক ও না।)

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) مَا مَعْنَى الرَّضَاعِ لُغَةً وَشَرْعًا؛ وَمَاهِىَ الْمُدَّةُ فِيْهِ؟ بَيِّنْ مَعَ بَيَانِ الْخِلَافِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ ـ

(٢) بَيِّنْ اَحْكَامَ حُرْمَةِ الرَّضَاعِ بِالتَّفْصِيْلِ ـ

(٣) كَيْفَ يَثْبُتُ الرَّضَاعُ ـ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ ـ

(٤) إِذَا اخْتَلَطَ لَبَنُ الْمَرْأَةِ بِالْمَاءِ اَوْ بِالطَّعَامِ اَوْ بِالدَّوَاءِ فَمَا حُكْمُهُ؟ وَمَا الْخِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ بَيِّنْ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا وَارْجِحُوا مَذْهَبَكُمُ الْمُخْتَارَ ـ

كِتَابُ الطَّلَاقِ

তালাক পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) বিবাহের জরুরি বিধানবলী ও বিবাহের পরের বিধানবলী তথা দুগ্ধপান সম্পর্কিত আলোচনা করার পর বিবাহ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করার বর্ণনা আরম্ভ করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, দুগ্ধপান পর্ব ও তালাক পর্ব উভয়টিই বিবাহের পরের বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত। গ্রন্থকার (র.) দুগ্ধপান পর্বকে তালাক পর্বের পূর্বে আনলেন কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে– দুগ্ধ পানের দ্বারা সদা-সর্বদা حُرْمَتْ সাব্যস্ত হয়, এটাতে বুঝা গেল দুগ্ধ পানের حُرْمَتْ -এর মধ্যে বেশি কঠোরতা বিদ্যমান, পক্ষান্তরে طَلَاقْ-এর حُرْمَتْ সাময়িক ও এটাতে দুগ্ধ পানের থেকে حُرْمَتْ-এর মধ্যে শিথিলতা বিদ্যমান; তাই তালাক পর্বকে দুগ্ধপান পর্বের পরে এনেছেন।

طَلَاقْ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ طَلَاقْ এটা تَطْلِيْق -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়; অর্থ- খুলে দেওয়া, ছেড়ে দেওয়া। যেমন- سَرَاحٌ এটা تَسْرِيْحٌ-এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

طَلَاقْ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ

শরিয়তের পরিভাষায় طَلَاقْ বলা হয়, নির্ধারিত শব্দাবলী দ্বারা বিবাহ বন্ধনকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া। কেউ কেউ طَلَاقْ-এর সংজ্ঞা বলেছেন– স্ত্রীর লজ্জাস্থান থেকে স্বামী কর্তৃক স্বীয় হককে বাতিল করা। কেউ কেউ طَلَاقْ-এর সংজ্ঞা এরূপ করেছেন, যে, طَلَاقْ বলা হয় বিবাহ বন্ধনকে খুলে দেওয়া।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে তালাক ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে পাকে এরশাদ করেছেন–

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا اِنْ ظَنَّا اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ .

অর্থ ঃ তারপর যদি সে স্ত্রীকে (তৃতীয় বার) তালাক দেয় তবে সে স্ত্রী যে পর্যন্ত তাকে ছাড়া অপর কোনো স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয় তার জন্য হালাল নয়। অতঃপর যদি দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তাদের উভয়ের জন্যই পরস্পরকে পুনরায় বিয়ে করাতে কোনো পাপ নেই যদি আল্লাহর হুকুম বজায় রাখার ইচ্ছা থাকে। আর এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা যারা উপলব্ধি করে তাদের জন্য আল্লাহ এগুলো বর্ণনা বর্ণনা করেন।

যুক্তির আলোকে তালাক বৈধ হওয়ার হিকমত ও রহস্য ঃ প্রকাশ থাকে যে, তালাক একটি আরবি শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ-খুলে দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় পুরুষ কর্তৃক নিজের স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধন হতে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার নাম তালাক। নিম্নোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝা যাবে। উল্লেখ্য যে, মুসলমানদের নিকট বিবাহ একটি অঙ্গীকার। এতে পুরুষের সাথে ইসলাম, মোহর, ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গ্রহণ ও সদাচরণের শর্ত থাকবে। আর স্ত্রীলোকদের জন্য ইসলাম, সতীত্ব, পবিত্রতা, সৎ স্বভাব ও আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি জরুরি শর্ত হিসাবে বিবেচিত হবে। যেভাবে অন্যান্য সকল অঙ্গীকার শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে বাতিল যোগ্য হয়ে যায়, তেমনি বিবাহের অঙ্গীকারেও শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ার পর বিবাহ বাতিলযোগ্য হয়ে পড়ে। তবে পার্থক্য এই যে, যদি পুরুষের পক্ষ হতে শর্ত লঙ্ঘিত হয় তবে স্ত্রী নিজে নিজে বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার রাখে না, যেমন নিজে নিজে বিবাহ করার ক্ষমতা তার নেই। বরং সমকালীন বিচারকের মাধ্যমে সে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারে। কিন্তু পুরুষ যেমন নিজের এখতিয়ারে বিবাহে অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে পারে, তেমনি স্ত্রীর পক্ষ হতে শর্ত লঙ্ঘিত হলে তালাক দেওয়ার ব্যাপারেও সে পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী। বস্তুত এই বিধান প্রকৃতিগত বিধানের সাথে সম্পৃক্ত ও সাদৃশ্যপূর্ণ। যেন এটা প্রকৃতিগত বিধানেরই একটি প্রতিবিম্ব মাত্র। কোননা, প্রকৃতিগত বিধান একথা স্বীকার করে নিয়েছে যে, যে কোনো অঙ্গীকারের স্থিরীকৃত শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ার দরুন উহা বাতিলযোগ্য হয়ে পড়ে। যদি দ্বিতীয় পক্ষ অঙ্গীকার বিলুপ্তির ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করে, তবে সে শর্ত লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে অঙ্গীকার ভঙ্গ করার যে অধিকার প্রতিপক্ষের

ছিল, তা না দিয়ে প্রতিপক্ষের প্রতি জুলুম ও অন্যায় আচরণ করবে। আমরা যদি বিবাহের মূল বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখি, তাহলে দেখতে পাব, এটা একটি পবিত্র অঙ্গীকারের শর্তাধীন দু'টি মানুষের জীবন যাপন করা বৈ আর কিছুই নয়। যে ব্যক্তি শর্ত লঙ্ঘন করবে, সে আদালতের দৃষ্টিতে অঙ্গীকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত অধিকার হতে বঞ্চিত হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে। এই বঞ্চনাকেই অন্য শব্দে তালাক নামে অভিহিত করা হয়। সুতরাং তালাকপ্রাপ্ত মহিলারা আচরণে তালাকদাতা পুরুষের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় অথবা কথাটা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, যদি কোনো মহিলা কারও স্ত্রী হয়ে নিজের কোনো কু-স্বভাবের দ্বারা বিবাহের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তা হলে সে এমন অঙ্গের মতো হয়ে গেল যা পঁচে-গলে গিয়েছে অথবা সে এমন দাঁতের মতো হলো যা পোকায় খেয়ে ফেলছে এবং উহার তীব্র ব্যথা সমস্ত দেহকে সর্বক্ষণ জর্জরিত করে রাখে। তাই এই দাঁত আর প্রকৃত দাঁত থাকে না। আর না সেই দূষিত অঙ্গ প্রকৃত অঙ্গ রইল। অতএব এই দাঁত উঠিয়ে ফেলা ও অঙ্গ কেটে ফেলে দেওয়ার মধ্যেই সুস্থতা নিহিত রয়েছে। এই কাজগুলো প্রকৃতির বিধানের সাথে সামঞ্জস্যশীল।

তালাকের রেজয়ী অর্থাৎ প্রত্যাহারযোগ্য তালাক দুই পর্যন্ত সীমিত হওয়ার রহস্য ঃ জাহিলিয়া যুগে লোকেরা যত ইচ্ছা 'তালাক' দিয়ে আবার স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহে রেখে দিত। স্পষ্টতই এতে স্ত্রীর প্রতি চরম জুলুম করা হতো। সুতরাং এই মর্মে আয়াত অবতীর্ণ হলো– الطلاق مرتان। অর্থাৎ এখন তালাক দু'টি দেওয়া যাবে। যার পর উহা প্রত্যাহার করে স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহে রাখা যাবে। অতঃপর তৃতীয় তালাক দেওয়া হলে যতক্ষণ এই স্ত্রী স্বেচ্ছায় দ্বিতীয় কোনো স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ববতী স্বামীর জন্য হালাল হবে না। নবী করীম (সা.) এই দ্বিতীয় বিবাহে স্বামীর সাথে সহবাসেরও শর্তারোপ করেছেন। সহবাসের শর্তারোপের দ্বারা অবশ্যই এটা উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার উদ্দেশ্যেই স্ত্রী দ্বিতীয় বিবাহ করবে, বরং বিবাহ আজীবনের জন্যই করবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি এখানেও তালাকপ্রাপ্ত হয়, তবে প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ জায়েজ হবে।

যে সব মূলনীতি অনুসরণের পর তালাক দেওয়ার অধিকার লাভ হয় ঃ মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই মূলনীতি গুলোর অনুসরণের জন্য মানুষকে হিদায়েত করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন –

وَالّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا- إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا- وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللّٰهُ بَيْنَهُمَا - إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا -

অর্থাৎ যে সকল মহিলার পক্ষ হতে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা করো, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো। এতে যদি বাধ্য হয়ে যায়, তবে পথ খুজিও না। নিশ্চয় আল্লাহ সবার ওপর শ্রেষ্ঠ। তার পরেও যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কচ্ছেদ হওয়ার পরিস্থিতিরই আশঙ্কা করো, তবে স্বামীর পরিবারের পক্ষ থেকে একজন এবং স্ত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে একজন শালিস নিযুক্ত করো। তারা মীমাংসার ইচ্ছা করলে আল্লাহ তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক কায়েম করে দেবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবকিছু অবহিত।

যুক্তির আলোকে তালাক তিন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ার রহস্য ও হিকমত ঃ তালাক তিন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ার রহস্য এই যে, এটা অধিক সংখ্যার প্রথম সীমা। তা ছাড়া তালাকের ব্যাপারে বুঝাপড়া ও চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন হয়। তিন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ার মধ্যে এই সময় ও সুযোগ পাওয়া যায়। কোননা, বহু লোক তালাকের ভালমন্দ দিকটি ততক্ষণ পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীর অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে স্ত্রী হারানোর স্বাদ গ্রহণ না করে। মূলত এক তালাকের দ্বারাই এই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়ে যায়, দ্বিতীয় তালাকে এই অভিজ্ঞতার পূর্ণতা হয়। তৃতীয় তালাকের পর অন্যত্র বিবাহের শর্ত আরোপ করা, পূর্ব বিবাহের সমাপ্তি ও নুতন বিবাহ সংঘটিত হওয়ার অর্থ প্রকাশের জন্য হয়ে থাকে। কোননা, দ্বিতীয় বিবাহ ব্যতীত যদি স্ত্রীকে স্বীয় বিবাহে রাখা দুরস্ত হতো, তবে উহাও রাজআতের মতোই হতো। কারণ তালাকপ্রাপ্তকে বিবাহ করাও এক প্রকার রাজআত। আর এই স্ত্রী যতক্ষণ স্বামীর বাড়িতে তার নিয়ন্ত্রণে ও তার আত্মীয়স্বজনদের নিকট অবস্থান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বামীর স্ত্রীর মতের ওপর প্রভাব বিস্তার করার সম্ভাবনা থাকে এবং স্ত্রী শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে সে মতই গ্রহণ করতে পারে, যার কল্যাণ সম্পর্কে স্বামীর আত্মীয়স্বজন তাকে বুঝাবে। পক্ষান্তরে স্ত্রী যদি স্বামীর প্রভাব ও তার আত্মীয়স্বজন হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে অবস্থান করে এবং সময়ের আবর্তন বিবর্তনের রথে চড়ে উহার ঝাল ও তিক্ততার স্বাদ ভোগ করে নেয় এবং এর পরও যদি সে তালাকদাতা লোকটির প্রতি যথেষ্ট আকৃষ্ট ও রাজি থাকে, মূলত তখনই উহা প্রকৃত রেযামন্দির পরিচায়ক হবে। তা ছাড়া তিন তালাকপ্রাপ্ত নারীর জন্য দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করার শর্ত দ্বারা তালাকদাতা

স্বামীকে স্ত্রীর বিচ্ছেদ বিরহের স্বাদ চাখানো এবং অপরিহার্য কোনো প্রয়োজন ব্যতীত আগাগোড়া চিন্তা-ভাবনা না করে তালাক দেওয়ার ব্যাপারে নফ্সের আনুগত্য করার শাস্তি প্রদান করা উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণের শর্ত আরোপের মাধ্যমে তিন তালাকপ্রাপ্ত নারীকে তালাকদাতার নিকট সম্মানিতারূপে সমাসীন করাও অন্যতম একটা লক্ষ্য এবং সেই সঙ্গে এটার দ্বারা তাকে ভর্ৎসনাও করা হয় যে, স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়ার দুঃসাহস সেই ব্যক্তিই করতে পারে, যে চরম ও অবর্ণনীয় অপমান ও অনুশোচনা ব্যতীত নিজেকে এই নারীর আশা পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ও স্থির করে নিতে পারে।

তালাকই একমাত্র মুক্তির পথ নয়, বরং এটা অনন্যোপায়ের শেষ হাতিয়ার ঃ এটা সম্ভব যে, মানুষ হিসাবে কোনো নারীর মাঝে পাওয়া যেতে পারে কিছু অপছন্দনীয় বিষয়। কিন্তু এর প্রতিকারের পথ তালাক নয়। ইসলাম চায় স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের ছোটখাটো খুঁতগুলোকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখুক এবং সুন্দর ও স্বস্তিপূর্ণ দাম্পত্য জীবন যাপন করুক। এক্ষেত্রে ইসলাম নারীর সাধারণ ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করার সুপারিশ করে। নবী করীম (সা.) তুলনামূলক উদাহরণের মাধ্যমে নারীপক্ষ সমর্থন করে বলেছেন– "নারী পাঁজরের হাড়ের মতো বাঁকা, যদি তোমরা তাকে সোজা করতে যাও তাহলে তা ভেঙে যাবে। আর যদি তাকে তার অবস্থায় ছেড়ে দাও তাহলে তাদের বক্রতা সত্ত্বেও তোমরা তাদের কাছ থেকে উপকৃত হতে পারবে।"

উক্ত হাদীসের শেষাংশের প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথা সহজেই বুঝা যায় যে, এতে পুরুষকে নারীর সাধারণ ভুল-ভ্রান্তির প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দেবার কথা বলা হয়েছে। সর্বোপরি ক্ষমা ঔদার্যই যে মহৎ ও সুখী জীবনের চাবিকাঠি, তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ হাদীস থেকে এ কথাও প্রমাণিত হচ্ছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের পরিবর্তে নারীদের ওপর ক্রোধ প্রকাশ করতে থাকো, তাহলে দাম্পত্য জীবন তিক্ত বিষাক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু নারীর প্রতি এই সহানুভূতি প্রদর্শনের অর্থ এটা নয় যে, ইসলাম নারীকে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কিংবা নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত আচার-আচরণের সুযোগ দিচ্ছে অথবা নারীকে নানা অপরাধের উৎস মনে করছে। আসলে ইসলামি শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে, পুরুষের মাঝে এই বোধ-চেতনা সৃষ্টি করা যে, ঘটনাচক্রে নারীর মধ্যে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি দেখা দেয় তাহলে তাকে পৃথক করে দেওয়ার ব্যাপারে যেন তাড়াহুড়া না করা হয়। কারণ হতে পারে একদিকে তার কোনো খুঁত থাকলেও অপরদিকে হয়তো তার সদগুণ বিদ্যমান থাকতে পারে, যার অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর, চিত্তাকর্ষক। কারণ দোষ-গুণ নিয়েই তো মানুষ। আর নারী মানুষ বৈ তো অন্য কিছু নয়। এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটেই প্রিয়নবী (সা.) বলেছেন – "কোনো মু'মিন পুরুষ যেন কোনো মু'মিনা নারীকে ঘৃণা না করে। কেননা তার কোনো কর্ম অপছন্দ হলেও অন্য কোনো কর্ম পছন্দনীয়ও হতে পারে। মূলত ইসলাম কিভাবে মুসলমানকে তালাকের অপব্যবহার ও তার নিন্দনীয় পন্থা থেকে বিরত রাখতে চায় তা এই হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। যদি স্ত্রীর কোনো দোষ-ত্রুটি থেকেই থাকে তবে এ ক্ষেত্রে পুরুষকে সমঝোতা ও সম্প্রীতির মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। বলা বাহুল্য, এ সকল পরিস্থিতি ইসলাম কেবল পুরুষকে এ পরামর্শ দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি; বরং তাকে স্ত্রীর সাথে সদয় ব্যবহারেরও নির্দেশ দিচ্ছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন – "তোমরা নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। যদি তাদেরকে অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন। –(সূরা নিসা)

এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আল্লামা আবূ বকর জাসাস তাঁর তাফসীরে আহকামুল কুরআনে বলেন, 'এই আয়াত এ কথাই প্রমাণিত করে যে, ইসলামি শরিয়ত স্বামীর অপছন্দ সত্ত্বেও স্ত্রীর সাথে সদ্ভাব বজায় রাখার উপদেশ দেয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে আমাদের এ শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, তাতে তিনি বিরাট কল্যাণ রেখেছেন ; কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি স্ত্রী সত্যিকারভাবে কোনো এমন অপ্রিয় কর্মে অভ্যস্ত হয়ে থাকে যা বাস্তবেই দাম্পত্য জীবনকে করে তোলে কলুষিত। বিনষ্ট করে দেয় স্বামীর স্বস্তি ও শান্তি। এবং যদি এ ক্ষেত্রে কোনো আলাপ-সমঝোতা, প্রীতি ভালোবাসা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির পরও স্ত্রী তার ক্ষতিকারক বদ আচার-আচারণ পরিত্যাগ না করে থাকে, তবে ইসলাম একেবারে শেষ পর্যায়ে স্বামী-স্ত্রী এবং সমাজের বৃহত্তর স্বার্থে এ দাম্পত্যনীড় ভেঙে দেবার অনুমতি দেয়। কিন্তু এ অবনতিশীল নাজুক পরিস্থিতিতেও প্রিয়নবী (সা.)-এর সতর্ক উপদেশ – "নারীদেরকে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া তালাক দিও না। কারণ আল্লাহ সম্ভোগকারী ও সম্ভোগকারিণীদের ভালোবাসেন।"

আভিধানিক ও পারিভাষিক উভয় অর্থের দিক থেকেই হাদীসের যে সারমর্ম দাঁড়ায় তা হচ্ছে– যতক্ষণ পর্যন্ত তালাকের বিকল্প ব্যবস্থা বর্তমান থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত নারীদের তালাক দিও না। বস্তুত তালাক হচ্ছে একান্ত অনন্যোপায় অবস্থার শেষ অবলম্বন।

ইসলামি শরিয়তের তালাক ও অন্যান্য ধর্মের বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যকার পার্থক্য ঃ

ইসলাম ধর্মে তালাক ঃ কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে- (الاية) وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا অর্থ ঃ এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী সম্প্রদায় করেছি। -(সূরা বাক্বারা; আয়াত ১৪৩)

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বভাব-ধর্ম ইসলাম কোনো বিষয়েই চরমপন্থা অবলম্বন করে না। বিবাহের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। দাম্পত্য জীবনে নর-নারী যত অতিষ্ঠ হয়ে উঠুক না কেন, বিবাহ বিচ্ছেদ যতই অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যাক না কেন, কোনো অবস্থাতেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটতে পারে না এমন কথা ইসলাম বলে না। আবার প্রয়োজনে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আছে বলে ডিভোর্স বা তালাকের অবাধ প্রচলন ও তালাক সংক্রান্ত অধিকারের যথেচ্ছ প্রয়োগের ফতোয়াও ইসলাম প্রদান করে না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক যত অপ্রিয় অবাঞ্চিত হোকনা কেন, মানব জীবনে এমনও অনেক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখনই সেই অপ্রিয় কর্মটি ব্যতীতও তার গত্যন্তর থাকে না। এ ধরনের অনিবার্য পরিস্থিতিতেও যদি স্বামী -স্ত্রীর মুক্তি এবং বিবাহ বিচ্ছেদের পথ চিররুদ্ধ থাকে, তবে দাম্পত্য বন্ধনের মর্যাদাই ক্ষুণ্ন হবে, ব্যর্থ হবে বিবাহের মহান উদ্দেশ্য। ফলে বিবাহের মর্যাদা যেমন ক্ষুণ্ন হবে তেমনি অনিশ্চিত পরিণতির ভয়ে মানুষের মনে বিবাহ বিমুখতা দেখা দেবে। বিবাহ এড়িয়ে চলার চেষ্টা করবে এবং জানা কথা যে, এতে দম্পতিরও শান্তি নেই, সমাজেরও কল্যাণ নেই ; বরং বিচ্ছেদের আশঙ্কাও সম্ভাবনা যে, মিলন মুহূর্তকে মধুর করে তোলে এ কথা তো বলাই বাহুল্য। বরং এহেন অবস্থায় নিজ ভুল-ত্রুটি ও যথেচ্ছাচারের ফলে দাম্পত্য জীবনে মনোমালিন্যের সৃষ্টি এবং বিবাহ বিচ্ছেদ জনিত অশুভ পরিণতির হাত থেকে আত্মরক্ষার খাতিরে স্বামী-স্ত্রী সর্বদাই আত্মসতর্ক থাকবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না। তাই তালাক ব্যবস্থা শত অপ্রিয় হলেও এর একটি গুরুত্ব আছে। দাম্পত্য জীবনে শান্তি এবং মাধুর্যতা আনয়নে এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

হিন্দু ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ এ ক্ষেত্রে হিন্দু ধর্মে একমাত্র মৃত্যু ব্যতীত বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের অন্য কোনো পথ নেই। এমনকি এ ধর্মে মৃত্যুতেও বিয়ের বন্ধন ছিন্ন হয় না। স্বামী মরে গেলেও স্ত্রীর মুক্তি নেই বলেই হিন্দু ধর্মে বিধবা বিবাহ ছিল নিষিদ্ধ এবং এ জন্যই প্রাচীন ভারতের বহু সতীসাধ্বী নারী সহমরণ বরণ করে নিতো। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে, সাম্প্রতিক কালে হিন্দু ধর্মের শিক্ষিত সমাজ এহেন অমানবিক কর্মকাণ্ডের অশুভ পরিণতি উপলব্ধি করতে পেরেছে। বর্তমান বিশ্বসভ্যতাও তালাকের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পেরেছে বলে আজ বিভিন্ন সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক প্রথা অনুমোদিত ও তৎসক্রান্ত আইন প্রবর্তিত হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে অবশ্য ইসলাম চৌদ্দশত বৎসব পূর্বেই বিবাহ বিচ্ছেদের যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা প্রবর্তন করে তার দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

ইহুদি ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ ইহুদি ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ অতি তুচ্ছ ব্যাপার। এর জন্য পুরুষের ইচ্ছাই ছিল যথেষ্ট। তালাক প্রথা তাদের কাছে মোটেই নিন্দনীয় ছিল না। পুরুষের দোষ-ত্রুটি যতই থাকুক না কেন, তার বন্ধন থেকে নারীর মুক্তির পথ চিররুদ্ধ। আবার বিনা অপরাধে স্ত্রীকে তালাক প্রদান তাদের নিকট বিন্দুমাত্র নিন্দার কারণ নয়। রমণীয় মর্যাদা ইহুদিধর্মে কতটুকুতা এ থেকেই সহজেই বোধগম্য হয়।

খ্রিস্ট ধর্মে বিবাহ বিচ্ছেদ ঃ খ্রিস্ট জগতে প্রথমদিকে তালাকের কোনো অবকাশই ছিল না। যে কোনো পরিস্থিতেই বিবাহ বিচ্ছেদ ছিল চিরনিষিদ্ধ। হিন্দু ধর্মের মতোই খ্রিস্ট জগতে এই অবৈজ্ঞানিক, অস্বাভাবিক নীতি স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা ও অস্বাভাবিকতা এহেন নীতির অসারতা-অকল্যাণ প্রমাণ করে দিয়েছে সকলের কাছে। ফলে এই অনিবার্য পরিণতিতে আন্দোলন শুরু হয়। সর্বপ্রথম এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু এতে উল্লেখযোগ্য জনকল্যাণ সাধিত হয়নি। বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার আইনত স্বীকৃত হলেও বিচ্ছিন্ন স্বামী স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহের পথটি রুদ্ধ থেকে যায়। ১৯১০ সালে এ বিষয়ে এক কমিশন গঠিত হয়। এবং ১৯২০ সালে উক্ত কমিশনের সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে বিবাহ বিচ্ছেদ ও অন্যত্র বিবাহের অধিকার প্রদত্ত হয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান মাত্রই পাশ্চাত্যে তালাকের ধুম পড়ে যায়। সীন আদালতে একই তারিখে দু'শত চুরানব্বইটি তালাকের ডিক্রি প্রদত্ত হয়। ইংল্যাণ্ডের একই আদালতে একই তারিখে চার হাজার একশত নয়টি তালাকের আবেদন পেশ হয়েছিল। বিভিন্ন বৎসরে ক্রমশ তালাকের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯২২ সাল থেকে সেখানে প্রতি দু'টি বিবাহে একটি তালাক অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

যারা পর্দা প্রথাকে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তির অন্তরায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ হিসাবে উল্লেখ করেন, তাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাচ্ছি, একবার পশ্চিমা দুনিয়ার দাম্পত্য ব্যর্থতা তথা বিবাহ বিচ্ছেদের করুণ দৃশ্য অনুধাবন করতে চেষ্টা করুন।

বস্তুত ইসলাম তালাক প্রথা অনুমোদন করলেও এর যথেচ্ছ ব্যবহারকে মোটেই পছন্দ করে না। পারত পক্ষে তালাক পরিহার করে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। সে সূচনাতেই ঘোষণা দিয়েছে, বৈধ বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অপ্রিয় বিষয় আল্লাহর নিকট তালাক।

اَلطَّلَاقُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَوْجُهٍ اَحْسَنُ الطَّلَاقِ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ وَاَحْسَنُ الطَّلَاقِ اَنْ يُّطَلِّقَ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً فِىْ طُهْرٍ وَاحِدٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيْهِ وَيَتْرُكُهَا حَتّٰى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا وَطَلَاقُ السُّنَّةِ اَنْ تُطَلَّقَ الْمَدْخُوْلُ بِهَا فِىْ ثَلٰثَةِ اَطْهَارٍ وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ اَنْ يُّطَلِّقَهَا ثَلٰثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ اَوْ ثَلٰثًا فِىْ طُهْرٍ وَاحِدٍ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَبَانَتْ اِمْرَاَتُهٗ مِنْهُ وَكَانَ عَاصِيًا وَالسُّنَّةُ فِى الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ سُنَّةٌ فِى الْوَقْتِ وَسُنَّةٌ فِى الْعَدَدِ فَالسُّنَّةُ فِى الْعَدَدِ يَسْتَوِىْ فِيْهَا الْمَدْخُوْلُ بِهَا وَغَيْرُ الْمَدْخُوْلِ بِهَا وَالسُّنَّةُ فِى الْوَقْتِ تَثْبُتُ فِىْ حَقِّ الْمَدْخُوْلِ بِهَا خَاصَّةً وَهُوَ اَنْ يُّطَلِّقَهَا وَاحِدَةً فِىْ طُهْرٍ لَمْ يُجَامِعْهَا فِيْهِ وَغَيْرُ الْمَدْخُوْلِ بِهَا اَنْ يُّطَلِّقَهَا فِىْ حَالِ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ وَاِذَا كَانَتِ الْمَرْاَةُ لَاتَحِيْضُ مِنْ صِغَرٍ اَوْ كِبَرٍ فَاَرَادَ اَنْ يُّطَلِّقَهَا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَاِذَا مَضٰى شَهْرٌ طَلَّقَهَا اُخْرٰى ـ

সরল অনুবাদ ঃ তালাক হলো তিন প্রকার, 'এক' طَلَاقِ اَحْسَنْ 'দুই' طَلَاقِ سُنَّتْ 'তিন' طَلَاقِ بِدْعَتْ । طَلَاقِ اَحْسَنْ বলা হয়, কোনো ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে এক তালাক দেয় এমন طُهْر-এর মধ্যে যেই طُهْر-এর ভিতর সে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করেনি। অতঃপর عِدَّتْ শেষ হওয়া পর্যন্ত এ অবস্থায় রেখে দেবে।

طَلَاقِ سُنَّتْ বলা হয়, স্ত্রীকে তিন طُهْر-এর মধ্যে তিন তালাক দেওয়া। طَلَاقِ بِدْعَتْ বলা হয়, একই বাক্যে তিন তালাক দেওয়া বা একই طُهْر-এর ভিতর তিন তালাক দেওয়া। যদি এ ধরনের তালাক দেয় তবে তালাক হয়ে যাবে এবং স্ত্রী بَائِنَه হয়ে যাবে ; কিন্তু স্বামী গুনাহগার হবে। আর তালাকের ভিতর দু' ধরনের সুন্নত রয়েছে। একটা সময়ের মধ্যে অপরটা সংখ্যার মধ্যে। অতঃপর سُنَّتْ عَدَدْ -এর ব্যাপারে مَدْخُوْل بِهَا তথা যার সাথে সঙ্গম করা হয়েছে এবং غَيْرمَدْخُوْل بِهَا তথা যার সাথে সঙ্গম করা হয়নি উভয়ই সমান। আর سُنَّتْ وَقْت শুধু مَدْخُوْل بِهَا-এর ব্যাপারে সাব্যস্ত হয়। এবং তার রূপ হলো, স্ত্রীকে এমন طُهْر-এর মধ্যে এক তালাক দেওয়া যাতে তার সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়নি। আর যদি স্ত্রীর স্বল্প বয়স অথবা বৃদ্ধ বয়সের কারণে حَيْض না আসে এবং স্বামী তাকে سُنَّتْ অনুযায়ী তালাক দিতে চায়, তবে তাকে এক তালাক দেবে এবং এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় তালাক দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ طَلَاقُ الْبِدْعَةِ الخ তালাকে بِدْعَة-এর সংজ্ঞা ঃ তালাকে بِدْعِىْ বলা হয় مَدْخُوْل بِهَا -কে একবাক্যে বা এক طُهْر-এর মধ্যে তিন তালাক দেওয়া অথবা حَيْض অবস্থায় তালাক দেওয়া।

قَوْلُهٗ وَالسُّنَّةُ فِى الطَّلَاقِ مِنْ وَجْهَيْنِ الخ তালাকের মধ্যে একাধিক সুন্নত রয়েছে ঃ তালাকের মধ্যে দু'টি সুন্নত রয়েছে। এক সময়ের মধ্যে 'দুই' সংখ্যার মধ্যে। আর سُنَّةُ عَدَدٍ-এর ব্যাপারে مَدْخُول بِهَا এবং غَيْرمَدْخُول بِهَا উভয়ই সমান। কোননা একই বাক্যে তিন তালাক নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ যে, স্বামী স্বীয়কৃত কর্মের ওপর অনুশোচনা করে তালাক ফিরিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর এটা غَيْرمَدْخُول بِهَا -এর মধ্যেও বিদ্যমান। কিন্তু سُنَّتُ فِى الْوَقْتِ শুধু مَدْخُول بِهَا-এর ব্যাপারে নির্দিষ্ট। আর তা হচ্ছে- স্ত্রীকে এক তালাক এমন طُهْر-এর মধ্যে দেবে যাতে তার সাথে সঙ্গম করেনি। কোননা যদি حَيْض অবস্থায় তালাক দেয়, তবে তার عِدَّتْ দীর্ঘায়িত হয়ে যায়। আর যদি সঙ্গমকৃত طُهْر-এর মধ্যে তালাক দেয়, তাহলে গর্ভবতী হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় এটারও সম্ভাবনা আছে যে, স্বামী নিজ কর্মের প্রতি অনুতপ্ত হবে, আর এটা শুধু مَدْخُول بِهَا-এর ব্যাপারেই প্রযোজ্য।

তালাকের শিষ্টাচার-এর প্রতি লক্ষ্য রাখার গুরুত্ব ঃ তালাকের শিষ্টাচার-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে তালাক দেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তাই তুহর বা পবিত্র সময় স্ত্রী সহবাস হয়নি এমন তুহরে এক তালাক দেওয়ার পর তার ইদ্দত সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত তাকে বর্জন করা এটি তালাকে হাসান বা উত্তম তালাক বলা হয়।

সহবাসমুক্ত পৃথক পৃথক তিন তুহরে তিন তালাক প্রদান । এটি তালাকে আহসান বা অতি উত্তম তালাক বলা হয়। অনেক অজ্ঞ স্বামী চিন্তা-ভাবনা না করেই একসাথে তিন তালাক দিয়ে বসে, এটি নির্বুদ্ধিতা। তালাক দিয়ে পরবর্তী সময়ে অনুশোচনায় লিপ্ত হয়। আলিমদের কাছে এসে সত্য গোপন করে নিজেও গুনাহগার হয়, আবার অনেক ক্ষেত্রে কিছু অর্থলোলুপ মৌলবিদেরকে গুনাহের পথে টেনে আনে।

কখনো মৌলবি সাহেবের কাছে এসে বলে হুযূর! আমার তালাকের নিয়ত ছিল না। আবার কখনো বলে হুযূর ! রাগের মাথায় তালাক দিয়েছি। কখনো বলে, তালাকের সময় তার নাম নেইনি। মোটকথা এ সবই হচ্ছে শরিয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার অনিবার্য পরিণতি। শরিয়তসম্মত তালাক প্রদান করলে হতাশাগ্রস্ত হবার কোনো কারণই দেখা দেয় না।

وَيَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَ وَطْيِهَا وَطَلَاقِهَا بِزَمَانٍ وَطَلَاقُ الْحَامِلِ يَجُوزُ عَقِيبَ الْجِمَاعِ وَيُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ ثَلٰثًا يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ تَطْلِيقَتَيْنِ بِشَهْرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يُطَلِّقُهَا لِلسُّنَّةِ إِلَّا وَاحِدَةً وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فِي حَالِ الْحَيْضِ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ وَحَاضَتْ وَطَهُرَتْ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَيَقَعُ طَلَاقُ كُلِّ زَوْجٍ إِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالنَّائِمِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَطَلَّقَ وَقَعَ طَلَاقُهُ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلٰى اِمْرَأَتِهِ وَالطَّلَاقُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ صَرِيحٌ وَكِنَايَةٌ فَالصَّرِيحُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَمُطَلَّقَةٌ وَطَلَّقْتُكِ فَهٰذَا يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَلَا يَقَعُ بِهِ إِلَّا وَاحِدَةً وَإِنْ نَوٰى أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এটাও জায়েজ আছে যে, স্ত্রীকে তালাক দেবে এবং স্ত্রীর সঙ্গম ও তালাকের মধ্যখানে কোনো নির্দিষ্ট কালের দ্বারা পৃথক করবে না। আর গর্ভবতীকে সঙ্গমের পরে তালাক দেওয়া জায়েজ আছে এবং তাকে সুন্নত অনুসারে তিন তালাক দেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে প্রত্যেক দু'তালাকের মধ্যখানে একমাসের তফাৎ রাখবে, এটা আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর মত অনুসারে, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) মতানুযায়ী তাকে সুন্নত অনুয়াযী এক তালাকের বেশি দিতে পারবে না। যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে حَيْض অবস্থায় তালাক দেয়, তবে তালাক পতিত হবে এবং স্বামীর জন্য مُسْتَحَبّ হলো যে, স্ত্রীকে رُجُوْع করে নেবে এবং স্ত্রী পাক হওয়ার পর পুনরায় حَيْض এসে আবার যখন পাক হয়, তখন স্বামীর ইচ্ছা হলে চাই তাকে তালাক দেবে অথবা ফিরিয়ে নেবে। প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক সজ্ঞান স্বামীর তালাক পতিত হবে। বাচ্চা, পাগল এবং ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক পতিত হবে না। আর যদি কোনো গোলাম মালিকের অনুমতিক্রমে বিবাহ করে এবং তালাক দিয়ে দেয় তবে তার তালাক হয়ে যাবে এবং মালিকের তালাক গোলামের স্ত্রীর ওপর অপির্ত হবে না। এবং তালাক দু'প্রকার ঃ (১) صَرِيْح (২) كِنَايَه তালাকে صَرِيْح বলা হয়, এভাবে বলা যে, তোমাকে তালাক বা তুমি তালাক প্রাপ্ত অথবা আমি তোমাকে তালাক দিয়ে দিয়েছি এসব উক্তি দ্বারা طَلَاقِ رَجْعِي অর্পিত হবে এবং শুধু এক তালাকই পতিত হবে যদিও একাধিক নিয়ত করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَفْصِلُ الخ **ইমাম যুফর (র.)-এর অভিমত ঃ** উপরোক্ত মাসআলায় ইমাম যুফর (র.) ভিন্নমত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, সঙ্গম এবং তালাকের মধ্যবর্তী একমাসের তফাৎ থাকা জরুরি, কিন্তু এ মতানৈক্য ঐ অবস্থায় যখন মহিলা এত অল্প বয়সী হয় যে তার থেকে حَيْض আসা বা গর্ভধারণ করার আশা করা যায় না। অন্যথা সর্ব সম্মতিক্রমে এটি শ্রেয় যে, সঙ্গমের একমাস পর তালাক দেওয়া।

قَوْلُهُ صَرِيْحٌ وَكِنَايَةٌ الخ **তালাকের প্রকারভেদ ঃ** তালাক দু' প্রকার তথা (১) তালাকে সরীহ, (২) তালাকে কেনায়াহ।

তালাকে সরীহ বলা হয় যে সব বাক্য দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণের সাথে উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় এমনকি তালাক দাতার উদ্দেশ্য বিকশিত হয়ে যায়। যেমন - اَنْتِ طَالِقٌ বা مُطَلَّقَةٌ । এ কারণেই বিল্ডিং এবং অট্টালিকা সমূহের নাম صَرْحٌ রাখা হয়। কেননা এগুলো খুবই বিকশিত হয় যে, দেখা মাত্রই বুঝা যায় যে, এটা একটি অট্টালিকা।

তালাকে কেনায়াহ বলা হয় এমন সব বাক্য দ্বারা তালাক দেওয়া যে গুলোর উদ্দেশ্য অপ্রকাশিত এবং গোপন থাকে।

সরীহ বাক্য দ্বারা তালাক দাতা চাই একাধিকের নিয়ত করুক বা بَائِنْ-এর নিয়ত করুক অথবা কোনো নিয়ত নাই করুক সর্বাবস্থায় এক তালাকই পতিত হবে। কেননা পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন "اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ اَوْتَصْرِيْحٌ الخ উক্ত আয়াতে তালাকে সরীহের পরে رَجْعَتْ তথা ফিরিয়ে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাহলে জানা গেল যে, তালাকে সরীহ'র দ্বারা طَلَاقِ رَجْعِى পতিত হয়; এখন যদি তালাক দাতা এমন পন্থা অবলম্বন করে, যার মধ্যে خَبَرْ মাসদার অথবা تَاكِيْد হয় চাই مَصْدَرْ নাকিরাহ হোক বা মারেফাহ হোক। যেরূপ اَنْتِ الطَّلَاقُ তথাপিও এক طَلَاقِ رَجْعِى পতিত হবে। যদিও তালাকদাতা দুইয়ের নিয়ত করে বা কোনো নিয়তই না করে। কোননা তালাকে সরীহের মধ্যে নিয়তের প্রয়োজন হয় না। তা ছাড়া صَرِيْح مَصْدَرْ-এর মধ্যে সংখ্যা গ্রহণযোগ্য হয় না। হ্যাঁ, যদি তিন তালাকের নিয়ত করে, তবে তিন তালাক-ই পতিত হয়ে যাবে। কোননা مَصْدَرْ হলো اِسْمِ جِنْس সুতরাং مَصْدَرْ দ্বারা পূর্ণ جِنْس-এর ইচ্ছা করা সম্ভব। আর তিন হলো গিয়ে فَرْدِ حُكْمِى অর্থাৎ তিন সংখ্যাটা তালাকের পূর্ণ অংশ। কিন্তু দুই পূর্ণ অংশ নয়। কোননা এটা فَرْدِ حَقِيْقِى না এবং فَرْدِ حُكْمِى -ও না।

وَلَايَفْتَقِرُ بِهٰذِهِ الْاَلْفَاظِ اِلٰى نِيَّةٍ وَقَوْلُهُ اَنْتِ الطَّلَاقُ وَاَنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقِ وَاَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَهِيَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَاِنْ نَوٰى ثِنْتَيْنِ لَايَقَعُ اِلَّا وَاحِدَةٌ وَاِنْ نَوٰى بِهٖ ثَلٰثًا كَانَ ثَلٰثًا وَالضَّرْبُ الثَّانِيْ اَلْكِنَايَاتُ وَلَايَقَعُ الطَّلَاقُ اِلَّا بِالنِّيَّةِ اَوْ بِدَلَالَةِ حَالٍ وَهِيَ عَلٰى ضَرْبَيْنِ مِنْهَا ثَلٰثَةُ اَلْفَاظٍ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَلَايَقَعُ بِهَا اِلَّا وَاحِدَةٌ وَهِيَ قَوْلُهُ اِعْتَدِّيْ وَاسْتَبْرِئِيْ رَحْمَكِ وَاَنْتِ وَاحِدَةٌ وَبَقِيَّةُ الْكِنَايَاتِ اِذَا نَوٰى بِهَا الطَّلَاقَ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَاِنْ نَوٰى ثَلٰثًا كَانَتْ ثَلٰثًا .

সরল অনুবাদ ঃ এবং এ ধরনের বাক্য নিয়তের মুখাপেক্ষী না আর স্বামীর কথিত শব্দ اَنْتِ الطَّلَاقُ বা اَنْتِ طَالِقُ الطَّلَاقِ, اَنْتِ طَالِقٌ طَلَاقًا প্রমুখ বাক্যের মধ্যে যদি স্বামীর কোনো উদ্দেশ্য না থাকে তাহলে এক তালাকে رَجْعِي পতিত হবে। যদি দুইয়ের নিয়ত করে। তথাপিও এক তালাক হবে। যদি তিন এর নিয়ত করে, তাহলে তিন তালাক-ই অর্পিত হবে। দ্বিতীয় প্রকার হলো كِنَايَة অর্থাৎ যে সব শব্দ দ্বারা নিয়ত অথবা স্বীকৃতি ব্যতীত তালাক পতিত হয় না। কেনায়াহ দু'প্রকার (১) ঐ সমস্ত শব্দ যার দ্বারা তালাকে رَجْعِي অর্পিত হয় এবং শুধু এক তালাক-ই পতিত হয় এ ধরনের শব্দ তিনটা যথা– اِعْتَدِّيْ , اِسْتَبْرِئِيْ رَحْمَكِ এবং اَنْتِ وَاحِدَةٌ (২) এ ছাড়া বাকি সব কেনায়াহ দ্বারা যখন তালাকের নিয়ত করে তখন এক তালাকে بَائِن পতিত হয় আর যদি তিন তালাকের ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে তিন তালাক পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالضَّرْبُ الثَّانِيْ اَلْكِنَايَاتُ الخ **তালাকে কেনায়াহর ব্যাখ্যা ঃ** তালাকের দ্বিতীয় প্রকার হলো كِنَايَه এবং তার পূর্ণ পদ্ধতি হলো যে, كنايات-এর শব্দসমূহ দ্বারা তালাকের নিয়ত বা পরিস্থিতির স্বীকৃতি ছাড়া قضاء তালাক পতিত হবে না। কোননা كِنَايَة-এর শব্দসমূহের মাঝে তালাক এবং غَيْر তালাক উভয় রকমের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং সঙ্গত যুক্তি ছাড়া কোনো একটাতে নির্দিষ্ট করা বৈধ নয়। আর সে যুক্তি হলো 'নিয়ত' বা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত, যেমন– স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তালাকের কথার্বাতা চলছে, এক পর্যায়ে স্ত্রী বলল, আমাকে তালাক দিয়ে দাও, স্বামী বলল اِعْتَدِّيْ , اِسْتَبْرِئِيْ বা اَنْتِ وَاحِدَةٌ তো এ সমস্ত বাক্যের মধ্যে তালাক এবং غَيْر তালাক দুটোরই সম্ভাবনা থাকে। যেরূপ اِعْتَدِّيْ -এর মধ্যে ইদ্দত বা আল্লাহর নিয়ামত উভয় গণনা করার সম্ভাবনা আছে। এবং اِسْتَبْرِئِيْ -এর উদ্দেশ্যও দু'টো হতে পারে (১) যে তুমি যৌনাঙ্গের পবিত্রতা অর্জন করো কোননা তুমি তালাকপ্রাপ্ত। (২) তুমি তোমার লজ্জাস্থানকে পবিত্র করো কোননা তোমাকে আমি তালাক দেব। এমনিভাবে اَنْتِ وَاحِدَةٌ-এর মধ্যেও দু'টো উদ্দেশ্য আছে। (১) যে তুমি এক তালাক দ্বারা তালাকপ্রাপ্ত, (২) তুমি আমার নিকট সৌন্দর্যের দিক থেকে এক নম্বরে। সারকথা তিনটা উপমার সবটির মধ্যেই দু'টো করে উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু তালাকের ব্যাপারে আলোচনা করার পরিস্থিতি স্বীকৃতি দেয় যে স্বামীর উদ্দেশ্য তালাকই ছিল, সুতরাং স্ত্রীর ওপর এক তালাকে رَجْعِي পতিত হবে।

قَوْلُهُ وَبَقِيَّةُ الْكِنَايَاتِ الخ ঃ কেনায়াতের শব্দসমূহ দ্বারা তালাক পতিত হওয়ার বিশ্লেষণ এই যে, স্বামী স্ত্রীর অবস্থা তিন প্রকার তথা ঃ (১) حَالَتِ رِضَاء বা সন্তুষ্টচিত্ত অবস্থা ঃ (২) حَالَتِ غَضَبْ বা রাগান্বিত অবস্থা ঃ (৩) حَالَتِ مُذَاكَرَه বা পরস্পর আলোচনাবস্থা। এবং كِنَايَه শব্দেরও তিন অবস্থা ঃ (১) এর দ্বারা তালাকের আবেদন নাকচ করা হতে পারে বা তার প্রতিউত্তরও হতে পারে। যেমন - تَقَنَّعِيْ - اِسْتَتِرِيْ - اُغْرُبِيْ (২) اَلْفَاظِ كِنَايَة -এর মধ্যে গালি-গালাজের সম্ভাবনা থাকে এবং প্রতিউত্তরও হতে পারে। যেমন – خَلِيَّةٌ - بَرِيَّةٌ - حَرَامٌ - بَائِنٌ - بَتَّةٌ ও بَتْلَةٌ (৩) এর দ্বারা তালাক নাকচ করা হয় না এবং গালি-গালাজেরও সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু প্রতিউত্তর এর সম্ভাবনা থাকে। যেমন – اِعْتَدِّيْ - اِسْتَبْرِئِيْ رَحْمَكِ - اَنْتِ وَاحِدَةٌ - اَنْتِ حُرَّةٌ - سَرَّحْتُكِ - فَارَقْتُكِ তো স্বামী সন্তুষ্টি থাকাবস্থায় তিনো প্রকার كِنَايَاتْ এর কার্যকারিতা নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর রাগান্বিত অবস্থায় প্রথম দু'প্রকার كِنَايَه নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর পরস্পর আলোচনাবস্থায় শুধুমাত্র প্রথম প্রকার নিয়তের ওপর নির্ভর করবে।

وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ كَانَتْ وَاحِدَةً وَهٰذِهٖ مِثْلُ قَوْلِهٖ أَنْتِ بَائِنٌ وَبَتَّةٌ وَبَتْلَةٌ وَحَرَامٌ وَحَبْلُكِ عَلٰى غَارِبِكِ وَالْحَقِيْ بِأَهْلِكِ وَخَلِيَّةٌ وَبَرِيَّةٌ وَ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ وَسَرَّحْتُكِ وَاخْتَارِيْ وَفَارَقْتُكِ وَأَنْتِ حُرَّةٌ وَتَقَنَّعِيْ وَاسْتَتِرِيْ وَاغْرُبِيْ وَابْتَغِي الْأَزْوَاجَ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهٗ نِيَّةُ الطَّلَاقِ لَمْ يَقَعْ بِهٰذِهِ الْأَلْفَاظِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ فِيْ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ فَيَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ فِي الْقَضَاءِ لَايَقَعُ فِيْمَا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى إِلَّا أَنْ يَّنْوِيَهٗ وَإِنْ لَّمْ يَكُوْنَا فِيْ مُذَاكَرَةِ الطَّلَاقِ وَكَانَا فِيْ غَضَبٍ أَوْخُصُوْمَةٍ وَقَعَ الطَّلَاقُ بِكُلِّ لَفْظَةٍ لَايُقْصَدُ بِهَا السَّبُّ وَالشَّتِيْمَةُ وَلَمْ يَقَعْ بِمَا يُقْصَدُ بِهَا السَّبُّ وَالشَّتِيْمَةُ إِلَّا أَنْ يَّنْوِيَهٗ وَإِذَا وُصِفَ الطَّلَاقُ بِضَرْبٍ مِّنَ الزِّيَادَةِ كَانَ بَائِنًا مِثْلَ أَنْ يَّقُوْلَ أَنْتِ طَالِقٌ بَائِنٌ وَأَنْتِ طَالِقٌ أَشَدَّ الطَّلَاقِ أَوْ أَفْحَشَ الطَّلَاقِ أَوْطَلَاقَ الشَّيْطَانِ أَوْطَلَاقَ الْبِدْعَةِ أَوْكَالْجَبَلِ أَوْمِلَأَ الْبَيْتِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি দু'তালাকের নিয়ত করে, তবে এক তালাক পতিত হবে। আর ঐ সমস্ত বাক্য হলো যেমন – স্বামী বলল, তুমি আমার থেকে পৃথক, আমার সাথে তোমার সম্পর্ক ছিন্ন, তুমি হারাম, তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন, তুমি প্রিয়জনদের সাথে মিলে যাও, তোমাকে পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তোমাকে তোমার আত্মীয় স্বজনদের হাওলা করে দেওয়া হয়েছে। আমি তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি, তুমি স্বাধীন হয়ে যাও, আমি তোমাকে পৃথক করে দিয়েছি তুমি আজাদ, তুমি নিজেকে চাদর দ্বারা ঢেকে নাও, তুমি পর্দা করো, দূর হয়ে যাও, স্বামী তালাশ করো। এখন যদি এ ধরনের শব্দ দ্বারা তালাকের নিয়ত না করে তাহলে তালাক পতিত হবে না। হ্যাঁ, যদি তালাকের আলোচনার মধ্যে হয় তাহলে বিচারকের রায়ে তালাক পতিত হবে। আর بَيْنَهٗ وَبَيْنَ اللّٰهِ নিয়ত ব্যতীত তালাক পতিত হবে না। আর যদি এসব বাক্য তালাকের আলোচনায় না হয় বরং রাগান্বিত বা ঝগড়ারত অবস্থায় হয় তাহলে ঐ সকল শব্দের দ্বারা তালাক হয়ে যাবে যদ্বারা গালমন্দ উদ্দেশ্য না হয়। এবং ঐ সব শব্দের দ্বারা তালাক হবে না যার মধ্যে গালমন্দটাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়। হ্যাঁ, যদি নিয়ত করে তাহলে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি তালাককে কোনো বহির্বস্তুর সাথে শর্তকরণ করা হয় তাহলে তালাকে بَائِنْ হবে। যেমন কেউ যদি এরূপ বলে যে, তুমি তালাকে بَائِنْ প্রাপ্ত, তুমি কঠিন তালাকপ্রাপ্ত, তুমি অতিনিকৃষ্ট তালাকপ্রাপ্ত, তোমার ওপর শয়তানের তালাক, তোমার ওপর بِدْعَتْ -এর তালাক, বা তোমার ওপর পাহাড় পরিমাণ অথবা ঘরভর্তি পরিমাণ তালাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ الخ ঃ اَلْفَاظِ كِنَايَة দ্বারা দুই তালাকের নিয়ত করার ব্যাপারে মতানৈক্য ঃ কথিত أَنْتِ بَائِنٌ হতে إِبْتَغِى الْأَزْوَاجَ পর্যন্ত যে সমস্ত كِنَايَاتْ কিতাবে উল্লেখ আছে যদি এগুলো দ্বারা দুই তালাকের নিয়ত করে, তবে এক তালাকই পতিত হবে। ইমাম যুফার (র.) বলেন যে, এমতাবস্থায় দুই তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল ঃ যে তালাকে بَائِنْ সংখ্যা অন্তর্ভুক্ত করে না। এ কারণেই أَنْتِ بَائِنَتَيْنِ বলা হয় না; হ্যাঁ যদি তিন তালাকের নিয়ত করে তবে তিন তালাক পতিত হবে। কিন্তু এই তিনের পতিত হওয়া সংখ্যার কারণে নয় ; বরং এ জন্য যে, আজাদ মহিলার ব্যাপারে তিন তালাক এটা بَيْنُوْنَتْ-এর সর্বশেষ অধ্যায়। যে রকমভাবে বাঁদির ব্যাপারে দুই তালাক হলো সর্ব শেষ অধ্যায়। সুতরাং কেউ যদি বাঁদির ব্যাপারে أَنْتِ بَائِنٌ বলে দুই তালাক-এর নিয়ত করে, তাহলে এটা শুদ্ধ হবে এবং দুই তালাকই পতিত হবে।

বিভিন্ন كِنَايَاتْ -এর দ্বারা তালাক না হওয়ার কারণ ঃ

قَوْلُهٗ إِلْحَقِيْ بِأَهْلِكِ الخ ঃ কেননা এ বাক্যের মধ্যে এটাও উদ্দেশ্য হতে পারে যে, তুমি তোমার পরিজনদের চরিত্র অবলম্বন করো। এ অর্থের ওপর ভিত্তি করে তালাক হবে না।

وَإِذَا اَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى جُمْلَتِهَا اَوْ إِلَى مَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْجُمْلَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ مِثْلُ اَنْ يَّقُوْلَ اَنْتِ طَالِقٌ اَوْ رَقَبَتُكِ طَالِقٌ اَوْعُنُقُكِ طَالِقٌ اَوْ رُوْحُكِ اَوْ بَدَنُكِ اَوْجَسَدُكِ اَوْفَرْجُكِ اَوْ وَجْهُكِ وَكَذٰلِكَ اِنْ طَلَّقَ جُزْءً اشَائِعًا مِنْهَا مِثْلُ اَنْ يَّقُوْلَ نِصْفُكِ اَوْثُلُثُكِ طَالِقٌ وَاِنْ قَالَ يَدُكِ اَوْ رِجْلُكِ طَالِقٌ لَمْ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَاِنْ طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيْقَةٍ اَوْ ثُلُثَ تَطْلِيْقَةٍ كَانَتْ تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً وَطَلَاقُ الْمُكْرِهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِعٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি তালাককে মাহিলার পূর্ণাঙ্গের ওপর সম্বোধন করে অথবা এমন একটি অঙ্গ বুঝায়, যার দ্বারা পুরা অঙ্গের ব্যাখ্যা হয়ে যায়, তাহলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। যেমন– এরূপ বলা যে, তুমি তালাক বা তোমার গর্দানকে তালাক, বা তোমার রূহকে, তোমার শরীরকে, তোমার অঙ্গকে, তোমার লজ্জাস্থানকে বা তোমার মুখমণ্ডলকে তালাক। অনুরূপভাবে যদি তার বিস্তৃত কোনো অংশকে তালাক দেয় যেমন এ কথা বলা যে, তোমার অর্ধেক বা তোমার তৃতীয়াংশ তালাকপ্রাপ্ত, তাহলেও তালাক পতিত হবে।

আর যদি বলে যে তোমার হাত বা তোমার পা তালাক তবে তালাক হবে না। যদি স্ত্রীকে তালাকের অর্ধেক বা তৃতীয়াংশ দেয় তাহলে পুরা এক তালাক পতিত হবে। আর বাধ্যকৃত এবং মাতালের তালাক পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا اَضَافَ الطَّلَاقَ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) ঐ সব বিধানাবলী আলোচনা করতেছেন যেখানে তালাককে পূর্ণ শরীর বা আংশিক শরীরের দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। যদি তালাকের নিসবত মহিলার সম্পূর্ণ অংশের দিকে করা হয়, অথবা এমন অংশের দিকে করা হয় যার দ্বারা كُلْ-কে বুঝানো হয়। যথা–গর্দান, অথবা কোনো অনির্দিষ্ট অংশের দিকে করা হয়। যথা– অবৈধ বা এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি তবে তালাক হয়ে যাবে। আর যদি এমন جُزْء-এর দিকে সম্বোধন করা হয় যার দ্বারা كُلْ -কে ব্যক্ত করা হয় না তবে তালাক হবে না।

قَوْلُهُ وَطَلَاقُهُ الْمُكْرِهِ الخ **জোর পূর্বক তালাক আদায় করার ব্যাপারে মতানৈক্য ঃ** ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট যার কাছ থেকে জোর প্রয়োগ করে তালাক আদায় করা হয়েছে এবং যে নেশা জাতীয় দ্রব্য আহরণ করে মাতাল অবস্থায় তালাক দেয় উভয়ের তালাক সংঘটিত হয়ে যাবে।

ইমাম শাফিয়ী মালেক এবং আহমদ (র.)-এর মতানুযায়ী তালাক পতিত হবে না। দলিল ঃ হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন যে, আমার উম্মত থেকে ভুল-ত্রুটি এবং ঐ সব জিনিস ক্ষমা করা হয়েছে, যা জোর প্রয়োগের মাধ্যমে আদায় করা হয়।

আহনাফের দলিল ঃ নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন– ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وهزلهن جِدٌّ اَلنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

আর শাফিয়ীর দেওয়া উক্ত হাদীসের জবাবে বলা হয়েছে উক্ত হুকুম দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে পরকালীন বিধান উদ্দেশ্য দুনিয়াবী বিধান উদ্দেশ্য নয়।

وَيَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا قَالَ نَوَيْتُ بِهِ الطَّلَاقَ وَيَقَعُ طَلَاقُ الْاَخْرَسِ بِالْإِشَارَةِ وَإِذَا اَضَافَ الطَّلَاقَ إِلَى النِّكَاحِ وَقَعَ عَقِيْبَ النِّكَاحِ مِثْلُ اَنْ يَّقُوْلَ إِنْ تَزَوَّجْتُكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ اَوْقَالَ كُلُّ اِمْرَأَةٍ اَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَإِذَا اَضَافَهُ إِلَى شَرْطٍ وَقَعَ عَقِيْبَ الشَّرْطِ مِثْلُ يَقُوْلُ لِإِمْرَاتِهِ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَلَايَصِحُّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْحَالِفُ مَالِكًا اَوْ يُضِيْفُهُ إِلَى مِلْكِهِ فَإِنْ قَالَ لِاَجْنَبِيَّةٍ إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَدَخَلَتِ الدَّارَ لَمْ تُطَلَّقْ وَاَلْفَاظُ الشَّرْطِ إِنْ وَإِذَا وَإِذَامَا وَكُلٌّ وَكُلَّمَا وَمَتٰى وَمَتٰى مَا فَفِيْ كُلِّ هٰذِهِ الْاَلْفَاظِ إِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ إِنْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ وَ وَقَعَ الطَّلَاقُ إِلَّا فِيْ كُلَّمَا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الشَّرْطِ حَتّٰى يَقَعَ ثَلٰثُ تَطْلِيْقَاتٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَكَرَّرَ الشَّرْطُ لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَ زَوَالُ الْمِلْكِ بَعْدَ الْيَمِيْنِ لَايُبْطِلُهَا فَإِنْ وُجِدَ الشَّرْطُ فِيْ مِلْكٍ إِنْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ وَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِنْ وُجِدَ فِيْ غَيْرِ الْمِلْكِ إِنْحَلَّتِ الْيَمِيْنُ وَلَمْ يَقَعْ شَيْءٌ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِيْ وُجُوْدِ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ فِيْهِ إِلَّا اَنْ تُقِيْمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ -

---

সরল অনুবাদ ঃ তালাক হয়ে যাবে যখন কোনো ব্যক্তি (কোনো বাক্য উচ্চারণ করে) বলে যে, আমি এটা দ্বারা তালাকের নিয়ত করেছি। আর বাকশক্তিহীন লোকের তালাক ইশারা দ্বারা হয়ে যাবে। আর যদি তালাককে বিবাহের সাথে সম্পৃক্ত করে, তবে বিবাহের পরে তালাক হয়ে যাবে। যেমন– এরূপ বলে যে, আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে তুমি তালাক বা এরূপ বলে যে, আমি যে মহিলাকেই শাদী করব সে তালাক। আর যদি তালাককে শর্তের সাথে সম্পৃক্ত করে তবে শর্ত পাওয়া গেলে তালাক হয়ে যাবে। যেমন– স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তুমি তালাক। আর তালাককে সম্পৃক্ত করা ঐ সময় বৈধ হবে। যখন তালাকদাতা তালাকের মালিক হবে। অথবা তালাকের অধিকার সৃষ্টির উপায়ের দিকে সম্বন্ধ করবে। অতঃপর যদি কোনো অপরিচিতাকে বলে যে, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ করো তাহলে তোমাকে তালাক। এরপর তাকে বিবাহ করল এবং স্ত্রী ঘরে প্রবেশ করল, তালাক হবে না। এবং শর্তের বাক্যসমূহ হলো– إِنْ - إِذَا - إِذَامَا - كُلٌّ - كُلَّمَا - مَتٰى এবং مَتٰى مَا এই সমস্ত বাক্যসমূহে যদি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে قَسَم পুরা হয়ে যাবে এবং তালাক পতিত হবে। كُلَّمَا ব্যতীত। কেননা উক্ত শব্দের মধ্যে শর্তের تَكْرَارْ হওয়ার দরুন তালাক ও مُكَرَّرْ হবে। এমনকি যদি শর্ত তিনবার تَكْرَارْ হয় তাহলে তিন তালাক পতিত হয়ে যাবে। অতঃপর পুনরায় বিবাহ করার পর যদি শর্ত পাওয়া যায় তাহলে তালাক হবে না। আর يَمِيْن তথা কসম এর পরে مِلْك বরবাদ হয়ে গেলে يَمِيْن নষ্ট হয় না। এখন যদি مِلْك-এর মধ্যে شَرْط পাওয়া যায়, তবে قَسَم পূর্ণ হয়ে যাবে এবং তালাক পতিত হবে। আর যদি غَيْرِ مِلْك-এর মধ্যে পাওয়া যায়, তাহলে কসম পুরা হয়ে যাবে। কিন্তু কোনো কিছু পতিত হবে না। আর যখন স্বামী-স্ত্রী (তালাকের) শর্ত পাওয়া যাওয়ার মধ্যে মতানৈক্য করে তখন স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে, হাঁ যদি স্ত্রী প্রমাণ উপস্থাপন করে (তখন স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য হবে)

فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ لَا يُعْلَمُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا فِي حَقِّ نَفْسِهَا مِثْلُ أَنْ يَقُولَ إِنْ حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ قَدْ حِضْتُ طُلِّقَتْ.

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি (তালাকের) শর্ত স্ত্রীর পক্ষ ছাড়া জানা অসম্ভব হয় তখন স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে তার নিজের হকের মধ্যে। যেমন– (স্বামী কর্তৃক) এরূপ বলা যে, যদি তোমার হায়েয আসে তবে তুমি তালাক। সে বলল, আমার হায়েয এসে গেছে, তখন তালাক পতিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا الخ ঃ এ মাসআলায় স্ত্রীর কথা এ জন্য গ্রহণ যোগ্য হবে যে, স্ত্রী তার স্বীয় অধিকারের ব্যাপারে আমানতদার। এ ছাড়া ঐ শর্তও স্ত্রী ছাড়া জানা অসম্ভব তাই স্ত্রীর কথাই গ্রহণযোগ্য হবে যেন স্বামী হারাম এর মধ্যে পতিত না হয়।

প্রমাণ উপস্থাপন কোথায় করবে?

قَوْلُهُ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, যদি ইসলামি আদালত থাকে তবে স্ত্রী সেখানে প্রমাণ উপস্থাপন করবে। আর যদি ইসলামি আদালত না থাকে তবে শরিয়তের সর্ব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত বিজ্ঞ আলিম ওলামা দ্বারা গঠিত ইফতাবোর্ডের কাছে প্রমাণ উপস্থাপন করবে।

অনৈসলামিক আদালতে বিবাহ্ বিচ্ছেদ করার বিধান ঃ এখানে আমরা প্রসঙ্গত অপর একটি বিধান বলে দিচ্ছি তা হচ্ছে– অনৈসলামিক আদালতে অমুসলমান জজের ডিক্রিতে মুসলমানদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। এ অধিকার ইসলাম কোনো অমুসলমান আদালত তথা অমুসলমান হাকিমকে দেয় না। এমতাবস্থায় যে সমস্ত মুসলমান বিবাহ বিচ্ছেদের সরকারি ডিক্রি বা সরকারি তালাককে যথেষ্ট মনে করেন তারা ভুল মনে করেন। এ ধরনের পাত্রীর অন্যত্র বিবাহ প্রদান বা এর পাণিগ্রহণ স্পষ্ট ব্যভিচার ও পর স্ত্রী ধর্ষণ বা পরপুরুষের সাথে অবৈধ মিলন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা, এমতাবস্থায় শরিয়তের আইন মোতাবেক পূর্ব বিবাহ অবিচ্ছিন্ন। তবে যদি অমুসলিম আদালতে (বা মুসলমান আদালতে) নিযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুসলমান বিচারক অথবা আইনত অধিকারপ্রাপ্ত অফিসার ইসলামি আইন মোতাবেক বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ডিক্রি দান করেন তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

বর্তমানে অধিকাংশ মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয় যৌতুক দিতে অক্ষম হলে ঃ

قَوْلُهُ فَأَنْتِ طَالِقٌ الخ ঃ গ্রন্থকার (র.) এখানে তালাককে শর্তের সাথে مُقَيَّدٌ করার বিধানাবলী বর্ণনা করছেন। আমাদের দেশে স্বামী কর্তৃক অনেক সময় স্ত্রীকে বলা হয়, তুমি যদি আমার জন্য পিতার বাড়ি থেকে এত টাকা যৌতুক না আনো তবে তুমি তালাক। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি শর্ত পূরণ করতে না পারে তালাক পতিত হয়ে যাবে, نَعُوذُ بِاللّٰهِ এসব শর্ত দিয়ে তালাক দেওয়া মহা অন্যায়। বর্তমানে আমাদের দেশে অধিকাংশ বরং অসংখ্য মহিলা তালাকপ্রাপ্ত হয় স্বামীকে তার চাহিদা অনুযায়ী যৌতুক দিতে না পারলে বা যৌতুক দিতে অক্ষম হলে। আহ! এসব যৌতুক অন্বেষণকারী পুরুষরা নারীর থেকে যৌতুক না চেয়ে, মনে হয় কুরবানির মৌসুমে গরুর বাজারে উঠে নিজকে রশি দিয়ে বেঁধে রাখলে মোটা মোটা গরুর সাথে নিজেকে বেশি দামে বিক্রি করতে সক্ষম হতো। বলা বাহুল্য যে, এই অভিশপ্ত যৌতুক প্রথা বা বিক্রির নিয়ম ইসলামি শরিয়ত আদৌ অনুমতি দেয় না। একথা অনস্বীকার্য। যৌতুকের প্রভাবে যেখানে বিবাহের কন্টকিত হচ্ছে, সেখানে নারী যদি অধঃপতনে যায়, নৈতিক বা দৈহিক আত্মহত্যা করে, তবে সে পাপের গুরুভার শুধু নারীর মাথায় চাপিয়ে দিয়েই নিষ্কৃতি নেই, সমাজকেও সেই অপরাধের মহাপাপের জন্য পুরোমাত্রায় দায়ী হতে হবে। এমনকি যদি সমাজের এহেন কু-প্রথার কারণে নারী অবিবাহিত থেকে যায়, বুক বেধে চোখের জলে ভেসে জীবন-যাপন করে, তবে সমাজকেই নিষ্ঠুর অত্যাচারী হিসাবে মানবতার আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে। অতএব যে অভিশপ্ত যৌতুক প্রথা নর-নারীর বৈধ মিলনের পথের কাঁটা, বিবাহের প্রতিবন্ধক, নারীর অবমাননা, পুরুষের অপমান, উভয় পক্ষের সম্প্রীতির অন্তরায়, সুখ-শান্তির প্রতিবন্ধক, অত্যাচার ও ব্যভিচারের পটভূমি। ইসলামের মতো দূরদর্শী জীবন ব্যবস্থা তা কখনও পছন্দ করতে পারে না। কোনো স্বভাবধর্ম কোনো মানবতা-দরদী-ধর্ম এ ধরনের কুপ্রথার অবকাশ দান করতে পারে না। তাই যৌতুক প্রথা যে ইসলামে নেই শুধু এতটুকুই নয় বরং এটি ইসলামের নীতিবিরুদ্ধ প্রথা।

وَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَفُلَانَةُ مَعَكِ فَقَالَتْ قَدْ حِضْتُ طُلِّقَتْ هِيَ وَلَمْ تُطَلَّقْ فُلَانَةُ وَإِذَا قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَرَاَتِ الدَّمَ لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ حَتّٰى يَسْتَمِرَّ الدَّمُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَإِذَا تَمَّتْ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ حَكَمْنَا بِوُقُوْعِ الطَّلَاقِ مِنْ حِيْنِ حَاضَتْ وَإِنْ قَالَ لَهَا إِذَا حِضْتِ حَيْضَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تُطَلَّقْ حَتّٰى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا وَطَلَاقُ الْاَمَةِ تَطْلِيْقَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا وَطَلَاقُ الْحُرَّةِ ثَلَاثٌ حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا ثَلَاثًا وَقَعْنَ عَلَيْهَا وَإِنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ بَانَتْ بِالْاُوْلٰى وَلَمْ يَقَعِ الثَّانِيَةُ وَالثَّالِثَةُ وَإِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً قَبْلَ وَاحِدَةٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ وَإِنْ قَالَ لَهَا وَاحِدَةً عَلَيْهَا قَبْلَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ وَإِنْ قَالَ وَاحِدَةً بَعْدَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ وَاحِدَةٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে যে, যখন তোমার হায়েয আসবে তখন তোমাকে তালাক এবং অমুক মহিলা (স্ত্রী)-কে তোমার সাথে (তালাক)। স্ত্রী বলল আমার হায়েয এসে গেছে, তখন শুধু এই স্ত্রীর তালাক হবে সাথের স্ত্রীর তালাক হবে না। আর যখন স্বামী এটা বলে যে যখন তোমার হায়েয এসে যাবে তখন তোমার তালাক, এরপর স্ত্রী রক্ত দেখল, তখন তালাক হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তিন দিন রক্ত জারি না থাকে। এরপর যখন তিন দিন পূর্ণ হয়ে যাবে তখন আমরা ঐ সময় থেকে তালাকের হুকুম দিব যখন থেকে তার রক্ত এসে ছিল। আর যদি এরূপ বলে যে, যখন তোমার এক হায়েয এসে যায় তখন তোমার তালাক, এতে এক হায়েয থেকে পবিত্র হওয়ার পূর্বে তালাক হবেনা। এবং বাঁদি দু'টি তালাকের মালিক এবং তার ইদ্দত দু'হায়েয, তার স্বামী স্বাধীন হোক বা গোলাম। আর স্বাধীন মহিলা তিনটি তালাকের মালিক, তার স্বামী স্বাধীন হোক বা গোলাম। যদি কেউ স্বীয় স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তিন তালাক দিয়ে দেয়, তখন তিনটি পতিত হয়ে যাবে, আর যদি পৃথক পৃথক দেয়, তখন প্রথম (তালাকেই) বায়েনা হয়ে যাবে, দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি পতিত হবে না। যদি স্ত্রীকে বলে যে, তোমাকে এক তালাক এবং একটি উহার ওপর, (তখন) এক তালাক পতিত হবে, আর যদি বলে একের পূর্বে এক তালাক, তখন এক তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে এরূপ একটি যে তার পূর্বেও একটি, তখন দু'টি পতিত হবে, আর যদি বলে একের পর এক তালাক তখন এক তালাক পতিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তালাকের সংখ্যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অবস্থার প্রেক্ষিতে হবে?

قَوْلُهُ وَطَلَاقُ الْاَمَةِ الخ ঃ হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তালাকের সংখ্যা স্ত্রীর অবস্থার প্রেক্ষিতে হবে অর্থাৎ স্ত্রী স্বাধীন হলে তিন তালাকের মালিক হবে আর স্ত্রী বাঁদি হলে এক তালাকের মালিক হবে। জমহুর এর মতে স্বামীর অবস্থার প্রেক্ষিতে হবে অর্থাৎ স্বামী স্বাধীন হলে স্ত্রী তিন তালাকের মালিক হবে আর স্বামী গোলাম হলে স্ত্রী দুই তালাকের মালিক হবে। তাদের প্রমাণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাণী– তালাকের হিসাব পুরুষের দিকে থেকে আর ইদ্দতের হিসাব মহিলাদের পক্ষ থেকে। আমাদের প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর বাণী যে বাঁদির তালাক দু'টি আর তার ইদ্দত দু'হায়েয। জমহুর-এর প্রমাণিত হাদীসের উত্তরে আমরা বলি যে, ঐ হাদীসের দ্বারা উদ্দেশ্য তালাক পতিত করবে স্বামীর পক্ষ থেকে, তালাকের সংখ্যা উদ্দেশ্য নয়।

وَإِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ اَوْ مَعَ وَاحِدَةٍ اَوْمَعَهَا وَاحِدَةٌ وَقَعَتْ ثِنْتَانِ وَإِنْ قَالَ لَهَا اِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَاَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَ وَاحِدَةً فَدَخَلَتِ الدَّارَ وَقَعَتْ عَلَيْهَا وَاحِدَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا تَقَعُ ثِنْتَانِ وَإِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ بِمَكَّةَ فَهِىَ طَالِقٌ فِى الْحَالِ فِىْ كُلِّ الْبِلَادِ وَكَذٰلِكَ اِذَا قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ فِى الدَّارِ وَإِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ اِذَا دَخَلْتِ بِمَكَّةَ لَمْ تُطَلَّقْ حَتّٰى تَدْخُلَ مَكَّةَ وَإِنْ قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِىْ وَإِنْ قَالَ لِاِمْرَاَتِهِ اِخْتَارِىْ نَفْسَكِ يَنْوِىْ بِذٰلِكَ الطَّلَاقَ اَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ فَلَهَا اَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا مَا دَامَتْ فِىْ مَجْلِسِهَا ذٰلِكَ فَاِنْ قَامَتْ مِنْهُ اَوْ اَخَذَتْ فِىْ عَمَلٍ اٰخَرَ خَرَجَ الْاَمْرُ مِنْ يَدِهَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি বলে এক তালাক একের পর বা একের সাথে বা উহার সাথে এক, তখন দু'তালাক পতিত হবে। আর যদি বলে যে, তুমি যদি ঘরে প্রবেশ করো তবে তোমাকে তালাক এক এবং এক, অতঃপর সে ঘরে প্রবেশ করল। তখন তার ওপর আবূ হানীফা (র.)-এর মতে এক তালাক পতিত হয়ে যাবে, সাহেবাইন (র.) বলেন, দু'টি পতিত হবে। আর যদি বলে তোমাকে মক্কায় তালাক, তখন সাথে সাথে তালাক পতিত হয়ে যাবে প্রত্যেক শহরে, অনুরূপভাবে যদি বলে যে, তোমাকে ঘরের মধ্যে তালাক (তখনও সাথে সাথে তালাক হয়ে যাবে)। আর যদি বলে যে, যখন তুমি মক্কায় প্রবেশ করবে তখন তোমাকে তালাক তখন সে মক্কায় প্রবেশ করা ব্যতীত তালাক হবে না। আর যদি বলে যে, তোমাকে কাল তালাক, তখন তার ওপর ফজরের ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে তালাক পতিত হয়ে যাবে, আর যদি কেউ তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি নিজকে ক্ষমতাপ্রয়োগ করে নাও, উহার দ্বারা স্বামী তালাকের নিয়ত করল অথবা বলল যে, তুমি নিজকে তালাক দিয়ে দাও, তখন স্ত্রী যতক্ষণ (ঐ) মজলিসে থাকবে নিজকে তালাক দিতে পারবে। যদি (স্ত্রী) মজলিস থেকে দাঁড়িয়ে যায় বা অন্য কোনো কাজে লেগে যায় তখন তার হাত থেকে ক্ষমতা চলে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَوْ مَعَ وَاحِدَةٍ الخ-এর আলোচনা ঃ আলোচ্য দু'অবস্থায় দুই তালাক পতিত হবে, কারণ مَعَ (সাথে) শব্দ এটা মিলিত হওয়াকে বুঝায়, সুতরাং উভয় তালাকের মাঝে পরস্পর পৃথক না হয়ে মিলিতভাবে পতিত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ اِخْتَارِىْ نَفْسَكِ-এর আলোচনা ঃ স্ত্রীকে তালাক দেয়ার মূল অধিকার স্বামীর। হাঁ, স্বামী যদি স্ত্রীকে এ অধিকার দেন, তবে অধিকার অনুযায়ী স্ত্রী নিজের ওপর তালাক পতিত করতে পারবে। আলোচ্য মাসআলায় এটাই বলা হয়েছে।

وَإِنْ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِىْ قَوْلِهٖ اِخْتَارِىْ نَفْسَكِ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً وَلَا يَكُوْنُ ثَلٰثًا وَإِنْ نَوَى الزَّوْجُ ذَالِكَ وَلَابُدَّ مِنْ ذِكْرِ النَّفْسِ فِىْ كَلَامِهٖ أَوْ فِىْ كَلَامِهَا وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فِىْ قَوْلِهٖ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ فَهِىَ وَاحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلٰثًا وَقَدْ أَرَادَ الزَّوْجُ ذَالِكَ وَقَعْنَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِىْ نَفْسَكِ مَتٰى شِئْتِ فَلَهَا أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا فِى الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ اِمْرَأَتِىْ فَلَهُ أَنْ يُّطَلِّقَهَا فِى الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ وَإِنْ قَالَ طَلِّقْهَا إِنْ شِئْتَ فَلَهُ أَنْ يُّطَلِّقَهَا فِى الْمَجْلِسِ خَاصَّةً وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كُنْتِ تُحِبِّيْنِىْ أَوْ تُبْغِضِيْنِىْ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَتْ أَنَا أُحِبُّكَ أَوْ أُبْغِضُكَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهَا خِلَافُ مَا أَظْهَرَتْ وَإِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ فِىْ مَرَضِ مَوْتِهٖ طَلَاقًا بَائِنًا فَمَاتَ وَهِىَ فِى الْعِدَّةِ وَرِثَتْ مِنْهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا مِيْرَاثَ لَهَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর যদি সে স্বামীর কথা 'তুমি তোমাকে গ্রহণ করে নাও' এ কথার পর নিজকে গ্রহণ করে নেয় (অর্থাৎ নিজেকে স্বামীর বন্ধন থেকে বিচ্ছেদ করে নেয়) তখন এক তালাকে বায়েনা হবে, তিন তালাক হবেনা, যদিও স্বামী তিন (তালাক)-এর নিয়ত করে। আর পুরুষ বা মহিলা উভয়ের যে কোনো একজনের কথায় 'নফস' (তথা সত্তা) শব্দের উল্লেখ থাকা জরুরি। এবং স্বামীর কথা 'তুমি তোমার সত্তাকে তালাক দাও' এর মধ্যে যদি সে (স্ত্রী) নিজেকে তালাক দেয় তখন এক তালাকে رَجْعِى হবে। আর যদি স্ত্রী তিন তালাক দিয়ে দেয় আর স্বামী বলে যখন তুমি চাও নিজকে তালাক দিয়ে দেবে, তখন স্ত্রী নিজকে ঐ মজলিসেও তালাক দিতে পারবে এবং উহার পরও পারবে। আর যদি স্বামী কোনো ব্যক্তিকে বলে, 'তুমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও' (যদি তুমি চাও) তখন সে ব্যক্তি শুধু ঐ মজলিসে তালাক দিতে পারবে। আর যদি স্বামী স্ত্রীকে বলে তুমি যদি আমার সাথে ভালবাসা বা বিদ্বেষ রাখো তবে তুমি তালাক। স্ত্রী উত্তরে বলল, আমি তোমার সাথে ভালবাসা বা বিদ্বেষ রাখি, তবে তালাক পতিত হয়ে যাবে। যদিও স্ত্রীর অন্তরে যা প্রকাশ করেছে এর বিপরীত থেকে থাকে। আর কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে নিজের মৃত্যুশয্যায় طَلَاقِ بَائِنْ দেয়, এরপর সে মারা যায়, স্ত্রী যদি স্বামী মৃত্যুবরণ করার সময় স্বীয় ইদ্দত পালন অবস্থায় থাকে তখন স্ত্রী স্বামীর উত্তরাধিকার হবে। আর যদি স্বামী ইদ্দত পালনের পর মারা যায় তবে স্ত্রীর জন্য মিরাস হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً الخ ঃ এ মাসআলায় এক তালাকে বায়েনা এ জন্য হবে যে, اِخْتَارِىْ نَفْسَكِ এটা كِنَايَاتْ (অপ্রকাশ্য)-এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব নিয়ত ব্যতীত হবে না। আর كِنَايَاتْ শব্দাবলীর দ্বারা طَلَاقِ بَائِنْ পতিত হয়।

قَوْلُهُ فِى الْمَجْلِسِ وَبَعْدَهُ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রী শুধু যে কোনো এক মজলিসে নিজকে এক বার তালাক দিতে পারবে। কারণ حَتّٰى শব্দ দ্বারা যে কোনো কালকে অনির্দিষ্টভাবে বুঝানো হয়, ক্রিয়াকে একাধিক বার করা বুঝানো হয় না।

وَإِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ اَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُتَّصِلًا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَ لَهَا اَنْتِ طَالِقٌ ثَلٰثًا اِلَّا وَاحِدَةً طُلِّقَتْ ثِنْتَيْنِ وَإِنْ قَالَ ثَلٰثًا اِلَّا ثِنْتَيْنِ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ إِمْرَاتَهُ اَوْ شِقْصًا مِنْهَا اَوْ مَلَكَتِ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا اَوْ شِقْصًا مِنْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে বলে যে, 'তুমি তালাক' ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চায়) আর এ বাক্যটি সে সাথে সাথে বলেছে তবে তালাক পতিত হবে না। যদি স্ত্রীকে বলে যে, তোমাকে তিন তালাক কিন্তু একটি (নয়) তখন দু'টি পতিত হবে। আর যদি বলে যে, তিনটি কিন্তু দু'টি (নয়) তখন একটি পতিত হবে। আর যখন স্বামী (গোলাম-বাঁদির প্রথা হিসাবে) স্ত্রীর মালিক হয়ে যায় বা স্ত্রীর কিছু অংশের (মালিক হয়ে যায়), অথবা স্ত্রী স্বামীর মালিক হয়ে যায় বা স্বামীর আংশিক (মালিক হয়ে যায়) তখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে (বিবাহ) বিচ্ছেদ ঘটে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মৃত্যু শয্যায় তালাক দেওয়ার বিধানে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ فِيْ مَرَضِ مَوْتِهِ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে স্ত্রী ইদ্দতের পরও উত্তরাধিকার হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে অপর স্বামীর কাছে বিবাহ না বসে। ইমাম মালেক (র.)-এর মতে যদি ঐ স্ত্রী দশ জন স্বামীর কাছেও বিবাহ বসে তখনও উত্তরাধিকার হবে।

ইনশাআল্লাহ বলে তালাক দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ الخ ঃ এ মাসআলায় তরফাইন (র.) এবং শাফেয়ী (র.)-এর মতে তালাক পতিত হবে না, ইমাম মালেক (র.)-এর মতে তালাক, এতাক তথা আজাদ করা ও সদকা ইনশাআল্লাহ বলার দ্বারা বাতিল হয় না, শপথ ও মানত বাতিল হয়ে যায়। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে শুধু তালাক বাতিল হবে না। আমাদের প্রমাণ ঐ সব হাদীস যে গুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, তালাক এতাক ইত্যাদির মধ্যে সাথে সাথে اِسْتِثْنَاء করার দ্বারা তালাক পতিত হয় না।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) اُكْتُبْ مُنَاسَبَةَ كِتَابِ الطَّلَاقِ مَعَ كِتَابِ الرِّضَاعِ وَالنِّكَاحِ ـ
(٢) مَا مَعْنَى الطَّلَاقِ لُغَةً وَاِصْطِلَاحًا؟ وَكَمْ قِسْمًا لَهُ؟ بَيِّنْ بِالتَّفْصِيْلِ ـ
(٣) هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيْ حَالَةِ الْحَيْضِ وَمَا حُكْمُهُ فِيْ حَالَةِ الْحَمْلِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ
(٤) بَيِّنْ حُكْمَ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَالْمُكْرِهِ وَالْاَخْرَسِ وَالطَّلَاقِ بِالْاِشَارَةِ بِالْيَقْظِ التَّامِّ ـ
(٥) كَمْ قِسْمًا لِلطَّلَاقِ بِاِعْتِبَارِ اللَّفْظِ؟ وَكَيْفَ يَقَعُ الطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ وَالْبَائِنُ؟ بَيِّنْ بِالْاِيْضَاحِ التَّامِّ ـ
(٦) هَلْ تَرَاثُ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا بَعْدَ طَلَاقِهَا فِيْ بَعْضِ الْاَحْوَالِ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ
(٧) مَا حُكْمُ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَاِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ بِمَكَّةَ اَوْقَالَ اَنْتِ طَالِقٌ غَدًا اَوْ اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا اِلَّا وَاحِدَةً ـ

بَابُ الرَّجْعَةِ

প্রত্যাহারযোগ্য তালাক অধ্যায়

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) তালাক পর্বের পর بَابُ الرَّجْعَةِ -কে এ জন্য এনেছেন যে, স্বভাবত প্রথম তালাক দেওয়া হয়। পরে ঐ তালাককে কোনো কোনো সময় প্রত্যাহার করা হয়। رَجْعَة যেহেতু স্বভাবত পরে আসে, তাই বিন্যাসেও পরে আনা হয়েছে যাতে বিন্যাসে আনা স্বভাবের সাথে মিলে যায়।

رَجْعَة-এর আভিধানিক অর্থ ঃ رَجْعَة এটা বাবে ضَرَبَ থেকে অর্থ– প্রত্যাবর্তন করা।

رَجْعَة-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ ফিকহশাস্ত্রবিদগণের পরিভাষায় তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর ইদ্দত পালনের সময় তার লজ্জাস্থানের অধিকারকে পুনরায় বহাল রাখার জন্য তার দিকে প্রত্যাবর্তন করা। কেউ কেউ رَجْعَة-এর সংজ্ঞা বলেছেন, তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে ইদ্দতের মধ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে বহাল রাখা।

رَجْعَة যে সব অবস্থায় শুদ্ধ হয় ঃ رَجْعَة ইচ্ছায় জবরদস্তী, হাসি-ঠাট্টা, খেলা-ধুলা ও ভুলবশত সর্বাবস্থায়ই শুদ্ধ হয়ে যায়।

যে সকল শব্দ ও কাজের দ্বারা رَجْعَة শুদ্ধ হয় ঃ আমি তোমাকে প্রত্যাবর্তন করে নিলাম, আমি তোমাকে ভালবাসলাম, আমি তোমার থেকে প্রশান্তি লাভ করলাম এ সব প্রকাশ্য প্রত্যাবর্তনের শব্দাবলী দ্বারা رَجْعَة শুদ্ধ হয়। এরূপভাবে কাজের দ্বারা رَجْعَة হতে পারে। যেমন– সঙ্গম করা, চুম্বন করা, স্পর্শ করা, স্ত্রীর লজ্জাস্থানকে কামভাবের দৃষ্টিতে দেখা।

رَجْعَة শুদ্ধ হওয়ার শব্দাবলীর মধ্যে মতভেদ ঃ আমাদের মাযহাবে তো উপরোক্ত শব্দাবলী ও কাজে رَجْعَة শুদ্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে رَجْعَة শুধু কথার মাধ্যমে শুদ্ধ হবে, কাজের দ্বারা নয়। আর বোবা ব্যক্তির رَجْعَة ইঙ্গিত-এর মাধ্যমে শুদ্ধ হবে। উল্লিখিত মতভেদের রহস্য এই যে, শাফেয়ী (র.)-এর মতে رَجْعَة-এর তৎপর্য হলো এটা প্রাথমিক বিবাহ-এর স্তরে তাই এর জন্য শব্দের প্রয়োজন হবে। আর আমাদের মতে رَجْعَة প্রাথমিকভাবে বিবাহ নয় বরং পূর্বের বিবাহকে বহাল রাখা, তাই শব্দ ও কাজ উভয়টির দ্বারাই শুদ্ধ হবে।

তালাকের প্রকারভেদ ঃ পূর্বে তালাক পর্বের মধ্যে তালাকের শিষ্টাচার তিন প্রকার বর্ণনা করা হয়েছে, এখানে পতিত হওয়ার হিসাবে তালাকের প্রকার বর্ণনা করছি।

তালাক তিন প্রকার ঃ

১. তালাকে রেজয়ী ঃ স্বামী স্ত্রীকে একবার বা দু'বার বলল, তুমি তালাক। অথবা বলল, তুমি এক তালাক বা দু'তালাক। এ ধরনের তালাকের পর পুনরায় তাকে নতুন বিবাহ বন্ধন ছাড়াই স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, স্বামী স্ত্রীকে বলবে, আমি তোমাকে যে তালাক প্রদান করেছি তা প্রত্যাহার করছি, অথবা কোনো কিছু না বলে তার সাথে সহবাস করল অথবা সহবাসের নিয়তে তাকে স্পর্শ করল। স্বামীর এ সকল আচরণের মাধ্যমে নতুন বিবাহ ব্যতীতই স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক পুনর্বহাল হয়ে যাবে।

২. তালাকে বায়েন ঃ এই তালাক কোন কোন শব্দযোগে পতিত হয় তা ফিকহের কিতাবসমূহে কিংবা কোনো বিজ্ঞ আলিমের নিকট থেকে জানা যেতে পারে। এই তালাকের কারণে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। অতএব এ ক্ষেত্রে নতুনভাবে বিবাহ করে স্ত্রীকে গ্রহণ করতে কোনো বাধা নেই।

৩. তালাকে মুগাল্লাযা ঃ এর অর্থ হচ্ছে, একত্রে তিন তালাক প্রদান, অথবা পৃথক পৃথকভাবে তিন তালাক প্রদান। এ ক্ষেত্রে তালাকের পর হালালা ব্যতীত সেই স্ত্রীলোককে বিবাহ করা জায়েজ নেই। অর্থাৎ তালাকের পর ইদ্দত শেষ হলে অন্য কারো সাথে বিবাহ হওয়ার পর এবং সহবাসের পর যদি দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেয় তবে ইদ্দতান্তে পূর্বের স্বামী তাকে বিবাহ করার সুযোগ পাবে।

উল্লেখ্য যে, বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির তালাক কার্যকর হয়ে থাকে। এভাবে জবরদস্তিমূলকভাবে কিংবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক প্রদান করলেও তা কার্যকর হয়ে যায়। তবে নাবালেগ, পাগল কিংবা ঘুমন্ত ব্যক্তির তালাক গ্রহণযোগ্য নয়।

বৈধ হলেও তালাক সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য ঃ তালাকের সরল অর্থ হচ্ছে, স্বামী ও স্ত্রীর পৃথক হয়ে যাওয়া এবং তারা আল্লাহর আইন মোতাবেক পরস্পর যে সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তা নাকচ করে দেওয়া। মানুষের পক্ষ থেকে আল্লাহর আইন নাকচ করে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আল্লাহর মধ্যস্থতাকে ভঙ্গ করা। যারা এমন করে তারা নিজেরাই নিজেদের ভালবাসা ও শান্তির অবসান ঘটায়। কোনো রকমের অপরিহার্য কারণ ছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করা মূলত আল্লাহর আইনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ব্যতীত অন্য কিছু নয়। নবী করীম (সা.) বলেছেন, তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমার সাথে খেলা করছো? কখনো বলো যে তালাক দিয়েছি, আবার কখনো (তা) ফিরিয়ে নাও। আল্লাহর কিতাবের সাথে কি খেলা করা হচ্ছে? অথচ আমি এখনো তোমাদের মধ্যে বর্তমান রয়েছি।

এ সকল বাক্য নবী করীম (সা.) এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে বলেছেন, যে তার স্ত্রীকে বিনা কারণে তালাক দিয়েছিল। অথচ ইসলামি শরিয়ত একান্ত অনন্যোপায় অবস্থায় তালাকের অনুমতি দিয়ে থাকে। আসলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কের চরম অবনতিশীল অবস্থার প্রেক্ষিতে যখন একত্রে দাম্পত্য জীবন যাপনের অন্য কোনো বিকল্প পন্থাই অবশিষ্ট থাকে না, ঠিক তখনই স্বামীকে এই শেষ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তাইতো তালাকের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রিয়নবী (সা.) বলেন, 'আল্লাহর কাছে হালাল বিষয়াবলীর মধ্যে সবচেয়ে ঘৃণ্য বিষয় হচ্ছে তালাক।' নবী করীম (সা.) বলেন, 'আল্লাহ তালাকের চেয়ে বেশি নিন্দনীয় বিষয় আর কিছুই সৃষ্টি করেননি।'

হযরত আলী (রা.) প্রিয় নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, বিয়ে করো কিন্তু তালাক দিও না, কারণ তালাক এমন বিষয় যার কারণে আরশও নড়ে ওঠে।

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَاتَهُ تَطْلِيقَةً رَجْعِيَّةً أَوْتَطْلِيقَتَيْنِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِيْ عِدَّتِهَا رَضِيَتِ الْمَرْأَةُ بِذَالِكَ أَوْ لَمْ تَرْضِ وَالرَّجْعَةُ أَنْ يَقُولَ لَهَا رَاجَعْتُكِ أَوْ رَاجَعْتُ إِمْرَاتِي أَوْ يَطَاهَا أَوْ يُقَبِّلُهَا أَوْ يَلْمِسُهَا بِشَهْوَةٍ أَوْ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهِ بِشَهْوَةٍ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ شَاهِدَيْنِ وَإِنْ لَّمْ يُشْهِدْ صَحَّتِ الرَّجْعَةُ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْكُنْتُ رَاجَعْتُهَا فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَتْهُ فَهِيَ رَجْعَةٌ وَإِنْ كَذَّبَتْهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَلَا يَمِيْنَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ قَدْ رَاجَعْتُكِ فَقَالَتْ مُجِيْبَةً لَهُ قَدْ إِنْقَضَتْ عِدَّتِيْ لَمْ تَصِحُّ الرَّجْعَةُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِذَا قَالَ زَوْجُ الْأَمَةِ بَعْدَ إِنْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَدْكُنْتُ رَاجَعْتُكِ فِي الْعِدَّةِ فَصَدَّقَهُ الْمَوْلٰى وَكَذَّبَتْهُ الْأَمَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ إِنْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَإِنْ لَّمْ تَغْتَسِلْ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যখন কোনো ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে এক তালাকে রেজয়ী বা দু'টি (তালাক) দিয়ে দেয়, তবে সে স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে, স্ত্রী উহাতে সন্তুষ্ট হোক বা না হোক। আর رَجْعَتْ বলে এটা বলা যে, আমি তোমাকে প্রত্যাবর্তন করলাম, বা আমি স্বীয় স্ত্রীকে প্রত্যাবর্তন করলাম, বা স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে নেওয়া, বা চুম্বন করা, বা তাকে কামভাবের সাথে স্পর্শ করা, বা স্ত্রীর লজ্জাস্থান দেখে নেওয়া। এবং رَجْعَتْ (তথা প্রত্যাবর্তন) এর ওপর দু'জন সাক্ষীকে সাক্ষী বানানো মোস্তাহাব। আর যদি সাক্ষী না করা হয় তবুও رَجْعَتْ শুদ্ধ হয়ে যাবে। এবং যখন ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায়, এরপর স্বামী বলল যে, আমি তোমাকে ইদ্দতের মধ্যে رَجْعَتْ করে নিয়েছি। এরপর স্ত্রী এটাকে সত্য মনে করল তবে رَجْعَتْ হয়ে গেছে, আর যদি স্ত্রী মিথ্যা মনে করে তবে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য এবং আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কোনো শপথ আসবে না। আর যখন স্বামী বলে আমি তোমাকে رَجْعَتْ করে নিয়েছি, স্ত্রী প্রতি উত্তরে বলল, আমার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেছে, তবে رَجْعَتْ শুদ্ধ হবে না (এটা) ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। এবং যখন বাঁদির স্বামী ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর বলে আমি তার সাথে رَجْعَتْ করেছি, মনিব এ কথা সত্য মনে করেছে। পক্ষান্তরে বাঁদি মিথ্যা মনে করেছে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বাঁদির কথা গ্রহণযোগ্য। এবং যখন তৃতীয় মাসিক এর রক্ত দশ দিনের পর বন্ধ হয় তবে رجعة শেষ হয়ে যাবে, আর ইদ্দতও অতিবাহিত হয়ে যাবে যদিও গোসল না করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

رَجْعَتْ-এর সাক্ষীর ব্যাপারে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ اَنْ يُّشْهِدَ عَلَى الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে رَجْعَتْ-এর সময় দু'জন বিশ্বস্ত লোককে সাক্ষী বানানো মোস্তাহাব। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর এক মত অনুযায়ী সাক্ষী বানানো ওয়াজিব। তাদের প্রমাণ আল্লাহ তায়ালার বাণী– وَاَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ এ আয়াতে তারা اَمْر-কে وُجُوْب তথা আবশ্যকীয় হিসাবে মেনে নিয়েছেন। আমাদের প্রমাণ, আল্লাহ তা'আলার বাণী– فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ (الاية) অর্থাৎ তখন তোমরা নিয়ম অনুযায়ী তাদেরকে রেখে দাও। এ আয়াতে সাক্ষী বানানোর কথা বলা হয়নি, এছাড়া অপর আয়াতে এরূপ এরশাদ হয়েছে– فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ (الاية) এ আয়াতেও সাক্ষীর কথা বলা হয়নি, অপর আর একটি আয়াতেও সাক্ষীর কথা বলা হয়নি। যেমন– وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (الاية) অর্থ ঃ তাহলে তাদেরকে ফিরিয়ে নেবার অধিকার তাদের স্বামীরা সংরক্ষণ করে। অপর আয়াতে আরো স্পষ্ট এরশাদ হচ্ছে- فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَّتَرَاجَعَا অর্থাৎ স্বামী স্ত্রী পরস্পর প্রত্যাবর্তন করলে কোনো অসুবিধা নেই, এক কথায় এ সকল আয়াত সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, এসব আয়াত مُطْلَقْ এসব আয়াতে اَمْر টি اِبَاحَتْ তথা শুধু বৈধ বুঝায় وُجُوْب তথা আবশ্যকীয় বুঝায় না। এরূপ নবী করীম (সা.)-এর বাণী- "مُرْ اِبْنَكَ فَلْيُرَاجِعْ" এ হাদীস দ্বারা اِبَاحَتْ (বৈধ) বুঝা যায়, وجوب নয়।

قَوْلُهُ فَصَدَّقَتْهُ ঃ স্বামী স্ত্রীর পরস্পরকে সত্য মনে করার দ্বারা বিবাহ যেহেতু শুদ্ধ হয় তাই رَجْعَتْ আরো উত্তম পন্থায় শুদ্ধ হয়ে যাবে, হাঁ যদি স্ত্রী অস্বীকার করে দেয় তখন رَجْعَتْ শুদ্ধ হবে না।

দশ দিনের বেশিতে মাসিক বন্ধ হওয়ার পর رَجْعَتْ -এর বিধান ঃ

قَوْلُهُ اِنْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ ঃ যেহেতু দশ দিনের বেশি হায়েয আসে না অতএব রক্ত বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে হায়েয শেষ, আর হায়েয শেষ হওয়ার সাথে সাথে ইদ্দত খতম আবার ইদ্দত খতম হওয়ার সাথে সাথে رَجْعَتْ-এর অধিকার শেষ। আর যদি দশ দিনের কমে রক্ত বন্ধ হয় তখন رَجْعَتْ-এর অধিকার শেষ হবে না, কারণ হায়েযের সময় বাকি আছে এবং রক্ত আসতে পারে, হাঁ যদি নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে যায় বা তায়াম্মুম করে নামাজ পড়ে নেয়, তখন رَجْعَتْ-এর অধিকার শেষ। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, তায়াম্মুম করার সাথে সাথে رَجْعَتْ-এর অধিকার শেষ হয়ে যাবে, কারণ তার জন্য তায়াম্মুমের দ্বারা ঐ সব বস্তু বৈধ হয়, যা গোসলের দ্বারা হয়, সুতরাং সে গোসল করার ন্যায় হয়ে গেছে। অতএব رَجْعَتْ -এর অধিকার শেষ। শায়খাইন (র.) বলেন যে, তায়াম্মুম অপবিত্রতাকে একেবারের দূর করে দেয় না সুতরাং পানি ব্যবহারের সুযোগ পেলেই তায়াম্মুম বাতিল হয়ে যায়। হাঁ যদি তায়াম্মুম দ্বারা নামাজ পড়ে নেয় তখন তার সাথে এমন বিধান যুক্ত হয়ে গেছে যা বাতিল হওয়ার অবকাশ রাখে না।

وَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ حَتّٰى تَغْتَسِلَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلٰوةٍ أَوْ تَتَيَمَّمَ وَتُصَلِّيَ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ وَأَبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا تَيَمَّمَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ وَإِنْ لَّمْ تُصَلِّ وَإِنْ اغْتَسَلَتْ وَنَسِيَتْ شَيْئًا مِّنْ بَدَنِهَا لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ فَإِنْ كَانَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا فَوْقَهُ لَمْ تَنْقَطِعِ الرَّجْعَةُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ انْقَطَعَتِ الرَّجْعَةُ وَالْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ تَتَشَوَّفُ وَتَتَزَيَّنُ وَيُسْتَحَبُّ لِزَوْجِهَا أَنْ لَّا يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتّٰى يَسْتَأْذِنَهَا وَيُسْمِعَهَا خَفْقَ نَعْلَيْهِ وَالطَّلَاقُ الرَّجْعِيُّ لَا يُحَرِّمُ الْوَطْئَ وَإِنْ كَانَ طَلَاقًا بَائِنًا دُوْنَ الثَّلٰثِ فَلَهُ أَنْ يَّتَزَوَّجَهَا فِيْ عِدَّتِهَا وَبَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ ثَلٰثًا فِي الْحُرَّةِ أَوْ اِثْنَتَيْنِ فِي الْأَمَةِ لَمْ تَحِلَّ لَهٗ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ نِكَاحًا صَحِيْحًا وَيَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا أَوْ يَمُوْتَ عَنْهَا۔

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি দশ দিনের কমে রক্ত বন্ধ হয় তবে رَجْعَة -এর সময় শেষে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল না করে বা এক নামাজের সময় অতিবাহিত না হয়, বা তাইয়াম্মুম করে নামাজ না পড়ে (এটা) শায়খাইনের (র.) অভিমত। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, যখন তায়াম্মুম করে ফেলে তখনই رَجْعَة-এর সময় শেষ হয়ে যাবে যদিও নামাজ না পড়ে, আর যদি স্ত্রী গোসল করার সময় শরীরের কোনো এক অংশ পানি পৌছাতে ভুলে যায়, যদি (তার পরিমাণ) এক অঙ্গ বা তার থেকে বেশি হয় তবে رَجْعَة -এর সময় শেষ হবে না। আর যদি এক অঙ্গ থেকে কম (পরিমাণ) হয় তবে (رَجْعَة -এর সময়) শেষ হয়ে যাবে। তালাকে রেজয়ীপ্রাপ্ত স্ত্রী কেশ বিন্যাস ও প্রসাধন গ্রহণ করবে, তার স্বামীর জন্য মোস্তাহাব যে, তার অনুমতি ব্যতীত তার কাছে প্রবেশ না করা বা তাকে নিজ পাদুকার আওয়াজ শুনানো (সে যাতে স্বামী আসতেছে বুঝতে পারে)। তালাকে রাজয়ী সঙ্গমকে হারাম করে না। যদি (স্ত্রীকে) তিনের চেয়ে কম তালাকে বায়েন দেয় তবে স্বামী তাকে তার ইদ্দতের মধ্যে বিবাহ করতে পারবে এবং ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পরও (বিবাহ করতে পারবে)। আর যদি স্বাধীন স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়া হয় বা বাঁদিকে দু'তালাক দেওয়া হয়, তবে স্ত্রী স্বামীর জন্য হালাল হবে না যে পর্যন্ত স্ত্রী অন্যের সাথে শুদ্ধভাবে বিবাহ বসে এবং ঐ স্বামী সঙ্গম করে তালাক দেয় বা মারা যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَشَوُّف ও تَزَيُّن -এর পার্থক্য ঃ تَشَوُّف অর্থ–কেশ বিন্যাস, অঙ্গসজ্জা, আর تَزَيُّن অর্থ– সৌন্দর্য গ্রহণ করা। কেউ কেউ বলেন, تَشَوُّف বলে চেহারাকে সৌন্দর্য করা। আর تَزَيُّن গোটা শরীরকে সৌন্দর্য করা।

তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলা দ্বিতীয় স্বামীর সহবাসের পর পুনরায় প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হওয়ার রহস্য ও হেকমত ঃ

قَوْلُهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا الخ : তিন তালাকের পর স্বামীর জন্য স্ত্রী হারাম হওয়া এবং স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহের পর আবার প্রথম স্বামীর জন্য বিবাহ করা জায়েজ হওয়ার হেকমত বা তাৎপর্য তিনিই জানতে পারেন, যিনি শরিয়তের তত্ত্ব ও রহস্যাবলী এবং আল্লাহর বিধানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সম্পর্কে অবগত রয়েছেন। উল্লেখ্য যে, এ সম্পর্কিত বিধানসমূহ প্রত্যেক যুগের এবং প্রত্যেক উম্মতের অবস্থা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রকম ছিল। তাওরাতের বিধান তালাকের পর স্ত্রীর দ্বিতীয় বিবাহ না করা পর্যন্ত স্বামীর জন্য তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা জায়েজ রেখেছিল। তবে স্ত্রী দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করে ফেললে প্রথম স্বামীর জন্য কোনো অবস্থাতেই আর তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করা জায়েজ ছিল না। আল্লাহর এই হুকুমে যে কল্যাণ ও হেকমত ছিল তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কেননা স্বামী যখন জানতে পারতো যে, আমি যদি স্ত্রীকে তালাক দেই তবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে; তার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করারও জায়েজ হয়ে যাবে। সে যদি দ্বিতীয় বিবাহ করেই ফেলে, তবে আমার জন্য সে চিরদিনের মতো হারাম হয়ে যাবে।

এ বিষয়গুলো মনে উদিত হওয়ার পর স্ত্রীর সাথে স্বামীর সম্পর্ক ও ঘনিষ্টতা আরও দৃঢ়তর হতো। স্ত্রীর বিরহকে স্বামী অত্যন্ত অসহনীয় মনে করতো। তাওরাতের বিধান হযরত মূসা (আ.)-এর উম্মতের মেজাজ ও অবস্থা অনুযায়ীই অবতীর্ণ হয়েছিল। কেননা তাদের মেজাজে কঠোরতা, ক্রোধ ও জিদ প্রবল ছিল। অতঃপর ইনজীলের বিধান অবতীর্ণ হয়। এই বিধান বিবাহের পর তালাকের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। পুরুষ কোনো নারীকে বিবাহ করে ফেললে পুরুষের পক্ষে কোনো অবস্থাতেই আর এই স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েজ ছিল না। ব্যাপক রদবদল ও পরিমার্জনের কল্যাণে আধুনিক খ্রিস্টবাদে এখন আর ইনজীলের এই বিধানের অস্তিত্বে বিদ্যমান নেই। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ হতে শরিয়তে মুহাম্মদী অবতীর্ণ হয়, যা পূর্ববর্তী সকল শরিয়ত হতে পরিপূর্ণ, সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং মজবুত ও সুদৃঢ়। এটা মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের পক্ষে সর্বাধিক উপকারী ও উপযোগী এবং যুক্তি ও বুদ্ধির অধিক অনুকূল। আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতকে পরিপূর্ণ দীন দিয়েছেন, তদের প্রতি স্বীয় নেয়ামতরাজি পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। এই উম্মতের জন্য কিছু বিষয় হালাল করে দিয়েছেন, যেগুলো পূর্ববর্তী কোনো উম্মতের জন্য হালাল ছিল না। যেমন– পুরুষ প্রয়োজন অনুযায়ী চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখতে পারে। আবার স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি অমিল দেখা দেয়, তবে স্বামীর জন্য সে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রীলোক বিবাহ করার অনুমতি রয়েছে। কেননা, প্রথম স্ত্রী যখন স্বামীর মনঃপূত না হয় অথবা স্ত্রীর পক্ষ হতে কোনো মতবিরোধ ঘটে এবং সে উহা হতে বিরত না হয়, তবে ইসলামি শরিয়ত এরূপ স্ত্রীকে পুরুষের হাত-পা ও গর্দানের শিকল বানিয়ে তাতে জিঞ্জির বদ্ধ করার এবং কোমর ভাঙ্গা বোঝা বানিয়ে রাখার বিধান দেয়নি। ইসলামি বিধান দুনিয়াতে পুরুষের সাথে এরূপ স্ত্রীর সম্বন্ধ রেখে তার জন্য দোজখ বানিয়ে রাখতে চায় না। কবির ভাষায়–

زن بد در سرائے مردنكو * همدريں عالم است دوزخ او

অর্থ : পৃথিবীর পান্থশালায় কোনো সজ্জনের স্ত্রী যদি অসৎ প্রকৃতির হয় তবে এই ইহলোকই তার জন্য দোজখ হয়ে দেখা দেয়।

অতএব আল্লাহ তা'আলা এরূপ স্ত্রীর বিচ্ছিন্নতা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। এই বিচ্ছিন্নতারও পন্থা এভাবে বিধিবদ্ধ করেছেন যে, স্বামী স্ত্রীকে এক তালাক দেবে, অতঃপর স্ত্রী তিন তুহুর বা তিন মাস পর্যন্ত স্বামীর রুজু করার অপেক্ষা করবে। ইত্যবসরে যদি স্ত্রী ঠিক হয়ে যায় এবং অনিষ্টতা হতে প্রত্যাবর্তন করে এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণ হয় অর্থাৎ অন্তরের গতি পরিবর্তনকারী আল্লাহ যদি পুরুষের অন্তরকে স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট করে দেন, তবে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর রুজু করা সম্ভব হতে পারে এবং স্বামীর জন্য রুজু করার দরজা খোলা থাকবে। যাতে স্বামী স্ত্রীর প্রতি রুজু করতে পারে এবং যে বিষয়টি সে ক্রোধ ও শয়তানী প্ররোচনায় হস্তচ্যুত করে দিয়েছিল, তা হস্তগত করতে পারে। যেহেতু এক তালাকের পর আবারও উভয় পক্ষে নফসের দ্বিতীয় তালাক দেওয়া বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। যাতে স্ত্রী বারবার তালাকের তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করে ও স্বীয় ঘর ভাঙ্গার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে অনিষ্টকর কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তি না করে, যে কারণে স্বামী ক্রোধান্বিত হয় এবং তার বিচ্ছিন্নতার কারণ ঘটে। অনুরূপভাবে স্বামীও যেন স্ত্রীর বিচ্ছেদ উপলব্ধি করে স্ত্রীকে তালাক না দেয়।

এভাবে যদি তৃতীয় তালাকের পর্যায় এসে যায় তবে এটা হবে এমন তালাক, যার পর আল্লাহর হুকুম হচ্ছে– স্বামী আর এই তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর প্রতি রুজু করতে পারবে না। এ জন্য উভয় পক্ষকে বলে দেওয়া হয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় তালাক পর্যন্ত তোমাদের পরস্পরের রুজু করা সম্ভব ছিল, কিন্তু এখন তৃতীয় তালাকের পর আর রুজু করা যাবে না। আল্লাহর এই বিধান নির্ধারিত হওয়ার ফলে উভয়েই সংশোধন হয়ে যাবে। স্বামী যখন অনুভব করবে যে, এই তৃতীয় তালাক তার ও তার স্ত্রীর মাঝের শেষ সম্পর্কটুকুরও অবসান ঘটাবে, তখন সে এই তালাক হতে বিরত থাকবে। কেননা স্বামী যখন জানতে পারবে যে, তৃতীয় তালাকের পর এই স্ত্রী অন্য ব্যক্তির নিকট শরিয়তের প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ বিবাহ এবং সেই স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্ত হওয়া ও উহার ইদ্দত পালন ব্যতীত আমার জন্য হালাল হবে না। তা ছাড়া দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহ বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে আসাও নিশ্চিত

নয়। দ্বিতীয় বিবাহের পরও যতদিন পর্যন্ত না দ্বিতীয় স্বামী তার সাথে সহবাস করবে এবং সহবাসের পর হয় দ্বিতীয় স্বামীর মৃত্যু হবে অথবা স্বেচ্ছায় তালাক দেবে এবং স্ত্রী ইদ্দতের সময় অতিক্রম করবে, ততদিন পর্যন্ত প্রথম স্বামী তাকে পুনঃবিবাহ করতে পারবে না। এমতাবস্থায় পুনঃবিবাহের ব্যাপারে নৈরাশ্য ও হাতাশা এবং উহার উপলব্ধি স্বামীর মধ্যে দূরদর্শিতা সৃষ্টি করবে এবং সে আল্লাহর অত্যন্ত অপছন্দনীয় মুবাহ কাজ অর্থাৎ তালাক দেওয়া হতে বিরত থাকবে। এভাবে স্ত্রীও যখন জানতে পারবে যে, তিন তালাকের পর স্বামী তাকে আর গ্রহণ করতে পারবে না, তখন তার আচার আচরণও সংযত হয়ে যাবে। এরূপে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধিত হয়ে যেতে পারবে।

স্ত্রীলোকের তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর দ্বিতীয় স্বামীর সঙ্গে বিবাহ সম্পর্কে নবী করীম (সা.) জোর দিয়ে বলেছেন যে, এই বিবাহ আজীবনের জন্য হতে হবে। সুতরাং দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি এই মহিলাকে আজীবন নিজের কাছে রাখার ইচ্ছায় বিবাহ না করে; বরং শুধু প্রথম স্বামীকে হালাল করে দেওয়ার জন্যই বিবাহ করে তবে হযরত (সা.) এরূপ ব্যক্তির প্রতি লানত করেছেন। এভাবে যদি প্রথম স্বামী-স্ত্রীকে কেবল হালাল করার উদ্দেশ্যেই কোনো ব্যক্তিকে রাজি করায়, তার প্রতিও লানত করেছেন।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ـ

অর্থ ঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, নবী করীম (সা.) হালাল করে দেওয়ার ইচ্ছায় বিবাহকারী ও হালাল করে দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে লোক নিয়োগকারীর ওপর অভিসম্পাত করেছেন। অতএব, শরিয়তের বিধান অনুযায়ী প্রকৃত হালাল হলো, দ্বিতীয় স্বামীর বিবাহিত জীবনে স্বয়ং এমন কোনো কার্যকারণের উদ্ভব হয়ে যাবে, যেভাবে প্রথম স্বামী ঘটনাক্রমে স্ত্রীকে তালাক দিয়েছিল, তেমনিভাবে দ্বিতীয় স্বামীও তাকে তালাক দিয়ে দেবে অথবা মৃত্যুবরণ করবে, তখনই কেবল স্ত্রীর ইদ্দতের সময় অতিক্রান্ত হলে প্রথম স্বামীর জন্য নির্দোষভাবে বিবাহ করা বৈধ হবে। সুতরাং এত কঠোর প্রতিবন্ধকতার পর প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রী গ্রহণ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এতে বিবাহের হুকুমের প্রতি ইজ্জত ও মর্যাদা প্রকাশ এবং আল্লাহর নেয়ামতের শুকরিয়া জ্ঞাপন ও বিবাহের স্থায়িত্ব ও বিচ্ছেদ না ঘটার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেননা, স্বামী যখন তালাকের কারণে স্ত্রীর বিচ্ছেদ হতে আরম্ভ করে পুনর্মিলন পর্যন্ত মাঝাখানে এই প্রতিবন্ধকতার কথা কল্পনা করবে, তখন সে আর তৃতীয় তালাক দেওয়ার পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছবে না।

তিন তালাক ও তার বিধান ঃ এ ক্ষেত্রে কুরআন মাজীদের বর্ণনাভঙ্গি লক্ষ্য করলে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, তালাক দেওয়ার শরিয়ত সম্মত বিধান হচ্ছে বড় জোর দুই তালাক পর্যন্ত দেওয়া যাবে। তৃতীয় তালাক দেওয়া উচিত হবে না। আয়াতের শব্দ اَلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ এরপর তৃতীয় তালাককে (যদিও) শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে এতে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। নতুবা বলা উচিত ছিল যে, অর্থাৎ তালাক তিনটি। তাই এর অর্থ হচ্ছে যে, তৃতীয় তালাক পর্যন্ত পৌঁছা উচিত নয়। আর এ জন্যই ইমাম মালেক এবং অনেক ফকীহ তৃতীয় তালাক দেওয়ার অনুমতি দেননি। তাঁরা একে তালাকে বিদ'আত বলেন। আর অন্যান্য ফকীহ্গণ তিন তুহুরে আলাদা আলাদাভাবে তিন তালাক দেওয়াও জায়েজ বলেন। এসব ফকীহ একেই সুন্নত তালাক বলেছেন। কিন্তু কেউই একথা বলেননি যে, এটাই তালাকের সুন্নত বা উত্তম পন্থা, বরং বিদআত তালাক এর স্থলে সুন্নত তালাক শুধু এ জন্য বলা হয়েছে যে, এটা বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত নয়। কুরআন ও হাদীসের এরশাদসমূহ এবং সাহাবী ও তাবেঈগণের কার্যপদ্ধতিতে প্রমাণিত হয় যে, যখন তালাক দেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকে না, তখন তালাক দেওয়ার উত্তম পন্থা হচ্ছে– এমন এক তুহুরে এক তালাক দেবে, যাতে সহবাস করা হয়নি। এই এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে। ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ সম্পর্ক এমনিতেই ছিন্ন হয়ে যাবে। ফকীহ্গণ একে আহসান বা উত্তম তালাক পদ্ধতি বলেছেন। সাহাবীগণও একেই তালাকের সর্বোত্তম পন্থা বলে অভিহিত করেছেন।

ইবনে আবী-শাইবা তাঁর গ্রন্থে হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (র.) থেকে উদ্ধৃত করেছেন যে, সাহাবীগণ তালাকের ব্যাপারে এ পদ্ধতিকেই পছন্দ করেছেন যে, মাত্র এক তালাক দিয়েই ছেড়ে দেবে এবং এতেই ইদ্দত শেষ হলে বিবাহ বন্ধন স্বাভাবিকভাবে ছিন্ন হয়ে যাবে। মোটকথা ইসলামি শরিয়ত তালাকের তিনটি পর্যায়কে তিন তালাকের আকারে স্থির করেছে। এর অর্থ আদৌ এই নয় যে, তালাকের ব্যাপারে এ তিনটি পর্যায়ই পূর্ণ করতে হবে; বরং শরিয়তের উদ্দেশ্য হচ্ছে– প্রথমত তালাকের দিকে অগ্রসর হওয়াই অপছন্দনীয় কাজ। কিন্তু অপারগতাবশত যদি এদিকে অগ্রসর হতেই হয়, তবে এর নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকাই বাঞ্ছনীয়। অর্থাৎ এক তালাক দিয়ে ইদ্দত শেষ করার সুযোগ দেওয়াই উত্তম। যাতে ইদ্দত শেষ হলে পরে বিবাহ বন্ধন আপনা-আপনিই ছিন্ন হয়ে যায়। একেই তালাকের উত্তম পদ্ধতি বলা হয়।

وَالصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ فِى التَّحْلِيْلِ كَالْبَالِغِ وَ وَطْئُ الْمَوْلٰى اَمَتَهُ لَايُحِلُّهَا وَاِذَا تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ التَّحْلِيْلِ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوْهٌ فَاِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ وَطْيِهَا حَلَّتْ لِلْاَوَّلِ وَاِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْحُرَّةَ تَطْلِيْقَةً اَوْ تَطْلِيْقَتَيْنِ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَتَزَوَّجَتْ بِزَوْجٍ اٰخَرَ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَادَتْ اِلَى الْاَوَّلِ عَادَتْ بِثَلٰثِ تَطْلِيْقَاتٍ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِىْ مَا دُوْنَ الثَّلٰثِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلٰثَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى.

সরল অনুবাদ ঃ এবং প্রাপ্তবয়স্কের দারপ্রান্তে উপনীত বালক (তিন তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে পুনরায় প্রথম স্বামীর ক্ষেত্রে) বৈধ করার জন্য প্রাপ্তবয়স্কের ন্যায় (অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্কের নিকট যেভাবে হালাল হয়ে যায় প্রাপ্ত বয়স্কের দারপ্রান্তে বালকের দ্বারা সহবাস হলেও হবে) এবং মনিব (স্বীয়) দাসীর সাথে সহবাস করার দ্বারা স্বামীর জন্য স্ত্রীকে হালাল করবে না। আর যদি হালাল করার শর্তে বিবাহ করে তবে এটা মাকরূহ। এরপর যদি (তিন তালাকপ্রাপ্ত) মহিলাকে সঙ্গমের পর তালাক দিয়ে দেয় প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে এবং যখন কেউ স্বাধীন মহিলাকে এক বা দু'তালাক দেয় আর তার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় এরপর সে দ্বিতীয় স্বামীর সাথে বিবাহ বসে, এরপর দ্বিতীয় স্বামী সঙ্গম করল, এরপর মহিলা প্রথম স্বামীর কাছে আসে, তখন এ মহিলা (পুনরায়) তিন তালাকের (অধিকার) লাভের সাথে (প্রথম স্বামীর কাছে) আসবে। এবং দ্বিতীয় স্বামী শায়খাইন (র.)-এর মতে তিন এর কম তালাককে অস্তিত্বহীনের ন্যায় করে দেয় যেমনটি তিন (তালাক)-কে অস্তিত্বহীনের ন্যায় করে দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

صَبِيّ مُرَاهِقْ-এর দ্বারা হালাল করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَالصَّبِيُّ الْمُرَاهِقُ الخ ঃ দ্বিতীয় স্বামী মহিলাকে হালাল করার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া জরুরি নয়; বরং প্রাপ্ত বয়সের দারপ্রান্তে উপনীত বালক এর দ্বারাও চলবে যদি তার বিশেষ বিশেষ অঙ্গ নড়াচাড়া করে ও কামভাব সৃষ্টি হয়, ফিকহশাস্ত্রবিদগণ এর পরিমাণ দশবৎসর নির্ধারণ করেছেন।

হালাল করার শর্তে বিয়ে দেওয়ার বিধানে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ فَالنِّكَاحُ مَكْرُوْهٌ الخ ঃ তিন তালাকপ্রাপ্ত মহিলাকে প্রথম স্বামীর জন্য হালাল করার শর্তে বিয়ে দেওয়া আহনাফের মতে মাকরূহে তাহরীমী। কিন্তু ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র.) বলেন যে, যদি হালাল করার শর্ত লাগানো হয় তবে বিবাহ ফাসিদ হয়ে যাবে এবং মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে বিবাহ তো ফাসিদ হবে না কিন্তু প্রথম স্বামীর জন্য হালালও হবে না। তাদের সকলের প্রমাণ নবী করীম (স.)-এর বাণী- لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ অর্থাৎ হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের প্রতি আল্লাহ তা'আলা লানত করেছেন। আহনাফের পক্ষ থেকে এর উত্তর হচ্ছে- উপরোক্ত হাদীসে দ্বিতীয় স্বামীকে مُحَلِّلْ বা হালালকারী বলাই এ কথার প্রমাণ যে, মহিলা প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে। অতএব বুঝা যায় যে, এ হাদীসে লানত ঐ ব্যক্তির জন্য যে হালাল করার ওপর পারিশ্রমিক নেয়।

<u>দ্বিতীয় স্বামীর জন্য পূর্বের তালাক বিলোপ করার মধ্যে মতভেদ ঃ</u>

قَوْلُهُ وَيَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِى الخ ঃ আলোচ্য মাসআলায় শায়খাইন (র.)-এর মতে প্রথম স্বামী পুনরায় তিন তালাকের মালিক হবে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে দ্বিতীয় স্বামী তিনের কম তালাকসমূহকে অস্তিত্বহীন করে না। এটা ইমাম যুফার, শাফেয়ী, আহমদ (র.)-এরও মাযহাব। তাদের প্রমাণ এ জাতীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর প্রশ্নের উত্তরে হযরত ওমর (রা.) এ জবাব প্রদান করেছিলেন যে, মহিলা প্রথম স্বামীর কাছে অবশিষ্ট তালাকের মালিক হবে অর্থাৎ পূর্বে একটি তালাকে বায়েনা দিলে এখন দু'টির; আর পূর্বে দু'টি তালাকে বায়েনা দিলে এখন একটির মালিক হবে। হযরত শায়খাইন (র.)-এর প্রমাণ হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (র.)-এর ঐ আছর যার মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর জবাব বর্ণিত আছে যে, দ্বিতীয় স্বামী এক, দু' এবং তিন সব তালাকসমূহকে অস্তিত্বহীন করে দেয়, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)ও এই জবাব দিয়েছেন। এছাড়া নবী করীম (স.)-এর বাণী- لَعَنَ اللّٰهُ الْمُحَلِّلَ অর্থাৎ আল্লাহ হালালকারীকে লানত করেছেন।

এর মধ্যে দ্বিতীয় স্বামীকে مُحَلِّلْ বলা হয়েছে, আর مُحَلِّلْ (হালালকারী) ঐ ব্যক্তিই হবে যে হালাল হওয়া সাব্যস্ত করে। আর এই দ্বিতীয় স্বামী পূর্বের হালালকে স্থির করবে না; বরং নতুনভাবেকে স্থির করবে, আর এটা জরুরি যে, পূর্বের হালাল ও পুনরায় হালাল এর মাঝে ব্যবধান থাকা উচিত। আর পূর্বেব হালাল ছিল অসম্পূর্ণ আর পুনরায় হালাল হলো সম্পূর্ণ। অতএব প্রথম স্বামী পুনরায় তিন তালাকের মালিক হবে।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَهْدِمُ الزَّوْجُ الثَّانِىْ مَادُوْنَ الثَّلٰثِ وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلٰثًا فَقَالَتْ قَدْ إِنْقَضَتْ عِدَّتِىْ وَتَزَوَّجْتُ بِزَوْجٍ اٰخَرَ وَ دَخَلَ بِىْ الزَّوْجُ الثَّانِىْ وَطَلَّقَنِىْ وَانْقَضَتْ عِدَّتِىْ وَالْعِدَّةُ تَحْتَمِلُ ذَالِكَ جَازَ لِلزَّوْجِ الْاَوَّلِ اَنْ يُّصَدِّقَهَا إِذَا كَانَ غَالِبُ ظَنِّهٖ اَنَّهَا صَادِقَةٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, দ্বিতীয় স্বামী তিনের কম তালাকসমূহকে অস্তিত্বহীনের ন্যায় করে না, আর যখন স্বামী স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়ে দেয়, এরপর স্ত্রী বলে যে, আমার ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে গেছে এরপর আমি দ্বিতীয় স্বামীর কাছে বিয়ে বসি, সে আমার সাথে সঙ্গম করেছে; অতঃপর তালাক দিয়েছে। আর তার ইদ্দতও অতিবাহিত হয়েগেছে, (অতিবাহিত) সময়ও স্ত্রীর কথার সম্ভাবনা রাখে, তখন প্রথম স্বামীর জন্য ঐ স্ত্রীকে সত্যবাদী মনে করা বৈধ যদি স্বামীর প্রবল ধারণা হয় যে, স্ত্রী সত্যবাদী।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ظَنِّ غَالِبْ-এর ওপর আমল করার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ إِذَا كَانَ غَالِبُ ظَنِّهٖ الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, এখানে যে غَالِبِ ظَنْ বলা হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে– প্রবল ধারণা। শরিয়তে প্রবল ধারণার ওপর আমল করার জন্য বহু ক্ষেত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং শরিয়তের অসংখ্য বিধানে প্রবল ধারণাকে প্রমাণ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ظَنْ শব্দের ব্যাখ্যা ঃ প্রকাশ থাকে যে, আরবি ভাষায় ظَنْ এটা তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (১) ধারণা ও অনুমান, যেমন কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে, اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَايُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

এ আয়াতে ظَنْ এটা অনুমান ও ধারণা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (২) প্রবল ধারণা,-এ অর্থেই হাদীস (বা خَبَرِ وَاحِدْ)-কে ظَنِّى বলা হয়। (৩) সুনিশ্চিত ও অকাট্য (প্রমাণ) যেমন কুরআনে কারীমের এরশাদ, قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوا اللّٰهِ এখানে আয়াতের মধ্যে ظَنْ অর্থ সুনিশ্চিত ও বিশ্বাস অন্যত্র। এরশাদ হচ্ছে, اَلَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُلٰقُوْا رَبِّهِمْ

এ আয়াতেও ظَنْ অর্থ সুনিশ্চিত ও বিশ্বাস। অপর এক স্থানে এরশাদ হচ্ছে وَظَنَّ دَاوٗدُ اِنَّمَا فَتَنّٰهُ এ আয়াতেও ظَنْ অর্থ বিশ্বাস ও সুনিশ্চিত।

অতএব اَلشَّيْئُ يُذْكَرُ بِالشَّيْئِ (কথায় কথা আসে) এ প্রবাদ হিসাবে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, বর্তমানে অনেক ইসলাম বিদ্বেষীগণ حَدِيْث ও سُنَّتْ -কে শরিয়তের প্রমাণ মানে না; এ জন্য যে, হাদীসের পরিভাষায় হাদীসকে ظَنِّى বলা হয়, তাদের প্রমাণ ظَنْ -এর উল্লিখিত প্রথম অর্থ। আমরা তাদের উত্তরে বলব যে, حَدِيْث -কে ظَنِّى বলা হয় ظَنْ -এর দ্বিতীয় অর্থের হিসেবে। আবার কোনো কোনো বিশেষ অবস্থায় ظَنْ-এর তৃতীয় অর্থে অর্থাৎ হাদীস ظَنِّى হওয়ার অর্থ এতে সত্য হওয়ার প্রবল ধারণা বিদ্যামান, অথবা হাদীস সুনিশ্চিত ও অকাট্য প্রমাণ।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) مَا مَعْنَى الرَّجْعَةِ لُغَةً وَاِصْطِلَاحًا؟ وَمَا الْمُرَادُ هٰهُنَا؟ بَيِّنْ مَالَهَا وَمَا عَلَيْهَا ـ

(٢) بَيِّنْ كَيْفِيَّةَ الْمُرَاجَعَةِ وَهَلْ يَجِبُ الشُّهُوْدُ عَلَى الرَّجْعَةِ؟ وَمَا الْخِلَافُ فِيْهِ بَيِّنْ بَيَانًا تَامًّا.

(٣) اِنْ اِنْقَطَعَ دَمُ الْمُطَلَّقَةِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ هَلْ تَنْقَطِعُ بِذَالِكَ الرَّجْعَةُ؟ بَيِّنْ مُفَصَّلًا ـ

(٤) مَا مَعْنَى الصَّبِيِّ الْمُرَاهِقِ؟ هَلْ يَكْفِىْ لِلتَّحْلِيْلِ اَمْ لَا؟ بَيِّنْ بِالْيَقْظَةِ التَّامِّ ـ

كِتَابُ الْإِيلَاءِ

ঈলা (স্ত্রী সহবাস না করার শপথ) পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) ঈলা পর্বকে এ জন্য রাজ'আত অধ্যায়ের পর এনেছেন যে, যেমনিভাবে তালাকে রাজয়ী-এর মধ্যে রাজ'আত না করলে ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর এক তালাকে বায়েনা হয় তদ্রূপ ঈলা পূরণ করলেও এক তালাকে বায়েনা হয়ে যায়। সুতরাং রাজ'আত অধ্যায়ের সাথে ঈলা পর্ব তালাকে বায়েন হওয়ার মধ্যে মিল ও সামঞ্জস্য রয়েছে।

اِيْلَاء-এর আভিধানিক অর্থ ঃ

اِيْلَاء মাসদার অর্থ–কসম খাওয়া। اِلْيَةٌ কসমকে বলে। এর বহুবচন اَلَايَا যেমন - عَطِيَّةٌ-এর বহুবচন عَطَايَا

اِيْلَاء-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ

পরিভাষায় اِيْلَاء বলে চার মাস বা তার থেকে বেশি সময় পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম না করার শপথ করা। যেমন–স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এরূপ বলা, وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ আমি চার মাস তোমার নিকট হবো না, বা এরূপ বলা وَاللّٰهِ لَا اَقْرَبُكِ অর্থাৎ আল্লাহর শপথ আমি তোমার নিকট হবো না।

اِيْلَاء-এর বিধান ঃ

স্বামী যদি চার মাসের মধ্যে স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে কাফ্ফারা দেওয়া আবশ্যক এবং اِيْلَاء বাদ হয়ে যাবে, আর যদি চার মাসের মধ্যে সঙ্গম না করে থাকে তবে স্ত্রী এক তালাকে বায়েনা হয়ে যাবে।

কুরআনের আলোকে ঈলা ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এরশাদ করেছেন –

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ - وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থ ঃ যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতঃপর যদি পারস্পরিক মিলমিশ্ করে নেয় তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। আর যদি বর্জন করার সংকল্প করে নেয়, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ শ্রবণকারী ও জ্ঞানী। –(সূরা বাক্বারা)

যুক্তির আলোকে ঈলার মেয়াদ চার মাস নির্ধারিত হওয়ার হিকমত মহান আল্লাহ এরশাদ করেছেন–

لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ فَاِنْ فَاءُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ – وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ -

অর্থাৎ যারা নিজেদের স্ত্রীগণ হতে পৃথক হয়ে যাওয়ার কসম করে, তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে। অতএব, তারা যদি ৪ মাসের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা হতে ফিরে আসে, তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। আর যদি তালাক প্রদানের দৃঢ় ইচ্ছাই করে ফেলে, তবে স্মরণ রাখবে যে, আল্লাহ সবকিছু শুনেন ও জানেন। ঈলার অর্থ কসম খাওয়া অর্থাৎ, শপথ করা জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা এ বিষয়ে হলফ অর্থাৎ শপথ করতো যে, সর্বদা বা একটা দীর্ঘ মেয়াদ পর্যন্ত স্ত্রীগণ হতে আলাদা থাকবে। এটা স্ত্রীদের জন্য জুলুম ও ক্ষতিকর হতো। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা চার মাসের অধিক ঈলার মেয়াদ রহিত করে দিয়েছেন। ঈলার মেয়াদ চার মাস নির্ধারণ করার বহুবিধ তাৎপর্য রয়েছে। তার কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো–

১. এই মেয়াদ নির্ধারণ করার কারণ হলো, এই মেয়াদের মাঝে কোনো কারণ ছাড়াই নফসের মধ্যে সহবাসের চাহিদা সৃষ্টি হয়। যদি মানুষ শোকাচ্ছন্ন না হয়, তবে এই চাহিদা পূরণ না করলে ক্ষতি হয়।

২. এই মেয়াদ বছরের এক-তৃতীয়াংশ অর্ধেকের কম জিনিসের হিসাব তৃতীয়াংশের দ্বারাই করা হয় এবং অর্ধেককে দীর্ঘ মেয়াদ হিসাবে গণ্য করা হয়।

৩. যদি ঈলার মেয়াদ দীর্ঘ হতো, তবে পুরুষ বে-পরওয়া হয়ে যেতো এবং স্ত্রীর ভরণপোষণ এড়িয়ে চলতো। আর এটা স্ত্রীর জন্য মারাত্মক ক্ষতিকারক হতো। তার খোরপোষ তথা খাওয়া পরা কোথা হতে আসতো? থাকতোই বা কোথায়?

৪. হতে পারে যে, এই ঈলা করার আগে স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছে, যদ্বারা গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা রয়েছে। এমতাবস্থায় গর্ভসঞ্চারের বিষয়টি চার মাসে পরিপূর্ণভাবে অবগত হয়ে যায়। যেমন– পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ কারণেই যে মহিলার স্বামী ইন্তেকাল করে, তার ইদ্দত চার মাস দশ দিন নির্ধারিত হয়েছে। অতএব, এই মেয়াদের মধ্যে নিশ্চিতরূপে গর্ভের পরিচয় হয়ে যেতে পারে। অতঃপর যদি গর্ভের পরিচয় পাওয়া যায় এবং স্বামী রুজু না করে, তবে তার ইদ্দত সন্তান প্রসবকাল পর্যন্ত দীর্ঘায়িত হবে।

৫. সকল প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়ের সর্বপরিজ্ঞাত আল্লাহ্ তা'আলা ঈলার মেয়াদ চার মাস নির্ধারণের মধ্যে এই রহস্য নিহিত রেখেছেন যে, প্রকৃতিগতভাবে কোনো সুস্থ যুবতী মহিলার জন্য চার মাসের অধিক স্বামীর বিচ্ছেদ পীড়াদায়ক হয়। সে সাধারণত এই মেয়াদকাল পর্যন্ত আবারও স্বামীর সান্নিধ্য কামনা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) স্বীয় তারীখুল খুলাফা গ্রন্থে লিখেছেন–

اَخْرَجَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَنْ اَصْدُقُهٗ اَنَّ عُمَرَ بَيْنَمَا هُوَ يَطُوْفُ سَمِعَ اِمْرَأَةً تَقُوْلُ تَطَاوَلَ هٰذَا اللَّيْلُ وَاَسْوَدَ جَانِبُهٗ وَاَرَقَنِىْ اَنْ لَّا خَلِيْلَ اُلَاعِبُهٗ فَلَوْلَا حِذَاءَ اللّٰهِ لَاشَىْءَ مِثْلُهٗ لَزُعْزِعَ مِنْ هٰذَا السَّرِيْرِ جَوَانِبُهٗ فَقَالَ عُمَرُ وَمَالَكِ قَالَتْ اَغْزَيْتَ زَوْجِىْ مُنْذُ اَشْهُرٍ وَقَدِ اشْتَقْتُ اِلَيْهِ قَالَ اَرَدْتِّ سُوْءًا قَالَتْ مَعَاذَ اللّٰهِ! قَالَ فَامْلِكِىْ عَلَيْكِ نَفْسَكِ فَاِنَّمَا هُوَ الْبَرِيْدُ اِلَيْهِ فَبَعَثَ اِلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ عَلٰى حَفْصَةَ فَقَالَ اِنِّىْ سَائِلُكِ عَنْ اَمْرٍ قَدْ اَهَمَّنِىْ فَاَخْرِجِيْهِ عَنِّىْ كَمْ تَشْتَاقُ الْمَرْأَةُ اِلٰى زَوْجِهَا فَخَفَضَتْ رَأْسَهَا وَاسْتَحْيَتْ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ لَايَسْتَحْيِىْ مِنَ الْحَقِّ فَاَشَارَتْ بِيَدِهَا ثَلَاثَةَ اَشْهُرٍ وَاِلَّا فَاَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ فَكَتَبَ عُمَرُ اَنْ لَّاتُحْبَسَنَّ الْجُيُوْشُ فَوْقَ اَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ -

অর্থাৎ ইবনে জুরাইজ বলেন, আমাকে এমন এক ব্যক্তি সংবাদ দিয়েছেন, যার কথা আমি সত্য মনে করি। হযরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতের জামানায় জনসাধারণের অবস্থা জানার জন্য এক রাতে মদীনার গলি পথে ঘুরাফিরা করতেছিলেন। এ সময় তিনি এক মহিলাকে কিছু কবিতা পংক্তি আবৃত্তি করতে শুনলেন। যার অর্থ হলো 'রাত্রি গভীর হয়েছে, মদীনা নগরী কালো আঁধারে ডুবে গেছে এই বিরহ যাতনা আমার নিদ্রা ভেঙ্গে দিয়েছে যে, আমার কোনো বন্ধু নেই। যার উষ্ণ সান্নিধ্যে আমি খেলায় মেতে উঠব। যদি অতুলনীয় সত্ত্বা ও অনন্য খোদার ভয় না থাকতো, তবে আমার এ খাটের দুইবাহু দুলে উঠতো।"

অতঃপর হযরত ওমর (রা.) মহিলাকে ডেকে বললেন, তুমি কি চাও? মহিলাটি বলল, কয়েক মাস বিগত হয়েছে, আপনি আমার স্বামীকে যুদ্ধে প্রেরণ করেছেন, এখন আমি আমার স্বামীর নৈকট্য আকাঙ্ক্ষী। হযরত ওমর (রা.) তাকে বললেন, তুমি কি কোনো পাপ চিন্তা পোষণ করো? মহিলাটি বলল, আল্লাহর পানাহ! আমি কোনো পাপ চিন্তা পোষণ করি না। হযরত ওমর (রা.) বললেন, তুমি তোমার নফসের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখো। তোমার স্বামীকে আনার জন্য এক্ষুনি দূত পাঠানো হবে। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) মহিলার স্বামীর নিকট দূত প্রেরণ করে স্বীয় কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার নিকট গমন করলেন এবং হাফসাকে বললেন, আমি তোমার নিকট একটি জটিল সমস্যার কথা জিজ্ঞাসা করতেছি, তুমি উহার সমাধান দাও। সমস্যাটি হচ্ছে– একজন মেয়েলোকের কতদিন পর তার স্বামীর সাথে মিলনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়? এটা শ্রবণ করে হাফসা (রা.) লজ্জায় মাথা নত করে ফেললেন। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা সত্য কথা বলতে লজ্জা করেন না। অতঃপর হাফসা (রা.) হাতের ইশারায় তিন মাস, কি বড়জোর চার মাসের সময়ের প্রতি ইঙ্গিত করলেন। অর্থাৎ স্বামীর জন্য তিন মাস বা অতিরিক্ত চার মাসের সময়ের মধ্যে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়া উচিত। অতঃপর হযরত ওমর (রা.) সেনাবাহিনীর অফিসারদের নামে পত্র প্রেরণ করলেন এবং তাগিদ দিলেন যে, কোনো সিপাহীকে যেন চার মাসের অধিক কর্মক্ষেত্রে আটকে রাখা না হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক সিপাহীর জন্য চার মাস পর পর ছুটির সাধারণ ঘোষণা দিয়ে দেওয়া হলো।

<u>সর্ব সাধারণের মাঝে ঈলার ব্যাপারে একটি ত্রুটি</u> : আমাদের দেশে সর্ব সাধারণের মাঝে তালাক হওয়ার ব্যাপারে একটি ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে, তা এই যে, কোনো কোনো ব্যাপারে তালাকের কারণ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে তালাকের কারণ মনে করা হয় না। যেমন- কেউ যদি কসম করে যে, আমি আমার স্ত্রীর কাছে কখনও যাব না আর সে সময়সীমা যদি চার মাস কিংবা তার বেশি হয় তাহলে তার বিধান হলো– চার মাসের আগে কসম ভেঙ্গে স্ত্রীর কাছে গেলে বিয়ে বহাল থাকবে তখন শুধু কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। কিন্তু যদি সে চার মাস পার করে তাহলে স্ত্রীর ওপর বাইন তালাক কার্যকর হবে। এটাকেই বলা হয় ঈলা। তবে চার মাসের কমের কসম হলে কিংবা চার মাসের আগে কসম ভেঙ্গে কাফ্ফারা দিয়ে স্ত্রীর কাছে গেলে বিয়ের কোনোই ক্ষতি হবে না।

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِإِمْرَأَتِهِ وَاللّٰهِ لَاأَقْرَبُكِ أَوْلَا أَقْرَبُكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ مُولٍ فَإِنْ وَطِيَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَنَثَ فِيْ يَمِيْنِهِ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَسَقَطَ الْإِيْلَاءُ وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتّٰى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِتَطْلِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلٰى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَقَدْ سَقَطَتِ الْيَمِيْنُ وَإِنْ كَانَ حَلَفَ عَلَى الْأَبَدِ فَالْيَمِيْنُ بَاقِيَةٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যখন স্বামী স্ত্রীকে বলে, আল্লাহর শপথ আমি তোমার নিকটবর্তী হবো না বা (এ কথা বলে) খোদার শপথ আমি চার মাস পর্যন্ত তোমার নিকট আসব না। তখন স্বামী মূলী (বা বিশেষ শপথকারী হিসাবে গণ্য) হয়ে গেছে। অতএব যদি চার মাসের মধ্যে ঐ স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তবে স্বীয় শপথ ভঙ্গকারী হিসাবে গণ্য হবে এবং তার ওপর কাফ্ফারা আবশ্যকীয় হবে আর ঈলা (বিশেষ শপথ) বাদ হয়ে যাবে। আর যদি চার মাস স্ত্রীর নিকট না যেয়ে থাকে তবে (স্ত্রী) এক তালাকে বায়েনা হয়ে যাবে। স্বামী যদি চার মাসের শপথ করে তবে (চার মাস পর) শপথ বাদ হয়ে যাবে। আর যদি সর্বদার জন্য শপথ করে থাকে তবে শপথ বাকি থাকবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِيْلَاءٌ-এর মধ্যে কাফ্ফারা দেওয়ার ব্যাপারে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَلَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ الخ ঃ স্বামী চার মাসের মধ্যে সহবাস করলে আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী কাফ্ফারা দিতে হবে, কিন্তু হাসান বসরী (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে কাফ্ফারা ওয়াজিব নয় তাঁর প্রমাণ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন "ঈলা সম্পর্কীয় আয়াতের শেষভাগে এরশাদ করেছেন– فَإِنْ فَاؤُوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অর্থাৎ অতঃপর যদি (স্বামী-স্ত্রী) পারস্পরিক মিল-মিশ করে নেয়, তবে আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু। –(সূরা বাক্বারা আয়াত- ২৬)

এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় আল্লাহ ক্ষমাকারী দয়ালু এখানে কাফ্ফারা এর কথা বলা হয়নি। আহনাফের পক্ষ থেকে এর উত্তর দেওয়া হয় যে, এ আয়াতে ক্ষমার দ্বারা উদ্দেশ্য আখেরাতের শাস্তি ক্ষমা, কাফ্ফারা বাদ দেওয়া উদ্দেশ্য নয়।

إِيْلَاءٌ-এর মধ্যে তালাকে বায়েন হওয়ার ব্যাপারে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ بَانَتْ بِتَطْلِيْقَةٍ وَاحِدَةٍ الخ ঃ আমাদের হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এবং হযরত ওসমান, আলী, যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.) এবং উবাদালায়ে ছালাছাহ বা তিন আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, যে চার মাসের মধ্যে স্বামী স্ত্রী সহবাস না করলে স্ত্রী এক তালাকে বায়েনা হয়ে যাবে, কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হলে তালাকে বায়েন হবে না; বরং কাজি তথা বিচারকের মাধ্যমে বিচ্ছেদ করা জরুরি হবে। তাঁর প্রমাণ হচ্ছে– স্বামী স্ত্রীর সঙ্গমের অধিকার থেকে বিরত রেখেছে। অতএব স্ত্রীর বিচ্ছেদের মধ্যে কাজি তার প্রতিনিধি হবে। আমাদের আহ্নাফের পক্ষ থেকে (এর উত্তরে) বলেন যে, স্বামী স্ত্রীর হককে বিরত রেখে জুলুম করেছে। সুতরাং শরিয়তে তার জুলুমের বদলা এভাবে দিয়েছে যে, স্বামী স্ত্রীকে ব্যবহার করার বড় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে এবং তালাকে বায়েন দ্বারা বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

فَإِنْ عَادَ فَتَزَوَّجَهَا عَادَ الْإِيلَاءُ فَإِنْ وَطِيَهَا وَإِلَّا وَقَعَتْ بِمَضِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثَالِثًا عَادَ الْإِيلَاءُ وَوَقَعَتْ عَلَيْهَا بِمَضِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ تَطْلِيقَةٌ أُخْرَى فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ زَوْجٍ أٰخَرَ لَمْ يَقَعْ بِذَالِكَ الْإِيلَاءُ طَلَاقٌ وَالْيَمِيْنُ بَاقِيَةٌ فَإِنْ وَطِيَهَا كَفَّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ إِنْ حَلَفَ عَلٰى أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ أَوْ بِصَوْمٍ أَوْ بِصَدَقَةٍ أَوْعِتْقٍ أَوْطَلَاقٍ فَهُوَ مُوْلٍ وَإِنْ اٰلٰى مِنَ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ كَانَ مُوْلِيًا وَإِنْ اٰلٰى مِنَ الْبَائِنَةِ لَمْ يَكُنْ مُوْلِيًا وَمُدَّةُ إِيلَاءِ الْأَمَةِ شَهْرَانِ وَإِنْ كَانَ الْمُوْلِى مَرِيْضًا لَايَقْدِرُ عَلَى الْجِمَاعِ أَوْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرِيْضَةً أَوْ كَانَتْ رَتْقَاءَ أَوْصَغِيْرَةً لَايُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْكَانَتْ بَيْنَهُمَا مُسَافَةٌ لَايَقْدِرُ أَنْ يَّصِلَ إِلَيْهَا فِي مُدَّةِ الْإِيلَاءِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি ঐ স্বামী স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ করে তবে ঈলা প্রত্যাবর্তন করবে। হাঁ, যদি স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে তবে ভাল অন্যথা চার মাস অতিবাহিত হওয়ার পর দ্বিতীয় তালাক হয়ে যাবে। এরপর যদি তৃতীয় বার বিবাহ করে তবে ঈলা প্রত্যাবর্তন করতে এবং চারমাস অতিবাহিত হওয়ার পর তৃতীয় তালাক পতিত হয়ে যাবে। পুনরায় যদি দ্বিতীয় স্বামীর পর এ মহিলাকে বিবাহ করে তখন ঐ ঈলার দ্বারা আর তালাক পতিত হবে না এবং শপথ বাকি থাকবে যদি ঐ স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করে; তবে শপথের কাফ্ফারা দেবে, যদি চার মাসের কমের শপথ করে তবে ঈলাকারী হবে না। আর যদি হজের শপথ করে বা সদকার বা গোলাম স্বাধীন করার বা তালাকের তবে সে শপথকারী হিসাবে গণ্য হবে এবং যদি তালাকে রেজয়ী প্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে ঈলা করে তবে ঈলাকারী হবে। আর যদি তালাকে বায়েনা প্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে ঈলা করে তবে ঈলাকারী হবেনা এবং দাসীর সাথে ঈলার সময় সীমা দু'মাস, যদি ঈলাকারী অসুস্থ হয় যার কারণে সহবাসে সক্ষম না হয় বা স্ত্রী অসুস্থ হয় বা স্ত্রীর সঙ্গমের রাস্তা বন্ধ হয় বা স্ত্রী এত ছোট হয় যে তার সাথে সঙ্গম করা সম্ভব না হয় বা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এতটুকু পরিমাণ দূরত্ব হয় যে ঈলার সময় সীমার মধ্যে ঐ পর্যন্ত পৌছা অসম্ভব (এসব অবস্থায়)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِيْلَاءٌ-এর সময় ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ حَلَفَ عَلٰى أَقَلَّ الخ ঃ চার ইমাম এ কথার মধ্যে একমত যে, إِيْلَاءٌ-এর সময় চার মাস। তাদের প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী– لِلَّذِيْنَ يُؤْلُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

অর্থ ঃ যারা নিজেদের স্ত্রীদের নিকট গমন করবে না বলে কসম খেয়ে বসে তাদের জন্য চার মাসের অবকাশ রয়েছে।

জমহুর ইমামগণের আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে– হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)-এর বাণী যে, চার মাসের কমে إيلاء হয় না। অতএব এর কমে সর্বসম্মতি ক্রমে إِيْلَاءٌ হবে না।

قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَفَ بِحَجٍّ الخ ঃ যেমন এরূপ বলবে যে, যদি আমি তোমার সাথে সঙ্গম করি তবে আমার ওপর হজ, রোজা, সদকা বা গোলাম স্বাধীন করা জরুরি হবে অথবা এরূপ বলছে যে, আমি যদি তোমার সাথে সঙ্গম করি তবে তোমার সতীনের ওপর তালাক। তবে এ সকল অবস্থায় إِيْلَاءٌ হয়ে যাবে।

فَفَيْئُهُ اَنْ يَّقُوْلَ بِلِسَانِهٖ فِئْتُ اِلَيْهَا فَاِنْ قَالَ ذَالِكَ سَقَطَ الْاِيْلَاءُ وَاِنْ صَحَّ فِى الْمُدَّةِ بَطَلَ ذٰلِكَ الْفَيْءُ وَصَارَ فَيْئُهُ الْجِمَاعَ وَاِذَا قَالَ لِاِمْرَأَتِهٖ اَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ سُئِلَ عَنْ نِيَّتِهٖ فَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ الْكِذْبَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ بِهِ الطَّلَاقَ فَهِىَ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ اِلَّا اَنْ يَّنْوِى الثَّلٰثَ وَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ وَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ بِهِ التَّحْرِيْمَ اَوْلَمْ اُرِدْ بِهٖ شَيْئًا فَهِىَ يَمِيْنٌ يَصِيْرُ بِهٖ مُوْلِيًا ـ

সরল অনুবাদ ঃ তার (ঈলাকারীর) প্রত্যাবর্তন এর নিয়ম হলো, মুখে বলে দেবে যে, আমি তার (স্ত্রীর) দিকে প্রত্যাবর্তন করেছি, যখন সে (স্বামী) এটা বলে দেবে তখন ঈলা বাদ হয়ে যাবে, যদি (ঈলার) সময়সীমার মধ্যে সুস্থ হয়ে যায় তখন এই প্রত্যাবর্তন বাতিল হয়ে যাবে। এখন তার প্রত্যাবর্তন সঙ্গমের মাধ্যমে হবে এবং যখন কোনো ব্যক্তি নিজ স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার ওপর হারাম, তখন তার নিয়ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, সে যদি বলে আমি মিথ্যার ইচ্ছা করেছি, তখন যা বলছে, তাই হবে। আর যদি বলে আমি (ঐ কথায়) তালাকের ইচ্ছা করেছি, তখন এক তালাকে বায়েন হবে। হ্যাঁ যদি সে তিন তালাকের নিয়ত করে (তবে তিন তালাক হয়ে যাবে)। আর যদি সে বলে যে, আমি জেহার-এর ইচ্ছা করেছি তবে জেহার হবে। আর যদি বলে যে, আমি হারাম হওয়ার ইচ্ছা করেছি বা কিছুর ইচ্ছা করিনি, তবে এটা শপথ হয়ে গেছে যার দ্বারা সে ঈলাকারী হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ سُئِلَ عَنْ نِيَّتِهِ الخ ঃ উল্লিখিত মাসআলায় স্বামীর নিয়ত যেরূপ হবে সে অনুযায়ী হুকুম হবে। যদি কোনো বস্তুর নিয়ত না হয় বা হারাম হওয়ার নিয়ত হয় তবে اِيْلَاءٌ হবে, কারণ হালালকে হারাম করা শপথ হয়। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী– لِمَ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ অর্থ ঃ আল্লাহ আপনার জন্য যা হালাল করেছেন। অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে– قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য কসম হতে অব্যাহিত লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর যদি স্বামীর উল্লিখিত কথায় ظِهَارْ-এর নিয়ত হয় তবে শায়খাইন (র.)-এর মতে ظِهَارْ হবে, ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ظِهَارْ হবে না। কারণ ظِهَارْ-এর মধ্যে مُحَرَّمَاتْ -এর সাথে উপমা দেওয়া জরুরি, যা এখানে নেই। শায়খাইন (র.) বলেন যে, مُطْلَقْ تَحْرِيْم আছে। আর ظِهَارْ-এর মধ্যে এক বিশেষ প্রকারের حُرْمَتْ হয় আর মূলনীতি আছে– اَلْمُطْلَقُ يَحْتَمِلُ الْمُقَيَّدَ

আর যদি মিথ্যা উদ্দেশ্য হয় তবে তার কথাটি অহেতুক হবে, আর যদি طَلَاقْ-এর নিয়ত হয় তবে তালাকে বায়েনা হবে। কারণ اَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ এটা তালাকে كِنَايَهْ-এর অন্তর্ভুক্ত। এখন যদি তিনটির নিয়ত করে থাকে, তবে তিন তালাক হবে। কারণ اَنْتِ عَلَىَّ حَرَامٌ-এর মধ্যে তিনের নিয়ত করা বৈধ আছে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) بين مناسبة كتاب الايلاء مع باب الرجعة ـ
(٢) ما معنى الايلاء لغة وشرعا؟ اكتب حكم الايلاء واصله بضوء القران والسنة –
(٣) ما الحكمة فى تعين مدة الايلاء باربعة اشهر بين مفصلا؟
(٤) ما الاختلاف بين العلماء على لزوم الكفارة فى الايلاء ؟ بين مع الدلائل ثم شيد مذهبك؟
(٥) بين اختلاف الائمة على كون المنكوحة تطليقة بائنة فى الايلاء مع ترجيح مذهبكم؟
(٦) اكتب حكم الايلاء اذا حلف على الابد؟
(٧) هل يكون الرجل موليا اذا حلف على اقل من اربعة اشهر بين مع الدلائل ـ
(٨) بين مدة ايلاء الامة ثم اكتب صورة الفئ اذا كان المولى مريضا لايقدر على الجماع او كانت المرأة مريضة اوكانت رتقاء او صغيرة لايجامع مثلها اوكانت بينهما مسافة لايقدر ان يصل اليها فى مدة الايلاء؟
(٩) قوله "اذا قال لامرأته انت على حرام الخ" بين احكام المسئلة مفصلا؟

كِتَابُ الْخُلْعِ
খোলা পর্ব

<u>যোগসূত্র</u> ঃ খোলা পর্বকে গ্রন্থকার (র.) ঈলা পর্বের পর এ জন্য যোগ করেছেন যে, ঈলার মধ্যে স্বামী স্ত্রী থেকে বিমুখ হয় আর খোলার মধ্যে স্ত্রী স্বামী থেকে বিমুখ হয়, অর্থাৎ ঈলা হয় স্বামীর পক্ষ থেকে আর খোলা হয় স্ত্রীর পক্ষ থেকে। তাই ঈলা পর্বকে পূর্বে এনেছেন, আর খোলাকে পরে এনেছেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, ঈলা এর মধ্যে বদলা দেওয়া হয় না কিন্তু খোলার মধ্যে বদলা দেওয়া হয় এদিক দিয়েও ঈলাও খোলার মধ্যে মিল আছে।

خُلْعٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ

خُلْعٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ অবতরণ করা, খুলে দেওয়া, প্রবাদ আছে- خَلَعْتُ النَّعْلَ অর্থ- আমি জুতা খুললাম।

خُلْعٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ

পরিভাষায় خُلْعٌ বলা হয়, خُلْعٌ বা তার অর্থবোধক শব্দ দ্বারা বিবাহ বন্ধনকে বিচ্ছেদ করা। কোনো কোনো ফিকহ শাস্ত্রবিদ বলেন, خُلْعٌ বলে خُلْعٌ শব্দ দ্বারা কিছু বদলা দিয়ে স্ত্রী কর্তৃক বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটানো।

خُلْعٌ নামকরণের কারণ ঃ কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে- هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থ ঃ স্ত্রীগণ তোমাদের পোশাক আর তোমরা তাদের জন্য পোশাক।

এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের জন্য পোশাক স্বরূপ। অতএব পরিভাষায় خُلْعٌ পোশাক খোলার থেকে রূপক অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে, স্ত্রী স্বামীর সাথে خُلْعٌ করা মানে পরস্পরে পোশাক খুলে দেওয়া।

خُلْعٌ-এর বিধান ঃ خُلْعٌ -এর হুকুম হলো তালাকে বায়েন, خُلْعٌ পুরুষের পক্ষ থেকে শপথ আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে বদলা ও বিনিময়।

কুরআনে কারীমের আলোকে خُلْعٌ-এর প্রমাণ ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন-

وَلَايَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْئًا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا .

অর্থ ঃ আর নিজের দেওয়া সম্পদ থেকে তাদের কাছ থেকে কিছু ফিরিয়ে নেওয়া তোমাদের জন্য জায়েজ নয়। কিন্তু যে ক্ষেত্রে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই এ ব্যাপারে ভয় করে যে, তারা আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না, অতঃপর যদি তোমাদের ভয় হয় যে, তারা উভয়েই আল্লাহর নির্দেশ বজায় রাখতে পারবে না তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে অব্যাহতি নিয়ে নেয়, তবে উভয়ের মধ্যে কারোরই কোনো পাপ নেই। এই হলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমা। কাজেই একে অতিক্রম করো না। -(সূরা বাক্বারা)

যৌথ স্বামী নয়, নারী خُلْعٌ করে দ্বিতীয় বিবাহের অধিকার লাভ করবে। প্রকাশ থাকে যে, নারী জীবনে দ্বিতীয় বিবাহের প্রয়োজন অনিবার্যভাবে দেখা যায় না এমন কথা বলা দুষ্কর। তবে যৌথ স্বামী গ্রহণই এর সমাধান নয়। দুর্ভাগ্য বশত স্বামী চিররুগ্ণ, পঙ্গু, পুরুষত্বহীন, নিরুদ্দেশ, পাগল, স্ত্রীর ন্যায্য দায়িত্ব সম্পাদনে অক্ষম, কিংবা অত্যাচারী হয় অথবা তার সঙ্গে মিল-মহব্বত না হয় তাহলে 'খোলা' করার অথবা ইসলামি আদালতে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার ইসলাম নারীকে দান করেছে। অনুরূপ ক্ষেত্রে ইসলামি আইনে ইসলামি আদালতের ডিক্রিই নারীকে মুক্তি দান করবে। বর্তমানে আমাদের দেশে ইসলামি আদালত না থাকায় এহেন মামলার নিষ্পত্তি বেশ জটিল হয়ে গেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে নিষ্পত্তির পথ বন্ধ হয়নি। এ পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট শর্তাধীনে গঠিত পঞ্চায়েতকেই এহেন দুরূহ দায়িত্ব পালনের অধিকার ইসলাম দান করেছে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ আলিমের নিকট এ ধরনের পঞ্চায়েত গঠন ও তাদের বিচার ধারার নিয়মনীতি জানা যেতে পারে।

বস্তুত জন্ম ও প্রকৃতিগতভাবে নারী-পুরুষের অবস্থা পরস্পর ভিন্ন। এ কারণেই ইসলাম একজন নারীর একাধিক স্বামী থাকার বিষয়টি সঠিক মনে করে না। তবে বৈধভাবে সে যেন যৌনতৃপ্তি লাভ করা থেকে বঞ্চিত না থাকে তা নিশ্চিত করা ইসলাম জরুরি মনে করে। তাই সে যতটা জোরালোভাবে পুরুষের বিয়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করে, নারীর বিয়ের জন্যও ততটা জোরালো ভাবেই চাপ সৃষ্টি করে। যদি বৈধব্য বা তালাক বা খোলা তাকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয় তাহলে অবিলম্বে পুনঃবিবাহ দিতে ইসলাম সমাজকে তাগিদ দেয় ও উৎসাহিত করে। তাই নবী করীম (সা.)-এর যুগে অতি সহজেই নারীদের দ্বিতীয় বিবাহ হয়ে যেতো।

আতেকা বিনতে যায়েদের বিবাহ হয়েছিল হযরত আবূ বকরের (রা.) পুত্র আব্দুল্লাহর সাথে। কিন্তু বিশেষ কিছু কারণে হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে তালাক দেওয়ার জন্য আব্দুল্লাহকে পরামর্শ দেন। তিনি পিতার পরামর্শে স্ত্রীকে তালাক দিলেন বটে, কিন্তু এ কাজের জন্য তার যথেষ্ট দুঃখ ছিল। কারণ তিনি আতেকাকে গভীরভাবে ভালবাসতেন। আব্দুল্লাহর আগ্রহ ও আকর্ষণ দেখে হযরত আবূ বকর (রা.) আতেকাকে পুনরায় বিবাহ করার অনুমতি দেন। আব্দুল্লাহ তাকে আবার বিবাহ করেন। তায়েফের যুদ্ধে আব্দুল্লাহ শহীদ হন। কোনো কোনো রেওয়ায়ত অনুযায়ী এরপর যায়েদ ইবনে খাত্তাব আতেকাকে বিবাহ করেন। তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হলে হযরত ওমর (রা.) এবং তারপর হযরত যুবায়েরের (রা.) সাথে তার বিয়ে হয়। হযরত যুবায়েরের (রা.) শাহাদাতের পর হযরত আলী (রা.) তার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু আতেকা এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেননি।

সুহায়লা বিনতে সুহাইলের বিবাহ হয়েছিল পরপর চারজন অর্থাৎ হযরত হুযায়ফা (রা.), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আওফ (রা.), আব্দুল্লাহ ইবনুল আসওয়াদ এবং শামাখ ইবনে সাঈদের সাথে।

আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের (রা.) কন্যা জামিলার বিবাহ হয়েছিল হযরত হানযালার (রা.) সঙ্গে। ওহুদের যুদ্ধে তাঁর শাহাদাত লাভের পর হযরত সাবেত ইবনে কায়েস তাকে বিবাহ করেন। হযরত সাবেতের (রা.) ইন্তেকালের পর মালেক ইবনে দুখশাম এবং শেষে হাবিব ইবনে লিয়াফ তাকে বিবাহ করেন।

আসমা বিনতে উমায়েসের প্রথম বিবাহ হযরত আলীর ভাই হযরত জাফরের সাথে হয়েছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত আবূ বকর (রা.) তাকে বিবাহ করেন। আর সর্বশেষে হযরত আলী (রা.) তাকে বিবাহ করেন। হযরত আলীর (রা.) কন্যা উম্মে কুলসুমের বিয়ে হয় হযরত ওমরের (রা.) শাহাদাতের পর আওন ইবনে জা'ফরের সাথে। আর আওনের ইন্তেকালের পর তার ভাই আব্দুল্লাহ্ তাকে বিবাহ করেন। নবী করীম (সা.) এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে নারীর দ্বিতীয় বিবাহ মোটেই দূষণীয় ছিল না। যেমনটি হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মে বিদ্যমান রয়েছে। এ কারণেই তৎকালে নারীদের একাধিক বিবাহ হয়েছে ব্যাপক হারে। এখানে মাত্র কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো। অন্যথা এ ধরনের ঘটনা এত অধিক যে, এ স্বল্প পরিসরে তার ব্যাখ্যা দেওয়াও অসম্ভব।

ইসলাম পূর্ব সমাজে নারীর স্থান ঃ ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াতের আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চতুষ্পদ জন্তুর মতো তাদেরও বেচাকেনা চলতো। নিজের বিয়ে শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোনো রকম মূল্য ছিল না। অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে আসন করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মিরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন; কোনো জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোনো স্বত্ব ছিল না আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশি যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারবে, তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয় সেগুলোতেও কোনো কোনো লোক এমনও ছিল যারা নারীর মানব সত্ত্বাকেই স্বীকার করত না।

ধর্ম কর্মেও নারীদের জন্য কোনো অংশ ছিল না। তাদেরকে ইবাদত উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্যও মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোনো কোনো সংসদে পারস্পরিক পরামর্শ ক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে, এরা হলো অপবিত্র এক

জানোয়ার যাতে আত্মার অস্তিত্ব নেই। সাধারণতভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে কৌলিন্যে নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল- নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুকনা কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনোটাই আরোপ করা আবশ্যক হবে না। কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হবে। মহানবী (সা.)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে ফরাসিরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা সারা বিশ্বেও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারকও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বুদ্ধি ও যুক্তি সঙ্গত কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না। হযরত রাহমাতুল্লিল আলামীন ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছেন। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের ওপর ফরজ করেছেন। বিয়ে শাদী ও ধন সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোনো প্রাপ্তবয়স্কা স্ত্রীলোককে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না। এমনকি স্ত্রী লোকের অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির ওপর স্থগিত থাকে সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন। কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয় যেমন হয় পুরুষরা। তাদের সন্তুষ্টি বিধানকেও শরিয়তে মুহাম্মদী ইবাদতের মর্যাদা দান করছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

কখন খোলা করা জায়েজ ঃ প্রয়োজন বোধে খোলা করতে কোনো আপত্তি বা দোষ নেই। আর প্রয়োজন এই যে, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে পরস্পর এমন বিবাদ সৃষ্টি হলো- তাদের মধ্যে সু-সম্পর্ক এবং সুন্দর জীবন-যাপনের কোনো আশাই নেই। আর অপ্রয়োজনে খোলা করা জায়েজ নেই। আর প্রয়োজনেও যথাসম্ভব উহা হতে বিরত থাকা উত্তম। নবী করীম (সা.)-এর বাণী – ابغض المباحات الطلاق অপর হাদীসে আছে "খোলাকারিণী নারীগণ মুনাফিক"। যে স্ত্রী তার স্বামী হতে বিনা প্রয়োজনে তালাক চায় তার জন্য জান্নাতে যাওয়া হারাম। অর্থাৎ সে বেহেশত হতে বঞ্চিত হবে। -(তিরমিযী)

إِذَا تَشَاقَّا الزَّوْجَانِ وَخَافَا أَنْ لَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَفْتَدِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِمَالٍ يَخْلَعُهَا بِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَالِكَ وَقَعَ بِالْخُلْعِ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَإِنْ كَانَ النُّشُوْزُ مِنْ قِبَلِهِ كُرِهَ لَهُ أَنْ يَّأْخُذَ مِنْهَا عِوَضًا وَإِنْ كَانَ النُّشُوْزُ مِنْ قِبَلِهَا كُرِهَ لَهُ أَنْ يَّأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا فَإِنْ فَعَلَ ذَالِكَ جَازَ فِي الْقَضَاءِ وَإِنْ طَلَّقَهَا عَلٰى مَالٍ فَقَبِلَتْ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَزِمَهَا الْمَالُ وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ مِثْلُ أَنْ يُّخَالِعَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ عَلٰى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ فَلَا شَيْءَ لِلزَّوْجِ وَالْفُرْقَةُ بَائِنَةٌ وَإِنْ بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الطَّلَاقِ كَانَ رَجْعِيًّا وَمَا جَازَ أَنْ يَّكُوْنَ مَهْرًا فِي النِّكَاحِ -

সরল অনুবাদ : যখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তিক্ততা ও বিষন্নতা সৃষ্টি হয় এবং উভয় এ আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর নির্দেশাবলী বজায় রাখতে পারবে না তখন কোনো অসুবিধা নেই যে, স্ত্রী স্বীয় জানের বদলায় কিছু মাল দিয়ে খোলা করে নেবে (অর্থাৎ স্বামীর অধিকার থেকে অব্যাহতি নেবে)। সুতরাং যখন সে এমনটি করবে তখন খোলার দ্বারা তালাকে বায়েন পতিত হয়ে যাবে, আর স্ত্রীর ওপর মাল দেওয়া আবশ্যক হয়ে যাবে। আর যদি স্বামীর পক্ষ থেকে বেমিল হয়ে থাকে তবে স্ত্রীর থেকে বদলা নেওয়া মাকরূহ। আর যদি অমিল স্ত্রীর পক্ষ থেকে হয় তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীকে যা দিয়েছে তার থেকে বেশি নেওয়া মাকরূহ। যদি তার থেকে বেশি নেয় তবে আইনত জায়েজ আছে এবং যদি স্ত্রীকে মালের বদলায় তালাক দেয় আর স্ত্রীও গ্রহণ করে নেয় তবে তালাক হয়ে যাবে, আর মাল দেওয়া জরুরি হয়ে যাবে এবং তালাকে বায়েন (পতিত) হয়ে যাবে। যদি খোলা এর মধ্যে বদলা বাতিল হয়ে যায় উদাহরণত- মুসলিম মহিলা মদ বা শূকর-এর ওপর যদি খোলা করে তবে স্বামী কিছুই পাবে না এবং উভয়ের মাঝে তালাকে বায়েন হয়ে যাবে। আর যদি তালাকের মধ্যে বদলা বাতিল হয়, তবে তালাকে রাজ'ঈ হবে। বিবাহ-এর মধ্যে যে বস্তু মোহর হওয়া জায়েজ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ الخ **:** এ জন্য যে, خَلْع শব্দ তালাক হওয়ার সম্ভাবনা রাখে সুতরাং এটা তালাকে كِنَايَاتْ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। আর كِنَايَاتْ শব্দাবলী দ্বারা তালাকে বায়েন হয়ে থাকে, হ্যাঁ সম্পদের কথা উল্লেখ থাকাতে নিয়ত-এর প্রয়োজন হয় না। অপর একটি কারণ এই যে, মহিলার মাল দেওয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, যেন তার ব্যক্তিত্ব ও সত্তা নিরাপদ থাকে আর নিরাপদ এটা তালাকে বায়েন এর দ্বারা হয়ে থাকে।

خُلْع ও نِكَاح-এর মধ্যকার পার্থক্য :

قَوْلُهُ وَمَا جَازَ أَنْ يَّكُوْنَ مَهْرًا الخ **:** কারণ বিবাহের মতো خَلْع-ও একটি عَقْد যা লজ্জাস্থানের ওপর হয়ে থাকে, শুধু পার্থক্য এই যে, যদি خَلْع-এর মধ্যে স্ত্রী মদ বা শূকর নির্দিষ্ট করে তখন স্বামী কিছুই পায় না ; কিন্তু خَلْع শুদ্ধ হয়ে যায়। আর আলোচ্য অবস্থায় বিবাহ-এর মধ্যে স্বামীকে مَهْر مِثْل দিতে হয়, পার্থক্যের কারণ হচ্ছে- স্বামীর অধিকার থেকে লজ্জাস্থান চলে যাওয়া এটাকে মূল্যের মধ্যে গণনা করা হয় না; কিন্তু স্বামীর অধিকারে লজ্জাস্থান আসার জন্য মূল্য দিতে হয় অর্থাৎ মোহর। তাই মুসলমানের নিকট মাল নয় এরূপ বস্তুর মধ্যে অন্য সম্পদ দিতে হবে।

جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ بَدَلًا فِى الْخُلْعِ فَاِنْ قَالَتْ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ فَخَالَعَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِىْ يَدِهَا شَىْءٌ فَلَاشَىْءَ لَهٗ عَلَيْهَا وَاِنْ قَالَتْ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ مَالٍ فَخَالَعَهَا وَلَمْ يَكُنْ فِىْ يَدِهَا شَىْءٌ رُدَّتْ عَلَيْهِ مَهْرَهَا وَاِنْ قَالَتْ خَالِعْنِىْ عَلٰى مَا فِىْ يَدِىْ مِنْ دَرَاهِمَ اَوْ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَفَعَلَ وَلَمْ يَكُنْ فِىْ يَدِهَا شَىْءٌ فَعَلَيْهَا ثَلٰثَةُ دَرَاهِمَ وَاِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَعَلَيْهَا ثُلُثُ الْاَلْفِ وَاِنْ قَالَتْ طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَلَا شَىْءَ عَلَيْهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهَا ثُلُثُ الْاَلْفِ وَلَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلِّقِىْ نَفْسَكِ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ اَوْ عَلٰى اَلْفٍ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا وَاحِدَةً لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا شَىْءٌ مِنَ الطَّلَاقِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ খোলা-এর মধ্যে ঐ বস্তু বদলা হওয়া জায়েজ। অতএব যদি স্ত্রী (স্বামীকে) বলে যে, আমার সাথে খোলা করে নাও ঐ বস্তুর বদলায় যা আমার হাতে আছে; এরপর স্বামী খোলা করে নিল অথচ স্ত্রীর হাতে কিছুই ছিল না, তবে স্বামীর জন্য স্ত্রীর ওপর কিছুই দিতে হবে না। আর যদি স্ত্রী বলে যে, আমার সাথে খোলা করে নাও আমার হাতে যে মাল আছে তার বদলায়। এরপর স্বামী খোলা করে নিল অথচ হাতে কিছুই ছিল না, তখন স্ত্রী স্বীয় মোহর ফেরত দেবে। আর যদি (স্ত্রী) বলে আমার হাতে যে দিরহামসমূহ আছে তার ওপর খোলা করে নাও, এরপর স্বামী খোলা করে নিল। অথচ স্ত্রীর হাতে কিছুই ছিল না, তখন স্বামী স্ত্রীর কাছে তিন দিরহাম পাবে। আর যদি (স্ত্রী) বলে আমাকে তিন তালাক দাও এক হাজারের বদলায় (এরপর) স্বামী এক তালাক দিল, তখন স্ত্রী এক হাজার-এর তৃতীয়াংশ স্বামীকে দেবে। আর যদি স্ত্রী বলে আমাকে তিন তালাক দাও হাজারের ওপর, এরপর স্বামী এক তালাক দিল, তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে স্ত্রীর ওপর কিছুই দিতে হবে না এবং সাহেবাইন (র.) বলেন যে, হাজারের তৃতীয়াংশ দিতে হবে। আর যদি স্বামী বলে যে, নিজেকে তিন তালাক দিয়ে দাও হাজারের বদলায় বা হাজারের ওপর এরপর স্ত্রী নিজেকে এক তালাক দিল, তখন কোনো তালাকই পতিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا بِاَلْفٍ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলায় স্ত্রী এক তালাকের দ্বারা বায়েনা হয়ে যাবে আর যদি স্ত্রী এরূপ বলে طَلِّقْنِىْ ثَلٰثًا عَلٰى اَلْفٍ তবে এ অবস্থায়ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে একই বিধান, কিন্তু ইমাম আযম (র.)-এর মতে এ অবস্থায় এক طَلَاقٌ رَجْعِىٌّ পতিত হবে।

وَالْمُبَارَأَةُ كَالْخُلْعِ وَالْخُلْعُ وَالْمُبَارَأَةُ يَسْقُطَانِ كُلَّ حَقٍّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الْآخِرِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالنِّكَاحِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُبَارَأَةُ تَسْقُطُ وَالْخُلْعُ لَاتَسْقُطُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَاتَسْقُطَانِ إِلَّا مَاسَمَّيْنَاهُ.

সরল অনুবাদ ঃ এবং মোবারাত (অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী পরস্পর একে অপর থেকে মুক্ত হওয়া) খোলা-এর মতো, এবং খোলা ও মোবারাত-এর মধ্য থেকে প্রত্যেকটা স্বামী-স্ত্রীর একের অন্যের ওপর বিবাহ সংক্রান্ত যে হক আছে সব বাতিল করে দেয় (আর এটা) আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, মোবারাত বাতিল করবে কিন্তু খোলা বাতিল করবে না, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, (খোলা ও মোবারাত) উভয়টি ঐসব অধিকার বাতিল করবে যা স্বামী-স্ত্রীর স্থিরকৃত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُبَارَأَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ

وَالْمُبَارَأَةُ كَالْخُلْعِ الخ ঃ مُبَارَأَةٌ এটা বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর مَصْدَرٌ অর্থ- একে অপরের থেকে মুক্ত হওয়া।

مُبَارَأَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ مُبَارَأَةٌ বলা হয়, স্ত্রী তার স্বামীকে বলবে, আমাকে এ পরিমাণ মালের ওপর নিষ্কৃত ও মুক্ত করে দাও। স্বামী বলবে, আমি তোমাকে মুক্ত করে দিলাম।

খোলা ও মোবারাত সম্পর্কীয় বিধানাবলী ঃ খোলা ও মোবারাত উভয়টি স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ সংক্রান্ত অধিকারসমূহকে বাতিল করে দেয়। যেমন- মোহর, খোরপোষ, বাসস্থান ইত্যাদি। এখানে বিবাহ দ্বারা উদ্দেশ্য এরূপ বিবাহ যার পরে খোলা বা মোবারাত হয়। সুতরাং যদি স্ত্রীকে তালাকে বায়েন দিয়ে দ্বিতীয় বার বিবাহ করে, আর দ্বিতীয় মোহর নির্ধারিত হয়, এরপর স্ত্রী খোলা-এর ইচ্ছা প্রকাশ করে, তখন স্বামী দ্বিতীয় বিবাহ-এর মোহর থেকে মুক্ত হয়ে যাবে প্রথম বিবাহ-এর মোহর থেকে নয়।

খোলা ও মোবারাত-এর বিধানে মতভেদ ঃ ইমাম মুহাম্মদ ও তিন ইমামগণের মতে খোলা ও মোবারাত দ্বারা ঐ সব অধিকারসমূহ বাতিল হবে যা স্বামী-স্ত্রী উভয় স্থির করেছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) খোলা সংক্রান্ত ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর সাথে আর মোবারাত সংক্রান্ত ব্যাপারে ইমাম আযম (র.)-এর সাথে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

السوال : (الف) اكتب مناسبة كتاب الخلع مع كتاب الايلاء (ب) بين معنى الخلع لغة واصطلاحا (ج) بين وجه تسميته بالخلع (د) اكتب حكم الخلع (ه) بين مشروعية الخلع بضوء القران الكريم .

السوال : (الف) بين ضرورة الخلع واهميته فى الحياة الازدواجية مع بيان حكمة امتناع تعدد الزوج للنساء؟ (ب) اكتب مكانة النساء قبل الاسلام مع بيان فضيلتها فى الاسلام؟

السوال : (الف) متى يكره للزوج اخذ العوض فى الخلع اوضح المقام بالتيقظ التام؟ (ب) متى يبطل العوض فى الخلع؟ (ج) اى شئ يجوز ان يكون بدلا فى الخلع؟ (د) قوله "وان قالت خالعنى على ما فى يدى من مال فخالعها ولم يكن فى يدها شئ" بين صورة المسئلة مع بيان حكمها؟

السوال : (الف) ما معنى المبارأة لغة واصطلاحا (ب) المبارأة كالخلع ام كيف تقولون؟ بين اختلاف الائمة الكرام فى هذه المسئلة مفصلا؟

كِتَابُ الظِّهَارِ
জেহার পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) জেহার পর্বকে খোলা পর্বের পর এ জন্য এনেছেন যে, জেহার ও খোলা উভয়টিই স্বামী স্ত্রীর বাহ্যিক অমিল থেকে সংঘটিত হয়ে থাকে।

খোলা পর্বকে জেহার-এর পূর্বে আনার কারণ ঃ খোলা পর্বকে জেহার পর্বের পূর্বে আনার কারণ হচ্ছে– খোলার দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়, পক্ষান্তরে জেহার এর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না। দ্বিতীয়ত কারণ হচ্ছে– খোলার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সদা সর্বদার জন্য حُرْمَتْ সাব্যস্ত হয় আর জেহার-এর মধ্যে স্বামী স্ত্রীর মাঝে সাময়িক حُرْمَتْ সাব্যস্ত হয় কিন্তু কাফ্ফারা দিলে حُرْمَتْ উঠে যায়। তাই حُرْمَتْ-এর প্রাচুর্যের দিকে লক্ষ্য করে খোলা পর্বকে পূর্বে এনেছেন।

ظِهَارْ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ ظِهَارْ এটা مَصْدَرْ; এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّيْ বলা। এ বাক্য দ্বারা খুব সূক্ষ্মভাবে রূপকভাষায় حُرْمَتْ -কে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

إِسْتِعَارَةْ বা রূপক ভাষার পরিচয় ঃ إِسْتِعَارَةْ ঐ রূপক ভাষাকে বলা হয় যার মধ্যে عَلَاقَةْ مُشَابِهَةْ পাওয়া যায়। عَلَاقَةْ مُشَابِهَةْ মানে শব্দের মূল অর্থ ও রূপক অর্থের মাঝে যে সম্পর্ক পাওয়া যাবে তার মধ্যে পরস্পর উপমা ও দৃষ্টান্ত-এর অর্থ পাওয়া যাবে।

ظَهْرْ শব্দের সাথে ظِهَارْ -কে নির্দিষ্ট করার কারণ ঃ

ظَهْرْ শব্দের অর্থ- পিঠ। ظِهَارْ-এর মধ্যে ظَهْرْ শব্দকে খাস করার কারণ হচ্ছে– সওয়ারির পিঠ সাধারণত সওয়ার হওয়ার স্থান হয়ে থাকে। ঠিক তেমনি স্বাভাবিক সঙ্গমের সময় স্ত্রীও সওয়ারির ন্যায়। অতএব সওয়ারির ওপর সওয়ার হওয়ার অর্থ থেকে رُكُوْبِ أُمْ-কে রূপক ভাষায় ব্যবহার করা হয়েছে। এরপর স্ত্রীর ওপর সওয়ার হওয়াকে رُكُوْبِ أُمْ তথা মায়ের ওপর সওয়ার হওয়ার সাথে উপমা দিয়েছে, অথচ ছেলের জন্য মা সদা সর্বদার জন্য হারাম ও নিষিদ্ধ। তাই এরূপ উপমা দিলে স্ত্রী সাময়িক হারাম হয়ে যাবে।

ظِهَارْ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় ظِهَارْ বলা হয় স্বীয় স্ত্রীকে এরূপ নারীর সাথে উপমা দেওয়া যে স্বামীর ওপর সদা সর্বদার জন্য হারাম ও বিবাহ নিষিদ্ধ।

যাদের পক্ষ থেকে ظِهَارْ শুদ্ধ হয় ঃ জেহারকারী এরূপ ব্যক্তি হতে হবে যে কাফ্ফারাহ-এর যোগ্য হয়। অতএব জিম্মি, পাগল ও ছোট বাচ্চার ظِهَارْ শুদ্ধ হবে না, কারণ এরা কাফফারাহ-এর যোগ্য নয়।

ظِهَارْ-এর বিধান ঃ

ظِهَارْ-এর বিধান হচ্ছে– আসল বিবাহ বাকি থাকা সত্ত্বেও কাফ্ফারা আদায় করা পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে সঙ্গম করা হারাম।

কুরআনের আলোকে ظِهَارْ-এর প্রমাণ ঃ ظِهَارْ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ – (الاية)

যখন আউস ইবনে সামেত (রা.) তাঁর স্ত্রীর সাথে জেহার করল, আর তার স্ত্রী মহানবী (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করল তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়।

হাত ও পা দ্বারা তুলনা করলে তার হুকুম ঃ স্ত্রীকে মুহাররামাতের হাত পায়ের সাথে তুলনা দিলে জেহার হবে না। কেননা এদের দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল।

জেহারের কাফফারা প্রদানের পূর্বে সহবাস করার হুকুম ঃ জেহারকারী শুধু জেহারের কাফ্ফারা প্রদান করবে এবং সহবাসের কারণে দ্বিতীয় কাফ্ফারা তার ওপর অপরিহার্য হবে না। কারণ নবী করীম (সা.) হতে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যিনি কাফ্ফারা প্রদানের পূর্বে স্ত্রীর সাথে সহবাস করল, তখন উত্তরে নবী করীম (সা.) বললেন, তার ওপর একই কাফ্ফারা প্রদান করা ওয়াজিব।

মুহরিম নারীর সাথে তুলনা করলে তার বিধান ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে তার মুহরিম নারীদের সাথে তুলনা করলে ইহা জেহার ব্যতীত অন্য কিছুই হবে না।

إِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِامْرَأَتِهِ اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ لَايَحِلُّ لَهُ وَطْيُهَا وَلَامَسُّهَا وَلَا تَقْبِيْلُهَا حَتّٰى يُكَفِّرَ عَنْ ظِهَارِهِ فَإِنْ وَطِيَهَا قَبْلَ اَنْ يُّكَفِّرَ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যখন পুরুষ তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার ওপর আমার মায়ের পিঠের সমতুল্য তাহলে উক্ত স্ত্রী তার ওপর হারাম হয়ে যাবে। তার সাথে সঙ্গম করাও হালাল হবে না এবং তাকে স্পর্শ ও তাকে চুমো দেওয়াও হালাল হবে না তার জেহারের কাফ্ফারা দেওয়ার আগ পর্যন্ত। সুতরাং যদি কাফফারা দেওয়ার আগেই তার সাথে সঙ্গম করে ফেলে তাহলে ইস্তেগফার করে নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জেহারকারী কাফফারা দেওয়ার পূর্বে চুম্বন করা ইত্যাদি সম্পর্কে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهَاالخ ঃ আমাদের আহনাফের মতে জেহারকারী কাফফারার পূর্বে সঙ্গম এবং সঙ্গমের আসবাব অর্থাৎ চুমো ইত্যাদি সবগুলো করা হারাম হবে। হযরত ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সঙ্গমের আসবাব হারাম নয়। কেননা জেহার সম্পর্কে যে আয়াত তাতে تَمَاسٌ শব্দ দ্বারা جِمَاعٌ অর্থাৎ সঙ্গম করা থেকে কেনায়া করা হয়েছে। হযরত ইমাম আহমদ ও শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জওয়াব হচ্ছে যে, تَمَاسٌ শব্দের হাকীকী অর্থাৎ বাস্তবিক অর্থ হাত দ্বারা স্পর্শ করা। সুতরাং যখন হাকীকী অর্থ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তখন মাজাযী অর্থের ওপর বলার প্রয়োজন নেই।

কাফফারার পূর্বে সঙ্গম করলে একাধিক কাফফারা সম্পর্কে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهَ الخ ঃ হানাফী মাযহাব মতে এ অবস্থায় জেহারের শুধু একটা কাফফারা দেবে এবং তওবা ও ইস্তিগফার করবে। হযরত ইমাম নাখঈ (র.) বলেন, তার ওপর তিনটি কাফফারা ওয়াজিব হবে। আর হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর বলেন, প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয় কাফফারাও ওয়াজিব হবে। হানাফী মাযহাবের দলিল হচ্ছে ঐ বর্ণনা যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে জেহার করার পর কাফফারা আদায়ের পূর্বেই সঙ্গম করে নিল। তখন হুযূর (সা.) এরশাদ করলেন, তুমি এমন কেন করেছ? ঐ ব্যক্তি আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! চন্দ্রের কিরণে তার চেহারার চমক দেখে আমার ওপর ধৈর্য ধরা সম্ভব হচ্ছিল না। এতদ শ্রবণে হুযূর (সা.)-এরশাদ করলেন, কাফফারা আদায় করা পর্যন্ত তার থেকে ভিন্ন থাক। আর ইমাম মালেক (র.)-এর মুয়াত্তার মধ্যে এ রকম আছে– يَكُفُّ عَنْهَا حَتّٰى يَسْتَغْفِرَ اللّٰهَ وَيُكَفِّرَ

সুতরাং ইস্তিগফার এবং এক কাফফারা ব্যতীত যদি দ্বিতীয় অন্য কিছু ওয়াজিব হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ (সা.) তা বয়ান করে দিতেন।

وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ الْكَفَّارَةِ الْأُولٰى وَلَا يُعَاوِدُ حَتّٰى يُكَفِّرَ وَالْعَوْدُ الَّذِيْ يَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ هُوَ اَنْ يَّعْزِمَ عَلٰى وَطْيِهَا وَاِذَا قَالَ اَنْتِ عَلَيَّ كَبَطْنِ اُمِّيْ اَوْكَفَخِذِ هَا اَوْكَفَرْجِهَا فَهُوَ مُظَاهِرٌ وَكَذَالِكَ اِنْ شَبَّهَهُمَا بِمَنْ لَايَحِلُّ لَهٗ النَّظَرُ اِلَيْهَا عَلٰى سَبِيْلِ التَّابِيْدِ مِنْ مَحَارِمِهٖ مِثْلَ اُخْتِهٖ اَوْ عَمَّتِهٖ اَوْ اُمِّهٖ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَكَذَالِكَ اِنْ قَالَ رَأْسُكِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ اَوْ فَرْجُكِ اَوْ وَجْهُكِ اَوْ رَقَبَتُكِ اَوْ نِصْفُكِ اَوْ ثُلُثُكِ وَاِنْ قَالَ اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلَ اُمِّيْ يَرْجِعُ اِلٰى نِيَّتِهٖ فَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ بِهِ الْكَرَامَةَ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ ظِهَارٌ وَاِنْ قَالَ اَرَدْتُّ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ بَائِنٌ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهٗ نِيَّةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يَكُوْنُ الظِّهَارُ اِلَّا مِنْ زَوْجَتِهٖ فَاِنْ ظَاهَرَ مِنْ اَمَتِهٖ لَمْ يَكُنْ مُظَاهِرًا ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং উক্ত ব্যক্তির ওপর প্রথম কাফ্ফারা ব্যতীত আর কিছুই হবে না। এরপর কাফ্ফারা দেওয়ার আগ পর্যন্ত ফিরিয়ে আনবে না। আর ঐ আউদ তথা ফিরানো যেটা কাফ্ফারাকে ওয়াজিব করে তা হচ্ছে সে তার সাথে সঙ্গম করার পরিপূর্ণ ইচ্ছা পোষণ করে এবং যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে যে তুমি আমার ওপর আমার মায়ের পিঠ, অথবা রান, অথবা তার লজ্জাস্থানের সমতুল্য; তাহলে সে মুজাহের হয়ে যাবে। এমনিভাবে যদি স্বামী তার স্ত্রীকে এমন মহিলার সাথে তুলনা দেয় যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা তার সব সময়ের জন্য হালাল নয়, যেমন তার নিজের বোন, ফুফু, দুধ মা। এমনিভাবে যদি তাকে বলে যে, তোমার মাথা আমার ওপর আমার মায়ের পিঠের মতো অথবা তোমার লজ্জাস্থান, অথবা তোমার চেহারা, অথবা তোমার গর্দান, অথবা তোমার অর্ধাংশ, অথবা তোমার এক তৃতীয়াংশ। আর যদি বলে যে তুমি আমার ওপর আমার মায়ের মতো, তাহলে তার নিয়তের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। অর্থাৎ তার নিয়ত অনুযায়ী ফয়সালা হবে। আর যদি বলে যে, এটা দ্বারা আমার ইচ্ছা বুজুর্গি বর্ণনা করা ছিল তাহলে তাই হবে। আর যদি বলে আমার উদ্দেশ্য জেহার ছিল তাহলে তাই হবে। আর যদি বলে আমার ইচ্ছা তালাক ছিল তাহলে বায়েন তালাক হয়ে যাবে। আর যদি কোনো নিয়ত না করে তাহলে কিছুই হবে না। আর নিজ স্ত্রী ছাড়া কারো সাথে জেহার হবে না। আর যদি তার বাঁদির সাথে জেহার করে তাহলে জেহার হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَالْعَوْدُ الخ ঃ কাফ্ফারা ওয়াজিব হওয়ার সবব কি? এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামদের মতভেদ আছে – (১) পরিপূর্ণ জেহার এবং আউদ (ফিরিয়ে নেওয়া)। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এটা সম্পর্কেই রায় পেশ করেন, কেননা জেহারের আয়াতের মধ্যে فَاَسْبَيَّنَهُ-এর আগে এটাই উল্লেখ আছে। (২) জেহার সবব, আর আউদ শর্ত। (৩) এর উল্টা, (৪) উভয়টার মধ্যে প্রত্যেকটাই সবব এবং শর্তও। হযরত ইমাম কুদূরী (র.)-এ কথার মধ্যে এটাই বলেছেন যে, জেহারের আয়াতে আউদ দ্বারা বুঝায় যে, জেহারকারী জেহারকৃতা মহিলার সাথে সঙ্গম করার পরিপূর্ণ ইচ্ছা করা।

قَوْلُهٗ وَاِنْ لَّمْ تَكُنْ نِيَّةٌ الخ ঃ কোনো ব্যক্তি যদি اَنْتِ عَلَيَّ مِثْلَ اُمِّيْ (তুমি আমার ওপর আমার মায়ের মতো) বলে কোনো কসমের নিয়ত না করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, কথা বেহুদা হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, জেহার হয়ে যাবে। কেননা যখন মায়ের কোনো অঙ্গ দ্বারা সমতুল্য দেওয়া জেহার হয় তখন পূর্ণদেহের সাথে সমতুল্য দেওয়াতো আরো উত্তমরূপেই জেহার হবে। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, তাশবীহ সম্পর্কে তার কথাটা মুজমাল এ জন্য তার দ্বারা কি বুঝায় এটা বয়ান করা আবশ্যক।

قَوْلُهٗ وَلَايَكُوْنُ الظِّهَارُ الخ ঃ হানাফী মাযহাব মতে জেহার শুধু নিজ স্ত্রীর সাথে হয়। বাঁদি, উম্মে ওয়ালাদ এবং মুকাতাবার সাথে জেহার সহীহ হবে না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, জেহার সহীহ হবে। কিন্তু জেহারের আয়াত তার ওপর দলিল-প্রমাণ। কেননা পরিভাষা অনুযায়ী نِسَاءُ رَجُلٍ তার স্ত্রীদেরকেই বলে বাঁদি ইত্যাদি কাউকে নয়।

وَمَنْ قَالَ لِنِسَائِهِ اَنْتُنَّ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّي كَانَ مُظَاهِرًا مِنْ جَمَاعَتِهِنَّ وَعَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةٌ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ عِتْقُ رَقَبَةٍ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا كُلُّ ذَالِكَ قَبْلَ الْمَسِيْسِ وَيُجْزِئُ فِيْ ذَالِكَ عِتْقُ الرَّقَبَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالْكَافِرَةِ وَالذَّكَرِ وَالْاُنْثٰى وَالصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ وَلَا يُجْزِئُ الْعَمْيَاءُ وَلَا مَقْطُوْعَةُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَيَجُوْزُ الْاَصَمُّ وَمَقْطُوْعُ اِحْدَى الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنْ خِلَافٍ وَلَا يَجُوْزُ مَقْطُوْعُ اِبْهَامَيِ الْيَدَيْنِ وَلَا يَجُوْزُ الْمَجْنُوْنُ الَّذِيْ لَا يَعْقِلُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যে ব্যক্তি তার সমস্ত স্ত্রীদেরকে বলল যে তোমরা সবাই আমার ওপর আমার মায়ের পিঠের মতো; তাহলে ঐ ব্যক্তির জন্য সবার পক্ষ থেকে আলাদা আলাদাভাবে কাফফারা ওয়াজিব হবে। জেহারের কাফফারা হচ্ছে– একজন গোলাম আজাদ করা। আর যদি গোলাম না পাওয়া যায় তাহলে ধারাবাহিক দু'মাস রোজা রাখতে হবে। আর যদি এটার ওপর ও সক্ষম না হয় তাহলে ষাট (৬০) জন মিসকিনকে খানা খাওয়ায়ে দেবে। এ সবগুলোই সঙ্গমের পূর্বে হবে। আর আজাদ করার জন্য এক গোলাম মুসলমান হোক অথবা কাফির, পুরুষ হোক অথবা মহিলা, ছোট বাচ্চা হোক অথবা বড় যথেষ্ট হবে। আর অন্ধ (এবং) দোনো হাত পা কর্তিত ব্যক্তি আজাদ করার জন্য যথেষ্ট হবে না। বধির ব্যক্তি জায়েজ আছে এবং ঐ ব্যক্তিও জায়েজ আছে যার ডান হাত এবং বাম পা অথবা বাম হাত এবং ডান পা কর্তিত। আর ঐ ব্যক্তি জায়েজ নেই যার উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ কর্তিত। এবং ঐ ব্যক্তি নয় যে পাগল, পরিপূর্ণ অজ্ঞ, বাক শক্তিহীন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْتُنَّ عَلَيَّ الخ ঃ এ অবস্থায় ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর নিকট শুধু এক কাফ্ফারাই যথেষ্ট হবে। এ সমস্ত ইমামগণ اِيْلَاءُ (ঈলা)-এর ওপর কিয়াস করেন যে, যদি কেউ কসম খেয়ে নেয় যে, আমি আমার স্ত্রীদের সাথে সঙ্গম করব না, এরপর যে কোনো একজনের সাথে সঙ্গম করল তাহলে একটা কাফ্ফারা দেওয়া দ্বারা সব স্ত্রীগণই ঐ ব্যক্তির জন্য হালাল হয়ে যাবে। আমরা বলছি যে, তাদের মুখ থেকে প্রত্যেকের সাথেই হুরমত ছাবেত হবে, আর কাফ্ফারা একমাত্র হুরমতকেই খতম করার জন্য। সুতরাং যখন হুরমত কয়েকটা আছে তখন কাফফারাও কয়েকটা হবে, কিন্তু ঈলা এটার বিপরীত। কেননা সেখানে কাফ্ফারার কারণ আল্লাহ তা'আলার নামের হেফাজতের জন্য আর তা মুতাআদ্দাদ (অর্থাৎ সংখ্যামূলক) নয়।

قَوْلُهُ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ الخ ঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যদি জেহারের কাফ্ফারায় গোলাম আজাদ করে তাহলে মুসলমান, কাফির, ছোট, বড়, নর ও নারী সবই সমান। আইম্মায়ে ছালাছার নিকট কাফির গোলাম আজাদ করা দ্বারা কাফ্ফারা আদায় হবে না। কেননা কাফ্ফারা আল্লাহ তা'আলার হক। সুতরাং তাকে আল্লাহর দুশমনের ওপর খরচ করা সহীহ হবে না, যেমন কাফির ব্যক্তির ওপর জাকাতের মাল খরচ করা সহীহ নয়। আমাদের দলিল হচ্ছে আয়াতের মধ্যে رقبه শব্দটি ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে; যা দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ যাত যেটা সব এতেবারেই মামলূক হবে। আর এ জিনিস কাফিরের গর্দানে অর্থাৎ কাফিরের নিকট উপস্থিত। সুতরাং ঈমানের কয়েদ লাগালে (আয়াত) কুরআনের ওপর বাড়াবাড়ি হবে যেটা জায়েজ নেই। বাকি কাফ্ফারার হক আল্লাহ তা'আলা হওয়া এর অর্থ হচ্ছে যে, আজাদ করা দ্বারা আজাদকারীর উদ্দেশ্য হলো আজাদকৃত গোলাম তার মনিবের খেদমত থেকে প্রত্যাবর্তন করে আসল খোদা আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যে লেগে যায়। এখন যদি সে তার কুফরির ওপরই অটল থাকে তাহলে এটা তার বদ এতেকাদের ওপর বহন করা হবে।

قَوْلُهُ وَلَا يُجْزِئُ الْعَمْيَاءُ الخ ঃ কাফ্ফারার মধ্যে এ রকম গোলাম আজাদ করা জায়েজ হবে না যার থেকে ফায়দা হাছিল করার জিন্‌স ফউত হয়ে গেছে। যেমন– এমন অন্ধ হওয়া সে একেবারেই দেখে না। অথবা তার উভয় হাত অথবা উভয় পা অথবা উভয় হাতের আঙ্গুলসমূহ কর্তিত হবে। অথবা এমন পাগল হওয়া যে কখনো হুঁশ ফিরে পায়না বা কখনো হুঁশে আসে না। এমনকি মুদাব্বার, উম্মোওয়ালাদ ও মুকাতাব যে বদলে কেতাবতের কিছু অংশ আজাদ করে দিয়েছে তাহলে এদেরকে আজাদ করা যথেষ্ট হবে না। কেননা এরা একভাবে আজাদ হওয়ার মুসতাহেক হয়েছে। সুতরাং এগুলোতে পূর্ণ গর্দান আজাদ করা পাওয়া যায় না বিধায় এগুলো আজাদ করা যথেষ্ট হবে না।

وَلَايَجُوزُ عِتْقُ الْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ الَّذِىْ اَدّٰى بَعْضَ الْمَالِ فَاِنْ اَعْتَقَ مُكَاتِبًا لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا جَازَ فَاِنْ اِشْتَرٰى اَبَاهُ اَوْ اِبْنَهُ وَيَنْوِى بِالشِّرَاءِ الْكَفَّارَةَ جَازَ عَنْهَا وَاِنْ اَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدٍ مُشْتَرِكٍ عَنِ الْكَفَّارَةِ وَضَمِنَ قِيْمَةَ بَاقِيَةٍ فَاَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفُ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُجْزِيْهِ اِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُوْسِرًا وَاِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَمْ يَجُزْ وَاِنْ اَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهٖ عَنْ كَفَّارَتِهٖ ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيَهٖ عَنْهَا جَازَ وَاِنْ اَعْتَقَ نِصْفَ عَبْدِهٖ عَنْ كَفَّارَتِهٖ ثُمَّ جَامَعَ الَّتِىْ ظَاهَرَ مِنْهَا ثُمَّ اَعْتَقَ بَاقِيَهٖ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ مَا يُعْتِقُهُ فَكَفَّارَتُهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَيْسَ فِيْهِمَا شَهْرُ رَمَضَانَ وَلَا يَوْمُ الْفِطْرِ وَلَايَوْمُ النَّحْرِ وَلَا اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ -

সরল অনুবাদ ঃ এবং মুদাব্বারকে আজাদ করা জায়েজ হবে না উম্মে ওয়ালাদকেও নয় এবং ঐ মুকাতাব ও নয় যে কিছু মাল আদায় করে দিয়েছে। আর যদি এমন মুকাতাবকে আজাদ করল যে কিছুই আদায় করেনি তাহলে জায়েজ হবে। অতঃপর যদি নিজের পিতা অথবা পুত্রকে কাফ্ফারা দেওয়ার নিয়তে ক্রয় করে তাহলে কাফ্ফারার পক্ষ থেকে জায়েজ হয়ে যাবে। আর যদি শরিক গোলামের অর্ধাংশকে আজাদ করে এবং বাকি অর্ধাংশের মূল্যের জামেন হয় এরপর তাকে আজাদ করে, তাহলে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। আর হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, আজাদকারী ব্যক্তি যদি ধনশীল হয় তাহলে যথেষ্ট হবে আর যদি সংকটমান হয় তাহলে যথেষ্ট হবে না। আর যদি তার নিজের গোলামের অর্ধেক কাফ্ফারা পক্ষ হতে আজাদ করে, এরপর পরিশিষ্ট অংশও তারই পক্ষ থেকে আজাদ করল তাহলে জায়েজ হবে। আর যদি নিজের অর্ধ গোলামকে কাফ্ফারার পক্ষ থেকে আজাদ করল, তারপর যার থেকে জেহার করা হয়েছে তার সাথে সঙ্গম করল, তারপর বাকি অর্ধেক গোলামও আজাদ করে দিল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে জায়েজ হবে না। অতঃপর যদি জেহারকারী ব্যক্তি ঐ জিনিস না পেল যেটা সে আজাদ করবে তাহলে তার কাফ্ফারা হচ্ছে ধারাবাহিক দু'মাস রোজা রাখা যার মধ্যে রমজান মাস ঈদুল ফিতর ঈদুল আজহা এবং আইয়ামে তাশরীক থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا الخ ঃ যদি কোনো ব্যক্তি জেহারের কাফ্ফারায় এমন মুকাতাব গোলাম আজাদ করল সে এখনো বদলে কেতাবতের কোনো অংশকে আজাদ করেনি তাহলে আমাদের নিকট এটা সহীহ হবে। হযরত ইমাম যুফার ও ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, সহীহ হবে না। কেননা সে কেতাবতের আক্দ করা দ্বারা আজাদ হওয়ার মুসতাহেক হয়েছে। আমরা হানাফীগণ বলছি যে, গোলামের মহল জানা আর মিলকিয়তের জায়গা উভয়টি ভিন্ন ভিন্ন। কেননা মিলকের মহল

গোলাম হওয়া থেকে ব্যাপক। সুতরাং মালিক হওয়া মানুষ ব্যতীত অন্যান্য বস্তুতেও হতে পারে ; কিন্তু গোলাম হওয়া অন্যান্য বস্তুতে হতে পারে না। এমনকি বিক্রি দ্বারা মিলকিয়ত (মালিক হওয়া) বরবাদ হয়ে যায় ; কিন্তু গোলাম হওয়া দূর হয় না। আর কেতাবত দ্বারা মুকাতাবের মিলকিয়তে ঘাটতি আসে গোলাম হওয়ার মধ্যে ঘাটতি আসে না। সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর এরশাদ মুবারক সে যতক্ষণ পর্যন্ত মুকাতাবের ওপর বদলে কেতাবতের কোনো জিনিস বাকি থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সে গোলামই থাকে। সুতরাং মুকাতাবকে আজাদ করা সহীহ হবে।

قَوْلُهُ فَإِنِ اشْتَرٰى الخ ঃ নিজস্ব নিকটতম আত্মীয়স্বজন পিতা অথবা পুত্র ইত্যাদিকে কাফ্ফারা আদায়ের নিয়তে ক্রয় করলে কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এরশাদ করেন ঃ لَنْ يُجْزِئَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ ইমাম যুফার ও তিনো ইমাম-এর উক্তি হচ্ছে যে, কাফ্ফারা আদায় হবে না। কিন্তু উল্লখিত হাদীস তাদের উক্তির বিরুদ্ধে হুজ্জত বা প্রমাণ। কেননা হাদীসের মধ্যে فاء (ফা) হরফ উল্লেখ আছে যা তা'কীবের জন্য আসে। এ ছাড়াও এখানে আজাদি দুই গুণ বিশিষ্ট ইল্লতের দ্বারা হাসিল হয়েছে অর্থাৎ করাবত এবং খরীদ (ক্রয়)। সুতরাং আজাদি শেষ গুণের দিক মুযাফ বা সম্পর্ক হবে আর তা হচ্ছে শেরা অর্থাৎ বেচা।

قَوْلُهُ نِصْفُ عَبْدٍ مُشْتَرِكٍ الخ ঃ হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট এই আজাদি কাফফারা দ্বারা জায়েজ নেই। হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট জায়েজ আছে। তবে শর্ত হচ্ছে যে, আজাদকারী সম্পদশালী হতে হবে। কেননা তাঁদের দু'জনের নিকট আজাদ অংশ বিশিষ্ট হয় না। তাহলে যে কোনো এক অংশে আজাদি আসা দ্বারা পূর্ণ আজাদ হয়ে যাবে। অতঃপর আজাদকারী ব্যক্তি যদি সম্পদশালী হয় তাহলে তার অংশীদারের জন্য তার অংশের জামিন হয়ে যাবে আর আজাদ বদল ব্যতীত হবে এ জন্য আজাদ করা সহীহ হবে। আর যদি আজাদকারী সংকীর্ণ (আর্থিক দুর্বল) হয়, তাহলে অংশীদারের অংশের মধ্যে গোলাম চেষ্টা করবে আর আজাদ বদলা দ্বারা হবে এ জন্য আজাদি সহীহ হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, শেষ অর্ধাংশের মামলূকিয়াতে (মালিক বানানোর মধ্যে) ঘাটতি এবং সার্বক্ষণিক গোলাম হওয়ার মধ্যে পার্থক্য এসে গেছে। কেননা এখন তার দ্বিতীয় মালিক তাকে বিক্রি করতে পারবে না, সুতরাং পূর্ণ গর্দান আজাদ করা পাওয়া যায়নি।

قَوْلُهُ فَإِنْ لَّمْ يَجِدِ الْمُظَاهِرُ الخ ঃ এ দূরত্বের মধ্যে ধারাবাহিক দু'মাস রোজা থাকতে হবে। কেননা আয়াতে কারীমার মধ্যে مُتَتَابِعَيْنِ-এর দ্বারা কয়েদ লাগানো হয়েছে, যার অর্থ লাগাতার বা ধারাবাহিক। আর এ দু'মাস এমন হতে হবে যার মধ্যে রমজান মাস না থাকে। কেননা রমজান মাসে দ্বিতীয় কোনো রোজা আদায় হয় না। যদি কাফফারার নিয়ত দ্বারা হয় তাহলেও রমজানেরই হবে।

فَإِنْ جَامَعَ الَّتِيْ ظَاهَرَ مِنْهَا فِيْ خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ لَيْلًا عَامِدًا أَوْ نَهَارًا نَاسِيًا اِسْتَأْنَفَ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْهَا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ اِسْتَأْنَفَ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ لَمْ يَجْزِهِ فِي الْكَفَّارَةِ إِلَّا الصَّوْمُ فَإِنْ أَعْتَقَ الْمَوْلٰى عَنْهُ أَوْ أَطْعَمَ لَمْ يُجْزِئْهُ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعِ الْمُظَاهِرُ الصِّيَامَ أَطْعَمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا وَيُطْعِمُ كُلَّ مِسْكِيْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيْرٍ أَوْ قِيْمَةَ ذَالِكَ فَإِنْ غَدَّاهُمْ وَعَشَّاهُمْ جَازَ قَلِيْلًا كَانَ مَا أَكَلُوْا أَوْ كَثِيْرًا وَإِنْ أَطْعَمَ مِسْكِيْنًا وَاحِدًا سِتِّيْنَ يَوْمًا أَجْزَاهُ وَإِنْ أَعْطَاهُ فِيْ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا عَنْ يَوْمِهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর যদি জেহারকৃত মহিলার সাথে দু'মাসের মধ্যবর্তীতে রাত অথবা দিনে ভুলে সঙ্গম করে নিল তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট শুরু থেকে আবার রোজা রাখবে। আর যদি ঐসব দিবস থেকে কোনো একদিন ওজর অথবা ওজর ছাড়াই ইফতার করে ফেলে তাহলে শুরু থেকে রোজা রাখবে। আর যদি গোলাম ব্যক্তি জেহার করে তাহলে তার কোনো কাফ্‌ফারাই যথেষ্ট হবে না রোজা ব্যতীত। অতঃপর তার মাওলা যদি আজাদ করে দিল অথবা খানা খাওয়ায়ে দিল গোলামের পক্ষ থেকে তাহলে যথেষ্ট হবে না। আর যদি জেহারকারী ব্যক্তি রোজা রাখার ওপর সক্ষম না হয় তাহলে ষাটজন মিসকিনকে খানা খাওয়াবে এবং প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ তোলা গম অথবা এক সা' খেজুর অথবা যব খাওয়াবে অথবা তার মূল্য দিয়ে দেবে। অতঃপর যদি তাদের সকাল ও বিকাল খাওয়াল তাহলে এটাও জায়েজ হবে ; চাই সে কম খাক অথবা বেশি। আর যদি শুধু এক মিসকিনকেই ষাট দিন খাওয়াল তাহলে এটাও যথেষ্ট হবে। আর যদি এক মিসকিনকেই একদিন ষাট মিসকিনের খানা দিয়ে দেয় তাহলে একদিনের খানা ব্যতীত বাকি উনষাট দিনের জন্য যথেষ্ট হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِيْ خِلَالِ الشَّهْرَيْنِ الخ ঃ এ সুরতের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট আবার নতুন করে শুরু থেকে রোজা রাখতে হবে। কাজি আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, রাত্রে সঙ্গম দ্বারা রোজা ফাসেদ হয় না। সুতরাং রোজার তারতীব তার নিত্য অবস্থায়ই বাকি থাকবে নষ্ট হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, যেমনভাবে রোজাসমূহ সঙ্গমের পূর্বে হওয়া নস দ্বারা শর্ত; এমনিভাবে তাদের সঙ্গম থেকে খালি হওয়াও শর্ত। এখন যদি প্রথম শর্ত ফউত হয়ে যায় তাহলে কমপক্ষে দ্বিতীয় শর্ত তামীল বা অমল করা জরুরি হওয়া দরকার।

قَوْلُهُ لَيْلًا عَامِدًا الخ ঃ لَيْل অর্থাৎ রাত্রের সাথে عَمْد (ইচ্ছাকৃত)-এর কয়েদ লাগানো। এটা ইত্তেফাকী এহতেরাযী নয়। কেননা রাত্রে সুহবত করার মধ্যে ইচ্ছা এবং ভুল উভয়টিই বরাবর।

قَوْلُهُ وَإِنْ ظَاهَرَ الْعَبْدُ الخ ঃ যদি গোলাম তার স্ত্রীর সাথে জেহার করে ফেলে তাহলে সে কাফ্ফারার মধ্যে শুধু রোজাই রাখবে। কেননা সে কোনো জিনিসের মালিক নয় বরং সে নিজেই তার মনিবের মামলূক। হাঁ, শুধু রোজা রাখার ওপর সক্ষম আছে এ জন্য তার ওপর রোজাই লাযেম হবে, যার থেকে তার মনিবও বাধা দেবে না। অতঃপর যেহেতু কাফ্ফারার মধ্যে ইবাদতের অর্থ আছে এ জন্য এখানে গোলামের হকে অর্ধেক হবে না বরং পুনঃ দু'মাস রোজা রাখবে।

قَوْلُهُ فَإِنْ أَطْعَمَ مِسْكِيْنًا وَاحِدًا الخ ঃ হানাফী মাযহাবে প্রত্যেক দিন নতুন ফকিরকে খাওয়ান জরুরি নয় ; যদি এক ফকিরকেই দু'মাস খাওয়াতে থাকে তাহলেও কাফ্ফারা আদায় হয়ে যাবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট পৃথকভাবে ষাট মিসকিনকে খাওয়ান জরুরি। কেননা আয়াতের মধ্যে سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا অর্থাৎ ষাট মিসকিন এর কথা প্রকাশ্যভাবে আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, খানা খাওয়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হাজতমান্দ ব্যক্তির হাজতকে দূর করা। আর হাজতের মধ্যে প্রত্যেক দিনই তাজাদ্দুদ অর্থাৎ প্রত্যেক দিন মানুষ খাওয়ার মুহতাজ। সুতরাং প্রত্যেক দিন একই ফকিরকে খাওয়ানো এমন যেমন প্রত্যেক দিন একজন নূতন ফকিরকে খাওয়ানো। হাঁ, যদি এক ফকিরকে এক দিনের মধ্যে তিন 'সা' গেল্লাহ দিয়ে দেয় তাহলে জায়েজ হবে না ; বরং শুধু এক দিনের কাফ্ফারাই আদায় হবে। কেননা এখানে হাকীকীভাবেও তাফরীক নয় হুকমীভাবেও নয়। অথচ তার জিম্মার মধ্যে তাফরীক লাযেম। আর এটা এমন হয়ে গেল যেমন কোনো হাজি সাহেব জামরার সাত কংকরকে এক বারই মেরে দেয় যে এটা শুধুমাত্র এক রমী বা নিক্ষেপ বলে পরিগণিত হবে।

وَاِنْ قَرُبَ الَّتِىْ ظَاهَرَ مِنْهَا فِىْ خِلَالِ الْاِطْعَامِ لَمْ يَسْتَانِفْ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ كَفَّارَتَا ظِهَارٍ فَاَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ لَايَنْوِىْ لِاَحَدِهِمَا بِعَيْنِهَا جَازَ عَنْهُمَا وَكَذَالِكَ اِنْ صَامَ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ اَوْ اَطْعَمَ مِائَةً وَّعِشْرِيْنَ مِسْكِيْنًا جَازَ وَاِنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً وَّاحِدَةً عَنْهُمَا اَوْ صَامَ شَهْرَيْنِ كَانَ لَهُ اَنْ يَّجْعَلَ ذَالِكَ عَنْ اَيِّتِهِمَا شَاءَ -

---

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর যদি খাওয়ানো অবস্থায় জেহারকৃত মহিলার সাথে সঙ্গম করে ফেলল তাহলে শুরু থেকে করবে না। আর যে ব্যক্তির ওপর জেহারের দু'টি কাফ্ফারা ওয়াজিব হলো এবং সে দু'টি গোলাম আজাদ করে দিল এবং কোনো একটারও নিয়ত করল না তাহলে উভয় জেহারের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। অনুরূপ যদি চার মাস রোজা রাখে অথবা একশত বিশজন মিসকিনকে খাওয়ায় তাহলে জায়েজ হবে। আর যদি এক গোলাম আজাদ করল অথবা দু'মাস রোজা রাখে তাহলে সে যার থেকে ইচ্ছা তার থেকেই উহাকে কাফ্ফারা হিসাবে গ্রহণ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الخ ঃ এই তিন সুরতের মধ্যে যেহেতু জিন্স তথা প্রকার এক ও অভিন্ন, এ জন্য নিয়ত নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

قَوْلُهُ رَقَبَةً وَاحِدَةً الخ ঃ এ সুরতের মধ্যে কিয়াসের চাহিদা হচ্ছে– জায়েজ না হওয়া। ইমাম যুফার (র.) এটাই বলেন। কেননা যদি উভয়টির ওপর বণ্টন করা হয় তাহলে প্রত্যেকটি থেকে তার অর্ধেক হবে। সুতরাং শুরু থেকেই বাতেল হয়ে যাবে। যেমন– যদি জেহার এবং রমজানের রোজার ইফতার দ্বারা এক এক গোলাম আজাদ করে। কিন্তু আমাদের (হানাফী) নিকট এসতেহসান হিসেবে জায়েজ আছে। এ জন্য যেখানে জিন্স এক হয় সেখানে নির্ধারণ করা বেহুদা হয়।

اَلْمُنَاقَشَةُ (অনুশীলনী)

(١) ما معنى الظهار لغة وشرعا؟ ثم بين مناسبة كتاب الظهار مع كتاب الخلع -

(٢) لماذا اخر المصنف كتاب الظهار من كتاب الخلع؟ بين وجه تخصيص لفظ الظهر بالظهار؟

(٣) بين حكم الظهار وهات دليل الظهار بضوء القران الكريم -

(٤) من هو اهل الظهار ؟ اذا شبه الرجل يد المنكوحة ورجلها مع المحرمات ماذا حكمه؟

(٥) بين حكم دواعى الجماع قبل الكفارة مع بيان اختلاف الائمة ثم شيد مذهبك بالدليل؟

(٦) اذا جامع المظاهر قبل اداء الكفارة ماذا حكمة هات مع بيان اختلاف الفقهاء ثم رجح مذهبك المختار بالدليل؟

كِتَابُ اللِّعَانِ

লে'আন পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) ظِهَارْ পর্বের পর لِعَانْ পর্বকে এ জন্য এনেছেন যে, ظِهَارْ হচ্ছে– স্ত্রীকে মন্দ ও অসমীচীন কথা বলে উপমা দেওয়া আর لِعَانْ হচ্ছে মন্দ ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া, এ হিসাবে ظِهَارْ ও لِعَانْ উভয়টির মধ্যেই সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

لِعَانْ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ

لِعَانْ শব্দটির لَامْ টি যের সহকারে قَاتِلْ - لَاعِنْ -এর ওজনে ক্রিয়ামূল। অনুরূপভাবে مُلَاعَنَةٌ -ও উহার ক্রিয়ামূল আসে, যা মূলত لَعْنٌ থেকে নিষ্পন্ন। এটার অর্থ আল্লাহর রহমত হতে অভিসম্পাত করা, দূরে সরিয়ে রাখা।

لِعَانْ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ

শরিয়তের পরিভাষায় لِعَانْ বলা হয়–

اَلشَّهَادَاتُ الْمُؤَكَّدَاتُ بِالْاَيْمَانِ الْمَقْرُوْنَةِ بِاللَّعْنِ الْقَائِمَةِ مَقَامَ حَدِّ الْقَذْفِ فِىْ حَقِّهِ وَحَدِّ الزِّنَا فِىْ حَقِّهَا –

অর্থাৎ কসমের সাথে মুয়াক্কাদ করে এমন সব সাক্ষ্য প্রদান করা যা অভিসম্পাত যুক্ত, এই সাক্ষ্যাবলী পুরুষের বেলায় বেত্রাঘাতযোগ্য এবং নারীর বেলায় জেনার স্থলাভিষিক্ত (অর্থাৎ যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ই لِعَانْ করবে তখন স্বামী হতে অপবাদের শাস্তি এবং স্ত্রী হতে জেনার শাস্তি রহিত হয়ে যাবে)।

ইমাম আহমদ, মালেক ও শাফেয়ী (র.) বলেন, শরিয়তের পরিভাষায় لِعَانْ বলা হয় اَللِّعَانُ اَيْمَانٌ مُؤَكَّدَاتٌ بِالشَّهَادَةِ (শাহাদাত শব্দ দ্বারা তাকিদকৃত কসমকে لِعَانْ বলে)। তাঁদের মতে মূলত লে'আন হলো আইমান বা কসম সাক্ষ্য বা শাহাদাত নয়। তাই তাঁরা কসমের যোগ্য হওয়ার শর্তারোপ করেন। আর তাঁদের মতে মুসলমান নারীর ও পুরুষের মধ্যে যেমনভাবে লে'আন প্রয়োগ হতে পারে তেমনিভাবে কাফির নারী ও পুরুষের মধ্যে এবং কাফির নারী ও গোলামের মধ্যেও প্রয়োগ হতে পারে।

لِعَانْ -এর রোকন ঃ

ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ওলামায়ে আহনাফের মতে لِعَانْ -এর রোকন হলো– শাহাদাত। আল্লাহ তা'আলার বাণী–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ –

লে'আনের রোকন শাহাদাত হওয়ারই প্রমাণ। কেননা অত্র আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা শাহাদাতকেই লে'আন স্থির করে উহাতে কসম এবং অভিসম্পাতকে সংযুক্ত করেছেন। কাজেই লে'আনের রোকন হবে কসম সহকারে তাকিদকৃত সাক্ষ্য। আর সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য হওয়াই লে'আনের জন্য শর্ত। অতএব মুসলমান, আকেল, বালেগ ও কোনো অপবাদে অভিযুক্ত হয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়নি এমন সব ক্ষেত্রেই লে'আন প্রযোজ্য হবে।

আর ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র.)-এর মতে লে'আনের রোকন হলো– কসম যা সাক্ষ্য সংযুক্ত হবে। এ জন্য লে'আনের মধ্যে কসম করার যোগ্য হওয়া শর্ত। কাজেই তাদের মতে মুসলমান, কাফির, নাবালেগ ও গোলাম সকলের ক্ষেত্রে লে'আন কার্যকরী হতে পারে।

কুরআনের আলোকে লে'আন ঃ

লে'আন প্রমাণ করে আল্লাহ তা'আলার এই বাণী–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ ـ وَيَدْرَؤُا عَنْهُمُ الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ – وَالْخَامِسَةُ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ –

অর্থাৎ এবং যারা তাদের স্ত্রীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোনো সাক্ষী নেই, এরূপ ব্যক্তির সাক্ষ্য এভাবে হবে যে, সে আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেবে যে, সে অবশ্যই সত্যবাদী এবং পঞ্চমবার বলবে যে, যদি সে মিথ্যাবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর লানত এবং স্ত্রীর শাস্তি রহিত হয়ে যাবে যদি সে আল্লাহর কসম খেয়ে চার বার সাক্ষ্য দেয় যে, তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যাবাদী এবং পঞ্চমবার বলে যে, যদি তার স্বামী সত্যবাদী হয় তবে তার ওপর আল্লাহর গজব নেমে আসবে। -(সূরায়ে নূর)

লে'আন কার ওপর প্রয়োগ হবে?

উপরোক্ত আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, লে'আন কেবলমাত্র স্বীয় স্ত্রীর বেলায়ই হয়ে থাকে। অন্যের স্ত্রীকে অপবাদদাতা বেত্রাঘাত পাওয়ার যোগ্য হবে, যা এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ হতে বুঝা যায়। আর এটাও বুঝা গেল যে, স্বামী নিজের পক্ষে প্রমাণ দিতে পারলেই লে'আন আসবে। যদি স্ত্রী জেনা করেছে বলে স্বামী প্রমাণ দিতে পারে কিংবা স্ত্রী জেনা করেছে বলে স্বীকার করে, তবে লে'আন আসবে না; বরং স্ত্রী জেনার শাস্তি প্রাপ্ত হবে।

লে'আনে স্ত্রীর অবস্থান ঃ

স্ত্রী বৈধ বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রী হওয়া লে'আনের একটি শর্ত। কেননা যে বিবাহ বন্ধন ফাসেদরূপে হয়েছে এমন বিবাহের স্ত্রী এবং যে স্ত্রীকে বায়েন তালাক দেওয়া হয়েছে এমন স্ত্রীর ওপর লে'আন হয় না। হাঁ তালাকে রেজয়ী যে স্ত্রীকে দেওয়া হয়েছে তার সাথে লে'আন হয়। মৃত স্ত্রীকে অপবাদ দিলে লে'আন হয় না।

لِعَانْ-এর উদ্দেশ্য ঃ

লে'আন এ জন্য প্রয়োগ হয়ে থাকে যে, যাতে নারীর থেকে ত্রুটি দূর করা যায়। আর যে নারী হারাম সহবাস কিংবা উহার অপবাদ হতে পবিত্র নয় তার দোষ-ত্রুটি ধর্তব্য নয়।

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَهُمَا مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُحَدُّ قَاذِفُهَا اَوْ نُفِيَ نَسَبُ وَلَدِهَا وَطَالَبَتْهُ الْمَرْأَةُ بِمُوْجِبِ الْقَذْفِ فَعَلَيْهِ اللِّعَانُ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْهُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتّٰى يُلَاعِنَ اَوْيُكَذِّبَ نَفْسَهُ فَيُحَدُّ وَاِنْ لَاعَنَ وَجَبَ عَلَيْهَا اللِّعَانُ فَاِنِ امْتَنَعَتْ حَبَسَهَا الْحَاكِمُ حَتّٰى تُلَاعِنَ اَوْتُصَدِّقَهُ -

সরল অনুবাদ ঃ যখন পুরুষ তার স্ত্রীকে জেনার অপবাদ দিল এবং উভয়জন সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্ত হয়। আর মহিলা এমন হয় যার অপবাদকারীকে হদ্ লাগানো হয়, অথবা তার সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হওয়াকে নিষেধ করে দেয়। আর মহিলা অপবাদের কারণ সম্পর্কে অন্বেষণ করে তাহলে তার ওপর লে'আন হবে। অতঃপর যদি তার থেকে বিরত থাকে তাহলে হাকিম তাকে বন্দী করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে লে'আন করে অথবা নিজের মিথ্যারোপ করে অর্থাৎ নিজকে মিথ্যাবাদী স্বীকার করে। আর তাকে হদ অর্থাৎ ইসলামি দণ্ড লাগানো হবে। অতঃপর যদি সে লে'আন করে তাহলে মহিলার ওপরও লে'আন ওয়াজিব হবে। আর যদি সে বিরত থাকে তাহলে হাকিম সাহেব তাকে বন্দী করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে লে'আন করে অথবা স্বামীর সত্যায়ন করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সতী স্ত্রীকে জিনার অপবাদ দেওয়ার বিধানাবলী ঃ

قَوْلُهُ اِمْرَأَتَهُ بِالزِّنَا الخ **ঃ** ফিকহ শাস্ত্রের অন্যান্য কিতাবে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত আছে তা এই যে, ব্যক্তি তার সতী স্ত্রীকে জেনার অপবাদ প্রদান করল অর্থাৎ যে স্ত্রী জেনা হতে পবিত্র কখনো জেনার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়নি। যথা– এমন নারী যে, তার সাথে এমন কোনো সন্তান রয়েছে যার পিতা অজ্ঞাত। আর প্রত্যেক স্বামী-স্ত্রী সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্যতা রাখে কিংবা স্বামী-স্ত্রীর সন্তানের সবংশ হওয়া অস্বীকার করে এবং স্ত্রী এর বিপরীত দাবি করে অর্থাৎ স্বামীর অপবাদের প্রমাণ চায় এবং প্রমাণ দিতে না পারলে শাস্তির দাবি করে তবে স্বামীর ওপর লে'আন ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বামী লে'আন করতে অসম্মতি জানায়, তবে তাকে লে'আন করা পর্যন্ত কিংবা নিজকে মিথ্যাবাদী বলে স্বীকার করা পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে এবং এই অবস্থায় তাকে অপবাদের হদ লাগাতে হবে। আর যদি লে'আন করে তবে স্ত্রীও লে'আন করতে হবে। অন্যথা স্ত্রীকে লে'আন করা পর্যন্ত কিংবা স্বামীর অপবাদ মেনে নেওয়া পর্যন্ত বন্দী করে রাখতে হবে। আর তার সন্তানের বংশ সম্পর্ক স্বামীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তবে কেবল স্বামীর দাবি মেনে নেওয়াতেই তার ওপর জেনার হদ জারি হবে না। আর যদি স্বামী গোলাম হয় অথবা কাফির কিংবা কোনো একবার তাকে অপবাদের হদ লাগানো হয়ে থাকে। তবে তার ওপর লে'আন আসবে না ; বরং তার ওপর হদ্দে কযফ প্রয়োগ হবে। কেননা এই সকল অবস্থায় সাক্ষ্য দানের যোগ্যতা না থাকার দরুন সে লে'আন করার যোগ্য নয়। আর যদি পুরুষ সাক্ষ্য দানের যোগ্য হয়, আর স্ত্রী যদি দাসী কিংবা কাফির হয়, অথবা তাকে কোনো সময় অপবাদের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে বা স্ত্রী অপ্রাপ্ত বয়স্কা বা পাগলী কিংবা জেনাকারিণী হয়, তবে স্বামীর ওপর হদ কিংবা লে'আন কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা স্ত্রী জেনাকারিণী অবস্থায় সে পবিত্র বা সতী থাকেনি, আর জেনা ব্যতীত উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়ের কোনো একটিতে গুণান্বিত হলে সে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য থাকেনি। সুতরাং এ সকল অবস্থায় স্বামীর ওপর অপবাদের শাস্তি এ জন্য কার্যকরী হবে না যে, স্ত্রী সতী এবং লে'আন এ জন্য আসবে না যে, স্ত্রী সতী পবিত্রা কিংবা সাক্ষ্য দানের যোগ্য নয়।

وَإِذَا كَانَ الزَّوْجُ عَبْدًا أَوْ كَافِرًا أَوْ مَحْدُوْدًا فِيْ قَذْفٍ فَقَذَفَ إِمْرَأَتَهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَةِ وَهِيَ أَمَةٌ أَوْ كَافِرَةٌ أَوْ مَحْدُوْدَةٌ فِيْ قَذْفٍ أَوْكَانَتْ مِمَّنْ لَايُحَدُّ قَاذِفُهَا فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ فِيْ قَذْفِهَا وَلَا لِعَانَ وَصِفَةُ اللِّعَانِ أَنْ يَّبْتَدِئَ الْقَاضِيْ فَيَشْهَدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ أَشْهَدُ بِاللّٰهِ إِنِّيْ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتُهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا ثُمَّ يَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَاهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا يُشِيْرُ إِلَيْهَا فِيْ جَمِيْعِ ذَالِكَ ثُمَّ تَشْهَدُ الْمَرْأَةُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ تَقُوْلُ فِيْ كُلِّ مَرَّةٍ أَشْهَدُ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزِّنَا وَتَقُوْلُ فِي الْخَامِسَةِ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَانِيْ بِهِ مِنَ الزِّنَا وَإِذَا الْتَعَنَا فَرَّقَ الْقَاضِيْ بَيْنَهُمَا -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি স্বামী গোলাম অথবা কাফির অথবা অপবাদের শাস্তি ভোগকৃত হয় এবং সে তার স্ত্রীকে অপবাদ দেয় তাহলে তার ওপর হদ ওয়াজিব হবে। আর যদি স্বামী শাহাদত ওয়ালা হয় আর মহিলা বাদি হয় অথবা কাফির অথবা অপবাদের শাস্তি ভোগকারিণী হবে অথবা তার অপবাদকারীকে হদ না লাগায় তাহলে তার ওপর হদ্ জারি হবে না তাকে অপবাদ লাগানোর মধ্যে এবং লে'আনও হবে না। লে'আনের পদ্ধতি এভাবে যে, কাজি সাহেব স্বামীকে দিয়ে আরম্ভ করেন এবং চারবার তার সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। প্রত্যেকবার বলবে যে, আমি আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, ঐ মহিলাকে আমি জেনার যে দোষারোপ করেছি তাতে অবশ্যই আমি সত্যবাদী। এরপর পঞ্চমবার বলবে আল্লাহর অভিশাপ হোক তার নিজের ওপর যদি সে স্ত্রীর প্রতি জেনার যে দোষারোপ করেছে তাতে মিথ্যাবাদী হয়। আর এসব গুলোর মধ্যে মহিলার দিকে ইশারা করবে। তারপর মহিলা চার বার সাক্ষ্য দেওয়া, প্রত্যেকবার বল আমি আল্লাহ তা'আলাকে সাক্ষী বানাচ্ছি যে, সে আমার প্রতি জেনার যে দোষারোপ করেছে তাতে সে মিথ্যাবাদী। আর পঞ্চমবার বলে যে, তার ওপর আল্লাহ তা'আলার আজাব হোক যদি সে আমার প্রতি জেনার যে দোষারোপ করেছে তাতে সত্যবাদী হয়। যখন উভয়ে লে'আন করে নিল তখন কাজি সাহেব তাদের মধ্যে পৃথক করে দেবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ الخ ঃ কিন্তু হদ না হওয়া এ জন্য হবে যে, লে'আন মহিলার পক্ষ থেকে নিষেধ। কেননা আমাদের নিকট অপবাদের কারণ স্বামীর জন্য হচ্ছে লে'আন। আর মহিলার পক্ষ থেকে লে'আন কষ্টকর হয় বিধায় হদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে।

জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ

لِعَانْ-এর শর্তাবলী ঃ লে'আন অপবাদের শাস্তি প্রয়োগের শর্ত হলো اِحْصَانْ আর اِحْصَانْ অর্থ হলো– নারী মুসলমান, আজাদ, বুদ্ধিমতী, বালেগা ও আফীফা বা পুণ্যবতী হওয়া। আর লে'আনের শর্ত যেহেতু ইহসান ও সাক্ষ্য প্রদানের যোগ্য পাত্র হওয়া, এ জন্য যদি নারী সতী না হয় তবে হদ এবং লে'আন কোনোটিই হবে না। কেননা ইহ্সানের শর্ত বিদ্যমান

নেই। আর যদি স্ত্রী সতী হয়, কিন্তু কোনো অপবাদের কারণে ইতঃপূর্বে তাকে হদ্ লাগানো হয়েছিল, তবে সাক্ষ্য দানের যোগ্য পাত্র না হওয়ার দরুন লে'আন হবে না এবং হদও জারি হবে না। কেননা এই পদ্ধতিতে লে'আন বাতিল হয়ে গেছে। আর তাও এমন কারণে হয়েছে যা স্ত্রীর মধ্যে পাওয়া গেছে, স্বামীর মধ্যে নয়।

যেসব রমণীর ওপর লে'আন হয় না ঃ

প্রকাশ থাকে যে, চার প্রকার নারীর ওপর লে'আন হয়না, এটার দলিল ইবনে মাজার হাদীস। চার ধরনের রমণী আছে যাদের ওপর লে'আন হয় না। (১) খ্রিস্টান নারী যদি কোনো মুসলমানের বিবাহ বন্ধনে থাকে, (২) ইহুদি নারী যদি কোনো মুসলমানের বিবাহধীনে থাকে, (৩) দাসী যদি কোনো স্বাধীন ব্যক্তির বিবাহধীনে হয়, (৪) স্বাধীন নারী যদি কোনো গোলামের বিবাহধীনে হয়।

লে'আনের পর বিবাহ বিচ্ছেদের বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَرَّقَ الْقَاضِيْ بَيْنَهُمَا الخ ঃ অর্থাৎ কিতাবে বর্ণিত লে'আনের নিয়ম অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী উভয়েই লে'আন করার পর তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া কাজির ওপর ওয়াজিব হয়ে থাকবে। কেননা নবী করীম (সা.) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি উয়াইমের আজালানী (রা.) ও তার স্ত্রীর মধ্যে লে'আন করার পর বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেন। -(বুখারী)

হাদীসখানি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যে, কেবল লে'আন দ্বারাই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় না, যেমন- ইমাম যুফার (র.) বলেন যে, লে'আনের পর কাজির পক্ষ থেকে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটাতে হবে। সুতরাং পরস্পর লে'আন করার পর বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বেই যদি তাদের মধ্য হতে কেউ মারা যায় তাহলে স্বামী স্ত্রীর যে জীবিত থাকবে সে মৃতের উত্তরাধিকারী হবে এবং তালাক দিলেও তালাক কার্যকরী হবে। ইমাম যুফার (র.)-এর দলিল সেই হাদীসের প্রকাশ্য ভাষ্য যে, "লে'আনকারী স্বামী-স্ত্রী কখনো একত্রিত হতে পারে না।" -(দারে কুতনী, বায়হাকী প্রমুখ) এর উত্তর এই যে- যেখানে হাদীসের উদ্দেশ্য হলো- "লে'আন করার পর স্বামী-স্ত্রী একত্রিত হতে পারে না" এ কথার অর্থ হলো কাজি বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়ার পর একত্রিত হতে পারে না। আবূ দাউদের বর্ণনায় এটাই প্রতীয়মান হয়। তা এই যে, "সুন্নত এটাই যে, লে'আনকারীদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে, এটার পর তাঁরা আর একত্রিত হতে পারবে না।" আর কেবলমাত্র পরস্পর লে'আন করার দরুন বিবাহ বিচ্ছেদ হয় না, এটার প্রমাণ হযরত উয়াইমের (রা.)-এর ঘটনা। তা হলো- হযরত উয়াইমের ও তাঁর স্ত্রীর লে'আনের পর তিনি তাকে তিন তালাকই প্রদান করেন। আর হুযূর (সা.) এতে নীরব ভূমিকা পালন করেন। যদি কাজির বিচ্ছেদ করা ছাড়াই সরাসরি বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যেতো তবে তিনি এর ওপর অসম্মতি জ্ঞাপন করতেন। - (বুখারী)

وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَكُوْنُ تَحْرِيْمًا مُؤَبَّدًا وَاِنْ كَانَ الْقَذْفُ بِوَلَدٍ نَفَى الْقَاضِىْ نَسَبَهُ وَاَلْحَقَهُ بِاُمِّهِ فَاِنْ عَادَ الزَّوْجُ وَاَكْذَبَ نَفْسَهُ حَدَّهُ الْقَاضِىْ وَحَلَّ لَهُ اَنْ يَّتَزَوَّجَهَا وَكَذَالِكَ اِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ اَوْ زَنَتْ فَحُدَّتْ وَاِنْ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ صَغِيْرَةٌ اَوْ مَجْنُوْنَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا وَلَاحَدَّ وَقَذْفُ الْاَخْرَسِ لَايَتَعَلَّقُ بِهِ اللِّعَانُ وَاِذَا قَالَ الزَّوْجُ حَمْلُكِ مِنِّىْ فَلَا لِعَانَ وَاِنْ قَالَ زَنَيْتِ وَهٰذَا الْحَمْلُ مِنَ الزِّنَا تَلَاعَنَا وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِىْ الْحَمْلَ مِنْهُ وَاِذَا نَفَى الرَّجُلُ وَلَدَ اِمْرَأَتِهِ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ اَوْ فِى الْحَالِ الَّتِىْ تُقْبَلُ التَّهْنِيَةُ فِيْهَا وَتُبْتَاعُ لَهُ اٰلَةُ الْوِلَادَةِ -

সরল অনুবাদ ঃ আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এ পৃথকীকরণ দ্বারা এক তালাকের হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, সব সময়ের জন্য হারাম হয়ে যাবে। আর যদি অপবাদ বাচ্চার অস্বীকৃতি দ্বারা হয় তাহলে কাজি সাহেব সন্তানের পিতৃ পরিচয় বাতিল করে বাচ্চাকে তার মায়ের সাথে মিলিয়ে দেবে। অতঃপর যদি স্বামী ফিরে এসে নিজের মিথ্যা স্বীকার করে তাহলে কাজি সাহেব তাকে হদ লাগাবে এবং উক্ত মহিলাকে বিবাহ করা হালাল হবে। এমনিভাবে যদি অন্য মহিলাকে অপবাদ দিলো এবং তাকে হদ লাগাল অথবা মহিলা যেনা করল এবং তাকে হদ লাগানো হলো। আর যদি নিজের স্ত্রীকে অপবাদ দিল অথচ সে খুব ছোট অথবা পাগলিনী হয়, তাহলে তার মধ্যে লে'আনও হবে না, হদও হবে না। আর বোবার অপবাদ লাগানো দ্বারা লে'আন হবে না। আর যখন স্বামী বলে যে তোমার গর্ভ আমার থেকে নয় তাহলে লে'আন হবে না। আর যদি বলে তুমি জেনা করেছ আর এই গর্ভ জেনা থেকেই তাহলে উভয়ে লে'আন করবে। আর কাজি সাহেব স্বামী থেকে গর্ভ পরিচয় বাতিল করবেন না। আর যখন স্বামী-স্ত্রীর সন্তান প্রসবের পর পর তা অস্বীকার করল, অথবা ঐ অবস্থায় যখন সন্তান জন্মের অভিনন্দন গ্রহণ এবং জন্মের জিনিসপত্র ক্রয় করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَطْلِيْقَةً بَائِنَةً الخ ঃ অর্থাৎ কাজি বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়ার পর নারী এক তালাকের সাথে বায়েনা হয়ে যাবে। আর এই বিচ্ছেদ তালাকে বায়েনের হুকুমভুক্ত হবে। কেননা এ স্থলে উদ্দেশ্য হলো, নারী হতে অন্যায় প্রতিরোধ করা এবং স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছেদ লাভ হওয়া।

قَوْلُهُ وَاَكْذَبَ نَفْسَهُ الخ ঃ অর্থাৎ যদি লে'আন করার পর স্বামী বলে যে, "আমার স্ত্রীর প্রতি জেনার অভিযোগ উত্থাপনে আমি মিথ্যাবাদী" তবে স্বামীর ওপর অপবাদের শাস্তি প্রয়োগ হবে এবং ঐ স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহধীন করা এই স্বামীর জন্য জায়েজ হবে। কেননা পূর্ববর্তী বিবাহ লে'আনের পর বিচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার কারণে ভঙ্গ হয়ে গেছে। আর বিবাহ এ জন্য জায়েজ হবে যে, লে'আনের প্রতিক্রিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে বর্তমান থাকেনি।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা সরাসরি একটি হাদীসের বিরোধ বুঝা যাচ্ছে তা হচ্ছে- হাদীস শরীফে আছে, اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَايَجْتَمِعَانِ اَبَدًا এটার উত্তর এই যে, নবী করীম (স.)-এর বাণী- اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَايَجْتَمِعَانِ اَبَدًا -এর ব্যাখ্যার সারকথা হলো আলোচ্য হাদীসখানির বাহ্যিক ভাব ধারায় প্রমাণ হয় যে, চিরতরে এক্ষেত্রে বিবাহ হালাল না হওয়া। যেমন ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন; কিন্তু তরফাইনের মতে স্বামী নিজেকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পর বিবাহ বন্ধন হালাল হবে। কারণ হাদীসের মধ্যে বিবাহ হারাম হওয়ার চিরস্থায়ী হুকুম লে'আন অবশিষ্ট থাকার সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত লে'আন থেকেই যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত হুরমতও চিরস্থায়ী হবে। অতঃপর মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দ্বারা যখন লে'আন বাতিল হয়ে গেল তখন হুরমতের সমাপ্তিও হয়ে গেল।

صَحَّ نَفْيُهُ وَلَاعَنَ بِهِ وَاِنْ نَفَاهُ بَعْدَ ذَالِكَ لَاعَنَ وَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَصِحُّ نَفْيُهُ فِىْ مُدَّةِ النِّفَاسِ وَاِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِىْ بَطْنٍ وَاحِدَةٍ فَنَفَى الْاَوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِىْ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا وَحُدَّ الزَّوْجُ وَاِنِ اعْتَرَفَ بِالْاَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِىَ ثَبَتَ نَسَبُهَا وَلَاعَنَ -

সরল অনুবাদ ঃ তাহলে তার অস্বীকৃতি শুদ্ধ হবে এবং এর কারণে লে'আন করবে। আর যদি এরপর অস্বীকার করে তাহলে লে'আন করবে এবং বংশ ছাবেত বা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, বাচ্চার অস্বীকার এটা নেফাসের মুদ্দতের মধ্যে শুদ্ধ হবে। যদি মহিলার এক পেট থেকে দুই সন্তান প্রসব করে এবং প্রথমটার থেকে নিষেধ করল আর দ্বিতীয়টার স্বীকার করল তাহলে উভয়টিরই বংশ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং স্বামীর ওপর হদ কায়েম করা হবে। আর যদি প্রথমটার স্বীকার করল এবং দ্বিতীয়টার থেকে অস্বীকার করল তাহলে উভয়টার বংশ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং লে'আন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ الخ ঃ অর্থাৎ, যদি নারী জমজ সন্তান প্রসব করে তবে কোনো একটির অস্বীকার করলেও উভয় সন্তানের বংশ স্বামীর সাথেই সাব্যস্ত হবে। কেননা যখন সে সন্তান দু'টির কোনো একটিকে স্বীকার করল, আর সন্তান দু'টির একই বীর্য হতে জন্ম হয়েছে এবং একই সময়ে উভয় সন্তানের গর্ভ হওয়ার স্থির হয়েছে। সুতরাং এমনিতেই দ্বিতীয় সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। স্বামীর অস্বীকার গ্রহণযোগ্য হবে না। এটাতে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, সন্তান অস্বীকার করার কারণে লে'আন ও হদ এবং বংশ সম্পর্ক বাতিল হওয়ার মধ্যে কোনোটাই একটি অপরটিকে আবশ্যক করে না।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) ما معنى اللعان لغة واصطلاحا؟ وكيف ينعقد اللعان بين بيانا شافيا -

(٢) متى يصح نفي الرجل نسب ولد امراته؟

(٣) هل اللعان كان لفسخ النكاح ام لا؟ بين مع اختلاف الائمة ـ

كِتَابُ الْعِدَّةِ

ইদ্দত পর্ব

<u>যোগসূত্র</u> ঃ বিবাহ বিচ্ছেদের যে সব কারণ আছে যেমন তালাক, ঈলা, খোলা, লে'আন এগুলো বর্ণনা করার পর ইদ্দত পর্বকে বর্ণনা করে গ্রন্থকার (র.) খুব সুন্দর সাজিয়েছেন। কারণ সাধারণত এসব বিবাহ বিচ্ছেদের পরই স্ত্রীর জন্য ইদ্দত পালন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই এখন ইদ্দতের বিধানাবলী বর্ণনা করা আরম্ভ করেছেন।

عِدَّةٌ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ عِدَّةٌ -এর আভিধানিক অর্থ গণনা করা, হিসাব, সংখ্যা, عِدَّةٌ শব্দটি ع বর্ণ যের د বর্ণটি তাশদীদ যুক্ত।

عِدَّةٌ -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় বৈবাহিক সম্পর্ক চলে যাওয়ার পর নারীর অপেক্ষমান সময়কে ইদ্দত বলে। চাই সেই বৈবাহিক সম্পর্ক চলে যাওয়া কোনো কারণ বশত হোক বা সন্দেহ জনিত বা তদ্রূপ কোনো কারণে হোক। কখনো কখনো অপেক্ষমান সময়কেই ইদ্দত বলে।

<u>عِدَّةٌ-এর পারিভাষিক অর্থের فَوَائِدُ قُيُوْد এই ঃ</u>

عِدَّةٌ -এর পারিভাষিক অর্থের মধ্যে "নারীর অপেক্ষাকরণ" বলাতে পুরুষের অপেক্ষাকরণ খারিজ হয়ে গিয়েছে। যথা– স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার পর তার ইদ্দত শেষ হওয়ার আগে তার বোনকে বিবাহ করা জায়েজ নেই। কিন্তু শরিয়ত এই অপেক্ষমান সময়কে ইদ্দত বলে না। আর বিবাহ বন্ধন চলে যাওয়ার কথাটি এ জন্য বলা হয়েছে যে, যাতে রেজয়ী তালাকের অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কেননা তাতে বিবাহ সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়ে যায় না। আর 'বিবাহের সন্দেহ' কথাটি বলতে ফাসেদ আকদের বিবাহও এতে শামিল হয়ে গেছে। আর উহার মতো কথাটি বলাতে উম্মে ওয়ালাদের ইদ্দতও শামিল হয়ে গেছে। আর এতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, জেনার মধ্যে ইদ্দত নেই। বরং যার সাথে জেনা করা হয়েছে সে গর্ভবতী হলেও বিবাহ করা জায়েজ।

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا أَوْ رَجْعِيًّا أَوْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهِيَ حُرَّةٌ مِمَّنْ تَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا ثَلٰثَةُ أَقْرَاءٍ

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ যখন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে তালাকে بائن অথবা رجعى দিয়ে দেয়। অথবা উভয়ের মধ্যে তালাক ব্যতীত পৃথকতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং মহিলা আজাদ হয় এবং ঋতুস্রাব প্রবাহিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে ঐ মহিলার ইদ্দত তিন قُرُوْء

<u>প্রাসঙ্গিক আলোচনা</u>

قَوْلُهُ هِيَ حُرَّةٌ ঃ আজাদ মহিলার ব্যাপারে উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষাপট হলো, যখন তার সাথে সঙ্গম করা হয়, চাই সে مُسْلِمَةٌ হোক অথবা غَيْرُ مُسْلِمَةٍ - কিন্তু যদি সঙ্গমের পূর্বে হয়, তাহলে ঐ মহিলার ওপর কোনো প্রকার ইদ্দত পালন নেই।

وَالْاَقْرَاءُ الْحَيْضُ وَاِنْ كَانَتْ لَاتَحِيْضُ مِنْ صِغَرٍ اَوْ كِبَرٍ فَعِدَّتُهَا ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَاِنْ كَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَاِنْ كَانَتْ اَمَةً فَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ وَاِنْ كَانَتْ لَاتَحِيْضُ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَنِصْفٌ وَاِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ اِمْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ فَعِدَّتُهَا اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشَرَةُ اَيَّامٍ وَاِنْ كَانَتْ اَمَةً فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ اَيَّامٍ -

সরল অনুবাদ ঃ আর قُرُوْء দ্বারা উদ্দেশ্য حَيْض তথা ঋতুস্রাব। কিন্তু যদি ঐ মহিলার স্বল্প বয়স অথবা বার্ধক্যের কারণে ঋতুস্রাব না হয়, তাহলে তার ইদ্দত হবে তিন মাসে। আর যদি স্ত্রী গর্ভবতী হয়, তবে তার 'ইদ্দত' গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। আর যদি মহিলা দাসী হয় তবে তার ইদ্দত দুই 'হায়েয'। যদি তার ঋতুস্রাব না হয়, তাহলে ইদ্দত দেড়মাস। আর যদি স্বামী তার (আজাদ) স্ত্রীকে রেখে মৃত্যুবরণ করে, তবে ঐ মহিলার ইদ্দত চারমাস দশদিন, কিন্তু স্ত্রী দাসী হলে তার ইদ্দত দুই মাস পাঁচ দিন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْاَقْرَاءُ الْحَيْضُ-এর ব্যাখ্যায় ইমামগণের মতানৈক্য ঃ

আল্লাহ তা'আলার বাণী- وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ ثَلٰثَةَ قُرُوْءٍ -এর মধ্যে যে ثَلٰثَةَ قُرُوْء শব্দ রয়েছে তার অর্থের ব্যবহার নিয়ে ইমামগণের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম মালেক এবং শাফেয়ী (র.)-এর নিকট ثَلٰثَةَ قُرُوْء এখানে তিন طُهْر -এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, ثَلٰثَةٌ একটি স্ত্রীঃ শব্দ। আর عَدَدْ (তথা সে সংখ্যা দ্বারা গণনা করা হয় সেটা) স্ত্রী হওয়াটা مَعْدُوْد (তথা যাকে গণনা করা হয়, তার) পুং হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করে। সুতরাং যেহেতু طُهْر পুং শব্দটি এতএব এখানে "قُرُوْء" টি طُهْر অর্থেই ব্যবহৃত হবে حَيْض অর্থে নয়।

আহনাফের মতানুসারে এখানে قُرُوْء শব্দটি حَيْض অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, قُرُوْء শব্দটি حَيْض এবং طُهْر -এর মধ্যে مُشْتَرَك (অর্থাৎ উভয় অর্থে সাধারণভাবে মিলিত এবং উভয়ই قُرُوْء-এর মূল অর্থে ব্যবহৃত হয়) আর مُشْتَرَك শব্দ একই সময়ে তার উভয় অর্থে সংযোজিত হয় না। অতএব যে কোনো এক অর্থে ব্যবহার হওয়া আবশ্যকীয়। যেহেতু قروء শব্দ طُهْر অর্থে ব্যবহার হওয়া সম্ভব নয়। (কেননা যে طُهْر-এর মধ্যে স্ত্রীর ওপর তালাক অর্পিত হয়েছে, ওটাকে যদি "ইদ্দত"-এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তাহলে তিন طُهْر পরিপূর্ণ হয়না। আর যদি অন্তর্ভুক্ত না করা হয়, তাহলে ইদ্দত-এর মধ্যে তিন طُهْر -এর আধিক্যতা অবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ কুরআনে قُرُوْء শব্দটি خَاصْ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যার মধ্যে কমবশি করা বৈধ নয়।) সুতরাং طُهْر শব্দ حَيْض অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

শাফেয়ী (র.)-এর যুক্তির খণ্ডন ঃ শাফেয়ী (র.)-এর উল্লিখিত দলিল সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কেননা যখন কোনো বস্তুর مُذَكَّر এবং مُؤَنَّث উভয়টি পৃথক اِسْم হয়। যেমন- بر - حنة এবং تَانِيْث حَقِيْقِى না হয়। তাহলে مُذَكَّر শব্দের দিকে সংযোগ করার সময় তার عَدَدْ -কে مُؤَنَّث এবং مُؤَنَّث -এর দিকে সংযোগ করার সময় عَدَدْ -কে مُذَكَّر রূপে ব্যবহার করা হয়। আর উল্লিখিত আয়াতে ثَلٰثَةٌ শব্দ قُرُوْء -এর দিকে সংযোজিত, যে قُرُوْء শব্দটি مُذَكَّر -

এ ছাড়া মহানবী (সা.)-এর হাদীস اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا এবং فَاطِمَةُ بِنْتُ حُبَيْشٍ -কে উপলক্ষ করে মহানবী (সা.)-এর বাণী- اِذَ اَتَاكِ قُرُوْءُكِ فَدَعِى الصَّلٰوةَ প্রভৃতির মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে قُرُوْء -এর দ্বারা حَيْض তথা ঋতুস্রাব বুঝানো হয়েছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতেও قُرُوْء শব্দ حَيْض অর্থেই ব্যবহৃত হবে।

وَاِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَعِدَّتُهَا اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَاِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِى الْمَرَضِ فَعِدَّتُهَا اَبْعَدَ الْاَجَلَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ اُعْتِقَتِ الْاَمَةُ فِىْ عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِىٍّ اِنْتَقَلَتْ عِدَّتُهَا اِلٰى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ وَاِنِ اعْتِقَتْ وَهِىَ مَبْتُوْتَةٌ اَوْ مُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا لَمْ تَنْتَقِلْ عِدَّتُهَا اِلٰى عِدَّةِ الْحَرَائِرِ وَاِنْ كَانَتْ اٰيِسَةً فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُوْرِ ثُمَّ رَاَتِ الدَّمَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি অন্তঃসত্ত্বা হয়, তবে তার ইদ্দত সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। যদি মহিলা মৃত্যুশয্যায় তালাকপ্রাপ্ত হয়, তাহলে তার ইদ্দত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট উভয় ইদ্দতের মধ্য হতে যেটা অতি দীর্ঘ সেটাই গৃহীত হবে। যদি দাসীকে তার তালাকে رَجْعِىْ -এর ইদ্দত চলাকালীন সময়ে আজাদ করে দেওয়া হয়, তাহলে তার ইদ্দত স্বাধীন মহিলাদের ইদ্দতের দিকে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। আর যদি এমতাবস্থায় মুক্ত হয় যে, উক্ত মহিলা তালাকে بَائِنَةْ প্রাপ্ত, অথবা তার স্বামী মৃত্যুবরণ করেছে, তাহলে তার ইদ্দত স্বাধীন মহিলাদের ইদ্দতের সাথে পরিবর্তন হবে না। যদি বার্ধক্যের দরুন মহিলার ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং সে মাসিক ইদ্দত পালন করা অবস্থায় পুনরায় রক্ত দেখে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ঃ কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ এটা مُطْلَقْ যা তার প্রত্যেক প্রকারের অন্তর্গত। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন যে, سُوْرَةُ نِسَاءِ قُصْوٰى অর্থাৎ 'সূরায়ে তালাক' যার মধ্যে উল্লিখিত আয়াত বিদ্যমান। এটা সূরায়ে বাকারার আয়াত يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا -এর পরে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) বলেন, যদি মহিলার সন্তান প্রসব এমন অবস্থায় হয় যে, তার স্বামী এখনো খাটের ওপর অর্থাৎ এখনো তাঁকে দাফন করা হয়নি তথাপিও তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে ইচ্ছা করলে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

قَوْلُهُ اَبْعَدَ الْاَجَلَيْنِ ঃ مُطَلَّقَة فِى الْمَرَضِ-এর ইদ্দতের ব্যাপারে মতানৈক্য ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতানুসারে উক্ত মহিলার ইদ্দত চার মাস দশদিন হবে যদি এটা عِدَّتْ بِالْحَيْضِ হতে দীর্ঘস্থায়ী হয়। আর যদি মাসিক হিসাবের তুলনায় عِدَّتْ بِالْحَيْضِ দীর্ঘায়িত হয় তবে তার ইদ্দত তিন ঋতুস্রাবের সময়সীমা নির্ধারিত হবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) নিকট তিন হায়েযই নির্ধারিত হবে। উপরোল্লিখিত হুকুম সমূহ ঐ সময় বাস্তবায়িত হবে যখন তালাকে بَائِنْ হবে। পক্ষান্তরে যদি তালাকে رَجْعِىْ হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে উক্ত মহিলার ওপর মৃত্যুর ইদ্দত পালিত হবে।

এরূপ মহিলার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতামত হলো যে, তার ইদ্দত তিন হায়েয হবে। কেননা عِدَّتْ وَفَاتْ তো ঐ সময় ওয়াজিব হবে যখন বিবাহের পতন মৃত্যুর কারণে হবে। আর এখানে মৃত্যুর পূর্বে তালাকের দ্বারা বিবাহ ভঙ্গ হয়ে গেছে।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন।

طَرْفَيْن -এর দলিল হলো, যখন বিবাহ حَقْ اِرْثْ -এর মধ্যে অবশিষ্ট আছে, তখন তাকে সতর্কতামূলক حَقْ عِدَّتْ -এর মধ্যেও অবশিষ্ট রাখা সমীচীন।

قَوْلُهُ وَاِنْ اُعْتِقَتْ امة الخ ঃ উপরোক্তবস্থায় বাঁদির ইদ্দত তিন হায়েয হয়ে যাবে। আর যদি বাঁদি তালাকে بَائِنْ বা স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত-এর মধ্যে থাকাকালীন আজাদ হয়ে যায়, তবে তার বাঁদি থাকাবস্থায় পালনকৃত ইদ্দত পূর্ণ বহাল থাকবে। কেননা তালাকে رَجْعِىْ দ্বারা বিবাহ অবশিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে 'তালাকে বায়েন' অথবা স্বামীর মৃত্যুর দরুন বিবাহ অবশিষ্ট থাকে না।

اِنْتَقَضَ مَا مَضٰى مِنْ عِدَّتِهَا وَكَانَ عَلَيْهَا اَنْ تَسْتَانِفَ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ وَبِالْمَنْكُوْحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا اَوِ الْمَوْطُوْءَةِ بِشُبْهَةٍ عِدَّتُهُمَا الْحَيْضُ فِى الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ وَاِذَا مَاتَ مَوْلٰى اُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا اَوْ اَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلٰثُ حِيَضٍ وَاِذَا مَاتَ الصَّغِيْرُ عَنْ اِمْرَاَتِهٖ وَبِهَا حَبْلٌ فَعِدَّتُهَا اَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَاِنْ حَدَثَ الْحَبْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ فَعِدَّتُهَا اَرْبَعَةُ اَشْهُرٍ وَّعَشَرَةُ اَيَّامٍ وَاِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهٗ فِىْ حَالَةِ الْحَيْضِ لَمْ تَعْتَدَّ بِالْحَيْضَةِ الَّتِىْ وَقَعَ فِيْهَا الطَّلَاقُ وَاِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ اُخْرٰى وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ তবে তার যেটুকু ইদ্দত অতিবাহিত হয়েছে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং তার ওপর ঋতুস্রাব অনুযায়ী পুনরায় ইদ্দত পালন করা আবশ্যক হবে। যে মহিলার বিবাহ ফাসেদ হয়ে গেছে এবং যার সাথে সন্দেহ বশত সহবাস হয়েছে, উভয়ের ইদ্দত فُرْقَتْ এবং مَوْت -এর অবস্থাতে ঋতুস্রাব দ্বারা গণনা করা হবে। যদি اُمِّ وَلَد (তথা যে দাসীর সাথে যৌন সহবাস করার দরুন সন্তান হয়েছে)-এর মনিব মরে যায় অথবা তাকে মুক্ত করে দেয়, তাহলে তার ইদ্দত তিন হায়েয।

আর যদি নাবালক ছেলে তার স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে অথচ তার স্ত্রী গর্ভবতী তবে তার ইদ্দত গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু যদি গর্ভ মৃত্যুর পরে প্রকাশ পায় তবে তার ইদ্দত চার মাস দশদিন। যখন স্বামী স্বীয় স্ত্রীকে ঋতুস্রাব অবস্থায় তালাক দিয়ে দেয়। তখন তালাক সে (স্ত্রী) যে হায়েযে সংঘটিত হয়েছে তা ইদ্দতের মধ্যে গণনা করবে না। আর যদি ইদ্দত পালন রত অবস্থায় মহিলার সাথে সন্দেহমূলকভাবে সঙ্গম করে ফেলে তবে তার ওপর নতুনরূপে ইদ্দত পালন করা আবশ্যক। আর উভয় ইদ্দত একটি অপরটির মধ্যে প্রবেশ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اِنْتَقَضَ مَا مَضٰى مِنْ عِدَّتِهَا ঃ কেননা عِدَّتْ بِالْحَيْضِ হলো আসল, আর عِدَّتْ بِالْاَشْهُرْ হলো সহকারী। আর সহকারীর জন্য শর্ত হলো, যতক্ষণ মূল বা আসল থেকে নিরাশ থাকবে, ততক্ষণ তা কার্যকর হবে। কিন্তু এখানে حَيْض আসার কারণে নৈরাশ্যতা দূরীভূত হয়ে গেছে। সুতরাং عِدَّتْ بِالْاَشْهُرْ -এর সহকারী হওয়াটা অকৃতকার্য হয়ে গেছে, যার দরুন পুনরায় عِدَّتْ بِالْحَيْض পালন করা কর্তব্য।

ইমাম আবূ ইউসুফ, মালেক এবং শাফেয়ী (র.)-এর মতানুযায়ী ঐ মহিলার 'ইদ্দত' চার মাস দশদিন।

শাফেয়ী প্রমুখদের দলিল ঃ কেননা ঐ মহিলার গর্ভ ثَابِتُ النَّسَبْ নয়। কেননা বাচ্চা থেকে সম্পর্ক স্থাপিত হতেই পারে না। সুতরাং ঘটনা এ ধরনের হয়ে গেল, যেমন নাকি মহিলা শিশু স্বামীর মৃত্যুর পরে গর্ভবতী হলো অর্থাৎ স্বামী মৃত্যুর ছয় মাস বা তদূর্ধ্ব পরে সন্তান প্রসব করল। আর এ অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে عِدَّتْ وَفَاتْ ধর্তব্য।

طَرَفَيْن-এর দলিল ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَاُوْلَاتُ الْاَحْمَالِ الخ এটা مُطْلَقْ (তথা যার মধ্যে কোনো শর্ত নেই) চাই গর্ভ স্বামীর থেকে হোক কিংবা দ্বিতীয় অন্য কারো থেকে হোক, ইদ্দত তালাক হিসেবে নাকি মৃত্যুর হিসেবে পালন করবে? তার কোনো বিস্তারিত বর্ণনা নেই।

فَيَكُوْنُ مَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ مُحْتَسِبًا مِنْهُمَا جَمِيْعًا وَاِذَا انْقَضَتِ الْاُوْلٰى وَلَمْ تَكْمُلِ الثَّانِيَةُ فَعَلَيْهَا اِتْمَامُ الْعِدَّةِ الثَّانِيَةِ وَابْتِدَاءُ الْعِدَّةِ فِى الطَّلَاقِ عَقِيْبَ الطَّلَاقِ وَفِى الْوَفَاةِ عَقِيْبَ الْوَفَاةِ فَاِنْ لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ اَوِ الْوَفَاةِ حَتّٰى مَضَتْ مُدَّةُ الْعِدَّةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَالْعِدَّةُ فِى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ عَقِيْبَ التَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمَا اَوْ عَزْمُ الْوَاطِئِ عَلٰى تَرْكِ وَطْيِهَا وَعَلَى الْمَبْتُوْتَةِ وَالْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا اِذَا كَانَتْ بَالِغَةً مُسْلِمَةً الْاِحْدَادِ وَالْاِحْدَادُ اَنْ تَتْرُكَ الطِّيْبَ وَالزِّيْنَةَ وَالدُّهْنَ وَالْكُحْلَ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَلَا تَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ وَلَا بِزَعْفَرَانٍ وَلَا اِحْدَادَ عَلٰى كَافِرَةٍ وَلَا صَغِيْرَةٍ -

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং যে ঋতুস্রাব দেখবে, তা উভয় ইদ্দতের মধ্যে পরিগণিত হবে। আর যখন প্রথম ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যায় এবং দ্বিতীয় ইদ্দত পুরা না হয়, তবে তার ওপর দ্বিতীয় ইদ্দত সম্পূর্ণ করা আবশ্যক। আর ইদ্দতের গণনা তালাকের অবস্থায় তালাকের পর থেকে শুরু হয় এবং মৃত্যুর অবস্থায় মৃত্যুর পর থেকে শুরু হয়। অতঃপর স্ত্রী যদি তালাক বা স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে অবগত না হয় এমনকি ইদ্দতের সময়কাল গত হয়ে যায়, তাহলে তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেছে এবং نِكَاحٌ فَاسِدٌ -এর মধ্যে ইদ্দতের গণনা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর বা সঙ্গমকারী যৌন সহবাস ছেড়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করার পর থেকে শুরু হয়।

তালাকে بَائِنْ বা স্বামী মৃত্যুর ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার ওপর শোক পালন করা কর্তব্য যখন সে জ্ঞানী ও মুসলমান হয়। আর শোক পালন হলো, সুগন্ধি, অলঙ্কার, তৈল এবং সুরমা ব্যবহার ছেড়ে দেওয়া। হ্যাঁ, প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহার করতে পারবে এবং মেহেদী লাগাবে না আর ঐসব কাপড়ের পরিধান পরিহার করতে হবে যা কুসুম (ফুল বিশেষ), সবুজ এবং জাফরান রঙে রঙিত। কাফির এবং ছোট মেয়ে শিশুর ওপর শোক পালন করা ওয়াজিব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ تَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ ঃ যখন ইদ্দত পালনকারিণীর সাথে সন্দেহবশত সহবাস হয়ে যায়, যেমন– মহিলা বিছানায় শায়িত রয়েছে তখন কেউ বলল যে, এটা তোমার স্ত্রী অতঃপর তার সাথে সঙ্গম করে ফেলল। অথবা মহিলা অন্যকারো ইদ্দতের মধ্যে ছিল, কিন্তু স্বামীর অবগতি না থাকায় সে ঐ মহিলাকে বিবাহ করে ফেলল। তাহলে ঐ মহিলার ওপর দ্বিতীয় ইদ্দত ওয়াজিব হয়ে যাবে এবং একটা ইদ্দত অন্যটার সাথে مُتَدَاخِلْ হয়ে যাবে। এবং যে ঋতুস্রাব দ্বিতীয় ইদ্দত ওয়াজিব হওয়ার পর বিকশিত হয়েছে তা উভয় ইদ্দতের মধ্যে গণনা করা হবে এবং যদি প্রথম ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে দ্বিতীয় ইদ্দত পুরা করা কর্তব্য। যেমন– মহিলার তালাকে بَائِنْ হয়ে গেছে এবং তার মাত্র একবার হায়েয হয়েছে আর সে অন্য স্বামীর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গেছে এবং সঙ্গমের পর পৃথক হয়ে গেছে, অতঃপর দু'বার ঋতুস্রাব হয়েছে, তাহলে এই

তিনো হায়েয উভয় ইদ্দতের মধ্যে পরিগণিত হবে। প্রথম ঋতুস্রাব এবং পরের দুই ঋতুস্রাব মিলে প্রথম স্বামীর ইদ্দত পূরণ হয়েছে। আর দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দতের শুধু দুই হায়েজ হয়েছে। অতঃপর যখন একবার ঋতুস্রাব দেখা দেবে, তখন দ্বিতীয় স্বামীর ইদ্দতও পূর্ণ হয়ে যাবে।

উপসংহার ঃ মোটকথা প্রথম ঋতুস্রাব প্রথম ইদ্দতের সাথে শেষ ঋতুস্রাব ইদ্দতের সাথে সংযুক্ত। আর মাঝের দুই ঋতুস্রাব উভয় ইদ্দতের সাথে সম্পৃক্ত এবং সংমিশ্রিত।

قَوْلُهُ وَعَلَى الْمَبْتُوتَةِ ঃ ইদ্দত পালন কারিণীর জন্য শোক পালন করা জরুরি? স্বামী মৃত্যুর কারণে অথবা তালাকে بَائِنْ -এর ইদ্দত পালন কারিণী মহিলার ওপর সৌন্দর্যের বস্তুসমূহ সুগন্ধি, তৈল, সুরমা, মেহেদী, কুমকুম এবং জাফরান রঙে রঙিত পোশাক ইত্যাদি ব্যবহার পরিত্যাগ করে শোক পালন করা কর্তব্য। যেরূপ হাদীসে এসেছে। হ্যাঁ, যদি নিরুপায় হয় তবে অনুমতি আছে।

مَبْتُوتَة-এর শর্তের দরুন رَجْعِيَّة مُطَلَّقَة-এর عَاقِلَة -এর শর্তের দরুন مَجْنُونَة তথা পাগলী, بَالِغَة -এর শর্তের দরুন صَغِيرَة তথা ছোট শিশু, এবং مُسْلِمَة এবং শর্তের দরুন كَافِرَة তথা অমুসলিমা উপরোক্ত হুকুম থেকে বের হয়ে যায়।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর ভিন্ন মত ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট مُعْتَدَّة بَائِنَة তথা তালাকে بَائِنْ -এর ইদ্দত পালনকারিণীর ওপর শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। কেননা এটাতো স্বামী মৃত্যুর ওপর হতাশার বহিঃপ্রকাশ, অথচ স্বামী তাকে তালাকে بَائِنْ দিয়ে কষ্ট ও দুঃখের মধ্যে ঢেলে দিয়েছে।

হানাফীদের দলিল ঃ কেননা শোক পালন করাটা বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামত হারানোর কারণে হয়। আর এই হারানোটা مَبْتُوتَة -এর ব্যাপারেও বিদ্যমান। সুতরাং তাকেও শোক পালন করতে হবে।

وَعَلَى الْاَمَةِ الْاِحْدَادُ وَلَيْسَ فِي عِدَّةِ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ وَلَا فِي عِدَّةِ اُمِّ الْوَلَدِ اِحْدَادٌ وَلَا يَنْبَغِي اَنْ تَخْطُبَ الْمُعْتَدَّةَ وَلَا بَأْسَ بِالتَّعْرِيْضِ فِي الْخِطْبَةِ وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ وَالْمَبْتُوْتَةِ الْخُرُوْجُ مِنْ بَيْتِهَا لَيْلًا وَ نَهَارًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ نَهَارًا وَبَعْضَ اللَّيْلِ وَلَا تَبِيْتُ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا وَعَلَى الْمُعْتَدَّةِ اَنْ تَعْتَدَّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي يُضَافُ اِلَيْهَا بِالسُّكْنٰى حَالَ وُقُوْعِ الْفُرْقَةِ وَالْمَوْتِ فَاِنْ كَانَ نَصِيْبُهَا مِنْ دَارِ الْمَيِّتِ لَا يَكْفِيْهَا وَاَخْرَجَ الْوَرَثَةُ مِنْ نَصِيْبِهِمْ اِنْتَقَلَتْ -

সরল অনুবাদ ঃ বাঁদির ওপর শোক পালন করা অপরিহার্য। আর نِكَاحْ فَاسِدْ এবং اُمِّ وَلَدْ -এর ইদ্দতের মধ্যে শোক পালন করার প্রয়োজন নেই। ইদ্দত পালনকারিণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া অনুচিত। হ্যাঁ ইঙ্গিতের মাধ্যমে প্রস্তাব দেওয়াতে কোনো ক্ষতি নেই। আর তালাকে رَجْعِيْ এবং بَائِنْ -এর ইদ্দত পালনকারিণী মহিলার জন্য দিবা-রাত্রি উভয় অবস্থাতে তার নিজের ঘর হতে বাহির হওয়া জায়েজ নেই। আর যে মহিলার স্বামী মারা গেছে সে দিনে এবং রাতের কিছু অংশ পর্যন্ত বাহির হতে পারবে, কিন্তু স্বীয় ঘর ব্যতীত অন্য ঘরে রাত্রি যাপন করতে পারবে না। مُعْتَدَّةْ -এর জন্য ঐ ঘরে ইদ্দত পালন করা জরুরি যে ঘরে স্বামী পৃথক অথবা মৃত্যুবরণ করার সময় জীবন যাপন করার বিবেচনায় তার দিকে সম্বন্ধ করা হতো। যদি মৃত্যু ব্যক্তির ঘর থেকে মহিলার প্রাপ্ত অংশ তার জন্য যথেষ্ট হয় তবে প্রয়োজন ব্যতিরেকে ঘর থেকে বের হওয়া ঐ মহিলার জন্য জায়েজ নেই। আর যদি (মৃত) স্বামীর ঘরের প্রাপ্ত অংশ মহিলার জন্য যথেষ্ট না হয় এবং মৃতের অভিভাবকগণ তাকে তাদের (নিজ) অংশ থেকে বের করে দেয়, তাহলে মহিলা অন্যত্র প্রত্যাবর্তন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى كَافِرَةٍ ঃ অমুসলিম মহিলা এবং কিশোরীর ওপর শোক পালন করা ওয়াজিব নয়। কেননা এরা শরিয়তের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। একজন স্বল্প বয়সের কারণে, অন্যজন বেদীন হওয়ার কারণে।

بَحْرُ الرَّائِقْ নামক গ্রন্থে রয়েছে যে, সাত মহিলার ওপর শোক পালন করা ওয়াজবি নয়। (১) অমুসলিম, (২) শিশু, (৩) পাগলী, (৪) نِكَاحْ فَاسِدْ -এর ইদ্দত পালনকারিণী (৫) তালাকে رَجْعِيْ -এর ইদ্দত পালনকারিণী, (৬) مَوْطُوْنَةْ بِالشُّبْهَةِ তথা সন্দেহমূলক সঙ্গমকৃত ইদ্দত পালনকারিণী (৭) আজাদ (মুক্ত) হওয়ার দরুন ইদ্দত পালনকারিণী।

قَوْلُهُ وَلَايَنْبَغِيْ ঃ ইদ্দত পালনকারিণী মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ - হ্যাঁ, ইঙ্গিত প্রদানের অনুমতি আছে। তবে শর্ত হলো মহিলা مُعْتَدَّةُ الْوَفَاةِ হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ -

ইঙ্গিত প্রদানের অর্থ হলো- কথাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা। যেমন- এরূপ বলা যে, আমি বিবাহের ইচ্ছা পোষণ করেছি, অথবা আমার আকাঙ্ক্ষা যে আল্লাহ তা'আলা আমাকে যেন মহিলা দান করেন। বুখারী শরীফের মধ্যে ইবনে আব্বাস হতে উক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে।

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ لِلْمُطَلَّقَةِ ঃ তালাকের رَجْعِيْ অথবা بَائِنْ প্রাপ্ত মহিলাদের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া জায়েজ নেই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّا اَنْ يَاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ الخ ইবরাহীম নখয়ী (র.)-এর নিকট فَاحِشَةْ -এর দ্বারা উদ্দেশ্য نَفْسِ خُرُوْجْ আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, فَاحِشَةْ দ্বারা উদ্দেশ্য زِنَا তথা যৌন পাপাচার। সুতরাং حَدْ তথা শাস্তি প্রয়োগের জন্য বের করা যাবে।

হাঁ স্বামী মৃত্যুর কারণে ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা পূর্ণ দিন এবং রাতের কিছু অংশ পর্যন্ত বের হতে পারবে। কেননা তার খোরপোশের দায়ভার তো কারো ওপর নেই। সুতরাং সে জীবিকা অর্জনের জন্য বের হতে বাধ্য। এর বিপরীত তালাকপ্রাপ্ত মহিলা। কেননা তার জীবিকার দায়ভার পালন করা স্বামীর ওপর কর্তব্য।

وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يُّسَافِرَ الزَّوْجُ بِالْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ فَاِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ اِمْرَاَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِىْ عِدَّتِهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ اَنْ يَّدْخُلَ بِهَا فَعَلَيْهِ مَهْرٌ كَامِلٌ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَعَلَيْهَا اِتْمَامُ الْعِدَّةِ الْاُوْلٰى وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُطَلَّقَةِ الرَّجْعِيَّةِ اِذَا جَاءَتْ بِهِ لِسَنَتَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ مَالَمْ تَقِرَّ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ لِاَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ لِاَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَكَانَتْ رَجْعِيَّةً وَالْمَبْتُوْتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا اِذَا جَاءَتْ بِهِ لِاَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ وَاِذَا جَاءَتْ بِهِ اِتْمَامَ سَنَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْفُرْقَةِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ اِلَّا اَنْ يَّدَّعِيَهُ الزَّوْجُ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا بَيْنَ الْوَفَاةِ وَبَيْنَ سَنَتَيْنِ وَاِذَا اعْتَرَفَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِاَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ -

---

সরল অনুবাদ ঃ তালাকে رَجْعِىْ প্রাপ্ত স্ত্রীর সাথে সফর করা স্বামীর জন্য জায়েজ নেই। যখন স্বামী-স্ত্রীকে তালাকে بَائِنْ দিয়ে পুনরায় ইদ্দতের মধ্যে তাকে বিবাহ করে এবং সঙ্গমের পূর্বে তাকে তালাক দিয়ে দেয় তাহলে স্বামীর ওপর পূর্ণ মোহর দেওয়া অপরিহার্য এবং মহিলার ওপর নতুনরূপে ইদ্দত পালন করা কর্তব্য। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, স্ত্রীর জন্য স্বামীর ওপর অর্ধেক মোহর এবং মহিলার জন্য প্রথম ইদ্দত পালন করা জরুরি। তালাকে রেজয়ী প্রাপ্ত স্ত্রীর বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হবে যখন সে দু'বৎসর বা তার অধিক সময়ে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী স্বীয় ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার স্বীকার না করে। আর যদি দু'বৎসরের কমে বাচ্চা হয় তবে প্রসব দ্বারা ইদ্দত শেষ হওয়ার কারণে স্ত্রী তার স্বামী থেকে তালাকে বায়েন প্রাপ্ত হয়ে যাবে এবং তার সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে। আর যদি দু'বৎসরের বেশি সময়ে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয় তবে বংশ সাব্যস্ত হবে আর এটা রাজআত বলে গণ্য হবে। এবং তালাকে বায়েন প্রাপ্ত স্ত্রীর বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হবে যখন সে দু'বৎসরের কমে বাচ্চা জন্ম দেয়। আর যখন বিচ্ছেদের দিন থেকে পূর্ণ দু বৎসরে বাচ্চা জন্ম দেয় তখন তার বংশ সাব্যস্ত হবে না, হাঁ যদি ঐ মহিলার স্বামী দাবি করে (তখন বংশ সাব্যস্ত হবে)। এবং স্বামী মত্যুবরণকারী স্ত্রীর বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হবে (স্বামীর) মৃত্যু ও দু'বৎসরের মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত। যখন ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা স্বীয় ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার স্বীকার করে নেয় এরপর সে ছয় মাসের কমে বাচ্চা জন্ম দেয় তবে তার বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি ছয় মাসের পর জন্ম দেয় তবে নসব সাব্যস্ত হবে না।

وَاِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ وَلَدًا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا اَنْ يَّشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا رَجُلَانِ اَوْ رَجُلٌ وَامْرَاَتَانِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ هُنَاكَ حَبَلٌ ظَاهِرٌ اَوْ اِعْتِرَافٌ مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ غَيْرِ شَهَادَةٍ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَثْبُتُ فِي الْجَمِيْعِ بِشَهَادَةِ اِمْرَاَةٍ وَاحِدَةٍ وَاِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ اِمْرَاَةً فَجَائَتْ بِوَلَدٍ لِاَقَلِّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مُنْذُ يَوْمِ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ وَاِنْ جَاءَتْ بِهِ لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ فَصَاعِدًا يَثْبُتُ نَسَبُهُ اِنِ اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ اَوْ سَكَتَ وَاِنْ جَحَدَ الْوِلَادَةَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ اِمْرَاَةٍ وَاحِدَةٍ تَشْهَدُ بِالْوِلَادَةِ وَاَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ سَنَتَانِ وَاَقَلُّهُ سِتَّةُ اَشْهُرٍ وَاِذَا طَلَّقَ الذِّمِّيُّ الذِّمِّيَّةَ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَاِنْ تَزَوَّجَتِ الْحَامِلُ مِنَ الزِّنَا جَازَ النِّكَاحُ وَلَا يَطَاُهَا حَتّٰى تَضَعَ حَمْلَهَا -

---

সরল অনুবাদ ঃ যদি ইদ্দত পালনকারিণী মহিলা বাচ্চা প্রসব করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ঐ বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হবে না ; কিন্তু যদি তার সন্তান প্রসবের স্বপক্ষে দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ দু'জন মহিলা বাচ্চা প্রসব এর সাক্ষ্য দেয় তবে ঐ সময় সাব্যস্ত হবে হাঁ যদি গর্ভ পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পায়, অথবা স্বামীর পক্ষ হতে স্বীকারোক্তি পাওয়া যায়, তাহলে বিনা সাক্ষ্য-প্রমাণে ঐ বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। صَاحِبَيْن তথা আবূ ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সর্বাবস্থায়ই এক মহিলার সাক্ষী দ্বারা نَسَبْ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। যদি কেউ কোনো মহিলাকে বিবাহ করল, পুনরায় ঐ মহিলা বিবাহের পর ছয় মাসের কম সময়ে বাচ্চা প্রসব করল, তাহলে ঐ বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হবে না। আর যদি ছয় মাস বা ততোধিক সময়ের মধ্যে প্রসব করে, তাহলে বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে, যদি স্বামী তার স্বীকার করে অথবা নীরবতা অবলম্বন করে। কিন্তু যদি স্বামী অস্বীকার করে তাহলে এক মহিলার সাক্ষ্য দ্বারা যিনি প্রসব সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করবেন বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। প্রসবের সর্বোচ্চ সময়সীমা ২ বৎসর আর সর্বনিম্ন ছয়মাস। যদি কোনো জিম্মী (পুরুষ) জিম্মিয়াহ (মহিলা)-কে তালাক দেয় তাহলে তার ওপর ইদ্দত প্রয়োজন হবে না। যদি জেনার দ্বারা সঙ্গমে অন্তঃসত্ত্বা এরূপ মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে বিবাহ জায়েজ হবে, কিন্তু সন্তান প্রসবের পূর্বে ঐ মহিলার সাথে অভিসারে লিপ্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِذَا وَلَدَتِ الْمُعْتَدَّةُ ঃ যখন مُعْتَدَّةٌ দাবি করে যে, আমার সন্তান জন্ম হয়েছে। কিন্তু (তালাকের ইদ্দতের মধ্যে) স্বামী অথবা (মৃত্যুর ইদ্দতের মধ্যে) স্বামীর অভিভাবকগণ সন্তান প্রসবের অস্বীকার করে, তাহলে ঐ অবস্থায় বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলার সাক্ষী প্রয়োজন। অথবা মহিলার গর্ভ প্রকাশ হওয়া চাই অর্থাৎ গর্ভের আলামত এতটুকু প্রকাশিত হওয়া যদ্দারা গর্ভ থাকার প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয়। আর স্বামী স্বীকার বা অভিভাবকদের পক্ষ হতে সন্তান প্রসবের বিশ্বাস থাকা চাই। উল্লিখিত শর্তসমূহ না পাওয়া অবস্থায় ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর অভিমত ঃ যদি উল্লিখিত শর্তসমূহ পাওয়া না যায়, তবে ঐ বাচ্চার نَسَبْ তথা বংশ সাব্যস্ত হবে না।

صَاحِبَيْن তথা ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) -এর অভিমত ঃ صَاحِبَيْن -এর নিকট সর্বাবস্থায় শুধু একজন মহিলা অর্থাৎ ধাত্রীর সাক্ষী যথেষ্ট। কেননা ইদ্দত স্থায়ী হওয়ার কারণে শয্যাও বহাল থাকে। আর শয্যা বহাল থাকা বংশ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং বংশতো আপনাতেই সাব্যস্ত হয়ে গেল এখন প্রয়োজন শুধু এটা যে, বাচ্চা ঐ মহিলা থেকে হওয়াটা যেন নির্দিষ্ট হয়ে যায় আর এটা ধাত্রীর সাক্ষ্য দ্বারা হয়ে যায়– যেমন বিবাহ বহাল থাকা অবস্থায় সাক্ষ্য দ্বারা বংশ সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, ইদ্দত বহাল থাকার কারণে শয্যা বহাল থাকে এটা ঠিক; কিন্তু এখানেতো ইদ্দতই বহাল নেই। কেননা মহিলা যখন গর্ভ খালাসের স্বীকৃতি দিতেছে, তখন তো ইদ্দত শেষ হয়ে গেছে, এ জন্য এখানে اِبْتِدَاءً نَسَبْ সাব্যস্ত করা জরুরি। সুতরাং সাক্ষীর কোটা পূর্ণ হওয়া আবশ্যকীয়।

قَوْلُهُ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ الخ ঃ কেননা মহিলার গর্ভে সন্তানের ভিত্তি নিঃসন্দেহে বিবাহের পূর্বে ছিল। হ্যাঁ যদি ছয় মাস বা ততোধিক কাল পরে জন্ম হয়, তাহলে বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে, যদি স্বামী স্বীকৃতি দেয় বা চুপ থাকে। আর যদি অস্বীকার করে তাহলে পুনরায় এক মহিলার সাক্ষী দ্বারা বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ وَأَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ ঃ গর্ভের নিম্নকাল ৬ মাস হওয়ার মধ্যে সবাই ঐকমত্য পোষণ করেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلٰثُوْنَ شَهْرًا– وَفِصَالُهُ فِيْ عَامَيْنِ -এর মধ্যে فِصَالْ -এর দুই বৎসর বিয়োগ দিলে পরে গর্ভের নিম্নকাল ছয় মাস অবশিষ্ট থাকে। এছাড়া ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, গর্ভের সন্তানের মধ্যে চার মাস পরে রুহ পৌছানো হয় অতঃপর দুই মাসের মধ্যে সৃষ্টির পূর্ণতা লাভ করে।

حَمْلْ -এর সর্বোচ্চ সময়সীমার ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত ঃ তাঁর মতে গর্ভের সর্বোচ্চকাল দু'বৎসর। কেননা হযরত আয়শা (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, "বাচ্চা গর্ভের মধ্যে দু'বৎসরের বেশি অবস্থান করে না।" আর এটা স্পষ্ট যে, এ ধরনের কথা নিছক অনুমানের দ্বারা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতীয়মান হয় যে, এ হাদীস مَرْفُوْع -এর প্রকোষ্ঠের মধ্যে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত ঃ তাঁর মতে গর্ভের সর্বোচ্চ সময়সীমা চার বৎসর। ইমাম মালেক এবং আহমদ (র.)-এর প্রসিদ্ধ মতও এটা। ইমাম মালেক (র.) হতে অন্য এক রেওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, حَمْلْ-এর সর্বোচ্চকাল পাঁচ বৎসর। لَيْثُ بِنُ سَعْد (র.) হতে সর্বোচ্চ কাল তিন বৎসর বর্ণিত আছে। অনুরূপভাবে ছয় সাত বৎসরের রেওয়ায়তও বর্ণিত আছে। কতেক ইমামের নিকট সর্বোচ্চের কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। তাদের যুক্তি ঐ সকল উপাখ্যান (কাহিনী) সমূহ যা এই অধ্যায়ে রচিত আছে। যেমন– مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ ، كَرَمُ بْنُ حَبَّانَ প্রভৃতিগণ মায়ের গর্ভে চার বৎসর অবস্থান করেছিলেন এবং ضَحَّاكْ চার বৎসর পর হাস্যাবস্থায় জন্ম নিয়েছিল এ জন্য তার নাম ضَحَّاكْ (হাস্যকারী) হয়ে গেছে। কিন্তু উল্লিখিত হাদীস সবগুলোর ওপর প্রমাণ স্বরূপ। যদি কেউ বলে যে, বাইহাকী (بَيْهَقِيْ) (র.) وَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمْ হতে বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত আয়েশার (রা.) হাদীস ইমাম মালেক (র.)-এর সম্মুখে পেশ করলাম। তিনি বললেন, سُبْحَانَ اللّٰهِ এটা কিভাবে হতে পারে? দেখ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ -এর স্ত্রীর বার বৎসরে চার বৎসর পর পর তিনটি বাচ্চা জন্ম হয়েছে। তাহলে বুঝা যায়, গর্ভ চার বৎসর পর্যন্ত থাকতে পারে।

قَوْلُهُ جَازَ النِّكَاحُ الخ ঃ طَرْفَيْن-এর নিকট নিষিদ্ধ সঙ্গমের দরুন গর্ভবতী মহিলাকে বিবাহ করার অনুমতি আছে। কিন্তু গর্ভ খালাসের পূর্বে সঙ্গম জায়েজ নেই। কেননা নবী করীম (সা.)-এর হাদীস لَاتُوْطَأُ الْحَمْلُ حَتّٰى تَضَعَ – হ্যাঁ যদি সঙ্গমকারী স্বামীই হয় তাহলে সঙ্গম করতে পারবে।

ইমাম আবু ইউসুফ এবং যুফার (র.)-এর নিকট নিষিদ্ধ সঙ্গমের দরুন গর্ভবতী মহিলার বিবাহ ফাসেদ।

সহবাসে কনডম ও কপার্টি ব্যবহার ঃ পাশ্চাত্যদের উদ্ভাবিত সমস্যার মধ্যে জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি ও অন্যতম একটি সমস্যা। ইংরেজ অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস ১৭৯৮ সালে সর্বপ্রথম এই মারাত্মক তথ্য উপস্থাপন করে যে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে; আর জীবন যাত্রার উপাদান বাড়ছে গাণিতিকহারে। কাজেই জনসংখ্যার প্রবৃদ্ধি যদি নিয়ন্ত্রণে আনা না যায় তবে জনসংখ্যা এতটা বেড়ে যাবে যে, উৎপাদনের সঙ্গে তা সামঞ্জস্যশীল থাকবে না। ফলে মানুষকে অনাহারে থাকতে হবে। তা

ছাড়া অধিক সন্তান হলে তারা উপযুক্ত লালন-পালন ও শিক্ষাদীক্ষা থেকেও বঞ্চিত হবে। অতএব জন্মনিয়ন্ত্রণই হচ্ছে তার একমাত্র সমাধান। বিভিন্ন দেশের ন্যায় আমাদের দেশের সরকারও জন্ম শাসনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের অনেক পন্থায় একটি হল কন্ডম বা কপার্টি ব্যবহার। মিহি পলিথিনের এক প্রকার আবরণী যা সহবাসকালে পুরুষ জননেন্দ্রীয়ে ব্যবহার করা হয় তাকে কন্ডম বলে। এ ধরনের আরেক প্রকার আবরণী আছে যা নারী জরায়ুর প্রবেশ-পথে ব্যবহার করে, যাতে শুক্র জরায়ুতে প্রবেশ করতে না পারে তাকে কপার্টি বলে। এ পন্থা নতুন বটে, কিন্তু সীমিত ও কম। সন্তান গ্রহণের প্রেরণা অনেক প্রাচীন। এ জন্য ইসলামের প্রাথমিক যুগেও আমরা এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাই। যেমন প্রাক ইসলাম যুগে এতদুদ্দেশ্যে 'আযলের পন্থা অবলম্বন' করা হতো। আযল হলো সহবাসকালে পুরুষ তার জননেন্দ্রীয় বীর্যস্থলনের পূর্বমুহূর্তে বের করে নিয়ে আসা। বিভিন্ন হাদীসেও এর উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো তা বৈধ না অবৈধ?

এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন হাদীস রয়েছে। কিছু হাদীসের বর্ণনা দৃষ্টে তা নিঃশর্ত জায়েজ বলে মনে হয় এবং অধিকাংশ হানাফী ফকীহগণের ঝোঁক এ দিকেই, শর্ত হলো স্ত্রীর সম্মতিক্রমে হতে হবে। কতেক মনীষী তা মাকরূহ তাহরীমি বলেছেন। অধিকাংশ ফিকাহবিদদের এটাই মত এবং অধিক সংখ্যক হাদীসেও তাই দেখা যায়। কিছু সংখ্যক হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী তো পরিষ্কার হারাম প্রমাণিত হয়, কেননা তাতে আযলকে জীবন্ত প্রোথিতকরণ (وَأْدٌ) আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বিশুদ্ধ ও সুচিন্তিত মত এই যে, বিনা ওজরে আযল করা কারাহাত মুক্ত নয়। বিশেষত যখন শুধুমাত্র অর্থনৈতিক (Economicel) অবস্থার অজুহাতে সন্তান থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে হয়। বিজ্ঞ হানাফী ফকীহগণও তা স্বীকার করেন। যেমন– মোল্লা আলী কারী (মৃত্যুঃ ১০১৪ হিঃ) ذَالِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ হাদীসের এ অংশের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন– ذَالِكَ لَايَدُلُّ عَلٰى حُرْمَةِ الْعَزْلِ بَلْ يَدُلُّ عَلٰى كَرَاهَتِهِ অর্থাৎ তা 'আযল হারাম হওয়া বুঝায় না বরং মাকরূহ বলে নির্দেশ করে।

এতে প্রমাণিত হলো কন্ডম ও কপার্টি ব্যবহার করা মাকরূহ, বিশেষতঃ যখন অর্থনৈতিক অস্থিরতার ভিত্তিতে করা হবে। তবে যদি কোনো ওযরের প্রেক্ষিতে হয় তাহলে এর অনুমতি আছে। যেমন গর্ভ এসে গেলে দুগ্ধপোষ্য শিশুর দুধ থেকে বঞ্চিত হওয়া বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার আশঙ্কা থাকা। তবে কন্ডম ব্যবহারের পূর্বে স্ত্রীর সম্মতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়, কারণ এ প্রক্রিয়ায় সহবাসে ওই পরিতৃপ্তি আসে না যা তা ব্যতিরেকে আসে।

গর্ভনিরোধক ঔষধ (Medicine) ঃ জন্ম নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পদ্ধতি এই যে, স্ত্রীর গর্ভাশয়ে শুক্রাণু পৌঁছাবে বটে কিন্তু এমন ঔষধ ব্যবহার করা হবে যাতে গর্ভস্থিতি (Concception) না ঘটে। বিভিন্ন ফিকহী দৃষ্টান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণ অবস্থায় তাও না জায়েজ। যদিও এ কথা সত্য যে, মানব উপাদানটি এখনও আত্মা ও জীবনশূন্য বিধায় তা বিনষ্ট করা পারিভাষিক হত্যার আওতায় পড়বে না। কিন্তু যদি একে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হতো তাহলে কিছুকাল পর তাই একটি জীবন্ত সত্তার রূপ পরিগ্রহ করতো। এই জন্য ভবিষ্যৎ বিবেচনায় একে নর হত্যার সমার্থ গণ্য করা হবে। যেমন– ইমাম শামসুল আইম্মাহ সরখসী বিস্তারিত বিশ্লেষণপূর্বক লিখেছেন–

ثُمَّ الْمَاءُ فِى الرَّحْمِ مَالَمْ يَفْسُدْ فَهُوَ مُعَدٌّ لِلْحَيَاةِ فَجَعَلَ كَالْحَيِّ فِىْ اِيْجَابِ الضَّمَانِ بِاَتْلَافِهِ كَمَا تُجْعَلُ بَيْضُ الصَّيْدِ فِىْ اِيْجَابِ الْجَزَاءِ عَلَيْهِ بِكَسْرِهِ ـ

অতঃপর গর্ভাশয়ে যে পর্যন্ত শুক্রাণু বিনষ্ট না হয় তাতে জীবনের উপযোগীতা বিদ্যমান থাকে। সে কারণে একে বিনাশনের ক্ষেত্রে একটি জীবন্ত মানুষ গণ্য করা হবে এবং অর্থদণ্ড আবশ্যক হবে, যেমন কেউ ইহরাম অবস্থায় শিকারের ডিম ভেঙ্গে ফেললে তার ওপর সে জরিমানা বর্তায় যা শিকার বধের কারণে বর্তে থাকে"। – (আল-মাবসূত খঃ ২৬, পৃঃ ৮৭)

মুহাম্মদ আহমাদ 'আলয়াশ মালিকীও গর্ভধারণ নিরোধক সমুদয় প্রক্রিয়া এবং ঔষধ নাজায়েজের সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, "গর্ভরোধের জন্য ঔষধ ব্যবহার জায়েজ নেই। শুক্রাণু গর্ভাশয়ে প্রবেশের পর স্বামী-স্ত্রীর যৌথ বা এককভাবে এ জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা জায়েজ নয়। –(ফাতহুল 'আলী আল-মালিক ; ১ম খঃ ; ৩৯৯ পৃষ্ঠা)

এ সকল বর্ণনা ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিনা ওজরে শুধুমাত্র সন্তান থেকে বাঁচার জন্য গর্ভ নিরোধক উপকরণ ব্যবহার জায়েজ নেই।

গর্ভপাত (Abortion)ঃ আত্মা এবং জীবনের লক্ষণ ফুটে উঠার পর শর'ঈ বিচারে গর্ভপাত (Abortion) হারাম হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কেননা যখন গর্ভে জীবন এসে যায় তখন একটি জীবন্ত সত্তা ও এর মাঝে কোনো তফাত নেই। হ্যাঁ, তফাত শুধু এটুকু যে, তা গর্ভাশয়ে ঝিল্লি আবৃত আর দ্বিতীয়জন আলো-বাতাসের পৃথিবীতে এসে গেছে। হত্যা বলা হয় কোনো জীবন্ত অস্তিত্বকে জীবন থেকে বঞ্চিত করা। এ অপরাধ মাতৃউদরে সংঘটন করলে যেমন হত্যা, অস্ত্র এবং লাঠির আশ্রয়ে হলেও হত্যা। শিশুদের জীবন্ত প্রোথিতকারীরা যদি لَاتَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ এর সম্বোধিত হতে পারে তাহলে সে সব

লোক কিরূপে তা থেকে রক্ষা পায় যারা মাতৃজঠরে পালিত শিশুদের জীবনের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত করে? এ কারণে হাফিয ইবনে তাইমিয়া (র.) লিখেন– إِسْقَاطُ الْحَمْلِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِيْنَ وَهُوَ مِنَ الْوَأْدِ الَّذِىْ قَالَ تَعَالٰى وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ অর্থাৎ গর্ভপাত সর্বসম্মতিক্রমে হারাম এবং তা ওই নরহত্যার শামিল যা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন– "কিয়ামত দিবসে জীবন্ত দাফনকৃতদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমাদের কোন অপরাধে হত্যা করা হলো?" –(ফতওয়া ইবনে তাইমিয়া ৪র্থ খঃ ২১৭ পৃঃ)।

বাকি রলো আত্মা সঞ্চারিত হওয়ার পূর্বে গর্ভপাতের কথা। ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তা কঠিন গুনাহ না হলেও নাজায়েজ নিঃসন্দেহে। সাধারণত ফিকহবিশারদগণ লিখেন, একশত বিশ দিনের পূর্বে গর্ভপাত করা কারাহাতে তাহরীমির (كَرَاهَتْ تَحْرِيْمِىْ) সংগে জায়েজ এবং তার পর তা হারাম। – (রদ্দুল মুহতার ; খঃ ৫, পৃঃ ২৭৯) (১) দুররুল আহকামে বলা হয়েছে ঃ اَلْجَنِيْنُ الَّذِىْ إِسْتَبَانَ بَعْضُ خَلْقِهِ بِمَنْزِلَةِ الْجَنِيْنِ التَّامِ অর্থাৎ যে ভ্রূণের (Embryo) কিছু অঙ্গ ফুটে উঠেছে তা পূর্ণাঙ্গ শিশুর তুল্য। – (ইবনে হাযাম ঃ আল-মুহাল্লা ; খঃ ১২, পৃঃ ৩৭৮)

এই মূলনীতির আলোকে ফিকহবিদগণ লিখেছেন যদি শারীরিক গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই গর্ভপাত ঘটানো হয় তাহলে শর'ঈ বিচারে ওই জরিমানা ওয়াজিব হবে যা পূর্ণ গঠনবিশিষ্ট গর্ভ বিনাশনের ক্ষেত্রে ওয়াজিব হয়। "যে ব্যক্তি কোনো গর্ভিনীর পেটে আঘাত করল এবং গর্ভপাত ঘটাল তাহলে চাই তার গঠন পূর্ণ হোক বা অপূর্ণ সর্বসম্মতিক্রমে গুররাহ (একটি দাস বা দাসী) আবশ্যক হবে। কেননা তদ্বারা একটি পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া আশাময় ছিল।– (ফতওয়া কাযীখানঃ হযর ও ইবাহাত অধ্যায়)

এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামি শরিয়তে মানুষ নিজে তার নিজ দেহেরও মালিক নয়। আত্মহত্যা বা নিজ দেহের কোনো অঙ্গচ্ছেদ করার অধিকার তার নেই। কেননা এসব আচরণ অন্যের বেলায় যখন অপরাধ কেউ নিজের ক্ষেত্রে করলেও শরিয়ত তাকে অপরাধী গণ্য করে এবং অনেক সময় দণ্ডারোপ করে। এ কারণে কোনো কোনো ফকীহ এ শ্রেণীর আচরণের দায়ে নারীকে ঘাতিকা সাব্যস্ত করেছেন। ইবনে আবেদীন শামী লিখেন– وَلَا يَخْفٰى أَنَّهَا تَأْثَمُ إِثْمَ الْقَتْلِ لَوْ إِسْتَبَانَ خَلْقُهُ وَمَاتَ بِفِعْلِهَا অর্থাৎ প্রকাশ থাকে যে, দৈহিক গঠন প্রকাশ পাওয়ার পরে নারীর কোন আচরণে যদি উদরস্থ শিশু মারা যায় তবে তার ওপর হত্যার গুনাহ বর্তাবে। – (শামীঃ খঃ ৫, পৃঃ ৫১৯)

কাযীখান এ সম্পর্কে চমৎকার লিখেছেন, তিনি বলেন জীবন সঞ্চারের পর যদি গর্ভপাত করা হয় তাহলে তা যে হারাম এ বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু জীবন আগমনের পূর্বে যদি তা করা হয় তথাপি তা জায়েজ হবে না। কেননা জীবন আসার পূর্ব পর্যন্ত গর্ভকে গর্ভিনীর একটি অংশ এবং তা দেহের অঙ্গ ধরা হবে এবং যেভাবে কাউকে হত্যা করা দুরস্ত নেই তদ্রূপ স্বীয় দেহের কোনো অঙ্গ কেটে ফেলাও জায়েজ নেই।– (ফতওয়া কাযীখানঃ হযর ও ইবাহাত অধ্যায়) উপরোক্ত আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার হয়ে গেল যে, কোনো মারাত্মক ওজর এবং অসাধারণ বাধ্যবাধকতা ব্যতীত কোনো অবস্থায়ই শরিয়তে গর্ভপাত জায়েজ নেই।

লাইগেশন ঃ জন্মনিয়ন্ত্রণের আরেকটি পদ্ধতি হলো লাইগেশন। অস্ত্রপচারের (Operation) মাধ্যমে নারী বা পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা (Inseminaton Power)চিরতরে খতম করে দেওয়াই হলো লাইগেশন। এতে সঙ্গমের ক্ষমতা অক্ষত থাকে, লুপ্ত হয় শুধু সন্তান জন্মানোর যোগ্যতা। জাহিলিয়া যুগে প্রজনন ক্ষমতা বিনাশনের উদ্দেশ্যে খাসী হওয়ার পন্থা অবলম্বন করা হতো। অর্থাৎ পশুদের ন্যায় পুরুষের অণ্ডকোষ থেকে অণ্ডদ্বয় যা জৈবিক কামনা ও সক্ষমতার উৎসবিন্দু বের করে ফেলা হতো।

দুনিয়া বিরাগী হয়ে অত্যধিক নিবিষ্টতার সাথে আল্লাহ তা'আলার ইবাদতে মশগুল হওয়ার নিমিত্তে স্বয়ং নবী (সা.)-এর কোনো কোনো সাহাবীও এ কাজের অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। কিন্তু তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে তা নিষেধ করেছেন। ফলে সকল ফিকহবিদ তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। এমনকি যদি কেউ কাউকে খাসী করে দেয় তবে তার ওপর ঐ অর্থদণ্ড বর্তাবে যা নরহত্যার জন্য নির্ধারিত। শায়খুল ইসলাম শরফুদ্দীন মূসা হাম্বলী দিয়ত (অর্থদণ্ড) আবশ্যককারী অপরাধগুলোর তালিকা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন " এবং বিকল হয়ে যাওয়া অংগ সমূহের– আর তা হলো হাত-পা, পুরুষাঙ্গ, স্তন প্রভৃতির কার্যক্ষমতা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া, তবে দিয়ত আবশ্যক হবে।" – (আল ইকনা খঃ ৪, পৃঃ ২২৮) এক্ষেত্রে সাধারণত এই বলে একটি বিভ্রান্তি ছড়ানো হয় যে, إِخْتِصَاءٌ অর্থাৎ খাসী হওয়া এবং লাইগেশন এক জিনিস নয়– প্রথমটিতে যেখানে যৌনশক্তি ও সহবাস ক্ষমতা সমূলে তিরোহিত হয়, দ্বিতীয়টিতে সেখানে সহবাসের ক্ষমতা সম্পূর্ণ অক্ষত থাকে, বিলুপ্ত হয় শুধু প্রজনন শক্তি। কিন্তু এ যুক্তি খোঁড়া ও অর্থহীন। কেননা সহবাস শক্তির বিনাশন এবং প্রজনন শক্তির বিনাশন প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র অপরাধ।

আল্লামা কাসানী লিখেছেন, যে সব ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত (অর্থদণ্ড) আবশ্যক হয় তাতে দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য- প্রথমত কারণ, দ্বিতীয়ত শর্তাবলী। দিয়ত আবশ্যক হওয়ার কারণ হলো কোনো অঙ্গের উদ্দিষ্ট কার্যক্ষমতা বিলুপ্ত করে দেওয়া। এ বিলুপ্তির দু'টি ধরন হতে পারে- এক, দেহ থেকে অঙ্গই বিচ্ছন্ন করে দেওয়া, দুই, অঙ্গ বহাল রেখে তার উদ্দিষ্ট কার্যশক্তি ছিনিয়ে নেওয়া। - (বাদা'ই ১:১৯৭)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে ভ্যাসেকটমি এবং প্লাষ্টিক কয়েলের বিধান কি হবে তাও পরিষ্কার হয়ে গেল। বন্ধ্যত্বকরণের উদ্দেশ্যে শুক্র চলাচলকারী রগ কেটে ফেলাই হলো ভ্যাসেকটমি, আর প্লাষ্টিক কয়েল হলো এক প্রকার সূক্ষ্ম তার যা ডাক্তার স্বহস্তে নারীর গর্ভশয়ের মুখে বেধে দেন বা রেখে দেন।

অস্ত্রপ্রয়োগে (Surgery) সন্তান ভূমিষ্ঠকরণ ঃ যদি মাতৃজঠরে সন্তান জীবিত থাকে এবং ভূমিষ্ঠ না হয় আর অপারেশনের সাহায্যে তা ভূমিষ্ঠকরণ সম্ভব হয় তবে তা করা যেতে পারে। কিন্তু যদি ডাক্তার বলেন, সন্তানের জীবন রক্ষা করতে গেলে প্রসূতীর জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে কিন্তু তা টুকরো করে বের করা হলে সে রকম আশঙ্কা নেই তাহলে তাকে এর অনুমতি দেওয়া হবে না। কেননা তখন প্রসূতী বেঁচে যাওয়ার নিশ্চয়তাই বা কতটুকু। জননীকে কল্পিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষার অজুহাতে নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা শরিয়তে জায়েজ নেই। সাধ্যানুসারে উভয়কে বাঁচাবার চেষ্টা করতে হবে। যদি প্রসূতী জীবিত থাকাবস্থায় গর্ভস্থ শিশু মারা যায় এবং ইনজেকশন বা ঔষধ প্রয়োগে তা খালাশকরণ সম্ভব না হয় তখন তা টুকরো করে বের করা জায়েজ। কেননা তা না হলে প্রসূতি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া নিশ্চিত। - (রদ্দুল মুহতার ১ম খঃ ৮৪০; জাদীদ ফিকহী মাসাইল; ইসঃ ফিকহ দ্রঃ)।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) ما معنى العدة ولم سميت بهذه الاسم؟ وما التفصيل فى العدة التى اشرتم اليها اجمالا .

(٢) ما معنى ابعد الاجلين واى الفائدة لها فى ذالك؟ وما هو الاحداد؟ بين مفصلا .

(٣) كيف يثبت نسب الاولاد من ابائهم؟ وما التفصيل فى ثبوت النسب من الزوج الذى طلقها .

(٤) هل لثبوت نسب ولد المعتدة شرط سوى ماذكر من الزمان .

(٥) امراة طلقت فكانت تعتد وطيها رجل فهل تستانف عدتها؟ وما صورة تداخل العدتين .

كِتَابُ النَّفَقَاتِ
খোরপোশ পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) বিবাহ পর্ব ও তার সংশ্লিষ্ট সকল পর্বসমূহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ও তার সংশ্লিষ্ট সকল পর্বসমূহ বর্ণনা করার পর এখন খোরপোশ বা জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় ব্যয় পর্ব আরম্ভ করেছেন।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ খোরপোশ পর্বকে বিবাহ পর্বের বিধানের সাথে বা তালাক পর্বের বিধানের সাথে বর্ণনা করলেন না কেন? অথচ বিবাহিতা স্ত্রী ও তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী উভয়ের সাথেই খোরপোশের বিধানাবলী সংশ্লিষ্ট।

এর উত্তর হচ্ছে– যদিও বিবাহিতা স্ত্রী ও তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর খোরপোশের বিধি-বিধান বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের পর্বের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু খোরপোশের বিধানাবলীর সাথে ذَوِى الْاَرْحَامِ বা মাতৃকুলের আত্মীয়স্বজন ও দাস-দাসীদের খোরপোশের বিধানও সম্পর্কিত তাই খোরপোশ পর্বকে পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন।

نَفَقَة -এর আভিধানিক অর্থ ঃ

نَفَقَةٌ শব্দটির বর্ণত্রয়কে যবর দ্বারা পাঠ করা হয়, মানুষ যে সম্পদ নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে উহাকে নফ্‌কা বলে। শব্দটি نُفُوْق থেকে নিষ্পন্ন। অর্থ– ধ্বংস হওয়া, নষ্ট হওয়া। যখন প্রাণী মারা যায় বা ধ্বংস হয়ে যায় তখন বলা হয় نَفَقَتُ الدَّابَّةُ نُفُوْقًا মানুষ যা ব্যয় করে। উহাকে نَفَقَةٌ বলার কারণ হলো ব্যয় করলে সম্পদ ধ্বংস বা শেষ হয়ে যায় এবং অবস্থা ঠিক থাকে।

نَفَقَةٌ -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ

শরিয়তের পরিভাষায় অন্ন ও উহার সংশ্লিষ্ট বস্তু, বস্ত্র ও উহার সংশ্লিষ্ট বস্তু, বাসস্থান ও উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়াদিকে নফ্‌কা বলে। এ কারণেই নফ্‌কা অনুচ্ছেদের বিবরণে ফকীহগণ বস্ত্র ও বাসস্থানের বিধানসমূহের বর্ণনাও দিয়ে থাকেন। অবশ্য শরিয়তের আলোকে কখনো কেবল অন্ন এবং উহার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর নফ্‌কা প্রয়োগ হয়ে থাকে। কাজেই ফকীহদের উক্তি تَجِبُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَالسُّكْنٰى -এর نَفَقَة শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র অন্নই উদ্দেশ্য। কেননা আতফ مَعْطُوْف এবং مَعْطُوْف عَلَيْهِ -এর মধ্যে বৈপরীত্যের চাহিদা পোষণ করে।

কুরআনের আলোকে নফ্‌কার প্রমাণ ঃ কুরআন শরীফের আয়াত 'নফ্‌কা' প্রমাণ করে। সূরা বাক্বারাতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ -

অর্থাৎ মাতাগণকে পূর্ণ দুই বৎসর দুধ পান করাবে, যে দুধ পান করানোর সময় পূর্ণ করতে চায়। আর সন্তানের পিতার ওপর উত্তম পদ্ধতিতে তার জীবিকা ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। সূরা তালাকের মধ্যে রয়েছে– لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ অর্থাৎ প্রশস্ত হস্তে পরিবার-পরিজনের প্রতি ব্যয় করবে, আর যার ওপর আল্লাহ তা'আলা তার রিজিক ফরজ করেছেন যে, আল্লাহর দেওয়া রিজিক হতে তা খরচ করতে হবে।

মুসলিম শরীফে বিদায় হজ অনুচ্ছেদে রয়েছে– নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন, উত্তম পদ্ধতিতে তোমাদের ওপর তাদের ভরণ-পোষণ প্রদান করা অপরিহার্য। নবী করীম (সা.) আরো ফরমান, যখন তাকে স্বামীর ওপর স্ত্রীর কর্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন, যখন তোমরা খাবে তাদেরকেও খাওয়াবে, আর যখন তোমরা পরিধান করবে তখন তাদেরকেও পরিধান করতে দেবে। –(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)। বুখারী ও মুসলিম শরীফের বর্ণনায় আছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.)-এর পিতা আবূ সুফিয়ান (রা.)-এর পত্নী হিন্দা (রা.) আরজ করলেন– হে আল্লাহর রাসূল! আবূ সুফিয়ান একজন কৃপণ ব্যক্তি। আমাকে এই পরিমাণ নফ্‌কা দেয় যাতে আমার ও আমার সন্তানদের খরচ চলে না। আমি কি গোপনে তার মাল নিয়ে নিতে পারি ? এতে কি আমার গুনাহ হবে ? নবী করীম (সা.) বললেন, যা তোমার ও তোমার সন্তানদের জন্য যথেষ্ট হবে তা উত্তম পদ্ধতিতে নিয়ে নেবে। এটা নফ্‌কা ওয়াজিব হওয়ার ওপর নস।

اَلنَّفْقَةُ وَاجِبَةٌ لِلزَّوْجِ عَلٰى زَوْجِهَا مُسْلِمَةً كَانَتْ اَوْ كَافِرَةً اِذَا سَلَّمَتْ نَفْسَهَا فِىْ مَنْزِلِهٖ فَعَلَيْهِ نَفْقَتُهَا وَكِسْوَتُهَا وَسُكْنَاهَا يُعْتَبَرُ ذَالِكَ بِحَالِهِمَا جَمِيْعًا مُوْسِرًا كَانَ الزَّوْجُ اَوْ مُعْسِرًا فَاِنِ امْتَنَعَتْ مِنْ تَسْلِيْمِ نَفْسِهَا حَتّٰى يُعْطِيَهَا مَهْرُهَا فَلَهَا النَّفْقَةُ وَاِنْ نَشَزَتْ فَلَا نَفْقَةَ لَهَا حَتّٰى تَعُوْدَ اِلٰى مَنْزِلِهٖ وَاِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لَايُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفْقَةَ لَهَا وَاِنْ سَلَّمَتْ اِلَيْهِ نَفْسَهَا وَاِنْ كَانَ الزَّوْجُ صَغِيْرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى الْوَطْيِ وَالْمَرْاَةُ كَبِيْرَةٌ فَلَهَا النَّفْقَةُ مِنْ مَالِهٖ ـ

সরল অনুবাদ ঃ স্ত্রীর জন্য পারিবারিক ব্যয় বহন করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব। চাই স্ত্রী মুসলিম হোক বা অমুসলিম। যখন সে নিজেকে স্বামীর ঘরে হাওলা করে দেয় তখন স্বামীর ওপর স্ত্রীর পারিবারিক ব্যয়, বস্ত্র এবং বাসস্থান দেয়া অপরিহার্য। এটা উভয়ের অবস্থায় বিবেচনা হবে। স্বামী বিত্তশালী হোক বা দরিদ্র। কিন্তু যদি মহিলা নিজেকে হাওলা করা হতে বিরত থাকে। এমনকি স্বামী তার মোহর দিয়ে দেয়। তখন মহিলার জন্য শুধু পারিবারিক ব্যয় ধার্য হবে। যদি স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য হয় তাহলে نَفْقَة পাবে না, যতক্ষণ না স্বামীর ঘরে না আসে। আর যদি স্ত্রী শিশু হয় যে, তার থেকে কোনো উপকৃত হওয়া যায় না, তাহলে তার জন্য نَفَقَة হবে না। যদিও সে নিজেকে স্বামীর হাওলা করে দেয়। যদি স্বামী শিশু হয় যে নাকি সঙ্গমের উপযুক্ত নয় এবং স্ত্রী বড় হয়, তাহলে স্ত্রীর জন্য স্বামীর সম্পদ হতে نَفْقَة ওয়াজিব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ يُعْتَبَرُ فِىْ ذَالِكَ الخ ঃ যদি স্বামী বিত্তশালী হয় আর স্ত্রী বিত্তহীন হয় তবে স্ত্রী বিত্তশীলা মহিলাদের চেয়ে কম খরচ পাবে। তবে বিত্তহীনা মহিলাদের চেয়ে অধিক পরিমাণে খোরপোশ বা খরচ পাবে। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যম ধরনের খরচ পাবে।

যদি মহিলা তাড়াতাড়ি মোহর আদায় করার উদ্দেশ্যে নিজেকে স্বামীর হাওলা না করে এবং সঙ্গম করতে না দেয়, তথাপিও نَفْقَة রহিত হবে না।

قَوْلُهٗ وَاِذَا نَشَزَتْ الخ ঃ নিজেকে স্বামীর আড়ালে রাখা অথবা স্বামীর অগোচরে ঘর থেকে চলে যাওয়া বা এত ছোট যে, তার সাথে সঙ্গম করা সম্ভব নয় বা তালাকপ্রাপ্ত হওয়ার পর নাস্তিক হয়ে যায় বা তালাকের পূর্বে নিজের ওপর স্বামীর ছেলেকে অধিকার দিয়ে দেয় বা ঋণগ্রস্তের কারণে বন্দী হয়ে যায় বা কেউ তাকে জোর পূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যায় বা স্বামী ব্যতীত অন্য কারো সাথে হজ করতে চলে যায় ; তবে উল্লিখিত সর্বাবস্থায় স্বামীর ওপর نَفْقَة ওয়াজিব নয়। কেননা نَفْقَة তো এ জন্য ওয়াজিব হয় যে, স্ত্রী স্বামীর নিকট অধিকারার্থে বন্দী থাকে আর উল্লিখিত অবস্থাতে বন্দীত্ব পাওয়া যায় না।

قَوْلُهٗ فَلَهَا النَّفْقَةُ ঃ কেননা এখানে সঙ্গমের অপারগতা পুরুষের পক্ষ হতে।

وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ إِمْرَأَتَهُ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنٰى فِىْ عِدَّتِهَا رَجْعِيًّا كَانَ أَوْ بَائِنًا وَلَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا وَإِنْ مَكَّنَتْ إِبْنَ زَوْجِهَا مِنْ نَفْسِهَا فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِىْ دَيْنٍ أَوْ غَصَبَهَا رَجُلٌ كُرْهًا فَذَهَبَ بِهَا أَوْ حَجَّتْ مَعَ مَحْرَمٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِذَا مَرِضَتْ فِىْ مَنْزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ وَ تَفْرِضُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةَ خَادِمِهَا إِذَا كَانَ مُوْسِرًا وَلَا تَفْرِضُ لِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ وَعَلَيْهِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِىْ دَارٍ مُفْرَدَةٍ لَيْسَ فِيْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি পুরুষ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে স্ত্রীর জন্য ইদ্দতকালীন সময়ে খোরপোশ এবং বাসস্থান দিতে হবে। চাই তালাকে رَجْعِى হোক বা بَائِنْ। আর যে মহিলার স্বামী মরে গেছে তার জন্য نَفَقَة নেই। আর যে সব পৃথকতা পাপাচারের কারণে মহিলার পক্ষ থেকে হয়, ঐ সব অবস্থায় স্ত্রীর জন্য نَفَقَة মিলবে না। আর যদি স্ত্রী তালাক দেওয়ার পর মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে نَفَقَة রহিত হয়ে যাবে। যদি মহিলা তালাকের পরে নিজের ওপর স্বামীর ছেলেকে অধিকার দিয়ে দেয়, তাহলে তার نَفَقَة মিলবে। কিন্তু যদি তালাকের পূর্বে হয় তাহলে نَفَقَة পাবে না। যদি মহিলা কর্জের কারণে বন্দী হয়ে যায় অথবা কেউ তাকে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে যায় বা غَيْر مَحْرَم (তথা যাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম নয়)-এর সাথে হজ করতে যায় তাহলে তার জন্য نَفَقَة হবে না। আর যদি স্বামীর ঘরে অসুস্থ হয়ে যায় তবে তার জন্য نَفَقَة ধার্য হবে। যদি স্বামী সম্পদশালী হয় তাহলে স্বামীর ওপর স্ত্রীর চাকরের نَفَقَة ধার্য করা হবে এবং একজন অনুচরের نَفَقَة -এর চেয়ে অতিরিক্ত ধার্যও করা যাবে না। আর স্বামীর ওপর কর্তব্য যে, স্ত্রীর জন্য পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, যার মধ্যে স্বামীর আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে কেউ না থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ ঃ যদি তালাকপ্রাপ্ত ইদ্দতের মধ্যে হয় তার نَفَقَة -ও স্বামীর ওপর অপরিহার্য, চাই তালাকে رَجْعِى হোক বা بَائِنْ -

أَئِمَّة ثَلَاثَة -এর অভিমত ঃ أَئِمَّة ثَلَاثَة তথা (১) ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট যদি মহিলা তিন তালাকপ্রাপ্ত হয় অথবা طَلَاق بِالْعِوَض হয় তবে তার نَفَقَة ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, যদি অন্তঃসত্ত্বা হয়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে نَفَقَة অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

أَئِمَّة ثَلَاثَة -এর প্রমাণ ঃ فَاطِمَة بِنْتُ قَيْس -এর বর্ণনা যে, তার স্বামী তাঁকে তিন তালাক দিয়ে দিলে তিনি নবী করীম (সা.)-এর দরবারে ঘটনা পেশ করলেন। তখন হুযূর (সা.) তাঁর জন্য نَفَقَة এবং سُكْنٰى নির্ধারণ করেননি। রেওয়ায়তে এই বাক্যসমূহ বর্ণিত আছে– إِنَّمَا السُّكْنٰى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

হানাফীদের যুক্তি ঃ আল্লাহ তা'আলার বাণী– أَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ -এর মধ্যে عَلَى الْإِطْلَاق খোরপোশ দেওয়া জরুরি।

أَئِمَّة ثَلَاثَة-এর দলিলের প্রতি উত্তর ঃ فَاطِمَة بِنْتُ قَيْس -এর বর্ণনা অগ্রহণযোগ্য। কেননা স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম এটাকে অগ্রাহ্য করেছেন। এ ব্যাপারে হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, আমরা আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের (সা.) সুন্নতকে একটা মহিলার কথায় ছাড়তে পারি না। হযরত আয়শা (রা.) বলেন যে, فَاطِمَة -এর কি হলো সে কি لَاسُكْنٰى وَلَا نَفَقَة বলার সময় আল্লাহ থেকে একটুও ভীতসন্ত্রস্ত হয় না।

إِلَّا أَنْ تَخْتَارَ ذَالِكَ وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَاَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظْرِ اِلَيْهَا وَلَامِنْ كَلَامِهِمْ مَعَهَا فِيْ اَيِّ وَقْتٍ اِخْتَارُوْا وَمَنْ أُعْسِرَ بِنَفْقَةِ اِمْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَيُقَالُ لَهَا اِسْتَدِيْنِيْ عَلَيْهِ وَاِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِيْ يَدِ رَجُلٍ يَعْتَرِفُ بِهِ وَبِالزَّوْجِيَّةِ فَرَضَ الْقَاضِيْ فِيْ ذَالِكَ الْمَالِ نَفْقَةَ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَاَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَوَالِدَيْهِ وَيَأْخُذُ مِنْهَا كَفِيْلًا بِهَا وَلَا يُقْضٰى بِنَفْقَةٍ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ اِلَّا لِهٰؤُلَاءِ وَاِذَا قَضَى الْقَاضِيْ لَهَا بِنَفْقَةِ الْاِعْسَارِ ثُمَّ اَيْسَرَ فَخَاصَمَتْهُ تَمَّ لَهَا نَفْقَةُ الْمُوْسِرِ.

সরল অনুবাদ ঃ হ্যাঁ যদি স্ত্রী সন্তুষ্ট থাকে তাহলে তার সাথে স্বামীর স্বজনরা থাকতে পারবে এবং স্বামীর এতটুকু ক্ষমতা আছে যে, সে স্ত্রীর মাতাপিতা, পূর্বের স্বামীর সন্তান এবং আত্মীয় স্বজনকে তার নিকট আসা থেকে বিরত রাখতে পারবে। কিন্তু তাদেরকে স্ত্রীর দিকে চাওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না। এমনকি স্ত্রী যখন চায় তাদের সাথে কথা বলতে পারবে এতে বাধা দিতে পারবে না। যে ব্যক্তি স্ত্রীর খোরপোশ দিতে অক্ষম হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যে পৃথক করে দেওয়া যাবে না এবং স্ত্রীকে বলা হবে যে, তুমি স্বামীর জিম্মায় কর্জ নিতে থাকো। আর যখন কোনো ব্যক্তি অনুপস্থিত হয়ে যায় এবং কারো কাছে তার মাল হয় যার স্বীকার সে করে এবং স্ত্রী হওয়ারও স্বীকার করে, তাহলে কাজী সাহেব উক্ত মালের মধ্যে অনুপস্থিত ব্যক্তির স্ত্রীর খরচপাতি নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং তার ছোট সন্তান ও মাতাপিতার খরচও নির্দিষ্ট করে দেবেন। আর স্ত্রী থেকে তার একজন জামিন নিয়ে নেবে এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের ব্যতীত অনুপস্থিত ব্যক্তির মাল সম্পদে নির্দিষ্ট করবে না। আর যখন কাজি সাহেব স্ত্রীর জন্য দরিদ্রতার ভরণ-পোষণের মীমাংসা করে দিল অতঃপর স্বামী সম্পদশালী হয়ে গেল এবং স্ত্রীও দাবি করল তাহলে তার জন্য মালদারীর ভরণ-পোষণ পূর্ণ করে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلِلزَّوْجِ اَنْ يَمْنَعَ الخ ঃ অর্থাৎ যে ঘরে স্ত্রী বসবাস করে সে ঘরে বা কক্ষে স্ত্রীর মাতা-পিতা, ভাই-ভাতিজা প্রবেশ করতে না দেওয়ার অধিকার স্বামীর আছে। তবে হাঁ তারা যদি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে খোঁজ খবর নিয়ে থাকে তবে তাতে কোনো দোষ নেই। এই মাসআলায় এটা একটি উক্তি। দ্বিতীয় উক্তি হলো, তাদেরকে স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া স্বামীর সাধারণত কোনো অধিকার নেই। অবশ্য সেখানে অবস্থান করতে কিংবা বেশীক্ষণ অবস্থান করতে বাধা দেওয়া স্বামীর অধিকার আছে। তৃতীয় উক্তি এই মাসআলায় এই যে, মাতাপিতাকে সপ্তাহে কমপক্ষে একবার এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সারা বৎসরে কমপক্ষে একবার আসতে বাধা দেওয়ার অধিকার স্বামীর নেই। হেদায়া গ্রন্থকার এই সকল উক্তি উল্লেখ করে শেষোক্ত উক্তিটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন।

স্ত্রীর ভরণ-পোষণে ব্যর্থ হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَعْسَرَ بِنَفْقَةِ اِمْرَأَتِهِ ঃ হানাফী মাযহাবের আলিমদের মতে স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদানে ব্যর্থ হয় তবে বিবাহ বিচ্ছেদ করা যাবে না ; বরং স্ত্রীকে স্বামীর পক্ষ থেকে ঋণ গ্রহণ করার জন্য আদেশ দেওয়া হবে। এ বিচারকই আদেশ প্রদান করবেন। এতে উপকারিতা হলো, ঋণদাতার পক্ষে স্বামীর নিকট থেকে ঋণ আদায় করা সম্ভব হবে। কেননা যদি

স্ত্রী বিচারকের অনুমতি ছাড়া ঋণ গ্রহণ করে তবে ঋণদাতা স্বামীর প্রতি রুজু করতে পারবে না ; বরং স্ত্রীর কাছে স্বীয় পাওনা চাইতে পারবে এবং তারই থেকে আদায় করবে। অবশ্য পরে স্ত্রী স্বীয় স্বামীর প্রতি রুজু করতে পারবে, তাও বিচারকের পক্ষ থেকে নির্ধারিত সীমা পর্যন্ত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে স্বামী তার স্ত্রীর ভরণ-পোষণ আদায় করতে ব্যর্থ হলে কাজি বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবে। তাঁর দলিল স্বরূপ বক্তব্যের সারাংশ হলো, কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাহের নসের আলোকে স্বামীর ওপর দু'টি কথার একটি ওয়াজিব হবে। (১) নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেবে। (২) নতুবা তাকে ছেড়ে দেবে ও আজাদ করে দিবে। সুতরাং যখন নিয়ম অনুযায়ী দরিদ্রতার কারণে ভরণ-পোষণ দিয়ে স্ত্রীকে রাখতে সে ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন তাকে উত্তমরূপে ছেড়ে দেওয়া এবং বিদায় করে দেওয়া স্বামীর ওপর ওয়াজিব। আর যখন স্বামী নিজের সম্মতিক্রমে ছেড়ে দিচ্ছে না এবং স্ত্রীও কষ্ট পাচ্ছে, তখন কাজি স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাকে পৃথক করে দেবে। কেননা কাজি সর্ব সাধারণভাবে অভিভাবকত্ব প্রাপ্ত। এটার উদাহরণ হলো নপংসুক স্বামী ও লিঙ্গ কর্তিত স্বামীর ক্ষেত্রে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া। এ দু'টি অবস্থায় কাজি স্বামীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বিবাহ বিচ্ছেদ করার অধিকার প্রাপ্ত।

আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ীর উত্তর ঃ

আমাদের পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর উত্তর এই যে, স্বামী নপুংসুক এবং লিঙ্গ কর্তিত হওয়ার অবস্থায় বিবাহ বিচ্ছেদ এ জন্য হয়ে থাকে যে, সে ক্ষেত্রে বিবাহের মূল উদ্দেশ্যই নৈরাশ্যজনক হয়ে গিয়েছে। তা হলো সন্তান জন্মের ধারাবাহিকতা এবং বংশ বৃদ্ধির ধারা, যা সম্পদের বিপরীত, অর্থাৎ সম্পদ বিবাহের মূল উদ্দেশ্য নয় ; বরং উহা বিবাহের প্রসঙ্গ। এ জন্য সম্পদ না থাকলে বিবাহ বিচ্ছেদ জরুরি হবে না। এটা ছাড়া স্ত্রীর আর্থিক সমস্যা স্বামীর নামে ঋণ গ্রহণকরণ দ্বারাও সমাধান হতে পারে। এ কারণেই স্বামীর পুরুষত্বহীনতা ও লিঙ্গ কর্তিত হওয়ার ক্ষতির মতো এখানে ক্ষতি নেই। সুতরাং সেই অবস্থাদ্বয়ের ওপর আলোচ্য মাসআলাকে কিয়াস করা যাবে না।

একান্ত ব্যর্থতার পর হুকুম ঃ

আবূ হাফস (র) স্বীয় "ফসূল" গ্রন্থে লিখেন যে, যখন সাক্ষীদের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়ে যাবে যে, স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ প্রদানে ব্যর্থ, তাহলে কাজী যদি শাফেয়ী মাযহাবের হয় তবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেবে এবং এ বিচ্ছেদ বিধান আমাদের মতেও কার্যকরী হয়ে যাবে। আর যদি কাজি হানাফী মাযহাবের হয়, তবে সে তো নিজের মাযহাবের বিপরীত ফয়সালা দিতে পারবে না, তখন যদি সে মুজতাহিদ হয় আর তার ইজতেহাদ এটাই হয় তবে এই অনুপাতে সিদ্ধান্ত দিবে। আর যদি সে বিনা ইজতেহাদে স্বীয় মাযহাবের ইমামের বিরোধিতা করে তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার সিদ্ধান্ত কার্যকরী হওয়ার ব্যাপারে দু'টি বর্ণনা রয়েছে। (১) স্বীয় ইমামের বিরোধিতা করার কারণে এই বিচারকের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবে না। (২) ইস্তেহসানের খাতিরে কার্যকরী হবে। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যদি আদেশদাতা ও আদেশগ্রহীতা ঘুষ না খায় তাহলে এই ভিত্তিতে বিবাহ বিচ্ছেদ করে দেওয়া হবে।

وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَطَالَبَتْهُ بِذَالِكَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْقَاضِيْ فَرَضَ لَهَا نَفَقَةً أَوْ صَالَحَتِ الزَّوْجُ عَلٰى مِقْدَارِهَا فَيُقْضٰى لَهَا بِنَفَقَةِ مَا مَضٰى فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ بَعْدَ مَا قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ وَمَضَتْ شُهُوْرٌ سَقَطَتِ النَّفَقَةُ وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُسْتَرْجَعْ مِنْهَا بِشَيْءٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُحْتَسَبُ لَهَا نَفَقَةُ مَا مَضٰى وَمَا بَقِيَ لِلزَّوْجِ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً فَنَفْقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيْهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ مَنْزِلًا فَعَلَيْهِ النَّفْقَةُ وَإِنْ لَمْ يُبَوِّأْهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ وَنَفَقَةُ الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ عَلَى الْأَبِ لَا يُشَارِكُهُ فِيْهَا أَحَدٌ كَمَا لَا يُشَارِكُهُ فِيْ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ أَحَدٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যখন কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যায় যার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর نَفَقَة দেয়নি এবং স্ত্রী তার দাবি করে তাহলে স্ত্রীর জন্য কিছুই হবে না। হ্যাঁ, যদি قَاضِى তার জন্য نَفَقَة নির্দিষ্ট করে অথবা স্ত্রী স্বামীর সাথে কোনো পরিমাণের ওপর সন্ধি করে, তাহলে তার জন্য অতীতের نَفَقَة -এর ফয়সালা হবে।

যদি স্ত্রীর জন্য نَفَقَة সিদ্ধান্ত হওয়ার পর স্বামী মারা যায় এবং কিছুকাল অতিবাহিত হয়ে যায় তবে نَفَقَة অকেজো হয়ে যাবে। যদি স্বামী এক বৎসরের نَفَقَة একসাথে দিয়ে দেয় অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তাহলে স্ত্রী থেকে অবশিষ্ট نَفَقَة ফেরত নেওয়া যাবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, স্ত্রীর জন্য অতীত দিনসমূহের نَفَقَة গণ্য হবে এবং অবশিষ্ট نَفَقَة সমূহ স্বামীরই হবে। যদি গোলাম স্বাধীন (মুক্ত) মহিলাকে বিবাহ করে তাহলে তার نَفَقَة গোলামের জিম্মায় ঋণ থাকবে, যার মধ্যে তাকে বিক্রি করা হবে। কেউ যদি দাসীকে বিবাহ করে এবং মালিক ঐ দাসীকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে نَفَقَة স্বামীকেই দিতে হবে। আর যদি তাকে স্বামীর ঘরে না পাঠায়, তাহলে স্বামীর ওপরে কোনো نَفَقَة ওয়াজিব হবে না। ছোট শিশুর نَفَقَة পিতার দায়িত্বে যার মধ্যে কেউ অংশীদার হবে না। যেমন স্বামীর সাথে অংশীদার হবে না তার স্ত্রীর نَفَقَة হিসেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ الْقَاضِيْ فَرَضَ لَهَا الخ ঃ

ائمه ثلاثة -এর অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী, মালেক এবং আহমদ ইবনে হাম্বল (র.)-এর নিকট কাজির ফয়সালা এবং স্বামী-স্ত্রীর সন্ধি ছাড়াও نفقه স্বামীর জিম্মায় ঋণের মতো। কেননা نَفَقَة আদায় করাটাও মোহর-এর মতো ওয়াজিব।

হানাফীদের দলিল ঃ আমাদের দলিল হলো যে, نَفَقَة এক ধরনের সদকার মতো সুতরাং কাজির ফয়সালা বা স্বামীর-স্ত্রীর সন্ধি ছাড়াও এটার হুকুম বর্ধিত হবে না। পক্ষান্তরে মোহর, যা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা এটা নিষিদ্ধ অঙ্গের প্রতিদান স্বরূপ। এ জন্য মোহরের মধ্যে কাজীর ফয়সালা এবং স্বামীর সন্তুষ্টির প্রয়োজন পড়ে না।

قَوْلُهُ أَسْلَفَهَا ঃ

شَيْخَيْن -এর অভিমত ঃ উল্লিখিত অবস্থায় শায়খাইন (র.)-এর নিকট প্রদত্ত نَفَقَة ফেরতযোগ্য নয়।

মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত ঃ তাঁরা বলেন, স্বামী জীবিত অবস্থার نَفَقَة নির্দিষ্ট করে বাকি نَفَقَة হিসাব করে ফেরত নেওয়া হবে। কেননা نَفَقَة তো আটক থাকার কারণে ওয়াজিব হয়। এখন স্বামী যেহেতু বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছে। সুতরাং মহিলা অবশিষ্ট نَفَقَة -এর উপযুক্ত নয়।

شَيْخَيْن -এর যুক্তি ঃ ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, نَفَقَة হলো একপ্রকার উপঢৌকন, যার ওপর অধিকার অর্জিত হয়ে গেছে। আর নিয়ম হলো যে, উপহার ও প্রতিদান এগুলো মৃত্যুর পরে প্রত্যাবর্তিত হয় না।

فَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ رَضِيعًا فَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ أَنْ تَرْضِعَهُ وَيَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعُهُ عِنْدَهَا فَإِنِ اسْتَأْجَرَهَا وَهِيَ زَوْجَتُهُ أَوْ مُعْتَدَّتُهُ لِتُرْضِعَ وَلَدَهَا لَمْ يَجُزْ وَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَاسْتَأْجَرَهَا عَلَى إِرْضَاعِهِ جَازَ وَإِنْ قَالَ الْأَبُ لَا أَسْتَأْجِرُهَا وَجَاءَ بِغَيْرِهَا فَرَضِيَتِ الْأُمُّ بِمِثْلِ أُجْرَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ كَانَتِ الْأُمُّ أَحَقَّ بِهَا وَإِنِ الْتَمَسَتْ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ كَمَا تَجِبُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ وَإِنْ خَالَفَتْهُ فِي دِينِهِ وَإِنْ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ -

সরল অনুবাদ ঃ যদি বাচ্চা স্তন্যপায়ী হয়, তাহলে মায়ের ওপর তাকে দুগ্ধ পান করানো কর্তব্য নয় ; বরং বাচ্চার জন্য পিতা এমন একজন মহিলা ঠিক করবে যে ছেলের মায়ের কাছে গিয়ে তাকে পারিশ্রমিকের ওপরে দুগ্ধ পান করাবে। এখন যদি বাচ্চাকে দুধ পান করানোর জন্য তার স্ত্রী বা তার مُعْتَدَّةْ -কে ভাড়া করা হয়, তাহলে জায়েজ হবে না। হ্যাঁ যদি তার ইদ্দত শেষ হয়ে যায় এবং তাকে দুধ পান করানোর জন্য পারিশ্রমিকের ওপর ঠিক করে, তবে জায়েজ হবে। যদি (বাচ্চার) পিতা বলে যে, আমিতো এই মহিলাকে পারিশ্রমিকের ওপর নিযুক্ত করব না এবং অন্য একজন মহিলা নিয়ে আসে, কিন্তু বাচ্চার মা নতুন মহিলার সমপরিমাণ পরিশ্রমের ওপর পূর্বের মহিলাকে রাখতে রাজি হয়, তাহলে মা এ ব্যাপারে বেশি অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু যদি পূর্বের মহিলা পারিশ্রমিক বেশি দাবি করে তাহলে স্ত্রী তাকে রাখার জন্য স্বামীর ওপর চাপ সৃষ্টি করবে না। সন্তানের نَفَقَةْ তার বাপের ওপর ওয়াজিব। যদিও বাচ্চা তার ধর্মের বিপরীত হয়, যেরূপ স্ত্রীর نَفَقَةْ স্বামীর ওপর ওয়াজিব যদিও স্ত্রী তার ধর্মের পরিপন্থী হয়। যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পৃথকতা সৃষ্টি হয়

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَلَيْسَ عَلَى أُمِّهِ ঃ মায়ের ওপর বাচ্চাকে দুগ্ধ পান করানো ওয়াজিব নয় ; বরং পিতা তার জন্য কোনো দুগ্ধ পান করানেওয়ালী মহিলাকে পারিশ্রমিকের ওপর ঠিক করবে যে বাচ্চাকে তার মায়ের নিকট থেকে দুগ্ধ পান করাবে। যদি পিতা স্বীয় স্ত্রীকে অথবা তালাকে رَجْعِيْ -এর ইদ্দত পালনকারিণীকে পারিশ্রমিকের ওপর ঠিক করে, তাহলে এটা জয়েজ হবে না। কেননা মায়ের ওপর দুধ পান করানো যদিও নীতি অনুযায়ী ওয়াজিব নয়, কিন্তু সাধুতার দিক থেকে এটা মায়েরই দায়িত্ব। নীতি অনুযায়ী তার ওপর বাধ্যতামূলক করা হয়নি এ জন্য যে, হতে পারে সে এটা থেকে অক্ষম। কিন্তু যখন সে পারিশ্রমিকের ওপর দুধ পান করানোর জন্য রাজি হয়েছে তখন তার অক্ষম না হওয়াটা প্রকাশ হয়ে গেছে। এ জন্য তাকে ভাড়া নেওয়া জায়েজ হবে না। হ্যাঁ যদি مُعْتَدَّةْ -এর ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়, তাহলে বিশুদ্ধ বর্ণনা মতে তাকে পারিশ্রমিকের ওপর নেওয়া বৈধ হবে। কেননা এখন তার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে ক্ষীয়মান হয়ে গেছে এবং সে অপরিচিতার মতো হয়ে গেছে।

قَوْلُهُ وَلَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا ঃ এটা পুরুষের ওপর থেকে ক্ষতি দূরীভূত করার জন্য। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন– لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ بِوَلَدِهِ এখন যদি পুরুষের ওপর অপরিচিতা থেকে বেশি পারিশ্রমিক অপরিহার্য করে দেওয়া হয়, তাহলে এটা তার ওপর অতিরিক্ত ক্ষতি প্রয়োগ করা হবে।

فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ الْأُمُّ فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ أُمِّ الْأَبِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمُّ الْأُمِّ فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْأَخَوَاتِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ جَدَّةٌ فَالْأَخَوَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَالْخَالَاتِ وَتَقَدَّمَ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ ثُمَّ الْخَالَاتُ أَوْلَى مِنَ الْعَمَّاتِ وَيَنْزِلْنَ كَمَا نَزَلَتِ الْأَخَوَاتُ ثُمَّ الْعَمَّاتُ يَنْزِلْنَ كَذَالِكَ وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْ هٰؤُلَاءِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحِضَانَةِ إِلَّا الْجَدَّةَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا الْجَدَّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ إِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِهِ فَاخْتَصَمَ فِيهِ الرِّجَالُ فَأَوْلَى هُمْ بِهِ أَقْرَبُهُمْ تَعْصِيبًا وَالْأُمُّ وَالْجَدَّةُ أَحَقُّ بِالْغُلَامِ حَتَّى يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِي وَحْدَهُ وَبِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَحِيضَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ তাহলে মা বাচ্চার বেশি উপযুক্ত। যদি মা না থাকে তাহলে নানী বেশি উপযুক্ত। যদি নানী না থাকে তাহলে বোনদের থেকে দাদী বেশি উপযুক্ত। যদি দাদীও না থাকে তাহলে বোনেরা উপযুক্ত ফুফু এবং খালাদের থেকে। (এদের মধ্যে আবার) সহোদরা বোন আগ্রবর্তী হবে। তারপর বৈপিত্রেয় বোন, তরপর বেমাত্রেয় বোন। এরপর ফুফুদের চেয়ে খালা বেশি উত্তম এবং তাদের মধ্যে ঐ বিন্যাস হবে যা বোনের মধ্যে হয়েছে। অতঃপর একই বিন্যাস পদ্ধতিতে ফুফুসমূহ হবে। আর উক্ত মহিলাদের মধ্য হতে যার বিবাহ হয়ে যাবে তার লালন-পালনের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। নানী ব্যতীত যখন নানীর স্বামী-বাচ্চার দাদা হয় তখন বিবাহের পরে হলেও নানীর দায়িত্ব বহাল থাকবে। যদি বাচ্চার স্বজনদের মধ্যে কোনো মহিলা না থাকে এবং দায়িত্ব পালন নিয়ে পুরুষদের বিবাদ বেঁধে যায়, তাহলে তাদের মধ্যে যে রক্তের সম্পর্কে বেশি নিকটবর্তী সেই বেশি উপযুক্ত। মা এবং নানী বাচ্চার দায়িত্ব পালন করবে ঐ সময় পর্যন্ত যে সময়ে বাচ্চা স্বেচ্ছায় খেতে পারে, পান করতে পারে, পরিধান করতে পারে এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে পারে। আর মেয়ে শিশু হলে ঋতুস্রাব আসা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ ঃ বাচ্চার প্রতিপালনের জন্য তার মা বেশি প্রযোজ্য। চাই পৃথকতার আগে হোক বা পরে। হাদীসে বর্ণিত আছে যে, এক মহিলা হুযূর (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করল হে আল্লাহর রাসূল (সা.) إِنَّ ابْنِي هٰذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءً وَ ثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَ زَعَمَ أَبِيهِ أَنَّهُ يَنْزِعُ مِنِّي অতঃপর রাসূল (সা.) বললেন- أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِي অনুরূপভাবে হযরত ওমর (রা.) একদা স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ায় নিজের ছেলে عاصم -কে তারা নিতে চাইল কিন্তু স্ত্রীকে দিতে অস্বীকার করায় ঘটনা হযরত আবূ বকর (রা.)-এর খেদমতে উপস্থাপিত হলো। তিনি বললেন- হে ওমর! এই মহিলার কোল এবং শয্যা বাচ্চার জন্য তোমার চেয়ে অনেক উত্তম। আর এ ঘটনা কতেক সাহাবায়ে কেরামের (রা.) সম্মুখে ঘটিত হয়েছে। অথচ কেউ এটার ওপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেননি।

قَوْلُهُ وَكُلُّ مَنْ تَزَوَّجَتْ الخ ঃ বাচ্চার প্রতিপালকের দায়িত্বে অর্পিত মহিলা যদি অন্যত্র বাচ্চার কোনো غَيْر مَحْرَمْ -এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে তার দায়িত্ব বিফল হয়ে যাবে। কেননা অপরিচিত ব্যক্তি তার স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর সন্তানের ওপর সাধারণত অসন্তুষ্ট থাকে। এতদসত্ত্বেও বাচ্চাকে লালন-পালনের জন্য তার ঘরে রাখা বাচ্চার জন্য ক্ষতি বৈ আর কিছু নয় এবং এটার ওপর সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন। হযরত হাসান (র.) ব্যতীত। তিনি বলেন যে, বিবাহের পরে ঐ মহিলার প্রতিপালন দায়িত্ব বিফলে যাবে না। এরূপ একটা বর্ণনা ইমাম মুহাম্মদ (র.) থেকেও কথিত আছে।

وَمَنْ سِوَى الْاُمِّ وَالْجَدَّةِ اَحَقُّ بِالْجَارِيَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ حَدًّا تَشْتَهِيْ وَالْاَمَةُ اِذَا اَعْتَقَهَا مَوْلَاهَا وَاُمُّ الْوَلَدِ اِذَا اُعْتِقَتْ فَهِيَ فِي الْوَلَدِ كَالْحُرَّةِ وَلَيْسَ لِلْاَمَةِ وَاُمِّ الْوَلَدِ قَبْلَ الْعِتْقِ حَقٌّ فِي الْوَلَدِ وَالذِّمِّيَّةُ اَحَقُّ بِوَلَدِهَا الْمُسْلِمِ مَالَمْ يَعْقِلِ الْاَدْيَانَ اَوْ يُخَافُ عَلَيْهِ اَنْ يَّأْلَفَ الْكُفْرَ وَاِذَا اَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ اَنْ تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْرِ فَلَيْسَ لَهَا ذٰلِكَ اِلَّا اَنْ تُخْرِجَهُ اِلٰى وَطَنِهَا وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ تَزَوَّجَهَا فِيْهِ وَعَلَى الرَّجُلِ اَنْ يُّنْفِقَ عَلٰى اَبَوَيْهِ وَاَجْدَادِهٖ وَجَدَّاتِهٖ اِذَا كَانُوْا فُقَرَاءَ وَاِنْ خَالَفُوْهُ فِيْ دِيْنِهٖ ـ

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ মা-নানী ছাড়া অন্য মহিলাগণ মেয়ে শিশুর প্রতিপালনের অধিক দাবিদার হবে মেয়ে কামভাবের উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত। আর বাঁদিকে যখন তার মালিক আজাদ (মুক্ত) করে দেয় এবং اُمِّ وَلَدْ যখন মুক্তি লাভ করে, তাহলে সে বাচ্চার ব্যাপারে আজাদ মহিলার মতোই। কিন্তু বাঁদি এবং اُمْ وَلَدْ -এর জন্য মুক্ত হওয়ার পূর্বে বাচ্চার ওপর কোনো প্রকার অধিকার নেই। আর ذِمِّيَّهْ মহিলা স্বীয় বাচ্চার বেশি দাবিদার তার মুসলমান স্বামী থেকে যতক্ষণ না বাচ্চার মধ্যে দীনের অনুভূতি না হয় এবং বাচ্চা কুফরির সাথে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার ভয় না হয়ে থাকে। যদি তালা প্রাপ্ত মহিলা নিজের সন্তানকে শহরের বাইরে নিয়ে যেতে চায়, তাহলে তার জন্য এটা জায়েজ হবে না। হ্যাঁ যদি ঐ ঘরে নিয়ে যেতে চায় যেখানে স্বামী তাকে বিবাহ করেছিল, তাহলে জায়েজ হবে। আর পুরুষের ওপর কর্তব্য যে, সে স্বীয় মাতা-পিতা দাদা-দাদীগণের জন্য খরচ করবে যখন তারা অভাবগ্রস্ত হয় যদিও তারা তার ধর্মের বিপরীত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَمَنْ سِوَى الْاُمِّ ঃ মা-নানী ব্যতীত খালা ফুফু প্রভৃতির ওপর মেয়ের প্রতিপালনের দায়িত্ব মেয়ে কামভাবের উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত। যার সময়সীমা ফকীহ্ اَبُوْ اللَّيْث-এর মতে নয় বৎসর। ইমাম মুহাম্মদ (র.) হতে এক বর্ণনায় আছে, যে মেয়ে তার মা এবং নানীর কাছে নয় বৎসরের বেশি থাকতে পারবে না এবং এটার ওপরই ফতোয়া।

قَوْلُهٗ وَالْاَمَةُ اِذَا اَعْتَقَهَا ঃ কেননা এখানে বিবাদ স্বয়ং মনিব থেকে হতে পারে, স্বামী থেকে নয়। এ জন্য যে, স্বামী তো বাচ্চার কোনো দাবিই রাখে না। কেননা অধিকৃত হওয়ার ব্যাপারে নিজের মায়ের অধীনে।

সুরতে মাসআলা হলো, যেমন- মনিব স্বীয় বাঁদি বা اُمْ وَلَدْ -কে অন্যত্র বিবাহ দিয়ে দিল এবং ঐ ঘরে কোনো বাচ্চা জন্ম নিল। অতঃপর মনিব তাকে মুক্ত করে দিল। তাহলে বাচ্চার প্রতিপালনের দায়িত্ব মনিবের নয় বরং ঐ বাঁদির।

قَوْلُهٗ وَعَلَى الرَّجُلِ اَنْ يُّنْفِقَ ঃ প্রত্যেক পুরুষের ওপর স্বীয় মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানীর نَفَقَهْ ওয়াজিব, যখন তারা দরিদ্রমুখী হয়। মাতা-পিতার জন্যতো খরচ করবে এ কারণে যে, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন- وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا-আর এ ধরনের ঘটনা সচরাচর দেখা যায় যে, মানুষ নিজেতো বিলাসিতা আর ফুর্তির মধ্যে মত্ত, কিন্তু তার পিতা-মাতা এক টুকরার রুটির জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে। এর চেয়ে বিষাদময় কথা আর কি হতে পারে। আর দাদার প্রভৃতির نَفَقَهْ এ জন্য জরুরি এরা আসলের অন্তর্ভুক্ত।

وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّيْنِ اِلَّا لِلزَّوْجَةِ وَالْاَبَوَيْنِ وَالْاَجْدَادِ وَالْجَدَّاتِ وَالْوَلَدِ وَ وَلَدِ الْوَلَدِ وَلَايُشَارِكُ فِيْ نَفَقَةِ اَبَوَيْهِ اَحَدٌ وَ النَّفَقَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ ذِيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ اِذَا كَانَ صَغِيْرًا فَقِيْرًا اَوْكَانَتْ اِمْرَأَةٌ بَالِغَةٌ فَقِيْرَةً اَوْ كَانَ ذَكَرًا زَمِنًا اَوْ اَعْمٰى فَقِيْرًا يَجِبُ ذَالِكَ عَلٰى مِقْدَارِ الْمِيْرَاثِ وَتَجِبُ نَفَقَةُ الْاِبْنَةِ الْبَالِغَةِ وَالْاِبْنِ الزَّمِنِ عَلٰى اَبَوَيْهِ اَثْلَاثًا عَلَى الْاَبِ الثُّلُثَانِ وَعَلَى الْاُمِّ الثُّلُثُ وَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّيْنِ وَلَاتَجِبُ عَلَى الْفَقِيْرِ وَاِذَا كَانَ لِلْاِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ قُضِىَ عَلَيْهِ بِنَفَقَةِ اَبَوَيْهِ وَاِنْ بَاعَ اَبَوَاهُ مَتَاعَهُ فِيْ نَفَقَتِهِمَا جَازَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ بَاعَ الْعِقَارَ لَمْ يَجُزْ وَاِنْ كَانَ لِلْاِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِيْ يَدِ اَبَوَيْهِ فَاَنْفَقَا مِنْهُ لَمْ يَضْمَنَا وَاِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِيْ يَدِ اَجْنَبِيٍّ فَاَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ اِذْنِ الْقَاضِيْ ضَمِنَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর স্ত্রী, পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, ছেলে এবং নাতী ব্যতীত অন্য কারো نَفَقَة ওয়াজিব নয় এবং পিতামাতার نَفَقَة -এর মধ্যে ছেলের সাথে অন্য কারো অংশীদার নেই। আর প্রত্যেক রক্ত সম্পর্কীয় مَحْرَمْ -এর জন্য نَفَقَة ওয়াজিব, যখন তারা ছোট এবং দরিদ্র হয় বা যুবতী মহিলা যখন সে অভাবগ্রস্ত হয় অথবা কোনো অন্ধ বা পঙ্গু পুরুষ যখন তার অবস্থা দুর্বল হয়। এ সমস্ত نَفَقَة মিরাস অনুপাতে ওয়াজিব হবে এবং সাবালিকা ও পঙ্গু ছেলের نَفَقَة তাদের পিতা-মাতার ওপর তিন ভাগ অনুপাতে ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ পিতার ওপর তিনভাগের ২ ভাগ $\frac{২}{৩}$ এবং মায়ের ওপর তিন ভাগের ১ ভগ $\frac{১}{৩}$ কিন্তু ধর্মের ব্যাপারে অনৈক্য হলে এদের মাহরাম আত্মীয়দের نفقه ওয়াজিব নয় এবং দরিদ্রের ওপরও نَفَقَة ওয়াজিব নয়। যদি অন্তর্হিত ছেলের কিছু সম্পদ থাকে, তাহলে এগুলোর ওপর মাতাপিতার نَفَقَة-এর হুকুম দেওয়া হবে। যদি মাতাপিতা ছেলের সম্পদ নিজের نَفَقَة-এর ওপর (অজুহাতে) বিক্রি করে দেয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট জায়েজ আছে। কিন্তু যদি ভূমি (জমিন) বিক্রি করে, তবে জায়েজ হবে না। যদি উধাও সন্তানের কিছু সম্পদ মাতা পিতার অধীনে হয় এবং তারা এর থেকে খরচ করে, তবে জবাবদিহি করতে হবে না। কিন্তু যদি অচেনা কারো নিকট থাকে এবং সে ওগুলো কাজির অনুমতি ব্যতিরেকে খরচ করে ফেলে তাহলে জবাবদিহি করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَعَ اِخْتِلَافِ الدِّيْنِ ঃ যদি ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে কারো نَفَقَة ওয়াজিব নয়। না কাফিরের نَفَقَة মুসলমানের ওপর এবং না মুসলমানের نَفَقَة কাফিরের ওপর। শুধু স্বীয় স্ত্রী ও আসলের অন্তর্ভুক্ত যারা তারা ব্যতীত। কেননা এদের نَفَقَة ধর্মের বৈপরীত্বের কারণেও ওয়াজিব হয়। তার কারণ হলো نَفَقَة ওয়াজিব হওয়ার পরিধি نَصْ قُرْاٰنِىْ -এর অনুপাতে উত্তরাধিকারীগণ। আর কাফির এবং মুসলমানের মধ্যে কোনো উত্তরাধিকার নেই।

পক্ষান্তরে স্ত্রী ও اُصُوْل وَفُرُوْع -এর মধ্যে স্ত্রীর نَفَقَة ওয়াজিব হওয়ার কারণ اِحْتِبَاسْ (আটক থাকা) আর اُصُوْل وَفُرُوْع -এর মধ্যে কারণ হলো وُجُوْد جُزْئِيَّتْ আর اِحْتِبَاسْ এবং جُزْئِيَّتْ -এর মধ্যে ধর্মের বৈপরীত্বের কারণে কোনো মতবিরোধ হয় না।

وَاِذَا قَضَى الْقَاضِىْ لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ وَلِذَوِى الْاَرْحَامِ بِالنَّفْقَةِ فَمَضَتْ مُدَّةٌ سَقَطَتْ اِلَّا اَنْ يَّاْذَنَ لَهُمُ الْقَاضِىْ فِى الْاِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ وَعَلَى الْمَوْلٰى اَنْ يُّنْفِقَ عَلٰى عَبْدِهٖ وَاَمَتِهٖ - فَاِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذَالِكَ وَكَانَ لَهُمَا كَسْبٌ اِكْتَسَبَا وَاَنْفَقَا مِنْهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمَا كَسْبٌ اَجْبَرَ الْمَوْلٰى عَلٰى بَيْعِهِمَا -

সরল অনুবাদ ঃ যদি বিচারক, সন্তান, মাতা-পিতা এবং স্বজনদের জন্য نَفْقَة -এর ফয়সালা করে দেয় এবং مُدَّتْ তথা সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে نَفْقَةٌ রহিত হয়ে যাবে। হাঁ, যদি কাজি তাদের জিম্মায় ঋণ নিতে অনুমতি দেয় তাহলে পারবে। আর মুনিবের ওপর তার গোলাম ও বাঁদির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় করা আবশ্যক। এখন যদি সে খরচ করা থেকে বিরত থাকে এবং তার উপার্জিত কোনো সম্পদ থাকে তবে তারা উহা থেকে নিজের জন্য খরচ করবে। আর যদি মনিবের উপার্জিত কিছু না থাকে তাহলে তাকে (গোলাম-বাঁদি) বিক্রয় করার জন্য বাধ্য করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَعَلَى الْمَوْلٰى اَنْ يُّنْفِقَ الخ ঃ কেননা নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন–

اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ اَطْعِمُوْهُمْ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ وَاَلْبِسُوْهُمْ مِمَّا تَلْبَسُوْنَ وَلَا تُعَذِّبُوْا عِبَادَ اللّٰهِ -

অর্থঃ নিশ্চয় তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করেছেন। কাজেই তোমরা যা খাও তা তাদেরকে ভক্ষণ করাও এবং তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকে তা পরিধান করাও। আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দিও না।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) ما معنى النفقة لغة واصطلاحا؟ بينوا الاحكام المتعلقة بنفقات الزوجات .

(٢) على من تجب النفقة الوالدين؟ هل تجب لغير الوالدين والاولاد من الاقارب؟

(٣) اذا كان ولد بين زوجين ذكرا كان او انثى على من تجب نفقته؟ ولم قيد ثم الاولاد بالصغار .

(٤) هل تجب النفقة لاحد مع اختلاف الدين؟ وكيف يتصور ان يكون دين الولد الصغير مخالفا لدين ابيه .

كِتَابُ الْعِتَاقِ
কৃতদাস মুক্ত করা পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) নাফাক্বাত তথা খোরপোশ পর্বের পর এতাক তথা কৃতদাস মুক্ত করার পর্ব এ জন্য এনেছেন যে, খোরপোশ-এর দ্বারা যেমন মানুষকে জীবিত করা হয় ঠিক তেমনি কৃতদাস মুক্ত করে তাকে জীবিত করা হয়। কারণ কুফর মৃত্যুর সমতুল্য যেমন কুরআন কারীমে এরশাদ হচ্ছে- (الاية) أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنَاهُ এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরকে মৃত বলেছেন। আর দাসত্ব ইহা কুফরের নিদর্শন, অতএব দাসত্বকে দূর করার মধ্যে এ হিসাবে জীবিত করার অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। -(আত্‌তান্‌ক্বীহুদ্ব দুরারী)

عِتَاقٌ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ عِتَاقٌ ও عِتْقٌ এটা بَابُ ضَرَبَ -এর مَصْدَرٌ অর্থ- শক্তি লাভ করা, দাসত্ব থেকে বের হওয়া।

عِتَاقٌ -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় عِتَاقٌ ঐ শরয়ী শক্তির নাম যা কৃতদাসের লাভ হয়ে থাকে যার কারণে সে শরয়ী কার্যক্রম যেমন- শাহাদাত, ওয়ালায়েত ইত্যাদির ক্ষমতা লাভ করে থাকে।

اِعْتَاقٌ-এর অর্থ ঃ ওপরে আলোচিত শক্তি স্থির হওয়ার নাম হচ্ছে اِعْتَاقٌ কারো কারো মতে اِعْتَاقٌ বলে কৃতদাস থেকে মালিকানা দূরীভূত করাকে।

ইসলামি শরিয়তে দাসদের প্রতি আচরণ ঃ এটা একটি চরম বাস্তবতা দৈনন্দিন ঘটনাবলীর দ্বারা যা প্রতীয়মান হয়েছে যে, মুসলমানদের মধ্যে মালিক ও দাসের সম্পর্ক পাশ্চাত্যের মনিব ও চাকরের সম্পর্কের চেয়ে বহুগুণ উত্তম যারা প্রভাবশালী তারা গরিব লোকদেরকে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। আর এ ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন সেই পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি যারা এ বিষয়ে গর্ববোধ করে যে, আমরা দাস প্রথা উচ্ছেদ করেছি। এতে সন্দেহ নেই যে, দাস নামটি তারা বিলোপ করে দিয়েছে। কিন্তু এর মূল বিষয়টি এখনও চাকর মনিবের সম্পর্কের ক্ষেত্রে তেমনি বিদ্যমান রয়েছে। নামের পরিবর্তনে মূল ব্যাপারটিতে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয় না। প্রাচীন জাতিসমূহের মধ্যে দাসের নামে যে অপমানের দাগ লেগেছিল এবং যে অপমানজনক আচরণ আজও গরিব ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে করা হয়, ইসলাম তাকে দাস নাম হতে সর্বতোভাবে বিদূরিত করে দেয় শুধু শাব্দিক ভাবেই নয় বরং কার্যকরী ভাবেই উহার শিকড় কেটে দেয়। ইসলামের আবির্ভাবে মনিব-চাকর বা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সত্যিকার ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়ে যায়। মনিব তার দাসের পরিশ্রমের কাজে শরিক হতে শুরু করে এবং দাস তার মনিবের প্রভাব ও সম্মানে শরিক হয়ে যায়। এটা শুধু সমাজের মধ্যম ও নিম্ন শ্রেণীর মনিবদের অবস্থাই ছিল না; বরং সর্বোচ্চ সম্মানিত ও সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী শ্রেণীর মনিবদেরও একই অবস্থা ছিল। সর্বাগ্রে আমাদের কুরআনে করীমের শিক্ষার প্রতি চিন্তা করা কর্তব্য যে, কুরআন দাসদের প্রতি কি ধরনের আচরণ দাবি করে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে-

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا -

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তার সাথে কাউকেও শরিক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো এবং আত্মীয়-পরিজন এতিম-মিসকিন আত্মীয় ও অনাত্মীয় সঙ্গী-সাথি অসহায় মুসাফির এবং নিজেদের দাস-দাসীদের প্রতিও যারা তোমাদের অধীনে রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দাম্ভিক ও গর্বিত লোকদেরকে পছন্দ করেন না অর্থাৎ যারা অন্যের অধিকারের পরোয়া করে না এবং তাদের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করে।

এই আয়াতে কারীমায় দু' প্রকারের বিধান একই জায়গায় একত্র করে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত ও তার মাখলুকের প্রতি সদাচরণ। আর দ্বিতীয় প্রকারের মধ্যে যাদের সাথে মানুষের সাথে সদাচরণ করা কর্তব্য তাদের কয়েকজনকে বিশেষ করে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে তাদের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়। এই উভয় বিধান একই জায়গায় বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হলো, যেমনিভাবে আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কোনো শরিক না করা ইসলাম গ্রহণের জন্য জরুরি তেমনি মাখলুকের প্রতি সদাচরণ করাও জরুরি। কেননা এই দু'টি বিষয়ই শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ আল্লাহর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তার মাখলুকের প্রতি সদাচরণ করা। অতএব কুরআন মাজীদে বিষয়টির ওপর এমন গুরুত্ব দিয়েছে যেমন গুরুত্ব দিয়েছে মাতা-পিতার সাথে সদাচরণের বিষয়টির প্রতি। কেননা দু'টি বিধান একই রকম ভাষায় বর্ণনা করা

হয়েছে। দাসদের প্রতি সদাচরণ করার জন্য এটা এত সুস্পষ্ট নির্দেশ যে, ইসলামের কোনো দুশমনও এটা অস্বীকার করতে পারবে না। যেমন 'হ্যালিওন' তার রচিত 'ডিকশনারী অব ইসলাম' গ্রন্থে এই বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি লিখেন এটা অত্যন্ত জোর তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

এতদ্ব্যতীত ইসলাম ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের যে ধারাবাহিকতা সৃষ্টি করেছিল উহাও সদাচরণের জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখেছিল। ইসলামে স্বাধীন স্ত্রীলোক ও দাসের মধ্যে এবং স্বাধীন পুরুষ ও বাঁদির মধ্যে বিবাহ জায়েজ করে দেওয়া হয়েছে একজন স্বাধীন মুশরিক মহিলা ও মুসলমান দাসের মধ্যে বিবাহের বেলায় মুসলমান দাসীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং একজন মুশরিক পুরুষ ও মুসলমান দাসের মধ্যে মুসলমান দাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ছোট ছোট বিষয়েও দাস মুক্ত করার হুকুম দেওয়া হয়েছে এবং তাকে কোনো গুনাহের কাফফারা সাব্যস্ত করে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, দাসের প্রতি সদাচরণ করা এবং তাদেরকে মুক্ত করা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয় কাজ। বাঁদি যদি বিবাহের পর ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তার শাস্তি স্বাধীন স্ত্রীলোকের শাস্তির অর্ধেক রাখা হয়েছে। তাদেরকে বিবাহ করিয়ে দেওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে করীমে এরশাদ হচ্ছে–

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآئِكُمْ اَنْ يَّكُوْنُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ -

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও এবং তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা সৎকর্ম পরায়ণ তাদেরও। তারা যদি নিঃস্ব হয় তবে আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে সচ্ছল করে দেবেন।

ইসলামের পূর্বে আরবে দাস দাসীদের ব্যাপারে যে সকল অপকর্ম প্রচলিত ছিল সেগুলো বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। এই অপকর্মগুলোর একটি ছিল দাসীদের দ্বারা দেহ ব্যবসা করিয়ে আর্থিক ফায়দা লাভ করা। কুরআন মাজীদে বিশেষভাবে তাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ হলো পবিত্র কুরআনের আহকাম। এখানে সর্বাগ্রে যে বিষয়টি দেখতে হবে তা এই যে, এই আহকামগুলোর দ্বারা নবী করীম (সা.) ও তাঁর অনুসারীগণ কি বুঝিয়ে ছিলেন এবং এগুলোর ওপর কিভাবে আমল করেছেন এই উদ্দেশ্য প্রথমে হাদীস শরীফে হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী এবং তার আমল দেখতে হবে। হাদীস শরীফে চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, আমাদের নবী করীম (সা.) দাসদের সাথে সদাচরণ করার প্রতি যে জোর দিয়েছেন এবং নিজেও এই সদাচরণের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেগুলোকে যদি তুলনা করা হয় তাহলে বলতেই হবে যে অন্যকোনো সংস্কারক তার তুলনায় কিছুই করেনি।

এ উদ্দেশ্যে প্রথমেই আমি বুখারী শরীফের কয়েকটি হাদীস বর্ণনা করব। অতঃপর অন্যান্য হাদীসের উদ্ধৃতি দেব। রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন–

اِنَّ اِخْوَانَكُمْ خَدَمُكُمْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ تَحْتَ اَيْدِيْكُمْ فَمَنْ كَانَ اَخُوْهُ تَحْتَ يَدِهٖ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَاْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاِنْ كَلَّفْتُمُوْهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَاَعِيْنُوْهُمْ -

অর্থাৎ তোমাদের ভ্রাতৃবৃন্দ তোমাদের খেদমতগার; আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তির ভাই তার অধীনস্থ হয়ে থাকবে তার উচিত হলো যা নিজে খাবে উহা হতে তাকেও খাওয়াবে। যেরকম পোশাক নিজে পরিধান করবে সে রকম পোশাক তাকেও পরিধান করাবে। তাদের ওপর এমন কোনো দায়িত্বের বোঝা দেওয়া হবে না যা তাদের সামর্থ্যের অধিক হবে। যদি সামর্থ্যের অধিক তাদেরকে কাজ দাও তবে তাদেরকে সহায়তা করবে।

বলুন মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল এমন আর কে পয়দা হয়েছে অথবা এমন কোন সংস্কারক আছেন? যিনি মনিব এবং দাসের মধ্যে এমন পরিপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করেছেন যা শুধু ভাষা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং বাস্তব ক্ষেত্রেও তা কার্যকরী হয়েছে যে, মালিক ও গোলামের একই ধরনের পোশাক হবে, একই রকমের খানা খাবে। শুধু এটাই নয় বরং গোলামদের বাস্তব অবস্থা আরও ঈর্ষণীয় মনে হয়, যখন আমরা প্রিয় হাবীবের এক অন্তরঙ্গ সাহাবী হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)-এর এই প্রিয় বক্তব্য পাঠ করি।

وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْلَا الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ اُمِّىْ لَاَحْبَبْتُ اَنْ اَمُوْتَ وَاَنَا مَمْلُوْكٌ -

অর্থাৎ শপথ সেই পবিত্র সত্তার, যাঁর হাতে আমার জীবন! যদি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ, হজ এবং আমার মায়ের খেদমত না হতো তাহলে আমি পছন্দ করতাম যে, গোলামের অবস্থাতেই আমি মৃত্যুবরণ করি। তারপর দাস দাসীদের প্রতি সদাচরণ শুধু এতটুকুই সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি যে, তাদের দ্বারা কাজ করানো হবে এবং সদাচরণ করা হবে; বরং তাদের উত্তম প্রতিপালনের জন্যও রাসূলে করীম (সা.) বিশেষভাবে এরশাদ করেছেন। দাসীদের সম্পর্কে তিনি এরশাদ করেছেন–

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتْ لَهٗ جَارِيَةٌ فَاَدَّبَهَا فَاَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَاَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهٗ اَجْرَانِ -

অর্থাৎ নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তির নিকট দাসী আছে এবং সে তাকে উঁচু পর্যায়ের সচ্চরিত্রের তরবিয়ত দেবে ও উত্তম শিক্ষা দান করবে অতঃপর তাকে আজাদ করবে ও বিবাহ করবে তার জন্য দু'টি ছওয়াব রয়েছে। এই হাদীসের প্রতি আমি বিশেষভাবে সে সকল সংকীর্ণ দৃষ্টির লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যারা বলে থাকে ইসলাম নারীদেরকে মূর্খ রাখতে চায়। তারা চিন্তা করে দেখুক স্বাধীন নারীদের কথাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না; বরং ইসলাম দাসীদের সম্পর্কেও এই হুকুম দেয় যে এদেরকে উত্তম তা'লীম ও তরবিয়ত দিতে হবে। এই হাদীসের দ্বারা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, দাস-দাসীদেরকে কোন পর্যায় পর্যন্ত উন্নীত করা ইসলামের লক্ষ্য।

এই পর্যায়ে আরও বহু হাদীস রয়েছে যাতে দাস-দাসীদের প্রতি উত্তম ব্যবহার ও আচরণ সম্পর্কে তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে মেশকাত শরীফের কিছু হাদীসের তরজমায় লেন সাহেব তার অনুবাদকৃত আলফে লায়লা গ্রন্থের টীকায় উল্লেখ করেছেন। সেগুলোই 'হ্যালিওন' তার 'ডিকসনারী অব ইসলাম' গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন, তন্মধ্যে কয়েকটির তরজমা নিম্নে প্রদত্ত হলো– নিজেদের দাস-দাসীদেরকে ঐ খানাই খাওয়াবে যা তোমরা খাও এবং ঐ পোশাক পরিধান করাবে যা তোমরা নিজেরা পরিধান করো। তাদেরকে এমন কাজ করতে দেবে না যা তাদের সামর্থ্যের অধিক হয়। যে ব্যক্তি নিজের গোলামকে অযথা মারপিট করে বা তার মুখের ওপর আঘাত করে তার কাফ্ফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেওয়া। যে ব্যক্তি মা এবং সন্তানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ঘটাবে আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাকে তার আপনজন হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবেন।

এ হাদীসসমূহের দ্বারা অত্যন্ত স্পষ্ট ও সুনিশ্চিতভাবে এই কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় যে, ইসলামে কখনও দাসকে দাস মনেই করা হয়নি; বরং তার ওপর অর্পিত কাজের দায়িত্ব ব্যতীত সর্বদিক দিয়ে মালিকের সমানই মনে করা হয়েছে। চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মানবজাতির প্রতি সত্যিকার সহানুভূতিশীল এক মহান ব্যক্তিত্ব এই বিধান জারি করেছেন, শুধু বিধান জারি করেই ক্ষান্ত থাকেননি বরং এগুলোর ওপর নিজে আমল করেছেন এবং অন্যদেরকে আমল করিয়েছেন। কিন্তু আজ চৌদ্দশত বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর মানবতার বড় বড় দাবিদার হওয়া সত্ত্বেও এই বিধানগুলোর ওপর আমল করাতো দূরের কথা কারও মধ্যে এতটুকু নৈতিক সাহসও নেই যে, চাকরদের সম্পর্কে এ ধরনের বিধান দিতে সাহস করবে।

এখানে আমি আরও কিছু হাদীস উল্লেখ করছি যাতে পাঠকগণ অবগত হতে পারেন যে, আমাদের নবী করীম (সা.) দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ সম্পর্কে কি পরিমাণ তাগিদ করেছেন।

এক রেওয়ায়তে বর্ণিত আছে ওফাতের পূর্বে তিনি বলেছিলেন– اَلصَّلٰوةُ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ অর্থাৎ দু'টি বিষয়ের প্রতি তোমরা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখবে একটি হলো নামাজ আর অপরটি হলো দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ। এই হাদীস দ্বারা কত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর অন্তরে মানুষের প্রতি বিশেষ করে ঐ শ্রেণীর প্রতি যাদেরকে দুনিয়ার সকল জাতি নিকৃষ্ট মনে করেছেন এবং আজও নিকৃষ্ট মনে করে তাদের প্রতি কত আবেগ পূর্ণ সহানুভূতি ছিল এবং কী পরিমাণ তাদের কল্যাণের চিন্তা ছিল যে, জীবনের শেষ অবস্থায়ও তার পবিত্র মুখে এ কথাগুলোই বের হয়েছে। একবার এক ব্যক্তি হুযূর (সা.)-এর খেদমতে এসে জিজ্ঞাসা করল, আমি আমার দাস-দাসীদের প্রতি কতবার ক্ষমা প্রদর্শন করব। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং প্রশ্নের কোনো জবাব দিলেন না। সে দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার সম্মুখে এসে একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করল। হুযূর (সা.) তেমনিভাবে মুখকে ফিরিয়ে নিলেন। সে যখন চতুর্থবার প্রশ্ন করল, তখন তিনি বললেন اُعْفُ عَنْ عَبْدِكَ سَبْعِيْنَ مَرَّةً فِىْ كُلِّ يَوْمٍ অর্থাৎ প্রতিদিন তুমি তোমার দাস-দাসীদের প্রতি ৭০ বার ক্ষমা প্রদর্শন করবে। আমার জিজ্ঞাসা আজ যাদেরকে সভ্য বলা হয় সে জাতিসমূহের মধ্যে একজন লোকও কি এমন আছে যে তার চাকরদের প্রতি তাদের ত্রুটি হওয়া সত্ত্বেও সত্তরবার ক্ষমা করতে পারবে? ইসলামে দাস-দাসীদের প্রতি প্রকৃতপক্ষেই এরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। হুযূর (সা.)-এর অন্তর এটাও বরদাশত করতে পারতোনা যে, গোলামদেরকে গোলাম বলে ডাকা হবে। কেননা তাতে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য ফুটে উঠতো। তিনি তাদের প্রতি কোনো প্রকার ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য প্রকাশ করা পছন্দ করতেন না। ইমাম বুখারী (র.) একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– لَايَقُلْ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ وَلْيَقُلْ فَتَاىَ وَفَتَاتِىْ وَغُلَامِىْ অর্থাৎ তোমাদের এভাবে বলা উচিত নয় যে, আমার দাস এবং আমার দাসী; বরং বলবে আমার যুবক আমার যুবতী বা আমার তরুণ। فَتًى শব্দটি প্রত্যেক যুবক পুরুষ ও প্রত্যেক যুবতী মহিলার জন্য ব্যবহার হয়, তেমনি غلام শব্দটির ব্যবহার যুবকের জন্য। আরবি ভাষায় عَبْد এবং اَمَةٌ বলতে এই জন্য নিষেধ করা হয়েছে যে এই শব্দ দু'টি সাধারণত দাস-দাসীদের জন্য ব্যবহার করা হতো যে শব্দগুলো দিয়ে ডাকতে বলা হয়েছে সেগুলোর অর্থ ব্যাপক স্বাধীন পুরুষ এবং মহিলার জন্যও فَتًى এবং غُلَامٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অবশ্য হাদীসে উল্লিখিত শব্দ দ্বারা ডাকা নিষিদ্ধ হওয়ার অন্য ব্যাখ্যাও রয়েছে। অতঃপর আমি আলোচনা করব যে, দাস-দাসী সম্পর্কিত ইসলামের এই বিধান সমূহের ওপর আমলও করা হয়েছিল না কিতাবেই ছিল? যদি আমল করা হয়ে থাকে তবে কি পরিমাণ আমল করা হয়েছে? কিন্তু আমলের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার পূর্বে একটি সন্দেহের অবসান হওয়া জরুরি মনে হচ্ছে। যদি দাস-দাসীদেরকে এত অধিকার দেওয়া হয়ে থাকে এবং এগুলোর সংরক্ষণ করা যদি এত জরুরি হয়ে

থাকে যেমন হাদীসের দ্বারা বুঝা যায়; তাহলে মনিব আর দাসের মধ্যে পার্থক্য কি ছিল? তার জবাব স্বয়ং নবী করীম (সা.)-এর হাদীসেই বিদ্যমান রয়েছে। হাদীসটি সহীহ বুখারী শরীফে উল্লিখিত হয়েছে হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন–

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْاَمِيْرُ الَّذِيْ عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْهُ -

অর্থাৎ তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। সুতরাং যাকে মানুষের ওপর আমীর নিযুক্ত করা হয়েছে তাকে তার অনুসারীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। আর মহিলা তার স্বামীর ঘরের ও সন্তানের বা পরিবারের লোকদের ওপর দায়িত্বশীল তাকে এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর দাস তার মনিবের মালের ওপর দায়িত্বশীল তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

এ হাদীসের দৃষ্টে প্রত্যেকের দায়িত্বে ভিন্ন ভিন্ন কাজ সোপর্দ করা হয়েছে। এক দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি দায়িত্বশীল অন্য দৃষ্টিতে সেই আবার অধীনস্থ। ইসলাম এমন সমতা ও সাম্য শিক্ষা দেয় না যাতে ছোট বড় পার্থক্য উঠে যাবে এবং দুনিয়ার কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাবে; বরং ইসলাম এমন এক ভ্রাতৃত্ব কায়েম করে যাতে প্রত্যেকের কাজই হবে ভিন্ন ভিন্ন এবং সমাজে বড়ও থাকবে ছোটও থাকবে। কিন্তু সাথে সাথেই তাদের মধ্যে মানুষ এবং ভাই হিসাবে এক প্রকার সমতাও থাকবে। কাজ ভিন্ন ভিন্ন নির্ধারিত করার মাধ্যমে ইসলামের পবিত্র শিক্ষার উদ্দেশ্য এই নয় যে, মনিব দাসের কাজকে নিকৃষ্ট মনে করবে এবং তাতে হাতও লাগাবে না। আর মনিবের কাজকে দাসের ইজ্জতের চেয়েও অধিক মনে করা হবে ; বরং এই নির্দেশও রয়েছে যে, প্রয়োজনের সময় মনিব ও দাসের কাজে তাকে সাহায্য করবে এবং মনিব যে সকল সুবিধা ভোগ করবে তা হতে দাসকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। তবে উভয়ের মধ্যে এ পার্থক্য রাখা হয়েছে যে, মনিব তার দাসের প্রতি সদাচরণ ও অনুগ্রহ করবে আর দাসের কর্তব্য হলো সে আন্তরিকভাবে মনিবের আনুগত্য করবে। এভাবে উভয়ের স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন করবে। অন্যান্য সকল বিষয়ে উভয়ই সমান হবে। এখানে আমি এমন কয়েকটি উদাহরণ পেশ করব যদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আমাদের নবী করীম (সা.) কেবল একজন শিক্ষকই ছিলেন না ; বরং প্রতিটি বিষয়ে তিনি স্বয়ং আদর্শ ছিলেন। মূলত এ কারণেই তার শিক্ষা সাহাবায়ে কেরাম ও মুসলমানগণের ওপর এত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল।

হযরত আনাস (রা.) খাদেমদের প্রতি হুযূর (সা.)-এর সদাচরণের ঘটনাবলী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি দীর্ঘ দশ বৎসর হযরত নবী করীম (সা.)-এর খেদমত করেছি, এ সময়ের মধ্যে তিনি আমাকে কখনও উহ্ পর্যন্ত বলেননি। আমি যখন কোনো কাজ করেছি তখনও এরূপ বলেননি যে, এটা তুমি কেন করনি বা কেন করলে? তার ব্যবহার ছিল গোটা বিশ্বের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উত্তম। মুসলিম জননী হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, হযরত নবী করীম (সা.) কখনও কোনো খাদেম বা মহিলাকে প্রহার করেননি।

পরম নবী প্রেমিক নিষ্ঠাবান ভক্তগণও তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতেন। একবারের ঘটনাঃ যুদ্ধ বন্দীদের মধ্যে হতে এক বন্দীকে দাস হিসাবে তিনি এক সাহাবী হযরত আবুল হাইসাম (রা.)-কে দেন এবং দেওয়ার সময় উপদেশ দেন যে, এর সাথে উত্তম ব্যবহার করবে। আবুল হাইসাম (রা.) তাঁর স্ত্রীকে বললেন, হুযূর (সা.) এ দাসটি দিয়েছেন এবং নসিহত করেছেন তার সঙ্গে যেন উত্তম ব্যবহার করি। স্ত্রী বললেন, তাকে মুক্ত করে দেওয়া ব্যতীত আপনি এই নসিহতের ওপর কি করে পরিপূর্ণ আমল করতে পারবেন? সুতরাং হযরত আবুল হাইসাম (রা.) তৎক্ষণাৎ সেই দাসকে মুক্ত করে দিলেন। খানবা নামক জনৈক ব্যক্তি তার এক গোলামকে এক বাঁদির সংস্রবে দেখতে পেয়ে তার নাক কেটে দেয়। গোলাম নবী করীম (সা.)-এর দরবারে উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। কে তোমার এই অবস্থা করেছে? গোলাম বলল খানবা। তৎক্ষণাৎ খানবাকে তলব করা হলো। খানবা এসে কৈফিয়ত হিসাবে সে যা দেখেছিল তা বর্ণনা করল। হুযূর (সা.) গোলামকে বললেন, যাও তুমি মুক্ত। গোলাম বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমাকে কার মাওলা বলা হবে? তিনি বললেন, তুমি আল্লাহ তা'আলার ও তাঁর রাসূলের আজাদকৃত। সুতরাং এই ওয়াদা মতো যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, তার সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকেন। তার মৃত্যুর পর হযরত আবূ বকর (রা.)-এর নিকট হাজির হয়ে তার বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়। তাতে হযরত আবূ বকর (রা.) তার এবং তার পরিবার-পরিজনের জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দেন। হযরত আবূ বকর (রা.)-এর ইন্তেকালের পর সে হযরত ওমর (রা.)-এর নিকট হাজির হয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যেতে আগ্রহী? আরজ করল, আমি মিসর যেতে চাই। তাতে হযরত ওমর (রা.) মিসরের শাসন কর্তার নামে এই মর্মে নির্দেশ লিখে দিলেন যে, তার জীবিকা নির্বাহের জন্য জমি বরাদ্দ করে দেওয়া হোক। সুবহানাল্লাহ! কেমন পবিত্র অঙ্গীকার ছিল। আর কেমন পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততার সাথে উহা পূরণ করা হয়েছে। হযরত আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) বলেন, একবার আমি আমার গোলামকে প্রহার করছিলাম হঠাৎ শুনতে পেলাম

কে যেন আমার পিছন হতে বলছেন, আবূ মাসউদ স্মরণ রেখো ক্ষমতাবান শাসক আল্লাহ তা'আলা তোমার ওপর রয়েছেন। আবূ মাসউদ (রা.) বললেন, আমি পিছনে ফিরে দেখলাম স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই মুহূর্তে তাকে আল্লাহর ওয়াস্তে আজাদ করে দিলাম। হুযূর (সা.) বললেন, তুমি যদি তাকে আজাদ না করতে তাহলে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে– তিনি একবার দেখলেন যে, এক ব্যক্তি বাহনের ওপর আরোহণ করে যাচ্ছে এবং গোলাম তার সাথে দৌড়ে পথ চলছে। তিনি আরোহীকে বললেন, তাকে তোমার পিছনে বসিয়ে নাও। কেননা সে তোমার ভাই। তার আত্মাও তোমার আত্মার মতো।

মা'রুর (রা.) বলেন, আমি হযরত আবূ যর (রা.)-কে দেখলাম, তিনি একটি নতুন উত্তম পোশাক পরিধান করেছেন। আমার জিজ্ঞাসার জবাবে তিনি বললেন, একবার আমি এক ব্যক্তিকে কিছু মন্দ কথা বলেছিলাম। সে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তিনি আমাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি তার মাকে তুলে তাকে লজ্জা দিয়েছ। অতঃপর বললেন, তোমাদের দাস-দাসী ও চাকর-বাকর তোমাদের ভাই। অতএব তোমার ভাই তাঁর অধীনস্থ হবে সে যেন নিজের খানা হতে তাকে খাওয়ায় এবং নিজের পোশাকের মতোই তাকে পোশাক পরিধান করায়। তোমরা দাস-দাসীদেরকে এমন কাজ দিও না যেন তা তার সামর্থ্যের বাইরে হবে। আর যদি দিতেও হয় তবে তার সাথে সাথে তুমিও সাহায্য করবে।

হযরত ওসমান (রা.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, অবাধ্যতার কারণে তিনি একবার এক গোলামের কানকে মলে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি তার এই কাজে লজ্জিত হয়ে তওবা করলেন এবং সে গোলামকে বললেন, আমি যেভাবে তোমার কানকে মলে দিয়েছিলাম তুমিও সেভাবে আমার কানকে মলে দাও। গোলাম উহা করতে অস্বীকার করে কিন্তু তাকে অনুরোধ করে বাধ্য করেন। অতঃপর সে আস্তে আস্তে কানকে মলতে শুরু করলে তিনি বললেন, আরো জোরে মলে দাও। কেননা কেয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি বরদাস্ত করতে পারব না। গোলাম বলল, হে আমার মনিব আপনি যে দিনটিকে ভয় করছেন আমিও সে দিনটিকে ভয় করছি। হযরত জয়নুল আবদীন (র.) সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, একবার তার এক গোলাম ভেড়া ধরতে গিয়ে তার পা ভেঙ্গে দেয়। তিনি গোলামকে জিজ্ঞাসা করলেন। তুমি এরূপ করলে কেন? গোলাম বলল, আমি আপনাকে রাগান্বিত করার জন্য এরূপ করেছি। তিনি বললেন, যে তোমাকে এটা শিক্ষা দিয়েছে আমি তাকে রাগান্বিত করব অর্থাৎ শয়তানকে। যাও আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাকে আমি আজাদ করে দিলাম।

ইসলামি রাষ্ট্রে দাস ও আজাদকৃত দাসদেরকে বড় বড় পদ দেওয়া হতো। প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত জায়েদের পুত্র উসামাকে স্বয়ং নবী করীম (সা.) একটি সৈন্য বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। এই বাহিনী রওয়ানা হওয়ার পূর্বেই নবী করীম (সা.) ইন্তেকাল করেন। কেউ কেউ হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, আপনি উসামার পরিবর্তে কোনো মর্যাদাশীল ব্যক্তিকে অধিনায়ক নিযুক্ত করুন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.) এতে খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, যে কাজ আমার হাবীব ও মনিব (সা.) করে গিয়েছেন আমি তা পরিবর্তন করে দেব? সেনাবাহিনী রওয়ানা হওয়ার সময় হলে তিনি উসামার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছিলেন। আর উসামা ছিলেন সওয়ারির ওপর। উসামা বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের খলীফা! হয় আপনি সওয়ারির ওপর আরোহণ করুন অথবা আমাকে হেঁটে যাওয়ার অনুমতি দিন। কিন্তু হযরত আবূ বকর (রা.) তার কথায় কর্ণপাত না করে উপদেশ দিতে দিতে কিছুক্ষণ এভাবেই তার সাথে হেঁটে গেলেন।

হযরত ওমর (রা.) যখন মিসর জয়ের পরিকল্পনা করেন তখন প্রথমে সন্ধির পয়গাম দিয়ে মিসরের শাসনকর্তার নিকট প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। হযরত ওবায়দা (রা.) এই প্রতিনিধি দলের নেতা নিযুক্ত হন। তিনি একজন হাবশী ছিলেন এবং তখন হাবশীদের গোলাম হিসাবে বেচাকেনা হতো। প্রতিনিধি দল মিসর অধিপতির নিকট পৌঁছলে সে বলল, এই হাবশীকে এখান হতে বের করে দাও। প্রতিনিধিরা বললেন, ইনিইতো আমাদের নেতা ইনি যা বলবেন বা করবেন আমরা তা মানতে বাধ্য। মিসর অধিপতি মুকাওকিম আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা একটি হাবশীকে কি করে নিজেদের নেতা নিযুক্ত করেছ? তাঁরা বললেন, আমাদের নেতৃত্ব জাতীয়তা ও বর্ণের ওপর নয় ; বরং যোগ্যতা ও মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে আমাদের নেতৃত্ব স্থির হয়। আর ইনি আমাদের মধ্যে যোগ্য ও মর্যাদাশীল। তাই ইনিই আমাদের নেতা। স্বীয় দাস-দাসীদের প্রতি হযরত ওমর (রা.)-এর ন্যায় পরাক্রমশালী শাসকের যে আচরণ ছিল উহা সুস্পষ্ট করে দেয় যে, ইসলামের প্রাথমিক সমাজ জীবনে দাস-দাসীদের কি মর্যাদা ছিল। সাহাবায়ে কেরাম কিভাবে তাদের প্রিয় নবীর পবিত্র মুখ নিঃসৃত প্রতিটি শব্দের ওপর আমল করতেন। হযরত আবূ উবায়দা কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দাস অবরোধের পর শহরের বাসিন্দারা অতিষ্ট হয়ে এই মর্মে মুসলমানদের নিকট শহর হস্তান্তর করার অঙ্গীকার করে যে, স্বয়ং হযরত ওমর (রা.) এসে সন্ধির শর্ত স্থির করবেন। হযরত

আবূ ওবায়দা (রা.) বিষয়টি জানিয়ে আমীরুল মু'মিনীনের নিকট পত্র লিখলে তিনি অনতি বিলম্বে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তার সফর সঙ্গী হিসাবে একজন গোলাম ছিল কিন্তু বাহনের জন্য উট ছিল মাত্র একটি। তাই খলীফা ও গোলাম পালাক্রমে উটের ওপর আরোহণ করতেন। যার আরোহণের পালা থাকতো না তাকে উটের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে যেতে হতো। এভাবে পথ অতিক্রম করে তারা যখন আবূ উবায়দার শিবিরের নিকটবর্তী হলেন তখন ঘটনাক্রমে উটের ওপর আরোহণের পালা ছিল গোলামের। হযরত ওমর (রা.) উটের পৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে গোলামকে উটের ওপর সওয়ার করে দিলেন এবং নিজে উহার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হেঁটে চললেন। এদিকে সমাগত দর্শকদের উৎসুক দৃষ্টি তার আগমনের অপেক্ষা করছিল। হযরত আবূ উবায়দা (রা.) মনে মনে এই বিষয়ে ভয় করছিলেন যে, আমীরুল মু'মিনীনকে এভাবে পদব্রজে চলতে দেখে বায়তুল মোকাদ্দাসের অধিবাসীদের ওপর কোনো খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় কিনা? এবং খোদা না করুন যুদ্ধের মোড় না পাল্টে যায়। তাই তিনি আবেদন করলেন যে, লোক আপনাকে দেখার জন্য উৎসুক হয়ে আছে। এমতাবস্থায় এটা ঠিক নয় যে, আপনার গোলাম সওয়ারির ওপর থাকবে আর আপনি ভৃত্যের ন্যায় তার সাথে হেঁটে যাবেন। এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) রাগে রাগান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তোমার পূর্বে আমাকে এমন কথা কেউ বলেনি। আমরা সকল মানুষের চেয়ে অধিক নিকৃষ্ট, ঘৃণ্য ও নীচু ছিলাম। আল্লাহ তা'আলা ইসলামের মাধ্যমে আমাদেরকে মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন। ইসলাম আমাদের যে পথ দেখিয়েছে যদি আমরা সে পথ হতে বিচ্যুত হয়ে অন্য পথে সম্মান অন্বেষণ করি। তাহলে আল্লাহ তা'আলা আবার আমাদেরকে ঘৃণ্য ও নিকৃষ্ট করে দেবেন।

হযরত ওমর (রা.)-এর কথার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছে যে, দাস- দাসীদেরকে তোমাদের সমপর্যায়ে রাখো এবং এতেই তোমাদের ইজ্জত মনে করো। আমরা যদি এই সাম্যের মধ্যে নিজেদের জিল্লতি মনে করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পথ হতে বিচ্যুত হওয়ার কারণে তিনি আবারও আমাদেরকে নিকৃষ্ট করে দেবেন।

আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আজও এই পৃথিবীতে এমন কোনো বিজয়ী আছে কিংবা ক্ষুদ্র কোনো রাষ্ট্রের শাসনকর্তা এমন আছে কিংবা বড় কোনো পদে আসীন এমন কোনো ব্যক্তি আছে কি? যে এমন নৈতিক চরিত্রের দুঃসাহস দেখাতে পারে, যা হযরত ওমর (রা.) দেখিয়েছেন। অথবা উত্তম ব্যবহারের এমন দৃষ্টান্ত দেখাতে পারবে, যা ইসলামের এক মহান শাসক দেখিয়েছেন? একটি নব বিজিত দেশের ওপর রাষ্ট্রপ্রধানের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত রাখা কতখানি জরুরি উহা কি হযরত ওমর (রা.) অবগত ছিলেন না? নিশ্চয়ই তা তিনি ভালভাবেই বুঝতেন; বরং এ সকল বিষয় তিনি এত বেশি বুঝতেন যে, আর কেউ এরূপ বুঝতো না। কিন্তু ইসলামি আহকামের সত্যিকার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর অন্তরে ছিল। তিনি দৃঢ়চিত্তে বিশ্বাস করতেন, সকল ইজ্জত ও সম্মান, প্রভাব ও প্রতিপত্তি ইসলামের নির্দেশিত চির সুন্দর পথেই এসে পদচুম্বন করবে। পরবর্তী কালের মুসলমানরা যখন দাস-দাসী ও চাকর চাকরানীদের সাথে ইসলামি সাম্যের ব্যবহার ও আচরণ পরিত্যাগ করেছে, তখন হযরত ওমর (রা.)-এর সেই আশঙ্কাই বাস্তবরূপ লাভ করেছে। তারা ইসলামের পথ বর্জন করে ভিন্ন পথে সম্মান অন্বেষণ করেছেন। সুতরাং তাদের অসম্মান ও লাঞ্ছনাই পেয়েছে। আজও যে সকল মুসলমান ইসলামের পথ ও রীতি-পদ্ধতিকে তুচ্ছ জ্ঞানে পরিহার করে অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর অনুসরণের মাধ্যমে পৃথিবীতে সম্মানের আসন পেতে চায়, তাদের এই কথাটি ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত।

সোনালী যুগের পরবর্তী মুসলমানগণ যদিও আমলের ভ্রান্তিতে পড়ে গিয়েছে এবং কালের বিবর্তনে নবী করীম (সা.)-এর শিক্ষার ওপর কার্যকর ভূমিকা পালন হতে বহুদূরে ছিটকে পড়েছে, তা সত্ত্বেও এই বিষয়টি লক্ষণীয় যে, তাঁর পবিত্র শিক্ষা তাদের রক্তের কণায় কণায় এমনভাবে মিশে গেছে বা কথাটি এভাবে বলুন যে, তাঁর কুদসী শক্তি এমনভাবে তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, এতদ্‌সত্ত্বেও দাস-দাসী ও চাকর কর্মচারীদের প্রতি মুসলমানদের ব্যবহার অন্যান্য জাতিসমূহের আচার-ব্যবহার হতে বহুগুণে উত্তম রয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞ যে, এ জন্য আমাদের প্রমাণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, স্বয়ং খৃষ্টানগণই এটা স্বীকার করে নিয়েছে। প্রখ্যাত খ্রিস্টান লেখক লেন সাহেব যিনি দীর্ঘদিন মিসরে অবস্থান করেছেন এবং মুসলমানদের অবস্থা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তিনি 'আলফে লায়লা' নামক গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের টীকায় লিখেছেন, "মুসলমানদের মধ্যে দাস-দাসীদের প্রতি সাধারণত সদাচরণ করা হয়।"

অন্যান্য দেশ সম্পর্কে তিনি লিখেন, "যে সকল পর্যটক অন্যান্য ইসলামি দেশসমূহ ভ্রমণ করেছেন, দাস-দাসীদের প্রতি মুসলমানদের আচার ব্যবহার সম্পর্কে তাদের সাক্ষ্য খুবই সন্তোষজনক।" অতঃপর লিখেন, "পবিত্র কুরআন ও হাদীসে

দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ করার যতগুলো নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মুসলমানগণ সাধারণত এ সবগুলোর ওপর বা এটার অধিকাংশের ওপর আমল করেন।" এটাতে বুঝা যায়, দাস-দাসীদের প্রতি সদাচরণ সম্পর্কিত ইসলামি শিক্ষা খ্রিস্টানদের "তোমার একটি গালে চড় মারলে অপর গালটি আগায়ে দাও" এই শিক্ষার মতো নয় যে, প্রশংসা করতে করতে হাজার হাজার পৃষ্ঠার সাদা কাগজ কালো করে ফেলবে; কিন্তু বাস্তব দুনিয়ায় যখন সন্ধানী দৃষ্টি ফেলবে, তখন পৃথিবীর কোথাও এটার একটি বাস্তব দৃষ্টান্তও দৃষ্টিগোচর হবে না।

এটা হলো একজন অসাম্প্রদায়িক খ্রিস্টানের ভাষ্য। কিন্তু খ্রিস্টান ধর্মযাজক হ্যালিওনকেও এ বিষয়টি স্বীকার করতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেন, "মুসলিম দেশসমূহে দাস-দাসীদের প্রতি ব্যবহার, আমেরিকায় যে ব্যবহার করা হয় তার তুলনায় বহু উত্তম। যেখানে খ্রিস্টান জাতিসমূহ হতে দাস প্রথা নির্বাসিত।" তদ্রূপ 'এনসাই ক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা'য় এক খ্রিস্টান নিবন্ধকার মুসলমানদের মধ্যে দাস প্রথার প্রচলন সম্পর্কে লিখেন, "প্রাচ্যের ইসলামি দেশসমূহের গোলামী সাধারণত ক্ষেত মজদুরের ন্যায় কাজ করার মতো গোলামী নয়; বরং তার সম্পর্ক বাড়ির কাজ কর্মের সাথে। গোলামকে পরিবারের একজন সদস্য মনে করা হয়। তার সঙ্গে ভালবাসা ও নম্রতাপূর্ণ ব্যবহার করা হয়। পবিত্র কুরআন দাস-দাসীদের প্রতি বিনম্র ও দয়ার্দ্র আচরণ করার প্রেরণা উদ্দীপ্ত করে এবং দাস-দাসী মুক্ত করার উৎসাহ দেয়।" ইসলামে শিক্ষা ও সুনিশ্চিত বাস্তব ঘটনাবলী পেশ করার পর আমি নিরপেক্ষ পাঠকবর্গের নিকট জিজ্ঞেস করি যে, দাসপ্রথা ইসলাম বিলুপ্ত করে দেয়নি, একে কি দাসত্ব বলা যায়? উহা কি সেই দাসত্ব যা দুনিয়ার মানুষ উহার সাধারণ বোধগম্য অর্থের দ্বারা বুঝে থাকে? কখনও নয়; বরং বর্তমানের চাকুরির অবস্থা দৃষ্টে আমি মনে করি, এই সময়ে যারা খাদেম বা চাকর নামে পদবীযুক্ত তারা একজন ইসলামি দাসের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করবে এবং এই খাদেমের অবস্থা হতে সেই গোলামের অবস্থাকে বহুগুণ উত্তম মনে করবে। দাসত্বের সাধারণ বোধগম্য অর্থের দৃষ্টিতে তো এটা বলাও ঠিক হবে না যে, কোন এক পর্যায় পর্যন্ত ইসলাম দাসত্বের অনুমতি দিয়েছে। কেননা দাসত্বের দ্বারা যত প্রকার অকল্যাণ দৃষ্ট হতো, ইসলামের শিক্ষা সেই সব অকল্যাণের শিকড় কেটে দিয়েছে। যে ব্যক্তি তার মনিবের সমান মর্যাদার অধিকারী, তাকে দাস বলা হবে কেন? এই সাম্য এবং পরিবারের সদস্যের ন্যায় হওয়া শুধু মুখের কথাই ছিল না; বরং বাস্তবেও তাই ছিল। মনিব যা খাবে দাসও তাই খাবে, মালিক যে পোশাক পরিধান করবে গোলামও তাই পরিধান করবে, মালিক যে জায়গায় থাকবে গোলামও সেই রকম জাগায় থাকবে এবং গোলামের সামর্থ্যের অধিক কাজ না দেওয়ায় তার সাথে কখনও কর্কশ ভাষায় কথা না বলা এবং তাকে প্রহার না করা প্রভৃতি বিষয়ের মাধ্যমে দাসের প্রতি ইসলামি সাম্য ও তার পারিবারিক সদস্যের মর্যাদার বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। এর অধিক আর কি সংস্কার দুনিয়ার মানুষ প্রত্যাশা করতে পারতো? এ যুগের মানুষ চটকদার শব্দের পূজারী। সার বস্তুর পরিবর্তে আবরণের চাকচিক্যের সে বেশি খুশি। নামে তো দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আফ্‌সোস! দুনিয়ার সভ্য জাতিগুলোর মাঝে আজও দাসত্বের হাকীকত তেমনি বিদ্যমান।

সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন বিশ্ববাসী উপলব্ধি করবে, চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে মানবতার এক পরম সহানুভূতিশীল, আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়তর ব্যক্তিত্ব খাদেমগণের প্রতি যে বিনম্র ও সদাচরণের শিক্ষা দিয়েছেন, যতদিন পর্যন্ত উহার যথাযথ অনুসরণ না করা হবে, বাস্তব ক্ষেত্রে উহার সেই কাঙ্ক্ষিত সংস্কার সাধিত হবে না, যা বিশ্বের নৈতিক উন্নতির জন্য একান্ত জরুরি। বস্তুত ইসলামের শিক্ষাই এমন বাস্তবমুখী শিক্ষা যার ওপর বিশ্ব চলতে পারে এবং যদ্দারা মানুষ মানুষের জন্য হিতৈষী ও মহান আল্লাহ তা'আলার যথার্থ বান্দা হতে পারে।

اَلْعِتْقُ يَقَعُ مِنَ الْحُرِّ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ فِىْ مِلْكِهٖ فَاِذَا قَالَ لِعَبْدِهٖ وَاَمَتِهٖ اَنْتَ حُرٌّ اَوْ مُعْتَقٌ اَوْعَتِيْقٌ اَوْ مُحَرَّرٌ اَوْ حَرَّرْتُكَ اَوْ اَعْتَقْتُكَ فَقَدْ عُتِقَ نَوَى الْمَوْلٰى الْعِتْقَ اَوْ لَمْ يَنْوِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ স্বাধীনতা সংঘটিত হয়ে যায় প্রাপ্ত বয়স্ক, জ্ঞানী, স্বাধীন ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার অধিকারের মধ্যে। সুতরাং যদি স্বীয় গোলাম বা বাঁদিকে বলে যে, তুমি স্বাধীন অথবা স্বাধীনকৃত বা আমি তোমাকে স্বাধীন করে দিলাম তবে সে স্বাধীন হয়ে যাবে, মনিব স্বাধীনতার নিয়ত (ইচ্ছা) করুক বা না করুক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দাস-দাসী প্রথার ইসলামি দর্শন ঃ

قَوْلُهُ اَلْعِتْقُ الخ ঃ প্রকৃত সত্য হলো এই যে, মানব সভ্যতা উহার পর্যায়ক্রমিক উন্নতিতে এমন পর্যায় অতিক্রম করেছে যার প্রেক্ষাপটে দাস প্রথার প্রচলন শুধু সঠিকই ছিল না; বরং অত্যন্ত জরুরি ছিল। পৃথিবীতে এখনও এমন প্রথা প্রচলিত আছে যেগুলো চিন্তা করলে মনে এক ভয়ঙ্কর ভীতির সৃষ্টি হয়, তবুও সামগ্রিক উন্নতির লক্ষ্যে এগুলো প্রচলিত থাকা জরুরি। একজন বিজয়ী সেনাধ্যক্ষ যখন বড় বড় জাহাজ ভর্তি হাজার হাজার বাছা বাছা সাহসী যুবককে ডুবিয়ে দিয়ে নিমিষে সমুদ্রের তলদেশে পৌঁছে দেয় বা একটি বড় শহরে গোলা নিক্ষেপ করে অসংখ্য নিরাপরাধ নারী শিশুকে ধ্বংস করে দেয়, তখন তার চোখে কখনও এক ফোটা অশ্রু আসে না; কিন্তু তাই বলে সর্বাবস্থায় এই অজ্ঞতা প্রসূত কথা বলা ঠিক হবে না যে, সে একজন কঠিন হৃদয় জালেম বা নির্দয় লোক। যে ব্যক্তি নিজের দয়ার্দ্রতার কারণে একজন মানুষের হত্যাকেও সহ্য করতে পারে না এবং এ ধরনের ঘটনা শ্রবণ করে কেঁপে উঠে সেই ব্যক্তিই অন্য অবস্থায় হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে বা তার চোখের সম্মুখে হত্যা হতে দেখে কখনও একটুও বিচলিত হয় না; বরং কোনো কোনো সময় আনন্দিত হয়। যুদ্ধবিগ্রহ মানব সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল আজও একই অবস্থা বিরাজ করছে। মানুষের প্রাচীন ইতিহাস অধ্যয়ন করলে বুঝা যাবে, মানব সভ্যতার সুচনালগ্নে যুদ্ধবিগ্রহের অনিবার্য ফল হিসাবেই দাস প্রথার উদ্ভব ঘটেছিল। বরং প্রকৃতপক্ষে দাস প্রথা মানব সভ্যতার এক তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায় ছিল। কেননা এই প্রথার উদ্ভবের সঙ্গে সেই নির্দয় পাষণ্ডতায় যুদ্ধে হস্তগত ভিন্ন জাতির সকল বন্দীকে হত্যা করা হতো। একজন নিরপেক্ষ খ্রিস্টান লেখকের ভাষায়–

কিন্তু এ কথাটি লোকেরা এখনও পুর্ণরূপে বুঝেনি যে, বিগত সভ্যতার উন্নতিতে যুদ্ধ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। প্রথমত এই দৃষ্টিতে যে, যুদ্ধের আসল লক্ষ্য ছিল যাতে বিক্ষিপ্ত জাতিগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়। এ জন্য এটা জরুরি ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীদের মধ্যে যারা বন্দী হয়ে আসবে তাদেরকে অধীনস্থ অবস্থায় রাখা হবে, যাতে পুনরায় এই জাতির মাথা চাড়া দিয়ে উঠার শক্তি না থাকে এবং এভাবেই যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

দ্বিতীয়ত এই দৃষ্টিতে যে, স্বীকৃত বিষয় হলো মানব সভ্যতার প্রথম দিকে মেহনত ও পরিশ্রমের কাজ হতে মানুষ গা বাঁচিয়ে চলতো। সাধারণত আরাম প্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই এক জাতির লোক যখন তার বিরোধী লোকদের নিকট এসে অবস্থান করবে এমতাবস্থায় কোনো বাধ্যবাধকতা ব্যতীত তারা কখনই কাজ করবে না। এ জন্য তাদেরকে দাস বানিয়ে কাজ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। এই দ্বিতীয় বিষয়টি সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে দুনিয়ার কোনো জাতিই স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে কোনো পরিশ্রমের কাজ গ্রহণ করেনি; বরং আমাদের জানা মতে প্রত্যেক দেশে একই অবস্থা দেখা যায় সবলেরা দুর্বলদেরকে বাধ্য করেই কাজে লাগিয়েছে। তাদের নিকট হতে কঠোর পরিশ্রমের কাজ আদায় করেছে। অতঃপর দীর্ঘদিন এই বাধ্যবাধকতা চলে আসার পর এ কাজ সে জাতির অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। প্রথম বিষয়টি সম্পর্কে বলা যায় স্বাধীন মানুষ আবশ্যিকভাবে পেশাগত যোদ্ধা ছিল এবং দাসগণ মেহনতের কাজ করতো। এই উভয় প্রকারের লোক পরস্পরের সহযোগী ছিল। একের অস্তিত্ব অপরের জন্য নির্ভরতা সুবিধাভোগ ও স্ব-স্ব কাজে নিয়োজিত থাকার জন্য একান্ত অপরিহার্য ছিল। এভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ঝগড়া-বিবাদ ব্যতীত উভয়ে একে অপরের সহযোগী হিসাবে মানব সভ্যতার উন্নতির মাধ্যম হয়েছিল।

وَكَذٰلِكَ اِذَا قَالَ رَاْسُكَ حُرٌّ اَوْ رَقَبَتُكَ اَوْبَدَنُكَ اَوْقَالَ لِاَمَتِهٖ فَرْجُكِ حُرٌّ وَاِنْ قَالَ لَامِلْكَ لِيْ عَلَيْكِ وَنَوٰى بِذٰلِكَ الْحُرِّيَّةَ عَتَقَ وَاِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يُعْتَقْ وَكَذٰلِكَ جَمِيْعُ كِنَايَاتِ الْعِتْقِ وَاِنْ قَالَ لَاسُلْطَانَ لِيْ عَلَيْكَ وَنَوٰى بِهِ الْعِتْقَ لَمْ يُعْتَقْ وَاِذَا قَالَ هٰذَا اِبْنِيْ وَثَبَتَ عَلٰى ذٰلِكَ اَوْ قَالَ هٰذَا مَوْلَايَ اَوْيَا مَوْلَايَ عَتَقَ وَاِنْ قَالَ يَااِبْنِيْ اَوْ يَا اَخِيْ لَمْ يُعْتَقْ وَاِنْ قَالَ لِغُلَامٍ لَايُوْلَدُ مِثْلُهٗ لِمِثْلِهٖ هٰذَا اِبْنِيْ عُتِقَ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَهُمَا لَايُعْتَقُ وَاِنْ قَالَ لِاَمَتِهٖ اَنْتِ طَالِقٌ وَنَوٰى بِهِ الْحُرِّيَّةَ لَمْ تَعْتِقْ وَاِنْ قَالَ لِعَبْدِهٖ اَنْتَ مِثْلُ الْحُرِّ لَمْ يَعْتِقْ وَاِنْ قَالَ مَا اَنْتَ اِلَّا حُرٌّ عُتِقَ عَلَيْهِ وَاِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عَنْهُ عُتِقَ عَلَيْهِ وَاِذَا اَعْتَقَ الْمَوْلٰى بَعْضَ عَبْدِهٖ عُتِقَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ الْبَعْضُ وَيَسْعٰى فِيْ بَقِيَّةِ قِيْمَتِهٖ لِمَوْلَاهُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا يَعْتِقُ كُلُّهٗ وَاِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَاَعْتَقَ اَحَدُهُمَا نَصِيْبَهٗ عَتَقَ فَاِنْ كَانَ مُوْسِرًا فَشَرِيْكُهٗ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَعْتَقَ وَاِنْ شَاءَ ضَمِنَ شَرِيْكَهٗ قِيْمَةَ نَصِيْبِهٖ وَاِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْعَبْدَ وَاِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ مُعْسِرًا فَالشَّرِيْكُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَعْتَقَ نَصِيْبَهٗ وَاِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْعَبْدَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ ঐ রকম ভাবে (আজাদ হয়ে যাবে) যদি মনিব বলে যে, তোমার মাথা অথবা তোমার ঘাড় অথবা তোমার শরীর অথবা নিজের বাঁদিকে বলে যে তোমার লজ্জাস্থান আজাদ এবং যদি বলে তোমার ওপর আমার মালিকা নেই এবং তা দ্বারা আজাদীর নিয়ত করল তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি নিয়ত না করে আজাদ হবে না ঐ রকমভাবে ইতকের সকল ইঙ্গিতশীল শব্দ (দ্বারা যদি আজাদির নিয়ত করে আজাদ হয়ে যাবে আর যদি নিয়ত না করে আজাদ হবে না) এবং যদি (কোনো গোলামকে) বলা হয় যে, তোমার ওপর আমার বড়ত্ব নেই এবং তা দ্বারা আজাদির নিয়ত করল আজাদ হবে না এবং যদি বলল যে, এ আমার ছেলে এবং তার ওপর অটল রইল অথবা বলল যে, এ আমার মনিব অথবা বলল– হে আমার মনিব তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি বলে, হে আমার ছেলে অথবা হে আমার ভাই তবে আজাদ হবে না। আর যদি এরকম গোলামের ব্যাপারে বলে যে, গোলাম তার থেকে জন্মগ্রহণ করতে পারে না যে এ আমার ছেলে তবে ইমাম সাহেব (র.)-এর নিকট আজাদ হয়ে যাবে, আর সাহেবাইন-এর নিকট আজাদ হবে না। আর যদি নিজের বাঁদিকে বলে যে, তোমাকে তালাক আর তা দ্বারা আজাদির নিয়ত করে আজাদ হবে না। আর যদি নিজের গোলামকে বলে যে, তুমি আজাদ ব্যক্তির মতো তবে আজাদ হবে না। আর যদি বলে যে, তুমি আজাদ ব্যতীত অন্য কিছু নও তবে আজাদ হয়ে যাবে। যখন মানুষ স্বীয় জী রেহেমে মুহরিমের মালিক হয়ে যায় তবে সে আজাদ (স্বাধীন) হয়ে যাবে। আর যখন মনিব নিজের গোলামের কিছু অংশ আজাদ করে তাহলে এ অংশ আজাদ হয়ে যাবে এবং ইমাম আজম (র.)-এর মতে বাকি মূল্যের মধ্যে মনিবের জন্য রোজগার করবে, আর সাহেবাইন (র.) বলেন, যে পুরোটাই স্বাধীন হয়ে যাবে। আর যখন গোলাম দুই শরিকের হয় এবং তার মধ্যে একব্যক্তি নিজের অংশ আজাদ করে দেয় তবে আজাদ হয়ে যাবে। যদি আজাদকারী সম্পদশালী হয় তখন তার শরিকের জন্য ইচ্ছা যদি চায় আজাদ করে দেবে যদি চায় নিজের শরিক থেকে নিজের অংশের মূল্যের জরিমানা নিয়ে নিবে আর যদি চায় গোলাম থেকে প্রচেষ্টা করিয়ে নেবে। আর যদি আজাদকারী গরিব হয় তখন তার শরিকের ইচ্ছা যদি চায় আজাদ করে দেবে; যদি চায় নিজের গোলাম থেকে প্রচেষ্টা করিয়ে নেবে।

وَهٰذَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ لَهُ اِلَّا الضِّمَانُ مَعَ الْيَسَارِ وَالسِّعَايَةُ مَعَ الْاَعْسَارِ وَاِذَا اشْتَرٰى رَجُلَانِ اِبْنَ اَحَدِهِمَا عَتَقَ نَصِيْبُ الْاَبِ وَلَاضِمَانَ عَلَيْهِ وَكَذٰلِكَ اِذَا اَوْرَثَاهُ وَالشَّرِيْكُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَعْتَقَ نَصِيْبَهُ وَاِنْ شَاءَ اِسْتَسْعَى الْعَبْدُ وَاِذَا شَهِدَ كُلٌّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ عَلَى الْاٰخَرِ بِالْحُرِّيَّةِ سَعَى الْعَبْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فِىْ نَصِيْبِهِ مُوْسَرَيْنِ كَانَا اَوْمُعْسِرَيْنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا اِذَا كَانَا مُوْسِرَيْنِ فَلَا سِعَايَةَ وَاِنْ كَانَا مُعْسِرَيْنِ سَعٰى لَهُمَا وَاِنْ كَانَ اَحَدُهُمَا مُوْسِرًا وَالْاٰخَرُ مُعْسِرًا سَعٰى لِلْمُوْسِرِ وَلَمْ يَسْعَ لِلْمُعْسِرِ وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ لِوَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ لِلشَّيْطَانِ اَوْ لِلصَّنَمِ عَتَقَ وَعِتْقُ الْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَاقِعٌ وَاِذَا اَضَافَ الْعِتْقَ اِلٰى مِلْكٍ اَوْشَرْطٍ صَحَّ كَمَا يَصِحُّ فِى الطَّلَاقِ وَاِذَا خَرَجَ عَبْدُ الْحَرْبِىِّ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ اِلَيْنَا مُسْلِمًا عَتَقَ وَاِذَا اَعْتَقَ جَارِيَةً حَامِلًا عَتَقَتْ.

সরল অনুবাদ ঃ এটা ইমাম সাহেব (র.)-এর নিকট। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মোহাম্মদ (র.) এর নিকটে তার শরিকের জন্য আজাদকারী ধনী হওয়ার অবস্থায় জরিমানা। আর গরিব হওয়া অবস্থায় প্রচেষ্টা ব্যতীত অন্যকোনো জিনিস নয়। আর যদি দুই ব্যক্তি নিজের মধ্য থেকে কারো ছেলেকে কিনে নেয় তাহলে বাপের অংশ আজাদ হয়ে যাবে এবং তার ওপর কোনো জরিমানা ওয়াজিব হবে না। অনুরূপ যদি সে তার ওয়ারিশ হয় এবং শরিকের জন্য ইচ্ছা হবে চাই তার অংশ আজাদ করে দিক চাই গোলাম থেকে প্রচেষ্টা করিয়ে নেবে। আর যদি দু'জন শরিক থেকে প্রত্যেকেই দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপর আজাদির সাক্ষী দিল তাহলে গোলাম তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য তার অংশের মধ্যে প্রচেষ্টা করবে। চাই তারা সম্পদশালী হোক অথবা সম্পদহীন হোক। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, যদি তারা সম্পদশালী হয় তাহলে প্রচেষ্টা করবে না আর যদি অর্থহীন হয় তাহলে উভয়ের জন্য প্রচেষ্টা করবে। আর যদি একজন সম্পদশালী এবং দ্বিতীয়জন অর্থহীন তাহলে সম্পদশালী ব্যক্তির জন্য প্রচেষ্ট করবে আর অর্থহীনের জন্য করবে না। আর যে ব্যক্তি তার নিজ গোলাম আল্লাহ তা'আলার জন্য অথবা শয়তান অথবা মূর্তির জন্য আজাদ করে তাহলে আজাদ হয়ে যাবে। মুকরাহ এবং নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির আজাদ করার দ্বারা আজাদ হয়ে যাবে। আর যখন আজাদিকে মিলক অর্থাৎ সম্পত্তি অথবা শর্তের দিকে সম্পর্ক করে তাহলে এটা সহীহ হবে। আর যখন কোনো হরবী গোলাম দারুল হরব থেকে মুসলমান হয়ে আমাদের দিকে বেরিয়ে আসে তাহলে সে আজাদ হবে এবং যখন কোনো ব্যক্তি গর্ভবতী বাঁদিকে আজাদ করে দেয় তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে।

وَعَتَقَ حَمْلُهَا وَاِنْ اَعْتَقَ الْحَمْلَ خَاصَّةً عَتَقَ وَلَمْ تَعْتِقِ الْاُمُّ وَاِذَا اَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلٰى مَالٍ فَقَبِلَ الْعَبْدُ ذٰلِكَ عَتَقَ وَلَزِمَهُ الْمَالُ وَلَوْ قَالَ اِنْ اَدَّيْتَ اِلَىَّ اَلْفًا فَاَنْتَ حُرٌّ صَحَّ وَلَزِمَهُ الْمَالُ وَصَارَ مَاذُوْنًا فَاِنْ اَحْضَرَ الْمَالَ اَجْبَرَ الْحَاكِمُ الْمَوْلٰى عَلٰى قَبْضِهِ وَعَتَقَ الْعَبْدُ وَ وَلَدُ الْاَمَةِ مِنْ مَوْلاَهَا حُرٌّ وَ وَلَدُهَا مِنْ زَوْجِهَا مَمْلُوْكٌ لِسَيِّدِهَا وَ وَلَدُ الْحُرَّةِ مِنَ الْعَبْدِ حُرٌّ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং তার গর্ভও আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি খাস করে হামলকে আজাদ করে তাহলে সে আজাদ হয়ে যাবে কিন্তু মা আজাদ হবে না। এবং যখন নিজ গোলামকে মালের বদলায় আজাদ করে এবং গোলাম তাকে কবুল করে নেয় তাহলে আজাদ হয়ে যাবে এবং তার জন্য মাল কর্তব্য হবে। আর যদি বলে যে, যদি তুমি আমাকে এক হাজার দিয়ে দাও তাহলে তুমি আজাদ তাহলে এটা সহীহ হবে এবং মাল দেওয়া কর্তব্য হবে এবং সে অনুমতিকৃত হয়ে যাবে। অতঃপর যদি সে মাল পেশ করে দেয় তাহলে হাকিম সাহেব মাওলাকে মাল নেওয়ার ওপর বাধ্য করবেন এবং গোলাম আজাদ হয়ে যাবে এবং বাঁদির যে সন্তান মাওলা থেকে সেটা আজাদ হয়ে যাবে এবং তার যে সন্তান স্বামী থেকে সে তার মাওলার গোলাম হবে এবং আজাদ মহিলার যে সন্তান গোলাম থেকে হয় সে আজাদ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَعَتَقَ حَمْلُهَا الخ ঃ অর্থাৎ যখন ছয় মাসের কমের মধ্যে জন্ম হয়। কেননা এ কথার সময় হামলের অস্তিত্বের নিশ্চিতভাবে বিদ্যমান। যদি ছয় মাসের বেশি মুদ্দতে সন্তান প্রসব হয় তাহলে আজাদ হবে না। কেননা হতে পারে যে, এ কথার পর গর্ভবতী হয়েছে। সুতরাং সন্দেহের কারণে আজাদ হবে না। হাঁ, যদি বাঁদি স্বামীর ইদ্দতের মধ্যে হয় এবং দুই বৎসরের মধ্যে জন্ম হয় তাহলে সেই সন্তান আজাদ হয়ে যাবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) اكتب مناسبة كتاب العتاق مع كتاب النفقات - و ما معنى العتاق لغة وشرعا و ممن يقع ويصح العتق ؟

(٢) اكتب الجمل التى يصح بها الاعتاق و هل يحتاج فى الاعتاق نية العتق ام لا ؟

(٣) هل يصح الاعتاق من كنايات العتق ؟ اذا قال المولى لعبده "هذا ابنى وثبت على ذالك" هل يصح الاعتاق بهذه الجملة ام كيف تقولون؟ اوضح المقام مع بيان اختلاف الائمة الكرام ؟

(٤) "اذا ملك الرجل ذا رحم محرم عنه" ماذا حكمه ؟ اذا عتق المولى بعض عبده ، ما الاختلاف بين ائمتنا فى حكم هذه المسئلة بين بيانا شافيا -

بَابُ التَّدْبِيْرِ

কৃতদাসকে মোদাব্বার করা অধ্যায়

যোগসূত্র : গ্রন্থকার (র.) তদবীর কৃতদাসকে মোদাব্বার করা অধ্যায়কে এতাক পর্বের পর এজন্য এনেছেন যে, এতাকের মধ্যে কৃতদাসকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা হয় আর তদবীরের মধ্যে কৃতদাস মুক্ত হওয়ার অধিকার মাত্র লাভ করে বাস্তবে মুক্ত হয় না মনিব মৃত্যুবরণ করার পর সে মুক্ত হয়।

تَدْبِيْر -এর আভিধানিক অর্থ : تَدْبِيْر -এর আভিধানিক অর্থ-কোনো কাজের আঞ্জামের ওপর চিন্তা-ভাবনা করা, বিচার-বিবেচনা, অভিসন্ধি, উপায় প্রতিকার, পরিচালন, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, স্বভাব।

تَدْبِيْر -এর পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় تَدْبِيْر বলা হয় গোলামের স্বাধীনতাকে সাধারণত স্বীয় মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করা। যেমন মনিব স্বীয় গোলামকে বলা, "যখন আমি মারা যাই তুমি স্বাধীন" তখন ঐ গোলাম মোদাব্বার হয়ে গেছে।

مُدَبَّر -এর বিধান : আহনাফ ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে মোদাব্বারকে বিক্রয় করা, হেবা করা, কাউকে মালিক বানানো জায়েজ নেই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে প্রয়োজনের সময় বিক্রয় ইত্যাদি জায়েজ আছে। কেননা এক আনসারী ঋণগ্রস্ত-এর গোলামকে রাসূলুল্লাহ (সা.) নুআইম ইবনে আব্দুল্লাহ-এর নিকট আটশত দিরহামে বিক্রি করে এরশাদ করে ছিলেন যে, স্বীয় ঋণ এই মূল্য থেকে পরিশোধ করো, অথচ ঐ গোলামটি মোদাব্বার ছিল। আমাদের আহনাফের প্রমাণ হলো নবী করীম (সা.)-এর বাণী যে, মোদাব্বার বিক্রয় করা যাবে না, হেবা করা যাবে না এবং সে তৃতীয়াংশ মাল থেকে স্বাধীন, অর্থাৎ মৃত মনিবের তৃতীয়াংশ মাল থেকে। তাদের হাদীসের উত্তর এই যে, উহা ইসলামের প্রথম যুগের বিধান বা উহাকে إِجَارَةُ مَنَافِعِ অথবা مُدَبَّرْمُقَيَّدْ-এর ওপর مَحْمُولْ করা হবে।

إِذَا قَالَ الْمَوْلٰى لِمَمْلُوْكِهٖ إِذَا مِتُّ فَاَنْتَ حُرٌّ اَوْ اَنْتَ حُرٌّ عَنْ دُبُرٍ مِنِّىْ اَوْ اَنْتَ مُدَبَّرًا وَقَدْ دَبَّرْتُكَ فَقَدْ صَارَ مُدَبَّرًا لَا يَجُوْزُ بَيْعُهٗ وَلَاهِبَتُهٗ وَلِلْمَوْلٰى اَنْ يَّسْتَخْدِمَهٗ وَيُوَاجِرُهٗ وَاِنْ كَانَتْ اَمَةً فَلَهٗ اَنْ يَطَأَهَا وَلَهٗ اَنْ يُّزَوِّجَهَا وَاِذَا مَاتَ الْمَوْلٰى عَتَقَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهٖ اِنْ خَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ مَالٌ غَيْرُهٗ يَسْعٰى فِىْ ثُلُثَىْ قِيْمَتِهٖ ـ

সরল অনুবাদ : যখন মনিব নিজের গোলামকে বলে যে, যখন আমি মরে যাব তুমি আজাদ অথবা আমার পরে তুমি আজাদ অথবা তুমি মোদাব্বার অথবা আমি তোমাকে মোদাব্বার করে দিলাম তখন সে মোদাব্বার হয়ে যাবে। এখন তাকে ক্রয় বিক্রয় এবং দান করা এবং কারো মালিক বানিয়ে দেওয়া জায়েজ নেই। হ্যাঁ, মনিব তার থেকে সেবা গ্রহণ করতে পারবে এবং তার শ্রমের মূল্য দিতে পারবে। আর যদি বাঁদি হয় তাহলে তার সাথে সহবাস করতে পারবে এবং অন্যের নিকট বিবাহ দিতে পারবে। পরে যখন মনিব মরে যাবে মোদাব্বার আজাদ হয়ে যাবে তার তৃতীয়াংশ মাল থেকে যদি সে তৃতীয়াংশ মাল থেকে বের হতে পারে। যদি মোদাব্বার ছাড়া মনিবের আর কোনো মাল না থাকে, তবে স্বীয় মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশের মধ্যে পরিশ্রম করবে।

فَاِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلٰى دَيْنٌ يَسْتَغْرِقُ قِيْمَتَهٗ يَسْعٰى فِىْ جَمِيْعِ قِيْمَتِهٖ لِغُرَمَائِهٖ وَوَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ فَاِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيْرَ بِمَوْتِهٖ عَلٰى صِفَةٍ مِثْلُ اَنْ يَقُوْلَ اِنْ مِتُّ مِنْ مَرْضِىْ هٰذَا اَوْ فِىْ سَفَرِىْ هٰذَا اَوْ مِنْ مَرَضٍ كَذَا فَلَيْسَ بِمُدَبَّرٍ وَيَجُوْزُ بَيْعُهٗ فَاِنْ مَاتَ الْمَوْلٰى عَلَى الصِّفَةِ الَّتِىْ ذَكَرَهَا عَتَقَ كَمَا يَعْتِقُ الْمُدَبَّرُ۔

সরল অনুবাদ ঃ যদি মনিবের জিম্মায় এতটুকু পরিমাণ ঋণ হয় যা মোদাব্বার-এর মূল্যকে গ্রাস করে ফেলে তবে পূর্ণ মূল্যের মধ্যে পাওনাদারদের জন্য পরিশ্রম করবে। এবং মোদাব্বারা (মহিলা)-এর বাচ্চাও মোদাব্বার হবে। অতএব যদি মোদাব্বার করাকে মনিব কোনো গুণের ওপর স্বীয় মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত করে। (যদি তদবীরকে মনিব নিজের মৃত্যুর কোনো গুণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়) যেমন- যদি এটা বলে যে, আমি যদি আমার এই অসুস্থতার মধ্যে অথবা এই সফরের মধ্যে অথবা অমুক অসুস্থতার মধ্যে মরে যাই তবে সে মোদাব্বের হবে না। সুতরাং তার ক্রয়-বিক্রয় জায়েজ হবে পরে। যদি মনিব উল্লিখিত গুণের ওপর মরে গেলে তাহলে আজাদ হয়ে যাবে যেমন মোদাব্বার আজাদ হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُدَبَّرْمُقَيَّدْ -এর বিধান ঃ

قَوْلُهٗ فَاِنْ عَلَّقَ التَّدْبِيْرَ الخ ঃ এটা مُدَبَّرْ مُقَيَّدْ-এর বিধান, যার আজাদ হওয়া শুধু মৃত্যুর শর্তের ওপর নয়, বরং মৃত্যুর সাথে কোনো অতিরিক্ত গুণ উল্লেখ করা যাবে। যেমন এই রোগ বা এই সফর। আর مُدَبَّرْ مُقَيَّدْ-এর মধ্যে মালিকানা লেনদেন যেমন- বিক্রয় করা, হেবা করা ইত্যাদি সব বৈধ। কেননা مُدَبَّرْ مُقَيَّدْ -কে দেওয়া সময়ের মধ্যে মনিবের মৃত্যু নিশ্চিত নয়; হাঁ সাধারণভাবে মৃত্যু হওয়া এটা নিশ্চিত। অতএব مُدَبَّرْ مُقَيَّدْ ও مُدَبَّرْ مُطْلَقْ উভয়টির বিধানে পার্থক্য স্পষ্ট।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) اكتب مناسبة باب التدبير مع كتاب العتاق ثم بين معنى التدبير لغة واصطلاحا وهات احكام المدبرمع بيان اختلاف الائمة الكرام والدلائل؟

(٣) هات الحمل التى يكون بها المملوك مدبرا هل يجوز بيع المدبر وهبته ؟ واستخدام المدبروالاجارة جائز ام الا؟

(٤) وطى المدبرة وتزويجها جائز ام لا؟ ماذا حكم المدبر اذا مات المولى بين مفصلا؟ ثم بين حكم ولد المدبرة؟

بَابُ الْاِسْتِيلَادِ

ইস্তীলাদ অধ্যায়

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) ইস্তীলাদ অধ্যায়কে তদবীর অধ্যায়ের পর এ জন্য এনেছেন যে, তদবীর ও ইস্তীলাদ উভয়টির মধ্যেই কৃতদাস-দাসী মুক্ত হওয়ার অধিকার লাভ করে। বাস্তবে তারা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয় না ; বরং মনিব মারা যাওয়ার পর সম্পূর্ণভাবে তারা মুক্ত হয়ে যায়। -(আত্‌তানক্বী-হুদ্দারুরী)

اِسْتِيلَادْ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ اِسْتِيلَادْ-এর আভিধানিক অর্থ- সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করা। চাই স্ত্রী থেকে হোক বা দাসী থেকে।

اِسْتِيلَادْ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় اِسْتِيلَادْ বলা হয় দাসীর থেকে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা করাকে অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থ শুধু দাসীর সাথে খাস।

اِذَا وَلَدَتِ الْاَمَةُ مِنْ مَوْلَاهَا فَقَدْ صَارَتْ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَا يَجُوْزُ لَهُ بَيْعُهَا وَلَا تَمْلِيْكُهَا وَلَهُ وَطْئُهَا وَاسْتِخْدَامُهَا وَاِجَارَتُهَا وَتَزْوِيْجُهَا وَلَا يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا اِلَّا اَنْ يَّعْتَرِفَ بِهِ الْمَوْلٰى فَاِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذٰلِكَ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ بِغَيْرِ اِقْرَارٍ فَاِنْ نَفَاهُ اِنْتَفٰى بِقَوْلِهِ وَاِنْ زَوَّجَهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ فِيْ حُكْمِ اُمِّهِ وَاِذَا مَاتَ الْمَوْلٰى عَتَقَتْ مِنْ جَمِيْعِ الْمَالِ وَلَا يَلْزَمُهَا السِّعَايَةُ لِلْغُرَمَاءِ اِنْ كَانَ عَلَى الْمَوْلٰى دَيْنٌ۔

সরল অনুবাদ ঃ যখন বাঁদি তার মনিব থেকে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে তখন বাঁদি মনিবের ام ولد হয়ে যাবে। সুতরাং এখন তার ক্রয় বিক্রয় করা, তাকে মালিক বানিয়ে দেওয়া জায়েজ নেই। তার সাথে সহবাস করা, খেদমত নেওয়া, প্রতিদান দেওয়া এবং তাকে বিবাহ করা জায়েজ আছে। এবং তার সন্তানের বংশ ছাবেত হবে না ; কিন্তু যখন মনিব তা স্বীকার করে এরপর যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তখন তার বংশ মনিবের থেকে ছাবেত হবে মনিবের স্বীকার ব্যতীত। আর যদি তা অস্বীকার করে তাহলে মনিবের থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে না। আর যদি মনিব তাকে বিবাহ করিয়ে দেয়, পরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তখন ঐ বাঁদি মায়ের হুকুমে হয়ে যাবে। এবং যখন মনিব মরে যায় তখন বাঁদি সমস্ত মালের থেকে আজাদ হয়ে যাবে এবং সে পাওনাদারদের জন্য পরিশ্রম করবে না যদি মনিবের জিম্মায় ঋণ থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِذَا وَلَدَتْ الخ ঃ যখন মনিবের বীর্য দ্বারা বাঁদির সন্তান হয়ে যায় তখন ঐ বাঁদি মনিবের (উম্মে ওয়ালাদ) হয়ে যাবে। এখন তাকে ক্রয় বিক্রয় করা, কাউকে তার মালিক বানিয়ে দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা হুযূর (সা.) উম্মাহাতে আওলাদের ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন। আরও কারণ হযরত ওমর (রা.) বলেছেন যে, যে বাঁদির নিজের মনিবের থেকে সন্তান হয় তখন ঐ বাঁদির মনিবে তাকে ক্রয় করতে পারবে না এবং কাউকে দান করতে পারবে না। হাঁ, সারা জীবন তার থেকে উপকৃত হতে পারবে।

قَوْلُهُ بِغَيْرِ اِقْرَارٍ الخ ঃ উম্মে ওয়ালাদ-এর স্বীকার করার দ্বারা পুনরায় দ্বিতীয় সন্তানের স্বীকারের দরকার নেই, এই দ্বিতীয় সন্তানের বংশও মনিবের থেকে সাব্যস্ত হবে, হাঁ প্রথম সন্তানের বংশ মনিবের স্বীকারের ওপর মুলতবি থাকবে, এটা আমাদের আহনাফের মত; কিন্তু আইম্মায়ে ছালাছাহ (র.) বলেন, শুধু মনিব সঙ্গমের স্বীকার করলেই বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে, সন্তানের স্বীকারের প্রয়োজন নেই। কারণ শুধু বিবাহ বন্ধনের দ্বারা যেহেতু বংশ সাব্যস্ত হয় তাই সঙ্গমের স্বীকারের দ্বারা আরো উত্তমরূপে বংশ সাব্যস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদের প্রমাণ এই যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) স্বীয় বাঁদির সাথে সহবাস করতেন (এতে) বাঁদি গর্ভবতী হলে তিনি বললেন, এটা আমার নয়, কারণ সহবাসের দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিল শুধু কামভাব পূরণ করা, সন্তান লাভ উদ্দেশ্য ছিল না। -(ত্বাহাবী শরীফ)

وَإِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ أَمَةَ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَلَكَهَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِذَا وَطِئَ الْأَبُ جَارِيَةَ اِبْنِهِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ قِيْمَتُهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ عَقْرُهَا وَلَاقِيْمَةُ وَلَدِهَا وَإِنْ وَطِئَ أَبُ الْأَبِ مَعَ بَقَاءِ الْأَبِ لَمْ يَثْبُتْ النَّسَبُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْأَبُ مَيْتًا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنَ الْجَدِّ كَمَا يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنَ الْأَبِ وَإِنْ كَانَتِ الْجَارِيَةُ بَيْنَ شَرِيْكَيْنِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ اَحَدُهُمَا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَصَارَتْ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَعَلَيْهِ نِصْفُ عَقْرِهَا وَنِصْفُ قِيْمَتِهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ قِيْمَةِ وَلَدِهَا فَإِنِ ادَّعَيَاهُ مَعًا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُمَا وَكَانَتِ الْأَمَةُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُمَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ الْعَقْرِ تَقَاصًّا بِمَا لِ لَهُ عَلَى الْآخَرِ وَ يَرِثُ الْاِبْنُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِيْرَاثَ اِبْنٍ كَامِلٍ وَهُمَا يَرِثَانِ مِنْهُ مِيْرَاثَ أَبٍ وَاحِدٍ وَإِذَا وَطِئَ الْمَوْلٰى جَارِيَةً مُكَاتَبَهُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ فَإِنْ صَدَّقَهُ الْمُكَاتِبُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ عَلَيْهِ عَقْرُهَا وَقِيْمَةُ وَلَدِهَا وَلَاتَصِيْرُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ كَذَّبَهُ الْمُكَاتَبُ فِي النَّسَبِ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُهُ مِنْهُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি কোনো ব্যক্তি অন্যের বাঁদির সাথে বিবাহের দ্বারা সহবাস করল এবং তার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো পরে স্বামী তার মালিক হলো তখন ঐ বাঁদি স্বামীর উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে। আর যখন পিতা নিজের ছেলের বাঁদির সাথে সহবাস করল ফলে তার থেকে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলো আর পিতা ঐ সন্তানের দাবি করল তখন পিতা থেকে বংশ সাবেত হয়ে যাবে এবং বান্দি পিতার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং পিতার ওপর ঐ বাদির মূল্য ওয়াজিব হবে এবং পিতার ওপর বাঁদির মোহর ওয়াজিব হবে না। আর তার সন্তানের মূল্যও ওয়াজিব হবে না। আর যদি পিতা থাকা অবস্থায় দাদা সহবাস করল তখন ঐ দাদার থেকে সন্তানের বংশ সাব্যস্ত হবে না। আর যদি পিতা মরে যায় তবে দাদার থেকে বংশ সাবেত হবে যেমন বাপের থেকে সাবেত হয়। আর যদি বাঁদি দুই শীরকের মধ্যে বিভক্ত হয় পরে ঐ বাঁদি সন্তান প্রসব করল এবং তাদের মধ্য হতে একজন নিজের সন্তান বলে দাবি করল এবং ঐ বাঁদি দাবিকারীর উম্মে ওলাদ হয়ে যাবে এবং তার ওপর অর্ধেক মোহর এবং অর্ধেক মূল্য ওয়াজিব হবে এবং তার সন্তানের কোনো মূল্য ওয়াজিব হবে না।

আর যদি উভয় ব্যক্তি দাবি করে তাহলে উভয় এর থেকে বংশ সাব্যস্ত হবে। আর বাঁদি উভয় ব্যক্তির উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং উহাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের ওপর অর্ধেক মোহর ওয়াজিব হবে, এবং ঐ উভয় জনেই নিজ নিজ হক পরস্পর আর বাচ্চা উহাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের উত্তরাধিকার হবে পূর্ণ এক পুত্রের মিরাসের এবং ঐ দু'জন ঐ বাচ্চার উত্তরাধিকার হবে এক পিতার মিরাসের সমান। যখন মনিব নিজের মুকাতাব বাঁদির সাথে সহবাস করে অতঃপর ঐ বাঁদির সন্তান হলো এবং মনিব ঐ সন্তানের দাবি করল। এখন যদি মুকাতাব তার দাবির সমর্থন করে তখন তার থেকে বংশ সাবেত হয়ে যাবে এবং মনিবের ওপরে তার মোহর এবং সন্তানের মূল্য ওয়াজিব হবে এবং বাঁদি তার উম্মে ওয়ালাদ হবে না। আর যদি মুকাতাব তার বংশ সমর্থন না করে তখন তার থেকে তার বংশ সাব্যস্ত হবেনা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلَهُ ثُمَّ مَلَكَهَا : এ ক্ষেত্রে উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার কারণ এটা যে, উভয় অবস্থায় সন্তানের বংশ তার থেকে স্থাপিত হলে উম্মে ওয়ালাদ হওয়াও সাবেত হয়ে যাবে।

قَوْلَهُ لَيْسَ عَلَيْهِ عَقْرُهَا : আকর অর্থ মোহরে মিছিল। আর মুহীত নামক গ্রন্থে আছে যে, যদি জেনা হালাল হতো তাহলে যেই পরিমাণ মালের দ্বারা মহিলাকে সহবাসের জন্য ভাড়া নেওয়া যেতো ঐ পরিমাণ মাল হলো عَقْر (আকর)।

قَوْلَهُ وَلَاقِيْمَةَ وَلَدِهَا : কারণ আলোচ্য অবস্থায় এখন বাঁদি পিতার দিকে স্থানান্তরিত হবে, অতএব (এখন) পিতা তার মালিক হয়ে গেছে। আর গর্ভধারণ তারই অধিকার ও মালিকানায় হয়েছে।

قَوْلَهُ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ الخ : ঐ অবস্থায় যে তার উম্মে ওয়ালাদ হওয়ার দাবি করেছে তার থেকে বাচ্চার বংশ সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর বাঁদি তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে যাবে এবং দাবিকারীর ওপর দাসীর অর্ধেক মূল্য এবং অর্ধেক মোহরে মিছিল ওয়াজিব হবে এবং বাচ্চার মূল্য ওয়াজিব হবে না। কারণ ক্ষতিপূরণ গর্ভধারণের দিনের প্রেক্ষিতে ওয়াজিব। আর বাচ্চা গর্ভ ধারণের সময় হতে বংশ হিসাবে স্থিরীকৃত। অতএব বাচ্চার আবির্ভাব ও জন্ম দাবিকারীর মালিকানায় হলো, শরিকের মালিকানায় নয়। আর যদি উভয় শরিক দাবিকারী হয় তবে বংশ উভয় থেকে সাব্যস্ত হয়ে যাবে এবং বাঁদি উভয়ের উম্মে ওয়ালাদ সাব্যস্ত হবে। আর উভয়ের ওপর অর্ধেক مَهْرمِثْل ওয়াজিব হবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) مامعنى الاستيلاد لغة وشرعا - متى تكون الامة ام ولد؟ بين مناسبة باب الاستيلاد مع باب التدبير

(٢) هل يجوز للمولى بيع ام ولد وتمليكها؟ بين حكم وطى ام ولد واستخدامها واجارتها و تزويجها ؟

(٣) متى يثبت نسب ولد ام ولد؟ "اذا وطئ الاب جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه" اوضح المسئلة مع بيان حكمها؟ مامعنى العقر؟

(٤) ان كانت الجارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه احدهمابين المسئلة مع بيان حكمها بيانا شافيا؟ اذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد اوضح المسئله مع بيان حكمهاايضاحا كاملا -

كِتَابُ الْمُكَاتَبِ

মুকাতাব পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) মুকাতাব-এর বিধানাবলীকে উম্মে ওয়ালাদ-এর বিধানাবলীর পর এ জন্য এনেছেন যে, উভয়টির মধ্যেই মুক্ত হওয়ার অধিকার লাভ করা হয় মূলত মুক্ত হয় না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় যে, মুকাতাব পর্বকে গ্রন্থকার (র.) এ'তাক পর্বের পর আনার কারণ কি? এর উত্তর এই যে, কেতাবত বলা হয় যার জন্য ওয়ালা হয় আর ওয়ালা হচ্ছে এ'তাক-এর বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত। অতএব মুকাতাব পর্বকে এ'তাক পর্বের পর আনাই বেশি উপযোগী।

كِتَابَةٌ ও مُكَاتَبٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ كِتَابَةٌ এটা كَافٌ -এর كَسْرَةٌ ও فَتْحَةٌ -এর সাথে بَابُ نَصَرَ -এর مَصْدَرٌ অর্থ-জমা করা, كِتَابٌ -কে كِتَابٌ এ জন্যই বলা হয় কেননা كِتَابٌ এটা بَابٌ ও فَصْلٌ সমূহকে জমাকারী হয়ে থাকে।

مُكَاتَبٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় مُكَاتَبٌ ঐ ক্রীতদাসকে বলা হয় যাকে মনিব উপার্জন করে টাকা পরিশোধ করার শর্তে মুক্তি নির্ধারণ করেন।

وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلٰى عَبْدَهٗ اَوْ اَمَتَهٗ عَلٰى مَالٍ شَرَطَ عَلَيْهِ وَقَبِلَ الْعَبْدُ ذٰلِكَ صَارَ مُكَاتَبًا وَيَجُوْزُ اَنْ يَّشْتَرِطَ الْمَالَ حَالًا وَيَجُوْزُ مُؤَجَّلًا وَمُنَجَّمًا وَتَجُوْزُ كِتَابَةُ الْعَبْدِ الصَّغِيْرِ اِذَا كَانَ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ وَاِذَا صَحَّتِ الْكِتَابَةُ خَرَجَ الْمُكَاتَبُ عَنْ يَدِ الْمَوْلٰى وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِلْكِهٖ فَيَجُوْزُ لَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ وَالسَّفَرُ وَلَايَجُوْزُ لَهُ التَّزَوُّجُ اِلَّا اَنْ يَأْذَنَ لَهُ الْمَوْلٰى -

---

সরল অনুবাদ ঃ যখন মাওলা তার গোলাম অথবা বাঁদিকে কোনো সম্পদের ওপর মুকাতাব করে যার শর্ত সে করেছিল এবং গোলাম তাকে কবুল করে নেয় তাহলে সে মুকাতাব হয়ে যাবে, এবং মালকে সাথে সাথেই দেওয়ার জন্য শর্ত করা জায়েজ আছে। এবং এটাও জায়েজ আছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের পরে শর্ত করবে অথবা কিস্তিতে দেওয়ার (শর্ত করবে)। আর অল্প বয়সী গোলাম যখন সে ক্রয়-বিক্রয় বুঝে তাকে মুকাতাব করা জায়েজ আছে। অতঃপর যখন কেতাবত সহীহ হয়ে যায় তখন মুকাতাব মাওলার অধীনে থাকবে না বের হয়ে যাবে এবং মাওলার মিলকিয়ত থেকে বের হবে না, আর তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় ও সফর করা জায়েজ হবে, তবে মাওলার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করা জায়েজ নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ الخ ঃ প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا কেননা এ আয়াতটি মুতলাক অর্থাৎ ব্যাপক।

قَوْلُهٗ يَجُوْزُ لَهُ الْبَيْعُ الخ ঃ কেননা কেতাবতের কারণ হচ্ছে যে, গোলাম তাসাররুফ হিসেবে আজাদ হয়ে যায়, আর এটা ঐ সময়ই হতে পারে যখন সে স্বতন্ত্র ভাবে এমন তাসাররুফের মালিক হয় যার দ্বারা সে বদলে কেতাবত আদায় করে আজাদ হতে পারে। এবং ক্রয়-বিক্রয় ও সফর এ জাতীয়ই।

قَالَ وَلَايَجُوْزُ لَهُ التَّزَوُّجُ الخ ঃ মুকাতাবের জন্য মাওলার অনুমতি ব্যতীত বিবাহ করা জায়েজ নেই। কেননা তার জন্য ঐ সমস্ত জিনিসের অনুমতি আছে যে গুলো তার উদ্দেশ্য অর্থাৎ আজাদ হওয়ার জন্য সহায়ক হয়। আর বিবাহ করে সে মোহর আদায় করা ও খরচ ইত্যাদির মধ্যে ব্যস্ততার মধ্যে পড়ে যাবে। অনুরূপ হেবা অর্থাৎ দান করা এবং সদকা করা এবং কারো জিম্মাদার হওয়াও জায়েজ হবে না। কেননা এগুলো সব দান-খয়রাত-এর অন্তর্ভুক্ত যার উপযুক্ত সে নয়।

وَلَايَهَبُ وَلَايَتَصَدَّقُ اِلَّا بِالشَّيْءِ الْيَسِيْرِ وَلَايَتَكَفَّلُ فَاِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ اَمَةٍ لَهُ دَخَلَ فِيْ كِتَابَتِهٖ وَكَانَ حُكْمُهٗ مِثْلُ حُكْمِ اَبِيْهِ وَكَسْبُهٗ لَهٗ فَاِنْ زَوَّجَ الْمَوْلٰى عَبْدَهٗ مِنْ اَمَتِهٖ ثُمَّ كَاتَبَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدًا دَخَلَ فِيْ كِتَابَتِهَا وَكَانَ كَسْبُهٗ لَهَا وَاِنْ وَطِئَ الْمَوْلٰى مُكَاتَبَتَهٗ لَزِمَهُ الْعُقْرُ وَاِنْ جَنٰى عَلَيْهَا اَوْعَلٰى وَلَدِهَا لَزِمَتْهُ الْجِنَايَةُ وَاِنْ اَتْلَفَ مَالًا لَهَا غَرِمَهٗ وَاِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ اَبَاهُ اَوْ اِبْنَهٗ دَخَلَ فِيْ كِتَابَتِهٖ وَاِنِ اشْتَرٰى اُمَّ وَلَدِهٖ مَعَ وَلَدِهَا دَخَلَ وَلَدُهَا فِي الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَجُزْلَهٗ بَيْعُهَا وَاِنِ اشْتَرٰى ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَاوْلَادٍ لَهٗ لَمْ يَدْخُلْ فِيْ كِتَابَتِهٖ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ نَجْمٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ فِيْ حَالِهٖ فَاِنْ كَانَ لَهٗ دَيْنٌ يَقْضِيْهِ اَوْمَالٌ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ لَمْ يُعَجِّلْ بِتَعْجِيْزِهٖ وَانْتَظَرَ عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ اَوِ الثَّلٰثَةِ ـ .

সরল অনুবাদ ঃ এবং সে অল্প সামান্য কিছু ছাড়া দানও করতে পারবে না সদকাও করতে পারবে না এবং সে কারো জিম্মাদারও হতে পারবেনা। সুতরাং যদি তার বাঁদির বাচ্চা হয় তাহলে সে কেতাবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে আর তার হুকুম পিতার হুকুমের ন্যায় হবে। আর তার সম্পদ উপর্জিত মুকাতাবের হবে। অতঃপর যদি মাওলা তার গেলামের বিবাহ তার বাঁদির সাথে করিয়ে দেয় এরপর উভয়কে মুকাতাব করে দেয় এবং তাতে বাঁদির বাচ্চা জন্ম হয় তাহলে সে বাচ্চা তার কেতাবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে আর তার উপার্জিত সম্পদ মায়ের জন্য হবে। আর যদি মাওলা তার মুকাতাব বাঁদির সাথে সঙ্গম করে তাহলে তার মোহর লাযেম হবে। আর যদি তার ওপর অথবা তার বাচ্চার ওপর জেনায়েত করল তাহলে তার জরিমানা লাযেম হবে। আর যদি তার মাল ধবংস করল তাহলে ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যখন মুকাতাব তার পিতা অথবা ছেলেকে ক্রয় করে তাহলে সেও তার কেতাবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তার উম্মে ওয়ালাদকে তার বাচ্চার সাথে ক্রয় করে তাহলে বাচ্চা কেতাবতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। আর উম্মে ওয়ালাদকে তার জন্য বিক্রি করা জায়েজ হবে না। আর যদি কোনো নিকটতম আত্মীয় মুহরামকে ক্রয় করে যার থেকে জন্ম সম্পর্কীয় আত্মীয়তা নেই তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সে তার কেতাবতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর যখন মুকাতাব কিস্তির টাকা আদায় করা থেকে অপারগ হয়ে যায় তাহলে হাকিম সাহেব তার অবস্থার ওপর চিন্তা করবে। যদি তার এ রকম ঋণ হয় যার দ্বারা আদায় করা সম্ভব হয় অথবা তার নিকট কোনো সম্পদ আসতে পারে এমন হয় তাহলে তাকে অপারগ করার মধ্যে তাড়াহুড়া করবে না, বরং দু' তিন দিন অপেক্ষা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاِنْ زَوَّجَ الْمَوْلٰى الخ **ঃ** এ সুরতের মধ্যে বাচ্চা মায়ের কেতাবতের অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা সে আজাদি এবং গোলামির মধ্যে মায়ের অনুসারী এবং ঐ বাচ্চার উপার্জিত সম্পদ ও মা পাবে। কেননা পিতার চেয়ে মা-ই অধিক হকদার। কেননা সে মায়ের অংশ।

قَوْلُهٗ وَاِذَا عَجَزَ الخ **ঃ** মাওলা তার গোলামকে পালাক্রমে বদলে কেতাবত আদায় করার ওপর মুকাতাব করে দিয়েছিল এবং কোনো অংশ আদায় করা থেকে অপারগ হয়ে গেছে, তবে যদি তার যে কোনো স্থান থেকে মাল পাওয়ার আশা থাকে তাহলে হাকিম সাহেব তার অপারগ হওয়ার ফয়সালা করবে না। কিন্তু এরপরও যদি আদায় করতে না পারে তাহলে অপারগতার ফয়সালা দিয়ে দেবে এবং তিন দিনের অধিক অপেক্ষা করা হবে না। কেননা তিন দিন এমন মুদ্দত যাকে ওজর-আপত্তির জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ জন্য তার চেয়ে অধিক করা যাবে না।

وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَجْهٌ وَطَلَبَ الْمَوْلٰى تَعْجِيْزَهُ عَجَزَهُ الْحَاكِمُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ لَايُعْجِزُهُ حَتّٰى يَتَوَالٰى عَلَيْهِ نَجْمَانِ وَاِذَا عَجَزَ الْكَاتِبُ عَادَ اِلٰى حُكْمِ الرِّقِّ وَكَانَ مَا فِىْ يَدِهٖ مِنَ الْاِكْتِسَابِ لِمَوْلَاهُ فَاِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهٗ مَالٌ لَمْ تَنْفَسِخْ الْكِتَابَةُ وَقُضِىَ مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهٖ وَحُكِمَ بِعِتْقِهٖ فِىْ اٰخِرِ جُزْءٍ مِنْ اَجْزَاءِ حَيَاتِهٖ وَمَا بَقِىَ فَهُوَ مِيْرَاثٌ لِوَرَثَتِهٖ وَيَعْتِقُ اَوْلَادُهٗ وَاِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَتَرَكَ وَلَدًامَوْلُوْدًا فِى الْكِتَابَةِ سَعٰى فِىْ كِتَابَةِ اَبِيْهِ عَلٰى نُجُوْمِهٖ فَاِذَا ادمى حَكَمْنَا بِعِتْقِ اَبِيْهِ قَبْلَ مَوْتِهٖ وَعَتَقَ الْوَلَدُ وَاِنْ تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرًى فِى الْكِتَابَةِ قِيْلَ لَهٗ اِمَّا اَنْ تُؤَدِّىَ الْكِتَابَةَ حَالًّا وَاِلَّا رُدِدْتَّ فِى الرِّقِّ وَاِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ عَبْدَهٗ عَلٰى خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ اَوْعَلٰى قِيْمَةِ نَفْسِهٖ فَالْكِتَابَةُ فَاِنْ اَدّٰى الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيْرَ عَتَقَ وَلَزِمَهٗ اَنْ يَّسْعٰى فِىْ قِيْمَتِهٖ لَايَنْقُصُ مِنَ الْمُسَمّٰى وَيُزَادُ عَلَيْهِ وَاِنْ كَاتَبَهٗ عَلٰى حَيَوَانٍ غَيْرِ مَوْصُوْفٍ فَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ وَاِنْ كَاتَبَهٗ عَلٰى ثَوْبٍ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি তার জন্য কোনো পন্থাই না থাকে এবং মাওলা তাকে অপারগ করতে চায়, তাহলে অপারগ করে কেতাবত ফসখ করে দেবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, সে তাকে অপারগ করবে না যে পর্যন্ত তার ওপর দু'টি কিস্তি চলে না যায়। যখন মুকাতাব অপারগ হয়ে যায় তখন সে গোলামের হুকুমে ফিরে আসবে এবং তার নিজ অর্জনের যা কিছু আছে সব তার মাওলার জন্য হবে। সুতরাং যদি মুকাতাব মারা যায় এবং তার মাল-সম্পদ হয় তাহলে কেতাবত ফসখ হবে না এবং যা কিছু তার জিম্মায় আছে সবগুলো তার সম্পদ থেকে আদায় করে দেওয়া হবে এবং তার জীবনের শেষাংশে তার আজাদ হওয়ার হুকুম দেওয়া হবে। আর যে গুলো অবশিষ্ট থাকে সেগুলো তার ওয়ারিসদের মিরাস হবে এবং তার ছেলে সন্তান আজাদ হয়ে যাবে। আর যদি সে মাল রেখে যায়নি বরং এক সন্তান রেখে গেছে যেটা কেতাবত থাকার জমানায় জন্ম হয়েছিল, তাহলে সে তার পিতার কেতাবতের মধ্যে কিস্তি হিসাবে পরিশ্রম করতে থাকবে যখন সে আদায় করে ফেলবে তাহলে আমরা তার পিতার আজাদির হুকুম দেব তার মৃত্যুর আগে এবং সন্তানও আজাদ হয়ে যাবে। এবং যদি ঐ সন্তান রেখে যায় যাকে কেতাবতের যুগে ক্রয় করেছিল, তাহলে তাকে বলা হবে যে হয়তো এখনই বদলে কেতাবত আদায় করো অন্যথা গোলামির দিকে প্রত্যাবর্তন করে দেওয়া হবে। এবং মুসলমান যখন তার গোলাম থেকে শরাব অথবা শূকরের কথার ওপর কেতাবত করে অথবা স্বয়ং গোলামের মূল্যের ওপর তাহলে কেতাবত ফাসাদ হয়ে যাবে। অতঃপর যদি সে শরাব এবং শূকরই দিয়ে দেয় তাহলে আজাদ হয়ে যাবে এবং তার ওপর তার মূল্যের মধ্যে পরিশ্রম করা আবশ্যক হবে এবং সে মূল্য স্থিরীকৃত মূল্য থেকে কম হবে না ; বরং বেশি হতে পারে যখন তার মূল্য বেড়ে যায়। আর যদি গোলামকে কোনো গুণবিহীন জানোয়ারের ওপর মুকাতাব করে তাহলে কেতাবত জায়েজ হবে। আর যদি এমন কাপড়ের ওপর মুকাতাব করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ تَنْفَسِخْ الخ ঃ এটা হযরত আলী ও ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাণী। কেননা কেতাবত এটা عَقْد مُعَاوَضَة সুতরাং তার মৃত্যু দ্বারা বাতিল হবে না যেমন তার মাওলার মৃত্যুর দ্বারা বাতিল হয় না। কেননা مُعَاوَضَة সাম্যতাকে কামনা করে।

قَوْلُه وَاِنْ لَمْ يَتْرُكْ الخ ঃ মুকাতাব ব্যক্তি মাল তো কিছুই রাখেনি; তবে ঐ সমস্ত সন্তান রেখে গেছে যারা কেতাবত অবস্থায় জন্ম লাভ করেছে। এ মাসআলার সুরত হচ্ছে যে, কোনো মুকাতাব ব্যক্তি বাঁদি ক্রয় করে তার সাথে সঙ্গম করল অতঃপর তার থেকে বাচ্চা জন্ম লাভ করল এবং মুকাতাব তার বংশ স্বীকার করল। অতঃপর মুকাতাব মারা গেল তাহলে বাচ্চা তার কেতাবতে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং ঐ ছেলের মাল অর্জন মুকাতাবের মাল অর্জনের মতো হবে এ জন্য বাচ্চা আদায় করার মধ্যে মুকাতাবের হবে।

قَوْلُهُ وَاِذَا كَاتَبَ الْمُسْلِمُ الخ ঃ এ সুরতের মধ্যে কেতাবত ফাসাদ হবে। কেননা শরাব এবং শূকর মুসলমানের জন্য মাল না হওয়া হিসেবে বদল হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। এখন যদি গোলাম শরাব অথবা শূকরই দিয়ে দেয় তাহলে আজাদ তো হয়ে যাবে কিন্তু স্বীয় মূল্যের মধ্যে প্রচেষ্টা করবে। কেননা এখানে আকদ ফাসাদ হওয়ার কারণে গর্দান ফিরিয়ে দেওয়া কষ্টকর এ জন্য মূল্য ওয়াজিব হবে, যেমন– ফাসাদ বেচাকেনার মধ্যে। যদি বিক্রেতার নিকট বিক্রিত মাল ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে মূল্য ওয়াজিব হয়ে যায়। আর যদি মাওলা গোলামকে তার মূল্যের পরিবর্তে মুকাতাব করে তাহলে এটাও ফাসাদ হবে। কেননা গোলামের মূল্য জাত, গুণ, উত্তম, অধম এবং পরিমাণ সর্ব দিক দিয়ে অজ্ঞাত।

قَوْلُهُ عَلٰى حَيَوَانٍ الخ ঃ জানোয়ারের শুধু জাত বর্ণনা করেছে যেমন ঘোড়া অথবা উট এবং প্রকার ও গুণ বর্ণনা করেনি তাহলে কেতাবত জায়েজ হবে। এবং এ সুরতে মধ্যম প্রকারের জানোয়ার অথবা তার মূল্য ওয়াজিব হবে। হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট কেতাবত জায়েজ হবে না ; কিয়াসও এটাই চায়। কেননা কেতাবত হচ্ছে– লেনদেন জাতীয় চুক্তি বা عَقْد مُعَاوَضَة তথা কোনো কিছুর বিনিময়ে কিছু প্রদান করার অঙ্গিকার। সুতরাং বিক্রির সমতুল্য হয়ে গেছে। এবং যখন বদল অজানা হয় তখন ক্রয়-বিক্রি সহীহ হয় না। আমরা বলব যে, কেতাবতের মধ্যে দু'টো দিক রয়েছে এক নম্বরে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ অর্থাৎ মালের পরিবর্তে মাল এ হিসেবে যে, গোলাম মাওলার হকের মধ্যে মাল এবং দুই নম্বরে مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ অর্থাৎ মালের পরিবর্তে মাল ব্যতীত অন্য বস্তু রয়েছে। এ অর্থের ওপর যে, গোলাম তার হকের মধ্যে মাল নয়। সুতরাং কেতাবত জায়েজ ও নাজায়েজের মধ্যে পতিত হয়েছে তাহলে এখন জায়েজই বলা হবে। এখন বাকি রইল অজ্ঞতা, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কারণ জাত বর্ণনা হওয়ার পর দূষণীয় অজ্ঞতা অবশিষ্ট থাকেনা।

لَمْ يُسَمِّ جِنْسَهُ لَمْ يَجُزْ وَإِنْ أَدَّاهُ لَمْ يَعْتِقْ وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَيْهِ كِتَابَةً وَاحِدَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ أَدَّيَا عَتَقَا وَإِنْ عَجَزَا رُدَّا فِي الرِّقِّ وَإِنْ كَاتَبَهُمَا عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ جَازَتِ الْكِتَابَةُ وَيَجُوزُ الضَّمَانُ وَأَيُّهُمَا أَدَّى عَتَقَا وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِ مَا أَدَّى وَإِذَا أَعْتَقَ الْمَوْلَى مُكَاتَبَهُ عُتِقَ بِعِتْقِهِ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ لَمْ تَنْفَسِخِ الْكِتَابَةُ وَقِيلَ لَهُ أَدِّ الْمَالَ إِلَى وَرَثَةِ الْمَوْلَى عَلَى نُجُومِهِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ لَمْ يَنْفُذْ عِتْقُهُ وَإِنْ أَعْتَقُوهُ جَمِيعًا عَتَقَ وَسَقَطَ عَنْهُ مَالُ الْكِتَابَةِ وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَى أُمَّ وَلَدِهِ جَازَ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى سَقَطَ عَنْهَا مَالُ الْكِتَابَةِ وَإِنْ وَلَدَتْ مُكَاتَبَتُهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ۔

সরল অনুবাদ ঃ যার জিনস (মূল উপাদান) বর্ণনা না করে তাহলে জায়েজ হবে না। যদি সে কাপড় দিয়ে দেয় তাহলে আজাদ হবে না। আর যদি দুই গোলামকে একই কেতাবতের মধ্যে এক হাজারের ওপর মুকাতাব করল তাহলে তারা যদি হাজার দিয়ে দেয় তাহলে আজাদ হয়ে যাবে, অন্যথা গোলামির দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। আর যদি উভয়কে এ শর্তের ওপর মুকাতাব করল যে, তাদের মধ্যে প্রত্যেকে একজন দ্বিতীয় জনের জামিন হবে তাহলে কেতাবত জায়েজ হবে। দু'জনের মধ্য থেকে যেই আদায় করে তাহলে উভয় আজাদ হয়ে যাবে এবং সে তার অংশীদার থেকে আদায়কৃত বস্তুর অর্ধাংশ নিয়ে যাবে। এবং যখন মাওলা তার মাকাতেবকে আজাদ করে দেয় তাহলে আজাদ হয়ে যাবে তার আজাদ করা দ্বারা এবং কেতাবতের মাল (বাতিল ও) বাদ হয়ে যাবে। আর যখন মুকাতাবের মাওলা মারা যায় তাহলে কেতাবত ফসখ হবে না এবং তাকে বলা হবে যে, মাল মনিবের উত্তরাধিকারীদেরকে তার কিস্তিসমূহ অনুযায়ী আদায় করো। সুতরাং যদি কোনো ওয়ারিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাকে আজাদ করে দিল, তাহলে আজাদির হুকুম জারি হবে না। আর যদি সবাই একসাথে তাকে আজাদ করে দেয় তাহলে আজাদ হয়ে যাবে এবং কেতাবতের মাল রহিত হয়ে যাবে। এবং যখন মাওলা তার উম্মে ওয়ালাদকে মুকাতাব করে তাহলে জায়েজ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ مَوْلَى الْمُكَاتَبِ الخ **ঃ** এ অবস্থায় কেতাবতের চুক্তি ফসখ হবেনা; বরং তার ওয়ারিশদের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। কেননা ওয়ারিশগণ মৃতের স্থলাভিষিক্ত। সুতরাং মুকাতাব তার ওয়ারিশদেরকে অংশ অনুযায়ী আদায় করবে। এবং কোনো এক ওয়ারিশকে আদায় করা দ্বারা আজাদি যেটি জারি হয় না তার কারণ এই যে, মুকাতাব ওয়ারিশদের নিকট ওয়ারিশ দ্বারা প্রত্যাবর্তন হয় না বরং মুকাতাবের জিম্মায় যে ঋণ আছে তা প্রত্যাবর্তন হয় এবং যখন সমস্ত ওয়ারিস সূত্র আজাদ করে দেয় তাহলে সে মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে আজাদ হয়ে যায়। কেননা তাদের আজাদ করা কেতাবত চুক্তির পরিপূর্ণতা। সুতরাং এটা আদায় ও দায় শেষের পর্যায়ে হয়েছে।

قَوْلُهُ وَإِنْ كَاتَبَ أُمَّ وَلَدِهِ الخ **ঃ** এ সুরতের মধ্যে চুক্তি ঠিক হবে। কেননা উম্মে ওয়ালাদ যদিও মাওলার মৃত্যুর পর আজাদ হওয়ার যোগ্য কিন্তু তার পূর্বে আজাদ হওয়ারও প্রয়োজন আছে। এখন যদি বদলে কেতাবতের আদায় করার পূর্বে মাওলার ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে উম্মে ওয়ালাদ বিনামূল্যে আজাদ হয়ে যাবে। কেননা তার আজাদ হওয়া মাওলার মৃত্যুর সাথে আবদ্ধ হয়েছিল।

قَوْلُهُ بِالْخِيَارِ الخ **ঃ** এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর উক্তি। কেননা কেতাবতের চুক্তি গোলামির অবশিষ্ট-এর ওপর সংঘটিত হয়েছে এবং তাদাব্বুর-এর কারণে যা কিছু ফউত হয়েছে তার ওপর সংঘটিত হয়নি। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ এবং সমস্ত কেতাবতের মালের মধ্যে যেটা সবচেয়ে কম সেটা ওয়াজিব আর অধিকাংশ আদায়ের ওপর আজাদি সীমাবদ্ধ নয়।

إِنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَتْ عَجَزَتْ نَفْسَهَا وَصَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَإِنْ كَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ جَازَ فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا كَانَتْ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ تَسْعَى فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا أَوْفِي جَمِيعِ مَالِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ دَبَّرَ مُكَاتَبَتَهُ صَحَّ التَّدْبِيرُ وَلَهَا الْخِيَارُ إِنْ شَاءَتْ مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَتْ عَجَزَتْ نَفْسَهَا وَصَارَتْ مُدَبَّرَةً فَإِنْ مَضَتْ عَلَى كِتَابَتِهَا فَمَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَتْ سَعَتْ فِي ثُلُثَيْ مَالِ الْكِتَابَةِ وَإِنْ شَاءَتْ سَعَتْ فِي ثُلُثَيْ قِيمَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَإِذَا أَعْتَقَ الْمُكَاتَبُ عَبْدَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَجُزْ وَإِذَا وَهَبَ عَلَى عِوَضٍ لَمْ يَصِحَّ وَإِنْ كَاتَبَ عَبْدَهُ جَازَ فَإِنْ أَدَّى الثَّانِي قَبْلَ أَنْ يُعْتِقَ الْأَوَّلُ فَوَلَاؤُهُ لِلْمَوْلَى الْأَوَّلِ وَإِنْ أَدَّى الثَّانِي بَعْدَ عِتْقِ الْمُكَاتَبُ الْأَوَّلُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ .

সরল অনুবাদ ঃ চাই কেতাবতের ওপর থাকুক এবং চাই নিজকে অপারগ করে তার উম্মে ওয়ালাদ হয়ে থাকে এবং মাওলার মৃত্যুর পর আজাদ হয়ে যাবে। এবং যদি তার মুদাব্বারাকে মুকাতাব করে তাহলে এটাও জায়েজ হবে। অতঃপর যদি মাওলা মারা যায় এবং মুদাব্বারা ব্যতীত তার কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে তার জন্য এখতিয়ার অর্থাৎ ইচ্ছা হবে সে তার দুই-তৃতীয়াংশ মূল্য অথবা পূর্ণ কেতাবতের মালের মধ্যে পরিশ্রম করবে। আর যদি তার মুকাতাবকে মুদাব্বারা করে দেয় তাহলে তাদবীর সহীহ হবে। এবং তার জন্য এটা এখতিয়ার আছে যে, চাই সে কেতাবতের ওপর থাকুক চাই সে নিজকে অপারগ করে মুদাব্বারাহ থাকে। এখন যদি সে কেতাবতের চুক্তির ওপর থাকে এবং মাওলা মারা যায় এবং তার কোনো সম্পদ না থাকে তাহলে তার জন্য এখতিয়ার থাকবে যে, চাই সে দুই-তৃতীয়াংশ কেতাবতের মালের মধ্যে পরিশ্রম করবে এবং চাই সে তার নিজের দুই-তৃতীয়াংশ মূল্যের মধ্যে পরিশ্রম করবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। এবং যখন মুকাতাব নিজের গোলাম মালের পরিবর্তে আজাদ করে তাহলে জায়েজ হবে না। আর যদি বিনিময়ের মাধ্যমে হেবা করে তাহলে এটাও সহীহ হবে না। আর যদি তার গোলামকে মুকাতাব করে তাহলে এটা জায়েজ হবে। অতঃপর যদি দ্বিতীয়টা প্রথমটার আজাদ করার পূর্বে আদায় করে দেয় তাহলে তার ওয়ালা তার প্রথম মাওলার জন্য হবে। আর যদি দ্বিতীয় মুকাতাব প্রথম মুকাতাবের আজাদির পর আদায় করে তাহলে ওয়ালা প্রথম মুকাতাব পাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ دَبَّرَ مُكَاتَبَتَهُ الخ ঃ এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট চাই কেতাবতের মালের দুই-তৃতীয়াংশে এবং চাই তার মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশে প্রচেষ্টা করে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ঐ উভয়টার কমটার মধ্যে প্রচেষ্টা করবে এবং এ অবস্থায় পরিমাণ ঐকমত্যের ভিত্তিতে এবং মতভেদ ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মধ্যে। মূলত এ মতভেদ গোলামদের অংশ বিশিষ্ট হওয়া ও না হওয়ার ওপর। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট গোলাম অংশ

বিশিষ্ট হতে পারে, তাহলে উল্লিখিত মুদাব্বারা এক-তৃতীয়াংশ আজাদের হকদার হয়েছে এবং তার দুই-তৃতীয়াংশ গোলাম। এদিকে তার আজাদ হওয়ার দু'টি দিক রয়েছে অর্থাৎ তাদবীর দ্বারা তাড়াতাড়ি আজাদ হওয়া আর কেতাবত দ্বারা দেরিতে আজাদ হওয়া। এ জন্য তার মূল্যের দুই-তৃতীয়াংশ এবং বদলে কেতাবতের দুই তৃতীয়াংশের মধ্যে এখতিয়ার থাকবে। যার মধ্যে ইচ্ছা প্রচেষ্টা করবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট গোলামের মধ্যে অংশও ভাগ হয় না। সুতরাং কিছু অংশ আজাদ হওয়া দ্বারা পূর্ণ আজাদ হয়ে যাবে। এবং তার ওপর বদলে কেতাবত ও মূল্য থেকে যে কোনো এক জিনিস ওয়াজিব হবে। আর এটা প্রকাশ্য কথা যে, সে কমটাকেই অগ্রাধিকার দেবে। সুতরাং ইচ্ছার ওপর ছাড়া অনর্থক হবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) هات مناسبة كتاب المكاتب مع باب الاستيلاد؟ ثم بين لماذا اورد المصنف كتاب المكاتب بعد كتاب العتاق؟

(٢) مامعنى الكتابة والمكاتب لغة واصطلاحا؟ اكتب بيان المكاتب بضوء القران الكريم؟

(٣) متى يكون العبد مكاتبا؟ هل يجوز اشتراط المال حالا ام موجلاومنجما؟ متى تجوز كتابة العبد الصغير؟

(٤) هل يخرج المكاتب عن يد المولى ام من ملكه ؟ هل يجوز للمكاتب البيع والشراء والسفر والتزوج والهبة والتصدق والتكفل؟

(٥) بين احكام ولد المكاتب مفصلا ثم بين ان وطئ المولى مكاتبته فماذا حكمه؟

(٦) ان اشترى المكاتب اباه او ابنه او ام ولده مع ولدها او ذا رحم محرم منه ماذا حكمها؟ بين مفصلا مع بيان اختلاف الائمة؟

كِتَابُ الْوَلَاءِ

ওয়ালাপর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) ওয়ালা পর্বকে মুকাতাব পর্বের পর এ জন্য এনেছেন যে, ওয়ালা এটা কেতাবত-এর নিদর্শন। কারণ কেতাবতের বদলা দিয়ে দিলে কৃতদাস থেকে মালিকানা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। -(নাতায়েজুল আফকার)

وَلَاءٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ وَلَاءٌ এটা وَلِيٌّ থেকে সংগৃহীত। অর্থ-নৈকট্যতা, নৈকট্য। অথবা مُوَالَاتٌ থেকে সংগৃহীত, আর مُوَالَاتٌ এটা وَلَايَتٌ থেকে অর্থ- বন্ধুত্ব, সাহায্য-সহযোগিতা, ভালোবাসা।

وَلَاءٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় وَلَاءٌ ঐ উত্তরাধিকার যা স্বাধীনকৃত দাস থেকে অথবা عَقْدُ مُوَالَاتٌ-এর কারণে লাভ হয়। স্বাধীনকৃত দাস থেকে লাভ হলে وَلَاءُ عِتَاقَةٍ বলে, আর عَقْدُ مُوَالَاتٌ-এর কারণে লাভ হলে وَلَاءُ مُوَالَاتٌ বলে।

إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلَ مَمْلُوكَهُ فَوَلَاؤُهُ لَهُ وَكَذٰلِكَ الْمَرْأَةُ تُعْتِقُ فَإِنْ شَرَطَ أَنَّهُ سَائِبَةٌ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ عُتِقَ وَ وَلَاؤُهُ لِلْمَوْلٰى وَإِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلٰى فَوَلَاؤُهُ لِوَرَثَةِ الْمَوْلٰى وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلٰى عَتَقَ مُدَبَّرُوْهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ وَ وَلَاؤُهُمْ لَهُ وَمَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ عُتِقَ عَلَيْهِ وَوَلَاؤُهُ لَهُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যখন কোনো ব্যক্তি তার গোলাম আজাদ করল তাহলে অধিকার তার জন্যই হবে। অনুরূপ যে মহিলা আজাদ করে। অতঃপর যদি এ শর্ত করে যে, সে ওলী অর্থাৎ অধিকার ব্যতীত তাহলে শর্ত বাতেল আর অধিকার আজাদকারী ব্যক্তিরই হবে। এবং যখন মুকাতাব আদায় করে দেয় তাহলে সে আজাদ এবং তার অধিকার মাওলার। আর যদি মাওলার মৃত্যুর পর আজাদ হয় তাহলে তার অধিকার মাওলার ওয়ারিশদের হবে। আর যখন মাওলা মারা যায় তাহলে তার সমস্ত মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ আজাদ হয়ে যাবে এবং তাদের সবার অধিকার তার জন্যই হবে। আর সে ব্যক্তি আত্মীয়তা সম্পর্কীয় মুহরিমের মালিক হয়ে যায় তাহলে সে আজাদ হবে এবং অধিকার মালিকেরই হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِذَا أَعْتَقَ الخ ঃ যদি আজাদকৃত গোলাম মারা যায় এবং কোনো ওয়ারিশ রেখে যায় তাহলে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি আজাদকারী ব্যক্তি পাবে। চাই আজাদ করা মুদাব্বার অথবা মুকাতাব অথবা উম্মে ওয়ালাদ করা দ্বারা হোক অথবা আত্মীয়তার মালিক হওয়া দ্বারা হোক। কেননা হাদীস শরীফে আছে- اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ وَلِيُّ النِّعْمَةِ

قَوْلُهُ عَتَقَ مُدَبَّرُ الخ ঃ যদি কেউ প্রশ্ন করে যে, মুদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ মাওলার মৃত্যুর পর আজাদ হয় তাহলে মাওলা তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ পাওয়ার কোনো সুরত আছে কি? উত্তর হচ্ছে যে, যখন মাওলা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায় এবং কাজি সাহেব তার মৃত্যুর হুকুম করে তার মুদাব্বর ও উম্মে ওয়ালাদের আজাদির ফয়সালা করে দিল অতঃপর মাওলা মুসলমান হয়ে দারুল ইসলামে চলে আসল অতঃপর মুদাব্বার অথবা উম্মে ওয়ালাদ মারা গেল তাহলে অধিকার মাওলা পাবে।

وَاِذَا تَزَوَّجَ عَبْدٌ رَجُلٍ اَمَةَ الْاٰخَرِ فَاَعْتَقَ مَوْلَى الْاَمَةِ الْاَمَةَ وَهِيَ حَامِلٌ مِنَ الْعَبْدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ حَمْلُهَا وَ وَلَاءُ الْحَمْلِ لِمَوْلَى الْاُمِّ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ اَبَدًا فَاِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا لِاَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ وَلَدًا فَوَلَاؤُهُ لِمَوْلَى الْاُمِّ مَا لَمْ يُعْتِقِ الْاَبُ فَاِنْ عَتَقَ الْاَبُ جَرَّ وَلَاءَ اِبْنِهٖ وَانْتَقَلَ مِنْ مَوْلَى الْاُمِّ اِلٰى مَوْلَى الْاَبِ وَمَنْ تَزَوَّجَ مِنَ الْعَجَمِ بِمُعْتَقَةِ الْعَرَبِ فَوَلَدَتْ لَهٗ اَوْلَادٌ فَوَلَاءُ اَوْلَادِهَا لِمَوَالِيْهَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَكُوْنُ وَلَاءُ اَوْلَادِهَا لِاَبِيْهِمْ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যখন কোনো ব্যক্তির গোলাম দ্বিতীয় ব্যক্তির বাঁদির সাথে বিবাহ করল অতঃপর মাওলা বাঁদিকে আজাদ করে দিল এবং সে উক্ত গোলাম দ্বারা গর্ভবতী হলো তাহলে বাঁদি এবং তার গর্ভ আজাদ হবে। এবং গর্ভের অধিকার মায়ের মাওলার হবে। অতঃপর যদি পিতাকে আজাদ করে দেওয়া হয় তাহলে সে তার মেয়ের অধিকার টেনে নেবে এবং মায়ের মাওলা থেকে পিতার মাওলার দিকে প্রত্যাবর্তন হয়ে যাবে। এবং সেই অনারব ব্যক্তি আরবদের আজাদকৃতাকে বিবাহ করল, অতঃপর সে সন্তানাদি প্রসব করল তাহলে সন্তানদের অধিকার ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট উক্ত মহিলার মাওলাগণ হবে। এবং কাজি আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, সন্তানদের অধিকার তার পিতার হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا تَزَوَّجَ الخ ঃ কোনো ব্যক্তি তার বাঁদিকে আজাদ করল যার স্বামী কোনো গোলাম ছিল এবং বাঁদি তার দ্বারা গর্ভবতী ছিল। অতঃপর আজাদির পর ছয় মাসের আগে যদি তার বাচ্চা প্রশব হয় তাহলে বাচ্চার অধিকার তার মায়ের মাওলার হবে। কেননা বাচ্চা মায়ের অংশ এবং মায়ের মাওলা ইচ্ছাকৃত তার পূর্ণ অংশের ওপর আজাদিকে পতিত করেছে। সুতরাং বাচ্চার আজাদকারী সেই হবে। এবং যদি আজাদীর পর ছয় মাসের থেকে বেশি সময়ে বাচ্চা হয়, তাহলেও বাচ্চার অধিকার তার মাতা পাবে তবে শর্ত হচ্ছে সে পিতা আজাদ হতে হবে অন্যথা পিতা বাচ্চার অধিকার তার মাওলার দিকে টেনে নেবে অর্থাৎ যদি বাচ্চা মারা যায় তাহলে তার وَلَاءٌ পিতার مَوَالِيْগণ পাবে।

قَوْلُهٗ وَمَنْ تَزَوَّجَ الخ ঃ একজন আজাদ অনারব ব্যক্তি একজন এমন ,মহিলার সাথে বিবাহ করল যে মহিলা কারো আজাদকৃতা ছিল তার থেকে কোনো সন্তান হয়েছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সন্তানদের অধিকার উক্ত আজাদকৃতা মহিলার মাওলাগণ পাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তার সন্তানদের হুকুম তাদের পিতাদের যা হুকুম তাই। সুতরাং তার অধিকার বাপের মাওলাগণ পাবে। কেননা অধিকার বংশের পর্যায়ে আর বংশ পিতার দিকে হয়। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, সে অধিকার পূর্ণ আজাদ ও গ্রহণযোগ্য। আর অনারবদের ক্ষেত্রে বংশ দুর্বলহীন। কেননা তারা বংশ বরবাদ করে দিয়েছে।

لِاَنَّ النَّسَبَ اِلَى الْاٰبَاءِ وَ وَلَاءُ الْعِتَاقَةِ تَعْصِيْبٌ فَاِنْ كَانَ لِلْمُعْتِقِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ اَوْلٰى مِنْهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهٗ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَمِيْرَاثُهٗ لِلْمُعْتِقِ فَاِنْ مَاتَ الْمَوْلٰى ثُمَّ مَاتَ الْمُعْتِقُ فَمِيْرَاثُهٗ لِبَنِى الْمَوْلٰى دُوْنَ بَنَاتِهٖ وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ اِلَّا مَا اَعْتَقْنَ اَوْ اَعْتَقَ مَنْ اَعْتَقْنَ اَوْ كَاتَبْنَ اَوْ كَاتَبَ مَنْ كَاتَبْنَ اَوْ دَبَّرْنَ اَوْ دَبَّرَ مَنْ دَبَّرْنَ اَوْ جَرَّ وَلَاءُ مُعْتِقِهِنَّ اَوْمُعْتِقِ مُعْتِقِهِنَّ وَاِذَا تَرَكَ الْمَوْلٰى اِبْنًا وَاَوْلَادَ اِبْنٍ اٰخَرَ فَمِيْرَاثُ الْمُعْتِقِ لِلْاِبْنِ دُوْنَ بَنِىْ الْاِبْنِ لِاَنَّ الْوَلَاءَ لِلْكُبْرِ وَاِذَا اَسْلَمَ رَجُلٌ عَلٰى يَدِ رَجُلٍ وَ وَالَاهُ عَلٰى اَنْ يَّرِثَهٗ وَيَعْقِلُ عَنْهُ اِذَا جَنٰى اَوْ اَسْلَمَ عَلٰى يَدِ غَيْرِهٖ وَ وَالَاهُ .

সরল অনুবাদ ঃ কেননা বংশ পিতার দিক থেকে হয়, আজাদকৃত ব্যক্তির وَلَاءُ এটা আসাবা-এর কারণ। অতএব যদি আজাদকৃত ব্যক্তির কোনো বংশগত আসাবা হয়, তাহলে অধিকারের হকদার সেই হবে। অতঃপর যদি তার কোনো বংশগত আসাবা না হয় তবে তার মিরাস আজাদকারীদের জন্য হবে। আর যদি মাওলা মৃত্যু বরণ করে অতঃপর আজাদকৃত ও মৃত্যুবরণ করে, তবে তার মিরাস মাওলার ছেলেদের হবে, তার মেয়েদের হবে না। আর মহিলাদের জন্য অধিকার তাদের আজাদকৃতদের ব্যতীত নেই অথবা তাদের আজাদকৃতদের আজাদকৃতের ব্যতীত অথবা তাদের মুকাতাবদের ব্যতীত, অথবা তাদের মুকাতাবদের মুকাতেব ব্যতীত, অথবা তাদের মুদাব্বের ব্যতীত, অথবা তাদের মুদাব্বারদের মুদতাব্বার ব্যতীত, অথবা তাদের আজাদকৃতদের অধিকার টেনে নেবে, অথবা তাদের আজাদকারীদের আজাদকৃতের। অতঃপর মাওলা যখন ছেলে রেখে যায় এবং দ্বিতীয় ছেলের সন্তানদের রেখে যায় তাহলে আজাদকৃত ব্যক্তির মিরাস ছেলের জন্য হবে ছেলের সন্তানদেব জন্য নয়। কেননা অধিকার বড়দের জন্য হয়। যখন কোনো ব্যক্তি কারো হাতে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার থেকে লেনদেন করল এ কথার ওপর যে, সে তার ওয়ারিস হবে এবং তার ভুলের জরিমানা দেবে, অথবা কোনো অন্য ব্যক্তির হাতে ইসলাম গ্রহণ করল এবং তার সাথে مُوَالَاتْ করল,

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ تَعْصِيْبٌ الخ ঃ ওয়ারিশ অধ্যায়ে আজাদকৃত নসবী আসাবা থেকে পরে এবং আত্মীয়দের পূর্বে হয় এবং তার ওয়ারিশ পুরুষ হয়, মহিলা নয়। সুতরাং যদি আজাদকৃতের কোনো বংশগত আসাবা হয় তাহলে সে বেশি প্রাপ্য হবে, অন্যথা তার মিরাস আজাদকারী ব্যক্তি পাবে।

قَوْلُهٗ اَوْ دَبَّرْنَ الخ ঃ যেমন এক মহিলা নিজ গোলামকে মুদাব্বার করে মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল এবং তার সংযোগ–এর হুকুমের ভিত্তিতে তার মুদাব্বার আজাদ হয়ে গেল অতঃপর সে মুসলমান হয়ে চলে আসল এবং মারা গেল তাহলে মুদাব্বারের অধিকার উক্ত মহিলা পাবে।

قَوْلُهٗ اَوْ جَرَّ الخ ঃ যেমন মহিলা তার গোলামের বিবাহ কোনো আজাদের সাথে করিয়ে দিল তার থেকে বাচ্চা হয়ে গেল তাহলে বাচ্চা মাতার অনুসরণে আজাদ হয়ে যাবে এবং তার অধিকার মাতার মাওলাগণ পাবে, পিতার মাওলাগণ নয়। এবং যদি মহিলা তার গোলামকে আজাদ করে দেয় তাহলে গোলাম তার বাচ্চার অধিকার তার নিজের দিকে নিয়ে যাবে। এবং মহিলা তার আজাদকৃতের অধিকার নিজের দিকে নিয়ে যাবে। এখন যদি বাচ্চা মারা যায় তাহলে তার মিরাস তার বাপ পাবে। আর যদি পিতা না থাকে তাহলে ঐ মহিলা পাবে যে তার পিতাকে আজাদ করেছিল।

فَالْوَلَاءُ صَحِيْحٌ وَعَقْلُهُ عَلٰى مَوْلَاهُ وَاِنْ مَاتَ وَلَاوَارِثَ لَهُ فَمِيْرَاثُهُ لِلْمَوْلٰى وَاِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ فَهُوَ اَوْلٰى مِنْهُ وَلِلْمَوْلٰى اَنْ يَّنْتَقِلَ عَنْهُ بِوَلَائِهِ اِلٰى غَيْرِهِ مَالَمْ يَعْقِلْ عَنْهُ فَاِذَا عَقَلَ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ اَنْ يَّتَحَوَّلَ بِوَلَائِهِ عَنْهُ اِلٰى غَيْرِهِ وَلَيْسَ لِمَوْلَى الْعِتَاقَةِ اَنْ يُّوَالِيَ اَحَدًا ـ

সরল অনুবাদ ঃ তাহলে অধিকার সহীহ হবে এবং ক্ষতিপূরণ তার মাওলার ওপর হবে। অতঃপর যদি সে মারা যায় এবং কোনো ওয়ারিশ না হয় তাহলে তার মিরাস মাওলার জন্য হবে। তার যদি কোনো ওয়ারিশ হয় তাহলে সেটাই উত্তম হবে এবং মাওলা তার অধিকার দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে জরিমানা আদায় না করা হয়। সুতরাং যদি জরিমানা আদায় করে তাহলে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না এবং আজাদকৃত ব্যক্তি কারো সাথে মোয়ালাত করা জায়েজ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَاءْ-এর প্রকারভেদ ঃ وَلَاءْ দু' প্রকার ঃ (১) وَلَاءْ عِتَاقَةْ (২) وَلَاءْ مُوَالَاتْ (১) وَلَاءْ عِتَاقَةْ বলা হয় ঐ উত্তরাধিকারকে যা দাস-এর থেকে হাসিল হয়। (২) وَلَاءْ مُوَالَاتْ বলা হয় ঐ উত্তরাধিকারকে যা عَقْد مُوَالَاتْ-এর কারণে হাসিল হয়ে থাকে।

অনুশীলনী – اَلْمُنَاقَشَةُ

(١) اكتب المناسبة بين كتاب المكاتب وكتاب الولاء؟ مامعنى الولاء لغة واصطلاحا ثم بين احكام الولاء مفصلا ـ

(٢) قوله ومن ملك ذا رحم محرم بين حكم المسئلة اولا ثم اوضح المسئلة الاتية مع بيان حكمها مفصلا ـ قوله واذا تزوج عبد رجل امة الاخر فاعتق مولى الامة الامة وهى حامل من العبد الخ

(٣) قوله ومن تزوج من العجم بمعتقة العرب فولدت له اولاد الخ ما الاختلاف بين ائمتنا فى حكم هذه المسئلة؟ بين بيانا شافيا ـ

(٤) اوضح العبارة الاتية ايضاحا تاما ؟ قوله وليس للنساء من الولاء ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن او دبرن او دبر من دبرن او جر ولاء معتقهن او معتق معتقهن ـ

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ

অপরাধ পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) কৃতদাস মুক্তির বিধি-বিধান আলোচনা করার পর এখন অপরাধের বিধি-বিধান বর্ণনা করা আরম্ভ করেছেন। কারণ কৃতদাস মুক্ত করার মাধ্যমে তাকে বন্দীত্ব জীবন থেকে মুক্ত ও স্বাধীন জীবন দান করা হয় আর জেনায়াত তথা অপরাধের মধ্যে জীবন নাশ করা হয় এ হিসাবে জীবন দান ও ধ্বংসের মাঝে প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও বৈপরীত্ব হিসাবেও মিল রয়েছে। আর একটি যোগসূত্র এই যে, কৃতদাস মুক্তির মধ্যে যে রূপ বন্দীত্ব জীবন থেকে মুক্ত জীবন লাভ হয় ঠিক জেনায়াত-এর মধ্যে যেহেতু কেসাসের বিধি-বিধান বর্ণনা করা হয়েছে তাই কেসাসের মধ্যেও জীবন দান করার অর্থ বিদ্যমান আছে। যেমন কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে- وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ হে জ্ঞানীগণ, তোমাদের জন্য কেসাস-এর মধ্যে রয়েছে জীবন। এ হিসাবে কৃতদাস মুক্তি ও জেনায়াত উভয়টির মধ্যেই জীবন দানের অর্থ হিসাবে সাম স্য রয়েছে।

جِنَايَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ جِنَايَاتٌ এটা جِنَايَةٌ-এর বহুবচন جِنَايَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ- অপরাধ করা, সীমাতিক্রম করা।

جِنَايَةٌ ، اَتْلَافٌ ও غَصْبٌ -এর মধ্যে পার্থক্য ঃ জান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এর ওপর সীমাতিক্রম ও উৎপীড়ন করাকে جِنَايَةٌ বলে, আর মালের ওপর সীমাতিক্রম ও জুলুম করাকে غَصْبٌ ও اَتْلَافٌ বলে।

جِنَايَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ ফকীহ তথা ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞানীগণের পরিভাষায় جِنَايَةٌ ঐ নিষিদ্ধ কাজের নাম যা জান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ হাত, পা, নাক, কান এবং চক্ষুর ওপর পতিত।

অন্যায় হত্যা হারাম হওয়ার কারণ ঃ মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকলে জনপদ ও শহর বিধ্বস্ত ও বিরান হয়ে পড়েবে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে; সামাজিক জীবনে নেমে আসবে ভয়াবহ ধ্বংস। এ সকল কারণে হত্যা খুন হারাম করা হয়েছে। কিসাস ও অন্য কোনো বৃহত্তর কল্যাণের প্রেক্ষিতেই শুধুমাত্র হত্যার অনুমতি দেওয়া হবে। কোনো কোনো সময় প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড না করে হত্যার অন্যান্য উপায় ও প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। এই উপায় ও প্রক্রিয়া গুলোও হত্যার মতোই হারাম। যেমন– কখনও মানুষের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠে ; কিন্তু কেসাসের আশঙ্কায় প্রতিপক্ষকে সরাসরি হত্যা করতে সাহস করে না। তাই খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে বা জাদু-টোনার মাধ্যমে হত্যা করে। এটাও সরাসরি হত্যার অন্তর্ভুক্ত। এটা হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। কারণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় খোলাখুলি ও প্রকাশ্যে। উহা হতে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে , কিন্তু গোপন প্রক্রিয়ায় হত্যাকাণ্ড হতে আত্মরক্ষা করা বা বেঁচে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট ও জনস্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণে এই প্রক্রিয়া গুলোকেও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

কেসাসের তাৎপর্য ঃ আমরা এখানে কেসাসের তাৎপর্য বর্ণনা করছি। জেনায়াত পর্বে যেহেতু কেসাসের আলোচনা হয়েছে তাই হত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ ফিতনা-ফাসাদ হতে বিরত রাখার জন্যই কেসাসের বিধান দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন - وَلَكُمْ فِى الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰاُولِى الْاَلْبَابِ অর্থাৎ হে জ্ঞানী সম্প্রদায় ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে।

اَلْقَتْلُ عَلٰى خَمْسَةِ اَوْجُهٍ عَمَدٌ وَشِبْهُ عَمَدٍ وَخَطأٌ وَمَا أُجْرِىَ مَجْرَى الْخَطأِ وَالْقَتْلُ بِسَبَبٍ فَالْعَمَدُ مَا تَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِسِلَاحٍ اَوْ مَا اُجْرِىَ مَجْرَى السِّلَاحِ فِىْ تَفْرِيْقِ الْاَجْزَاءِ كَالْمُحَدَّدِ مِنَ الْخَشَبِ وَالْحَجَرِ وَالنَّارِ وَمُوْجِبُ ذَالِكَ الْمَاثَمِ وَالْقَوَدِ اِلَّا اَنْ يَّعْفُوَ الْاَوْلِيَاءَ وَلَاكَفَّارَةَ فِيْهِ وَشِبْهُ الْعَمَدِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ يَّتَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِمَا لَيْسَ بِسِلَاحٍ وَلَامَا اُجْرِىَ مَجْرَاهُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ হত্যা পাঁচ প্রকার ঃ (১) কতলে আমদ (২) কতলে শিবহে আমদ (৩) কতলে খাতা (৪) কতলে জারি মাজরায়ে খাতা (৫) কতল বিস সবব। (১) কতলে আমদ বলা হয় হাতিয়ার দ্বারা কাউকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা অথবা যা অঙ্গ কর্তনের ক্ষেত্রে হাতিয়ারের মতো যেমন– ধারালো লাকড়ি, পাথর, আগুন। এর শাস্তি হলো গুনাহ এবং কেসাস। কিন্তু নিহত ব্যক্তির আপনজন যদি ক্ষমা করে দেয় তাহলে কেসাস লাগবে না এবং তাতে কাফফারা নেই। (২) কতলে শিরহে আমদ ঃ ইমাম আজম (র.) বলেন, কতলে শিবহে আমদ হলো, এমন জিনিস দ্বারা ইচ্ছাকৃত কতল করা যা হাতিয়ার বা তার মতো অন্য কিছু নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَاكَفَّارَةَ فِيْهِ ঃ আহনাফদের নিকট ইচ্ছাকৃত হত্যার মধ্যে কাফ্‌ফারা নেই এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট আছে। কেননা ভুলে হত্যা করার তুলনায় এতে কাফ্‌ফারার অধিক প্রয়োজন। আমরা বলি যে, ইচ্ছাকৃত হত্যা করা সরাসরি কবীরা গুনাহ আর কাফফারা হলো ইবাদত যার দ্বারা বুঝা গেল ইচ্ছাকৃত কতল, আর কাফ্‌ফারার মধ্যে কোনো প্রকার সম্পর্ক নেই।

قَوْلُهُ وَشِبْهُ الْعَمَدِ الخ ঃ ইমাম আযম (র.)-এর নিকট কতলে শিবহে আমদ হলো এমন বস্তু দ্বারা হত্যা করা যা শরীরের কোনো অংশকে পৃথক করতে পারে না যদিও বড় পাথর বা বড় লাঠি হোকনা কেন। সাহেবাইন এবং ইমাম শাফী (র.)-এর নিকট কতলে শিবহে আমদ হলো, কাউকে এমন জিনিস দ্বারা হত্যা করা যেগুলোর দ্বারা সাধারণত হত্যা করা যায় না। ইমাম মালেক (র.) বলেন, আমি জানি না শিবহে আমদ আবার কি? কতল দুই প্রকার ঃ (১) কতলে আমদ অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত হত্যা করা (২) কতলে খতা অর্থাৎ ভুলে হত্যা করা। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর প্রমাণ এই হাদীস–

اِلَّا اَنَّ دِيَةَ الْخَطَاشِبْهُ الْعَمَدِ مَاكَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْاِبِلِ مِنْهَا اَرْبَعُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهَا اَوْلَادُهَا رَوَاهُ اَبُوْ دَاوٗدَ وَالنَّسَائِىْ وَابْنُ مَاجَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رض) وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو (رض)

وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ عَظِيْمٍ اَوْ بِخَشَبَةٍ عَظِيْمَةٍ فَهُوَ عَمَدٌ وَشِبْهُ الْعَمَدِ اَنْ يَّتَعَمَّدَ ضَرْبَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ بِهِ غَالِبًا وَمُوْجِبُ ذَالِكَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ الْمَاْثَمُ وَالْكَفَّارَةُ وَلَا قَوْدَ فِيْهِ وَفِيْهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْخَطأُ عَلٰى وَجْهَيْنِ خَطَأً فِى الْقَصْدِ وَهُوَ اَنْ يَّرْمِىَ شَخْصًا يَظُنُّهُ صَيْدًا فَاِذَا هُوَ اٰدَمِىٌّ وَخَطَأً فِى الْفِعْلِ وَهُوَ اَنْ يَّرْمِىَ غَرَضًا فَيُصِيْبَ اٰدَمِيًّا وَمُوْجِبُ ذَالِكَ الْكَفَّارَةُ وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا مَاْثَمَ فِيْهِ وَمَا اُجْرِىَ مَجْرَى الْخَطَاِ مِثْلُ النَّائِمِ يَنْقَلِبُ عَلٰى رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْخَطَاِ وَاَمَّا الْقَتْلُ بِسَبَبٍ كَحَافِرِ الْبِئْرِ وَ وَاضِعِ الْحَجَرِ فِىْ غَيْرِ مِلْكِهِ وَمُوْجِبُهُ اِذَا تَلَفَ فِيْهِ اٰدَمِىٌّ الدِّيَةَ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَالْقِصَاصُ وَاجِبٌ بِقَتْلِ كُلِّ مَحْقُوْنِ الدَّمِ عَلَى التَّابِيْدِ اِذَا قَتَلَ عَمَدًا ـ

সরল অনুবাদ ঃ সাহেবাইন (র.) বলেন, যখন কাউকে বড় পাথর অথবা বড় লাকড়ি দ্বারা হত্যা করা হয় তখন তাকে কতলে আমদ বলবে। এবং শিবহে আমদ বলা হয় কাউকে ইচ্ছাকৃত এমন জিনিস দ্বারা হত্যা করা যার দ্বারা সাধারণত মরে না। উভয় রায় অনুযায়ী তার শাস্তি হলো গুনাহ এবং কাফ্ফারা। আর তাতে কোনো কেসাস নেই; বরং আকেলার ওপর دِيَّتْ مُغَلَّظَةٌ এবং কতলে খতা দুই প্রকার ঃ (১) 'খাতা ফিল কসদ' কোনো মানুষকে শিকার মনে করে তীর নিক্ষেপ করা। (২) খাতা ফিল ফে'ল টার্গেট করে তীর নিক্ষেপ করার পর কোনো ব্যক্তির গায়ে লেগে যাওয়া, তার সাজা কাফফারা। আর আকেলাদের ওপর দিয়ত। তাতে কোনো গুনাহ নেই। "কতলে জারি মাজরায়ে খাতা" ঘুমন্ত ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির ওপর পড়ার কারণে মরে যাওয়া। তার হুকুম "কতলে খতা"–এর মতো এবং "কতল বিস সবাব" অন্যের জায়গায় কূপ খননকারী এবং পাথর স্থাপনকারী তার শাস্তি যখন উহার দ্বারা মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় আকেলার ওপর দিয়ত এবং উহাতে কাফফারা নেই। এবং কেসাস ওয়াজিব প্রত্যেক ঐ সব লোককে হত্যা করার দ্বারা যাদের রক্তকে সদা-সর্বদার জন্য নিরাপত্তা প্রদান করা হয়েছে যখন তাদেরকে ইচ্ছা করে হত্যা করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلَهُ بِمَا لَا يُقْتَلُ الخ ঃ এটার দৃষ্টান্ত যেমন ছোট আকারের লাঠি যখন তার দ্বারা লাগাতার মারা না হয়, যদি লাগাতার মারা হয় তবে শিবহে আমাদ হবে না বরং আমাদ হবে।

قَوْلَهُ اَلْمَاثَمَ وَالْكَفَّارَةُ الخ ঃ কারণ সে এরূপ অবস্থায় হত্যা করেছে যে মারার ইচ্ছা করে ছিল, আর কাফফারা এ জন্য যে, উহার সাথে ভুলে হত্যার সাথে মিল আছে।

قَوْلَهُ عَلَى الْعَاقِلَةِ الخ ঃ عَاقِلَة–এর আভিধানিক অর্থ সাহায্যকারী আর শরিয়তের পরিভাষায় عَاقِلَة বলা হয় গোত্রের লোক সমূহকে এই দিয়ত এজন্য আকেলাদের ওপর ওয়াজিব যে, উহাকে ভুলের ওপর তুলনা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ الْكَفَّارَةُ الخ ঃ এ মাসআলার প্রমাণ– فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلٰى اَهْلِهَا এবং দিয়ত আকেলাদের ওপর তিন বৎসরে উসূল হবে।

وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ وَلَا يُقْتَلُ الْمُسْلِمُ بِالْمُسْتَأْمِنِ وَيُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ وَالْكَبِيرُ بِالصَّغِيرِ وَالصَّحِيحُ بِالْأَعْمٰى وَالزَّمِنِ وَلَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَلَا بِعَبْدِهِ وَلَا بِمُدَبَّرِهِ وَلَا بِمُكَاتَبِهِ وَلَا بِعَبْدِ وَلَدِهِ وَمَنْ وَرِثَ قِصَاصًا عَلٰى أَبِيهِ سَقَطَ وَلَا يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَإِذَا قُتِلَ الْمُكَاتَبُ عَمْدًا وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا الْمَوْلٰى فَلَهُ الْقِصَاصُ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً.

সরল অনুবাদ ঃ আজাদকে আজাদের পরিবর্তে এবং আজাদকে গোলামের পরিবর্তে, গোলামকে আজাদের পরিবর্তে এবং গোলামকে গোলামের পরির্বতে, মুসলমানকে জিম্মির পরিবর্তে হত্যা করা হবে। হাঁ, মুসলমানকে মুসতানের পরিবর্তে হত্যা করা হবে না। এবং পুরুষকে মহিলার পরির্বতে এবং ছোটদের পরিবর্তে বড়দেরকে এবং অন্ধ ও পঙ্গুর পরিবর্তে সুস্থ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে। ছেলে ও গোলামের পরিবর্তে পিতা ও মনিবকে হত্যা করা হবে না। এবং আবদে মুদাব্বার ও আবদে মুকাতাব-এর পরিবর্তে মনিবকে হত্যা করা হবে না, নিজ সন্তানের গোলামের পরিবর্তেও পিতাকে হত্যা করা হবে না। এবং যে ব্যক্তি তার পিতার ওপর কেসাসের ভিত্তিতে ওয়ারিশ হয় সে মিরাস থেকে বঞ্চিত এবং কেসাস একমাত্র তলোয়ারের দ্বারাই নেওয়া যায় এবং যদি কোনো আবদে মুকাতাব ইচ্ছাকৃতভাবে নিহত হয় এবং তার মনিব ছাড়া অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকে তাহলে তার জন্য কেসাসের অধিকার রয়েছে যদি গোলামের কোনো মাল না থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْحُرُّ بِالْعَبْدِ الخ ঃ আইম্মায়ে ছালাছাহ (র.)-এর মতে স্বাধীন ব্যক্তিকে দাসের মোকাবেলায় হত্যা করা যাবে না, বরং হত্যাকারীর ওপর উহার মূল্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী – اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ-এর মধ্যে স্বাধীন এর মোকাবেলায় স্বাধীন এবং দাসের পরিবর্তে দাস বলা হয়েছে। অর্থাৎ এটার মধ্যে জাতের পরিবর্তে জাত বলা হয়েছে, আর এ আয়াতের দাবি অনুযায়ী স্বাধীনকে দাসের পরিবর্তে হত্যা করা যাবে না, এ ছাড়া কেসাসের ভিত্তি পরস্পর বরাবর ও সমানের ওপর, অথচ স্বাধীন ও দাসের মাঝে পরস্পর সমতা নেই, কারণ স্বাধীন ব্যক্তি মালিক হয় আর দাস হয়ে থাকে মামলূক, মালিক হওয়ার মধ্যে শক্তির ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে পক্ষান্তরে অন্যের অধিকারে থাকলে অক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট। আমাদের প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী– اَلنَّفْسُ بِالنَّفْسِ -এ আয়াত مُطْلَقٌ এতে স্বাধীন ও দাসের কোনো বাধ্যতা ও শর্তারোপ করা হয়নি। অতএব এ আয়াত اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ-এর জন্য نَاسِخٌ (রহিতকারী) হিসাবে গণ্য হবে। –(তাফসীরে দুররে মানছূর) এ ছাড়া আমাদের আর একটি প্রমাণ হলো, আল্লাহ তা'আলার বাণী – كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى -এ আয়াতটি ব্যাপক এখানে স্বাধীন ও দাসের ভেদাভেদ নেই। আমাদের তৃতীয় প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطَانًا এ আয়াতে ও ব্যাপকভাবে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে আমাদের চতুর্থ প্রমাণ এই যে, কতিপয় সহীহ ও বিশুদ্ধ হাদীসেও ব্যাপকভাবে বলা হয়েছে যে, فِى الْعَمْدِ اَلْقَوَدُ আমাদের পক্ষ থেকে আইম্মায়ে ছালাছার প্রমাণের খণ্ডন এভাবে করা হয়েছে যে, তাদের প্রমাণ সঠিক নয়। কারণ ঐ সব প্রমাণ تَخْصِيص ذِكْرِى-এর দ্বারা অন্য প্রমাণের ওপর কোনো নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়নি। সুতরাং تَخْصِيص ذِكْرِى-এর কারণে দাসের পরিবর্তে স্বাধীনের হত্যার মধ্যে কোনো ক্ষতি নেই, অন্যথা পুরুষকে নারীর পরিবর্তে হত্যা করাও বৈধ হবে না। কারণ আয়াতে আছে – وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى অথচ এটার সমর্থনকারী কোনো ইমাম নেই।

وَاِنْ تَرَكَ وَفَاءً وَوَارِثُهُ غَيْرُ الْمَوْلٰى فَلَا قِصَاصَ لَهُمْ وَاِنِ اجْتَمَعُوْا مَعَ الْمَوْلٰى وَاِذَا قُتِلَ عَبْدُ الرَّهْنِ فِىْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ حَتّٰى يَجْتَمِعَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا عَمْدًا فَلَمْ يَزَلْ صَاحِبُ فِرَاشٍ حَتّٰى مَاتَ فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ عَمْدًا مِنَ الْمَفْصَلِ قُطِعَتْ يَدُهُ وَلَوْكَانَتْ اَكْبَرُ مِنْ يَدِ الْمَقْطُوْعِ وَكَذٰلِكَ الرِّجْلُ وَمَارِنُ الْاَنْفِ وَالْاُذُنِ وَمَنْ ضَرَبَ عَيْنَ رَجُلٍ فَقَلَعَهَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ فَاِنْ كَانَتْ قَائِمَةً وَ ذَهَبَ ضَوْئُهَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ تُحْمٰى لَهُ الْمِرْاٰةُ وَيُجْعَلُ عَلٰى وَجْهِهٖ قُطْنٌ رُطَبٍ وَتُقَابِلُ عَيْنَهُ بِالْمِرْاٰةِ حَتّٰى يَذْهَبَ ضَوْءُهَا وَفِى السِّنِّ الْقِصَاصُ وَفِىْ كُلِّ شَجَّةٍ يُمْكِنُ فِيْهَا الْمُمَاثَلَةُ الْقِصَاصُ وَلَاقِصَاصَ فِىْ عَظْمٍ اِلَّا فِى السِّنِّ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ شِبْهُ عَمْدٍ وَاِنَّمَا هُوَ عَمْدًا وَخَطَأً وَلَاقِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ فِيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ وَلَابَيْنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَلَا بَيْنَ الْعَبْدَيْنِ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি তার কোনো মাল থাকে এবং মনিব ব্যতীত তার কোনো ওয়ারিশ থাকে তাহলে তাদের কেসাসে নেওয়ার অধিকার নেই যদিও তারা মনিবের সাথে মিলে যায়। যদি মুরতাহেনের হাতে আবদে মরহুন নিহত হয়ে যায় তাহলে রাহেন ও মুরতাহেন একত্রিত হওয়া পর্যন্ত কেসাস ওয়াজিব হবে না। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কাউকে আঘাত করে এবং সে এতে জনম রোগী হয়ে যায় এমনকি এই রোগেই মারা যায় তাহলে তার ওপর কেসাস ওয়াজিব। এবং যদি কোনো ব্যক্তি কারো কব্জি কেটে দেয় তাহলে তারও হাত কাটা হবে যদিও কাটা হাতের চেয়ে তার হাত বড় হয়। এমনিভাবে পা, নাক ও কানের হুকুমও তাই। কেউ যদি কারো চক্ষু আঘাতের দ্বারা উঠিয়ে ফেলে তাহলে তার ওপর কেসাস ওয়াজিব নয়। আর যদি চক্ষু বাকি থাকে কিন্তু দৃষ্টি শক্তি চলে যায় তাহলে তার ওপর কেসাস ওয়াজিব। এই ব্যক্তির জন্য শিশা গরম করা হবে এবং চেহারার ওপর ভিজা তুলা রেখে তার চোখের সামনে শিশা রাখা হবে। যে পর্যন্ত তার (চোখের) আলো (সম্পূর্ণ) চলে যায়। এবং দাঁতের মধ্যে কেসাস রয়েছে এবং ঐ জখমের মধ্যেও কেসাস রয়েছে যার মধ্যে মমতা বিধান সম্ভব এবং দাঁত ব্যতীত অন্য কোনো হাড়ের মধ্যে কেসাস নেই। এবং জান ব্যতীত অন্য অঙ্গের কতলে শিবহে আমদ নেই; বরং সেটা 'কতলে আমদ" ও "কতলে খাতা" হবে। এবং জান ব্যতীত অন্য অঙ্গের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা এবং আজাদ ও গোলাম এবং দুই গোলাম-এর কেসাস নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْاَةِ الخ ঃ যদি কোনো পুরুষ মহিলার বা স্বাধীন পুরুষ দাসের অথবা এক গোলাম অপর গোলামের হাত বা পা কেটে ফেলে তবে আহনাফের মতে উহার মধ্যে কেসাস নেই, আইম্মায়ে ছালাছাহ এবং ইবনে আবী লায়লা (র.)-এর মতে এ সবের মধ্যে কেসাস আছে। কারণ এসব ইমামগণের মতে যে স্থানে জানের মধ্যে কেসাস আছে ঐখানে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যেও কেসাস আছে। আমরা বলি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে তো মালের মতো বিধান প্রয়োগ করা হয় এ জন্য مُمَاثَلَتْ শর্ত অথচ এগুলোর মধ্যে কোনো مُمَاثَلَتْ নেই। কেননা জান এর মধ্যে ব্যবধান হলে দিয়ত ও মূল্যের মধ্যেও ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।

وَيَجِبُ الْقِصَاصُ فِي الْاَطْرَافِ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ مِنْ نِصْفِ السَّاعِدِ اَوْ جَرَحَهُ جَائِفَةً فَبَرَأَ مِنْهَا فَلَاقِصَاصَ عَلَيْهِ وَاِذَا كَانَ يَدُ الْمَقْطُوْعِ صَحِيْحَةً وَيَدُ الْقَاطِعِ شَلَّاءَ اَوْنَاقِصَةُ الْاَصَابِعِ فَالْمَقْطُوْعُ بِالْخِيَارِ اِنْشَاءَ قَطَعَ الْيَدَ وَالْمَعِيْبَةَ وَلَاشَيْئَ لَهُ غَيْرَهَا وَاِنْ شَاءَ اَخَذَ الْاَرْشَ كَامِلًا وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَاسْتَوْعَبَتْ الشَّجَّةُ مَا بَيْنَ قَرْنَيْهِ وَهِيَ لَاتَسْتَوْعِبُ مَا بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّاجِّ فَالْمَشْجُوْجُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اِقْتَصَّ بِمِقْدَارِ شَجَّتِهِ يَبْتَدِئُ مِنْ اَيِّ الْجَانِبَيْنِ شَاءَ وَاِنْ شَاءَ اَخَذَ الْاَرْشَ كَامِلًا وَلَاقِصَاصَ فِي اللِّسَانِ وَلَا فِي الذَّكَرِ اِلَّا اَنْ يَّقْطَعَ الْحَشْفَةَ وَاِذَا اصْطَلَحَ الْقَاتِلُ اَوْلِيَاءَ الْمَقْتُوْلِ عَلٰى مَالٍ سَقَطَ الْقِصَاصُ وَ وَجَبَ الْمَالُ قَلِيْلًا كَانَ اَوْكَثِيْرًا فَاِنْ عَفَا اَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ اَوْصَالَحَ مِنْ نَصِيْبِهِ عَلٰى عِوَضٍ سَقَطَ حَقُّ الْبَاقِيْنَ مِنَ الْقِصَاصِ.

সরল অনুবাদ ঃ এবং দুই গোলামের মধ্যে এবং মুসলমান ও কাফিরের অঙ্গের মধ্যে কেসাস আছে। যে ব্যক্তি কারো হাতের পাঞ্জার অর্ধাংশ থেকে অথবা পেট পর্যন্ত জখম করে দিল এবং সে এগুলো থেকে সুস্থ হয়ে গেল তাহলে তার ওপর কেসাস নেই। এবং যদি কর্তিত ব্যক্তির হাত সুস্থ হয়ে যায় এবং কর্তনকারী ব্যক্তির হাত প্যারালাইসিস হয়ে যায় অথবা আঙ্গুলসমূহ অসম্পূর্ণ হয় তাহলে কর্তিত ব্যক্তির অধিকার রয়েছে যে, সে দূষণীয় ব্যক্তির হাত কেটে দেয়, তাহলে তার জন্য আর কিছুই হবে না। অথবা সে পূর্ণ দিয়াত নিয়ে নেবে। যে ব্যক্তি কাউকে জখম করল অতঃপর উক্ত ক্ষত তার মাথার উভয় পাশ ঘিরে নিল অথচ উক্ত জখম জখমকারী ব্যক্তির উভয় পাশ ঘিরেনি, তাহলে জখমকৃত ব্যক্তির অধিকার রয়েছে। ইচ্ছা করলে যে কোনো স্থান থেকে জখম (ক্ষত) পরিমাণ কেসাস নিতে পারবে এবং ইচ্ছা করলে পুরোপুরি দিয়াতও নিতে পারবে। এবং লিঙ্গের মধ্যে কেসাস নেই, কিন্তু ইচ্ছা করলে লিঙ্গের মাথা কেটে দিতে পারবে। এবং "কাতেল" যখন "মাকতূলের" আভিভাকদের সাথে মীমাংসা করে নেয়, তাহলে কেসাস রহিত হয়ে যায় এবং তার ওপর মাল ওয়াজিব হবে কম হোক বা বেশি হোক। অতঃপর কয়েক জন মিলে হত্যা করার পর যদি ক্ষমা করে দেয় অথবা নিজের অংশ কোনো জিনিসের পরিবর্তে মীমাংসা করে নেয় তখন অন্য লোকদের কেসাসের অধিকার "সাকেত" হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ جَائِفَةً الخ ঃ জায়েফাহ ঐ ক্ষতকে বলে যা সিনা বা পেট অথবা পিঠের থেকে পেটের ভিতর পর্যন্ত পৌছে যায়।

قَوْلُهُ وَهِيَ لَاتَسْتَوْعِبُ الخ ঃ কেননা আলোচ্য মাসআলায় মাথা ক্ষতকারী ব্যক্তির মাথা ক্ষতকৃত ব্যক্তির চেয়ে বড়, অতএব এখন যদি ক্ষতকারী ব্যক্তির মাথা থেকে ঐ পরিমাণ ক্ষত করা যায় যা ক্ষতকৃত ব্যক্তির মাথায় আছে তবে ক্ষতকারী ব্যক্তির মাথায় কিছু অংশ বাকি থেকে যাবে।

قَوْلُهُ وَلَاقِصَاصَ فِي اللِّسَانِ الخ ঃ এ বিধান ঐ সময় যখন জিহ্বার কিছু অংশ কাটে; কিন্তু যদি গোড়া থেকে কাটে, তখন কাজি আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে কেসাস আসবে।

قَوْلُهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ الخ ঃ এ মাসআলার প্রমাণ, মহান আল্লাহর বাণী–

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ.

وكَانَ لَهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الدِّيَةِ وَإِذَا قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا عَمَدًا اُقْتُصَّ مِنْ جَمِيْعِهِمْ وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً فَحَضَرَ اَوْلِيَاءُ الْمَقْتُوْلِيْنَ قُتِلَ لِجَمَاعَتِهِمْ وَلَاشَيْءَ لَهُمْ غَيْرَ ذَالِكَ فَاِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قُتِلَ لَهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِيْنَ وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ فَمَاتَ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ يَدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ فَلَاقِصَاصَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَعَلَيْهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يَمِيْنَى رَجُلَيْنِ فَحَضَرَا فَلَهُمَا اَنْ يَّقْطَعَا يَدَهُ وَيَاْخُذَا مِنْهُ نِصْفَ الدِّيَةِ يَقْتَسِمَانِهَا نِصْفَيْنِ -

সরল অনুবাদ ঃ এবং তার অংশ "দিয়াত" থেকে হবে এবং যখন বহু মানুষ মিলে একজনকে হত্যা করবে তখন সবার থেকে কেসাস নেওয়া হবে। এবং যদি এক ব্যক্তি বহু মানুষকে হত্যা করে অতঃপর হত্যাকৃত ব্যক্তিগণের অভিভাবকরা উপস্থিত হয়ে যায় তাহলে সবার পরির্বতে তাকে হত্যা করা হবে এবং তাদের জন্য এটা ছাড়া আর অন্য কোনো কিছু করার অধিকার নেই এবং ঐ সময় যদি হত্যাকৃত ব্যক্তি গণের মধ্য থেকে যে কোনো এক জনের অভিভাবক উপস্থিত হয়ে তাকে হত্যা করে দেয় তাহলে অন্যদের পক্ষ থেকেও "রহিত" হয়ে যাবে। এবং যার ওপর কেসাস ওয়াজিব ছিল সে যদি মারা যায় তাহলে কেসাস শেষ হয়ে যাবে। যখন দুই ব্যক্তি মিলে একজনের হাত কেটে দেয় তাহলে তাদের মধ্যে করো ওপর কেসাস ওয়াজিব হবে না। বরং "নিসফে দিয়াত" ওয়াজিব হবে। এবং এক ব্যক্তি যদি দু'ব্যক্তির ডান হাত কেটে দেয় এবং উভয় জনই উপস্থিত থাকে তাহলে দু'জনে মিলে তার হাত কেটে দেবে অথবা অর্ধেক দিয়াত নিয়ে দু'জনে ভাগ করে নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قَتَلَ الخ ঃ অর্থাৎ এক ব্যক্তিকে একদলে মিলে হত্যা করল এবং প্রত্যেকেই আঘাত করল তখন একজনের পরিবর্তে গোটা দলকে হত্যা করা হবে। হযরত ইবনে যুবাইর ও যুহরী (র.)-এর মতে গোটা দলকে হত্যা করা হবে না; বরং সবার ওপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। তাদের প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী- إِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (الْآيَةَ) এ আয়াতের দ্বারা বুঝা যায় একের বদলায় একাধিককে হত্যা করা যাবে না। আমাদের প্রমাণ যে, হযরত ওমর (রা.) একের বদলায় পাঁচ বা সাত ব্যক্তিকে হত্যা করেছেন এবং বলেছেন, যদি সাফাবাসী উহার হত্যার ওপর একমত হতো এবং সহায়তা করতো তবে আমি উহাদের সকলকে হত্যা করতাম। -(মালেক, মুহাম্মদ, শাফেয়ী (র.) বর্ণনা করেছেন)

قَوْلُهُ وَإِذَا قَطَعَ رَجُلَانِ الخ ঃ অর্থাৎ দু' ব্যক্তি ছুরি নিয়ে এক ব্যক্তির হাতে চালালো এতে ঐ ব্যক্তির হাত কেটে গেল, তবে আমাদের মাযহাব মতে উভয়ের মধ্যে থেকে কোনো একজনের ওপরও কেসাস হবে না, হাঁ উভয়ের ওপর হাতের দিয়তের ক্ষতিপূরণ আসবে। আইম্মায়ে ছালাছার মতে উভয়ের হাত কাটা যাবে যেমনটি কতিপয় ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে হত্যা করলে সবাইকে হত্যা করা যায়। আমাদের পক্ষ থেকে তাদের প্রমাণকে এভাবে খণ্ডন করি যে, এক্ষেত্রে উভয়েই কর্তনকারী, কারণ হাত কাটা উভয়ের শক্তি থেকেই সংঘটিত হয়েছে, আর হাতের মধ্যে কর্তন শক্তিটা বণ্টন হয়ে গেছে। অতএব প্রত্যেকের দিকেই কিছু হাত কর্তন করাকে সম্বন্ধ করা হবে, সুতরাং এক হাত এবং দুই হাতের মাঝে বরাবর হতে পারে না। কিন্তু জান হত্যা করার বিধান এর বিপরীত, কেননা উহা উভয় ব্যক্তির দিকেই পরিপূর্ণভাবে সম্বন্ধ হয়ে থাকে। -(আল-মিসবাহুন্নূরী)

وَاِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَطَعَ يَدَهُ فَلِلْاٰخَرِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَاِذَا اَقَرَّ الْعَبْدُ بِقَتْلِ الْعَمَدِ لَزِمَهُ الْقَوَدُ وَمَنْ رَمٰى رَجُلًا عَمَدًا فَنَفَذَ مِنْهُ السَّهْمَ اِلٰى اٰخَرَ فَمَاتَا فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ لِلْاَوَّلِ وَالدِّيَةُ لِلثَّانِىْ عَلٰى عَاقِلَتِهٖ -

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি দু'জনের মধ্য থেকে একজন উপস্থিত হয় তাহলে তার হাত কেটে দেবে এবং দ্বিতীয় অর্ধেক দিয়াত নেবে। যখন গোলাম ইচ্ছাকৃত হত্যাকে স্বীকার করে তখন তার ওপর কেসাস লাযেম হবে। কেউ যদি ইচ্ছা করে কোনো ব্যক্তিকে তীর নিক্ষেপ করে আর এটা সেই ব্যক্তিকে অতিক্রম করে দ্বিতীয় ব্যক্তির গায়ে লেগে যায় তারপর উভয় জনেই মারা যায় তখন প্রথম ব্যক্তির জন্য কেসাস নেওয়া হবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য তার আকেলার ওপর দিয়ত আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْقِصَاصُ لِلْاَوَّلِ الخ ঃ এর কারণ এই যে, প্রথম হত্যা হচ্ছে قَتْلِ عَمَدْ বা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা তাই উহাতে কেসাস ওয়াজিব আর দ্বিতীয় হত্যা قَتْلِ خَطَأْ বা অনিচ্ছায় ভুলশত হত্যা, আর এতে দিয়ত দেওয়া আবশ্যক।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) هات مناسبة كتاب الجنايات مع احكام العتاق مفصلا؟ ثم اكتب معنى الجناية لغة ثم بين معناها الشرعى مفصلا؟ وما الفرق بين الجناية والغصب والاتلاف؟

(٢) بين احكام الجناية بضوء القران الكريم ثم اكتب سبب تحريم القتل و هات حكمة القصاص بضوء القران الكريم؟

(٣) كم قسما للقتل وما هى؟ فصل اقسام القتل مع بيان احكامه؟

(٤) هل يقتل المسلم بالمستامن؟ (ب) هل قتل الرجل بابنه وعبده ومدبره؟ (ج) بين معنى الجائفة اولا ثم هات معنى الشاج والمشجوج؟

كِتَابُ الدِّيَاتِ
দিয়ত (রক্তঋণ) পর্ব

<u>**যোগসূত্র ঃ**</u> জেনায়াত পর্বে যেহেতু কেসাস-এর আলোচনা হয়েছে তাই গ্রন্থকার (র.) দিয়ত তথা রক্তঋণ পর্বকে তার পরে এনেছেন, কারণ মানুষের জীবন ও আত্মার নিরাপত্তা বা হিফাজতের জন্য কেসাস তথা জানের বদলায় জান দেওয়া হলো আসল বিধান আর দিয়ত তথা রক্তঋণ আদায় করা হচ্ছে কেসাসের স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি তাই বেশি শক্তিশালী বিধানকে পূর্বে বর্ণনা করে এখন দিয়ত পর্বকে বর্ণনা করেছেন।

دِيَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ دِيَةٌ-এর বহুবচন دِيَاتٌ তার تَاءْ টি وَاوْ -এর পরিবর্তে এসেছে এটা دِيَةٌ এটা وَدْىٌ থেকে مُشْتَقٌ উহার অর্থের মধ্যে প্রবাহিত হওয়া ও বের হওয়া পাওয়া যায়। وَادِىْ-কে وَادِىْ এ জন্য বলা হয় যে, উহার থেকে পানি প্রবাহিত হয়।

دِيَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় মানুষ বা তার কোনো অঙ্গের সম্পদের মাধ্যমে বদলাকে دِيَة বলা হয়।

<u>**হত্যার প্রমাণের জন্য দু'জন সাক্ষী জরুরি হওয়ার হিকমত ঃ**</u> হত্যার প্রামাণের জন্য দু'জন সাক্ষী ও ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী জরুরি হওয়ার কারণ এই যে, হত্যার ব্যাপারে দু'জন সাক্ষী যথেষ্ট হওয়া এবং ব্যভিচার প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী তলব করার হুকুম আল্লাহর অনন্ত হেকমত ও কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিধান। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্য হলো হদ ও কেসাসের ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা। হত্যার ব্যাপারে সাবধানতা হলো এই যে, যদি হত্যা প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী চাওয়া হতো, তাহলে অধিক পরিমাণে খুন-খারাবি হতো। হত্যার ব্যাপারে মানুষ দুঃসাহসী হয়ে উঠতো। অধিকাংশ হত্যাকারী কেসাস হতে রক্ষা পাওয়ায় আরও বেশি খুন-খারাবির কারণ হয়ে দাঁড়াতো। আর ব্যভিচারের ক্ষেত্রে সাবধানতা এই যে, ব্যভিচারের প্রমাণের জন্য চারজন সাক্ষী চাওয়ার দরুন মুসলমানের ইজ্জত আবরুর প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখা হয়েছে। সুতরাং ব্যভিচার প্রমাণের জন্য এমন চারজন সাক্ষী আবশ্যক করা হয়েছে যারা ব্যভিচারের প্রত্যক্ষ ঘটনা এমনভাবে বর্ণনা করবে যাতে সন্দেহ-সংশয়ের কোনোই অবকাশ না থাকে। এভাবে ব্যভিচারের স্বীকারোক্তির বেলায়ও চারবারের কম স্বীকারোক্তিকে যথেষ্ট মনে করা হয়নি। এটাতেও এই অপমানকর বিষয়টি গোপন রাখার ব্যাপারে কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছে। কারণ এর প্রকাশ আল্লাহর নিকট অত্যন্ত অপছন্দনীয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে এই ঘৃণিত ও নিন্দনীয় কাজটি মু'মিনগণের মধ্যে প্রচারকারীর ওপর দুনিয়া ও আখেরাতে কঠোর শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন।

إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا شِبْهَ عَمْدٍ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالَى مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَاعًا خَمْسٌ وَّعِشْرُونَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَخَمْسٌ وَّعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَّعِشْرُونَ حِقَّةً وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جِذْعَةً وَّلَا يَثْبُتُ التَّغَلُّظُ إِلَّا فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً فَإِنْ قَضَى بِالدِّيَةِ مِنْ غَيْرِ الْإِبِلِ لَمْ تَتَغَلَّظْ وَفِي قَتْلِ الْخَطَإِ تَجِبُ بِهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْكَفَّارَةُ عَلَى الْقَاتِلِ وَالدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ إِبْنَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَّعِشْرُونَ جِذْعَةً وَمِنَ الْعَيْنِ أَلْفُ دِيْنَارٍ ـ

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ যখন কোনো ব্যক্তি কোনো এক ব্যক্তিকে শিবহে আমাদ-এর দ্বারা হত্যা করে তবে উহার (হত্যাকারীর) আকেলা-এর ওপর দিয়তে মোগাল্লাযা হবে, আর হত্যাকারীর ওপর কাফ্ফারা আসবে। শায়খাইন-এর মতে শিবহে আমাদ-এর দিয়ত চার প্রকারের- একশত উট, অর্থাৎ পঁচিশটি বিনতে মাখাজ, পঁচিশটি বিনতে লাবূন, পঁচিশটি হিক্কা ও পঁচিশটি জিয'আ এবং দিয়তে মোগাল্লাজা একমাত্র উটের দ্বারা (আদায়) হয়। যদি উট ব্যতীত অন্য কোনো বস্তু দ্বারা দিয়ত আদায় করে তবে উহা দিয়তে মোগাল্লাযা হবে না। এবং কতলে খাতা বা ভুলবশত হত্যার মধ্যে দিয়ত আকেলার ওপর ওয়াজিব হয় আর কাফ্ফারা হত্যাকারীর ওপর এবং কতলে খাতা-এর দিয়ত। পাঁচ প্রকারের একশত উট, বিশটি বিনতে মাখাজ, বিশটি ইবনে মাখাজ, বিশটি বিনতে লাবূন, বিশটি হিক্কা এবং বিশটি জায'আ এবং স্বর্ণের থেকে এক হাজার দিনার

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ دِيَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ الخ ঃ আলোচ্য বিধানে আইম্মায়ে ছালাছার মতে ত্রিশটি হিক্কা, ত্রিশটি জিয'আ এবং চল্লিশটি ছানিয়্যা ওয়াজিব। শাইখাইন (র.)-এর প্রমাণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর হাদীস যার মধ্যে শাইখাইন (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে, এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (র.) তাঁর সুনানে বর্ণনা করেছেন।

قَوْلُهُ فِي الْإِبِلِ خَاصَّةً الخ ঃ কারণ শরিয়তের পক্ষ থেকে দিয়তে মোগাল্লাযা শুধু উটের মধ্যে স্থির করা হয়েছে।

قَوْلُهُ اَلدِّيَةُ فِي الْخَطَإِ الخ ঃ আহনাফ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কতলে খাতা বা ভুলবশত হত্যার দিয়ত পাঁচ প্রকারের একশত উট। ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেক (র.)-এর মতে এক বৎসরের বিশটি উটের স্থানে দু'বৎসরের বিশটি উট তাঁদের প্রমাণ হযরত সাহল ইবনে আবী হাইছাম (রা.)-এর বর্ণনা। আর আমাদের প্রমাণ, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা।

قَوْلُهُ وَمِنَ الْعَيْنِ الخ ঃ ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে চাঁদির থেকে দিয়ত দিলে বারো হাজার দিরহাম দেবে। তাঁদের প্রমাণ, নবী করীম (সা.)-এর যুগে বনূ আদী তথা আদী গোত্রের এক ব্যক্তিকে হত্যা করা হয় তখন নবী করীম (সা.) তার দিয়ত বারো হাজার দিরহাম নির্ধারিত করেন। আমাদের প্রমাণ এই যে, হযরত ওমর (রা.) চাঁদি থেকে দশ হাজার দিরহাম বলেছেন। সুনানে বায়হাকীতে এ সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া হুযূর (সা.)-এর যুগে ওজনে খামসা, ওজনে ছিত্তাহ, ওজনে 'আশারা বিভিন্ন প্রকার ওজন প্রচলিত ছিল সুতরাং তাদের প্রমাণকে ওজনে খামসা আর ওমর (রা.)-এর বর্ণনাকে ওজনে সিত্তাহ-এর ওপর হিসাব করলে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বন্দ্ব থাকে না।

وَمِنَ الْوَرِقِ عَشَرَةُ اٰلَافِ دِرْهَمٍ وَلَا يَثْبُتُ الدِّيَةُ اِلَّا مِنْ هٰذِهِ الْاَنْوَاعِ الثَّلٰثَةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنْهُمَا وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَمِنَ الْغَنَمِ اَلْفَا شَاةٍ وَمِنَ الْحُلَلِ مِائَةَ حُلَّةٍ كُلُّ حُلَّةٍ ثَوْبَانِ وَ دِيَةُ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ سَوَاءٌ وَفِى النَّفْسِ الدِّيَةُ وَفِى الْمَارِنِ الدِّيَةُ وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِى الْعَقْلِ اِذَا ضَرَبَ رَأْسَهُ فَذَهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ وَفِى اللِّحْيَةِ اِذَا حَلَقَتْ فَلَمْ تَثْبُتِ الدِّيَةُ وَفِىْ شَعْرِ الرَّاْسِ الدِّيَةُ وَفِى الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْيَدَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الرِّجْلَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْاُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى الْاُنْثَيَيْنِ الدِّيَةُ وَفِىْ ثَدْيَىِ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ وَفِىْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِى اَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِى اَحَدِهِمَا رُبْعُ الدِّيَةِ.

সরল অনুবাদ ঃ আর চাঁদি থেকে দশ হাজার দিরহাম। ইমাম আযম (র.)-এর মতে দিয়ত শুধু এই তিন প্রকারের বস্তু দ্বারা দোয়া যাবে, সাহেবাইন (র.) বলেন যে, এই তিন প্রকার এর দ্বারা এবং গাভীর থেকে দু'শত গাভী, বকরি থেকে দু'হাজার বকরি এবং হুল্লা থেকে দু'শত হুল্লা, প্রতি হুল্লা দু'টি কাপড়ের মুসলমান এবং জিম্মির দিয়ত সমান। জানের মধ্যে দিয়ত, নাকের নরম স্থানের (পরিবর্তে) দিয়ত, জিহবার (পরিবর্তে) দিয়ত, লিঙ্গের মধ্যে দিয়ত, যখন কারো মাথায় আঘাত করার দ্বারা জ্ঞান চলে যায় এটারও দিয়ত (দিতে হবে), দাড়ি মুণ্ডানোর পর যদি আর না উঠে দিয়ত (দিতে হবে)। মাথার চুলের দিয়ত, উভয় ভ্রূ-এর মধ্যে দিয়ত, উভয় চক্ষুতে দিয়ত, উভয় হাতে দিয়ত, উভয় পায়ে দিয়ত, উভয় কানে দিয়ত, উভয় ঠোঁটে দিয়ত, উভয় অণ্ডকোষে দিয়ত, মহিলাদের উভয় স্তনের (পরিবর্তে) দিয়ত (দিতে হবে) এবং এগুলোর প্রত্যেকটা (যার মধ্যে দু'টো করে অঙ্গ) অর্ধেক দিয়ত (দিতে হবে) এবং চোখের উভয় পলকের (পরিবর্তে) দিয়ত আছে। আর এর প্রত্যেকটার মধ্যে চতুর্থাংশ দিয়ত (দিতে হবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَفِى الْمَارِنِ الخ **ঃ** নাক, জিহবা এবং লিঙ্গ কাটলে পূর্ণ দিয়ত হাদীস শরীফে আছে فِى الْاَنْفِ اِذَا قَطَعَ مَارِنَهُ الدية এভাবে অপর হাদীসে আছে, وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ অপর এক হাদীসে লিঙ্গ সম্পর্কে আছে وَفِى الذَّكَرِ الدِّيَةُ এ সম্পর্কে মূলনীতি এই যে, যদি কোনো অঙ্গের থেকে উপকৃত হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে বা ঐ মানুষের সৌন্দর্য পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যায় সে ক্ষেত্রে পূর্ণ দিয়ত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَفِى اللِّحْيَةِ الخ **ঃ** ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে একজন আদেল-এর ফায়সালা। কেননা এসব বস্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত, এ জন্যই মাথার চুল মুণ্ডানো হয়ে থাকে। আবার কোনো কোনো লোক দাড়িও পরিষ্কার করে ফেলে। অতএব এগুলো বুক ও পায়ের গোড়ালির সদৃশ। আহনাফ বলেন, দাড়ি আপন স্থানে সৌন্দর্য ও শোভা পায় এভাবে মাথার কেশ, এ জন্যই দেখা যায় যে, সব লোকদের মাথায় ভূমিষ্ঠ হতেই চুল উঠে না। তারা ইচ্ছা করে আপন মাথা লুকায়িত রাখে, তাই (কেউ) যদি (চুল-দাড়ি) নষ্ট করে ফেলে দিয়ত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَفِىْ كُلِّ وَاحِدٍ الخ **ঃ** মানুষের যে সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একাকী যেমন– নাক, জিহবা, লিঙ্গ, এগুলোর মধ্যে পূর্ণ দিয়ত, আর যেসব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দু'টি দু'টি যেমন- চক্ষু, ভ্রূ, হাত, পা, স্তন, অণ্ডকোষ এগুলোর কাটার দ্বারা পূর্ণ দিয়ত, আর একটির কাটার মধ্যে অর্ধেক দিয়ত। এবং যেসব অঙ্গ চারটি যেমন- চোখের পলক, চারটি কাটলে পূর্ণ দিয়ত আর একটি কাটলে চতুর্থাংশ দিয়ত এবং যেসব অঙ্গ দশটি যেমন- হাত, পায়ের আঙ্গুলসমূহ এগুলো সব কাটার কারণে পূর্ণ দিয়ত আর একটি কাটার কারণে দশমাংশ দিয়ত।

وَفِيْ كُلِّ اِصْبَعٍ مِنْ اَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ عَشْرُ الدِّيَّةِ وَالْاَصَابِعُ كُلُّهَا سَوَاءٌ وَفِيْ كُلِّ اِصْبَعٍ فِيْهَا ثَلٰثَةُ مَفَاصِلَ فَفِيْ اَحَدِهَا ثُلُثُ دِيَةِ الْاِصْبَعِ وَمَا فِيْهَا مِفْصَلَانِ فَفِيْ اَحَدِهِمَا نِصْفُ دِيَةِ الْاِصْبَعِ وَفِيْ كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْاِبِلِ وَالْاَسْنَانُ وَالْاَضْرَاسُ كُلُّهَا سَوَاءٌ وَمَنْ ضَرَبَ عَضْوًا فَاَذْهَبَ مَنْفَعَتَهُ فَفِيْهِ دِيَّةٌ كَامِلَةٌ كَمَا فِيْ قَطْعِهِ كَالْيَدِ اِذَا شَلَّتْ وَالْعَيْنِ اِذَا ذَهَبَ ضَوْؤُهَا وَالشِّجَاجُ عَشَرَةٌ اَلْحَارِصَةُ وَالدَّامِعَةُ وَالدَّامِيَةُ وَالْبَاضِعَةُ وَالْمُتَلَاحِمَةُ وَالسِّمْحَاقُ وَالْمُوْضِحَةُ وَالْهَاشِمَةُ وَالْمُنَقِّلَةُ وَالْاٰمَّةُ فَفِي الْمُوْضِحَةِ الْقِصَاصُ اِنْ كَانَتْ عَمَدًا وَلَاقِصَاصَ فِيْ بَقِيَّةِ الشِّجَاجِ وَفِيْ مَا دُوْنَ الْمُوْضِحَةِ فَفِيْهِ حُكُوْمَةُ عَدْلٍ وَفِي الْمُوْضِحَةِ اِنْ كَانَتْ خَطَأً نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَّةِ وَفِي الْهَاشِمَةِ عُشْرُ الدِّيَّةِ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرِ الدِّيَّةِ وَفِي الْاٰمَّةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ وَفِي الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَّةِ فَاِنْ نَفَذَتْ فَهِيَ جَائِفَتَانِ فَفِيْهِمَا ثُلُثَا الدِّيَّةِ وَفِيْ اَصَابِعِ الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَّةِ فَاِنْ قَطَعَهَا مَعَ الْكَفِّ فِيْهَا نِصْفُ الدِّيَّةِ

সরল অনুবাদ ঃ এবং উভয় হাত পা-এর আঙ্গুলসমূহের মধ্যে প্রত্যেক আঙ্গুলে দিয়তের দশমাংশ, আঙ্গুলসমূহ সব সমান এবং প্রত্যেক ঐ আঙ্গুল যার মধ্যে তিনটি গিরা আছে প্রত্যেকটির (পরিবর্তে) আঙ্গুলে তৃতীয়াংশ দিয়ত, আর যে আঙ্গুলে দু'টি গিরা আছে তার এক গিরায় আঙ্গুলে অর্ধেক দিয়ত, প্রতি দাঁত-এর মধ্যে পাঁচটি উট, দাঁত এবং মাড়ীর দাঁত সব সমান, যে ব্যক্তি অঙ্গের ওপর মেরে তার থেকে উপকৃত হওয়া নষ্ট করে দিয়েছে তার মধ্যে পূর্ণ দিয়ত যেমনটি উহা কাটলে পূর্ণ দিয়ত, যেমন (মারার কারণে) যখন হাত প্রতিঘাত হয়ে যায় এবং চক্ষু যখন তার আলো চলে যায়। এবং আহত দশ (প্রকার) (১) হারেসাহ (২) দামেআহ (৩) দামীয়াহ (৪) বাদ্বেয়াহ (৫) মুতালাহিমাহ (৬) সামহাক (৭) মুদ্বেহাহ (৮) হাশেমাহ (৯) মুনাক্কেলাহ (১০) আম্মাহ। শুধু (এর মধ্যে) মুদ্বেহাহ-এর মধ্যে কেসাস আসবে যদি ইচ্ছাকৃত হয় আর বাকি আহত-এর মধ্যে কেসাস নেই। আর মুদ্বেহাহ-এর কম (আহত) হলে এক আদেল ব্যক্তির ফয়সালা এবং মুদ্বেহাহ যদি ভুলবশত হয় দিয়তের বিশমাংশ এবং হাশেমাহ-এর মধ্যে দিয়তের দশমাংশ, আর মুনাক্কেলাহ-এর মধ্যে (দিয়তের) দশমাংশ ও বিশমাংশ এবং আম্মাহ-এর মধ্যে দিয়তের তৃতীয়াংশ এবং জায়েফাহ-এর মধ্যে দিয়তের তৃতীয়াংশ, সুতরাং যদি (আহত স্থানের জখম) পার হয়ে অপর দিক পর্যন্ত ক্ষত করে তবে এটা দু'টি জায়েফাহ, এটার মধ্যে দু'তৃতীয়াংশ দিয়ত হবে। এক হাতের আঙ্গুলসমূহে অর্ধেক দিয়ত, যদি আঙ্গুলসমূহ হাতের তালু সহ কাটে তবে তার মধ্যেও অর্ধেক দিয়ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالشِّجَاجُ عَشَرَةٌ الخ ঃ এটা شَجَّةٌ-এর বহুবচন, অর্থ-ঐ সব জখম ও আহত যা চেহারা বা মাথায় হয়।

شَجَّةٌ ও جَرَاحَةٌ-এর পার্থক্য ঃ شَجَّةٌ বলা হয় মাথা ও চেহারার ক্ষত ও আহত স্থানকে, আর جَرَاحَةٌ বলা হয় বাকি শরীরের ক্ষত ও আহত স্থানকে।

شِجَاجْ সর্বমোট দশটি ঃ (১) হারেসাহ ঃ ঐ ক্ষত স্থান যার মধ্যে চামড়া খসে পড়ে যাকে হিন্দী ভাষায় كهرونچ বলা হয়। (২) দামেআহ ঃ ঐ ক্ষত স্থান যার মধ্যে অশ্রুর ন্যায় রক্ত প্রকাশিত হয় কিন্তু প্রবাহিত হয় না। (৩) দামীয়াহ ঃ ঐ ক্ষত স্থান যার মধ্য থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়। (৪) বাদ্বেয়াহ ঃ ঐ ক্ষত স্থান যার মধ্যে চামড়া কেটে যায়। (৫) মুতালাহিমাহ ঃ ঐ ক্ষত স্থান যার মধ্যে গোশত কেটে যায়। (৬) ছামহাক ঃ ঐ ক্ষত স্থান যার মধ্যে ক্ষত ঐ পাতলা খোসা পর্যন্ত পৌছে যায় যা গোশত ও মাথার হাড়ের মাঝে আছে। (৭) মুদ্বেহাহ ঃ ঐ ক্ষত স্থান যার মধ্যে হাড় খুলে যায়। (অর্থাৎ হাড় পর্যন্ত পৌছে।) (৮) হাশেমাহ ঃ ঐ ক্ষত স্থান যা হাড়কে ভেঙ্গে দেয়। (৯) মুনাক্কেলাহ ঃ ঐ ক্ষত স্থান যা হাড়কে আপন স্থান থেকে সরিয়ে দেয় ও নাড়িয়ে ফেলে। (১০) আম্মাহ ঃ ঐ ক্ষত স্থান যা ঐ খোসা পর্যন্ত পৌছে যার মধ্যে মগজ থাকে। উপরোক্ত ক্ষতসমূহ থেকে সপ্তম নম্বরে দিয়তের বিশতমাংশ অর্থাৎ পাঁচটি উট বা পাঁচশত দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) এবং অষ্টম নম্বরে দশমাংশ অর্থাৎ দশটি উট, আর নবম নম্বরে (দিয়তের) দশমাংশ ও বিশতমাংশ অর্থাৎ পনেরটি উট, দশম নম্বরে দিয়তের তৃতীয়াংশ। হাদীসের বর্ণনাসমূহে উপরোক্ত বিধানই বর্ণিত হয়েছে, এ ছাড়া অন্যান্য ক্ষতসমূহে দিয়ত নেই ; বরং শুধু এক ইনসাফগার ব্যক্তির ফয়সালা (কার্যকর হবে)।

جَائِفَةْ-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَفِى الْجَائِفَةِ ঃ جَائِفَةْ-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ রয়েছে। যাইলায়ী উল্লেখ করেন যে, جَائِفَةْ (জায়েফাহ) ঐ ক্ষত স্থান যা মাথা ও পেটে হয়। (নসবুর রায়াহ) কেউ কেউ বলেন যে, জায়েফাহ ঐ ক্ষত স্থান যা পেট বা পিঠ বা বুকের দিক থেকে পেটের ভিতর পর্যন্ত অথবা ঘাড়ের দিক থেকে ঐ পর্যন্ত পৌছে যায় যেখানে পানি পৌছলে রোজা ভেঙ্গে যায়, এটার মধ্যে তৃতীয়াংশ দিয়ত। এর প্রমাণ নবী করীম (সা.)-এর বাণী– فِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ

جَائِفَةْ -এর আরো একটি বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ نَفَذَتْ الخ ঃ অর্থাৎ যদি জায়েফাহ পিঠের দিকে চিড়ে বের হয়ে আসে এবং অতিক্রম হয়ে যায় তবে দিয়তের দু'তৃতীয়াংশ ওয়াজিব। কেননা এখন দু'টি জায়েফাহ হয়ে গিয়েছে, একটি পেটের দিকে থেকে অপরটি পিঠের দিক থেকে। হযরত আবূ বকর (রা.) এটাই ফয়সালা করেছেন। –(মোসান্নাফে আঃ রাজ্জাক, ত্বাবরানী, বায়হাক্বী)

হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ কাটার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَفِى أَصَابِعِ الْيَدِ الخ ঃ অর্থাৎ যদি কেউ এক হাতের সমস্ত আঙ্গুল হাতের তালু সহ কেটে দেয়, তবে এটার মধ্যেও অর্ধেক দিয়ত। কেননা হাতের তালু আঙ্গুল সমূহের অধীনস্থ। –(আল-মিসবাহুন্নূরী)

وَاِنْ قَطَعَهَا مَعَ نِصْفِ السَّاعِدِ فَفِى الْاَصَابِعِ وَالْكَفِّ نِصْفُ الدِّيَّةِ وَفِى الزِّيَادَةِ حُكُوْمَةُ عَدْلٍ وَفِى الْاِصْبَعِ الزَّائِدِ حُكُوْمَةُ عَدْلٍ وَفِىْ عَيْنِ الصَّبِيِّ وَلِسَانِهٖ وَ ذَكَرِهٖ اِذَا لَمْ يَعْلَمْ صِحَّتَهُ حُكُوْمَةُ عَدْلٍ وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا مُوْضِحَةً فَذَهَبَ عَقْلُهُ اَوْ شَعْرُ رَأْسِهٖ دَخَلَ اِرْشُ الْمُوْضِحَةِ الدِّيَّةُ وَاِنْ ذَهَبَ سَمْعُهُ اَوْبَصَرُهُ اَوْكَلَامُهُ فَعَلَيْهِ اِرْشُ الْمُوْضِحَةِ مَعَ الدِّيَّةِ وَمَنْ قَطَعَ اِصْبَعَ رَجُلٍ فَشَلَّتْ اُخْرٰى اِلٰى جَنْبِهَا فَفِيْهِمَا الْاِرْشُ وَلَاقِصَاصَ فِيْهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ قَطَعَ سِنَّ رَجُلٍ فَنَبَتَتْ مَكَانُهَا اُخْرٰى سَقَطَ الْاِرْشُ وَمَنْ شَجَّ رَجُلًا فَالْتَحَمَتِ الْجَرَاحَةُ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا اَثَرٌوَنَبَتَ الشَّعْرُ سَقَطَ الْاِرْشُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ اِرْشُ الْاَلَمِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ اُجْرَةُ الطَّبِيْبِ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি আঙ্গুলসমূহ হাতের কব্জির অর্ধেক পর্যন্ত কাটে তবে হাতের তালুর মধ্যে অর্ধেক দিয়ত এবং বৃদ্ধির মধ্যে একজন ইনসাফগারের ফয়সালা, এবং অতিরিক্ত আঙ্গুলসমূহে একজন ইনসাফগারের ফয়সালা, শিশুর চক্ষু, জিহ্বা এবং লিঙ্গের মধ্যে যখন তার সুস্থতা ও আরোগ্য জানা না থাকে একজন আদেলের ফয়সালা (গ্রহণযোগ্য হবে)। যে ব্যক্তি কারো মাথার ওপর ক্ষত করল যাতে তার জ্ঞান বা মাথার চুল চলে যায়, তখন দিয়তের মধ্যে মুদ্বেহাহঃ-এর আরশ অন্তর্ভুক্ত হবে, আর যদি তার শ্রবণ শক্তি, বা দৃষ্টি শক্তি অথবা কথোপোকথনের শক্তিও চলে যায় তখন উহার ওপর মুদ্বেহাহ-এর আরশ দিয়ত সহকারে ওয়াজিব হবে। কোনো ব্যক্তি এক ব্যক্তির আঙ্গুল কেটে দেওয়ার কারণে তার পাশে অপর আর একটি আঙ্গুল শুকিয়ে গেল তবে উহার মধ্যে আরশ দেবে। আর ইমাম আযম (র.)-এর মতে উহার মধ্যে কেসাস নেই। যে ব্যক্তি অপর ব্যক্তির দাঁত ওপড়ে ফেলল এরপর তার স্থানে অপর আরো একটি দাঁত উঠল তখন আরশ বাদ হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি কাউকে ক্ষত করল এরপর ক্ষত স্থান ভরে গেল যার চিহ্ন পর্যন্ত বাকি নেই এবং ঐ স্থানে চুল উঠে গেছে তবে ইমাম আযম (র.)-এর মতে আরশ বাদ হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, তার ওপর কষ্টের ক্ষতিপূরণ আসবে, আর ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ডাক্তারের পারিশ্রমিক দিতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ قَطَعَ سِنَّ رَجُلٍ الخ ঃ ইমাম আযম (র.)-এর মতে এ ক্ষেত্রে ত্রুটি দূর হয়ে যাওয়ার কারণে আরশ বাদ হয়ে যাবে, কারণ খারাপ আকৃতির স্পষ্ট পড়লে আরশ আবশ্যক। অতএব যখন চিহ্ন বাকি নেই আরশও আসবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, এক আদেলের ফয়সালা আরশ ওয়াজিব হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, ডাক্তারী ও চিকিৎসার খরচ ওয়াজিব হবে। কারণ এসব খরচ তার কর্মের কারণেই করতে হয়েছে।

وَمَنْ جَرَحَ رَجُلًا جِرَاحَةً لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ حَتّٰى يَبْرَأَ وَمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ خَطَأً ثُمَّ قَتَلَهُ خَطَأً قَبْلَ الْبُرْءِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ وَسَقَطَ اَرْشُ الْيَدِ وَاِنْ بَرَأَ ثُمَّ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ دِيَّتَانِ دِيَةُ نَفْسٍ وَ دِيَةُ الْيَدِ وَكُلُّ عَمْدٍ سَقَطَ فِيْهِ الْقِصَاصُ بِشُبْهَةٍ فَالدِّيَةُ فِيْ مَالِ الْقَاتِلِ وَكُلُّ اَرْشٍ وَجَبَ بِالصُّلْحِ وَالْاِقْرَارِ فَهُوَ فِيْ مَالِ الْقَاتِلِ وَاِذَا قَتَلَ الْاَبُ اِبْنَهُ عَمَدًا فَالدِّيَةُ فِيْ مَالِهٖ فِيْ ثَلٰثِ سِنِيْنَ وَكُلُّ جِنَايَةٍ اِعْتَرَفَ بِهَا الْجَانِيْ فَهِيَ فِيْ مَالِهٖ وَلَا يُصَدَّقُ عَلٰى عَاقِلَتِهٖ وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ خَطَأٌ وَفِيْهِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِيْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ وَضَعَ حَجَرًا فَتَلَفَ بِذٰلِكَ اِنْسَانٌ فَدِيَّتُهٗ عَلٰى عَاقِلَتِهٖ وَاِنْ تَلَفَ بِهٖ بَهِيْمَةٌ فَضِمَانُهَا فِيْ مَالِهٖ وَاِنْ اَشْرَعَ فِي الطَّرِيْقِ رَوْشَنًا اَوْ مِيْزَابًا فَسَقَطَ عَلٰى اِنْسَانٍ فَعَطَبَ فَالدِّيَةُ عَلٰى عَاقِلَتِهٖ وَلَا كَفَّارَةَ عَلٰى حَافِرِ الْبِئْرِ وَ وَاضِعِ الْحَجَرِ-

সরল অনুবাদ ঃ আর যে ব্যক্তি কাউকে আহত করল, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ভাল না হয় কেসাস নেওয়া যাবে না। আর যে ব্যক্তি কারো হাত ভুলবশত কাটল এরপর তাকেই ভুলবশত হত্যা করে দিল, ভাল হওয়ার পূর্বে তো তার ওপর দিয়ত দেওয়া জরুরি হবে আর হাতের দিয়ত বাদ হয়ে যাবে। আর যদি সে ভাল হয়ে যাওয়ার পর তাকে হত্যা করে তবে তার (হাত্যাকারীর) ওপর দু'টি দিয়ত দেওয়া জরুরি হবে (ক) জানের দিয়ত (খ) এবং হাতের দিয়ত। এবং প্রত্যেক ঐ ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা যার মধ্যে সন্দেহের কারণে কেসাস বাদ হয়ে গেছে, সেখানে দিয়ত হত্যাকারীর মালের মধ্যে হবে, আর যে দিয়ত মীমাংসার দ্বারা ওয়াজিব হয় উহাও হত্যাকারীর মালের মধ্যে হবে। এবং যদি পিতা স্বীয় পুত্রকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে দিয়ত তার মালের মধ্যে হবে তিন বৎসরের কিস্তিতে। এবং প্রত্যেক ঐ অপরাধ যা অপরাধকারী স্বীকার করে তবে উহা তার মালের মধ্যে হবে এবং উহার আকেলার ওপর সত্যায়ন করা আসবে না। বাচ্চা ও পাগলের ইচ্ছাকৃত (হত্যা) -ও ভুলবশত-এর মধ্যে গণ্য হবে এবং তার মধ্যে দিয়ত আকেলার ওপর হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি মুসলমানদের রাস্তায় কূপ খনন করল বা কোনো পাথর রাখল এবং তার দ্বারা কোনো মানুষ ধ্বংসই হয়ে গেল তবে তার দিয়ত আকেলার ওপর হবে। আর যদি উহার দ্বারা কোনো প্রাণী ধ্বংস হয়ে যায় তবে তার বদলা মালের মধ্যে হবে, আর যদি রাস্তার দিকে বন-জঙ্গল বা ড্রেন বের হয় এবং উহা কোনো মানুষের ওপর পতিত হয়ে সে ধ্বংস হয়ে যায় তখন দিয়ত তার আকেলার ওপর হবে এবং অপরের মালিকানায় কূপ খননকারী এবং পাথর স্থাপনকারীর ওপর কাফ্ফারা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ الخ ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে সাথে নেওয়া যাবে, কারণ কেসাসের কারণ যখন সাব্যস্ত হয়ে গেছে তবে বিলম্ব কিসের ? আমরা বলি যে ক্ষত ভাল হওয়ার পূর্বে নবী করীম (সা.) কেসাস নিতে নিষেধ করেছেন। দ্বিতীয়ত কারণ হলো এই যে, ক্ষতের মধ্যে শেষ ফলাফলের হিসাব করা হবে, কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ক্ষত মারাত্মক আকার ধারণ করে জানও চলে যায়, তখন ঐ ক্ষেত্রে জান ধ্বংস করার বিধান প্রয়োগ হয় অতএব ক্ষত সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِيْ مِلْكِهِ فَعَطَبَ بِهَا اِنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْ وَالرَّاكِبُ ضَامِنٌ لِمَا اَوْطَأَتِ الدَّابَّةُ وَمَا اَصَابَتْهُ بِيَدِهَا اَوْكَدَمَتْ وَلَا يَضْمَنُ مَانَفَحَتْ بِرِجْلِهَا اَوْذَنَبِهَا فَاِنْ رَاثَتْ اَوْبَالَتْ فِي الطَّرِيْقِ فَعَطَبَ بِهِ اِنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْ وَالسَّائِقُ ضَامِنٌ لِمَا اَصَابَتْ بِيَدِهَا اَوْرِجْلِهَا وَالْقَائِدُ ضَامِنٌ لِمَا اَصَابَتْ بِيَدِهَا دُوْنَ رِجْلِهَا وَمَنْ قَادَ قِطَارًا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا اَوْطَا فَاِنْ كَانَ مَعَهُ سَائِقٌ فَالضَّمَانُ عَلَيْهِمَا وَاِذَا جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً خَطَأً قِيْلَ لِمَوْلَاهُ اِمَّا اَنْ تَدْفَعَهُ بِهَا اَوْتَفْدِيَهُ فَاِنْ دَفَعَهُ مَلَكَهُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ وَاِنْ فَدَاهُ فَدَاهُ بِاَرْشِهَا فَاِنْ عَادَ فَجَنَى كَانَ حُكْمُ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ حُكْمُ الْاُوْلَى فَاِنْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ قِيْلَ لِمَوْلَاهُ اِمَّا اَنْ تَدْفَعَهُ اِلَى وَلِيِّ الْجِنَايَتَيْنِ يَقْتَسِمَانِهِ عَلَى قَدْرِ حُقُوْقِهِمَا وَاِمَّا اَنْ تَفْدِيَهُ بِاَرْشِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যে ব্যক্তি স্বীয় মালিকানায় কূপ খনন করল এবং উহার দ্বারা কোনো ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে গেল, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, আরোহী ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ দিতে হবে উহার যাকে সওয়ারি পিষ্ট করে ফেলে বা হাত দ্বারা আঘাত করে অথবা মুখের দ্বারা কেটে খায়, আর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না যাকে সে (সওয়ারি) পদাঘাত করে বা লেজ দিয়ে আঘাত করে, যদি সে (সওয়ারি) রাস্তায় মল ত্যাগ করে বা প্রশ্রাব করে এরপর উহাতে কোনো মানুষ ধ্বংস হয়ে যায় তখন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না সওয়ারিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি উহার ক্ষতিপূরণ দেবে যার ওপর সওয়ারির হাত বা পা লেগে যায় আর (সওয়ারিকে) টেনে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি উহার ক্ষতিপূরণ দেবে যার ওপর সওয়ারির শুধু হাত লাগে পা নয়, এবং যে ব্যক্তি উটের কাতার ধরে নিয়ে যায় তবে সে উহার ক্ষতিপূরণ দেবে যা উটে মেরে ফেলে। আর যদি উহার সাথে সওয়ারীকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যক্তি থাকে তবে ক্ষতিপূরণ উভয়ের ওপর আসবে। যদি গোলাম ভুলবশত কোনো জেনায়াত করে ফেলে তবে তার মনিবকে বলা হবে যে, হয়তো উহার বিনিময়ে গোলাম দাও বা উহার বিনিময়ে ক্ষতিপূরণ দাও। সুতরাং যদি সে গোলাম দেয় তবে জেনায়াত-এর অভিভাবক উহার মালিক হয়ে যাবে। আর যদি ফেদিয়া দেয় তবে ক্ষতিপূরণের ফেদিয়া দেবে, যদি গোলাম পুনরায় জেনায়াত করে তবে দ্বিতীয় জেনায়াত-এর বিধান প্রথম জেনায়াত-এর ন্যায় হবে। যদি গোলাম দু'টি জেনায়াত করে তবে মনিবকে বলা হবে হয়তো উভয় জেনায়াতের অভিভাবককে গোলাম দিয়ে দাও যাকে তারা বণ্টন করে নেবে নিজ নিজ হক অনুযায়ী অথবা উভয় জেনায়াতের ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাকে ছাড়িয়ে নাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالرَّاكِبُ ضَامِنٌ الخ ঃ চতুষ্পদ জন্তুর জেনায়াত-এর ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও না দেওয়ার মূলনীতি এই যে, যে সব ক্ষেত্রে বাঁচা সম্ভব উহার মধ্যে নিরাপদের শর্তের সাথে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রাস্তায় চলাচল করা বৈধ। যদি এসব ক্ষেত্রে কোনো দিক থেকে সীমাতিক্রম হয় তবে সে ক্ষতিপূরণ দানকারী হবে। আর যেসব ক্ষেত্রে বাঁচা সম্ভব নয় ঐ সব ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

وَاِنْ اَعْتَقَهُ الْمَوْلٰى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ضَمِنَ الْمَوْلٰى اَلْاَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهٖ وَمِنْ اِرْشِهَا وَاِنْ بَاعَهُ اَوْ اَعْتَقَهُ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْاِرْشُ وَاِذَا جَنٰى الْمُدَبَّرُ اَوْ اُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَةً ضَمِنَ الْمَوْلٰى اَلْاَقَلَّ مِنْ قِيْمَتِهٖ وَاِرْشِهَا فَاِنْ جَنٰى جِنَايَةً اُخْرٰى وَقَدْ دَفَعَ الْمَوْلٰى قِيْمَتَهُ اِلَى الْوَلِيِّ الْاَوَّلِ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلَاشَيْئَ عَلَيْهِ وَيَتَّبِعُ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ الْاُوْلٰى فَيُشَارِكُهُ فِيْمَا اَخَذَ وَاِنْ كَانَ الْمَوْلٰى دَفَعَ الْقِيْمَةَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ يَتَّبِعُ الْمَوْلٰى وَاِنْ شَاءَ يَتَّبِعُ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ الْاُوْلٰى وَاِذَا مَالَ الْحَائِطُ اِلٰى طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ فَطُوْلِبَ صَاحِبُهٗ بِنَقْضِهٖ اَوْ اَشْهَدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُضْهُ فِيْ مُدَّةٍ يَقْدِرُ عَلٰى نَقْضِهٖ حَتّٰى سَقَطَ ضَمِنَ مَاتَلَفَ بِهٖ مِنْ نَفْسٍ اَوْمَالٍ وَيَسْتَوِيْ اَنْ يُّطَالَبَهٗ بِنَقْضِهٖ مُسْلِمٌ اَوْذِمِّيٌّ وَاِنْ مَالَ اِلٰى دَارِرَجُلٍ فَالْمُطَالَبَةُ لِمَالِكِ الدَّارِخَاصَّةً فَاِذَا اصْطَدَمَ فَارِسَانِ فَمَاتَا فَعَلٰى عَاقِلَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَّةُ الْاٰخَرِ۔

সরল অনুবাদ ঃ যদি মনিব গোলামকে স্বাধীন করে দেয় অথচ তার জেনায়াত সম্পর্কে জানা ছিল না, তবে মনিব গোলামের মূল্য এবং উহার আরশ থেকে কমের ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি জেনায়াত জানার পর বিক্রি করে ফেলে বা স্বাধীন করে দেয় তবে মনিবের ওপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। যদি মুদাব্বার বা উম্মে ওয়ালাদ কোনো জেনায়াত করে তবে মনিব তার মূল্য এবং তার আরশ থেকে কমের ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি তাদের উভয়ের কেউ দ্বিতীয় আর একটি জেনায়াত করে অথচ মনিব প্রথম জেনায়াত ওয়ালাকে বিচারকের নির্দেশে তার মূল্য দিয়ে দিয়েছে তবে মনিবের ওপর এখন কিছুই নেই, সুতরাং দ্বিতীয় জেনায়াত ওয়ালা প্রথম জেনায়াত ওয়ালার পিছু হবে এবং সে যা নিয়েছে উহাতে শরিক হয়ে যাবে। আর যদি মনিব বিচারকের নির্দেশ ব্যতীত মূল্য দিয়ে থাকে তবে দ্বিতীয় জেনায়াত ওয়ালার অধিকার আছে চাই সে মনিবের পিছে পড়বে চাই প্রথম জেনায়াত ওয়ালার পিছে পড়বে। যদি মুসলমানদের রাস্তার দিকে দেয়াল ঝুঁকে যায় এবং মালিকের উহা ভেঙ্গে ফেলার দাবি করা হয় এবং এ ব্যাপারে সাক্ষী ও করা হয়ে থাকে এবং সে ব্যক্তি ভাঙ্গার শক্তি রেখেও এতদিন পর্যন্ত ভাঙ্গেনি, শেষ পর্যন্ত ঐ দেয়াল পড়ে গিয়ে ছিল, তবে যে সব জান বা মাল ধ্বংস হয় সে উহার ক্ষতিপূরণ দেবে, চাই ঐ দেয়াল ভাঙ্গার দাবি কোনো মুসলমান করুক বা জিম্মি করুক। আর যদি কারো ঘরের দিকে ঝুঁকে তবে দাবি করার অধিকার শুধু ঘরের মালিকের। যদি দুই আরোহী ব্যক্তি সংঘর্ষ হয়ে মারা যায় তবে উহাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের আকেলার ওপর দ্বিতীয় জনের দিয়ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ ضَمِنَ الْمَالُ اَلْاَقَلَّ الخ ঃ এ জন্য যে, যখন মনিব অবগত ছিল না তাই মনিব ফিদয়া গ্রহণকারী হয়নি কিন্তু সে এরূপ গর্দান তথা গোলাম ধ্বংস করেছে যার সাথে জানায়াত-এর অভিবাবক-এর অধিকার সম্পৃক্ত। অতএব তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া জরুরি।

وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ وَلَاتُزَادُ عَلَى عَشَرَةِ اٰلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ عَشَرَةَ اٰلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ قُضِيَ عَلَيْهِ بِعَشَرَةِ اٰلَافِ دِرْهَمٍ إِلَّا عَشَرَةً وَفِي الْأَمَةِ إِذَا زَادَتْ قِيْمَتُهَا عَلَى الدِّيَةِ تَجِبُ خَمْسَةُ اٰلَافِ دِرْهَمٍ إِلَّاعَشَرَةً وَفِي يَدِ الْعَبْدِ نِصْفُ قِيْمَتِهِ لَايُزَادُ عَلَى خَمْسَةِ اٰلَافِ دِرْهَمٍ إِلَّاخَمْسَةً وَكُلُّ مَايُقَدَّرُمِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْ قِيْمَةِ الْعَبْدِ وَإِذَا ضَرَبَ رَجُلٌ بَطْنَ إِمْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِيْنًا مَيِّتًا فَعَلَيْهِ غُرَّةٌ وَالْغُرَّةُ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فَإِنْ أَلْقَتْهُ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيْهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ وَإِنْ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتِ الْأُمُّ فَعَلَيْهِ دِيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ مَاتَتْ ثُمَّ أَلْقَتْهُ مَيِّتًا فَلَا شَيْءَ فِي الْجَنِيْنِ وَمَا يَجِبُ فِي الْجَنِيْنِ مَوْرُوْثٌ عَنْهُ وَفِيْ جَنِيْنِ الْأَمَةِ إِذَا كَانَ ذَكَرًا نِصْفُ عُشْرِ قِيْمَتِهِ لَوْكَانَ حَيًّا وَعُشْرُقِيْمَتِهِ إِنْ كَانَ أُنْثَى وَلَاكَفَّارَةَ فِي الْجَنِيْنِ وَالْكَفَّارَةُ فِيْ شِبْهِ الْعَمَدِ وَالْخَطَأِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَلَايُجْزِئُ فِيْهِ الْإِطْعَامُ۔

সরল অনুবাদ ঃ এবং যখন কোনো ব্যক্তি ভুলবশত কোনো গোলাম হত্যা করে তবে তার ওপর উহার মূল্য ওয়াজিব, যা দশ হাজার দিরহাম থেকে বেশি হবে না। যদি উহার মূল্য দশ হাজার দিরহাম বা উহার থেকে বেশি হয় তবে হত্যাকারীর ওপর দশ দিরহাম কম দশ হাজারের হুকুম করা যাবে, আর দাসীর মধ্যে যখন তার মূল্য দিয়ত থেকে বেশি হয় তবে দশ দিরহাম কম পাঁচ হাজার ওয়াজিব হবে এবং গোলামের হাতে উহার অর্ধেক মূল্য, যা পাঁচ দেরহাম কম পাঁচ হাজার থেকে বেশি হবে না, আর যে পরিমাণ স্বাধীন ব্যক্তির দিয়ত থেকে নির্ধারিত তা গোলামের মূল্য থেকে নির্ধাতির হবে। যখন কোনো ব্যক্তি কোনো মহিলার পেটে আঘাত করে এরপর সে মৃত বাচ্চা গর্ভপাত করে তবে তার ওপর গোররাহ ওয়াজিব, আর গোররাহ দিয়তের বিশ ভাগের এক ভাগ। এখন যদি বাচ্চা জীবিত গর্ভপাত হয় এরপর মারা যায় তবে তার ওপর পূর্ণ দিয়ত আসবে। আর যদি বাচ্চা মৃত গর্ভপাত করে পরে মাও মারা যায় তবে তার (আঘাতকারীর) ওপর দিয়ত এবং গোররাহ উভয়টি আসবে। আর যদি মারা যাওয়ার পর মৃত বাচ্চা গর্ভপাত করে তখন বাচ্চার ব্যপারে কিছু আসবে না। যা কিছু জানীনের (গর্ভস্থ শিশুর) মধ্যে ওয়াজিব তা উহার উত্তরাধিকারীদের আবশ্যক হবে দাসীর বাচ্চা যদি ছেলে হয় তার মূল্যের বিশ ভাগের এক ভাগ যদি জীবিত হয়। আর যদি মেয়ে হয় তবে তার মূল্যের দশ ভাগের এক ভাগ অবশ্যক হবে। বাচ্চাকে পতিত করানোর মধ্যে কাফ্ফারা নেই। শিবহে আমাদ ও ভুলবশত হত্যার মধ্যে কাফ্ফারা হচ্ছে– একজন মু'মিন গোলাম স্বাধীন করা, যদি না পায় তবে ধারাবাহিক দু'মাস রোজা রাখবে। এবং এই কাফ্ফারা-এর মধ্যে খানা খাওয়ানো যথেষ্ট নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا الخ ঃ যদি কোনো গোলাম বা দাসী ভুলবশত হত্যা হয়ে যায় তবে তার মূল্য ওয়াজিব, পরে যদি গোলামের মূল্য স্বাধীন পুরুষের দিয়তের সমান হয় আর দাসীর মূল্য স্বাধীন মহিলার দিয়তের সমান হয় তখন

গোলামের সত্তার কম মূল্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে প্রত্যেকের দিয়ত থেকে দশ দশ দিরহাম কম করে দেওয়া যাবে, এটা তরফাইন (র.)-এর মতে। আইম্মায়ে ছালাছাহ ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর মতে উহার মূল্য ওয়াজিব যতটুকুই হোক না কেন কেননা ক্ষতিপূরণ এটা মাল হওয়ার বিনিময়ে। তরফাইন (র.)-এর প্রমাণ, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর বাণী–

لَايَبْلُغُ بِقِيْمَةِ الْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ وَيَنْقُصُ مِنْهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ

غُرَّةٌ-এর পরিমাণে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَالْغُرَّةُ الخ ঃ আহনাফের মতে غُرَّةٌ -এর পরিমাণ পাঁচশত দিরহাম অর্থাৎ পুরুষের দিয়তের বিশ ভাগের এক ভাগ আর মহিলার দিয়তের দশ ভাগের এক ভাগ। ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে ছয় শত দিরহাম। আহনাফের প্রমাণ নবী করীম (সা.)-এর বাণী, মৃত বাচ্চার মধ্যে গোররাহ অর্থাৎ গোলাম বা বাঁদি অথবা পাঁচশত দিরহাম।

غُرَّةٌ কার ওপর আসবে? আহনাফের মতে গোররাহ হত্যাকারীর عَاقِلَةٌ-এর ওপর আসবে, ইমাম মালেক (র.)-এর মতে হত্যাকারীর মালের ওপর আসবে। আমাদের প্রমাণ, নবী করীম (সা.) গোররাহ হত্যাকারীর আকেলার ওপর ওয়াজিব করেছেন।

غُرَّةٌ কত দিনে উসুল করবে ঃ আহনাফের মতে غُرَّةٌ উসুল করবে এক বৎসরের মধ্যে, ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে তিন বৎসরে উসুল করবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) اكتب المناسبة بين كتاب الديات وكتاب الجنايات مفصلا؟ بين معنى الدية لغة وشرعا - ماهى الكلمة فى وجوب الشاهدين فى ثبوت القتل؟

(٢) ماالاختلاف بين الائمة فى دية شبه العمد بين مفصلا ومدللا؟ هات اختلاف الائمة فى دية الخطأ مع الدلائل -

(٣) بين مقدار الدية من العين والورق مفصلا- ثم بين هل يثبت الدية من الانواع الثلثة اى الابل والعين والورق ام كيف تقولون ؟ اكتب مقدار الدية من البقرة والغنم والحلل؟

(٤) دية المسلم والذمى سواء ام لا؟ هات الفرق بين الجراحة والشجة ثم بين اقسام الشجاج مفصلا؟

بَابُ الْقَسَامَةِ

(বিশেষ) হলফ অধ্যায়

যোগসূত্র : নিহত ব্যক্তির হত্যাকারী নির্ধারণ করতে অনেক সময় বিশেষ হলফ ও শপথ-এর প্রয়োজন হয়। তাই দিয়ত পর্ব তথা রক্ত ঋণ পর্বের শেষে কাসামাহ অধ্যয়কে এনেছেন। সারকথা হলো, কাসামাহ এটা দিয়ত পর্বের বিধানাবলীর সাথে সম্পৃক্ত হওয়াতে তার শেষে এনেছেন। আবার যেহেতু হত্যাকারী নির্ধারণ করতে সর্বদা কাসামাহ -এর প্রয়োজন হয় না, বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় তাই পৃথক অধ্যায়ে তাকে বর্ণনা করা হয়েছে।

قَسَامَةٌ -এর আভিধানিক অর্থ : قَسَامَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ– কসম, শপথ (বিশেষ শপথ)।

قَسَامَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় قَسَامَةٌ বলে বিশেষ কারণে, নির্ধারিত লোকদের পক্ষ থেকে বিশেষ পন্থায় আল্লাহর নামে শপথ করাকে।

قَسَامَةٌ -এর নিয়ম ও বিধান : যদি কোনো এলাকায় এমন কোনো নিহত ব্যক্তি পাওয়া যায় যার হত্যাকারী জানা নেই তখন এলাকার পঞ্চাশজন ব্যক্তি থেকে শপথ গ্রহণ করা হবে। প্রকাশ থাকে যে, এই পঞ্চাশ জন লোককে নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারগণ নির্বাচন করবে। পঞ্চাশ জন সবাই একবচন শব্দ দ্বারা এভাবে শপথ করবে যে, بِاللّٰهِ مَاقَتَلْنَاهُ وَلَاعَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا আল্লাহর শপথ আমি তাকে হত্যাও করিনি এবং তার হত্যাকারী সম্পর্কে আমি জনিও না। যখন সবাই এভাবে শপথ করবে, তখন বিচারকের পক্ষ থেকে সবার ওপর দিয়ত (রক্তঋণ)-এর নিদের্শ দেওয়া যাবে।

وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيْلُ فِيْ مَحَلَّةٍ لَايُعْلَمُ مَنْ قَتَلَهُ اُسْتُحْلِفَ خَمْسُوْنَ رَجُلًا مِّنْهُمْ يَتَخَيَّرُهُمُ الْوَلِيُّ بِاللّٰهِ مَاقَتَلْنَا وَلَاعَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِذَا حَلَفُوْا قُضِيَ عَلٰى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِالدِّيَةِ وَلَايُسْتَحْلَفُ الْوَلِيُّ وَلَايُقْضٰى عَلَيْهِ بِالْجِنَايَةِ وَإِنْ حَلَفَ وَإِنْ أَبٰى وَاحِدٌ مِّنْهُمْ حُبِسَ حَتّٰى يَحْلِفَ وَإِنْ لَمْ يَكْمُلْ أَهْلُ الْمَحَلَّةِ كُرِّرَتِ الْأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ حَتّٰى يَتِمَّ خَمْسِيْنَ يَمِيْنًا وَلَايَدْخُلُ فِي الْقَسَامَةِ صَبِيٌّ وَلَامَجْنُوْنٌ وَلَا اِمْرَأَةٌ وَلَا عَبْدٌ وَإِنْ وُجِدَ مَيِّتٌ لَا أَثَرَ بِهٖ فَلَا قَسَامَةَ وَلَادِيَةَ وَكَذٰلِكَ إِنْ كَانَ الدَّمُ يَسِيْلُ مِنْ أَنْفِهٖ أَوْ دُبُرِهٖ أَوْ فَمِهٖ فَإِنْ كَانَ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ أَوْ أُذُنَيْهِ فَهُوَ قَتِيْلٌ وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيْلُ عَلٰى دَابَّةٍ يَسُوْقُهَا رَجُلٌ فَالدِّيَةُ عَلٰى عَاقِلَتِهٖ دُوْنَ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيْلُ فِيْ دَارِ إِنْسَانٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَيْهِ وَالدِّيَةُ عَلٰى عَاقِلَتِهٖ وَلَايَدْخُلُ السُّكَّانُ فِي الْقَسَامَةِ مَعَ الْمُلَّاكِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

সরল অনুবাদ : যখন কোনো মহল্লায় নিহত লাশ পাওয়া যায় কিন্তু এটা জানা না যায় যে কে হত্যা করেছে, তখন তাদের মধ্যে এমন পঞ্চাশ ব্যক্তি থেকে শপথ নেবে যাদেরকে নিহতের ওলী ঠিক করে। কসম এভাবে যে, খোদার কসম আমরা তাকে মারিনি এবং তাকে কে মেরেছে সেটাও জানি না। অতঃপর যখন তারা শপথ করে তবে গ্রামবাসীদের ওপর দিয়ত-এর ফয়সালা হয়ে যাবে। ওলী থেকে শপথ নেবে না এবং ওলীর ওপর জরিমানার হুকুম করা যাবে না, যদিও সে শপথ করে যদি তাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি শপথ করার থেকে অস্বীকার করে তখন

তাকে গ্রেফতার করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে শপথ না করে। যদি মহল্লাবাসীরা পঞ্চাশজন না হয় তখন শপথ বার বার নেওয়া হবে তাদের থেকে, যে পর্যন্ত পঞ্চাশ শপথ পুরা হয়ে যাবে। শপথ বাচ্চা, পাগল, মহিলা এবং গোলাম থেকে নেওয়া হবে না। যদি এমন লাশ পাওয়া যায় যার ওপর কোনো পরিচয় নেই তখন তার ওপর শপথ এবং দিয়ত কিছু ওয়াজিব হবে না। এরকমভাবে যদি রক্ত প্রবাহিত হয় তার নাক, পায়খানার রাস্তা অথবা মুখ থেকে এবং যদি তার চোখ অথবা কান থেকে প্রবাহিত হয় তবে সে নিহত যদি নিহতকে এমন সওয়ারির ওপর পাওয়া যায় যাকে কেউ হাঁকিয়েছে তাহলে দিয়্যত তার আকেলার ওপর হবে, মহল্লাবাসীর ওপর নয়। আর যদি লাশটি কারো ঘরে পাওয়া যায় তাহলে শপথ ঘরওয়ালার ওপর এবং দিয়ত তার আকেলার ওপর। আর মালিকগণ থাকা অবস্থায় ভাড়াটিয়াগণ শপথ -এর মধ্যে দাখেল হবে না ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَايَدْخُلُ فِى الْقَسَامَةِ الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, قَسَامَة-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– কসম (শপথ)। শরিয়তের মধ্যে قَسَامَة বলে আল্লাহ তা'আলার নামের শপথ যেটা খাস করা হয়। এলাকার মধ্যে যদি কোনো হত্যাকৃত ব্যক্তি পাওয়া যায় যার হত্যাকারী সম্পর্কে কেউ অবগত নয়, তাহলে এলাকার পঞ্চাশ জন ব্যক্তি হতে শপথ নেওয়া হবে যাদেরকে এ হত্যাকৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ পছন্দ করবে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকে কসম খাবে যে, আল্লাহর শপথ আমি তাকে হত্যাও করিনি এবং আমি তার হত্যাকারী সম্পর্কেও অবগত নই। যখন সে এই কসম খেল তখন তার ওপর দিয়তের হুকুম করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ يَسِيْلُ مِنْ اَنْفِهِ الخ ঃ যদি এলাকার মধ্যে এমন কোনো লাশ পাওয়া যায় যার নাক অথবা গুহ্যদ্বার অথবা মুখ থেকে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহলে তার মধ্যে কসমও নেওয়া হবে না এবং দিয়তও হবে না। কেননা এটাও তো হতে পারে যে, সে নাকছীর অথবা অর্শরোগ অথবা উন্মাদের বমীর কারণে মারা গেছে। হ্যাঁ যদি রক্ত চক্ষু অথবা কর্ণ থেকে প্রবাহিত হয় তাহলে বুঝা যাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। কেননা এ সমস্ত জায়গাগুলো থেকে অভ্যাসগতভাবেই কঠোর কোনো আঘাত ব্যতীত রক্ত প্রবাহিত হয় না।

قَوْلُهُ فِى دَارِ اِنْسَانٍ الخ ঃ এ সুরতের মধ্যে ঘরওয়ালার ওপর কসম এবং তার আকেলার ওপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। কেননা সেই ঘর তার হাতের মধ্যে আছে। সুতরাং ঘরওয়ালার সাথে এলাকাওয়ালার এমন সম্পর্ক যেমন এলাকা ওয়ালার সম্পর্ক শহরের। আর শহরওয়ালা এলাকা ওয়ালার সাথে কসমের মধ্যে শরিক না হয়। সুতরাং এলাকাওয়ালাও ঘরের মালিকের সাথে হবে না।

وَهِيَ عَلَى اَهْلِ الْخِطَّةِ دُوْنَ الْمُشْتَرِيْنَ وَلَوْ بَقِيَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَاِنْ وُجِدَ الْقَتِيْلُ فِيْ سَفِيْنَةٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَى مَنْ فِيْهَا مِنَ الرُّكَّابِ وَالْمَلَّاحِيْنَ وَاِنْ وُجِدَ فِيْ مَسْجِدِ مَحَلَّةٍ فَالْقَسَامَةُ عَلَى اَهْلِهَا وَاِنْ وُجِدَ فِي الْجَامِعِ وَالشَّارِعِ الْاَعْظَمِ فَلَاقَسَامَةَ فِيْهِ. وَاِنْ وُجِدَ فِيْ بَرِيَّةٍ لَيْسَ بِقُرْبِهَا عِمَارَةٌ فَهُوَ هَدَرٌ وَاِنْ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ كَانَ عَلَى اَقْرَبِهِمَا وَاِنْ وُجِدَ فِيْ وَسْطِ الْفُرَاتِ يَمُرُّ بِهَا الْمَاءُ فَهُوَ هَدَرٌ وَاِنْ كَانَ مُحْتَبَسًا بِالشَّاطِئِ فَهُوَ عَلَى اَقْرَبِ الْقُرَى مِنْ ذَالِكَ الْمَكَانِ وَاِنِ ادَّعَى الْوَلِيُّ الْقَتْلَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْ اَهْلِ الْمَحَلَّةِ بِعَيْنِهِ لَمْ تَسْقُطِ الْقَسَامَةُ عَنْهُمْ وَاِنِ ادَّعَى عَلَى وَاحِدٍ مِّنْ غَيْرِهِمْ سَقَطَتْ عَنْهُمْ وَاِذَا قَالَ الْمُسْتَحْلِفُ قَتَلَهُ فُلَانٌ اُسْتُحْلِفَ بِاللّٰهِ مَاقَتَلْتُ وَلَاعَلِمْتُ لَهُ قَاتِلًا غَيْرَ فُلَانٍ وَاِذَا شَهِدَ اِثْنَانِ اَهْلِ الْمَحَلَّةِ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِهِمْ اَنَّهُ قَتَلَهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا.

সরল অনুবাদ ঃ আর কাসামত বা শপথ খিত্তাহ ওয়ালাদের ওপর হবে ক্রয়কারীদের ওপর নয়, যদিও তাদের মধ্যে একজন বাকি থাকে। যদি লাশ নৌকার মধ্যে পাওয়া যায় তখন নৌকার মধ্যে যারা আছে তাদের ওপর শপথ ওয়াজিব হবে অর্থাৎ আরোহণকারী বা ক্যাপ্টেন (অর্থাৎ জাহাজ পরিচালক)। যদি লাশ মহল্লার মসজিদে পাওয়া যায় তবে মহল্লাবাসীদের ওপর শপথ ওয়াজিব হবে। যদি জামে মসজিদ বা রাজপথে পাওয়া যায় তাহলে তাতে কোনো শপথ নেই, তবে বায়তুল মাল এর ওপর দিয়ত ওয়াজিব হবে। যদি লাশ জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায় যার আশেপাশে কোনো লোকালয় নেই তাহলে সেটা বেহুদা হবে। আর যদি দুই গ্রামের মধ্যে পাওয়া যায় তাহলে শপথ নিকটবর্তীর ওপর হবে। আর যদি ফুরাত নদীর মধ্যে পাওয়া যায় যাকে পানি ভাসিয়ে নিয়ে চলছে, তাহলে সেটা অনর্থক হবে। আর যদি নদীর কিনারে আটকে থাকে তাহলে নিকটবর্তী গ্রামবাসীদের ওপর কসম বর্তাবে। আর যদি নিহতের ওলী হত্যার দাবি করল কোনো এক মহল্লা ওয়ালার ওপর নির্দিষ্ট করে, তাহলে তাদের থেকে কসম রহিত হবে না (অর্থাৎ কসম নেয়া হবে)। আর যদি উক্ত এলাকা ব্যতীত অন্যদের ওপর হত্যার দাবি করল তাহলে এলাকা ওয়ালাদের থেকে কসম রহিত হয়ে যাবে। যদি শপথ প্রদত্ত ব্যক্তি বলে যে, তাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে, তাহলে তার থেকে এ কসম নেওয়া হবে যে, আল্লাহর শপথ আমি তাকে হত্যা করিনি এবং আমি তার হত্যাকারীকেও চিনি না অমুক ব্যক্তি ব্যতীত। যখন এলাকাওয়ালাদের থেকে দুই ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, সে তাকে হত্যা করেছে তাহলে তাদের সাক্ষী কবুল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আহলে খিত্তাহ-এর সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ الخ ঃ আহলে খিত্তাহ দ্বারা পুরাতন মালিকদেরকে বুঝায়, যারা ঐ সময় থেকে জমিনের মালিক যখন থেকে ইমাম সাহেব শহরকে জয়লাভ করেছিল এবং যোদ্ধাদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে প্রত্যেককেই তার অংশের কাগজ লিখে দিয়েছিল। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট ঐ সমস্ত লোকের ওপরই কসম হবে। কাজি আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকটও খানকার বাসিন্দাগণ এবং ক্রেতাগণ ও (কসমে) শরিক তথা অংশীদার হবে। কেননা গৃহ

প্রশাসনের দায়িত্ব যেমনিভাবে মালিকানা সূত্রে অর্জিত হয় তদ্রূপ বসবাস দ্বারাও হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) কাসামাহ ও দিয়তকে ইহুদিদের ওপর নির্দিষ্ট করেছিলেন অথচ তারা খায়বারের বসবাসকারী ছিলেন, মালিক ছিলেন না।

قَوْلُهٗ عَلٰى مَنْ فِيْهَا الخ : কেননা নৌকার মাঝিমাল্লা সবাই তাদের সাহায্য করেছিল।

قَوْلُهٗ عَلٰى اَهْلِهَا الخ : কেননা মসজিদের প্রশাসনিক দায়িত্ব এলাকাবাসীর ওপর হয়।

قَوْلُهٗ فَلَاقَسَامَةَ الخ : কেননা জামে মসজিদ এবং রাজপথ সবার জন্য। তন্মধ্য হতে কতিপয় ব্যক্তিবর্গ তার সাথে নির্দিষ্ট নয়। এ জন্য বাইতুল মালের ওপর ওয়াজিব। কেননা বাইতুল মাল সমস্ত মুসলমানদের।

قَوْلُهٗ فَهُوَ هَدَرٌ الخ : এমনিভাবেই যখন এটা লোকালয় থেকে এই পরিমাণ দূর হবে যে, যখন কেউ তার ওপর হামলা করে এবং সে সেখান থেকে চিৎকার করে ডাকে তাহলে তার চিৎকার এবং ডাক লোকালয় বাসিন্দারা শুনল না। হ্যাঁ যদি তার চিৎকার এবং ডাক শুনা যায়, তাহলে তা সেখানকার নিকটবর্তী প্রতিবেশির ওপর কসম ও দিয়ত ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهٗ لَمْ تَسْقُطِ الْقَسَامَةُ الخ : এবং দিয়ত ও তাদের বুদ্ধিমানদের থেকে রহিত হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট রহিত হয়ে যাবে। কেননা একজনের ওপর দাবি করা অবশিষ্টদেরকে জিম্মা থেকে দায়মুক্ত করে দেয়।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) بَيِّنْ مَعْنَى الْقَسَامَةِ لُغَةً وَشَرْعًا ـ ثُمَّ اكْتُبْ مُنَاسَبَتَهَا مَعَ كِتَابِ الدِّيَاتِ ـ

(٢) بَيِّنْ صُورَةَ الْقَسَامَةِ مَعَ بَيَانِ اَحْكَامِهٖ مُفَصَّلًا ـ

(٣) هَلْ يَدْخُلُ فِى الْقَسَامَةِ صَبِيٌّ وَمَجْنُوْنٌ وَامْرَأَةٌ وَعَبْدٌ اَمْ لَا؟

(٤) هَلْ يَدْخُلُ السُّكَّانُ فِى الْقَسَامَةِ مَعَ الْمُلَّاكِ اَمْ لَا؟ مَا الْاِخْتِلَافُ فِيْهِ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ الْكِرَامِ هَاتَ مَعَ الدَّلَائِلِ؟

(٥) مَاذَا اَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِاَهْلِ الْخِطَّةِ اُكْتُبْ مُوْضِحًا ـ

كِتَابُ الْمَعَاقِلِ

মা'আক্বেল পর্ব

<u>**যোগসূত্র ঃ**</u> গ্রন্থকার (র.) مَعَاقِلْ পর্বকে এ স্থানে আনার যোগসূত্র এই যে, অনেক সময় ভুলবশত হত্যার মধ্যে عَاقِلَه গণের ওপর দিয়ত আসে তাই দিয়ত ও قَسَامَه পর্বের পর كِتَابُ الْمَعَاقِلِ বর্ণনা করেছেন।

مَعَاقِلْ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ مَعَاقِلْ এটা مَعْقُلَةٌ-এর বহুবচন। অর্থ দিয়ত, রাজকীয় বিচারালয়, পেনশন, প্রাত্যহিকভাতা, দৈনিক বেতন, দফতর। যেমন– مَكَارِمُ এটা مَكْرُمَةٌ -এর বহুবচন। مَعَاقِلْ -এর অপর নাম عَقْل অর্থ– বিরত রাখা। দিয়তকে এ জন্য عَقْل বলা হয়, যেহেতু এটা হত্যা সংঘটিত হওয়া থেকে বিরত রাখে।

<u>**একটি প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ**</u> উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, গ্রন্থকারের (র.) এ স্থানে كِتَابُ الْمَعَاقِلِ শিরোনাম দেওয়া সামঞ্জস্য হয়নি। (অর্থাৎ এরূপ শিরোনাম দেওয়া ভুল হয়েছে।) কারণ এ পর্বে দিয়ত তথা রক্ত ঋণের বর্ণনা উদ্দেশ্যে নয় তার জন্য তো كِتَابُ الدِّيَّاتِ পৃথকভাবে আলোকপাত করা হয়েছে, এ পর্বে শুধু ঐ সব লোকদের আলোচনা করা উদ্দেশ্য যাদের ওপর দিয়ত বা রক্তঋণ ওয়াজিব হয়, যাদের আরবি ভাষায় عَاقِلَه বলা হয়। যার বহুবচন আসে عَوَاقِلْ, অতএব এখানে كِتَابُ الْعَوَاقِلِ দ্বারা শিরোনাম করা উচিত ছিল? গ্রন্থকার (র.)-এর পক্ষ থেকে উল্লিখিত প্রশ্নের তিনটি জবাব দেওয়া যায়।

(১) كِتَابُ الْمَعَاقِلِ-এর স্থানে আরবি গ্রামারের রীতিনীতি অনুযায়ী প্রথমে مُضَافْ -কে লুক্কায়িত মানা যাবে অর্থাৎ كِتَابُ اَهْلِ الْمَعَاقِلِ-এর অর্থ হবে যাদের ওপর দিয়ত ওয়াজিব তাদের আলোচনা পর্ব।

(২) مَعْقُلَةٌ -কে ظَرْف (বা স্থানে) মেনে দিয়তের স্থান বলা উদ্দেশ্য ।

(৩) اِطْلَاقُ الْحَالِ عَلَى الْمَحَلِّ অর্থাৎ স্থানের ওপর অবস্থাকে প্রয়োগ করা পদ্ধতিতে مَعَاقِلْ দ্বারা اَهْلِ مَعَاقِلْ উদ্দেশ্য।

<u>**مَعَاقِلْ -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ**</u> পরিভাষায় مَعَاقِلْ বলা হয় شِبْه عَمْد ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার মতো হত্যার দিয়ত এবং ভুলবশত হত্যার দিয়ত এবং ঐ সব দিয়ত যা শুধু হত্যার কারণে ওয়াজিব হয়। এগুলোকে হত্যাকারী যদি চাকুরিজীবী হয় তার সহকর্মীদের থেকে আদায় করা আর যদি চাকুরিজীবী না হয় তবে হত্যাকারীর গোত্র বা নিকটতম গোত্র থেকে আদায় করা।

<u>**যুক্তির আলোকে অন্যায় হত্যা হারাম হওয়ার হিকমত ও রহস্য ঃ**</u> মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকলে জনপদ ও শহর বিধ্বস্ত ও বিরান হয়ে পড়বে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। সামাজিক জীবনে নেমে আসবে ভয়াবহ ধ্বংস। এ সকল কারণে হত্যা খুন হারাম করা হয়েছে। কেসাস ও অন্য কোনো বৃহত্তর কল্যাণের প্রেক্ষিতেই শুধুমাত্র হত্যার অনুমতি দেওয়া হবে। কোনো কোনো সময় প্রকাশ্য হত্যাকাণ্ড না করে হত্যার অন্যান্য উপায় ও প্রক্রিয়া অবলম্বন হয়। এই উপায় ও প্রক্রিয়াগুলোও হত্যার মতোই হারাম। যেমন, কখনও মানুষের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠে। কিন্তু কেসাসের আশঙ্কায় প্রতিপক্ষকে সরাসরি হত্যা করতে সাহস করে না। তাই খাবারের সাথে বিষ মিশিয়ে বা জাদু-টোনার মাধ্যমে হত্যা করে। ইহাও সরাসরি হত্যার অন্তর্ভুক্ত; বরং এটা হত্যার চেয়েও জঘন্য অপরাধ। কারণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় খোলাখুলি ও প্রকাশ্যে। উহা হতে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনাও থাকে, কিন্তু গোপন প্রক্রিয়ার হত্যাকাণ্ড হতে আত্মরক্ষা করা বা বেঁচে যাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। সুতরাং সামাজিক স্থিতিশীলতা নষ্ট ও জনস্বার্থে ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণে এই প্রক্রিয়াগুলোকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

اَلدِّيَةُ فِى شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ وَكُلُّ دِيَةٍ وَجَبَتْ بِنَفْسِ الْقَتْلِ عَلَى الْعَاقِلَةِ وَالْعَاقِلَةُ اَهْلُ الدِّيْوَانِ اِنْ كَانَ الْقَاتِلُ مِنْ اَهْلِ الدِّيْوَانِ يُؤْخَذُ مِنْ عَطَايَاهُمْ فِى ثَلٰثِ سِنِيْنَ فَاِنْ خَرَجَتِ الْعَطَايَا فِى اَكْثَرِ مِنْ ثَلٰثِ سِنِيْنَ اَوْ اَقَلِّ اُخِذَ مِنْهَا وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ مِنْ اَهْلِ الدِّيْوَانِ فَعَاقِلَتُهُ قَبِيْلَتُهُ تُقْسَطُ عَلَيْهِمْ فِى ثَلٰثِ سِنِيْنَ لَايُزَادُ الْوَاحِدُ عَلَى اَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فِى كُلِّ سَنَةٍ دِرْهَمٌ وَ دَانِقَانِ وَيُنْقَصُ مِنْهَا فَاِنْ لَّمْ تَتَّسِعِ الْقَبِيْلَةُ لِذَالِكَ ضُمَّ اِلَيْهِمُ الْاَقْرَبُ الْقَبَائِلُ اِلَيْهِمْ وَيَدْخُلُ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ فَيَكُوْنُ فِيْمَا يُؤَدِّى كَأَحَدِهِمْ وَعَاقِلَةُ الْمُعْتَقِ قَبِيْلَةُ مَوْلَاهُ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلَاهُ وَقَبِيْلَتُهُ لَاتَتَحَمَّلُ الْعَاقِلَةُ اَقَلَّ مِنْ نِصْفِ عُشْرِ الدِّيَةِ وَتَتَحَمَّلُ نِصْفَ الْعُشْرِ فَصَاعِدًا وَمَا نَقَصَ مِنْ ذَالِكَ فَهُوَ فِى مَالِ الْجَانِىْ وَلَاتَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ جِنَايَةَ الْعَبْدِ وَلَاتَعْقِلُ الْجِنَايَةَ الَّتِىْ اِعْتَرَفَ بِهَا الْجَانِىْ اِلَّا اَنْ يُّصَدِّقُوْهُ وَلَايَعْقِلُ مَالَزِمَ بِالصُّلْحِ وَاِذَا جَنَى الْحُرُّ عَلَى الْعَبْدِ جِنَايَةً خَطَأً كَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهٖ ـ

সরল অনুবাদ ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার মতো (হত্যার) দিয়ত এবং ভুলবশতঃ হত্যার (দিয়ত) এবং প্রত্যেক ঐ দিয়ত যা শুধু হত্যার কারণে ওয়াজিব হয় (এগুলো) عَاقِلَه -এর ওপর আসবে, এবং عَاقِلَه বলে দফতরবাসীদেরকে যদি হত্যাকারী দফতরবাসীদের থেকে হয়, তাদের ভাতা থেকে তিন বৎসরে আদায় করা হবে, যদি তিন বৎসরের বেশি বা কমে ভাতা বের হয়ে আসে তখন তার থেকে উসুল করে নেওয়া হবে। আর যে (হত্যাকারী) দফতরবাসীদের মধ্য থেকে নয় তার عَاقِلَه হবে তার গোত্রের লোক, (দিয়তকে) তাদের ওপর তিন বৎসরের মধ্যে কিস্তি (হিসাবে বণ্টন) করে দেবে, এক ব্যক্তির ওপর চার দিরহামের বেশি (ধার্য) করবে না। সে মতে প্রতি বৎসর এক দিরহাম এবং দু দানেক করে পড়বে। অবশ্য চার (দিরহাম) থেকে কমও হতে পারে। যদি গোত্রের লোক (দিয়ত আদায়ে) ব্যর্থ হয় তবে তাদের সাথে নিকটতম গোত্র মিলিত করা হবে। আক্কেলার সাথে স্বয়ং হত্যাকারীও অন্তর্ভুক্ত হবে। সেমতে দিয়ত পরিশোধের ক্ষেত্রে সে একজন আক্কেলার ন্যায় হবে। আজাদকৃত গোলামের আক্কেলাহ হলো তার মনিবের গোত্র। মাওলাল মুওয়ালাত (চুক্তিবদ্ধ মিত্র) এর পক্ষ থেকে তার মাওলা (মিত্র) এবং তার নিজ গোত্র দিয়ত পরিশোধ করবে। আর আক্কেলাহ বিশ ভাগের এক ভাগের কম দিয়ত বহন করবে না। আর দশমাংশ বা তার থেকে বেশির দায়ভার নেবে। আর যা এর চেয়ে কম হবে তা অপরাধকারীর সম্পদ থেকে হবে। আর আক্কেলাহগণ গোলামের অপরাধের দিয়ত দেবে না এবং ঐ অপরাধেরও দিয়ত দেবে না যার স্বীকার অপরাধকারী করে নেয়। হ্যাঁ যদি এই তারা তার সত্যায়ন করে। আর তারা উহার দিয়তও দেবে না যা সন্ধির কারণে দেওয়া জরুরি হয়। যদি স্বাধীন ব্যক্তি গোলামের ওপর ভুলবশত অপরাধ করে তবে দিয়ত তার আক্কেলাহ -এর ওপর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَكُلُّ دِيَةٍ الخ **:** শুধু হত্যার কারণে যে দিয়ত দেওয়া আবশ্যক হয়, অর্থাৎ যে দিয়ত মীমাংসা এবং ابوت-এর কারণে হয় না উহা হত্যাকারী عاقله-এর ওপর ওয়াজিব হয়। অর্থাৎ আহলে দিওয়ান-এর ওপর যদি হত্যাকারী সেনাবাহিনী হয়। دِيْوَانْ রেজিস্ট্রারকে বলা হয় যার মধ্যে সৈন্যদের নাম, দৈহিক ভাতা, মাসিক বেতন ইত্যাদি লেখা যায়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দিয়ত গোত্রের লোকদের ওপর হয়। কারণ নবী করীম (সা.)-এর যুগে এটাই নিয়ম ছিল। আমাদের প্রমাণ এই যে, যখন ওমর (রা.) دِيْوَانْ নির্ধারণ করলেন, তখন সাহাবায়ে কেরাম (রা.)-এর সবার উপস্থিতে দেওয়ান ওয়ালাদের ওপর دِيَّتْ নির্দিষ্ট করেছেন এবং কেউ অস্বীকার করেননি। এ ছাড়া আর একটি প্রমাণ এই যে, নবী করীম (সা.)-এর যুগে সাহায্য সহানুভূতি বংশীয় লোকদের পক্ষ থেকে হতো আর دِيْوَانْ স্থির করার পর সাহায্য সহায়তা دِيْوَانْ-এর সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে এবং اَهْلِ دِيْوَانْ কে عَاقِلَه স্থির করা হয়েছে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) مَا مَعْنَى الْمَعَاقِلِ لُغَةً وَاصْطِلَاحًا؟ بَيِّنْ مُنَاسَبَةَ كِتَابِ الْمَعَاقِلِ مَعَ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَّاتِ؟ لِمَاذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ كِتَابَ الْمَعَاقِلِ وَلَمْ يَقُلْ كِتَابَ الْعَوَاقِلِ بَيِّنْ بَيَانًا شَافِيًا .

(٢) مَنْ هُمُ الْعَاقِلَةُ ؟ بَيِّنْ اَحْكَامَهَا مُفَصَّلًا؟ هَلْ يَدْخُلُ الْقَاتِلُ مَعَ الْعَاقِلَةِ؟ مَنْ هُمْ عَاقِلَةُ الْمُعْتَقِ؟

كِتَابُ الْحُدُودِ

শাস্তি পর্ব

যোগসূত্র ঃ কিতাবুল হুদূদ-এর সাথে পূর্বেকার কিতাব সমূহের সাথে যোগসূত্র হচ্ছে– পূর্বেকার কিতাবসমূহের মধ্যে অপরের ওপর জেনায়াত-এর আলোচনা করা হয়েছে, আর কিতাবুল হুদূদের মধ্যে নিজের ওপর জেনায়াত এর আলোচনা করা হবে।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয় তা এই যে, গ্রন্থকার (র.) অপরের জেনায়াত পর্ব সমূহের পর কিতাবুল হুদূদ তথা নিজের ওপর জেনায়াত-এর আলোচনা আনলেন কেন? অর্থাৎ কিতাবুল হুদূদকে এগুলোর পূর্বে আনলেন না কেন? এ প্রশ্নে উত্তর এই যে, অন্যের ওপর জেনায়াতে এটা নিজের ওপর জেনায়াত থেকে বেশি জঘন্য ব্যাপার তাই কিতাবুল হুদূদকে পরে এনেছেন।

حُدُوْد -এর আভিধানিক অর্থ ঃ حُدُوْد এটা حَدّ-এর বহুবচন অর্থ– বাধা দেওয়া, বিরত রাখা।

حُدُوْد নামকরণের কারণ ঃ حُدُوْد-কে حُدُوْد এ জন্য বলা হয় যে, উহা শাস্তির কারণসমূহে লিপ্ত হওয়া থেকে বাধা দান করে থাকে, অথবা حُدُوْد –কে حُدُوْد এ জন্য বলা হয় যে, উহার দ্বারা মানুষ অপরাধে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকে।

حُدُوْد-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় حَدّ ঐ নির্ধারিত নির্দিষ্ট শাস্তির নাম যা আল্লাহর বান্দাদেরকে অবজ্ঞা কাজসমূহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রাখার জন্য আল্লাহর হক হিসাবে ফরজ হয়েছে।

حَدّ তথা ইসলামি দণ্ডবিধি অমানবিক নয় ঃ হদ বা ইসলামি দণ্ডবিধি অমানবিক নয়, কারণ এগুলো না থাকলে মানুষ ও চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে আর পার্থক্য থাকে না। ইসলামের নির্ধারিত জেনার শাস্তি পারিবারিক ও দাম্পত্য জীবনে বয়ে আনে অসংখ্য শান্তি-শৃঙখলা অপবাদের নির্ধারিত শাস্তির কারণে সামাজিক জীবনে অহেতুক কেউ কারো মান-সম্মান নষ্ট করার প্রয়াস পায় না, এভাবে চুরি-ডাকাতি ও মদ্য পানের ইসলামি দণ্ডবিধির কারণে ব্যক্তিগত জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রিয় জীবন তথা গোটা বিশ্বে নিরাপত্তা ও শান্তি ফিরে আসে।

حَدّ ، تَعْزِيْر ও كَفَّارَة -এর পার্থক্য ঃ حَدّ (হদ) এটা আরবি শব্দ। এর অর্থ– বিরত রাখা, পরিমাণ করা। শরিয়তের পরিভাষায় কোনো গুনাহের শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ যে সীমা ও পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন এবং যাতে কারও রায় ও মতানুযায়ী কমবেশি হতে পারে না তাকে 'হদ' বলে। যেমন– মুহসান ব্যভিচারীকে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এবং গায়রে মুহসানকে বেত্রাঘাত করা এবং চোরের হাত কর্তন ইত্যাদি।

'তা'যীর' বলা হয়, যে গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেননি; বরং উহার শাস্তি স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে বিচারকের রায়ের ওপর ন্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। তবে এজন্য কিছু নিয়ম নীতি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। যেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ জায়েজ নয়। তা'যীরের আভিধানিক অর্থ– শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া ও সম্মান করা। সুতরাং এই বিষয়টিও আল্লাহর হুকুম-আহকামের ইজ্জতও সম্মানের জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। যাতে মানুষের অন্তরে আল্লাহর আহকাম ও বিধানের সম্মান কায়েম থাকে। এগুলোর যেন কোনোরূপ অসম্মান না হয়। হদ ও তা'যীর এমন কর্মের শাস্তির হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে, যা কোনো অবস্থাতেই মুবাহ ও জায়েজ নেই।

কাফফরার বিধান এমন বিষয়ের প্রতিবিধান ও জরিমানা হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে, যা মূলত মুবাহ ও জায়েজ; কিন্তু সাময়িক কোনো কারণে উহা হারাম হয়ে থাকে। যেমন– রমজান মাসে দিনের বেলায় এবং এহরাম অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস। প্রথমটির কাফফারা হলো, একটি রোজার বিনিময়ে লাগাতার দু'মাস রোজা রাখা বা ষাটজন মিসকিনকে দু'বেলা আহার করানো। দ্বিতীয়টির কাফফারা হলো, কুরবানি করা।

তা'যীর সে সকল গুনাহের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেগুলোর জন্য কোনো হদ ও কাফফারা নেই। কেননা, গুনাহ তিন প্রকার এক যেগুলোর জন্য হদ নির্ধারিত আছে। কিন্তু কাফফারা নির্ধারিত নেই। 'দুই' যেগুলোর জন্য কাফফারা আছে, কিন্তু হদ নির্ধারিত নেই। 'তিন' যেগুলোর জন্য কোনো হদ বা কাফফারা নির্ধারিত নেই। প্রথম প্রকার যেমন– চুরি, জেনা ও জেনার অপবাদ দেওয়া। এগুলোর জন্য হদ নির্ধারিত রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যেগুলোর জন্য শুধু কাফফারা নির্ধারিত রয়েছে, হদ নেই। যেমন– রমজান মাসের দিনের বেলায় বা এহরাম অবস্থায় স্ত্রী-সহবাস করা। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যেগুলোর কোনো হদ বা কাফফারা নেই, শুধুমাত্র তাযীরের হুকুম রয়েছে। যেমন– বেগানা স্ত্রীকে চুম্বন করা, তার সাথে নির্জন ঘরে বসা, হাম্মাম খানায় বিবস্ত্র প্রবেশ করা, মৃত জীবজন্তু, রক্ত ও শুকরের গোশ্‌ত খাওয়া ইত্যাদি। প্রথম প্রকারের 'হদ'ই তা'যীরের জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় প্রকারের কাফফারার সাথে তাযীরও ওয়াজিব হবে কিনা? সে ব্যাপারে দু' ধরনের মত রয়েছে। তৃতীয় প্রকারে সর্বসম্মতভাবে শুধু তা'যীরের হুকুমেই কার্যকর হবে।

اَلزِّنَا يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْاِقْرَارِ فَالْبَيِّنَةُ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَةٌ مِّنَ الشُّهُوْدِ عَلٰى رَجُلٍ اَوْ اِمْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَسَأَلُهُمُ الْاِمَامُ عَنِ الزِّنَا مَا هُوَ؟ وَكَيْفَ هُوَ؟ وَاَيْنَ زَنٰى وَمَتٰى زَنٰى وَبِمَنْ زَنٰى؟ فَاِذَا بَيَّنُوْا ذَالِكَ وَقَالُوْا رَأَيْنَاهُ وَطَأَهَا فِىْ فَرْجِهَا كَالْمَيْلِ فِى الْمِكْحَلَةِ وَسَأَلَ الْقَاضِىْ عَنْهُمْ فَعُدِّلُوْا فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ وَالْاِقْرَارُ اَنْ يُّقِرَّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ عَلٰى نَفْسِهٖ بِالزِّنَا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِىْ اَرْبَعَةِ مَجَالِسَ مِنْ مَجَالِسِ الْمُقِرِّ كُلَّمَا اَقَرَّ رَدَّهُ الْقَاضِىْ . فَاِذَا تَمَّ اِقْرَارُهٗ اَرْبَعَ مَرَّاتٍ سَأَلَهُ الْقَاضِىْ عَنِ الزِّنَا مَا هُوَ وَكَيْفَ هُوَ؟ وَاَيْنَ زَنٰى وَبِمَنْ زَنٰى؟ فَاِذَا بَيَّنَ ذَالِكَ لَزِمَهُ الْحَدُّ .

সরল অনুবাদ ঃ জেনা প্রমাণ (বাইয়্যিনা) এবং স্বীকারের (একরারের) দ্বারা সাবেত হয়। সুতরাং বাইয়্যিনা এই যে, চারজন সাক্ষী কোনো পুরুষ বা মহিলার ওপর জিনা কি? কিভাবে হয়? জিনা কোথায় করেছে? কখন করেছে? কার সাথে করেছে? যখন তারা তা বর্ণনা করে দেবে এবং বলে দেবে যে, আমরা তাকে লজ্জাস্থানে সহবাস করতে দেখছি এমনি যেমনি সুরমাদানীতে সুরমার শলাকা থাকে। অতঃপর কাজি তাদের অবস্থা জেনে নেবেন এবং তাদের প্রকাশ্য এবং লুকায়িত (আদেল) ইনসাফকারী বর্ণনা করা হবে, তখন কাজি তাদের সাক্ষী অনুযায়ী হুকুম করবেন। আর একরার এই যে, আকেল বালেগ নিজের ওপর চারবার স্বীকার করবে নিজস্ব মজলিস থেকে চার মজিলসের মধ্যে, তারা যখনই স্বীকার করবে কাজি তা (রদ) অগ্রাহ্য করে দেবে এবং যখন তার স্বীকার চারবার পুরা হয়ে যাবে, তখন কাজি তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে, জেনা কি এবং কিভাবে হয়? সে জেনা কোথায় করেছে, কার সাথে করেছে?

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জেনার সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهٗ اَلزِّنَا الخ ঃ জেনা ঐ সহবাসকে বলে, যা এমন লজ্জাস্থানে হয় যে, উহা মালিকানা এবং মালিকানার মতো (উপমালিকানা) থেকে খালি অর্থাৎ যে লজ্জাস্থান মালিকানাও নয় এবং উপমালিকানাও নয়।

যে জেনার হদ ওয়াজিব হয় ঐ জেনার সংজ্ঞা এই–

هُوَ وَطْيُ مُكَلَّفٍ نَاطِقٍ طَائِعٍ فِىْ قُبُلٍ مُشْتَهَاةٍ حَالًا اَوْ مَاضِيًا خَالٍ عَنْ مِلْكِهٖ وَشُبْهَتِهٖ فِىْ دَارِ الْاِسْلَامِ اَوْ تَمْكِيْنَهٗ مِنْ ذَالِكَ اَوْتَمْكِيْنَهٗ .

অর্থাৎ জেনা বলা হয় বুদ্ধিমান, প্রাপ্ত বয়স্ক, কথোপকনকারী সন্তুষ্টির সাথে সঙ্গম করা বর্তমান বা অতীতে কামভাব যোগ্য মহিলার এরূপ যোনি পথে যা মালিকানা এবং উপ মালিকানা থেকে মুক্ত, অথবা পুরুষ বা মহিলা সঙ্গমের জন্য সুযোগ দিয়ে দেওয়া।

قَوْلُهٗ يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ الخ ঃ এ মাসআলার প্রমাণ–فَاسْتَشْهِدُوْا فِيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ সাক্ষী দিতে শুধু সঙ্গমের সাক্ষী দেওয়া যথেষ্ট নয় বরং স্পষ্ট জেনা শব্দের দ্বারা সাক্ষী দেওয়া জরুরি, কারণ সঙ্গমের মধ্যে মালিকানা বা উপমালিকানার সম্ভাবনা আছে, আর বিচারকের পক্ষ থেকে ঐ সব প্রশ্নাবলী করার প্রয়োজন এই জন্য যে, হয়তো এরূপও হতে পারে যে, জোরপূর্বক জেনা হয়েছে বা দারুল হরবে অথবা স্বীয় ছেলের বাঁদির সাথে হয়েছে অথচ সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি এসব থেকে অজ্ঞাত, তাই হাকেম পুরোপুরী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খোঁজ-খবর নেবে যাতে কোনো কৌশলের মাধ্যমে হদ বাদ হয়ে যায়, কারণ হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন– اِدْرَؤُا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ হদকে পরিহার কর যতটুকু পরিমাণ সম্ভব হয়।

فَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُحْصَنًا رَجَمَهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى يَمُوتَ يُخْرِجُهُ إِلَى أَرْضٍ فَضَاءٍ تَبْتَدِئُ الشُّهُودُ بِرَجْمِهِ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِنِ امْتَنَعَ الشُّهُودُ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ سَقَطَ الْحَدُّ وَإِنْ كَانَ الزَّانِي مُقِرًّا إِبْتَدَأَ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ وَيُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ مُحْصَنًا وَكَانَ حُرًّا فَحَدُّهُ مِائَةُ جَلْدَةٍ يَأْمُرُ إِمَامٌ بِضَرْبِهِ بِسَوْطٍ لَاثَمَرَةَ لَهُ ضَرْبًا مُتَوَسِّطًا يُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهُ وَيُفَرِّقُ الضَّرْبَ عَلَى أَعْضَائِهِ إِلَّا رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ وَفَرْجَهُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا جَلَدَهُ خَمْسِينَ كَذَالِكَ فَإِنْ رَجَعَ الْمُقِرُّ عَنْ إِقْرَارِهِ قَبْلَ إِقَامَةِ الْحَدِّ أَوْ فِي وَسَطِهِ قُبِلَ رُجُوعُهُ وَخُلِّيَ سَبِيلُهُ وَيُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُّلَقِّنَ الْمُقِرَّ الرُّجُوعَ وَيَقُولَ لَهُ لَعَلَّكَ لَمَسْتَ أَوْقَبَّلْتَ وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَالِكَ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَاتُنْزَعُ عَنْهَا ثِيَابُهَا إِلَّا الْفَرْوَ وَالْحَشْوَ وَإِنْ حُفِرَ لَهَا فِي الرَّجْمِ جَازَ وَلَايُقِيمُ الْمَوْلَى الْحَدَّ عَلَى عَبْدِهِ وَأَمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ.

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং যদি জেনাকারী বিবাহিত হয় তাহলে তাকে পাথর নিক্ষেপ করবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে মারা যায়, তাকে ময়দানে বের করবে এবং প্রথমে সাক্ষীরা পাথর নিক্ষেপ করবে অতঃপর ইমাম অতঃপর অন্য লোক। এবং যদি সাক্ষী দাতারা শুরু করা থেকে বিরত থাকে তাহলে 'হদ' বাতিল হয়ে যাবে। এবং যদি জেনাকারী স্বীকারকারী হয় তাহলে প্রথমে ইমাম শুরু করবে, অতঃপর অন্য লোক। তাকে গোসল এবং কাফন দেওয়া হবে এবং তার ওপর নামাজ পড়া হবে। যদি বিবাহিত না হয় এবং আজাদ হয় তাহলে তার 'হদ' একশ দোররা। ইমাম এমন কোড়া (দোররা) মারার হুকুম করবে, যাতে গিরা না হয়, মধ্যম আঘাতে। তার কাপড় খুলে ফেলা হবে এবং আঘাত তার অঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন করা হবে মাথা, চেহারা এবং লজ্জাস্থান ব্যতীত। আর যদি সে গোলাম হয়, তাহলে এমনিভাবে তাকে পঞ্চাশ (কোড়া) দোররা লাগাবে, যদি স্বীকারকারী নিজের স্বীকার থেকে 'হদ' কায়েম হওয়ার আগে অথবা মাঝে ফিরে যায়, তাহলে তার ফিরে যাওয়া গ্রহণ করা হবে এবং তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। ইমামের জন্য মোস্তাহাব যে স্বীকারকারীকে ফিরে যাওয়ার পথ নির্দেশ করবে এবং তাকে বলবে যে, হতে পারে তুমি চুমা দিয়েছিলে। পুরুষ ও মহিলা তাতে বরাবর। তবে মহিলার কাপড় খোলা হবে না, পালকযুক্ত পোশাক এবং মোটা কাপড় ছাড়া এবং যদি মহিলাকে পাথর নিক্ষেপ করার জন্য গর্ত খনন করা হয় তাহলে জায়েজ আছে। এবং মনিব তার গোলাম এবং বাঁদির ওপর ইমামের অনুমতি ছাড়া 'হদ' কায়েম করতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ رَدَّهُ الْقَاضِي الخ ঃ অর্থাৎ শুধু তার স্বীকারের দ্বারা শাস্তি দেবে না, যতক্ষণ বিভিন্ন জায়গায় চারবার স্বীকার করবে। কাজি তা অগ্রাহ্য করবে এবং হুমকি দেখাবে। এমনিভাবে প্রত্যেকবার ধিক্কার দিতে থাকবে। সুতরাং যদি এক মজলিসে চার বার স্বীকার করে তাহলে এক স্বীকার গণনা করা হবে এবং স্বীকারের পরে তার থেকে ফিরে যাওয়া সহীহ আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট 'হদ' জারি করা হবে। কেননা 'হদ' তার স্বীকার দ্বারা সাবেত হয়েছে, সুতরাং ফিরে যাওয়ার দ্বারা সাকেত হবে না। আমরা বলি যে, তার ফিরে যাওয়া একটা খবর যাতে সত্যের সম্ভাবনা আছে এবং কোনো মিথ্যাবাদী উপস্থিত নেই। সুতরাং স্বীকারের মধ্যে সন্দেহ এসে গেছে এবং 'হদ' সামান্য সন্দেহ দ্বারা নড়ে যায়।

وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُوْدِ بَعْدَ الْحُكْمِ قَبْلَ الرَّجْمِ ضُرِبُوا الْحَدَّ وَسَقَطَ الرَّجْمُ عَنِ الْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الرَّجْمِ حُدَّ الرَّاجِعُ وَحْدَهُ وَضَمِنَ رُبُعَ الدِّيَةِ وَإِنْ نَقَصَ عَدَدُ الشُّهُوْدِ عَنْ أَرْبَعَةٍ حُدُّوا جَمِيْعًا وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ أَنْ يَّكُوْنَ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ إِمْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيْحًا وَ دَخَلَ بِهَا وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَانِ .

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি কোনো সাক্ষী রায় ঘোষণার পরে প্রস্তর নিক্ষেপের পূর্বে তার সাক্ষ্য হতে ফিরে যায়, তাহলে সাক্ষীদেরকে হদ লাগানো হবে এবং যার ওপর সাক্ষ্য দিয়েছে তার থেকে রজম রহিত হয়ে যাবে। এবং যদি প্রস্তর নিক্ষেপের পরে ফিরে যায় তাহলে শুধু ফিরনে ওয়ালাকে হদ লাগানো হবে এবং দিয়াতের চতুর্থাংশের (জামিন) জিম্মাদার হবে (দিতে হবে)। এবং যদি সাক্ষীর সংখ্যা চার থেকে কম হয়, তাহলে সকলকে হদ লাগনো হবে। প্রস্তর নিক্ষেপের জন্য মুহসান হওয়ার অর্থ হলো, সে (জেনাকারী) আজাদ, বালেগ, আকেল এবং মুসলমান হবে, যে কোনো মহিলার সাথে নেকাহে সহীহা করেছে এবং তার সাথে সহবাস করেছে এবং তারা দু'জন স্বামী-স্ত্রী উভয়ই মুহসান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُ الشُّهُوْدِ ঃ এ অবস্থায় যার ওপর সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তার থেকে রজম বাদ হয়ে যাবে। কেননা তার ব্যাপারে সাক্ষী পরিপূর্ণ নয় এবং যদি রজম করার পর ফিরে যায় তাহলে ফিরনেওয়ালার ওপর মিথ্যার শাস্তি জারি করা হবে। কেননা তার সাক্ষী অপবাদ দ্বারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। এবং তার ওপর দিয়াতের চতুর্থাংশের জরিমানাও ওয়াজিব হবে। কেননা নফসের ক্ষতি তার সাক্ষীর কারণে হয়েছে। আর যখন সে ফিরে এসে স্বীকার করেছে যে, নফসের ক্ষতি নাহক হয়েছে তখন তার অনুযায়ী দিয়তের জরিমানা ওয়াজিব হবে।

قَوْلُهُ وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ الخ ঃ মোহসান হওয়ার জন্য সাতটি শর্ত আছে। যদি তা থেকে কোনো একটা বাদ পড়ে যায় তাহলে পাথর নিক্ষেপ করা হবে না, (১) আজাদ হওয়া, সুতরাং গোলাম এবং বাঁদি মোহসান নয়। কেননা জাতিগত গোলাম নিজে নেকাহে সহীহার ওপর শক্তি রাখে না। (২) জ্ঞানী হওয়া। (৩) বালেগ হওয়া, ছোট এবং পাগল শাস্তির অযোগ্য হওয়ার কারণে মোহসান নয়। (৪) মুসলমান হওয়া। কাফের মোহসান নয়। (৫) সহবাস হওয়া, (৬) মিলনের সময় বিশুদ্ধ বিবাহের সাথে সহবাস হওয়া, যে ব্যক্তি সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করেছে সে মোহসান নয়, (৭) সহবাসের সময় স্বামী স্ত্রী মোহসান সিফতের সাথে এক হওয়া। যে ব্যক্তি কিতাবিয়্যাহ (অর্থাৎ যাদের ওপর আসমানী কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে)-কে অথবা জিম্মীয়্যাহকে অথবা ছোট মেয়েকে অথবা পাগলীকে বিবাহ করে সহবাস করল, সে মোহসান নয়। কেননা স্ত্রী অমুসলিম অথবা প্রাপ্ত বয়স্ক না হওয়ার কারণে মোহসান নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.) এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট মোহসানের জন্য জেনাকারী মুসলমান হওয়া শর্ত নয়। কেননা রাসূলে পাক (সা.) ইহুদি পুরুষ মহিলাকে রজম করেছেন। আমাদের দলিল হুযূর (সা.)-এর হাদীস, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক করেছে সে মোহসান নয়। এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিলের জবাব এই যে, তিনি তাওরাতের হুকুমে রজমের হুকুম দিয়েছেন। কেননা ঐ সময় পর্যন্ত রজমের আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। তারপরে রজমের আয়াত মুসলমান হওয়ার শর্ত ছাড়া অবতীর্ণ হয়নি। তার পরে রজমের হুকুম মুসলমান হওয়ার শর্তের সাথে হয়েছে। এটা ছাড়াও আমাদের দলিল হলো হাদীসে 'কওলী' এবং তাদের দলিল হলো একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা মাত্র। অথচ হদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

وَلَا يُجْمَعُ فِي الْمُحْصَنِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالرَّجْمِ وَلَا يُجْمَعُ فِي الْبِكْرِ بَيْنَ الْجَلْدِ وَالنَّفْيِ اِلَّا اَنْ يَّرَى الْاِمَامُ فِي ذَالِكَ مُصْلِحَةً فَيُغَيِّرُ بِهِ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَى وَاِذَا زَنَى الْمَرِيْضُ وَحَدُّهُ الرَّجْمُ رُجِمَ وَاِنْ كَانَ حَدُّهُ الْجَلْدُ لَمْ يُجْلَدْ حَتَّى يَبْرَأَ فَاِذَا زَنَتِ الْحَامِلُ لَمْ تُحَدَّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَاِنْ كَانَ حَدُّهَا الْجَلْدُ فَحَتَّى تَتَعَلَّا مِنْ نِفَاسِهَا وَاِذَا شَهِدَ الشُّهُوْدُ بِحَدٍّ مُتَقَادِمٍ لَمْ يَمْنَعْهُمْ عَنْ اِقَامَتِهِ بُعْدُهُمْ عَنِ الْاِمَامِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمْ اِلَّا فِي حَدِّ الْقَذْفِ خَاصَّةً وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةً اَجْنَبِيَّةً فِي مَا دُوْنَ الْفَرْجِ عُزِّرَ وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ اَوْ وَلَدِ وَلَدِهِ وَاِنْ قَالَ عَلِمْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ حُدَّ وَاِنْ قَالَ ظَنَنْتُ اَنَّهَا تَحِلُّ لِيْ لَمْ يُحَدَّ وَمَنْ وَطِئَ جَارِيَةَ اَخِيْهِ وَعَمِّهِ وَقَالَ ظَنَنْتُ اَنَّهَا عَلَيَّ حَلَالٌ حُدَّ وَمَنْ زُفَّتْ اِلَيْهِ غَيْرُ اِمْرَأَتِهِ وَقَالَتِ النِّسَاءُ اِنَّهَا زَوْجَتُكَ فَوَطِئَهَا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَمَنْ وَجَدَ اِمْرَأَةً عَلَى فِرَاشِهِ فَوَطِئَهَا فَعَلَيْهِ الْحَدُّ۔

সরল অনুবাদ ঃ আর বিবাহিতের মধ্যে বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপ এক সাথে করবে না এবং এমনিভাবে কুমারী মহিলার ব্যাপারে কোড়া এবং দেশান্তরকে জমা করা যাবে না। কিন্তু যদি ইমাম তাতে কোনো যৌক্তিকতা দেখেন। সুতরাং তাকে স্বীয় সঠিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশান্তর করবে। এবং যদি অসুস্থ ব্যক্তি জেনা করে যার হদ রজম করা। তাহলে তাকে রজম করা হবে। এবং যদি তার 'হদ', 'কোড়া' লাগানো হয়, তাহলে আরোগ্য লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত কোড়া মারা হবে না। এবং যদি গর্ভবতী মহিলা জেনা করে, তাহলে গর্ভ পর্যন্ত 'হদ' লাগানো হবে না। যদি তার 'হদ' কোড়া হয়, তাহলে নেফাস থেকে পাক হওয়া পর্যন্ত এবং যখন সাক্ষীরা পুরাতন হদের সাক্ষী দেয় যা ইমাম থেকে দূর করার কোনো বাধা ছিল না, তাহলে তাদের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে না; কিন্তু বিশেষ করে মিথ্যা অপবাদের হদের ব্যাপারে। যে ব্যক্তি অপরিচিতা মহিলার সাথে লজ্জাস্থান ছাড়া অন্য জায়গায় সহবাস করে তাহলে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। এবং ঐ ব্যক্তির ওপর কোনো হদ নেই যে নিজের ছেলে অথবা নাতির বাঁদির সাথে সহবাস করেছে ; যদিও সে একথা বলে যে, আমি জানি যে, সে আমার ওপর হারাম। এবং যদি নিজের পিতার অথবা মাতার অথবা স্ত্রীর বাঁদির সাথে সহবাস করে অথবা গোলাম নিজের মনিবের বাঁদির সাথে সহবাস করে, এবং ইহা বলে যে আমি জানি যে, সে আমার ওপর হারাম তাহলে হদ লাগানো হবে এবং যদি সে বলে যে, আমি তাকে আমার জন্য হালাল মনে করেছি তাহলে তাকে হদ লাগানো হবে না। এবং যে ব্যক্তি নিজের ভাইয়ের অথবা চাচার বাঁদির সাথে সহবাস করে এবং বলে যে, আমি তাকে আমার ওপর হালাল মনে করছিলাম, তাহলে হদ লাগানো হবে। এবং যে ব্যক্তির নিকট বাসর রাত্রিতে কোন মহিলা পাঠানো হলো, এবং অন্য মহিলারা বলল যে, এটা তোমার স্ত্রী, সে ব্যক্তি সহবাস করে নিল, তাহলে তার ওপর হদ হবে না এবং তার ওপর মোহর দেওয়া আবশ্যক হবে এবং যে ব্যক্তি নিজ বিছানায় কোনো মহিলাকে পেল অতঃপর সে তার সাথে সহবাস করল তাহলে তার ওপর 'হদ' হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ الخ ঃ আহলে জাহের এবং ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপকে একসাথে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট বেত্রাঘাত ও দেশান্তরকে একত্রে করা জায়েজ আছে, কেননা হুযূর (সা.)-এরশাদ করেছেন اَلْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ অর্থাৎ কুমারী কুমারের সাথে একশত বেত্রাঘাত ও দেশান্তর। اَلثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُمِائَةٍ وَالرَّجْمُ অর্থাৎ বিবাহিতা বিবাহিতের সাথে এক শত বেত্রাঘাত ও পাথর নিক্ষেপ। কিন্তু জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট এই জমা জায়েজ নেই। কেননা বহু হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হুযূর (সা.) মায়াযে আসলামী (রা.) ইত্যাদিকে রজম করছেন কিন্তু দোররা লাগাননি। তাহলে জানা গেল যে, উল্লিখিত একত্রিকরণ (মানসূখ) বাতেল। দ্বিতীয় জবাব এই যে, প্রথম কোড়া এই কারণে মারা হয়েছিল যেহেতু মোহসান হওয়া জানা ছিল না। অতঃপর তার মোহসান হওয়া জানা গেল তাই তাকে রজম করা হলো। এবং আবূ দাউদ এবং নাসাঈ ইত্যাদি কিতাবে অন্য রকম শব্দে বর্ণনা রয়েছে। হ্যাঁ যদি হাকিম শাস্তি স্বরূপ (দেশত্যাগ) করাতে চায় তাহলে করতে পারবে। হাদীস সমূহে আবূ বকর (রা.) ওমর (রা.) ওসমান (রা.) তাঁদের থেকে বেত্রাঘাত এবং দেশান্তর করার মধ্যে একত্রিকরণের ব্যাপারে যে রেওয়ায়েত আছে, তা ঐ শাস্তি এবং তাযীর ওপরই ধরা যাবে।

قَوْلُهُ وَلَا يُجْمَعُ فِي الْبِكْرِ الخ ঃ কেননা কুরআনে তার 'হদ' কোড়া স্থির করেছে আর مُطْلَقْ نَصّ -এর ওপর অতিরিক্ততা উহাকে রহিত করার মধ্যে শামিল হবে যা সম্পূর্ণ অবৈধ।

قَوْلُهُ تَتَعَلَّا الخ ঃ অর্থাৎ উঠে যাবে অর্থাৎ নেফাস থেকে পাক এবং বের হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু কিতাবে "تَتَعَالَّا" আছে, এটা ভুল। গর্ভবতী মহিলার 'হদ' যদি কোড়া লাগানো হয়, তাহলে নেফাস থেকে পাক হওয়ার পরে লাগানো হবে। এবং হায়েযা মহিলাকে হায়েয অবস্থায় কোড়া লাগানো হবে। কেননা সে (অসুস্থ) রোগী নয়।

قَوْلُهُ وَلَاحَدَّ عَلَى مَنْ وَطِئَ الخ ঃ কোননা হুযূর (সা.)-এর হাদীস اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ (তুমি এবং তোমার মাল তোমার মাতা পিতার জন্য) এর দ্বারা বুঝা যায় যে, সন্তানের মাল মাতা পিতার মাল। সুতরাং ছেলে নাতির বাঁদির সাথে সহবাস হালাল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলো, যদিও শরিয়তের দলিলের ভিত্তিতে এটার হালাল প্রমাণ নেই। এবং সন্দেহের কারণে হদ উঠে যায়। যদিও সে হারাম হওয়া ধারণা করে। কেননা সন্দেহের কারণে হদ উঠে যাওয়ার ভিত্তি শরয়ী দলিলের ওপর জেনাকারীর (ধারণা) বিশ্বাসের ওপর নয়। এমনিভাবে যদি নিজের মাতাপিতার বা নিজের স্ত্রীর বা নিজের মনিবের বাঁদির সাথে সহবাস করল, তাহলে মালিকানা সম্পর্কের কারণে ধারণা হতে পারে যে, ছেলে নিজের মাতাপিতার বাঁদির ওপর ক্ষমতা আছে, যেমন পিতার জন্য ছেলের বাঁদির ওপর ক্ষমতা আছে, সুতরাং সহবাসের মধ্যে হালালের ব্যাপারে সন্দেহ হয়ে গেল, যাকে "শুবাহ ফিল ফেয়েল" অর্থাৎ কোনো কাজে সন্দেহ হওয়া বলে। এটা দ্বারাও 'হদ' উঠে যায়, শর্ত হলো জেনাকারী হালাল মনে করতে হবে। অন্যথা 'হদ' জারি করা হবে এবং যদি নিজ ভাই অথবা চাচার বাঁদির সাথে সহবাস করল এবং হালাল মনে করল, তাহলে 'হদ' জারি হবে। কেননা এখানে মালিকানা সম্পর্ক নেই যাতে হালাল সন্দেহ হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ زُفَّتْ الخ ঃ এটা শুবাহ্ ফিল মহল অর্থাৎ 'কোনো জায়গার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়া'এর প্রকার থেকে। কেননা এই খবর যে, এটা তার স্ত্রী শরিয়তের দৃষ্টিতে তার জন্য সহবাসকে জায়েজ রাখে। সুতরাং ধোঁকার ক্ষতিকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে স্থির করা হয়েছে।

وَمَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا فَوَطِئَهَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَمَنْ اَتَى اِمْرَأَةً فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوْهِ اَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيُعَزَّرُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى هُوَ كَالزِّنَا فَيُحَدُّ وَمَنْ وَطِئَ بَهِيْمَةً فَلَاحَدَّ عَلَيْهِ وَمَنْ زَنٰى فِيْ دَارِالْحَرْبِ اَوْ فِيْ دَارِ الْبَغْيِ ثُمَّ خَرَجَ اِلَيْنَا لَمْ يُقَمْ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

সরল অনুবাদ ঃ এবং যে ব্যক্তি এমন মহিলার সাথে বিবাহ করল, যার সাথে তার বিবাহ হালাল নয় এবং তার সাথে সহবাস করে নিল তাহলে ইমাম আযম (র)-এর নিকট তার ওপর 'হদ' ওয়াজিব নয় এবং সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট হদ লাগানো হবে। এবং যে ব্যক্তি (মহিলার) স্ত্রীর সাথে মাকরুহ জায়গা দিয়ে সহবাস করল, অথবা কউমে লূতের মতো কাজ করল তাহলে ইমাম আযম (র.)-এর নিকট তাকে হদ লাগানো হবে না, হ্যাঁ শাস্তি দেয়া হবে। সাহেবাইন বলেন যে, এটা জেনার মতো। সুতরাং 'হদ' লাগানো হবে। এবং যে ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তুর সাথে সহবাস করল, তার ওপর হদ নেই। এবং যে ব্যক্তি শত্রু কবলিত দেশে জেনা করল অথবা রাষ্ট্রদ্রোহীর ক্ষমতায় জেনা করল, অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে এল, তাহলে তার ওপর 'হদ' কায়েম করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحَدُّ الخ ঃ অর্থাৎ ইমাম আযম (র.)-এর নিকটে 'হদ' লাগানো ওয়াজিব নয়, তবে শাস্তি দেওয়া হবে এবং সাহেবাইনের নিকট যখন সে হারাম জানে, তাহলে তাকে 'হদ' লাগানো হবে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) بَيِّنْ مُنَاسَبَةَ كِتَابِ الْحُدُوْدِ مَعَ الْكِتَابِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنَ الْمَعَاقِلِ وَالدِّيَّاتِ وَالْجِنَايَاتِ؟ مَامَعْنَى الْحُدُوْدِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ بَيِّنْ وَجْهَ تَاخِيْرِ كِتَابِ الْحُدُوْدِ مِنْ كِتَابِ الْجِنَايَاتِ وَالدِّيَّاتِ وَالْمَعَاقِلِ . اُكْتُبْ وَجْهَ التَّسْمِيَةِ لِلْحُدُوْدِ .

(٢) مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْحُدُوْدِ وَالتَّعْزِيْرِ وَالْكَفَّارَةِ؟ هَلِ الْحُدُوْدُ الشَّرْعِيَّةُ لَاإِنْسَانِيَّةٌ اَمْ لَا ؟ اَىَّ شَقٍّ اِخْتَرْتَ بَيِّنْهُ بَيَانًا شَافِيًا ؟

(٣) عَرِّفِ الزِّنَا الَّذِيْ يَكُوْنُ مُوجِبًا لِلْحَدِّ؟ بِمَا يَثْبُتُ الزِّنَا؟ فَصِّلْ صُوْرَةَ الْبَيِّنَةِ وَالْاِقْرَارِ بِالزِّنَا ـ كَمَا فِيْ كِتَابِكُمْ اُكْتُبْ اَحْكَامَ الزَّانِيْ مُفَصَّلًا .

(٤) مَاذَا حُكْمُ مَنْ اَتَى اِمْرَأَتَهُ فِي الْمَوْضِعِ الْمَكْرُوْهِ اَوْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ؟ بَيِّنْ مَعَ بَيَانِ اِخْتِلَافِ الْاَئِمَّةِ ثُمَّ رَجِّحِ الْمُخْتَارَ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ .

بَابُ حَدِّ الشُّرْبِ

মদ্য পানের শাস্তি অধ্যায়

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) দণ্ডবিধান পর্বে জেনার শাস্তি বর্ণনা করার পর এখন মদ্য পানের শাস্তি অধ্যায় আরম্ভ করেছেন। জেনার অপরাধ মদ্য পানের অপরাধের চেয়ে জঘন্য ও বড়। এভাবে তার শাস্তিও বেশি, আর জঘন্য ও বড় অপরাধের বিধি-বিধান পূর্বে বর্ণনা করাই আবশ্যক।

হদ্দে শুরবকে হদ্দে কযফের পূর্বে আনার কারণ ঃ হদ্দে শুরবকে হদ্দে কযফের পূর্বে আনার কারণ এই যে, মদ্যপানকারীর অপরাধটি নিশ্চিতভাবে সাব্যস্ত হয়েছে, তাই তার শাস্তির বিধান প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর অপরাধের শাস্তির বর্ণনা করেছেন। কারণ অপবাদদানকারী সত্য হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, তাই তার অপবাদটি মদ্যপানকারীর অপরাধের ন্যায় নিশ্চিত নয়।

شُرْب -এর আভিধানিক অর্থ ঃ شُرْب -এর আভিধানিক অর্থ–মদ্যপান করা شَرَابٌ অর্থ– মদ্য, সুরা, পানীয়।

خَمْر -এর আভিধানিক অর্থ ঃ خَمْر -এর আভিধানিক অর্থ– মদ্য, উত্তেজক পানীয়।

خَمْر -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ خَمْر -এর পারিভাষিক অর্থ– এই–

اَلْخَمْرُ هُوَالَّتِيْ مِنْ مَاءِ الْعِنَبِ اِذَا غَلٰى وَاشْتَدَّ

কুরআনের আলোকে মদের নিষিদ্ধতা ঃ কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ

وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاُخِذَ وَرِيْحُهَا مَوْجُوْدَةٌ فَشَهِدَ الشُّهُوْدُ عَلَيْهِ بِذَالِكَ اَوْ اَقَرَّ وَرِيْحُهَا مَوْجُوْدَةٌ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ فَاِنْ اَقَرَّ بَعْدَ ذِهَابِ رَائِحَتِهَا لَمْ يُحَدَّ وَمَنْ سَكِرَ مِنَ النَّبِيْذِ حُدَّ وَلَاحَدَّ عَلٰى مَنْ وُجِدَ مِنْهُ رَائِحَةُ الْخَمْرِ اَوْ مَنْ تَقَيَّأَهَا وَلَايُحَدُّ السَّكْرَانُ حَتّٰى يُعْلَمَ اَنَّهُ سَكِرَ مِنَ النَّبِيْذِ وَشَرِبَهُ طَوْعًا وَلَايُحَدُّ حَتّٰى يَزُوْلَ عَنْهُ السُّكْرُ وَحَدُّ الْخَمْرِ وَ السُّكْرِ فِى الْحُرِّ ثَمَانُوْنَ سَوْطًا يُفَرَّقُ عَلٰى بَدَنِهِ كَمَا ذَكَرْنَا فِى الزِّنَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যে ব্যক্তি মদ্য পান করল আর এ অবস্থায় পাকড়াও করা গেল যে, দুর্গন্ধ (মুখে) আছে, এবং সাক্ষীগণও সাক্ষী দান করে বা সে স্বয়ং স্বীকার করে আর দুর্গন্ধও (মুখে) আছে, তবে তার ওপর হদ (ইসলামি দণ্ড) হবে। আর যদি দুর্গন্ধ শেষ হওয়ার পর স্বীকার করে তবে হদ লাগানো যাবে না। এবং যে ব্যক্তি খেজুর ভেজানোর পানি পান করে জ্ঞানহারা হয়ে যায় তবে হদ লাগানো যাবে এবং ঐ ব্যক্তির ওপর হদ নাই যার থেকে মদের গন্ধ আসে বা সে মদের বমি করে, নেশাগ্রস্তকে হদ লাগানো হবে না যে পর্যন্ত না জানা যায় যে, সে নবীয পানে নেশাগ্রস্ত হয়েছে এবং তা পান করেছে স্বেচ্ছায় এবং নেশা শেষ না হওয়া পর্যন্ত হদ লাগানো যাবে না। মদ্য এবং নেশার হদ (ইসলামি দণ্ড) স্বাধীন ব্যক্তির জন্য আশি দোররা (বেত্রাঘাত) যা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে লাগাবে। যেরূপভাবে আমি জিনার দণ্ড বিধিতে আলোচনা করেছি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ سَكِرَ الخ : এ স্থানে নবীয তথা খেজুর ভেজানো পানি পান করার ক্ষেত্রে নেশার শর্ত এজন্য লাগানো হয়েছে যে, নেশা ব্যতীত নবীয পান করলে হদ ওয়াজিব হয় না, কিন্তু মদ্যপান এর বিপরীত, কেননা উহাতে কম হোক বা বেশি, নেশা হোক বা না হোক, প্রত্যেক অবস্থায় হদ ওয়াজিব।

মদ্য পানের হদ ঃ

قَوْلُهُ وَحَدُّ الْخَمْرِ الخ : মদ্য পানের শাস্তি বেত্রাঘাত করার প্রমাণ নবী করীম (সা.)-এর বাণী–

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মাযহাব অনুযায়ী মদ্য পানের শাস্তি চল্লিশ দোররা এবং ক্ষেত্র বিশেষে আশি দোররা দেওয়ারও অনুমতি আছে। ইমাম আযম ও মালেক (র.)-এর মতে আশি দোররাই নির্ধারিত। কারণ হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতিনিধিত্ব কালে সাহাবায়ে কেরামগণের পরামর্শক্রমে এটাই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ে ছিল। আর এটার ওপর সাহাবায়ে কেরামগণ إِجْمَاعْ বা ঐকমত্য হয়েছেন।

এক বিন্দু মদ্য পানের দরুন হদ ওয়াজিব হওয়ার হিকমত ঃ প্রকাশ থাকে যে এক বিন্দু মদ্য পানের দরুন হদ ওয়াজিব হওয়া এবং কয়েক সের মল-মূত্র পানাহারের পরও হদ ওয়াজিব না হওয়ার কারণ, (১) এই হুকুম ইসলামি শরিয়তের এক অনুপম সৌন্দর্য, সুষ্ঠু বিবেক-বুদ্ধি সম্মত ও সর্বব্যাপী কল্যাণের সহায়ক ও অনুকূল। আল্লাহ তা'আলা মানুষের প্রকৃতির মধ্যেই মল-মূত্র পানাহারের প্রতি জন্মগত ও স্বভাবগত ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা রেখে দিয়েছেন। এ স্বভাবগত ঘৃণাবোধই মানুষকে এ সকল ঘৃণ্যবস্তুর পানাহার হতে বিরত রাখতে যথেষ্ট। তাই এর জন্য হদ নির্ধারণের প্রয়োজন হয়নি। অপরদিকে মদের প্রতি স্বভাবের তীব্র আকর্ষণের কারণে এর জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে, যাতে মানুষ মদ্য পান হতে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকে। এ জন্যই সামান্য পরিমাণ মদ্য পানের অপরাধেও হদ নির্ধারণ করা হয়েছে, যদিও পরিমাণের স্বল্পতার কারণে সে নেশাগ্রস্ত না হয়। কেননা অল্প মদ্য পানই অধিক পানের প্রতি উৎসাহিত করে। (২) মদ্যপানের দরুন নিজের ও অন্যের যে অনিষ্ট ও ক্ষতি সাধিত হয়, তা মল-মূত্র পানাহারের ক্ষতির তুলনায় কয়েক গুণ বেশি। পেশাব পান ও ময়লা ভক্ষণ করার ক্ষতি উহার পানকারী বা ভক্ষণকারী পর্যন্তই সীমিত থাকে। তাও এত প্রচণ্ড নয়, যে প্রচণ্ড ক্ষতি মধ্যপানের দরুন বিবেক-বুদ্ধি রহিত হওয়ার কারণে হয়।

শরিয়তে হদ নির্ধারিত হওয়ার হিকমত ঃ শরিয়তে হদ এ জন্য নির্ধারিত হয়েছে, যাতে মানুষকে গুনাহ ও অপরাধ সংগঠনের ব্যাপারে সদা সতর্কীকরণ ও ভীতি প্রদর্শন অব্যাহত থাকে। যেমন– আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ অর্থাৎ "যাতে তারা কৃতকর্মের স্বাদ ভোগ করতে পারে।" যদি হদ নির্ধারিত না হতো, তাহলে উদ্ধৃত স্বভাবের মানুষ তাদের অপকর্ম হতে বিরত থাকতো না। বরং তাদের ঔদ্ধত্য ও অনিষ্টতা আরও বৃদ্ধি পেতো।

فَإِنْ كَانَ عَبْدًا فَحَدُّهُ أَرْبَعُونَ وَمَنْ أَقَرَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسُّكْرِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُحَدَّ وَيَثْبُتُ الشُّرْبُ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُقْبَلُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি সে গোলাম (ক্রীতদাস) হয়, তবে উহার (মদ্য পানের) হদ চল্লিশ দোররা। আর যে ব্যক্তি মদ বা নেশা পান করার স্বীকার করল অতঃপর উহার থেকে ফিরে গেল তবে তাকে হদ লাগানো হবে না। এবং মদ পান করার প্রমাণ দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা হয়ে যায় বা তার একবার স্বীকার করার দ্বারা এবং উহাতে পুরুষদের সাথে মহিলাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইসলামে মদ ইত্যাদি হারাম হওয়ার কারণ ঃ ইসলামে মদ, মৃত জীব, জানোয়ার, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় এবং বেশ্যাবৃত্তি ও গণকের ভাড়া হারাম হওয়ার কারণ এই– কোনো বস্তুর হারাম হওয়া নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের ওপর, তন্মধ্যে একটি হলো যে, কোনো কোনো বস্তু স্বভাবগতভাবেই অপরাধ ও গুনাহের অন্তর্ভুক্ত বা বস্তুগুলোর দ্বারা মানুষের অপরাধ জাতীয় ফায়দা ও উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য হয়। এটাও এক প্রকারের অন্যায় ও পাপ। যেমন– মদ, মূর্তি ও বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। কারণ এ সকল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলনে এবং এগুলো তৈরি করার মধ্যে এই গুণাহসমূহ প্রকাশ করা, মানুষকে এই গুনাসমূহের প্রতি প্ররোচিত ও উৎসাহিত করা এবং নিটকতর করা হয়। সুতরাং আল্লাহর কল্যাণ বিবেচনা অনুযায়ী এ সব কিছুর ক্রয়-বিক্রয় ও ঘরে রাখা হারাম করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এটা দ্বারা এই গুনাহগুলো দূর করা এবং মানুষকে এসব বস্তু হতে বেঁচে থাকার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়। এ কারণেই হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন–إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃতজীব, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ও হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করেছেন– إِنَّ اللّٰهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ অর্থাৎ যখন আল্লাহ কোনো বস্তুকে হারাম করেন তখন উহার মূল্যও হারাম করে দেন। অতএব যখন কোনো বস্তুর ফায়দা হাসিল করার নিয়ম নির্দিষ্ট থাকে, যেমন মদ শুধুমাত্র পান করার জন্য এবং মূর্তি শুধুমাত্র পূজা করার জন্যই বানানো হয়ে থাকে এবং এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় হারাম করে দেওয়াও আল্লাহর হেকমতেরই দাবি। আর হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন– مَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ অর্থাৎ "বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা উপার্জিত অর্থ অত্যন্ত ঘৃণিত।" অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) গণকের পারিশ্রমিক নিষিদ্ধ করেছেন এবং গায়কের উপার্জনও নিষিদ্ধ করেছেন। এর কারণ হচ্ছে– যে অর্থ উপার্জনে গুনাহের সংমিশ্রণ থাকে সে অর্থের দ্বারা ফায়দা হাসিল না করার মাধ্যমে গুনাহ হতে বিরত রাখা হয়। পক্ষান্তরে এই প্রকারের লেনদেনের নিয়ম-রীতি জারি করার মাধ্যমে ফিতনা ফ্যাসাদ জারি করা এবং মানুষকে এই গুনাহসমূহের প্রতি প্ররোচিত করা হয়। দ্বিতীয় কারণ ঃ মানুষের জ্ঞান ও ধারণায় স্বাভাবিকভাবেই এ কথাটি বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, কোনো জিনিস বিক্রয় করার দ্বারাই মূল্য অর্জিত হয়। তাই উর্ধ্ব জগতেও এই মূল্যের জন্য একটি রূপক অস্তিত্ব হয়। আর স্বভাবতই অবৈধ বস্তুর রূপক অস্তিত্ব ঘৃণ্য ও নিন্দিত আকারেই হয়ে থাকে। সুতরাং এই বিক্রয় এবং এই কাজের ঘৃণ্যতা তার উর্ধ্ব জগতের রূপক মূল্য ও উহার উজরতের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। মানুষের আত্মার মধ্যেও এই কার্যাকৃতির একটা প্রভাব পড়ে। এ জন্য হযরত (সা.) মদের ব্যাপারে মদ চোলাইকারী, চোলাইর হুকুমদাতা, পানকারী, বহনকারী ও যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় সকলের প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। কারণ পাপ কাজে সাহায্য করা, পাপের প্রসার ঘটানো এবং মানুষকে পাপের প্রতি আকৃষ্ট করাও পাপ এবং এর দ্বারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হয়।

আরও একটি কারণ এই যে, নাপাকী যেমন– মুর্দা, রক্ত, গোবর, পায়খানা ইত্যাদির সাথে সংমিশ্রণ অত্যন্ত ক্ষতিকর ও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। এই সংমিশ্রণের কারণে শয়তানের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়। এবং পবিত্র লোকদেরকে আল্লাহ

তাআলা পছন্দ করেন। কিন্তু সামান্য সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও যেহেতু গত্যান্তর নেই, তাই সম্পূর্ণরূপে উহার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। কারণ, তাতে মানুষের অপরিসীম কষ্ট ও অসুবিধা হতো। সুতরাং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের মুহূর্তে নাপাক বস্তুগুলোর দ্বারা যতটুকু উপকৃত না হলেই নয়, সে পরিমাণ ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। যেমন– গোবরের (সারের) ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। বাকি অন্যান্যগুলোর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা, এতে কারো কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। যেমন– মদ ও শূকরের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মদ্য পান ইত্যাদিতে কাফ্ফারা নির্ধারিত না হওয়ার কারণ ঃ এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (র.) লিখেছেন "যে সমস্ত গুনাহ সর্বতোভাবেই হারামের অন্তর্ভুক্ত, যেমন– জুলুম ও অশ্লীল কাজকর্ম, শরিয়ত প্রবর্তক এগুলোর জন্য কোনো কাফ্ফারা নির্ধারণ ও বিধিবদ্ধ করেনি। কাজেই ব্যভিচার, মদ্যপান, সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ ও চুরির জন্য কোনো কাফ্ফারা বিধিবদ্ধ করা হয়নি। এই গুনাহ্সমূহের কাফ্ফারা নির্ধারিত না হওয়ার কারণে এগুলোতে লিপ্ত লোকদের অপরাধকে লঘু করে দেওয়া হয়নি। আর এই অপরাধসমূহে এ জন্য কাফফারা বিধিবদ্ধ হয়নি যে, এ প্রকারের অপরাধে কাফ্ফারা কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। কাফ্ফারার প্রভাব সেখানেই পরিলক্ষিত হয়, যেখানে বিষয়টি মূলত মুবাহ থাকে এবং কোনো সাময়িক কারণে উহা হারাম হয়ে যায়। যেমন– রমজান মাসের দিনে এবং হজের এহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের কারণে কাফ্ফারা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শিরোনামে উল্লিখিত গুনাহসমূহ আসলেই কবীরা ও বড় শক্ত গুনাহ। তাই এগুলোতে কাফ্ফারা নির্ধারণ না করে শাস্তিরই বিধান দেওয়া হয়েছে।

اَلْمُنَاقَشَةُ – অনুশীলনী

(١) هَاتِ مُنَاسَبَةَ بَابِ حَدِّ الشُّرْبِ مَعَ أَحْكَامِ الزِّنَا ـ اُكْتُبْ مَعْنَى الشُّرْبِ لُغَةً ثُمَّ بَيِّنْ وَجْهَ تَقْدِيْمِ بَابِ الشُّرْبِ عَلٰى بَابِ حَدِّ الْقَذْفِ ـ

(٢) مَامَعْنَى الْخَمْرِ لُغَةً وَشَرْعًا؟ بَيِّنْ تَحْرِيْمَ الْخَمْرِ بِضَوْءِ الْقُرْاٰنِ الْكَرِيْمِ ـ اُكْتُبْ أَحْكَامَ حَدِّ الشُّرْبِ مُفَصَّلًا ـ

(٣) مَا الْحِكْمَةُ فِيْ وُجُوْبِ حَدِّ الشُّرْبِ؟ مَاالْاِخْتِلَافُ بَيْنَ الْاَئِمَّةِ فِيْ مِقْدَارِ حَدِّ الشُّرْبِ بَيِّنْ مَعَ الدَّلَائِلِ؟

بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

অপবাদের শাস্তি অধ্যায়

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) জানের নিরাপত্তা ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তার জন্য শরিয়তের দণ্ডবিধি ও শাস্তির বর্ণনা করতে গিয়ে অপবাদের শাস্তি অধ্যায়কে মদ্য পানের শাস্তি অধ্যায়ের পর এ জন্য এনেছেন যে, অপবাদের শাস্তির মধ্যে অপবাদ দানকারী সত্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাই তার শাস্তির কারণ হালকা, পক্ষান্তরে মদ্য পানের শাস্তির মধ্যে মদ্য পানকারীর অপরাধ নিশ্চিত তাই তার শাস্তির কারণ মারাত্মক।

قَذْف-এর আভিধানিক অর্থ ঃ قَذْف -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে اَلرَّمْىُ مُطْلَقًا। অর্থাৎ সাধারণত নিক্ষেপ করা, কামূস গ্রন্থে আছে, اَلتَّقَاذُفُ এটা بَابِ تَفَاعُلْ থেকে অর্থ পরস্পর নিক্ষেপ করা। –(আত্‌তানক্বীহুদ্ দ্বারুরী)

قَذْف-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ قَذْف-এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে বিশেষ একটি নিক্ষেপ অর্থাৎ বিশেষ অপবাদ বা সরাসরি ব্যভিচার-এর অপবাদ, যে অপবাদের কারণে হদ ওয়াজিব হয়ে থাকে।

حَدِّ قَذْف -এর শর্ত ঃ حَدِّ قَذْف -এর শর্ত হচ্ছে অপবাদকৃত পুণ্যবতী হওয়া আর অপবাদদাতা ব্যভিচারের প্রমাণ দিতে অক্ষম হওয়া।

অপবাদদাতাকে প্রমাণ উপস্থিত করতে সময় দেওয়ার বিধান ঃ

মাসআলা ঃ যদি অপবাদদাতা বলে আমার কাছে শহরে সাক্ষী আছে, তবে তাকে মজলিসের শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়া যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, তাকে দ্বিতীয় মজলিস পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে। (আল-কাওকাবুদ্ দুররী)

কুরআনের আলোকে অপবাদের শাস্তি ঃ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَاْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَّ اُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ -

অর্থাৎ যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, অতঃপর স্বপক্ষে চারজন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে। এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই নাফরমান। (সূরায়ে নূর, আয়াত– ৫)

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ رَجُلًا مُحْصَنًا أَوْ إِمْرَأَةً مُحْصَنَةً بِصَرِيْحِ الزِّنَا وَطَالَبَ الْمَقْذُوْفُ بِالْحَدِّ حَدَّهُ الْحَاكِمُ ثَمَانِيْنَ سَوْطًا إِنْ كَانَ حُرًّا يُفَرِّقُ عَلَى أَعْضَائِهِ وَلَا يُجَرِّدُ مِنْ ثِيَابِهِ غَيْرَ أَنَّهُ يُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا جَلَّدَهُ أَرْبَعِيْنَ سَوْطًا وَالْإِحْصَانُ يَكُوْنُ الْمَقْذُوْفُ حُرًّا بَالِغًا عَاقِلًا مُسْلِمًا عَفِيْفًا عَنْ فِعْلِ الزِّنَا وَمَنْ نَفَى نَسَبَ غَيْرِهِ فَقَالَ لَسْتَ لِأَبِيْكَ أَوْ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَأُمُّهُ مُحْصَنَةٌ مَيِّتَةٌ فَطَالَبَ الْاِبْنُ بِحَدِّهَا حُدَّ الْقَاذِفُ وَلَا يُطَالَبُ بِحَدِّ الْقَذْفِ لِلْمَيِّتِ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ فِيْ نَسَبِهِ بِقَذْفِهِ وَإِذَا كَانَ الْمَقْذُوْفُ مُحْصَنًا جَازَ لِابْنِهِ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ أَنْ يُطَالِبَ بِالْحَدِّ ـ

সরল অনুবাদ : যখন কোনো ব্যক্তি কোনো সৎ পুরুষ অথবা সতী নারীকে পরিষ্কার জিনার অপবাদ দেয় এবং অপবাদকৃত ব্যক্তি শাস্তি চায় তাহলে কাজি সাহেব তাকে আশি (৮০) কোড়া শাস্তি দেবে, যদি সে আজাদ হয়, তার প্রত্যেক অঙ্গে পৃথক পৃথক করে। এবং তাকে কাপড় খুলে উলঙ্গ করবে না। কিন্তু তার থেকে জামার আস্তিন ও তুলোযুক্ত কাপড় খুলে দেওয়া হবে। আর যদি গোলাম হয় তাহলে চল্লিশ (৪০) কোড়া শাস্তি দেবে। আর 'ইহসান' হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, অপবাদকৃত ব্যক্তি আজাদ, বালেগ, জ্ঞানী, মুসলমান এবং জিনা থেকে পাক হবে। আর যে ব্যক্তি কারো বংশের নিষেধ করে দিল, অতঃপর বলল তুমি তোমার পিতার পুত্র নও অথবা হে অপকর্ম কারিণীর পুত্র অথচ তার "মোহ্সানাহ" মা মৃত, অতঃপর ছেলে মায়ের ওপর অপবাদ-এর শাস্তি দাবি করল তাহলে হদ্ অর্থাৎ শাস্তি দেওয়া হবে এবং মৃতের পক্ষ থেকে অপবাদের শাস্তি দাবি করতে পারবে না; কিন্তু ঐ ব্যক্তিই পারবে যার বংশের মধ্যে অপবাদের কারণে বদনামী হয়েছে। আর যদি তুহ্মতকৃত ব্যক্তি "মোহসান" হয় তাহলে তার কাফির ছেলে এবং গোলামের জন্য শাস্তি তলব কর জায়েজ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُطَالَبُ الخ : মৃতের পক্ষ থেকে তুহমতের শাস্তি ঐ ব্যক্তিই অন্বেষণ করতে পারবে যার বংশের মধ্যে ঐ অপবাদ দ্বারা ফরক পড়ে অর্থাৎ ছেলে ও পিতা। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট তুহমতের শাস্তি দাবি করার হক প্রত্যেক ওয়ারিশদের জন্যই বিদ্যমান আছে। কেননা তাঁর মতে ওগুলোর মধ্যে ওয়ারিশ জারি হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ إِلَّا مَنْ يَقَعُ الْقَدْحُ الخ : অর্থাৎ মৃতের পক্ষ থেকে অপবাদের শাস্তির দাবি একমাত্র ঐসব লোক করতে পারবে যারা অপবাদের কারণে বদনামী হয়েছে, যেমন– মৃতের পিতা, ছেলে।

وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ اَنْ يُطَالِبَ مَوْلَاهُ بِقَذْفِ اُمِّهِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَاِنْ اَقَرَّ بِالْقَذْفِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوْعُهُ وَمَنْ قَالَ لِعَرَبِيٍّ يَانِبْطِيُّ لَمْ يُحَدُّ وَمَنْ قَالَ لِرَجُلٍ يَا اِبْنَ مَاءِ السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ وَاِذَا نَسَبَهُ اِلَى عَمِّهِ اَوْ اِلَى خَالِهِ اَوْ اِلَى زَوْجِ اُمِّهِ فَلَيْسَ بِقَاذِفٍ وَمَنْ وَطِئَ وَطْئًا حَرَامًا فِيْ غَيْرِ مِلْكِهِ لَمْ يُحَدُّ قَاذِفُهُ وَالْمُلَاعَنَةُ بِوَلَدٍ لَا يُحَدُّ قَاذِفُهَا وَاِنْ كَانَتِ الْمُلَاعَنَةُ بِغَيْرِ وَلَدٍ حُدَّ قَاذِفُهَا وَمَنْ قَذَفَ اَمَةً اَوْ عَبْدًا اَوْ كَافِرًا بِالزِّنَاءِ اَوْ قَذَفَ مُسْلِمًا بِغَيْرِ الزِّنَاءِ فَقَالَ يَا فَاسِقُ اَوْ يَا كَافِرُ اَوْ يَا خَبِيْثُ عُزِّرَ وَاِنْ قَالَ يَاحِمَارُ اَوْ يَاخِنْزِيْرُ لَمْ يُعَزَّرْ وَالتَّعْزِيْرُ اَكْثَرُهُ تِسْعَةٌ وَّثَلَاثُوْنَ سَوْطًا وَاَقَلُّهُ ثَلَاثُ جَلَدَاتٍ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رحـ) يُبْلَغُ بِالتَّعْزِيْرِ خَمْسَةً وَّسَبْعِيْنَ سَوْطًا -

সরল অনুবাদ ঃ আর গোলামের জন্য তার মাওলার ওপর তার আজাদ মায়ের ওপর অপবাদের শাস্তি দাবি করা জায়েজ নেই। আর যদি কেউ অপবাদের স্বীকার করে অতঃপর তার স্বীকার থেকে ফিরে গেল তাহলে তার স্বীকৃত থেকে প্রত্যাবর্তন করা কবুল করা হবে না। যে ব্যক্তি কোনো আরব ব্যক্তিকে "يَا نِبْطِيُّ" ("হে নিবত্বী!") বলল, তাহলে হদ লাগানো হবে না। আর যে ব্যক্তি কাউকে বলল "হে আসমানের পানির ছেলে" তাহলে সে অপবাদকারী নয়। যখন কাউকে তার চাচা অথবা মামা অথবা তার মায়ের স্বামীর দিকে সম্পর্ক করল সে অপবাদ প্রদানকারী নয়। যে ব্যক্তি আপন মালিকানা ছাড়া হারাম সঙ্গম করে তাহলে তার অপবাদ প্রদানকারী ব্যক্তিকে হদ লাগানো হবে না। বাচ্চার কারণে লে'আনকারীণীর অপবাদ প্রদানকারী ব্যক্তিকে হদ লাগানো হবে না। আর সে ব্যক্তি কোনো বাঁদি অথবা গোলাম অথবা কাফেরকে অপকর্মের অপবাদ দিল, অথবা মুসলমানকে যেনা ছাড়া অন্য অপবাদ দিল যেমন বলল– হে ফাসেক, অথবা হে কাফের, অথবা হে খবীস! তাহলে তা'যীর করা হবে। আর যদি বলে হে গাধা! অথবা হে শুকর! তাহলে তা'যীর করা হবে না। তা'যীর হচ্ছে অধিকতর উনচল্লিশ কোড়া আর সর্বনিম্ন তিন কোড়া। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, তা'যীর পঁচাত্তর কোড়া পর্যন্ত হতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِلْعَبْدِ الخ **ঃ** যেহেতু গোলাম স্বয়ং নিজের জন্যই মাওলার ওপর অপবাদের শাস্তির অন্বেষণ করতে পারে না।

قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوْعُهُ الخ **ঃ** কেননা তার সাথে গোলামের হক সম্পর্ক হয়ে পড়েছে।

قَوْلُهُ اِبْنَ مَاءِ السَّمَاءِ الخ **ঃ** কাউকে এ শব্দ দ্বারা আহ্বান করার দ্বারা তুহমতের শাস্তি হবে না। কেননা এর দ্বারা দানশীলতা, সুন্দর ও পরিচ্ছন্নতার সাথে তুলনা দেওয়া বুঝা যায়। সুতরাং আমের ইবনে হারেসার লকব مَاءُ السَّمَاءِ (আকাশের পানি) ছিল। কেননা তিনি দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর সম্পদকে বৃষ্টির ন্যায় প্রবাহিত করতেন। অনুরূপ উম্মুল মুনযের সৌন্দর্যতার কারণে مَاءُ السَّمَاءِ-এর সাথে লকবকৃত ছিল। নু'মান ইবনুল মুনযেরের লকবও اِبْنَ مَاءِ السَّمَاءِ ছিল অধিক দানশীলতার কারণে।

قَوْلُهُ يَا نَبَطِيُّ الخ : نَبْط (নিবৃত) এক অনারব গোত্র যারা ইরাকীদের মধ্য থেকে ছিল। তারপর সেখানকার সাধারণ জনগণকেই নিবৃত বলা শুরু হলো।

মাসআলা হচ্ছে যে, যদি কোনো আরবিকে يَانَبَطِيُّ (হে নিবৃতী) বলে ডাক দেওয়া হয় তাহলে হদ লাগানো হবে না। কেননা আহবায়ক উক্ত শব্দ দ্বারা ফকীহ্ না হওয়ার মধ্যে তুলনা দেওয়ার ইচ্ছা করেছে।

قَوْلُهُ إِذَا نَسَبَهُ إِلَى عَمِّهِ الخ : যদি কাউকে চাচা, মামা, অথবা তার মায়ের স্বামীর দিকে সম্পর্ক করল তাহলে এটা অপবাদ হবে না। কেননা তাদের প্রত্যেকের ওপর أَبٌ বাপের এতলাক হয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী– وَإِلٰهُ أَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحٰقَ অথচ এখানে হযরত ইসমাঈল (আ.) চাচা ছিলেন।

হাদীসের বাণী– اَلْخَالُ أَبٌ أَوْ زَوْجُ الْأُمِّ কে তরবিয়ত অর্থাৎ লালন-পালনের কারণে পরিভাষা হিসেবে পিতা বুঝা যায়।

قَوْلُهُ وَمَنْ وَطِئَ الخ : এখানে তার ওপর অপবাদ প্রদানকারীর ওপর হদ লাগানো হবে না। কেননা উক্ত সঙ্গম শুধুমাত্র হারাম রয়নি।

تَعْزِيْر -এর আভিধানিক অর্থ :

قَوْلُهُ عَزَّرَ الخ : تَعْزِيْر-এর আভিধানিক অর্থ সাধারণত আদব দেওয়ার জন্য শাস্তি দেওয়া, চাই রাগ মুখে হোক, বা কঠোর বাক্যে হোক, দুই চার বা পাঁচ দশ বার মারার দ্বারা হোক বা অন্য কোনো প্রকারে হোক।

تَعْزِيْر -এর মূলনীতি : تَعْزِيْر করা ও না করার মধ্যে মূলনীতি এই যে, যখন কোনো ব্যক্তি অপরকে এরূপ إِخْتِيَارِيْ কাজের দিকে সম্বন্ধ করে যা শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম এবং حُرْمَتْ টি লজ্জার কারণ হয় তবে এ ক্ষেত্রে বক্তার ওপর تَعْزِيْر আসবে। আর যদি সম্বন্ধকৃত কাজটি إِخْتِيَارِيْ না হয় অথবা إِخْتِيَارِيْ হয় কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম কিন্তু দেশীয় প্রথানুযায়ী লজ্জার কারণ নয় তবে উহাতে تَعْزِيْر নেই। এ মূলনীতিকে সামনে রাখা হলে تَعْزِيْر সম্পর্কীয় সকল বাক্যের বিধান সহজেই বুঝা যাবে।

تَعْزِيْر ও حَدّ-এর মধ্যে পার্থক্য কি? تَعْزِيْر বলা হয় যে, গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলা কোনো শাস্তি নির্ধারণ করেননি; বরং উহার শাস্তি, স্থান, কাল ও অবস্থাভেদে বিচারকের রায়ের ওপর ন্যস্ত করে দেওয়া হচ্ছে। যেগুলোর বিরুদ্ধাচরণ জায়েজ নয়। আর حَدّ ইহা আরবি শব্দ।

وَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يَضُمَّ إِلَى الضَّرْبِ فِي التَّعْزِيرِ الْحَبْسَ فَعَلَ وَأَشَدُّ الضَّرْبِ التَّعْزِيرُ ثُمَّ حَدُّ الزِّنَا ثُمَّ حَدُّ الشُّرْبِ ثُمَّ حَدُّ الْقَذْفِ وَمَنْ حَدَّهُ الْإِمَامُ أَوْعَزَّرَهُ فَمَاتَ فَدَمُهُ هَدَرٌ وَإِذَا حُدَّ الْمُسْلِمُ فِي الْقَذْفِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ تَابَ وَإِنْ حُدَّ الْكَافِرُ فِي الْقَذْفِ ثُمَّ أَسْلَمَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি ইমাম সাহেব এটা ভালো মনে করেন যে, তা'যীরের মধ্যে কোড়ার সাথে বন্দী করাও সংযুক্ত করে তাহলে তাও সংযুক্ত করা হবে। সবচেয়ে কঠোরতর মার হচ্ছে তা'যীরের, এরপর জিনার শাস্তির, এরপর মদ পানের শাস্তি, এরপর অপবাদকারীর শাস্তি। যে ব্যক্তিকে ইমাম সাহেব হদ লাগাল অথবা শাস্তি দিল এবং সে মারা গেল তাহলে তার খুন বৃথা যাবে। যখন কোনো মুসলমান ব্যক্তির ওপর তুহমতের হদ লাগাল তাহলে তার সাক্ষী পড়ে যাবে যদিও সে তওবা করে নেয়। আর যদি কোনো কাফিরকে তুহমতের হদ লাগানো হয় অতঃপর সে মুসলমান হয়ে গেল তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَدَمُهُ هَدَرٌ الخ ঃ হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট বাইতুল মাল থেকে তার দিয়ত ওয়াজিব। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, হাকিম সাহেব যা কিছু করেছেন তাতে তিনি শরয়ী ভাবেই আদিষ্ট। আর আদিষ্টের কাজ সর্বদা নিরাপদভাবে হবে এমন ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

কোন কোন গুনাহে تَعْزِير রয়েছে?

قَوْلُهُ فِي التَّعْزِيرِ الخ ঃ তা'যীর সে সকল গুনাহের জন্য বিধিবদ্ধ করা হয়েছে যেগুলোর জন্য কোনো হদ ও কাফ্ফারা নেই। কেননা গুনাহ তিন প্রকার। (১) যেগুলোর জন্য হদ নির্ধারিত আছে, কিন্তু কাফ্ফারা নির্ধারিত নেই। (২) যেগুলোর জন্য কাফ্ফারা আছে, কিন্তু হদ নির্ধারিত নেই। (৩) যেগুলোর জন্য কোনো হদ বা কাফ্ফারা নির্ধারিত নেই। প্রথম প্রকার যেমন– চুরি, জিনা ও জিনার অপবাদ দেওয়া। এগুলোর জন্য হদ নির্ধারিত রয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ যেগুলোর জন্য শুধু কাফ্ফারা নির্ধারিত রয়েছে, হদ নেই। যেমন– রমজান মাসের দিনের বেলায় বা এহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ যেগুলোর জন্য কোনো হদ বা কাফ্ফারা নেই, শুধুমাত্র তা'যীরের হুকুম রয়েছে। যেমন– বেগানা স্ত্রীলোককে চুম্বন করা, তার সাথে নির্জন ঘরে বসা। হাম্মামখানায় বিবস্ত্র প্রবেশ করা, মৃত জীবজন্তু, রক্ত ও শূকরের গোশ্ত খাওয়া ইত্যাদি। প্রথম প্রকারে 'হদ'ই তা'যীরের জন্য যথেষ্ট। দ্বিতীয় প্রকারে কাফ্ফারার সাথে তা'যীরও ওয়াজিব হবে কি হবে না সে ব্যাপারে দু'ধরনের মত রয়েছে। তৃতীয় প্রকারে সর্বসম্মতভাবে শুধু তা'যীরের হুকুমই কার্যকর হবে।

كِتَابُ السَّرِقَةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيْقِ

চুরি ও ডাকাতির পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) চুরি ও ডাকাতি পর্বকে দণ্ডবিধি ও শাস্তি পর্বের পর এ জন্য এনেছেন যে চুরি ও ডাকাতি পর্বও দণ্ডবিধি ও শাস্তি পর্বের অন্তর্ভুক্ত। হ্যাঁ. পার্থক্য এই যে, চুরি-ডাকাতির শাস্তির সাথে আবার ক্ষতিপূরণও দিতে হয় পক্ষান্তরে পূর্বে বর্ণিত দণ্ডবিধিসমূহে শরিয়তে কোনো ক্ষতিপূরণ নেই।

চুরি ও ডাকাতির পর্বকে দণ্ডবিধি পর্বের থেকে পৃথক বর্ণনা করার কারণ ঃ চুরি ও ডাকাতি পর্বকে অধ্যায় হিসাবে না এনে ভিন্ন পর্বে বর্ণনা করার কারণ এই যে. এখানে চুরি ও ডাকাতি পর্বে ক্ষতিপূরণের বিধি-বিধান ইহা দণ্ডবিধির থেকে পৃথক বিধান তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই এখানে অধ্যায় না বলে ভিন্নভাবে চুরি ও ডাকাতি পর্বকে আনা হয়েছে।

سَرَقَة-এর আভিধানিক অর্থ ঃ سَرَقَة-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অন্যের কোনো বস্তুকে গোপনভাবে নেওয়া।

سَرَقَة-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ سَرَقَة -এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে জ্ঞানী প্রাপ্তবয়স্ক লোক অন্য কারো এরূপ বস্তুকে গোপনে নেওয়া যার মূল্য সীলমোহরকৃত দশ দিরহামের সমপরিমাণ হয় এবং ঐ বস্তু ঘরে অথবা অন্য কোনো হেফাজতকারী দ্বারা হেফাজতে থাকে।

কি পরিমাণ মালে হাত কাটা হবে? আহলে জাহেরদের মতে চুরিতে হাত কাটার জন্য মালের কোনো পরিমাণ নির্ধারিত নেই, খারেজী সম্প্রদায়েরও এই মতামত, তাদের প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী–

اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا (الاية) –

অর্থাৎ যে পুরুষ চুরি করে এবং নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও। – (সূরায়ে মায়েদাহ, আয়াত–৩৮)

তারা বলেন, এ আয়াত مُطْلَقْ এখানে হাত কাটার জন্য চুরিকৃত মালের পরিমাণ বলা হয়নি।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত-এর পক্ষ থেকে তাদের এই প্রমাণকে এভাবে খণ্ডন করা হয়েছে যে, আহলে জাহের ও খারেজী সম্প্রদায়ের দলিল অনুযায়ী তো একটি গম চুরি করলেও চোরের হাত কাটতে হবে অথচ এটার পক্ষে কেউ নেই।

আইম্মায়ে আরবাআহ-এর মাঝে মতভেদ ঃ হযরত ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এক দীনার স্বর্ণ মুদ্রার চতুর্থাংশ পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে, আর ইমাম মালেক ও আহমাদ (র.)-এর মতে তিন দিরহাম রৌপ্য মুদ্রা চুরি করলে হাত কাটা হবে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর প্রমাণ ঃ হাদীস শরীফে আছে, এক দীনারের চতুর্থাংশ মধ্যে হাত কর্তন করবে, উহার কমে কর্তন করবে না।

ইমাম মালেক ও আহমাদ (র.) -এর প্রমাণ ঃ নবী করীম (সা.)-এর যুগে একটি ঢাল চুরিতে হাত কাটা হতো যে ঢালটির মূল্য ছিল তিন দিরহাম।

আহনাফ-এর মতামত ঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী যে পরিমাণ মালে হাত কাটা হবে তার পরিমাণ দশ দিরহাম।

আহনাফের প্রমাণ ঃ (১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র.) হতে বর্ণিত, لَا قَطْعَ اِلَّا فِىْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ অর্থাৎ, "দশ দিরহাম ব্যতীত হাত কাটা হবে না।" –(তাবরানি দারে কুতনী)

(২) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, ثَمَنُ الْمِجَنِّ الَّذِىْ قُطِعَ فِيْهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ অর্থাৎ যে ঢালের জন্য হাত কাটা হবে তার মূল্য দশ দেরহাম।

আইম্মায়ে ছালাছার প্রমাণের খণ্ডন ঃ ইমাম মালেক ও আহমদ (র.)-এর প্রমাণের জবাব এই যে, ঢালের মূল্য দশ দিরহাম-এর চেয়ে বেশিও আছে, আর حُدُوْد -এর মধ্যে বেশির ওপর বিধান স্থির করা উত্তম।

আল-কুরআন ও লটারীর মাধ্যমে চোর সাব্যস্ত করা ঃ কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে, فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ। অর্থ ঃ অতঃপর লটারী করলে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন।–(সূরা ঃ আস্ সাফফাত ঃ আয়াত ১৪১)

আধুনিক সমাধানঃ লটারীর মাধ্যমে কারও হক প্রমাণিত করা অথবা কাউকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না, যেমন কাউকে লটারীর মাধ্যমে চোর সাব্যস্ত করা যায় না। এমনিভাবে বিরোধপূর্ণ সম্পত্তির ব্যাপারে লটারী এমন ক্ষেত্রে জায়েজ বরং উত্তম যে ক্ষেত্রে কাউকে পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয়েছে যে, কয়েকটি বৈধ পন্থার মধ্য হতে যে কোনো একটি অবলম্বন না করে লটারীর মাধ্যমে তা ফয়সালা করে নেয়। উদাহরণত যার একাধিক স্ত্রী রয়েছে সফরে যাওয়ার সময় তাদের যে কোনো একজনকে সে সাথে নেওয়ার অধিকার রাখে– এমতাবস্থায় নিজ ইচ্ছায় কাউকে নির্বাচন না করে লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা করে নিল। এটা উত্তম, এতে কেউ মনক্ষুণ্ন হবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাই করতেন।

إِذَا سَرَقَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ مَا قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ مِنْ حِرْزٍ لَاشُبْهَةَ فِيهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ فِيهِ سَوَاءٌ وَيَجِبُ الْقَطْعُ بِإِقْرَارِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً أَوْ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَإِذَا اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةٍ فَأَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ قُطِعَ وَإِنْ أَصَابَهُ أَقَلَّ مِنْ ذَالِكَ لَمْ يُقْطَعْ -

সরল অনুবাদ ঃ যখন বালেগ জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি দশ দিরহাম চুরি করল অথবা ঐ জিনিস যার মূল্য দশ দিরহাম হয়, দশ দিরহাম সীলমোহরকৃত হোক অথবা সীলমোহরকৃত না হোক এমন সংরক্ষিত স্থান থেকে যার মধ্যে কোনো প্রকার সন্দেহ হয় না তাহলে তখন হাত কর্তন করা ওয়াজিব, এর মধ্যে গোলাম চোর ও আজাদ চোর বরাবর হবে। তার একবার স্বীকৃতি দ্বারা হাত কর্তন করা ওয়াজিব। অথবা দু'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা যখন পূর্ণ একটি দল চুরির মধ্যে শরিক হয়। সুতরাং তাদের মধ্যে প্রত্যেকের যদি দশ দিরহাম পরিমাণ পৌঁছে তাহলে হাত কর্তন করা হবে, আর যদি তার চেয়ে আরো কম পৌঁছে তাহলে হাত কর্তন করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

চুরির শাস্তি স্বরূপ চোরের হাত কাটার রহস্য ঃ

قَوْلُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, এখানে একটি প্রশ্ন উদিত হয় তা এই যে, চোরের হাত কেটে দেওয়ার বিধান রাখা হলো কেন? এর উত্তর এই যে, চোর অত্যন্ত গোপনভাবে চুরি করে থাকে। স্বয়ং চোরের আরবি 'সারাক্কা' (অর্থাৎ গোপনে কিছু নিয়ে যাওয়া) শব্দটিই এর প্রমাণ বহন করে। যেমন– কোনো লোক যখন কারও প্রতি গোপনভাবে লক্ষ্য করে এবং সে চায় না যে, অন্যকেও বিষয়টি অবগত করানো হোক, তখন বলা হয়, অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির প্রতি চুরি করে দেখে থাকে। চোর সারাক্ষণ এই ভয়ে ভীত ও লুক্কায়িত থাকে যে, কেউ টের পেয়ে গেলে সে ধরা পড়ে যাবে। যখন সে কোনো কিছু চুরি করে, পাকড়াও হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য অত্যন্ত দ্রুত চলতে থাকে। এই দ্রুত প্রস্থান করার জন্য তার হাত ও পায়ের শক্তি ব্যবহার করে। কেননা মানুষের দু'টি হাত পাখির উড়ার জন্য দু'টি ডানার ন্যায়। আর দ্রুত যাওয়ার জন্য পায়ের ভূমিকার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং চোরের হাত কাটার শাস্তি দেওয়ার অর্থ হলো তার বাহুশক্তি দুর্বল করে দেওয়া এবং পুনরায় চুরি করলে অতি সহজে তাকে পাকড়াও করা। প্রথমবার চুরির কারণে তার এক বাহুশক্তি কাটা যাবে। এতে তার দৌড়িয়ে যাওয়ার শক্তি কমে যাবে, অতঃপর আবারও যদি চুরি করে, তাহলে তার একটি পা কেটে দেওয়া হবে যাতে পলায়নের শক্তি আরও স্তিমিত হয়ে যায়, সে যেন কোনো মতেই পলায়ন করতে না পারে। অতঃপর তৃতীয় ও চতুর্থবার চুরি করার ঘটনা খুবই বিরল। তাই শাস্তি হিসাবে অঙ্গ কাটারও আর কোনো বিধান রাখা হয়নি। যদি কদাচিৎ এমন বিরল ঘটনা ঘটেই যায়, তবে তাকে কয়েদ করে রাখবে, যাতে অন্যান্য লোকেরা তার উৎপাত হতে স্বস্তি লাভ করতে পারে।

চুরির মধ্যে কাফফারা নির্ধারিত না হওয়ার কারণ ঃ যে সমস্ত গুনাহ সর্বতভাবেই হারামের অন্তর্ভুক্ত, যেমন জুলুম ও অশ্লীল কাজকর্ম, শরিয়ত প্রবর্তক এগুলোর জন্য কোনো কাফফারা নির্ধারিত ও বিধিবদ্ধ করেনি। কাজেই ব্যভিচার, মদ্যপান, সতী-নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ ও চুরির জন্য কোনো কাফফারা বিধিবদ্ধ করা হয়নি। এই গুনাহসমূহের কাফফারা নির্ধারিত না হওয়ার কারণে এগুলোতে লিপ্ত লোকদের অপরাধকে লঘু করে দেখা হয়নি। আর এই অপরাধসমূহে এজন্য কাফফারা বিধিবদ্ধ হয়নি যে, এই প্রকারের অপরাধে কাফফারা কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। কাফফারার প্রভাব সেখানেই পরিলক্ষিত হয় যেখানে বিষয়টি মূলত মুবাহ থাকেএবং কোনো সাময়িক কারণে উহা হারাম হয়ে যায়। যেমন– রমজান মাসের দিনে এবং হজের এরহাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের কারণে কাফফারা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শিরোনামে উল্লিখিত গুনাহসমূহ আসলেই কবীরা ও বড় শক্ত গুনাহ। তাই এগুলোতে কাফফারা নির্ধারণ না করে শাস্তির বিধান দেওয়া হচ্ছে।

وَلَا يُقْطَعُ فِيمَا يُوجَدُ تَافِهًا مُبَاحًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَالْخَشَبِ وَالْحَشِيشِ وَالْقَصَبِ وَالسَّمَكِ وَالصَّيْدِ وَلَا فِيمَا يَسْرَعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ كَالْفَوَاكِهِ الرَّطْبَةِ وَاللَّبَنِ وَاللَّحْمِ وَالْبِطِّيخِ وَالْفَاكِهَةِ عَلَى الشَّجَرِ وَالزَّرْعِ الَّذِي لَمْ يُحْصَدْ وَلَا قَطْعَ فِي الْأَشْرِبَةِ الْمُطْرِبَةِ وَلَا فِي الطُّنْبُورِ وَلَا فِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ وَلَا فِي الصَّلِيبِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا الشَّطْرَنْجِ وَلَا النَّرْدِ وَلَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِ الصَّبِيِّ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حُلِيٌّ وَلَا سَارِقِ الْعَبْدِ الْكَبِيرِ وَيُقْطَعُ سَارِقُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ وَلَا يُقْطَعُ فِي الدَّفَاتِرِ كُلِّهَا إِلَّا فِي دَفَاتِرِ الْحِسَابِ وَلَا يُقْطَعُ سَارِقُ كَلْبٍ وَلَا فَهْدٍ وَلَا دُفٍّ وَلَا طَبْلٍ وَلَا مِزْمَارٍ وَيُقْطَعُ فِي السَّاجِ وَالْقَنَاءِ وَالْآبَنُوسِ وَالصَّنْدَلِ.

সরল অনুবাদ ঃ এবং ঐ সমস্ত জিনিসেও নয় যেগুলো অতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়ে যায়। যেমন– তরল ফলাদি, দুধ, গোশ্‌ত, তরমুজ, বৃক্ষের সাথে সংযুক্ত ফল এবং ঐ সমস্ত ফসলাদি যা কাটা হয়নি। এবং বেহুঁশী ও শরাব পানে হাত কাটবে না এবং বাদ্যযন্ত্র চুরিতেও কাটবে না। এবং কুরআন শরীফ চুরি করলেও নয় যদিও উক্ত কুরআন শরীফের ওপর স্বর্ণের কারুকার্য হয়। এবং স্বর্ণ রৌপ্যের ক্রুশ চিহ্নের মধ্যেও নয়। এবং দাবার ছক ও পাশা খেলার সামগ্রী চুরি করলেও নয়। এবং স্বল্প বয়স্ক স্বাধীন ছেলে চোরকেও হাত কাটবে না, যদিও উহার কাছে অলঙ্কার থাকে। এবং বয়স্ক গোলাম চোরেরও হাত কাটা হবে না। আর নাবালেগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বয়স্ক গোলাম চুরিকারীর ও হাত কাটা হবে। এবং সরকারি খাতাপত্র চুরি করলে হাত কাটা হবে না, হাঁ হিসাব-নিকাশের খাতা চুরিতে হাত কাটা হবে এবং কুকুর, ঢোল ও সারঙ্গী চুরিকারীর হাত কাটা যাবে না। সেগুন কাঠ, বল্লমের কাঠ, কালো শক্ত কাঠ এবং চন্দন কাঠ চুরি করলে হাত কাটা যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُقْطَعُ الخ ঃ আমাদের নিকট এ ব্যাপারে কায়দা হচ্ছে যে, প্রত্যেক ঐ সমস্ত সম্পদ চুরির মধ্যে হাত কর্তন করা হবে যে সমস্ত সম্পদ ভাল ও উন্নত মানের হয় এবং দারুল ইসলামে তা مُبَاحُ الْأَصْلِ সবার জন্য বৈধ) রূপে না পাওয়া যায়। نَفِيس (নফীস) বলা দ্বারা ঘাস, নারিকেল ইত্যাদি মালিকানাভুক্ত জিনিস তার থেকে বাদ হয়ে গেছে অর্থাৎ এগুলো চুরির মধ্যে হাত কর্তন করা হবে না। আর مُبَاحُ الْأَصْلِ الخ (যা মূলত বৈধ) বলা দ্বারা সমস্ত মুবাহ জিনিস বাদ হয়ে গেছে অর্থাৎ তার মধ্যে হাত কর্তন করা হবে না। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে নিম্ন ও স্বল্পমূল্য জিনিসের মধ্যে হাত কর্তন করা হতো না।

قَوْلُهُ كَالْفَوَاكِهِ الخ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন لَاقَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَ لَا كَثَرٍ-এর দ্বারা প্রমাণিত।

قَوْلُهُ وَلَافِي سَرِقَةِ الْمُصْحَفِ الخ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট এক বর্ণনায় আছে যে, কুরআন শরীফ চুরি করলে হাত কর্তন করা হবে। আর দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে যে, যদি দশ দিরহামের চেয়ে বেশি হয় তাহলে কাটা হবে অন্যথা কাটা হবে না। কেননা উক্ত কর্ম কুরআনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় এ জন্যই তার ভিন্নভাবে ধর্তব্য হবে।

ظَاهِرُ الرِّوَايَه-এর বর্ণনার কারণ হচ্ছে যে, চোর পড়ার জন্য নেওয়ারও বাহানা করতে পারে। এবং অক্ষর হিসেবেও তার মধ্যে সম্পদ হয় না অথচ সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ একমাত্র সম্পদ হওয়ার কারণেই করা হয়, তার বাইন্ডিং ও পাতার কারণে নয়।

قَوْلُهُ سَارِقِ الصَّبِيِّ الخ ঃ কেননা আজাদ ছেলে মাল নয় আর তার ওপর যে মনিমুক্তা রয়েছে তা তার আনুষঙ্গিক। আর হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট যখন মনিমুক্ত চুরির নেসাব পর্যন্ত পৌঁছবে তাহলে হাত কর্তন করা হবে।

قَوْلُهُ الدَّفَاتِرِ الخ ঃ কেননা সরকারি খাতাপত্রের মধ্যে যা লিপিবদ্ধ তা নেওয়া উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু হিসাবের খাতা পত্র তার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে পাতাসমূহ তার বিষয়াদি উদ্দেশ্য নয়। আর পাতাসমূহ সম্পদ এজন্য তার চোরের হাত কর্তন করা হবে।

وَإِذَا اتُّخِذَ مِنَ الْخَشَبِ أَوَانِيُّ أَوْأَبْوَابٌ قُطِعَ فِيْهَا وَلَاقَطْعَ عَلَى خَائِنٍ وَلَاخَائِنَةٍ وَلَانَبَّاشٍ وَلَامُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَلَا مِنْ مَالٍ لِلسَّارِقِ فِيْهِ شِرْكَةٌ ـ وَمَنْ سَرَقَ مِنْ أَبَوَيْهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لَمْ يُقْطَعْ وَكَذَالِكَ إِذَا سَرَقَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الْآخَرِ أَوِ الْعَبْدُ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ اِمْرَأَةِ سَيِّدِهِ أَوْ مِنْ زَوْجِ سَيِّدَتِهِ أَوِ الْمَوْلَى مِنْ مُكَاتَبِهِ وَكَذَالِكَ السَّارِقُ مِنَ الْمَغْنَمِ وَالْحِرْزُ عَلَى ضَرْبَيْنِ حِرْزٌ لِمَعْنًى فِيْهِ كَالدُّوْرِ وَالْبُيُوْتِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি কাঠ দিয়ে পাত্র তৈরি করা হয় বা দরজা তাহলে ঐগুলো চুরি করলে কাটা যাবে। আত্মসাৎকারী পুরুষ ও মহিলা, কাফন চোর, ডাকাত ও পকেটমারের হাত কাটা যাবে না। রাষ্ট্রীয় ধনাগার থেকে এবং যে মালে চোরের অংশ আছে চুরি করলে হাত কাটা যাবে না এবং যে ব্যক্তি নিজ মাতাপিতার, ছেলের এবং আত্মীয় যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ তাদের কোনো জিনিস চুরি করে তাহলে হাত কর্তন করা হবে না। অনুরূপ স্বামী স্ত্রীদের মধ্য থেকে কোনো একজন অপরজনের অথবা গোলাম তার মাওলার অথবা তার মাওলার স্ত্রীর অথবা তার মহিলা মাওলার স্বামীর অথবা মাওলা তার মুকাতাবের কোনো জিনিস চুরি করে (তাহলে হাত কর্তন করা হবে না) অনুরূপ গনিমতের চোরের। এবং আশ্রয় স্থল দু'প্রকারঃ এক নম্বর হচ্ছে, উক্ত জায়গায় সংরক্ষিত হবে যেমন ঘর এবং কক্ষ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ نَبَّاشٍ الخ **ঃ** নাব্বাশ প্রত্যেক ঐ সমস্ত লোককে বলা হয় যারা কবর খুরে, কাফন চুরি করে।

قَوْلُهُ مُنْتَهِبٍ الخ **ঃ** اِنْتِهَابٌ অর্থ ফিরে আসা, অর্থাৎ জোর পূর্বক আলাদাভাবে নিয়ে যাওয়া। কেননা তার কাজ গোপনীয় নয়। এবং রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেছেন– لَا قَطْعَ فِي مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا خَائِنٍ

قَوْلُهُ مُخْتَلِسٍ الخ **ঃ** গাফিলাতির সময় কোনো জিনিসকে তাড়াতাড়ি যে ব্যক্তি নিয়ে যায় তাকে مُخْتَلِسٌ বলে।

قَوْلُهُ اَلْحِرْزُ الخ **ঃ** حِرْزٌ -এর শাব্দিক অর্থ সংরক্ষিত জায়গা এবং শরয়ীভাবে ঐ জায়গাকে বলা হয় যেখানে সাধারণত সম্পদের সংরক্ষণ করা হয়। তা দু'প্রকারঃ (১) সংরক্ষিত ও নিরাপদ বাড়ি, সংরক্ষিত ঘর, দোকান, শিবির, তাঁবু, সিন্দুক ইত্যাদি। (২) রক্ষক ও পাহারাদার ইত্যাদি দ্বারা সংরক্ষিত। অতএব কোনো ব্যক্তি যদি (আলোচ্য তাফসিল অনুযায়ী) শরয়ীভাবে সংরক্ষিত বা শরয়ীভাবে সংরক্ষিত নয় কিন্তু মালিক উহার হেফাজত করে, এরূপ বস্তু চুরি করলে তার হাত কাটা যাবে।

মসজিদ থেকে চুরি করলে তার বিধান ঃ যদি কোনো ব্যক্তি মসজিদে স্বীয় আসবাবের নিকট ছিল, তা সত্ত্বেও চোর আসবাব চুরি করে ফেলল, তবে হাত কাটা যাবে। হাদীস শরীফে আছে যে, হযরত সাফওয়ান (রা.) মসজিদে স্বীয় মাথার নিচে আসবাব রেখে শুয়ে ছিলেন, এক ব্যক্তি তার আসবাব চুরি করে ফেলল, তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) ঐ ব্যক্তির হাত কাটলেন।

وَحِرْزٌ بِالْحَافِظِ فَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا مِنَ الْحِرْزِ أَوْ غَيْرِ حِرْزٍ وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ يَحْفَظُهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَطْعُ وَلَا قَطْعَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ حَمَّامٍ أَوْ مِنْ بَيْتٍ أُذِنَ لِلنَّاسِ فِي دُخُولِهِ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَسْجِدِ مَتَاعًا وَصَاحِبُهُ عِنْدَهُ قُطِعَ وَلَا قَطْعَ عَلَى الضَّيْفِ إِذَا سَرَقَ مِمَّنْ أَضَافَهُ وَإِذَا نَقَبَ اللِّصُّ الْبَيْتَ وَ دَخَلَ فَأَخَذَ الْمَالَ وَنَاوَلَهُ آخَرَ خَارِجَ الْبَيْتِ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَلْقَاهُ فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَهُ قُطِعَ وَكَذَالِكَ إِذَا حَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ وَسَاقَهُ فَأَخْرَجَهُ وَإِذَا دَخَلَ الْحِرْزَ جَمَاعَةٌ فَتَوَلَّى بَعْضُهُمُ الْأَخْذَ قُطِعُوْا جَمِيعًا وَمَنْ نَقَبَ الْبَيْتَ أَوْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَأَخَذَ شَيْئًا لَمْ يُقْطَعْ وَإِنْ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِ الصَّيْرَفِيِّ أَوْ فِي كُمِّ غَيْرِهِ -

সরল অনুবাদ ঃ দুই নম্বর হচ্ছে– প্রহরীর দ্বারা। এখন যে ব্যক্তি কোনো জিনিস আশ্রয় স্থল থেকে চুরি করল অথবা তা ব্যতীত অন্য কোনো অরক্ষিত স্থান থেকে যখন মালিক তা পাহারা দিচ্ছিল, তাহলে হাত কর্তন করা হবে। ঐ ব্যক্তির হাত কর্তন করা হবে না, যে ব্যক্তি বাথরুম থেকে অথবা এমন কক্ষ যেখানে সর্বসাধারণকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে চুরি করল। যে ব্যক্তি মসজিদ থেকে মালপত্র চুরি করল অথচ মালিক তার নিকট ছিল তাহলে হাত কর্তন করা হবে। মেহমান যদি মেজবানের কোনো জিনিস চুরি করে তাহলে হাত কর্তন করা হবে না। চোর যখন ঘরের মধ্যে সিধ কাটে এবং প্রবেশ করে মালামাল উত্তোলন করে এবং ঐ মাল দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে দিয়ে দেয় যে ঘর থেকে বাহিরে ছিল তাহলে দু'জনের কারোই হাত কর্তন করা হবে না। আর যদি মাল রাস্তায় ফেলে দেয়, অতঃপর বের হয়ে সেগুলো উঠিয়ে নিয়ে গেল তাহলে হাত কর্তন করা হবে। অনুরূপভাবে যদি গাধার ওপর উঠিয়ে সামনের দিকে হাঁকিয়ে দেয় এবং বাহিরে নিয়ে আসে, (তাহলেও হাত কর্তন করা হবে।) আর যখন সংরক্ষিত স্থানে এক দল প্রবেশ করে এবং কিছু লোক মাল নিয়ে নেয় তাহলে সবার হাত কর্তন করা হবে। আর যে ব্যক্তি ঘরের মধ্যে সিধ কাটে এবং তার ভেতর হাত দিয়ে কোনো জিনিস উঠিয়ে নেয় তাহলে হাত কর্তন করা হবে না। আর যদি নিজের হাত স্বর্ণকারের সিন্দুকের মধ্যে দিল অথবা কারো পকেটে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মেহমান চোরের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَا قَطْعَ عَلَى الضَّيْفِ الخ ঃ কেননা মেহমানের জন্য ঘর হিরয (সংরক্ষিত স্থান) নয়। কেননা সে ঘরে প্রবেশ করার জন্য অনুমতি প্রাপ্ত।

قَوْلُهُ جَمَاعَةٌ الخ ঃ জামাত প্রবেশ করা বলেছেন এ জন্য যে, যদি চুরির কাজে সবাই অংশীদার হয়, এবং এক ঘরে প্রবেশ করে মালকে বের করেছে, তাহলে শুধু প্রবেশকারীর ওপর হাত কর্তনের হুকুম হবে, আর বাকিদের ওপর তা'যীর হবে। এবং এ স্থলে সবার হাত কর্তন করার কারণ হচ্ছে যে, এখানে সবার সাহায্য পাওয়া গেছে এবং মাল বের করা সবার সাহায্য দ্বারা হয়েছে। যেমন ডাকাতির মধ্যে যখন একজন থেকে কাজ প্রকাশ হয় এবং যদি মাল নিয়ে নেয় তাহলে রাহাজানীর হদ সবার ওপর ওয়াজিব হবে।

وَاَخَذَ الْمَالَ قُطِعَ وَيُقْطَعُ يَمِيْنُ السَّارِقِ مِنَ الزَّنْدِ وَتُحْسَمُ فَاِنْ سَرَقَ ثَانِيًا قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرٰى فَاِنْ سَرَقَ ثَالِثًا لَمْ يُقْطَعْ وَخُلِّدَ فِى السِّجْنِ حَتّٰى يَتُوْبَ وَاِنْ كَانَ السَّارِقُ اَشَلَّ الْيَدِ الْيُسْرٰى اَوْ اَقْطَعَ اَوْ مَقْطُوْعَ رِجْلِ الْيُمْنٰى لَمْ يُقْطَعْ وَلَا يُقْطَعُ السَّارِقُ اِلَّا اَنْ يَّحْضُرَ الْمَسْرُوْقُ مِنْهُ فَيُطَالِبُ بِالسَّرِقَةِ فَاِنْ وَهَبَهَا مِنَ الْمَسَارِقِ اَوْ بَاعَهَا مِنْهُ اَوْ نَقَصَتْ قِيْمَتُهَا عَنِ النِّصَابِ لَمْ يُقْطَعْ وَمَنْ سَرَقَ عَيْنًا فَقُطِعَ فِيْهَا وَ رَدَّهَا ثُمَّ عَادَ فَسَرَقَهَا وَهِىَ بِحَالِهَا لَمْ يُقْطَعْ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং মাল বের করে নেয় তাহলে হাত কর্তন করা হবে। চোরের ডান হাত কব্জি থেকে কর্তন করা হবে এবং দাগ দেওয়া হবে। আর যদি দ্বিতীয়বার চুরি করে তাহলে তার বাম পা কাটা হবে। অতঃপর যদি তৃতীয়বার চুরি করে তাহলে কাটা হবে না; বরং কারাগারে বন্দী করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তওবা করে। যদি চোরের বাম হাত পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়, অথবা কর্তিত হয়, অথবা ডান পা কর্তিত হয় তাহলে কাটা হবে না। আর যে ব্যক্তির সম্পদ চুরি করা হয়েছে তার উপস্থিতি ব্যতীত চোরের হাত কর্তন করা হবে না এবং চুরি করছে এ দাবিও করতে হবে। অতঃপর যদি সে উক্ত মাল সম্পদ চোরকে দান করে দেয়, অথবা তার হাতে বিক্রি করে দিয়েছে, অথবা তার মূল্য নেসাব থেকে কম হয়ে গেল তাহলে হাত কর্তন করা হবে না। এবং যে ব্যক্তি কোনো জিনিস চুরি করল তখন তার হাত কর্তন করা হলো এবং ঐ জিনিস ফিরিয়ে দিল ঐ ব্যক্তি পুনরায় চুরি করল এবং ঐ জিনিস তার আপন অবস্থায়ই আছে তাহলে কর্তন করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيُقْطَعُ يَمِيْنُ السَّارِقِ الخ ঃ শুধুমাত্র হাত কর্তন করার দলিল হচ্ছে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এরশাদ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا আর ডান হাত কর্তন করার দলিল হচ্ছে, হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কেরাত فَاقْطَعُوْا اَيْمَانَهُمَا যা প্রসিদ্ধ। আর কব্জি থেকে কর্তন করা পূর্বসূরি হিসেবে এবং বিভিন্ন হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত । অতঃপর গরম তৈল দ্বারা দাগ দেওয়া হবে। (দাগ দু'রকমভাবে দেওয়া যায় (এক) লোহা গরম করে হাতের ওপর লাগানো হবে যেন রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। (দুই) হাত কর্তন করার পর গরম তৈলে রাখা হবে যেন রক্ত বন্ধ হয়ে যায় এবং তেলের মূল্য চোরের ওপর ওয়াজিব হবে।) হানাফী ওলামাদের নিকট ওয়াজিব হিসেবে আর শাফেয়ীদের নিকট মুস্তাহাব হিসেবে। কেননা এর দ্বারা রক্ত বন্ধ হয়ে যায়। এটাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

قَوْلُهُ فَاِنْ سَرَقَ ثَانِيًا الخ ঃ শুধু হাত কর্তন করা হাদীস এবং ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আর টাখনু থেকে কর্তন করা হযরত ওমর (রা.)-এর কৃতকর্ম দ্বারা প্রমাণিত। এবং তৃতীয়বার চুরি করা দ্বারা কর্তন হবে না বরং বন্দী করা হবে। কেননা হযরত আলী (রা.) বলেন যে, যদি চোর তৃতীয়বার চুরি করে তাহলে আমি বন্দী করে রাখব যতক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে উত্তম কোনো নমুনা প্রকাশ পায়। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, তৃতীয়বার চুরি করলে বাম হাত আর চতুর্থবার চুরি করলে ডান পা কর্তন করা হবে। কেননা এটা হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর কথার উত্তরে আমরা বলব যে, এ হাদীসটি হযরত ইমাম নাসাঈ (র.)-এর উক্তিতে অস্বীকৃত অথবা এটা মানসূখ।

قَوْلُهُ وَ رَدَّهَا الخ ঃ অর্থাৎ মালিকের নিকট ফিরিয়ে দেবে কেননা তার মালিকানার ওপর বাকি আছে। এবং চোরের জন্য চুরিকৃত বস্তু থেকে কোনোরূপ ফায়দা লাভ উঠানো জায়েজ নেই; বরং চোর যদি চুরিকৃত সম্পদ কাউকে দান করে দেয় অথবা বিক্রি করে দেয় তাহলে দানগ্রহীতা এবং ক্রেতা উভয় থেকে কোনো মতভেদ ছাড়াই ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

وَاِنْ تَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا مِثْلُ اِنْ كَانَتْ غَزْلاً فَسَرَقَهُ فَقُطِعَ فِيْهِ وَرَدَّهُ ثُمَّ نُسِجَ فَعَادَ وَسَرَقَهُ قُطِعَ وَاِذَا قُطِعَ السَّارِقُ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فِىْ يَدِهٖ رَدَّهَا وَاِنْ كَانَتْ هَالِكَةً لَمْ يَضْمَنْ وَاِذَا اِدَّعَى السَّارِقُ اَنَّ الْعَيْنَ الْمَسْرُوْقَةَ مِلْكُهٗ سَقَطَ الْقَطْعُ عَنْهُ وَاِنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً وَاِذَا خَرَجَ جَمَاعَةٌ مُمْتَنِعِيْنَ اَوْ وَاحِدٌ يَقْدِرُ عَلَى الْاِمْتِنَاعِ فَقَصَدُوْا قَطْعَ الطَّرِيْقِ فَاُخِذُوْا قَبْلَ اَنْ يَاْخُذُوْا مَالاً وَيَقْتُلُوْا نَفْسًا حَبَسَهُمُ الْاِمَامُ حَتّٰى يُحْدِثُوْا تَوْبَةً وَاِنْ اَخَذُوْا مَالَ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّيٍّ وَالْمَاْخُوْذُ اِذَا قُسِمَ عَلٰى جَمَاعَتِهِمْ اَصَابَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি ঐ জিনিস পরিবর্তন হয়ে যায় তার পূর্বের অবস্থা থেকে, যেমন সে সূতা চুরি করার কারণে হাত কাটা হয়েছে এবং ঐ সূতা ফিরিয়ে দিয়েছে, অতঃপর মালিক কাপড় বুনে নিল এবার সে কাপড় চুরি করে নিল তাহলে হাত কর্তন করা হবে। যখন চোরের হাত কেটে দেওয়া হয় এবং ঐ জিনিস হুবহু তার নিকট আছে তাহলে ফিরিয়ে দিতে হবে। আর যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। চোর যখন দাবি করে যে, চুরিকৃত বস্তু আমার, তার মালিক আমি, তাহলে হাত কর্তনের হুকুম তার থেকে রহিত হয়ে যাবে। যদিও তার উক্তির ওপর প্রমাণ উপস্থাপনা করতে না পারে। আর যদি এক দল রাস্তা প্রতিরোধক বের হয় অথবা একজন পুরুষ যে রাস্তা প্রতিরোধ করতে সক্ষম, অতঃপর তারা ডাকাতির ইচ্ছা করল এবং মাল নেওয়া ও খুন করার পূর্বে তাদেরকে গ্রেফতার করে নেওয়া হলো, তাহলে ইমাম সাহেব তাদেরকে বন্দী করে দেবে যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রকাশ্য তওবা না করে। আর যদি সে কোনো মুসলমান অথবা জিম্মির মাল নিয়ে থাকে এতটুকু পরিমাণ যে, অত্র মাল যদি সকলকে বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকে দশ দিরহাম অথবা তার চেয়ে বেশি করে পাবে,

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَتْ هَالِكَةً الخ ঃ এবং নিজে যদি নষ্ট করে তাহলেও এটাই হুকুম অর্থাৎ চোর জরিমানা দেবে। কেননা আমাদের নিকট জরিমানা এবং হাত কর্তন উভয়ই একত্রিত হয় না।

أَوْ مَا تَبْلُغُ قِيْمَتُهُ ذَالِكَ قَطَعَ الْإِمَامُ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَإِنْ قَتَلُوْا نَفْسًا وَلَمْ يَأْخُذُوْا مَالًا قَتَلَهُمُ الْإِمَامُ حَدًّا فَإِنْ عَفَا الْأَوْلِيَاءُ عَنْهُمْ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى عَفْوِهِمْ وَإِنْ قَتَلُوْا وَأَخَذُوْا مَالًا فَالْإِمَامُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَقَتَلَهُمْ أَوْ صَلَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ وَإِنْ شَاءَ صَلَّبَهُمْ وَيُصَلَّبُ حَيًّا وَيُبْعَجُ بَطْنُهُ بِرُمْحٍ إِلَى أَنْ يَمُوْتَ وَلَا يُصَلَّبُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلْثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ كَانَ فِيْهِمْ صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُوْنٌ أَوْ ذُوْ رِحْمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْمَقْطُوْعِ عَلَيْهِ سَقَطَ الْحَدُّ عَنِ الْبَاقِيْنَ وَصَارَ الْقَتْلُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ إِنْ شَاءُوْا قَتَلُوْا وَإِنْ شَاءُوْا عَفَوْا وَإِنْ بَاشَرَ الْقَتْلَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ أُجْرِيَ الْقَتْلُ عَلَى جَمَاعَتِهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ অথবা এমন জিনিস যার মূল্য এতটুকু হয় তাহলে ইমাম সাহেব তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করে দেবেন। আর যদি তারা কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে এবং কোনো মাল না নেয় তাহলে তাদেরকে হদ হিসেবে হত্যা করে ফেলবে, এমনকি অভিভাবকরা যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেয় তাহলেও তাদের ক্ষমার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবে না। আর যদি তারা হত্যাও করে এবং মালও নেয়, তাহলে ইমাম সাহেবের ইচ্ছার ওপর নির্ভর চাই তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কর্তন করে অতঃপর হত্যা করে দেয় অথবা শূলিতে দিয়ে দেয়। এবং ইচ্ছা করলে শুধু হত্যা করবেন কিংবা শুধু শূলে চড়াবেন। তাদেরকে জীবিত অবস্থায় শূলিতে দেওয়া হবে এবং তাদের পেটে বর্শা বা বল্লম দ্বারা আঘাত করবে যতক্ষণ পর্যন্ত না মারা যায়। এবং তিন দিনের বেশি শূলিতে দেওয়া হবে না। সুতরাং তাদের মধ্যে যদি বাচ্চা অথবা দিওয়ানা অথবা যাদেরকে ডাকাতি করেছে তাদের আত্মীয়-স্বজন হয় তাহলে বাকি লোকদের থেকে হদ বাদ হয়ে যাবে। আর হত্যা করা এটা অভিভাবকদের ইচ্ছার ওপর থাকবে, ইচ্ছা করলে হত্যা করবে ইচ্ছা করলে মাফ করে দেবে। আর যদি এক ব্যক্তি খুন করে তাহলেও সবার ওপর হদ জারি হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَطَعَ الْإِمَامُ الخ ঃ হাত ও পা উভয়টি কর্তন করা এ জন্য ওয়াজিব যে, ডাকাত দল সম্পদ নেওয়ার সাথে সাথে রাস্তায় ভয় দেখানোও মিলিত করেছে। সুতরাং তার হুকুম শক্ত ও কড়া হয়েছে যে, হাত কাটার সাথে সাথে পাও কাটা হবে। তার বিপরীত দিক থেকে এ জন্য কর্তন করা হয় যে, একই দিক থেকে কর্তন করা উপকারের বস্তুকে বিলুপ্ত করার দিকে ধাবিত হয়। এবং গ্রন্থকারের বাণী مِنْ خِلَافٍ দ্বারা এস্থলে ডান হাত ও বাম পা বুঝায়।

قَوْلُهُ حَبْسُهُمُ الْإِمَامُ الخ ঃ ডাকাতের হদ শাস্তি সম্পর্কে আসল প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী- إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ الخ ـ অর্থ- যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের সাথে সংগ্রাম করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হলো এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিতে চড়ানো হবে, অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেওয়া হবে, অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হলো তাদের জন্য পার্থিব লাঞ্ছনা। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। -(সূরা মায়েদা, আয়াত- ৩৩)

[এ স্থলে نَفْى দ্বারা (বন্দী) কারাগারে প্রবেশ করানো বুঝিয়েছে।]

كِتَابُ الْاَشْرِبَةِ

পানীয় পর্ব

<u>যোগসূত্র</u> **:** গ্রন্থকার (র.) ধন-সম্পদ চুরির বিধি-বিধান বর্ণনা করার পর এখন জ্ঞান-বুদ্ধি চুরির তথা জ্ঞান-বুদ্ধি হরণকারী বস্তুর বিধি-বিধান আরম্ভ করেছেন। অর্থাৎ হারাম পানীয়-এর বিধি-বিধান বর্ণনা করা আরম্ভ করেছেন। যেমন- হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, لَا اَشْرَبُ مَا يَسْرِقُ عَقْلِىْ অর্থাৎ যে বস্তু আমার জ্ঞান-বুদ্ধিকে চুরি করে তা আমি পান করব না।

اَشْرِبَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ : اَشْرِبَةٌ এটা شَرَابٌ -এর বহুবচন। شَرَابٌ -এর আভিধানিক অর্থ- পানীয়, মদ্য, সুরা, এছাড়া প্রত্যেক পানীয় বস্তুকে شَرَابٌ বলা হয় চাই উহা হালাল হোক বা হারাম।

اَشْرِبَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ : শরিয়তের পরিভাষায় اَشْرِبَةٌ ঐ সব হারাম পানীয় বস্তুর ওপর বলা যায় যেগুলোর মধ্যে নেশা আছে।

<u>**মদ ইত্যাদি হারাম হওয়ার কারণ**</u> **:** কোনো বস্তুর হারাম হওয়া নির্ভর করে কয়েকটি বিষয়ের ওপর। তন্মধ্যে একটি হলো এই যে, কোনো কোনো বস্তু স্বভাবগতভাবেই অপরাধ ও গুনাহের অন্তর্ভুক্ত বা বস্তুগুলোর দ্বারা মানুষের অপরাধ জাতীয় ফায়দা ও উপকার লাভ করা উদ্দেশ্য হয়। এটাও এক প্রকারের অন্যায় ও পাপ। যেমন- মদ, মূর্তি ও বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। কারণ এ সকল ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলনে এবং এগুলো তৈরির মধ্যে এই গুনাহসমূহ প্রকাশ করা; মানুষকে এই গুনাহসমূহের প্রতি প্ররোচিত ও উৎসাহিত করা এবং নিকটতর করা হয়। সুতরাং আল্লাহর কল্যাণ-বিবেচনা অনুযায়ী এ সকলের ক্রয়-বিক্রয় ও ঘরে রাখা হারাম করা হয়েছে। কেননা এটার দ্বারা এই গুনাহগুলো দূর করা এবং মানুষকে এসব বস্তু হতে বেঁচে থাকার প্রতি অনুপ্রাণিত করা হয়। এ কারণেই মহানবী (সা.) এরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْاَصْنَامِ .

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মুর্দা, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ও হারাম করে দিয়েছেন।

অতঃপর তিনি এরশাদ করেছেন- اِنَّ اللّٰهَ اِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তু হারাম করেন, তখন উহার মূল্যও হারাম করে দেন। অর্থাৎ যখন কোনো বস্তুর দ্বারা ফায়দা হাসিল করার নিয়ম নির্দিষ্ট থাকে, যেমন মদ শুধুমাত্র পান করার জন্য এবং মূর্তি শুধুমাত্র পূজা করার জন্যই বানানো হয়ে থাকে এবং এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন। সুতরাং এগুলোর ক্রয়-বিক্রয় হারাম করে দেওয়াও আল্লাহর হেকমতেরই দাবি। আর হুযূর (সা.)-ও এরশাদ করেছেন- مَهْرُ الْبَغِىِّ خَبِيْثٌ অর্থাৎ যখন "বেশ্যাবৃত্তির দ্বারা উপার্জিত অর্থ অত্যন্ত ঘৃণিত।" অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) গণকের পারিশ্রমিক নিষিদ্ধ করেছেন। এর কারণ- যে অর্থ উপার্জনে গুনাহের সংমিশ্রণ থাকে সে অর্থের দ্বারা ফায়দা হাসিল করা দুই কারণে হারাম। প্রথম কারণ হলো, এরূপ অর্থকে হারাম করা এবং এর দ্বারা ফায়দা হাসিল না করার মাধ্যমে গুনাহ হতে বিরত রাখা হয়। পক্ষান্তরে এ প্রকারের লেনদেনের নিয়ম-নীতি জারি করার মাধ্যমে ফিৎনা ফ্যাসাদ জারি করা এবং মানুষকে এই গুনাহসমূহের প্রতি প্ররোচিত করা হয়। দ্বিতীয় কারণ, মানুষের জ্ঞান ও ধারণায় স্বাভাবিকভাবেই এই কথাটি বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, কোনো জিনিস বিক্রয় করার দ্বারাই মূল্য অর্জিত হয়। তাই ঊর্ধ্ব জগতেও এই মূল্যের জন্য একটি রূপক অস্তিত্ব হয়। আর স্বভাবতই অবৈধ বস্তুর রূপক অস্তিত্ব ঘৃণ্য ও নিন্দিত আকারেই হয়ে থাকে। সুতরাং এই বিক্রয় এবং এই কাজের ঘৃণ্যতা তার ঊর্ধ্ব জগতের রূপক মূল্য ও উহার উজরতের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায় মানুষের আত্মার মধ্যেও এই কার্যাকারিতার একটা প্রভাব পড়ে। এ জন্য মহানবী (সা.) মদের ব্যাপারে মদ চোরাইকারী, চোরাইর হুকুমদাতা, পানকারী, বহনকারী ও যার নিকট বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়, সকলের প্রতিই অভিসম্পাত করেছেন। কারণ, পাপ কাজে সাহায্য করা, পাপের প্রসার ঘটান এবং মানুষকে পাপের প্রতি আকৃষ্ট করাও পাপ এবং এর দ্বারা পৃথিবীতে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা হয়।

আরও একটি কারণ এই যে, নাপাকী যেমন- মুর্দা, রক্ত, গোবর, পায়খানা ইত্যাদির সাথে সংমিশ্রণ অত্যন্ত ক্ষতিকর ও আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ। এই সংমিশ্রণের কারণে শয়তানের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয় এবং পবিত্র লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন। কিন্তু সামান্য সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও যেহেতু গত্যন্তর নেই। তাই সম্পূর্ণরূপে উহার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। কারণ তাতে মানুষের অপরিসীম কষ্ট ও অসুবিধা হতো। সুতরাং অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনের মুহূর্তে নাপাক বস্তুগুলোর দ্বারা যতটুকু উপকৃত না হলেই নয়, সে পরিমাণ ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। যেমন- গোবরের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যাতে মানুষ অসুবিধার সম্মুখীন না হয়। বাকি অন্যান্যগুলোর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেননা এতে কারো কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় না। যেমন- মদ ও শূকরের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

বেহেশতে শরাব (মদ) হালাল হওয়ার কারণ ঃ

প্রশ্ন ঃ দুনিয়াতে শরাব পান করা নিষিদ্ধ ও হারাম। সুতরাং বেহেশতে উহা বৈধ ও হালাল হবে কিভাবে?

উত্তর ঃ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, বেহেশতী শরাবের সাথে দুনিয়ার অনিষ্ট সৃষ্টিকারী শরাবের কোনোই সম্পর্ক নেই। তিনি পবিত্র কুরআন শরীফে বেহেশতী শরাবের গুণের বর্ণনা প্রসঙ্গে এরশাদ করেছেন– وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا অর্থাৎ "বেহেশতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করলে আল্লাহ তাদেরকে পবিত্র শরাব পান করাবেন, যা নিজেও পবিত্র এবং অন্তরসমূহের জন্য পবিত্রকারী হবে।" তিনি শরাব সম্পর্কে আরও এরশাদ করেছেন–

وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ لَايُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ .. لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا اِلَّا قِيْلًا سَلَامًا سَلَامًا –

আয়াতসমূহের সারমর্ম এই যে, বেহেশতী লোকদেরকে স্বচ্ছ নির্মল ও সুমিষ্ট পানির ন্যায় পরিষ্কার শরাবে পূর্ণ পানপত্র দেওয়া হবে। এই শরাব শিরপীড়া, বিকার ও উদভ্রান্তি সৃষ্টির দোষ হতে মুক্ত থাকবে। বেহেশতে কোনো প্রকার অযথা, অনর্থক ও গুনাহের কথা শ্রুত হবে না; বরং চতুর্দিক হতেই কেবল দয়া ও ভালবাসার নিদর্শন 'সালাম সালাম' শ্রুত হবে।

সারমর্মের ব্যাখ্যা এই যে, শরাবে দু'টি বিষয় থাকে। একটি হলো 'নেশা' অপরটি 'প্রফুল্লতা'। আর এ দু'টি বিষয় পরস্পর বিরোধী। নেশা হলো অচৈতন্যতার নাম। অচৈতন্য অবস্থায় সুখ-দুঃখ, আনন্দ বেদনা কোনোটাই অনুভূত হয় না। এমতাবস্থায় এই বিপরীতধর্মী দু'টি বিষয়ের সমন্বয় এমনই হবে যেমন যাবতীয় মৌল উপাদানের সমন্বয়ের মধ্যে গরম ও ঠাণ্ডা একত্রিত হয়। কিন্তু যেহেতু গরম ও ঠাণ্ডা পরস্পর বিরোধী অবস্থা, সেহেতু এই দু'টি অবস্থা একই বস্তুর প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। সুতরাং পানির প্রতিক্রিয়া ঠাণ্ডা এবং আগুনের প্রতিক্রিয়া গরম। এই দু'টি অবস্থার জন্য দু'টি বস্তু যথা পানি ও আগুনকে ক্রিয়াশীল স্বীকার করতে হয়। এমনিভাবে উল্লিখিত কারণ অনুযায়ী নেশা ও প্রফুল্লতা এই পরস্পর বিরোধী দু'টি অবস্থা এক বস্তুর প্রতিক্রিয়া হতে পারে না। অতএব বাধ্য হয়েই বলতে হবে, নেশা হলো এক বস্তুর ক্রিয়া বা বৈশিষ্ট্য আর প্রফুল্লতা হলো আরেক বস্তুর ক্রিয়া বা বৈশিষ্ট্য। তাই নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুটি যদি শরাবে না থাকে; বরং আল্লাহ তা'আলা যদি তাঁর কুদরতী যন্ত্রে ছেকে শরাবের প্রফুল্লতা সৃষ্টিকারী বস্তু হতে নেশা সৃষ্টিকারী বস্তুটিকে পৃথক করে দেন, তাহলে শরাবের মধ্যে কেবল স্বাদ আর প্রফুল্লতাই অবশিষ্ট থেকে যাবে, নেশার কোনো নাম-গন্ধও থাকবে না। এমতাবস্থায় সকল বুদ্ধিমান লোকের নিকটই এই শরাব হালাল হবে। মোটকথা, শরাব হারাম হওয়ার প্রবক্তা ও সকল জ্ঞানী লোকদের নিকট শরাব হারাম হওয়ার কারণ একটিই, তাহলো শরাবের নেশা। মুসলমানগণ শরাবকে ততক্ষণই হারাম বলেন, যতক্ষণ তাতে নেশা বিদ্যমান থাকে। যদি শরাব সিরকা হয়ে যায় এবং উহাতে নেশা না থাকে, তাহলে মুসলমানগণ উহা পান করতে কোনো প্রকার দ্বিধা বা সংকোচ বোধ করেন না।

পবিত্র কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে এই কারণটিই উল্লিখিত হয়েছে। মোদ্দাকথা, শরাব হারাম হওয়ার কারণই হলো নেশা। এই নেশার অস্তিত্ব যেহেতু পরবর্তীতে সৃষ্ট একটি অবস্থা। সুতরাং শরাব হতে নেশার বিচ্ছিন্ন হওয়া সম্ভব। আর নেশাকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর শরাবের মধ্যে কেবল প্রফুল্লতার উপাদানই অবশিষ্ট থেকে যাবে। বলাবাহুল্য, যে ব্যক্তি শরাব পান করে, আনন্দ ও প্রফুল্লতা অর্জনের জন্যই করে। বেহুঁশ অচৈতন্য হওয়ার জন্য কেউ শরাব পান করে না। আল্লাহর কালাম পবিত্র কুরআনে কারীমে বেহেশতী শরাবের স্বাদের প্রমাণ রয়েছে যা প্রফুল্লতার সামগ্রী। বেহেশতী শরাব পানে কেউ নেশায় বিকারগ্রস্ত হবে না, যে কারণে দুনিয়াতে উহা নিষিদ্ধ। সুতরাং কুরআনের আয়াত– لَايَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا অর্থাৎ "বেহেশতে কোনো অর্থহীন প্রলাপ হবে না, সেখানে কোনো গুনাহের কথাও হবে না," ইহার প্রমাণ বহন করে। যদি মেনেও নেওয়া হয় যে, বেহেশতের শরাবেও নেশা থাকবে, তবুও সেই নেশা হারাম হবে না। কেননা দুনিয়াতে নেশার বস্তু এজন্য হারাম করা হয়েছে যে, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর হুকুম আহকাম আদায় করা যায় না। আল্লাহর হুকুম আদায় করতে না পারার আশঙ্কা এ দুনিয়ার জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ। মৃত্যুর পর সকল হুকুম আহকামই রহিত হয়ে যাবে। বেহেশতে ফরজ ও ওয়াজিব ইত্যাদি আদায় করা হতে সকলেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। সুতরাং নেশাযুক্ত শরাবও যদি সেখানে হালাল হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি কি?

মদ্যপানে কাফফারা নির্ধারিত না হওয়ার কারণ ঃ যে সমস্ত গুনাহ সর্বতোভাবেই হারামের অন্তর্ভুক্ত যেমন– জুলুম ও অশ্লীল কাজ-কর্ম, শরিয়ত প্রবর্তক এগুলোর জন্য কোনো কাফ্‌ফারা নির্ধারণ ও বিধিবদ্ধ করেননি। কাজেই ব্যভিচার, মদ্যপান, সতী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ ও চুরির জন্য কোনো কাফ্‌ফারা বিধিবদ্ধ করা হয়নি। এই গুনাহসমূহের কাফ্‌ফারা নির্ধারিত না হওয়ার কারণে এগুলোতে লিপ্ত লোকদের অপরাধকে লঘু করে দেখা হয়নি। আর এ অপরাধসমূহে এ জন্য কাফ্‌ফারা বিধিবদ্ধ হয়নি যে, এ প্রকারের অপরাধে কাফ্‌ফারা কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না। কাফ্‌ফারার প্রভাব সেখানেই পরিলক্ষিত হয় যেখানে বিষয়টি মূলত মুবাহ থাকে এবং কোনো সাময়িক কারণে উহা হারাম হয়ে যায়। যেমন– রমজান মাসের দিনে এবং হজের এহরাম অবস্থায় স্ত্রী সহবাসের কারণে কাফ্‌ফারা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু শিরোনামে উল্লিখিত গুনাহসমূহ আসলেই কবীরা ও বড় শক্ত গুনাহ। তাই এগুলোতে কাফ্‌ফারা নির্ধারণ না করে শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।

اَلْاَشْرِبَةُ الْمُحَرَّمَةُ اَرْبَعَةٌ اَلْخَمْرُ وَهِيَ عَصِيْرُ الْعِنَبِ اِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَقَذَفَ بِالزَّبَدِ وَالْعَصِيْرُ اِذَا طُبِخَ حَتّٰى ذَهَبَ اَقَلُّ مِنْ ثُلُثَيْهِ وَنَقِيْعُ التَّمْرِ وَنَقِيْعُ الزَّبِيْبِ اِذَا غَلَا وَاشْتَدَّ وَنَبِيْذُ التَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ اِذَا طُبِخَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اَدْنٰى طَبْخَةٍ حَلَالٌ وَاِنْ اِشْتَدَّ اِذَا شُرِبَ مِنْهُ مَا يَغْلِبُ عَلٰى ظَنِّهِ اَنَّهُ لَا يُسْكِرُهُ مِنْ غَيْرِ لَهْوٍ وَلَا طَرَبٍ وَلَا بَأْسَ بِالْخَلِيْطَيْنِ وَنَبِيْذُ الْعَسَلِ وَالتِّيْنِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالذُّرَّةِ حَلَالٌ وَاِنْ لَمْ يُطْبَخْ وَعَصِيْرُ الْعِنَبِ اِذَا طُبِخَ حَتّٰى ذَهَبَ مِنْهُ ثُلُثَاهُ حَلَالٌ وَاِنْ اِشْتَدَّ وَلَا بَأْسَ بِالْاِنْتِبَاذِ فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ وَاِذَا تَخَلَّلَتِ الْخَمْرُ حَلَّتْ سَوَاءٌ صَارَتْ بِنَفْسِهَا خَلًّا اَوْ شَيْءٌ طُرِحَ فِيْهَا وَلَا يُكْرَهُ تَخْلِيْلُهَا -

সরল অনুবাদ ঃ হারাম মদ চার প্রকার ঃ খামর তথা আঙ্গুরের রস, যখন তা জোস মারে এবং তেজ হয়ে ফেনা ফেলতে লাগে। এবং আসীর তথা যখন ঘনরস পাকানো হয় যতক্ষণ পর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশের কম চলে যায় এবং ভিজানো খেজুর ও ভিজানো কিসমিস যখন জোস মারে এবং তীব্র হয়। এবং খেজুর ভেজানো পানি ও আঙ্গুর ভেজানো পানি যখন এগুলো থেকে প্রত্যেকটাকে সামান্য একটু পাকানো হয় তাহলে তা হালাল হবে যদিও তা তেজ হয়ে যায়। যখন ফুর্তি ও নেশার উদ্দেশ্য ব্যতীত ওগুলো থেকে এতটুকু পরিমাণ পান করে যে, তীব্র ধারণা হয় যে, এটা নেশা আনবে না। এবং খলীত্বাইন-এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। মধু, ডুমুর, গম, যব এবং এবং বিচি-এর পানি হালাল যদি তা না পাকানো হয়। আঙ্গুরের রস যখন এতটুকু পাকানো হয় যে, দুই তৃতীয়াংশ চলে যায় তখন তা হালাল হবে যদিও তা তেজ হয়। লাউ-এর খোল দ্বারা প্রস্তুত পাত্র, মাটির সবুজ পাত্র, তৈলাক্ত পাত্র, কাঠের পাত্র এর মধ্যে নবীয তৈরি করলে কোনো অসুবিধা নেই। যখন শরাব সিরকা হয়ে যায় তাহলে তা হালাল হবে চাই তা নিজে নিজেই হোক অথবা অন্য কোনো জিনিস তাতে সংযোজন করা দ্বারা হোক। মদের সিরকা বানানো মাকরূহ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خَمْر-এর সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهُ اَلْخَمْرُ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) হারাম পানীয়-এর প্রথম প্রকার خَمْر-এর বর্ণনা শুরু করেছেন। خَمْر আঙ্গুরের কাঁচা পানিকে বলে, যখন উহা স্ফুটিত হয়ে উত্তপ্ত গাঢ় হয়ে ফেনাযুক্ত হয়ে যায়। আইম্মায়ে ছালাছার নিকট প্রত্যেক নেশাযুক্ত বস্তুই খমর। কেননা হাদীসের মধ্যে আছে প্রত্যেক নেশাযুক্ত বস্তু হারাম। হানাফীগণ বলেন যে, অভিধানবিদদের ঐকমত্যে উল্লিখিত অর্থ শুধু ঐ ইসমের জন্য খাস, এ জন্যই তার ব্যবহার ঐ অর্থে পরিচিতি, ঐ অর্থ ব্যতীত অন্য কোনো অর্থে ব্যবহার করার জন্য অন্য শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন- بَاذَق - طلاء ইত্যাদি। এবং উল্লিখিত হাদীস মাজাজ-এর ওপর ব্যবহৃত। অর্থাৎ খমর বাস্তবের মধ্যে আঙ্গুরের মদকে বলে থাকে। কিন্তু কখনও খমর ছাড়া অন্যগুলোও মাজায হিসাবে খমর বলে থাকে। যদি মাজাযের অর্থে ব্যবহার না করা হয় তাহলে ভাং এবং তাড়ীও খমর (মদ্য) হয়। কেননা নেশাগ্রস্ত দ্রব্যের মধ্যে এটাও দাখেল, অথচ তার প্রবক্তা কেউ নেই।

قَوْلُهُ وَقَذَفَ الخ ঃ খমর-এর এ সংজ্ঞা ইমাম আজম (র.)-এর নিকট। সাহেবাঈন এবং আইম্মায়ে ছালাছার নিকট উত্তপ্ত হওয়া শর্ত নয়। বরং গাঢ় হয়ে গেলেই উহাকে খমর বলবে। এবং ইহাই প্রকাশ্য। কেননা মত্ততা ও নেশাগ্রস্ততা তীব্রতা দ্বারাই হয়ে যায়। ইমাম আযম (র.) বলেন যে গাল্ইয়ান অর্থাৎ তীব্রতা ফেনা বের হওয়া তো তীব্রতার প্রারম্ভতা। এবং খমর যা তাখমর অর্থাৎ তীব্রতা হতে উৎকলিত উহা দ্বারা পরিপূর্ণ তীব্রতা উদ্দেশ্য। স্ফুটনের প্রাথমিক অবস্থাতে উহাকে খামর বলা যাবে না; বরং যখন স্ফুটন হতে শুরু করবে, তখন উহা খমর হবে। কেননা গোপনীয়তা থেকে স্পষ্টতা উহা থেকেই হয়।

قَوْلُهُ وَالْعَصِيْرُ الخ ঃ দ্বিতীয় হারাম মদ হলো যাকে طَلَاء - بَاذَق (তলা বা বাযক) অর্থাৎ মদও বলে। এবং তৃতীয় হারাম মদ নাক্বিয়ে তামার। অর্থাৎ পাকা খেজুরের কাঁচা রস যা উত্তপ্ত হয়ে গাঢ় এবং নেশাযুক্ত হয়ে যায়। উহা হারাম হওয়ার ওপর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) গণের ইজমা। চতুর্থ প্রকার হারাম মদ হলো, নাকিয়ে যাবীব তা শুকনা আঙ্গুর পানির মধ্যে ভিজিয়ে এবং উহা উত্তপ্ত হয়ে গাঢ় হয়ে যাওয়া। এ তিন প্রকার শরাব অর্থাৎ আসীর, নাকিয়ে তামর, নাকিয়ে যাবীব হারাম ঠিক; কিন্তু এগুলোর হারাম হওয়াটা খামরের তুলনায় নগণ্য। সুতরাং যারা এগুলোকে হালাল মনে করে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না এবং এগুলো পানকারীদের শাস্তিও প্রদান করা যাবে না যখন পর্যন্ত নেশা না হবে। এবং এগুলোর বিক্রিও জায়েজ হবে। কেননা এগুলোর হারাম হওয়া ইজতিহাদী এবং খমর-এর হুরমত কত্য়ী। এবং খমরের এক ফোটা পান করাও হারাম। যদিও নেশা না হয়।

قَوْلُهُ نَبِيْذُ التَّمَرِ الخ ঃ চার প্রাকার মদ হালাল। (১) নবীযে তামর, (২) নবীযে যবীব, অর্থাৎ ভিজা খেজুর এবং শুকনা কিসমিসের পানিকে অল্প সময় পাকানো। এটা শায়খাইনের নিকট হালাল যদিও গাঢ় হয়ে যায়। এ শর্তে যে, যাতে করে মাত্লামী না হয়, বরং শক্তি অর্জনের জন্য যদি হয়। এবং এতটুকু পরিমাণ পান করবে যাতে করে নেশা না আসে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এবং শাফী (র.)-এর নিকট সর্বাবস্থায় হারাম।

(৩) خَلِيْطَيْنِ অর্থাৎ খেজুর এবং কিসমিসকে পৃথকভাবে ভিজিয়ে উভয়টার পানি সামান্য পাকানো। এটাও হালাল। যেমন– আয়শা (রা.) বর্ণিত হাদীসে এসেছে। (৪) মধু, আঞ্জীর, গম, জব এবং খেজুরের নবীযও শায়খাইন (র.)-এর মতে হালাল। আইম্মায়ে ছালাছাহ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে কম হোক বা বেশি সর্বাবস্থায়ই হারাম। প্রকাশ থাকে যে, এই মতানৈক্য ঐ সময় যদি ইবাদতের মধ্যে শক্তি লাভ করার উদ্দেশ্যে পান করা হয়, আর যদি ফুর্তি ও বাসনা পূরণ করার জন্য হয় তবে সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

কতিপয় শব্দের ব্যাখ্যা ঃ

قَوْلُهُ الدُّبَّاءُ ঃ اَلدُّبَّاءُ বায়শ, অর্থাৎ কদুর খোল দ্বারা নির্মিত পাত্র।

اَلنَّقِيْرُ ঃ খোদাইকৃত কাঠের পাত্র।

اَلْحَنْتَمُ ঃ সবুজ পাত্র। اَلْمُزَفَّتُ ঐ পাত্র যার মধ্যে আলকাতরা মাটিয়া তৈল ইত্যাদি রয়েছে।

সিরকা-এর বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاِذَا تَخَلَّلَتْ الخ ঃ হানাফীদের নিকট خَمْر-এর সিরকাই হালাল, চাই উহা নিজে নিজেই সিরকা হয়ে যায় বা خَمْر-এর মধ্যে কিছু ঢেলে সিরকা তৈরি করা হোক। আইম্মায়ে ছালাছাহ-এর মতে خَمْر -কে সিরকা বানানো মাকরুহ। চাই রৌদ্রের দ্বারা خَمْر -কে সিরকা করা হোক বা লবণ ইত্যাদি ঢেলে করা হোক।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ঐ সিরকা হালাল নয়, যা خَمْر-এর মধ্যে কোনো বস্তু ঢেলে তৈরি করা হয়েছে। আর যদি রৌদ্র ইত্যাদির দ্বারা سِرْكَه তৈরি করা হয় তবে তাতে তাঁর দু'টি অভিমত, (১) হালাল (২) হালাল নয়। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (র.)-এরও এটাই মত।

মদ্য পান হারাম হওয়ার কারণ ঃ মানুষের জীবিকা, পারিবারিক ও নাগরিক জীবনের কর্মকুশলতা ও শৃঙ্খলা যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকবোধ ব্যতীত পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত হতে পারে না। আর মদ্য পানের অভ্যাস সকল মানবীয় জীবন ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলায় গোলমাল সৃষ্টি করে দেয়। এটাতে সামাজিক জীবনে কলহ বিবাদ ও ব্যক্তিগত মনঃকষ্ট ও দুর্দশা দেখা দেয়। মানব স্বভাবে যুক্ত অবাঞ্ছিত আকাঙ্ক্ষাগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠে এবং সুস্থ বিবেক বুদ্ধিকে লুপ্ত করে দেয়। অতঃপর কতগুলো পাপ-প্রবণতা বৃদ্ধি পায়, যাবতীয় শৃঙখলাকে ধ্বংস করে দেয়। তাই যদি এরূপ অনিষ্টকর কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা না হয়, তাহলে মানুষ ধ্বংস হয়ে যাবে। এটা প্রতিরোধ করার জন্যই মদ্য পান হারাম করা হয়েছে।

মদ্যপানে বহু অন্যায় অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে। এতে আল্লাহর অসন্তুষ্টি নেমে আসে। মদ্যপানের কারণে আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠাপূর্ণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয় না। সামাজিক ও পারিবারিক শৃঙ্খলা এলোমেলো হয়ে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা মদকে নাপাকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন– رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ অর্থাৎ "মদ নাপাক এবং শয়তানের কর্ম।" এ জন্য আল্লাহ তা'আলা একে কঠোরভাবে হারাম করেছেন। আল্লাহর হেকমতের দাবি হলো, একে পেশাব-পায়খানার পর্যায়ভুক্ত করে দেওয়া, যাতে এটার জঘন্যতা মানুষের সম্মুখে পরিস্ফুট হয়ে যায় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষের অন্তর এটা হতে ফিরে আসে। অবশ্য মদ হারাম হওয়ার আরও বহু কারণ রয়েছে। এটা বহু অনিষ্টের মূল। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَوٰةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ –

অর্থাৎ শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর জিকির ও নামাজ হতে ফিরিয়ে রাখতে চায়। অতঃপর তোমরা কি ইহা হতে বিরত হবে? নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন– مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ অর্থাৎ যে বস্তু অধিক পরিমাণ নেশা আনয়ন করে তার অল্প বেশি সবই হারাম। জুয়া হারাম হওয়ার কারণ হলো এই যে, এতে অযথা সম্পদ বিনষ্ট হয় এবং ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। অতি জরুরি করণীয় কাজ পরিত্যাজ্য হয়ে যায়। পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা যার ওপর সামাজিক জীবনের স্থিতি নির্ভরশীল, অর্থাভাবে উহার পন্থা রুদ্ধ হয়ে যায়। আমাদের এই বক্তব্য যদি সত্য বলে অনুমিত না হয়, তাহলে আপনিই গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে দেখুন, কোনো জুয়াড়িকেই আপনি এ বিষয়গুলো হতে মুক্ত ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ দেখতে পাবেন না। মদ্য পানকারীদের অবস্থাও তথৈবচ। এটার ক্ষতি ও অনিষ্ট অপরিসীম। যে পরিবার, জাতি ও দেশে মদ্যপানের আধিক্য হবে, সেখানে আপদ-বিপদেরও আধিক্য ঘটবে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে অধিক মদ্যপানের কারণে অপরাধ প্রবণতা প্রতি দিনই বৃদ্ধি পেয়ে চলছে। বস্তুত ইসলাম মদ হারাম করে মানবজাতির প্রতি অসাধারণ অনুগ্রহ করেছে। ইসলামে নেশা জাতীয় বস্তু নিষিদ্ধ হওয়ার কারণে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই পবিত্র ধর্ম প্রবৃত্তি পূজার প্রতি কী পরিমাণ ঘৃণা পোষণ করে। ইসলাম বিরোধী কোনো ধর্ম যদি নফসানিয়াতের পথই প্রদর্শন না করবে, তাহলে সে ধর্মগুলোতে শরাবের ন্যায় অনিষ্টকর মন্দ বস্তুগুলোর প্রতি কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই কেন? আমরা এখানে এই প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই না। কেননা তা এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, সমগ্র বিশ্ববাসীর স্বীকৃতি অনুযায়ী মদ যদি কাম উত্তেজক বস্তু হয়ে থাকে, তাহলে কোনো ধর্ম কর্তৃক শরাবকে নিষিদ্ধ করা ও শরাব পানকে কঠোর হস্তে দমন করা কি এই কথার নিশ্চিত ও অকাট্য সাক্ষ্য নয় যে, এই ধর্ম অবাধ যৌনাচার হতে বিরত রাখতে চায়. এবং সাধুতা সত্যবাদিতা এবং রূহ ও আত্মার পবিত্রতার প্রতি আহ্বান করে। যদি ইসলাম একটি প্রবৃত্তি পূজারী ধর্ম হতো এবং প্রবৃত্তির বল্গাহীন কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার পন্থা বলে দেওয়া এবং সেগুলোতে অবাধ বিচরণের পথও উন্মুক্ত করে দেওয়াই যদি ইসলামের উদ্দেশ্য হতো, তাহলে ইসলাম শরাব কেন নিষিদ্ধ করেছে? আর কেনই বা মদ্য পানের মূলোৎপাটন করেছে? আমরা আরও আশ্চর্যবোধ করি, যখন কোনো কোনো নাম সর্বস্ব মুসলমানকে বলতে শুনি যে, ইসলামের মৌল বিধানাবলী একটি প্রাথমিক পর্যায়ের সোসাইটির জন্য রচিত হয়েছিল। অন্য কথায় এটার অর্থ এই যে, ইসলামের এই বিধানালী একটি বর্বরজাতির জন্য রচিত হয়েছিল। বর্তমান সভ্য জাতিগুলোর জন্য সেই বিধানাবলী প্রযোজ্য নয়। যাই বলুন, মদ্য পানের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে এরূপ সভ্য জাতিগুলোর তুলনায় সেই কথিত বর্বর জাতিগুলোই ভাল ছিল। পরিতাপের বিষয় মানুষ বাস্তবতার নিরিখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না; বরং মনের মধ্যে যে ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়, উহারই অনুসরণ করতে থাকে। সত্যকথা হলো, ইসলাম যে পবিত্র জীবন যাপনের শিক্ষা দিয়েছে আর কোনো শিক্ষাই উহার পবিত্রতার সমকক্ষ নয়। কিন্তু এই সত্যিকার পবিত্রতাকেই বলা হয় নফসানিয়্যাত বা প্রবৃত্তি পূজা। অথচ যে মদ্য পান মানুষকে যৌন অশ্লীলতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে, উহাকেই সভ্যতা নামে অভিহিত করা হয়েছে। শরাব এমন এক বস্তু যা প্রবৃত্তির কামনাগুলোকে প্রবলভাবে উত্তেজিত করে তোলে। এই শরাব পানের বদ অভ্যাসকে ইসলাম মূল শিকড় হতে কেটে দিয়ে মানুষকে পাশবিক প্রবণতা হতে মুক্ত করেছে। আজও পর্যন্ত দুনিয়া এই যথার্থ আলো হতে উদাসীন রয়েছে। কিন্তু সে সময় অতি নিকটবর্তী যখন দুনিয়ার চোখ এই আলো অবলোকন করার জন্য খুলে যাবে এবং দুনিয়া ইসলামের বিধানাবলী অবগত হবে। তখন এটার যথার্থতা বুঝে আসবে যে, ইসলাম যে পবিত্রতার শিক্ষা দেয়, উহা সে সকল লোকদের ধ্যান-ধারণারও উর্ধ্বে।

كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ

শিকার ও জবাই পর্ব

যোগসূত্র : গ্রন্থকার (র.) শিকার পর্বকে পানীয় দ্রব্য পর্বের পর আনার প্রথমত কারণ এই যে, শিকার ও পানীয় দ্রব্য উভয়টিই মানুষকে খুশি ও আনন্দ দান করে থাকে। দ্বিতীয়ত কারণ এই যে, শিকার হচ্ছে খাদ্য দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত আর আশ্‌রিবাহ হচ্ছে পানীয় দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত। আর উভয়টির মাঝে সম্পর্ক স্পষ্ট।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর : এখানে একটি প্রশ্ন হয় তা এই যে, অস্তিত্ব ও বিন্যাসের দিক থেকে পূর্বে খাদ্যদ্রব্যের আলোচনা এবং পরে পানীয় দ্রব্যের আলোচনা করা উচিত ছিল, গ্রন্থকার (র.) এমনটি করলেন না কেন? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, পানীয় পর্বে যেহেতু أَشْرِبَة مُحَرَّمَة তথা হারাম ও নিষিদ্ধ পানীয়-এর আলোচনা করা হয়েছে, তাই হারাম এর দিকে দৃষ্টি করত তাকে পূর্বে আনা হয়েছে। কারণ মূলনীতি আছে دَفْعُ الضَّرَرِ مُقَدَّمٌ عَلٰى جَلْبِ النَّفْعِ অর্থাৎ উপকার লাভ করা থেকে ক্ষতি থেকে বাঁচা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে শিকার হচ্ছে উপকার লাভ আর হারাম পানীয় হচ্ছে ক্ষতির আওতাভুক্ত, তাই (হারাম) পানীয় পর্বকে পূর্বে আনা হয়েছে। −(আত্‌তানকীহ)

صَيْد ও ذَبَائِح-এর যোগসূত্র : পাখিকে পূর্বে শিকার করা হয় তারপর জবাই করা হয় অতএব صَيْد (শিকার) ও ذَبْح (জবাই)-এর মধ্যে যোগসূত্র স্পষ্ট।

صَيْد-এর আভিধানিক অর্থ : صَيْد -এর আভিধানিক অর্থ− শিকার করা। রূপক অর্থে শিকারকৃত জানোয়ারের ওপরও বলা যায়, সেক্ষেত্রে صَيْد ঐসব বন্য জানোয়ারকে বলবে যাকে কৌশল ব্যতীত পাকড়াও করা সম্ভব হয় না। চাই উহা হালাল হোক বা হারাম। যেমন কবির ভাষায়− صَيْدُ الْمُلُوْكِ أَرَانِبُ وَثَعَالِبُ * وَإِذَا رَكِبْتُ فَصَيْدِيَ الْأَبْطَالُ

ভাবার্থ : লোকদের শিকার হচ্ছে খরগোশ ও খেকশিয়াল আর আমার শিকার হচ্ছে বড় বড় বাহাদুর।

কুরআনের আলোকে শিকারী জানোয়ারের শিকার :

শিকারী জানোয়ারের শিকারকৃত জানোয়ার হালাল হওয়া সম্পর্কে কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে−

وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ

অর্থাৎ যে সব শিকারি জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দান করো, শিকারের প্রতি প্রেরণের জন্য এবং ওদেরকে ঐ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দাও, যা আল্লাহ্ তোমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। −(সূরায়ে মায়েদাহ, আয়াত− ৩৪)

قَوْلُهُ الذَّبَائِحُ : এ পর্বে শিকার-এর বিধি-বিধান বর্ণনা করার সাথে সাথে প্রাণী জবাই করার নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে বিধায় এ পর্বের নাম রাখা হয়েছে كِتَابُ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ অর্থাৎ শিকার ও জবাই পর্ব।

ذَبَائِح -এর আভিধানিক অর্থ : ذَبَائِحُ শব্দটি ذَبِيْحَةٌ শব্দের বহুবচন। এটা ذَبْح ধাতু হতে উৎকলিত। যার অর্থ হলো− কতগুলো নির্দিষ্ট রগ কেটে দেওয়া। ذَبِيْحَة শব্দের প্রকৃত অর্থ হলো− জবাইকৃত প্রাণী। আর রূপক অর্থ হলো। জবাইযোগ্য প্রাণী। গ্রন্থকার এখানে ذَبِيْحَة শব্দ দ্বারা রূপক অর্থ গ্রহণ করেছেন। কেননা এই অর্থ গ্রহণ করলেই এটা হারামের যাবতীয় প্রকারকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

ذَبَائِح শব্দটি বহুবচন নেওয়ার কারণ : এখানে ذَبَائِحُ শব্দটি বহুবচন নেওয়া হয়েছে তার প্রকারের দিক হতে। কেননা জবাই দু'প্রকার : (১) ذَبْح اِخْتِيَارِىْ আর (২) ذَبْح اِضْطِرَارِىْ অথবা যে সকল প্রাণী জবাইযোগ্য এরা অনেক বিধায় ذَبَائِح শব্দ বহুবচন নেওয়া হয়েছে।

ذَبْح-এর প্রকারভেদ : প্রকাশ থাকে যে, জবাই সাধারণত দু'প্রকার : (১) ذبح اختيارى বা স্বাভাবিক জবাই, (২) ذَبْح اِضْطِرَارِىْ বা জরুরি মুহূর্তের জবাই। ذَبْح اِخْتِيَارِىْ - حَلْق এবং لَبَّة-এর মাঝখানে হয়ে থাকে। আর ذَبْح اِضْطِرَارِىْ -এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই; বরং প্রাণীর যে কোনো স্থানে আঘাত করে দিলেই ذَبْح اِضْطِرَارِىْ হয়ে যাবে। আর ذَبْح اِضْطِرَارِىْ তখন করবে যখন জবাইকারী ذَبْح اِخْتِيَارِىْ হতে ব্যর্থ হয়, তখন প্রাণীর দেহের যে কোনো স্থান হতে রক্ত প্রবাহিত করতে পারলে প্রাণী হালাল হয়ে যাবে। আর ذَبْح اِضْطِرَارِىْ-এর অনুমোদন শরিয়তের পক্ষ হতে এক বিশেষ অনুগ্রহ। অর্থাৎ ذَبْح اِخْتِيَارِىْ হতে সক্ষম অবস্থায়ও শরিয়ত জবাই করার সুযোগ প্রদান করেছে।

يَجُوزُ الْإِصْطِيَادُ بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ وَالْفَهْدِ وَالْبَازِيْ وَسَائِرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ وَتَعْلِيمِ الْكَلْبِ أَنْ يَتْرُكَ الْأَكْلَ ثَلْثَ مَرَّاتٍ وَتَعْلِيمُ الْبَازِيْ أَنْ يَرْجِعَ إِذَا دَعَوْتَهُ فَإِنْ أَرْسَلَ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ أَوْ بَازِيَهُ أَوْ صَقْرَهُ عَلَى صَيْدٍ وَذَكَرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عِنْدَ إِرْسَالِهِ -

সরল অনুবাদ ঃ ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুর, বাজ পাখি, চিতা বাঘ এবং দ্বিতীয় অন্যান্য ট্রেনিংপ্রাপ্ত জখমকারী জন্তু দ্বারা শিকার করা জায়েজ আছে। কুকুরের ট্রেনিংপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে, তিনবার তার (ধৃত প্রাণির) আহার থেকে বিরত থাকবে। আর বাজপাখির ট্রেনিংপ্রাপ্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে যে, যখনই তুমি তাকে ডাকবে তখন ফিরে আসবে। যদি স্বীয় ট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুর অথবা বাজপাখি অথবা শকরাকে কোনো শিকারের ওপর ছেড়ে দেয় এবং বিসমিল্লাহ পড়ল তাকে ছাড়ার সময়

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মোহরেম তথা এহরাম অবস্থা ব্যতীত সর্বদা শিকার জায়েজ ঃ

قَوْلُهُ يَجُوزُ الْإِصْطِيَادُ الخ ঃ ঐ চতুষ্পদ জানোয়ার যা কোনো উপায় অবলম্বন না করে পাকড়াও করা সম্ভব নয় সেই প্রাণীগুলোকে صَيْد বা শিকার বলে। এহ্রামকালীন অবস্থা ব্যতীত সকল অবস্থায় শিকার করতে পারবে। দলিল আল্লাহর কালাম- وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا কুরআনের অপর স্থানে বলা হয়েছে- وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا অর্থাৎ এহরাম অবস্থায় স্থলচর প্রাণী শিকার করা তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে।

শিকারির জন্য শর্ত ঃ

শিকারির জন্য শর্ত এই- (ক) শিকারি জবাই করবার যোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ মুসলমান বা কিতাবী হতে হবে।

(খ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণীকে ইচ্ছাকৃতভাবে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করতে হবে।

(গ) শিকারির সাথে এমন লোক যুক্ত হতে পারবে না যার শিকার হালাল নয়। যেমন- মাজূসীও মুশরিক।

(ঘ) শিকারি ইচ্ছা করে বিসমিল্লাহ পরিত্যাগ করতে পারবে না।

(ঙ) শিকারি প্রাণী শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণের সময় অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত হতে পারবে না।

(চ) শিকারি শিকারের উদ্দেশ্যে যেই প্রাণীটি প্রেরণ করবে উহা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর ও বাজপাখির পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ بِالْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলতে ঐ কুকুরকে বলে, শিকারি প্রেরণের সাথে সাথে শিকার ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, ডাকার সাথে সাথেই প্রত্যাবর্তন করে এবং শিকারকৃত প্রাণিকে না খেয়ে জখম করে নিয়ে আসে। উপরোক্ত শর্তাবলী পাওয়া গেলে বুঝতে হবে যে, এটা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর। আর বাজপাখি প্রশিক্ষণের জন্য শর্ত হলো প্রেরণের সাথে সাথে শিকার ধরতে যায়, আর প্রেরণকারীর আহ্বানে প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে উহা প্রশিক্ষণ প্রাপ্তরূপে গণ্য হবে।

বাজপাখি যদি শিকারের মধ্য হতে কিছু ভক্ষণ করে তা হলেও উক্ত শিকার ভক্ষণ করা যাবে, কিন্তু কুকুর যদি এরূপ ভক্ষণ করে তাহলে উহা ভক্ষণ করা যাবে না। অনুরূপভাবে কুকুর যদি প্রথম তিনবার শিকার হতে কিছু খায়নি এবং চতুর্থবার খেয়েছে তাহলে উক্ত শিকার ভক্ষণ করা হারাম হবে। অতঃপর সে যত প্রাণীই শিকার করবে তা হারাম হবে। কারণ কুকুর যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়নি এটাই প্রমাণিত।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত না হওয়ার পরিচয় ঃ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর অথবা বাজপাখি প্রেরণের সাথে সাথে না গেলে বরং কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে কিংবা কিছু খেলে বা পেশাব করলে অতঃপর শিকার ধরতে গেলে বুঝতে হবে সে নিজের প্রয়োজনে শিকার ধরতে গিয়েছে, যা খাওয়া জায়েজ নেই। তবে কোনো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিতাবাঘ যদি শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণের পর সাথে সাথে না গিয়ে কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে শিকার ধরে তাহলে সেই শিকার হারাম হবে না। কেননা এই প্রকার জীব শিকার করার পূর্বে ওঁৎ পেতে অবস্থান নিয়ে থাকে, আর এটা তাদের সহজাত অভ্যাস। অনুরূপভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরও যদি শিকার ধরার পূর্বে এরূপ অভ্যস্ত হয়ে পড়ে তা খাওয়াও হারাম নয়।

فَاَخَذَ الصَّيْدَ وَجَرَحَهُ فَمَاتَ حَلَّ اَكْلُهُ فَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ اَوِ الْفَهْدُ لَمْ يُؤْكَلْ وَاِنْ اَكَلَ مِنْهُ الْبَازِىْ أُكِلَ وَاِنْ اَدْرَكَ الْمُرْسِلُ الصَّيْدَ حَيًّا وَجَبَ عَلَيْهِ اَنْ يُّذَكِّيَهُ فَاِنْ تَرَكَ تَذْكِيَتَهُ حَتّٰى مَاتَ لَمْ يُؤْكَلْ وَاِنْ خَنَقَهُ الْكَلْبُ وَلَمْ يَجْرَحْهُ لَمْ يُؤْكَلْ وَاِنْ شَارَكَهُ كَلْبٌ غَيْرُ مُعَلَّمٍ اَوْ كَلْبُ مَجُوْسِيٍّ اَوْ كَلْبٌ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ لَمْ يُؤْكَلْ وَاِذَا رَمَى الرَّجُلُ سَهْمًا اِلَى الصَّيْدِ فَسَمَّى اللّٰهَ تَعَالٰى عِنْدَ الرَّمْيِ اُكِلَ مَا اَصَابَهُ اِذَا جَرَحَهُ السَّهْمُ فَمَاتَ وَاِنْ اَدْرَكَهُ حَيًّا ذَكَّاهُ وَاِنْ تَرَكَ تَذْكِيَتَهُ لَمْ يُؤْكَلْ .

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর সে শিকার ধরে জখম করল এবং শিকারকৃত জন্তু মারা গেল তাহলে তাকে খাওয়া হালাল হবে। আর যদি তার থেকে কুকুর অথবা চিতাবাঘ কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তাকে খাওয়া জায়েজ হবে না। আর যদি তার থেকে বাজ খেয়ে নেয় তাহলে খাওয়া জায়েজ হবে। আর যদি প্রেরণকারী ব্যক্তি শিকারকে জীবিত পায় তাহলে তাকে জবাই করা জরুরি। অতঃপর যদি জবাই ছেড়ে দেয় এমনকি সে মারা যায় তাহলে খাওয়া হবে না। যদি কুকুর প্রাণীর গলা টিপে দেয় এবং ক্ষত না করে তাহলে খাওয়া যাবে না। আর যদি অট্রেনিংপ্রাপ্ত কুকুর অথবা অগ্নিপূজকের কুকুর অংশগ্রহণ করে অথবা এমন কুকুর যাকে শুরুতে আল্লাহর নাম নিয়ে ছাড়া হয়নি তাহলে খাওয়া হবে না। আর যখন কোনো ব্যক্তি শিকারের ওপর তীর চালানোর সময় আল্লাহর নাম নেয় তাহলে যার দেহে তীর বিদ্ধ হয় তাকে খাওয়া হবে যখন তার উক্ত পশুকে জখমী করে দেয় এবং মারা যায়। আর যদি তাকে জীবিত পায় তাহলে তাকে জবাই করবে। যদি জবাই ছেড়ে দেয় তাহলে খাওয়া হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রাণীকে ক্ষত করা সম্বন্ধে ইমামগণের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَجَرَحَهُ الخ ঃ শিকার প্রাণীকে জখম তথা ক্ষত করা প্রয়োজন। কারণ কুকুর শিকারের ওপর পতিত হলে আর যন্ত্রণায় মৃত্যু হলে সেই প্রাণী খাওয়া হালাল হবে না। কেননা জখম করা শর্ত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন, জখম করা শর্ত নয়। আর তরফাইনের মতে জখম করা শর্ত।

তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে শিকার হালাল হওয়ার জন্য শর্ত ঃ

قَوْلُهُ فَسَمَّى اللّٰهَ الخ ঃ তীর নিক্ষেপের মাধ্যমে শিকার হালাল হওয়ার জন্য শর্ত এই যে, (১) তীর নিক্ষেপ কালে বিসমিল্লাহ উচ্চারণ করা। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ বর্জন না করা। যদি ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহি বর্জন করা হয় তবে সেই শিকার ভক্ষণ করা হালাল হবে না। হাঁ, যদি অনিচ্ছাকৃত ও ভুলবশত বিসমিল্লাহ বর্জিত হয় তবে সে শিকার ভক্ষণ করা হালাল হবে। তদ্রূপ জবাইয়ের ক্ষেত্রে এরূপ বিধান রয়েছে।

সেই নিক্ষিপ্ত তীর শিকারকে আহত করা, এই আহতকরণই জবাই করার স্থলাভিষিক্ত হবে। সুতরাং যদি নিক্ষিপ্ত তীর শিকারকে আহত না করে তবে সেই শিকার হালাল হবে না।

وَاِذَا وَقَعَ السَّهْمُ بِالصَّيْدِ فَتَحَامَلَ حَتّٰى غَابَ عَنْهُ وَلَمْ يَزَلْ فِيْ طَلَبِهٖ حَتّٰى اَصَابَهٗ مَيْتًا اُكِلَ فَاِنْ قَعَدَ عَنْ طَلَبِهٖ ثُمَّ اَصَابَهٗ مَيْتًا لَمْ يُؤْكَلْ وَاِنْ رَمٰى صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ لَمْ يُؤْكَلْ وَكَذَالِكَ اِنْ وَقَعَ عَلٰى سَطْحٍ اَوْ جَبَلٍ ثُمَّ تَرَدّٰى مِنْهُ اِلَى الْاَرْضِ لَمْ يُؤْكَلْ وَاِنْ وَقَعَ عَلَى الْاَرْضِ اِبْتِدَاءً اُكِلَ وَمَا اَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهٖ لَمْ يُؤْكَلْ وَاِنْ جَرَحَهٗ اُكِلَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ তীর যখন শিকারের দেহে বিদ্ধ হয় এবং শিকার উক্ত আঘাত বরদাশত করে উধাও হয়ে যায় এবং শিকারি ব্যক্তি তালাশ করতেই থাকে শেষ পর্যন্ত মৃত পেল তাহলে খাওয়া হবে। আর যদি তালাশ করা থেকে বিরত থেকে বসে থাকে তারপর তাকে মৃত পেল তাহলে খাওয়া যাবে না। আর যদি শিকারকে তীর নিক্ষেপ করে অতঃপর সে পানিতে পড়ে গেল তাহলে খাওয়া যাবে না। অনুরূপ যদি ছাদের ওপর অথবা পাহাড়ের ওপর পরে তারপর মাটিতে পড়ে যায় তাহলে খাওয়া যাবে না। আর যদি প্রথম থেকেই মাটিতে পড়ে তাহলে খাওয়া যাবে। আর যে প্রাণীর পরবিহীন তীর প্রস্থের দিক থেকে বিদ্ধ হয় তাকে খাওয়া যাবে না। আর যদি ক্ষত করে দেয় তাহলে খাওয়া যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শিকার পলায়ন করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ ثُمَّ اَصَابَهٗ مَيْتًا الخ **ঃ** তীর নিক্ষেপ করার পর যদি সেই শিকার পলায়ন করে তবে উহার পিছু ধাওয়া করা, বসে না থাকা। শিকার পলায়ন করার পর যদি তীর নিক্ষেপকারী পিছু ধাওয়া করে এবং শিকারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে উক্ত শিকারকে ভক্ষণ করা হালাল হবে। আর যদি তীর নিক্ষেপকারী এরূপ পলায়নের পর শিকারের পিছু ধাওয়া না করে নিশ্চেষ্ট বসে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত উক্ত শিকারকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে উক্ত শিকার ভক্ষণ করা হালাল হবে না। কারণ উহার পিছু ধাওয়া করত উহাকে তালাশ করা তার সাধ্যের আওতায় ছিল, কিন্তু সে তা করেনি। সুতরাং তার জন্য উক্ত শিকার হালাল হবে না। আর যদি তীর নিক্ষেপকারী বা কুকুর বাজ প্রেরণকারী শিকার করার পর শিকারকৃত প্রাণীকে জীবিত পায় তবে উহাকে জবাই করা আবশ্যক। কিন্তু জীবিত পাওয়া সত্ত্বেও যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জবাই না করে তবে সেই শিকার ভক্ষণ করা হালাল হবে না। আর যদি উহাকে জবাই করার অবকাশ না পায় তবে তা হালালই থেকে যাবে।

শিকারের কতিপয় বিধান ঃ

মাসআলা ঃ যে প্রাণী শিকার করার তা জীবিত অবস্থায় পাওয়া গেলে জবাই করে হালাল করতে হবে। আর যদি জবাই করার কোনো সুযোগ না পায় এবং শিকারটি তৎপূর্বেই মৃত্যুবরণ করে তবে উক্ত শিকার হালাল রূপেই ভক্ষণযোগ্য হবে।

মাসআলা ঃ জবাই করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জবাই না করলে প্রাণী হারাম হবে। আর জবাই করার সুযোগ না থাকলে হালাল হবে। এটাই শায়খাইন হতে বর্ণিত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর অভিমত এটাই। আর জাহের রেওয়ায়ত মতে প্রাণী হারাম হবে। প্রাণী যদি জবাইকৃত প্রাণীর অনুরূপ হয় তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। অতএব তা জবাই করতে হবে না।

মাসআলা ঃ যে প্রাণী ওপর থেকে পরে মরে অথবা তদানুরূপ হয়, আর যে বকরি রোগাক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে যদি প্রাণ ও জীবনী শক্তি থকে তবে তাও গ্রহণযোগ্য হবে। আর এর ওপরও ফতোয়া হয়েছে। এ প্রাণী জবাই করতে হবে। আর সামান্য স্পন্দন থাকলেও তা হালাল হবে।

مِعْرَاض-এর বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَمَا اَصَابَ الْمِعْرَاضُ الخ **ঃ** প্রাণী বধ যদি প্রস্থ ভাগ দিয়ে হয়, দৈর্ঘ্যের দিক দিয়ে না হয় তখন শিকার হারাম হবে। মিরাজ ঐ তীরকে বলে, যা পরবিহীন হয়। আর মিরাজকে এ জন্য মিরাজ বলে উহা লক্ষস্থলে প্রস্থের দিক দিয়ে আঘাত করে ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করে না। আর ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করলে শিকার হালাল হবে। দলিল হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন– 'ধারালো দিক দিয়ে আঘাত করলে উহা ভক্ষণ করো, আর প্রস্থের দিক দিয়ে আঘাত করলে তা ভক্ষণ করো না। কেননা উহা আঘাতপ্রাপ্ত।

وَلَا يُؤْكَلُ مَا اَصَابَهُ الْبُنْدُقَةُ إِذَا مَاتَ مِنْهَا وَإِذَا رَمٰى صَيْدًا فَقَطَعَ عَضْوًا مِنْهُ اُكِلَ الصَّيْدُ وَلَمْ يُؤْكَلِ الْعَضْوُ وَإِنْ قَطَعَهُ اَثْلَاثًا وَالْاَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الْعَجْزَ اُكِلَ الْجَمِيْعُ وَإِنْ كَانَ الْاَكْثَرُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ اُكِلَ الْاَكْثَرُ وَلَا يُؤْكَلُ صَيْدُ الْمَجُوْسِيِّ وَالْمُرْتَدِ وَالْوَثَنِيِّ وَمَنْ رَمٰى صَيْدًا فَاَصَابَهُ وَلَمْ يُثْخِنْهُ وَلَمْ اُخْرِجْهُ عَنْ حَيِّزِ الْاِمْتِنَاعِ فَرَمَاهُ اٰخَرُ فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلثَّانِيْ وَيُوْكَلُ وَإِنْ كَانَ الْاَوَّلُ اَثْخَنَهُ فَرَمَاهُ الثَّانِيْ فَقَتَلَهُ فَهُوَ لِلْاَوَّلِ وَلَمْ يُؤْكَلْ وَالثَّانِيْ ضَامِنٌ بِقِيْمَتِهٖ لِلْاَوَّلِ غَيْرَ مَا نَقَصَتْهُ جِرَاحَتُهُ وَيَجُوْزُ اِصْطِيَادُ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الْحَيَوَانِ وَمَا لَا يُؤْكَلُ وَذَبِيْحَةُ الْمُسْلِمِ وَالْكِتَابِيِّ حَلَالٌ وَلَا تُؤْكَلُ ذَبِيْحَةُ الْمُرْتَدِ وَالْمَجُوْسِيِّ وَالْوَثَنِيِّ وَالْمُحْرِمِ وَإِنْ تَرَكَ الذَّابِحُ التَّسْمِيَةَ عَمَدًا فَالذَّبِيْحَةُ مَيْتَةٌ لَا تُؤْكَلُ وَإِنْ تَرَكَهَا نَاسِيًا اُكِلَ -

---

সরল অনুবাদ : যদি কোনো জানোয়ারকে বন্দুক দিয়ে শিকার করা হয়। এবং তার গুলির আঘাতে যদি সে মারা যায় তাকে খাওয়া জায়েজ হবে না। কোনো জানোয়ারকে যদি তীর দিয়ে শিকার করা হয় এবং তার একটি অঙ্গ পৃথক হয়ে যায়, তবে ঐ জানোয়ারকে খাওয়া জায়েজ হবে, কিন্তু পৃথক অঙ্গটি খাওয়া জায়েজ হবে না। যদি কোনো জানোয়ারকে তিন টুকরা করে ফেলে তাহলে অধিকাংশ যদি প্রথম অংশের সাথে মিলে তাহলে সব গোশ্ত খাওয়া জায়েজ কিন্তু শুধু মাথার সাথে মিললে বেশি ভাগকে খেতে পারবে। অগ্নিপূজক, মুরতাদ, ভূতপূজক এবং মুহরিম (অর্থাৎ হজের অথবা ওমরার এহরাম বেঁধেছে)-এর জবাইকৃত জানোয়ার খাওয়া জায়েজ হবে না। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো জানোয়ারকে তীর নিক্ষেপ করার পর তাকে দুর্বল করতে না পারে এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ব্যক্তি যদি তাকে তীর মেরে হত্যা করে, তাহলে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য হবে এবং তাকে খেতে পারবে। কিন্তু যদি প্রথম ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের পর তাকে দুর্বল করে তার অধীনে নিয়ে আসল এমতাবস্থায় অপর ব্যক্তি যদি তীর নিক্ষেপ করে তাকে কতল করে তাহলে তা প্রথম ব্যক্তির জন্য হবে, কিন্তু তা খেতে পারবে না। আর প্রথম ব্যক্তিকে দ্বিতীয় ব্যক্তি তার জরিমানা দিতে হবে। হালাল এবং হারাম উভয় জানোয়ারকে শিকার করা জায়েজ। মুসলমান এবং কিতাবী অর্থাৎ খৃস্টান, ইহুদির জবাই হালাল। অগ্নিপূজক এবং মুরতাদ ও মুহরিমের জবাই খাওয়া যাবে না। যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত জবাই করার সময় বিসমিল্লাহকে ছেড়ে দিল সে জানোয়ার মৃত-এর হুকুমে হওয়ার কারণে খাওয়া জায়েজ হবে না। যদি ভুলে ছেড়ে দেয় তাহলে খাওয়া যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভারী বন্দুকের বিধান :

قَوْلُهُ مَا اَصَابَهُ الْبُنْدُقَةُ الخ : প্রকাশ থাকে যে, ভারী বন্দুক ধারালো হলেও উহার আঘাত বধকৃত প্রাণী হালাল নয়। কারণ প্রাণী ভারের দরুন বধ হয়েছে, এর সম্ভাবনা থেকে যায়, যখম দ্বারা নয়। আর ভার ও ওজন দ্বারা কতল হলে অবশ্যই হারাম হবে। আর ভারে বধ হয়েছে না ধারে বধ হয়েছে এতে সন্দেহ হলেও হারাম হবে।

শিকারের কাটা অংশ সম্পর্কীয় বিধান

قَوْلُهُ وَإِنْ قَطَعَهُ اَثْلَاثًا الخ ঃ শিকারকৃত প্রাণীটি যদি এরূপভাবে কাটা যায় যে, উহা দুই খণ্ডে পৃথক হয়ে গেছে অর্থাৎ এক খণ্ড পশ্চাৎ দিকে, অপর খণ্ড মস্তকের দিকে অথবা তার মস্তকের অর্ধেক কাটা গেছে অথবা ততোধিক। এমতাবস্থায় উভয় কর্তিত অংশই খাওয়া জায়েজ, কারণ এই অবস্থায় তার মধ্যে জবাইকৃত জানোয়ার অপেক্ষা অধিক প্রাণ শক্তি থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং উহা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে ঐ অবস্থায় যদি উভয় অংশ মাথার দিক হতে হয় আর পশ্চাত দিক দিয়ে একাংশের হয় তাহলে এতে জীবনী শক্তি আছে বলে সম্ভাবনা আছে, পশ্চাতের অংশ ভক্ষণ করা হারাম হবে। আর মাথার দিকের উভয় অংশ খাওয়া হালাল হবে। হাঁ যদি মাথার অংশ অর্ধেকের কম কেটে যায় তাহলে জীবনী শক্তি থাকার সম্ভাবনায় জবাইকৃত প্রাণীর জীবনী শক্তি হতে অধিক জীবনী শক্তি আছে বলে মনে করতে হবে। সুতরাং এটা ভক্ষণ করা জায়েজ হবে না।

দুই শিকারির তীর নিক্ষেপের বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَرَمَاهُ اٰخَرُ ঃ কোনো শিকারের প্রতি এক ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করার পর অপর ব্যক্তি তীর নিক্ষেপ করায় যদি প্রাণী মারা যায়, তবে প্রথম অবস্থায় তা এ জন্য হারাম যে, প্রথম ব্যক্তির তীরের আঘাতে শিকার কাবু হয়ে যাওয়ার পর সেই সময় স্বাভাবিক জবাই করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল। আর এই কথা সুস্পষ্ট যে, সেই ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে যবহে এখতিয়ারী সম্পূর্ণরূপে না জায়েজ। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অবস্থায় হারাম না হওয়ার কারণ হলো, যেহেতু প্রথম বারের তীরের আঘাতে শিকার দুর্বল হয়ে পড়েনি। আর তা ছাড়াও এক্ষেত্রে যবেহ এখতিয়ারী সম্ভব নয়। তাই দ্বিতীয় ব্যক্তিরই এই শিকার প্রাপ্য। যেহেতু সে উহাকে হত্যা করেছে।

অখাদ্য প্রাণীর শিকারের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَا لَا يُؤْكَلُ الخ ঃ যাদের গোশ্‌ত খাওয়া হারাম যেমন– শিয়াল, বাঘ, ভল্লুক ইত্যাদির চামড়া ও হাড় যেহেতু উহা মানুষের কল্যাণে আসে সেহেতু শিকার জায়েজ। তবে শূকর কোনো অবস্থাতেই জায়েজ নয়। সুতরাং উহা কোনো অবস্থাতেই শিকার করা যাবে না।

ইহুদি নাসারাদের জবাইয়ের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَالْكِتَابِيِّ الخ ঃ জবাইকারী যদি মুসলমান বা কিতাবী হয় তাহলে উহার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল হবে। কেননা মুসলমান হোক আর কিতাবী হোক সে জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করবে। আর জবাইকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার জন্য তার ওপর বিসমিল্লাহ পাঠ করা শর্ত। তাই জবাইকারী বিসমিল্লাহ বিশ্বাসী হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমান ইহুদি নাসারারা এ হুকুমের আওতাভুক্ত নয় কারণ তারা ধর্মকে تَحْرِيفْ করে ফেলেছে।

জবাইয়ের মধ্যে ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিহার করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ اَلتَّسْمِيَةَ الخ ঃ ইচ্ছাকৃত বিসমিল্লাহ পরিহারকারীর জবাইকৃত প্রাণীর গোশ্‌ত ভক্ষণ করা হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন "তোমরা ঐ প্রাণীর গোশ্‌ত খেয়ো না যার জবাইয়ের সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা হয়নি।" এটাই আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে বিসমিল্লাহ পরিহার করলেও জবাইকৃত প্রাণীর গোশ্‌ত হালাল হবে। কেননা তাঁর মতে প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে বিসমিল্লাহ তথা আল্লাহর নাম আছে এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আয়াতের উত্তরে বলেন, এটা غَيْرُ اللّٰهِ -এর নামে জবাইকৃত প্রাণীর ব্যাপারে বলা হয়েছে।

ইমামগণের মতভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, প্রাণী জবাই করার সময় বিস্‌মিল্লাহ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে জবাইয়ের সময় বিস্‌মিল্লাহ ইচ্ছাকৃত বা ভুলবশত ছেড়ে থাকুক প্রাণীর গোশ্‌ত হালাল হবে। কেননা তিনি বলেন যে, প্রত্যেক মু'মিনের অন্তরে বিস্‌মিল্লাহ তথা আল্লাহর নাম আছে বিধায় এই অন্তরে বিদ্যমান আল্লাহ্‌র নাম পূরণই জবাইয়ের জন্য যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্‌মিল্লাহ পরিহারকারীর জবাইকৃত প্রাণীর গোশ্‌তও হালাল হবে। আর ইমাম মালেক (র.)-এর মতে বিস্‌মিল্লাহ ভুলক্রমে ছেড়ে দিলেও জবাইকৃত প্রাণীর গোশ্‌ত হালাল হবে না। কেননা তিনি বলেন, আয়াতে কারীমা لَا تَاْكُلُوْا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ -এর মধ্যে ইচ্ছাকৃত ও ভুলক্রমে হওয়ার কোনো বর্ণনা নেই।

وَالذَّبحُ بَينَ الحَلقِ وَاللَّبَّةِ وَالعُرُوقُ الَّتِي تُقطَعُ فِي الذَّكَاةِ اَربَعَةٌ اَلحُلقُومُ وَالمَرِيُّ وَالوَدجَانِ فَاِنْ قَطَعَهَا حَلَّ الاَكلُ وَاِنْ قُطِعَ اَكثَرُهَا فَكَذٰلِكَ عِندَ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَقَالَا لَابُدَّ مِنْ قَطعِ الحُلقُومِ وَالمَرِيِّ وَ اَحَدِ الوَدجَينِ وَيَجُوزُ الذَّبحُ بِاللِّيطَةِ وَالمِروَةِ وَبِكُلِّ شَيءٍ اَنهَرَ الدَّمَ اِلَّا السِّنَّ القَائِمَ وَالظُّفرَ القَائِمَ وَيُستَحَبُّ اَنْ يُحِدَّ الذَّابِحُ شَفرَتَهُ وَمَنْ بَلَغَ بِالسِّكِّينِ النُّخَاعَ وَقَطَعَ الرَّأسَ كُرِهَ لَهُ ذٰلِكَ وَتُؤكَلُ ذَبِيحَتُهُ وَاِنْ ذَبَحَ الشَّاةَ مِنْ قَفَاهُ فَاِنْ بَقِيَتْ حَيَّةً حَتّٰى قَطَعَ العُرُوقَ جَازَ وَيُكرَهُ وَاِنْ مَاتَتْ قَبلَ قَطعِ العُرُوقِ لَمْ تُؤكَلْ وَمَا اِستَانَسَ مِنَ الصَّيدِ فَذَكَاتُهُ الذَّبحُ وَمَا تَوَحَّشَ مِنَ النَّعَمِ فَذَكَاتُهُ العَقرُ وَالجَرحُ وَالمُستَحَبُّ فِي الاِبِلِ النَّحرُ وَاِنْ ذَبَحَهَا جَازَ وَيُكرَهُ وَالمُستَحَبُّ فِي البَقَرَةِ وَالغَنَمِ الذَّبحُ فَاِنْ نَحَرَهُمَا جَازَ وَيُكرَهُ ـ

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ জবাই গলা এবং সীনার ওপরের হাড়ের মাঝখানে করতে হয়। যে সকল রগসমূহ কর্তন করা হয় তা চারটি– (১) খাদ্যনালী (২) শ্বাসনালী অপর দু'টি রক্তনালী। যদি এই সমস্ত রগ কাটা হয় তাহলে জানোয়ার হালাল হবে। আর যদি অধিকাংশ রগ কাটা হয় তবুও ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট হালাল হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, খাদ্যনালী, শ্বাসনালী ও একটি রক্তনালী অবশ্যই কাটতে হবে। বাঁশের ছিলকা ও ধারালো পাথর এবং এমন জিনিস দ্বারা জবাই করা জায়েজ যেগুলো রক্ত প্রবাহিত করে দেয়। কিন্তু দাঁত ও নখ দ্বারা জবাই করা জায়েজ নেই। জবাইকারী প্রথমে তার ছুরিকে ধারালো করে নেওয়া মোস্তাহাব। জবাই করার সময় হারাম মগজ পর্যন্ত পৌঁছান ও মাথাকে একেবারে পৃথক করে ফেলা মাকরূহ। কিন্তু তা খেলে কোনো অসুবিধা নেই। যদি কেউ বকরিকে হাড় সংযোগ স্থলে কর্তন করে অতঃপর সে জীবিত থেকে যায় এমনকি তার রগসমূহকে কেটে ফেলল তাহলে তা জায়েজ হবে কিন্তু এ কাজ করা মাকরূহ। আর যদি রগ কাটার আগেই সে মারা যায় তাহলে তা খাওয়া জায়েজ হবে না। যে সকল শিকার পোষ মেনেছ তবে তাকে খাওয়ার হালাল পন্থা হচ্ছে জবাই করা। আর যে সকল পশু বুনো হয়ে গেছে, তাহলে তাকে খাওয়ার বৈধ পন্থা হচ্ছে তীর নিক্ষেপ করা এবং ক্ষত করা। উট ইত্যাদি নহর মোস্তাহাব যদি জবাই করে তাও জায়েজ কিন্তু মাকরূহ হবে। গরু ছাগল ইত্যাদিতে জবাই মোস্তাহাব কিন্তু যদি কেউ নাহর করে তাহলে জায়েজ আছে। তবে মাকরূহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَولُهُ وَالذَّبحُ بَينَ الخ ঃ এ সম্পর্কে আসল প্রমাণ নবী করীম (সা.)-এর বাণী– اَلذَّكَاةُ بَينَ اللَّبَّةِ وَاللِّحيَينِ অর্থাৎ জবাই গলা এবং লিহ্‌ইয়াঈন-এর মাঝে করা হবে।

<u>জবাইয়ের রগসমূহের বর্ণনা</u> ঃ

قَولُهُ فِي الذَّكَاةِ اَربَعَةٌ الخ ঃ এখানে জবাইয়ের রগের বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা জবাইয়ের উদ্দেশ্য হলো প্রাণীর দেহের রক্ত প্রবাহিত করে তার জীবনী শক্তি শেষ করে দেওয়া। আর প্রাণীর জীবনী শক্তির সম্পর্ক সাধারণত কয়েকটি

বিশেষ রগের সাথে। তাই জীবনী শক্তির সমাপ্তির জন্য এই সকল রগগুলো বা তাদের অধিকাংশ রগ কেটে দেওয়া আবশ্যক। আর ঐ সকল রগ হলো চারটি। (১) حُلْقُوْم তথা শ্বাসনালী, (২) مَرِى খাদ্যনালী, (৩ ও ৪) وَدْجَانْ দু'টি শাহরগ। এ সকল সমস্ত রগ বা প্রথম ও দ্বিতীয়সহ তৃতীয় ও চতুর্থের যেই কোনো একটি রগ তথা মোট তিনটি রগ কেটে দিলেও জবাই সহীহ হবে।

দাঁত ও নখ দ্বারা জবাইয়ের বিধান ঃ

قَوْلُه وَبِكُلِّ شَيْءٍ اَنْهَرَ الدَّمَ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) বলছেন যে, যে কোনো ধারালো জিনিস দ্বারা জবাই জায়েজ হবে যা রগ কাটতে সক্ষম এবং রক্ত প্রবাহিত করতে পারে। এটা হতে বাদ দেওয়া কল্পে বলা হয়েছে যে, إِلَّا السِّنَّ الْقَائِمَ وَالظُّفُرَ الْقَائِمَ অর্থাৎ দাঁত এবং নখ যখন কারো দেহের সাথে প্রতিষ্ঠিত থাকে তখন এদের দ্বারা জবাই করা জায়েজ হবে না। যদিও এগুলো রগ কাটে এবং এদের দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয়। কেননা এরূপে জবাই করা হাবশীদের জবাইয়ের সাথে তুলনীয় হয়। আর যদি দাঁত ও নখ দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয় তখন এগুলোর দ্বারা জবাই করা মাকরূহের সাথে জায়েজ হবে। এটাই আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর অভিমত। আর ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে দাঁত ও নখের সাহায্যে জবাই করলে জায়েজ হবে না ; বরং এটা মৃত প্রাণীর হুকুমে হবে। চাই দাঁত ও নখ দেহের সাথে সংযুক্ত হোক বা বিচ্ছিন্ন হোক। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর দলিল হলো নবী করীম (সা.)-এর হাদীস। তিনি এরশাদ করেন যে, দাঁত এবং নখ ব্যতীত অন্য কোনো ধারালো জিনিস দ্বারা জবাই করবে। আহনাফ হাদীসের উত্তরে বলেন যে, হাদীসে ঐ সকল দাঁত ও নখের কথা বলা হয়েছে যা দেহের সাথে সংযুক্ত, বিচ্ছিন্ন নয়। এর ইঙ্গিত বহন করে এই কথা যে, হাবশীগণ দেহের সাথে প্রতিষ্ঠিত ও সংযুক্ত দাঁত ও নখ দ্বারাই জবাই করতো। আর আমরা বিচ্ছিন্ন দাঁত ও নখ দ্বারা জবাই করাকে জায়েজ বলছি।

وَمَنْ نَحَرَ نَاقَةً أَوْ ذَبَحَ بَقَرَةً أَوْ شَاةً فَوَجَدَ فِيْ بَطْنِهَا جَنِيْنًا مَيْتًا لَمْ يُؤْكَلْ أَشْعَرَ أَوْ لَمْ يُشْعِرْ وَلَا يَجُوْزُ أَكْلُ كُلِّ ذِيْ نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَلَا كُلِّ ذِيْ مِخْلَبٍ مِنَ الطُّيُوْرِ وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ غُرَابِ الزَّرْعِ وَلَا يُؤْكَلُ الْأَبْقَعُ الَّذِيْ يَأْكُلُ الْجِيَفَ وَيُكْرَهُ أَكْلُ الضَّبُعِ وَالضَّبِّ وَالْحَشَرَاتِ كُلِّهَا وَلَا يَجُوْزُ أَكْلُ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَالْبِغَالِ وَيُكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِ الْفَرَسِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ -

সরল অনুবাদ ঃ এবং যে ব্যক্তি উষ্ট্রী নহর করল অথবা গাভী অথবা বকরি জবাই করল এবং তার পেটে মৃত বাচ্চা তাহলে উক্ত বাচ্চা খাওয়া হবে না। কেশ আসুক বা না আসুক। এবং নখ বিশিষ্ট ও পাঞ্জা বিশিষ্ট কোনো জন্তু খাওয়া জায়েজ নেই। এবং ফসলের কাক খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং আব্‌কা কাক যা মৃত ভক্ষণ করে খাওয়া জায়েজ হবে না। এবং গুঁইসাপ ও সমস্ত জমিনের কীটপতঙ্গ খাওয়া মাকরূহ। এবং ঘরে লালিত গাধা ও খচ্চরসমূহ খাওয়া জায়েজ হবে না। এবং ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জবাই ও নহরের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ نَحَرَ نَاقَةً الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, উটকে জবাই করা মাকরূহ। সুতরাং উহাকে নহর করতে হবে। আর গরু, বকরিকে নহর করা মাকরূহ তাই উহাদেরকে জবাই করতে হবে। কেননা নবী করীম (সা.) উটকে নহর করেছেন এবং গরু ও বকরিকে জবাই করেছেন।

গর্ভস্থ মৃত বাচ্চার বিধান ঃ

قَوْلُهُ فِيْ بَطْنِهَا جَنِيْنًا الخ ঃ কোনো প্রাণী জবাই করার পর যদি তার পেটে কোনো মৃত বাচ্চা পাওয়া যায় তাহলে এটা খাওয়া আমাদের আহনাফের মতে জায়েজ নেই। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে যদি বাচ্চাটি গঠনাকৃতি পরিপূর্ণ হয় তাহলে খাওয়া জায়েজ হবে। আর যদি এটার গঠন পরিপূর্ণ না হয় তাহলে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতেও এটা খাওয়া জায়েজ হবে না। আর যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে তার গোশ্‌ত খেতে হলে তাকে নিয়মান্ত্রিকভাবে জবাই করতে হবে।

গর্তে বসবাসকারী প্রাণীর বিধান ঃ

قَوْلُهُ الْحَشَرَاتِ الخ ঃ এটা দ্বারা ঐ সকল প্রাণীকে বুঝানো হয়েছে যা মাটির গর্তে বসবাস করে। যেমন– ইঁদুর, চিকা ইত্যাদি। ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে এদের গোশ্‌ত হারাম। তবে ইমাম মালেক (র.)-এর মতে এদের গোশ্‌ত মাকরূহ তাহরীমী। কেননা হাদীস শরীফে আছে, حَشَرَاتُ الْاَرْضِ كُلُّهَا خَبِيْثٌ আর কুরআনে আছে– يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

ঘোড়ার গোশত সম্পর্কে ইমামগণের মতামত ঃ

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ أَكْلُ لَحْمِ الْفَرَسِ الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া বৈধ কি অবৈধ এ ব্যাপারে ইমামদের মতপার্থক্য আছে। ইমাম আহমদ, শাফেয়ী ও সাহেবাইন (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া হালাল। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া হারাম। ঘোড়ার গোশ্‌ত হালাল বর্ণনাকারীগণ হযরত জাবের (রা.)-এর হাদীস দলিলরূপে বর্ণনা করেছেন, যাতে ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি সাব্যস্ত হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালিদ-এর হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাতে নবী করীম (সা.) ঘোড়ার গোশ্‌ত খেতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া ঘোড়া যুদ্ধের অবলম্বন। সুতরাং ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়ার অনুমতি দিলে যুদ্ধের অবলম্বনে সংকট দেখা দিতে পারে, তাই ইমাম সাহেব ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া অবৈধ বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) তাঁর ইন্তেকালের তিনদিন পূর্বে তিনি তাঁর নাজায়েজের অভিমত প্রত্যাহার করেন। সুতরাং ঘোড়ার গোশ্‌ত খাওয়া সর্বসম্মতভাবে জায়েজ।

وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْأَرْنَبِ وَإِذَا ذُبِحَ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ طَهُرَ جِلْدُهُ وَلَحْمُهُ إِلَّا الْآدَمِيَّ وَالْخِنْزِيْرُ فَإِنَّ الذَّكَاةَ لَا تَعْمَلُ فِيْهِمَا وَلَا يُؤْكَلُ مِنْ حَيَوَانِ الْمَاءِ إِلَّا السَّمَكُ وَيُكْرَهُ أَكْلُ الطَّافِيْ مِنْهُ وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجِرِّيْثِ وَالْمَارْ مَاهِيْ وَيَجُوْزُ أَكْلُ الْجَرَادَةِ -

সরল অনুবাদ ঃ এবং খরগোশ খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং যখন ঐ জন্তু যার গোশ্‌ত খাওয়া যায় না জবাই করা হয় তাহলে তার চামড়াও তার গোশত পবিত্র হয়ে যায়। মানুষ ও শূকরের চামড়া ব্যতীত এ উভয়ের মধ্যে জবাই দ্বারা পবিত্র করা কাজে আসে না। এবং পানির জন্তুর মধ্যে মাছ ব্যতীত কোনো জন্তু খাওয়া জায়েজ হবে না। এবং ঐ মাছ খাওয়া মাকরূহ যা মারা গিয়ে পানির মধ্যে ভাসমান হয়ে যায় এবং চাচকী ও বাম মাছ– খাওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই, আর টিড্ডী খাওয়া জায়েজ, উহা জবাই করারও কোনো প্রয়োজন নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যে সব জানোয়ারে গোশ্‌ত হালাল নয় তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ طَهُرَ جِلْدُهُ الخ **ঃ** যে পশুর গোশ্‌ত খাওয়া হয় না তাকে জবাই করা দ্বারা তার গোশ্‌ত ও চামড়া পবিত্র হয়ে যায়, যদি কোনো তরল ও প্রবাহমান জিনিসে পড়ে যায় তাহলে তা নাপাক হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট পাক হবে না। কেননা জবাইয়ের প্রতিক্রিয়া গোশ্‌ত হালাল হওয়ার জন্য হচ্ছে আসল, আর গোশ্‌ত ও চামড়া পাক হয় তার অধীনে থেকে আর অধীনের জিনিস আসল ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না। সুতরাং যখন জবাই করা দ্বারা তার গোশ্‌ত মুবাহ হওয়া সাব্যস্ত হয় না তাহলে গোশ্‌ত ও চামড়ারও মুবাহ হওয়া সাব্যস্ত হবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, যেমনিভাবে দাবাগাত-এর দ্বারা তরলতা দূরীভূত হয়ে যায় অনুরূপভাবে জবাই করা দ্বারাও দূরীভূত হয়ে যায়। এ জন্য দাবাগাতের ন্যায় জবাই করা দ্বারাও এ সমস্ত জিনিসগুলো দূরীভূত হয়ে যাবে।

إِلَّا الْآدَمِيُّ وَالْخِنْزِيْرُ الخ **ঃ** প্রকাশ থাকে যে, মানুষের গোশ্‌ত খাওয়া শরিয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। মানুষের সম্মানার্থে, আর শূকরের গোশ্‌ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে উহা মূলত হারাম হওয়ার কারণে।

শূকরের গোশ্‌ত হারাম হওয়ার কারণ ঃ (১) কারো অজানা নয় যে, শূকর একটি অপবিত্র, নির্লজ্জ ও অপবিত্র জিনিস ভক্ষণকারী জানোয়ার। এটা হারাম হওয়ার কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, এরূপ নাপাক ও বদ প্রকৃতির জানোয়ারের গোশ্‌ত ভক্ষণে দেহ এবং আত্মার ওপর অপবিত্রতার প্রভাব পড়বে। কারণ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, খাদ্যের প্রভাব আত্মার ওপর অবশ্যই পতিত হয়। সুতরাং এতে আর সন্দেহ কি যে, এরূপ মন্দের প্রভাব ও মন্দই হবে। ইউনানী চিকিৎসকগণ ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বেই রায় দিয়েছেন যে, এই জানোয়ারের গোশতের বৈশিষ্ট্য হলো, উহা লজ্জা শরমের শক্তি কমিয়ে দেয় এবং নির্লজ্জতা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং এই বিষয়টি যখন স্বীকৃত যে, দেহ ও চরিত্র পরিবর্তনের কারণসমূহের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী কারণ হলো খাদ্য, তাই ইসলামি শরিয়ত এরূপ জানোয়ারের গোশ্‌ত খাওয়া হারাম করে দিয়েছে যেগুলোর ঘৃণিত স্বভাব শয়তানের সাথে সর্বতোভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং ফেরেশতাগণ হতে দূরবর্তী হওয়ার কারণ হয় ও সচ্চরিত্রের বিপরীত গুণাবলী সৃষ্টি করে।

(২) শূকর নাজাসাতের প্রতি খুবই আসক্ত। বিশেষত মানুষের মল বা পায়খানা এদের প্রিয় খাদ্য। এরূপ অপবিত্র বস্তু হতেই এর গোশ্‌ত তৈরি হয়। সুতরাং উহার গোশ্‌ত খাওয়া প্রকারন্তরে নিজের বিষ্ঠা খাওয়ারই নামান্তর।

শূকরের গোশ্‌ত ও চিকিৎসা বিজ্ঞান ঃ প্রখ্যাত এক চিকিৎসক বলেন, (ক) শূকরের গোশ্‌ত দূষিত পিত্তের জন্ম দেয়, (খ) প্রচণ্ড লালসা সৃষ্টি করে, (গ) দীর্ঘস্থায়ী মাথাব্যথা সৃষ্টি করে, (ঘ) পায়ের গোছায় ও (ঙ) শরীরের জোড়ায় জোড়ায় ব্যথা হয়, (চ) আকল বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়, (ছ) মানবতা, (জ) আত্ম মর্যাদা ও (ঝ) সহমর্মিতা দূর করে দেয়, (ঞ) অশ্লীলতা

বৃদ্ধি করে, (ট) ঘৃণ্য ময়লাযুক্ত ও (ঠ) কুৎসিত আকৃতির হয়ে থাকে। অধিকাংশ অমুসলিম জাতি উহার গোশ্ত ভক্ষণ করে। ইসলামের আলো প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে উহার গোশ্ত বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হতো। অতঃপর ইসলাম এটাকে ও এর ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ ও বাতিল করে দেয়। (ঢ) তা ছাড়া এর গোশ্ত ভক্ষণ করলে মানুষ সহসাই বক্ষব্যাধি জাতীয় রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে :

قَوْلُهُ حَيَوَانِ الْمَاءِ الخ **ঃ** আমাদের হানাফীদের মতে মাছ ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় সামুদ্রিক প্রাণীই হারাম। তবে ইমাম মালেক (র.)-এর বর্ণনা মতে সামুদ্রিক ব্যাঙ ও শূকর মাকরূহ। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে কুমীর এবং সামুদ্রিক ব্যাঙ ব্যতীত অন্য সকল সামুদ্রিক প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া জায়েজ। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর বিশুদ্ধতম বর্ণনা মোতাবেক যাবতীয় সামুদ্রিক প্রাণীর গোশ্তই হালাল। তাঁর দলিল আল্লাহর কালাম ঃ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ কুরআনে পাকের বর্ণনাটি যেহেতু শর্তহীন ও ব্যাপক, তাই সামুদ্রিক সকল প্রাণীর গোশ্তই হালাল হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে কুরআনের উক্তি صَيْدُ الْبَحْرِ দ্বারা মাছকেই বুঝানো হয়েছে।

টিডিডর বিধান ঃ

قَوْلُهُ اَكْلُ الْجَرَادِ **ঃ** اَلْجَرَادَةُ **ঃ** এটা এক প্রকার বড় আকারের ফড়িং। ইমাম মালেক (র.) ব্যতীত অন্যান্য ইমামদের মতে এটা খাওয়া বৈধ। আমাদের দলিল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস। নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন যে, আমাদের জন্য দুই প্রকারের রক্ত বৈধ করা হয়েছে। মৃত দু'টি হলো মাছ এবং টিডিড। আর রক্ত দুটি হলো কলিজা ও গোর্দা।

মাছ ও টিডিড জবাই ব্যতীত হালাল হওয়ার কারণ ঃ মাছ এ কারণে জবাই করা হয় না যে, উহার দেহের মূল উপকরণ পানি। আর পানি স্বভাবতভাবেই নিজে পবিত্র ও অন্যকে পবিত্রকারী। সুতরাং নাপাকী যেমন পানির মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না তেমনি জলজপ্রাণীর আত্মা বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন উহাতে নাপাকীর প্রভাব পড়বে না, তাই উহাকে জবাই করার প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকে না। আর টিডিড এ কারণে জবাই করা হয় না যে, উহাতে প্রবাহমান রক্ত থাকে না। রক্ত ব্যতীত দেহের সাথে উহার আত্মার সম্পর্ক তেমনি যেমন পাহাড় বৃক্ষলতা ও অন্যান্য জড়পদার্থের সাথে তাদের আত্মার সম্পর্ক। এরূপ রক্তহীন দেহ হতে আত্মার বিচ্ছিন্নতা উহার নাপাকীর কারণ হয় না। কেননা এ বিচ্ছিন্নতা তার কারণে রক্ত শোষিত হয় না। যদিও এ কারণের মধ্যে সকল প্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু ও যাবতীয় রক্তহীন স্থলচর প্রাণী ও কীটপতঙ্গ সমানভাবে শরিক; কিন্তু এগুলো কলুষতা, নাপাক ও ক্ষতিকর খাদ্য আহার করে বিধায় হারাম। অপর পক্ষে মাছ ও টিডডী স্বভাবগত ও সাময়িক কলুষতা অর্থাৎ নাপাকী ভক্ষণ হতে পাক ও মুক্ত। এজন্যই এতদুভয় প্রাণীর জন্য ব্যতিক্রমী হুকুম দেওয়া হয়েছে। নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন–

أُحِلَّتْ لَنَا الْمَيْتَتَانِ وَالدَّمَانِ اَمَّا الْمَيْتَتَانِ الْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَالدَّمَانِ الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ –

অর্থাৎ আমাদের জন্য দু'টি মৃত প্রাণী ও দু'টি রক্ত হালাল করে দেওয়া হয়েছে। দু'টি মৃত প্রাণী হলো মাছ ও টিডডী। আর দু'টি রক্ত হলো কলিজা ও গোর্দা।

কলিজা ও গোর্দা দেহের দু'টি অঙ্গ। কিন্তু এগুলো রক্তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং এগুলো সম্পর্কে যে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারতো, মহানবী (সা.) তা দূর করে দিয়েছেন। তা ছাড়া মাছের দেহেও টিডডীর ন্যায় কোনো প্রবাহিত রক্ত থাকে না। এ জন্য মাছ জবাই করার হুকুম বিধিবদ্ধ হয়নি।

كِتَابُ الْأُضْحِيَّةِ

কুরবানি পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) কুরবানি পর্বকে জবাই ও শিকার পর্বের পর এ জন্য এনেছেন, (ক) ঈদুল আয্হার দিন যেহেতু পশু ও জানোয়ারকে উৎসর্গ ও জবাই করা হয়, তাই প্রথমে জবাই এর বিধানাবলী বর্ণনা করার পর এখন কুরবানির দিনের জবাই ও তার বিধানাবলী বর্ণনা করা আরম্ভ করেছেন। (খ) জবাই বলা হয় আম তথা সাধারণ পশুপাখিকে জবাই করা চাই যে সময় ও যে দিনেই হোক না কেন, আর কুরবানি বলা হয় নির্দিষ্ট পশুকে নির্দিষ্ট সময় ও দিনে জবাই ও উৎসর্গ করাকে। সাধারণত আম তথা সাধারণকে বর্ণনা করার পর নির্দিষ্ট ও বিশেষ বস্তুকে বর্ণনা করা হয় এ জন্য জবাইয়ের বিধানাবলী বর্ণনা করার পর কুরবানির পর্ব শুরু করেছেন।

أُضْحِيَّةٌ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ মূলত أُضْحِيَّةٌ শব্দটি أُضْحُوْيَةٌ ছিল। وَاوْ এবং يَاء এক স্থানে একত্রিত হয়েছে। এগুলোর প্রথমটি জযম বিশিষ্ট, তাই وَاو কে يَاء দ্বারা পরিবর্তন করে يَاء কে يَاء এর মধ্যে إِدْغَامْ করা হয়েছে। আর يَاء এর সাথে সঙ্গতি রক্ষার খাতিরে حَاء এর মধ্যে যের দেওয়া হয়েছে। এটা একবচন। এটার বহুবচন أَضَاحِيْ; কুরবানির পশুকে أُضْحِيَّةٌ বলে। উল্লেখ্য যে, ضُحٰى শব্দের দ্বারা দিনের ঐ সময়কে বুঝানো হয়ে থাকে সকাল বেলার পর সূর্য যখন প্রখর তেজোদীপ্ত হয়। বলা বাহুল্য যে, উপরোক্ত সময়েই কুরবানির পশু জবাই করা হয়ে থাকে। অতএব أُضْحِيَّةٌ -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান।

أُضْحِيَّةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় বিশেষ পশুকে আল্লাহর সন্তোষ ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ সময় (কুরবানির দিনে) জবাই করাকে أُضْحِيَّةٌ বলে।

عِبَادَةٌ مَالِيَّةٌ হিসাবে কুরবানির গুরুত্ব ঃ জেনে রাখা উচিত যে, দ্বিবিধ উপায়ে সম্পদের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তোষ অর্জন করা যেতে পারে। প্রথমত অন্যকে স্বীয় সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে। যেমন– সদকাহ! দ্বিতীয়ত সম্পদ হতে মালিকানার বিলোপ সাধনের মাধ্যমে। যেমন– দাস-দাসী মুক্ত করে দেওয়া। বলা বাহুল্য যে, কেবল কুরবানির মাধ্যমে উভয়বিধ উপায়ে খোদার সন্তোষ লাভ করা যেতে পারে। কেননা এতে এক দিকে পশু জবাইয়ের দ্বারা মালিকানা খতম করার মাধ্যমে ছওয়াব অর্জন করা হয়, আবার কুরবানির গোশ্ত দান করে অপরকে মালিক বানিয়ে দেওয়ার মধ্যে সওয়াব অর্জন করা হয়।

যুক্তির আলোকে কুরবানি ঃ (ক) আল্লাহ পাক কারো রক্ত ও গোশতের জন্য লালায়িত নন। তিনি কুরআনের ভাষায় وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ (তিনি সকলকে আহার দান করেন আর নিজে আহার করেন না।) এমন মহান ও পবিত্র যে, তিনি না চামড়ার মুখাপেক্ষী, আর না গোশতের নৈবেদ্যের প্রত্যাশী, বরং তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দিতে চান, যেন তোমরাও এমনিভাবে আল্লাহর দরবারে উৎসর্গিত হয়ে যাও। আর এই কুরবানি ও তোমাদেরই আত্মোৎসর্গ যে, নিজেদের পরিবর্তে তোমাদের প্রিয় ও মূল্যবান পশু কুরবানি কর।

(খ) যে সকল লোক কুরবানিকে বিবেক বিরুদ্ধ বলে, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, সারা দুনিয়াতেই কুরবানির প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন জাতির ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, ছোট বস্তুকে বড় বস্তুর জন্য উৎসর্গ করা হয়। আর এই ধারা ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ হতে বৃহৎ জিনিসসমূহে পাওয়া যায়। ছোট বেলায় শুনেছিলাম, কারো আঙ্গুলে বিষাক্ত সাপ দংশন করলে সে আঙ্গুলটি কেটে ফেলতে হবে, যাতে সারা দেহ বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া হতে রক্ষা পায়। বস্তুত এখানেও সারাটি দেহের স্বার্থে ক্ষুদ্র আঙ্গুলটিকে যেন কুরবানি করে দেওয়া হলো।

(গ) অনুরূপভাবে আমরা দেখি, আমাদের কোনো বন্ধু এসে গেলে তাকে খুশি করার জন্য আমাদের নিকট যা কিছু থাকে, সবই তার তরে অর্পণ করে দেই। এই মেহমানের সম্মুখে ঘি, আটা, গোশত ইত্যাদি মূল্যবান সামগ্রীর যেন কোনো মূল্যই থাকে না।

(ঘ) মেহমান যদি আরো প্রিয় ব্যক্তি হয় তখন মোরগ-মুরগি এমনকি ভেড়া-ছাগলও অর্পণ করা হয়; বরং এটা হতে আরো অগ্রসর হয়ে গরু এবং উটও সেই প্রিয় মেহমানের জন্য অর্পণ করা হয়।

(ঙ) চিকিৎসা বিজ্ঞানে দেখা দিয়েছে, যে সকল সম্প্রদায় জীব হত্যাকে বৈধ মনে করেন না, তারাও নিজেদের ক্ষত স্থানের শত শত কীটকে হত্যা করে নিজেদের জীবনের জন্য উৎসর্গ করে। আরো অগ্রসর হলে আমরা দেখি, নিম্ন পর্যায়ে লোকদেরকে উচ্চ পর্যায়ের আনন্দ উৎসবের দিন হলেও তারা তখন পেশাগত দায়িত্ব হতে মুক্তি পায় না; বরং এই দিনগুলোতে তাদের ওপর চাপ আরো বেশি পড়ে। মানুষের আরাম ও সুবিধার জন্য পথে-ঘাটে যেন কোনো ময়লা আবর্জনা না থাকে সেদিকে অতিরিক্ত খেয়াল রাখতে হয়। বস্তুত এখানেও নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তিটির আনন্দকে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তির আনন্দের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে।

(চ) অনেক হিন্দু অত্যন্ত প্রবলভাবে গো- রক্ষা করে থাকে। লাদাখ অঞ্চলে গাভীর দুধ পর্যন্ত পান করা হয় না, একে বাছুরের হক মনে করা হয়।

(ছ) একজন সাধারণ সৈনিক নিজের ওপরস্থ কর্মকর্তার জন্য, সে তার ওপরস্থের জন্য এবং সে তার ওপরস্থ কর্মকর্তা তার বাদশাহর জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দেয়। বস্তুত আল্লাহ তা'আলা এই প্রকৃতিগত ব্যবস্থাটিই অক্ষুণ্ন রেখেছেন। এবং এই কুরবানির মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ছোটকে বড়র জন্য উৎসর্গ করা হোক।

কুরবানির পশুর জবাই করা কি করুণার পরিপন্থী? এ প্রশ্নের হিকমতপূর্ণ উত্তর এই যে, মহান আল্লাহকে স্বীকারকারী কোনো জাতিই এর প্রবক্তা নয় যে, আল্লাহ তা'আলা জালিম; বরং তারা সকলেই আল্লাহকে দয়াময় ও কৃপাময় বলে বিশ্বাস করে। এখন আপনি আল্লাহ তা'আলার ক্রিয়াকর্মের প্রতি লক্ষ্য করুন। বাতাসে বাজ, শকুন, শিকরাহ্ ও এ জাতীয় শিকারি পাখি বিদ্যমান রয়েছে এবং এরা নিরীহ পশুপাখির গোশ্তই ভক্ষণ করে থাকে। ঘাস, উত্তম ধরনের ফল-ফলাদি এবং এই জাতীয় কোনো জিনিস এরা আহার করে না। আবার দেখুন আগুনে পতঙ্গের সাথে কি আচরণ করা হয়। অতঃপর পানির দিকে লক্ষ্য করুন তাতে কি পরিমাণ হিংস্র প্রাণী রয়েছে। ঘড়িয়াল, বিরাট বিরাট মাছ; উদবিড়াল ইত্যাদি প্রাণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীগুলোকে খেয়ে সাবাড় করে ফেলে। এমনকি কিছু কিছু মাছ উত্তর মেরু হতে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত শিকার করার জন্য চলে যায়। আবার ভূপৃষ্ঠেই একটি কুদরতি খেলা দেখুন পিপীলিকাভোজী প্রাণীটি কিভাবে জিহ্বা বের করে পড়ে থাকে। যখন অনেকগুলো পিঁপড়া তার জিহ্বার মিষ্টতার কারণে উহাতে চড়ে বসেন, তখন সে ঝট করে জিহ্বা টেনে নিয়ে সবগুলোকে গিলে ফেলে। মাকড়সা শিকার করে খায়। মাছি ভক্ষণকারী প্রাণিগুলো উহাদেরকে মেরেই নিজের আহার যোগাড় করে। বানরগুলোকে বাঘে খেয়ে ফেলে। জঙ্গলে সিংহ বাঘ ও চিতার কি আহার নির্ধারিত রয়েছে উহা সকলেরই জানা। আরো দেখুন বিড়াল কিভাবে ইঁদুরগুলোকে নিধন করে এখন আপনিই বলুন জগতের এসব দৃশ্য দেখার পরেও কি কেউ বলতে পারে যে, এই কুরবানির বিষয়টি যা ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে কোন জুলুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত? কখনও না! তাহলে মানুষের বিরুদ্ধে পশু জবাই করার এই অভিযোগ আনার অর্থ কি? মানুষের গায়ে উকুন অথবা অন্য কোনো পোকা পড়ে গেলে কত নির্দয়ভাবে উহাদের ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এটাকে কি কখনও জুলুম বলা হয়? যখন এটাকে এ কারণে জুলুম বলা হয় না যে, উৎকৃষ্ট প্রাণীর স্বার্থে নিকৃষ্ট প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ, তখন পশু জবাইয়ের সময় কি করে আপত্তি হতে পারে? আপনি চিন্তা করলে দেখবেন, মালাকুল মাউত হযরত আযরাঈল (আ.) কিরূপে নবী-রাসূল, বাদ্শাহ, শিশু, ফকির, আমীর এবং সওদাগর সকলকে মেরে শেষ করে দেন এবং পৃথিবী হতে বিদায় করে দেন।

অতঃপর আপনি চিন্তা করুন আমরা যদি ঈদুল আজহায় এই মনে করে পশু জবাই না করি যে, এটা দয়ার পরিপন্থী, তবে কি আল্লাহ্ তা'আলা এগুলোকে সর্বদার জন্য জীবিত রাখবেন? আর এই অনন্ত জীবনই কি তাদের ওপর দয়া প্রদর্শন হবে? অতএব, এই ভূমিকার পর আমাদের বক্তব্য এই যে, পশুকে জবাই করা যদি দয়ার পরিপন্থী হতো, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা শিকারি ও মাংসভোজী প্রাণীই সৃষ্টি করতেন না। তা ছাড়া এগুলোকে জবাই না করা হলে ওরা নিজেরাই অসুস্থ হয়ে একদিন না একদিন অবশ্যই মারা যাবে। চিন্তা করে দেখুন, তখন তাদের মৃত্যু কত কষ্টকর ও যন্ত্রণাদায়ক হবে।

আল্লাহর চিরন্তন নীতি এই যে, প্রত্যেক বস্তু সীমা সংখ্যা ছাড়িয়ে বৃদ্ধি পেতে চায়। যদি সকল বটবৃক্ষের বীজ দানা সংরক্ষণ করা হয়, তবে দুনিয়াতে শুধু বটগাছই দেখা যাবে, পৃথিবীতে অন্য কোনো জিনিসই থাকবে না। কিন্তু দেখুন হাজার হাজার পশুপাখি উহার ফল ভক্ষণ করে। এতে বুঝা যায় যে, এই সীমাহীন বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করা আল্লাহরই ইচ্ছা। অনুরূপভাবে পৃথিবীর সকল গরুগুলোকে যদি লালন-পালন করা হয়, তবে এক সময় আসবে, যখন সারা দুনিয়ার ভূমিও ওদের ঘাস উৎপাদনের জন্য যথেষ্ট হবে না। ফলে ক্ষুধা পিপাসায় তাদের নিজেদেরই মরে যেতে হবে। যখন কুদরতের এই দৃশ্য চোখের সামনেই বর্তমান, তখন পশু জবাই করা আল্লাহর ইচ্ছার বিরোধী কেন হবে?

<u>কুরবানিতে মানুষ জবাই করা নিষিদ্ধ হওয়ার রহস্য</u> : উপরোক্ত আলোচনায় কেউ যদি এ প্রশ্ন করেন যে, তাহলে মানুষ জবাই করাও বৈধ হওয়া উচিত, তবে এর উত্তর এই যে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিজস্ব বিবেচনায় জবাই ও কুরবানি মানুষের বেলায়ও উত্তম গুণ। আর এ কারণেই শাহাদতকে সকলেই একবাক্যে সর্বোচ্চ গুণ ও পরিপূর্ণতা বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু মানুষকে জবাই না করার পক্ষে অন্যান্য শক্তিশালী দলিল ও প্রমাণাদি রয়েছে।

এর সারসংক্ষেপ এই যে, মানুষের সাথে অন্যদের হক ও অধিকার জড়িত থাকে। কারও লালন-পালনের হিকমত রয়েছে, অন্য কারও হয়তো অন্য কিছু থাকে। এমতাবস্থায় যদি এমন নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে সমস্যা ও জটিলতার এক দীর্ঘ পরম্পরা সৃষ্টি হয়ে যাবে। এই কারণে মানুষ হত্যাকে সামাজিক দৃষ্টিকোণ ও শরিয়তের আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ ও মস্তবড় গুনাহ বলা হয়েছে। মোটকথা, মানুষ হত্যার কথা এ জন্য বিবেচনা করা হয়নি যে, তার সাথে অনেক হক জড়িত রয়েছে, যেগুলো বিনষ্ট হলে হয়ে দাঁড়াবে অনেক দুঃখ-কষ্টের কারণ।

<u>কুরবানি কি ওয়াজিব না সুন্নত?</u> কুরবানির বিধান সম্পর্কে ফিক্হ শাস্ত্র বিশারদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ হানিফা, মুহাম্মদ, যুফার ও হাসান বসরী (র.)-এর মতে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর এক বর্ণনানুযায়ী কুরবানি ওয়াজিব। তাঁদের দলিল হলো হুযূর (সা.)-এর বাণী– مَنْ وَجَدَ سَعَةً وَلَمْ يَصْنَعْ فَلَا يَقْرِبَنَّ مُصَلَّانَا অর্থাৎ ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কুরবানি না করে সে যেন আমাদের মসজিদে না আসে। ওয়াজিব পরিহার ব্যতিরেকে অনুরূপ ধমকীর যোগ্য হতে পারে না। তা ছাড়া এটা এমন বৈশিষ্ট্য যার প্রতি এটার সময়কে সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অপরিহার্য করণীয়-এর ব্যাপারেই অনুরূপ সম্পর্কিত করা হয়ে থাকে। অপরপক্ষে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) হতে অপর বর্ণনানুসারেও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কুরবানি সুন্নত। তাঁদের দলিল নবী করীম (সা.)-এর বাণী– مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهٖ وَأَظْفَارِهٖ شَيْئًا অর্থাৎ তোমাদের কেউ কুরবানি করতে চাইলে সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে। এখানে কুরবানিকে ইচ্ছার সাথে সংযুক্ত করণের দ্বারা ওয়াজিব না হওয়া প্রতীয়মান হয়।

আমাদের মতে উক্ত হাদীসে إِرَادَةٌ শব্দটি سَهْوٌ -এর বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। হাদীসের অর্থ হলো, কেউ যখন তার ওপর ওয়াজিবকৃত কুরবানি করতে চায়। যেমন– مَنْ أَرَادَ الصَّلٰوةَ فَلْيَتَوَضَّأْ

<u>কুরবানি কি ইবাদাত?</u> কিছু লোকের কুরবানি বর্জনের পেছনে বড় একটি কারণ রয়েছে। তা হচ্ছে তারা এটাকে ইবাদত বরে মনে করো না। বিশেষত হজের সময়কার কুরবানির প্রাচুর্যকে তারা অপচয় বলে ভাবে। এর প্রতিকার হচ্ছে, তারা তাদের এসব সন্দেহ ও প্রশ্ন সবিস্তারে জানিয়ে কোনো বিজ্ঞ আলেম থেকে সন্তোষজনক জবাব নিয়ে নেবে। সংক্ষিপ্ত জবাব হচ্ছে, খোদার নির্দেশ পালনের নাম ইবাদত। কুরবানি যে খোদার নির্দেশ তা সুপ্রমাণিত তথাপি তার ইবাদত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ কি? যদি প্রশ্ন করা হয়, খোদার এ নির্দেশের পেছনে কোনো হেকমত রয়েছে? এ যুগে এ ধরনের প্রশ্ন করতেই মানুষ উৎসুক। এর খাঁটি জবাব এই যে, এ ধরনের প্রশ্ন কেউ আমাদের কাছে করতে পারে না। কারণ, আমরা বিধান প্রণেতা নই। তাই কোনো বিধান কেন করা হয়েছে তা আমাদের জানার কথা নয়। আমরা তো বিধান বর্ণনাকারী মাত্র। যখন বিধানদাতার সামনে দাড় করানো হবে তখন সাহস হলে তা জেনে নেবে। তিনি তখন কথায় কিংবা কাজে আর শাস্তি দিয়ে হোক কিংবা লাঞ্ছিত করে হোক যে জবাব দেবেন সেটাই হবে প্রশ্ন কর্তাদের যথেষ্ট জবাব।

আইনের বিভিন্ন ধারা উপধারার কারণ উকিল কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে প্রশ্ন করা মস্ত বড় বোকামি। যদি কেউ তাদের জিজ্ঞেস করে তাহলে তাদের এ জবাব দেওয়ার অধিকার রয়েছে যে, আইন প্রণেতাদের কাছে তা জিজ্ঞেস কর। আমাদের সে দায়-দায়িত্ব নয়। তাই আলিমরা কেন সেই ধরনের প্রশ্নকারীদের অনুরূপ জবাব দিতে পারবো না? যদি তা দিতে পারে তো দেয় না কেন? কেন তারা প্রশ্নকারীর অপাত্রে জবাব দিতে যায়?

যারা কুরবানিকে অপচয়ভাবে তাদের জবাব তদ্রূপ দিতে হয়। অপচয় তো তখন হয় যখন তাতে কোনো কল্যাণ না থাকে। যখন কুরবানির দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়া যায়, যার তুলনা আর কোনো কল্যাণের সাথে চলে না, তখন তা অপচয় হলো কি করে?

<u>কুরবানি কি ও কেন?</u> কুরআনে মাজীদে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন–

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ -

এবং কুরবানির উটসমূহকে আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নিদর্শন সমূহের অন্তর্গত করেছি। তোমাদের জন্য নিহিত রয়েছে তাতে কল্যাণ। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানি আল্লাহর নিদর্শন, এতে আমাদের পরকালীন কল্যাণ নিহিত আছে।

কুরবানি নতুন কোনো বস্তু নয়, কোনো একটি হালাল পশুকে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে জবাই করার নিয়ম ইহ জগতে মানবের আবির্ভাব হতেই প্রচলিত। দুনিয়াতে সর্বপ্রথম কুরবানি আদি মানব হযরত আদম (আ.)-এর দুই পুত্র হাবিল ও কাবীল করেছিলেন। সেই যুগে কুরবানি আল্লাহ তা'আলার দরবারে গৃহীত হওয়ার প্রমাণ এই ছিল যে, আসমান হতে অগ্নি এসে কুরবানির উৎকৃষ্ট গোশ্তগুলো পুড়িয়ে দিতো। কিন্তু আমাদের প্রতি আল্লাহর অসীম অনুগ্রহ থাকায় তার গোশ্ত হালাল করে দেওয়া হয়েছে। কুরবানির প্রচলন আদি কাল হতে হলেও হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর ঐতিহাসিক ঘটনা হতে তার একটি বিশেষ গুরুত্ব পরিলক্ষিত হয়। যখন আল্লাহ পাক হযরত খলিলুল্লাহ (আ.) ও তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল জাবিহুল্লাহ (আ.)-কে পরীক্ষা করেছিলেন যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে কতটুকু মহব্বত করেন, হযরত ইবরাহীম (আ.) নিজ স্নেহের পুত্রকে এবং হযরত ইসমাঈল (আ.) আপন প্রাণটুকু আল্লাহর আদেশ ও সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ 'উৎসর্গ' করে দিয়েছিলেন। যাতে আল্লাহ তা'আলার তাঁদের ওপর রাজি হয়েছেন এবং মেহেরবানী করে সমগ্র মুসলিম সমাজের ওপর ঐ কুরবানি প্রথাটি সহজভাবে প্রবাহিত করে নিজ প্রাণের পরিবর্তে পশু জবাই করার বিধান বিধেয় করে দিয়েছেন। হুযূর (সা.)-এর সাহাবীগণ মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তদুত্তরে তিনি এরশাদ করলেন سُنَّةُ أَبِيْكُمْ إِبْرَاهِيْمَ "এটা তোমাদের কুরবানির পিতা হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর তরীকা" অথচ তিনি স্বীয় পুত্রকে কুরবানি করতে ছিলেন। আর আমরা তার বদলে পশু জবাই করে থাকি। এতে বুঝা যায় যে, তিনি নিজ পুত্রকে পিতা হয়ে জবাই করে যেরূপ আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করেছিলেন, আমরা পশু জবাই করেও সেই ছওয়াব পাব। এতএব কুরবানির তারিখে শরিয়ত মোতাবেক পশু উৎসর্গ করা অপেক্ষা বড় নেকী আল্লাহ পাকের নিকট আর কিছু নেই। যারা ঐ সময় কুরবানি করেন তাঁরা অতি ভাগ্যবান ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা। যেহেতু তা আল্লাহ তা'আলার খলীল (আ.) -এর অনুকরণ ও তাঁর স্মৃতি এবং যাঁরা পবিত্র মক্কা নগরীতে আল্লাহ তা'আলার দরবারে হজ আদায় করার নিয়তে আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হওয়ার পরে মিনাতে এসে কুরবানি করেন ও কা'বা শরীফের তওয়াফ করেন তাঁদের পূর্ণ অনুকরণ।

اَلْاُضْحِيَّةُ وَاجِبَةٌ عَلٰى كُلِّ حُرٍّ مُسْلِمٍ مُقِيْمٍ مُوسِرٍ فِيْ يَوْمِ الْاَضْحٰى يَذْبَحُ عَنْ نَفْسِهٖ وَعَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيْرِ وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةً اَوْ يَذْبَحُ بَدَنَةً اَوْ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةٍ وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيْرِ وَالْمُسَافِرِ اُضْحِيَّةٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ কুরবানি প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমান মুকীম ধনীর ওপর ওয়াজিব। বকরা ঈদের দিন নিজের পক্ষ থেকে এবং নিজের ছোট বাচ্চার পক্ষ থেকে জবাই করবে। প্রত্যেক মানুষের পক্ষ থেকে একটি ছাগল জবাই করবে। অথবা উট বা গরু সাতজন মানুষের পক্ষ থেকে জবাই করবে। দরিদ্র ও মুসাফিরের ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاجِبَةٌ ঃ কুরবানি ওয়াজিব না সুন্নত এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

শিশু সন্তানের পক্ষ থেকে কুরবানি দেওয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَعَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيْرِ الخ ঃ শিশু সন্তানের পক্ষ হতে তার অভিভাবকের ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব হবে কিনা? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর পক্ষ হতে দ্বিবিধ বর্ণনা পাওয়া যায়। হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনানুসারে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে, শিশু সন্তানের পক্ষ থেকে অভিভাবকের ওপর কুরবানি করা ওয়াজিব হবে। কেননা শিশু সন্তানের সর্ব প্রকার দায়-দায়িত্ব তার ওপর বর্তায়ে থাকে। যেমনটি শিশু সন্তানের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতির আদায় করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে থাকে। আর সদকায়ে ফিতির ও কুরবানি উভয়ই অর্থকরী ইবাদত। উভয়ই ঈদের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট, তাই হুকুমের দিক দিয়েও পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ হবে।

অপর দিকে জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে শিশু সন্তানের পক্ষ হতে কুরবানি দেওয়া অভিভাবকের ওপর ওয়াজিব হবে না। এটার ওপরই ফতোয়া।

'ফাতোয়ায়ে কাযীখান' গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ রয়েছে। এটা সদকায়ে ফিতরের বিপরীত। কেননা সদকায়ে ফিতরের কারণ হলো, প্রতিপালনের আওতাভুক্ত ও সংশ্লিষ্ট হওয়া। আর শিশু সন্তানের বেলায় উক্ত দু'টি কারণই বিদ্যমান। পক্ষান্তরে কুরবানি এমন ইবাদত যা একমাত্র আল্লাহর সন্তোষ ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। আর এরূপ ইবাদত একের পক্ষ হতে অন্যের ওপর ওয়াজিব হয় না। আর তাই স্বীয় দাসের পক্ষ হতে কুরবানি করা ওয়াজিব নয়, অথচ তার পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব।

ছাগল, গরু ও উট কতজনের পক্ষ থেকে কুরবানি করবে?

قَوْلُهٗ شَاةً اَوْ يَذْبَحُ بَدَنَةً الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি দ্বারা একজনের পক্ষ হতে কুরবানি দেওয়া যায়। আর গরু, উট ইত্যাদিতে এক হতে সাতজন পর্যন্ত কুরবানির ব্যাপারে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে একাধিক অংশীদার কুরবানি সহীহ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। প্রথমত অংশীদারদের মধ্য হতে কারো অংশ কমবেশি হতে পারবে না। দ্বিতীয়ত অংশীদারদের মধ্য হতে সকলের নিয়ত একনিষ্ঠ হতে হবে। কারো মধ্যে খোদার সন্তোষ ছাড়া যদি গোশত খাওয়া বা ইত্যাকার নিয়ত থাকে তাহলে সকলের কুরবানিই বাতিল হয়ে যাবে। কেননা, কুরবানি এমন একটি 'কুদরত' যা খণ্ডিত হতে পারে না। তাই একজনের নিয়ত অশুদ্ধ হওয়ার কারণে সকলের কুরবানিই ব্যর্থ হবে।

গরু, উট কুরবানির ব্যাপারে মতভেদ ঃ

قَوْلُهٗ عَنْ سَبْعَةٍ ঃ প্রকাশ থাকে যে, জমহুর ফিক্হবিদদের মতে গরু বা উট একাধিক সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে কুরবানি করা জায়েজ হবে। তবে কেয়াসের দৃষ্টিতে কুরবানি একাধিক ব্যক্তির পক্ষ হতে বৈধ হতে পারে না। কেননা একটি

পশুর জবাইয়ের দ্বারা মাত্র একটি কুদরত অর্জিত হতে পারে। হ্যাঁ, রাসূল (সা.)-এর হাদীসের কারণে এই স্থলে কিয়াস পরিত্যাগ করা হয়েছে। সুতরাং হযরত জাবের (রা.) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলে কারীম (সা.)-এর সাথে একটি গরু বা উট সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানি করতাম। তাই সাত বা সাত হতে কম সংখ্যক ব্যক্তি হলে জায়েজ হবে। সাতের অধিক ব্যক্তি হলে জায়েজ হবে না।

ইমাম মালেক (র.)-এর মতে একটি গরু বা উট মাত্র একটি পরিবারে পক্ষ হতে কুরবানি করা জায়েজ হবে না। তাঁর মতে এ ব্যাপারে পরিবারের সদস্য সংখ্যা ধর্তব্য নয় বরং পরিবারের সংখ্যা ধর্তব্য। কেননা নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, প্রত্যেক পরিবারের জন্য প্রতি বৎসর একটি কুরবানি করা কর্তব্য।

জমহুরের মতে উপরোক্ত হাদীস দ্বারা পরিবারের কর্তাকে বুঝানো হয়েছে। মোটকথা জমহুর ফকিহগণের মতে অংশীদারিত্বের ভিত্তি হলো অংশীদারদের সংখ্যা। অর্থাৎ তাদের সংখ্যা সর্বাধিক সাত হতে পারবে। তারা এক পরিবারের হোক বা একাধিক পরিবারের হোক। অপর পক্ষে ইমাম মালেক (র.)-এর অভিমত হলো অংশীদারিত্বের ভিত্তি পারিবারিক সূত্র অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীরা একই পরিবারভুক্ত হতে হবে। একাধিক পরিবারের হতে পারবে না, তাদের সংখ্যা যাই হোকনা কেন।

ফকির ও মুসাফিরের কুরবানির বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيْرِ الخ ঃ অর্থাৎ ফকির ও মুসাফিরের ওপর কুরবানি ওয়াজিব নয়, ফকিরের ওপর কুরবানি ওয়াজিব না হওয়ার কারণ এই যে, সে নেসাবের মালিক নয়।

وَ وَقْتُ الْاُضْحِيَّةِ يَدْخُلُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ اِلَّا اَنَّهُ لَا يَجُوْزُ لِاَهْلِ الْاَمْصَارِ الذَّبْحُ حَتّٰى يُصَلِّيَ الْاِمَامُ صَلٰوةَ الْعِيْدِ فَاَمَّا اَهْلُ السَّوَادِ فَيَذْبَحُوْنَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَهِيَ جَائِزَةٌ فِيْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَوْمَانِ بَعْدَهُ وَلَا يُضَحّٰى بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ وَالْعَرْجَاءِ الَّتِيْ لَا تَمْشِيْ اِلَى الْمَنْسَكِ وَلَا الْعَجْفَاءِ وَلَا تُجْزِئُ مَقْطُوْعَةُ الْاُذُنِ وَالذَّنَبِ وَلَا الَّتِيْ ذَهَبَ اَكْثَرُ ذَنَبِهَا اَوْ اُذُنِهَا وَاِنْ بَقِيَ الْاَكْثَرُ مِنَ الْاُذُنِ وَالذَّنَبِ جَازَ وَيَجُوْزُ اَنْ يُضَحّٰى بِالْجَمَّاءِ وَالْخَصِيِّ وَالْجَرْبَاءِ وَالثَّوْلَاءِ وَالْاُضْحِيَّةُ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ الثَّنِيُّ فَصَاعِدًا اِلَّا الضَّأْنَ فَاِنَّ الْجَذَعَ مِنْهُ يُجْزِئُ وَيَاْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْاُضْحِيَّةِ وَيُطْعِمُ الْاَغْنِيَاءَ وَيَدَّخِرُ وَيَسْتَحِبُّ لَهُ اَنْ لَا يَنْقُصَ الصَّدَقَةَ مِنَ الثُّلُثِ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا اَوْ يَعْمَلُ مِنْهُ اٰلَةً تُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْتِ وَالْاَفْضَلُ اَنْ يَذْبَحَ اُضْحِيَّتَهُ بِيَدِهٖ اِنْ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ وَيَكْرَهُ اَنْ يَذْبَحَهَا الْكِتَابِيُّ وَاِذَا غَلَطَ رَجُلَانِ فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اُضْحِيَّةَ الْاُخْرٰى اَجْزَأَ عَنْهُمَا وَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِمَا ـ

---

২৩৯ কুরবানির সময় নহরের দিন ফজর উদয় হওয়ার থেকেই শুরু হয়ে যায়। কিন্তু শহরবাসীদের জন্য ইমাম সাহেব ঈদের নামাজ আদায় না করা পর্যন্ত কুরবানির জবাই করা জায়েজ নেই। তবে গ্রামবাসী তারা ফজরের পরে জবাই করতে পারবে। কুরবানি তিনদিন পর্যন্ত জায়েজ আছে। একদিন নহরের দিন এবং তার পরে দু'দিন। অন্ধ, কানা এবং এ রকম লেংড়া জানোয়ারের দ্বারা কুরবানি করবে না যে জানোয়ার জবাই করার জায়গা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। এবং দুর্বল, কান কাটা, লেজ কাটা, পশুর দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই। এবং ঐ পশু যার অধিকাংশ কান, অথবা লেজ কাটা হয় উহা দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই। যদি অধিকাংশ লেজ, অথবা কান বাকি থাকে তখন এই পশু দিয়ে কুরবানি জায়েজ আছে। এবং সিং বিহীন। বলদ এলাজি এবং পাগল জানোয়ারের দ্বারা কুরবানি জায়েজ আছে। উট, গরু, ছাগল, দ্বারা কুরবানি জায়েজ আছে। এবং এই সকল জানোয়ার থেকে ছানী বা তদূর্ধ্বে বয়সী হওয়া আবশ্যক। ব্যতিক্রম শুধু বেড়াতে, কেননা তা ছয়মাস বয়সী হলেও যথেষ্ট হবে। কুরবানির গোশ্‌ত নিজে খাবে, মালদার দরিদ্র ব্যক্তিদেরকেও খাওয়াবে এবং রেখেও দিতে পারবে। কুরবানির গোশ্‌ত তিন ভাগের এক ভাগের কমে সদকা না করা মোস্তাহাব। এবং জানোয়ারের চামড়াকেও সদকা করে দেবে, অথবা জানোয়ারের চামড়া দ্বারা এরকম জিনিস বানিয়ে নেবে যা ঘরের মধ্যে ব্যবহার করা যায়। নিজের কুরবানির জানোয়ার নিজে জবাই করা উত্তম যদি ভালভাবে জবাই করতে পারে। এবং কুরবানির জানোয়ারকে কোনো আহলে কিতাবিয়্যার জবাই করা মাকরূহ। যখন দু'ব্যক্তি ভুলক্রমে প্রত্যেকে অপরজনের কুরবানি করে দেয়, তখন উভয়ের পক্ষ থেকে কুরবানি যথেষ্ট হয়ে যাবে। আর তাদের ওপর কোনো ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুরবানির পশু জবাই করার সময় ঃ

قَوْلُهُ وَوَقْتُ الْأَضْحِيَّةِ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) কুরবানির পশু জবাই করার সময় বর্ণনা করছেন। কুরবানির দিন ফজর উদয়ের পর পরই কুরবানির পশু জবাইয়ের সময় হয়ে যায়। তবে উল্লেখ্য যে, উহা কেবল শহরের বাইরে অবস্থানকারীদের জন্য প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে শহুরে লোকদের জন্য ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানি করা জায়েজ নেই।

এ স্থলে রাসূলে কারীম (সা.)-এর নিম্নোক্ত বাণী নীতি নির্ধারক। তিনি এরশাদ করেছেন– যে কেউ (ঈদের) নামাজের পূর্বে কুরবানি করলে সে যেন পুনরায় কুরবানি করে। আর যে (ঈদের) নামাজের পর কুরবানি করল। তার ইবাদত হলো এবং সে মুসলমানদের সুন্নত প্রাপ্ত হলো।

হুযূর (সা.) আরো এরশাদ করেছেন– আজকের (ঈদের) দিন আমাদের প্রথম ইবাদত হলো (ঈদের) নামাজ আদায় করা। অতঃপর কুরবানি করা। তবে এটা তাদের জন্যই ওয়াজিব যাদের ওপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব। অর্থাৎ শহুরেদের ওপর ওয়াজিব গ্রামবাসীদের ওপর নয়।

তা ছাড়া যুক্তির দৃষ্টিতেও কুরবানির পূর্বে নামাজ পড়ে নেওয়া দরকার। কেননা কুরবানিতে মশগুল হওয়ার কারণে নামাজে বিলম্ব হয়ে যেতে পারে। আর যেহেতু গ্রাম্য ব্যক্তির ওপর ঈদের নামাজ ওয়াজিব নয়, তাই তার বিলম্ব হয়ে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না।

ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম মালেক (র.)-এর মতে ঈদের নামাজের পর ইমামের কুরবানির পূর্বে অন্যদের জন্য কুরবানি করা জায়েজ হবে না। কিন্তু উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ের আলোকে তাদের সিদ্ধান্ত অসার ও অগ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়। কেননা হাদীসদ্বয়ে নামাজের পরের কথা বলা হয়েছে, ইমামের কুরবানির পরে যেতে হবে এমন উল্লেখ নেই।

আবার জবাইয়ের সময় নির্ধারণের ব্যাপারে কুরবানির পশুর অবস্থান স্থলের বিবেচনা করা হবে, কুরবানি দাতার অবস্থান স্থলের বিচার করা হবে না। সুতরাং যদি কুরবানির পশু গ্রামে থাকে আর কুরবানিদাতা শহরে থাকে, তাহলে ফজরের পর পরই কুরবানির পশু জবাই করা বৈধ হবে। অপর পক্ষে কুরবানিদাতা যদি গ্রামে থাকে আর কুরবানির পশু শহরে থাকে, তাহলে ঈদের নামাজের পূর্বে কুরবানি করা জায়েজ হবে না। আর শহুরে লোক কৃত্রিম পন্থা অবলম্বন করে যদি স্বীয় কুরবানির জানোয়ার গ্রামে পাঠিয়ে দেয় তাহলে ফজর উদয়ের পরপরই জবাই করা জায়েজ হবে।

আর কুরবানির পশুর ব্যাপারে পশুর অবস্থান স্থল ধর্তব্য হওয়ার কারণ হলো, এটা জাকাতের সাথে সামঞ্জস্যশীল হওয়া। কেননা কুরবানির দিবসগুলো অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই যদি সম্পদ হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে কুরবানির দায়িত্ব হতে রহিত হয়ে যায়। যেমন– নিসাব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার দরুন জাকাত রহিত হয়ে যায়। তাই জাকাতের ন্যায় স্থানের বিচার করা হবে, দাতার বিবেচনা করা হবে না।

এটা সদকায়ে ফিতরের বিপরীত। কেননা ঈদুল ফিতরের দিন ফজর উদয়ের দায়িত্ব হতে রহিত হয় না।

যদি এমতাবস্থায় কুরবানির পশু জবাই করে যে মসজিদস্থ মুসল্লিরা নামাজ আদায় করল। অথচ ঈদগাস্থ মুসল্লিরা নামাজ আদায় করেনি। তাহলে ইসতেহসানের দৃষ্টিকোণ হতে বৈধ হবে। তেমনটি ঈদগাহের লোকেরা যদি নামাজ আদায় করে থাকে আর মসজিদের মুসল্লিরা আদায় না করে থাকে তাহলেও জায়েজ হবে।

আর কুরবানির দিনের পর আরো দুই দিনসহ মোট তিন দিন কুরবানি করা জায়েজ। এটা আহনাফ ও জমহুর ফিকহবিদগণের মত। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কুরবানির দিনের পর আরো তিন দিনসহ মোট চার দিবস কুরবানি করা জায়েজ। কেননা হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন, "তাশরীকের সমস্ত দিনগুলোতে কুরবানির পশু জবাই করা যেতে পারে"। আর জমহুরের দলিল হলো, হযরত ওমর, আলী ও ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হাদীস। তাঁরা বলেছেন, কুরবানির জন্য তিন দিন নির্ধারিত রয়েছে। এদের মধ্যে প্রথম দিন কুরবানি করা সর্বোত্তম। তাঁদের এই বক্তব্য হুযূর (সা.) হতে শ্রবণের ওপর নির্ভরশীল। কেননা বিশেষ দিবস কিয়াস দ্বারা নির্ধারণ করা যায় না।

যেহেতু হাদীসের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ পরিলক্ষিত হলো, তাই আমরা যা নিশ্চিত; অর্থাৎ ন্যূনতম সংখ্যা গ্রহণ করব। আর যে সংখ্যার ব্যাপারে সন্দেহ রয়েছে উহা পরিহার করব।

عَمْيَاء ـ عَوْرَاء ـ عَرْجَاء ও عَجْفَاء -এর সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يُضَحِّي بِالْعَمْيَاءِ وَالْعَوْرَاءِ الخ ঃ عَمْيَاء এটা عَمْيٌ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। এটার অর্থ– হলো অন্ধ। عَوْرَاء এটা أَعْوَر -এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ– কানা, এক চক্ষু বিশিষ্ট। عَرْجَاء এটা أَعْرَج-এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ– লেংড়া। عَجْفَاء এটা أَعْجَف -এর স্ত্রীলিঙ্গ। এর অর্থ– অত্যন্ত দুর্বল, জীর্ণ-শীর্ণ।

উপরোক্ত প্রাণীগুলো কুরবানি করা সহীহ নয়। কেননা হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, নবী করীম (সা.) আমাদেরকে কুরবানির পশু নির্বাচনের সময় কান ও চক্ষু দেখে নেওয়ার জন্য বলেছেন। আর কানা পশু কুরবানি করতে

নিষেধ করেছেন। হযরত বারা ইবনে আজেব (রা.) হতে বর্ণিত। হুযূর (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন্ কোন্ প্রাণী কুরবানি করা যাবে না। তখন তিনি উত্তর দিলেন, লেংড়া পশু যার লেংড়া হওয়া সুস্পষ্ট, কানা প্রাণী যার কানা হওয়া সুস্পষ্ট, আর রুগ্ন পশু যার রোগা হওয়া সুস্পষ্ট, আর এমন দুর্বল প্রাণী যার হাড় ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ হাড়ের মধ্যস্থিত মগজ পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে।

جَمَّاء, خَصِي, جَرْبَاء ও ثَوْلَاء-এর সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ اَنْ يُّضَحِّيَ بِالْجَمَّاءِ الخ ঃ جَمَّاء বলে এমন পশুকে যার শিং নেই। এটার দ্বারা কুরবানি করা বৈধ। কেননা শিংয়ের সাথে কুরবানির কোনো উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট নয়। আর উটের তো শিং-ই নেই। অথচ এটার দ্বারা তো কুরবানি করা হয়ে থাকে। আর অনুরূপভাবে ভগ্ন শিং বিশিষ্ট পশুর দ্বারাও কুরবানি জায়েজ হবে।

خَصِي বলে বলদকে। এর গোশ্‌ত সুস্বাদু হয়। ইবনে মাজাহ হযরত আয়শা (রা.) ও আবূ হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। হুযূর (সা.) কুরবানির উদ্দেশ্যে সুন্দর, মোটাতাজা, সুদর্শন বলদ ক্রয় করতেন।

جَرْبَاء বলা হয় এমন পশুকে যার শরীরে খোস-পাচড়া ও এলার্জী থাকে। এ জাতীয় পশুকে কুরবানি করা জায়েজ আছে।

ثَوْلَاء বলে এমন পশুকে যার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। কারো কারো মতে উহার মস্তিষ্ক বিকৃতি এমন পর্যায় থাকে যে, ঘাস খায় তাহলে জায়েজ হবে। কেননা এর দ্বারা উদ্দেশ্যে ব্যাহত হয়নি। আর ঘাস না খেলে উহার দ্বারা কুরবানি বৈধ হবে না।

ত্রুটিযুক্ত পশুর কতিপয় বিধান ঃ

মাসআলা ঃ পাগল জন্তু যদি ঘাস খায়, পানি পান করে, মাঠে চরে তাহলে তার দ্বারা কুরবানি জায়েজ আছে অন্যথা কুরবানি জায়েজ নেই। -(শামী ৫ম খণ্ড, ২৮০ পৃঃ)

মাসআলা ঃ যে সব জন্তুর শিং জন্মগতভাবে না থাকে, কিংবা মধ্যভাগে ভেঙ্গে যায়, তার কুরবানি জায়েজ হবে। হাঁ, শিং যদি গোড়া থেকে একেবারে নির্মূল হয়ে যায় তা দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ নেই। -(শামী ৫ম খণ্ড, ২৮০ পৃঃ)

মাসআলা ঃ খাসি জন্তুর দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ বরং উত্তম। -(শামী ৫ম খণ্ড, ২৮০ পৃঃ)

মাসআলা ঃ চর্মরোগ যুক্ত মোটা জন্তু দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ কিন্তু দুর্বল জন্তু দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ হবে না। অর্থাৎ এমন দুর্বল যেটা জবাই করার জায়গা পর্যন্ত পৌঁছাতে কষ্ট হয়। -(শামী ৫ম খণ্ড, ২৮০ পৃঃ)

মাসআলা ঃ অন্ধ, কানা, অতিরিক্ত দুর্বল ও পঙ্গু জন্তু দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ হবে না। হাঁ, তবে উক্ত পঙ্গু পশু যদি তিন পা দিয়ে চলাচল করে এবং চতুর্থ পা দ্বারা কিছু কিছু টেক লাগাতে পারে, তাহলে কুরবানি জায়েজ আছে। -(শামী ৫ম খণ্ড, ২৮১ পৃঃ)

মাসআলা ঃ যে জন্তুর জন্মগতভাবে কর্ণ নেই, তা দ্বারাও কুরবানি করা জায়েজ নেই। হাঁ, কর্ণ আছে বটে খুব ছোট, তার দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ আছে। -(শামী ৫ খণ্ড, ২৮১ পৃঃ)

মাসআলা ঃ সমলিঙ্গ জন্তুর কুরবানি জায়েজ নেই। কিন্তু এমদাদুল ফতোয়াতে আছে, জন্তুর গোশ্‌ত যদি ভালোভাবে গলে যায় তাহলে জায়েজ হবে। -(শামী ৫ খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ)

মাসআলা ঃ অধিকাংশ কান কাটা, লেজ কাটা, কানা ও শরীরের পেছনের অংশ কাটা এরকম জন্তু দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ নেই। অধিকাংশ মানে তৃতীয়াংশ। কেননা তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম হলে ধর্তব্য নয়। -(শামী ৫ খণ্ড, ২৮২ পৃঃ)

মাসআলা ঃ স্বভাবগত এক অণ্ডকোষ বিশিষ্ট পশু দ্বারা কুরবানি জায়েজ। -(ইম্‌দাদুল ফতোয়া খণ্ড ৩, পৃঃ ৪৭২)

মাসআলা ঃ অধিকাংশ দাঁত বিশিষ্ট জন্তু দ্বারা কুরবানি জায়েজ। যার দাঁত অধিকাংশ বা মোটেই নেই, তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে না। -(শামী ৫ খণ্ড, ২৮৩ পৃঃ)

মাসআলা ঃ যদি জন্মগতভাবে একটি কান না থাকে কিংবা কান কাটা হয় তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ নেই।

মাসআলা ঃ যে জন্তু বেশি পায়খানা খায় তা দ্বারা কুরবানি জায়েজ হবে না। তবে উষ্ট্রকে চল্লিশ দিন, গরু-মহিষকে বিশ দিন, ছাগল-ভেড়াকে দশদিন ধরে পায়খানা খাওয়া থেকে বিরত রাখলে কুরবানি জায়েজ ও বৈধ হবে।

মাসআলা ঃ যে জন্তুর কান লম্বায় কাটা বা কানে যদি ছিদ্র আছে তা কুরবানি করা জায়েজ আছে। -(শামী ৫ খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ)

মাসআলা ঃ যে জন্তুর পুরুষাঙ্গ কাটা হওয়াতে সঙ্গমে অক্ষম কিংবা বয়োবৃদ্ধ হওয়াতে বাচ্চা জন্মানো থেকে অক্ষম হয়ে গেছে, তার কুরবানি জায়েজ। -(শামী ৫ খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ)

মাসআলা ঃ যে জন্তুর স্তনের প্রথমাংশ কাটা হয় বা রোগের কারণে দুধ শুকিয়ে যায়, তাহলে তার কুরবানি জায়েজ নেই। তদ্রূপ ছাগলের দু'টি দুধ থেকে একটি দুধ যদি কেটে যায় বা গরু মহিষের চারটি থেকে দু'টি কেটে যায় তার কুরবানিও জায়েজ নেই। -(শামী ৫ খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ)

মাসআলা ঃ কোনো লোক ভাল পশু ক্রয় করার পর পশুটি এমন ত্রুটিযুক্ত হলো, যা দ্বারা কুরবানি জায়েজ হয় না, ক্রেতা যদি ধনী ব্যক্তি হয় তবে দ্বিতীয় একটি দেওয়া তার ওপর ওয়াজিব। যদি ক্রেতা গরিব হয়, তাহলে ঐ ত্রুটিযুক্ত জানোয়ার দ্বারা কুরবানি করা জায়েজ হবে। -(শামী ৫ খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ)

মাসআলা ঃ ভাল জানোয়ার কুরবানি করার সময় ত্রুটিময় হয় তাহলেও কুরবানি জায়েজ আছে। -(শামী ৫ খণ্ড, ২৮৪ পৃঃ)

كِتَابُ الْاَيْمَانِ

শপথ পর্ব

যোগসূত্র ঃ اُضْحِيَّةٌ বা কুরবানি পর্বের সাথে اَيْمَانٌ বা শপথ পর্বের যোগসূত্র এই যে, হাদীস শরীফে আছে– عَظِّمُوْا ضَحَايَا كُمْ فَاِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ مَطَايَاكُمْ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কুরবানি এমন এক বাহন ও সওয়ারি যার দ্বারা পুলসিরাতের ওপর দিয়ে অতিক্রম করতে শক্তি লাভ করা যায়, ঠিক তেমনি اَيْمَانٌ এটা বহুবচন, তার একবচন আসে يَمِيْنٌ যার অর্থ শক্তি, يَمِيْن বা শপথ যে কথার সাথে মিলিত হয় সে কথাটিও শক্তিশালী হয়ে যায়। সারকথা কুরবানি দ্বারা পুলসিরাতের ওপর চলতে শক্তি লাভ করা যায় ; আর শপথ করে কথাকে শক্তিশালী করা হয় এ জন্য গ্রন্থকার (র.) কুরবানি পর্বের পর শপথ পর্বকে যোগ করেছেন।

اَيْمَانٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ اَيْمَانٌ এটা يَمِيْنٌ-এর বহুবচন। يَمِيْنٌ অর্থ –শক্তি, শপথ এবং হাত اَيْمَانٌ –এর মধ্যে মুশতারিক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

اَيْمَانٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় اَيْمَانٌ বলা হয় আল্লাহ তা'আলার নাম বা তার গুণসমূহ উল্লেখ করে কোনো কথাকে মজবুত ও শক্তিশালী করা।

কুরআনের আলোকে শপথ ঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে এরশাদ করেছেন–

لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِىْ اَيْمَانِكُمْ .

অর্থ ঃ আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের লগব শপথ-এর মধ্যে পাকড়াও করবেন না।

অন্যত্রে এরশাদ হচ্ছে, وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوْبُكُمْ

অর্থ ঃ কিন্তু সে সব কসমের ব্যাপারে ধরবেন, তোমাদের মন যার প্রতিজ্ঞা করেছে। – (সূরা আল-বাক্বারাহ্: আয়াত - ২২৫)

অন্যত্র আছে, وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ

অর্থ ঃ কিন্তু পাকড়াও করেন ঐ শপথের জন্য যা তোমার মজবুত করে বাঁধ।

উপরোক্ত শেষ আয়াত দু'টোতে যে শপথ সম্পর্কে পাকড়াও করা হবে, তার আলোচনা করা হয়েছে স্পষ্ট ভাবে।

اَلْاَيْمَانُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَضْرُبٍ يَمِيْنٌ غَمُوْسٌ وَيَمِيْنٌ مُنْعَقِدَةٌ وَيَمِيْنٌ لَغْوٌ فَيَمِيْنُ الْغُمُوْسِ هِىَ الْحَلْفُ عَلٰى اَمْرٍ مَاضٍ يَتَعَمَّدُ الْكِذْبَ فِيْهِ فَهٰذِهِ الْيَمِيْنُ يَأْثَمُ بِهَا صَاحِبُهَا وَلَاكَفَّارَةَ فِيْهَا اِلَّا التَّوْبَةُ وَالْاِسْتِغْفَارُ وَالْيَمِيْنُ الْمُنْعَقِدَةُ هِىَ اَنْ يَّحْلِفَ عَلٰى الْاَمْرِ الْمُسْتَقْبِلِ اَنْ يَّفْعَلَهُ اَوْ لَايَفْعَلَهُ فَاِذَا حَنِثَ فِىْ ذَالِكَ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَيَمِيْنُ اللَّغْوِ اَنْ يَّحْلِفَ عَلٰى اَمْرٍ مَاضٍ وَهُوَ اَنَّهُ يَظُنُّ كَمَا قَالَ وَالْاَمْرُ بِخِلَافِهَا فَهٰذِهِ الْيَمِيْنُ نَرْجُوْا اَنْ لَّايُؤَاخِذَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهَا صَاحِبَهَا وَالْقَاصِدُ فِى الْيَمِيْنِ وَالْمُكْرَهُ وَالنَّاسِىْ سَوَاءٌ وَمَنْ فَعَلَ الْمَحْلُوْفَ عَلَيْهِ عَامِدًا اَوْ نَاسِيًا فَهُوَ سَوَاءٌ وَالْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى اَوْ بِاِسْمٍ مِّنْ اَسْمَائِهٖ كَالرَّحْمٰنِ وَالرَّحِيْمِ اَوْ بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِ ذَاتِهٖ -

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ কসম তিন প্রকার ঃ (১) ইয়ামীনে গামূস (২) ইয়ামীনে মু'নআকিদাহ (৩) ইয়ামীনে লগব। ইয়ামীনে গামূস বলা হয় অতীতের কর্মের ওপর কসম খাওয়া যার মধ্যে শপথকারী ব্যক্তি ইচ্ছা করে মিথ্যা বলে। এ রকম শপথের কারণে শপথকারী ব্যাক্তির গুনাহগার হবে, তার মধ্যে তওবা ইস্তেগফার ব্যতীত কোনো কাফ্ফারা নেই। ইয়ামীনে মুন'আকিদাহ বলা হয় ভবিষ্যতের কর্মের ওপর শপথ করা যে, সে এই কাজ করবে বা করবে না। যখন তার শপথ ভঙ্গ হয়ে যায় তখন তার ওপর কাফ্ফারা অপরিহার্য। ইয়ামীনের লগব বলা হয় অতীতের কোনো কর্মের ওপর শপথ করা যে, আমি যেমন বলেছি তেমনি এবং বাস্তবে তার বিপরীত। এ রকম শপথের সম্পর্কে আমাদের ধারণা যে, আল্লাহ পাক শপথকারী ব্যাক্তিকে শাস্তি দেবেন না। শপথের মধ্যে ইচ্ছা করে শপথকারী ব্যক্তি এবং জোরপূর্বক শপথকারী এবং ভুল বশত শপথকারী ব্যক্তি সবাই সমান। এবং ইচ্ছায় অথবা ভুলে শপথকৃত বস্তুকে করাও সমান। কসম আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর অন্য কোনো নামের সাথে যেমন– রহমান, রহীম অথবা আল্লাহর জাতি গুণবাচক নামের মধ্য থেকে কোনো গুণের সাথে হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ يَمِيْنُ اللَّغْوِ الخ ঃ আহনাফের নিকট লগব শপথ এই যে, নিজের সন্দেহের কারণে সত্য মনে করে মিথ্যা শপথ করা। উদহারণ এই যে, গত পরশু বৃষ্টি হয়নি, কিন্তু যায়েদের অধিক সন্দেহ যে, বৃষ্টি হয়ে ছিল। সুতরাং যায়েদের এটা বলা যে, আল্লাহর কসম পরশু বৃষ্টি হয়েছে ইয়ামীনে লঘব বলা হবে। হযরত ইবনে আব্বাস এবং যারারাহ ইবনে আবূ আওফা হতে বিস্তারিত বর্ণিত আছে। সুতরাং ইয়ামীনে লগব এবং ইয়ামীনে গামূস-এর মধ্যে পার্থক্য শুধু ইচ্ছাকৃত মিথ্যা এবং অনিচ্ছাকৃত মিথ্যার কারণেই, অতীত এবং বর্তমানের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই।

قَوْلُهٗ بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِهٖ ঃ জানা উচিত যে, আল্লাহর গুণাবলী দু'প্রকার। (১) জাতি গুণ (২) ক্রিয়া গুণ। সুতরাং যে গুণাবলী জাতের মধ্য হতে হবে তার দ্বারা শপথকারী হয়ে যাবে, এবং যে গুণাবলী ক্রিয়ার মধ্য থেকে হবে তার দ্বারা শপথকারী হবে না। উভয়টার মাঝে পার্থক্য এই যে, আল্লাহর সাথে এ রকম গুণ নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলার বিপরীত থেকে ঐ গুণ জায়েজ নেই, তখন এটাকে জাতি গুণ বলা হয়। যেমন– ইলম, কুদরত, শাস্তি, আর যে গুণ এরকম যে, আল্লাহর বিপরীত থেকে জায়েজ গুণ হয় তখন উহাকে ক্রিয়া গুণ বলা হয়। যেমন–মহব্বত, রহমত, যখন এটা প্রকাশ হলো তখন আমরা বলব যে, কেউ যদি আযমতুল্লাহ, ইজ্জতুল্লাহ অথবা এমন কোনো গুণাবলীর সাথে শপথ করল, তাহলে উক্ত ব্যক্তি শপথকারীদের মধ্য গণ্য হবে।

كَعِزَّةِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَجَلَالِهٖ وَكِبْرِيَائِهٖ اِلَّا قَوْلَهٗ وَعِلْمِ اللّٰهِ فَاِنَّهٗ لَايَكُوْنُ يَمِيْنًا وَاِنْ حَلَفَ بِصِفَةٍ مِّنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ كَغَضَبِ اللّٰهِ وَسَخَطِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا وَمَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَكُنْ حَالِفًا كَالنَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْقُرْآنِ وَالْكَعْبَةِ وَالْحَلْفُ بِحُرُوْفِ الْقَسَمِ وَحُرُوْفُ الْقَسَمِ ثَلٰثَةٌ اَلْوَاوُ كَقَوْلِهٖ وَاللّٰهِ وَالْبَاءُ كَقَوْلِهٖ بِاللّٰهِ وَالتَّاءُ كَقَوْلِهٖ تَاللّٰهِ وَقَدْ تُضْمَرُ الْحُرُوْفُ فَيَكُوْنُ حَالِفًا كَقَوْلِهٖ اَللّٰهِ لَاَفْعَلَنَّ كَذَا وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا قَالَ وَحَقِّ اللّٰهِ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ وَاِذَا قَالَ اُقْسِمُ اَوْ اُقْسِمُ بِاللّٰهِ اَوْ اَحْلِفُ اَوْ اَحْلِفُ بِاللّٰهِ اَوْ اَشْهَدُ اَوْ اَشْهَدُ بِاللّٰهِ فَهُوَ حَالِفٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যেমন–কথকের কথা, আল্লাহর ইজ্জতের শপথ, আল্লাহর বুজুর্গীরি শপথ এবং তাঁর বড়ত্বের শপথ এই কথা ব্যতীত যে, আল্লাহর ইলমের শপথ, কেননা এটা শপথ নয়। যদি আল্লাহর গুণবাচক কোনো কর্ম থেকে কোনো গুণের সাথে শপথ করে যেমন– (আল্লাহর গজব) আল্লাহর ক্রোধ অথবা আল্লাহর কঠোরতা, তখন সে শপথকারীদের মধ্য থেকে হবে না এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো শপথ করে তখন সে শপথকারী হবে না। যেমন মহানবী (স.) অথবা কুরআন অথবা কাবার শপথ করা। এ সকল অবস্থায় উক্ত ব্যক্তি শপথকারী হবে না। এবং শপথ হরফে শপথ দ্বারা হয় এবং হরফে শপথ তিনটি : (১) ওয়াও, যেমন (ওয়াল্লাহ) অর্থ– আল্লাহর কসম (২) বা যেমন (বিল্লাহ) অর্থ–আল্লাহর কসম (৩) তা যেমন (তাল্লাহ) অর্থ– আল্লাহর শপথ এবং কখনো হরফে কসম লুক্কায়িত হয়। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি এর মধ্যেও শপথকারী হয়ে যাবে। যেমন– (আল্লাহু লাআফ'আলান্না কাযা) অর্থ– আল্লাহর শপথ আমি অবশ্যই এমনটি করব। এবং ইমাম আযম (র.) বলেন, যখন আল্লাহর হকের শপথ বলবে তখন উক্ত ব্যক্তি শপথকারী নয় এবং যখন বলবে আমি শপথ করেছি অথবা আমি আল্লাহর শপথ করেছি, অথবা (আহলিফু) অর্থ– আমি শপথ করেছি, অথবা বলে (আহলিফু বিল্লাহ) আল্লাহর নামে শপথ করছি, অথবা (আশহাদু) অর্থ- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, অথবা আমি আল্লাহর নামে সাক্ষ্য দিচ্ছি, তখন উক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত সকল অবস্থায় শপথকারী ব্যক্তি হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ حُرُوْفُ الْقَسَمِ ঃ ঐ তিনটার মধ্য থেকে بَاء (বা) টি تَاء ও وَاوْ থেকে ব্যাপক। কেননা بَاء (বা) প্রকাশ্য নাম এবং যমীর উভয়টির ওপর দাখেল হয়। যেমন বলা হয় – حَلَفْتُ بِاللّٰهِ وَبِهٖ আর ওয়াওটি যিহারের কাফ্ফারার তা হতে ব্যাপক। কেননা ওয়াও আল্লাহ তা'আলার সকল গুণাবলীর ওপর দাখিল হয় এবং তা শুধু আল্লাহর সাথে খাস।

وَكَذَالِكَ قَوْلُهُ وَعَهْدِ اللّٰهِ وَمِيْثَاقِهٖ وَاِنْ قَالَ عَلٰى نَذْرٍ اَوْ نَذْرِ اللّٰهِ فَهُوَ يَمِيْنٌ وَاِنْ قَالَ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَاَنَا يَهُوْدِيٌّ اَوْ نَصْرَانِيٌّ اَوْ مَجُوْسِيٌّ اَوْ مُشْرِكٌ اَوْ كَافِرٌ كَانَ يَمِيْنًا وَاِنْ قَالَ فَعَلَيَّ غَضَبُ اللّٰهِ اَوْ سَخَطُهٗ فَلَيْسَ بِحَالِفٍ وَكَذَالِكَ اِنْ قَالَ اِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَاَنَا زَانٍ اَوْ شَارِبُ خَمْرٍ اَوْ اٰكِلُ رِبًوا فَلَيْسَ بِحَالِفٍ وَكَفَّارَةُ الْيَمِيْنِ عِتْقُ رَقَبَةٍ يُجْزِئُ فِيْهَا مَا يُجْزِئُ فِى الظِّهَارِ وَاِنْ شَاءَ كَسَا عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كُلَّ وَاحِدٍ ثَوْبًا فَمَا زَادَ وَاَدْنَاهُ مَا يَجُوْزُ فِيْهِ الصَّلٰوةُ وَاِنْ شَاءَ اَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِيْنَ كَالْاِطْعَامِ فِىْ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ فَاِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلٰى اَحَدِ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ الثَّلٰثَةِ صَامَ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এরকম ভাবে কেউ যদি বলে ওয়াআহদিল্লাহি ও মীছাকিহী, অথবা বলে 'আলাইয়্যা নাযরুন, অথবা নাযরুল্লাহি আলাইয়্যা এগুলোও শপথ। যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, যদি আমি এমনটি করি তখন আমি ইহুদি অথবা নাসারা অথবা অগ্নি পূজক হয়ে যাব, অথবা মুশরিক অথবা কাফির হয়ে যাব, তখন এগুলো শপথ হবে। এবং উক্ত ব্যক্তি যদি বলে যে, আমার ওপর আল্লাহর গজব অথবা আল্লাহর ক্রোধ, তখন শপথ হবে না। অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি বলে যে, যদি আমি এমনটি করি তাহলে আমি জেনাকারীদের মধ্য থেকে হব অথবা মদ পানকারীদের অথবা সুদখোরদের মধ্য থেকে, তখন উক্ত ব্যক্তি শপথকারী নয়। এবং শপথের কাফ্ফারা হলো এক গোলাম আজাদ করা; যার মধ্যে এটাই যথেষ্ট হয় যা যিহারের মধ্যে যথেষ্ট হয়। অথবা যদি ইচ্ছা হয় দশজন মিসকিনকে কাপড় পরিয়ে দেবে প্রত্যেককে একটি করে কাপড় অথবা তাঁর চেয়ে বেশি আর বস্ত্রের নিম্ন (পরিমাণ) হলো যা পরিধান করে নামাজ পড়া যায়। অথবা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দশজন মিসকিনকে খাবার খাইয়ে দেবে, যেমনটি যিহারের কাফ্ফারার মধ্যে খাওয়ানো হয়। সুতরাং যদি এই তিনটির কোনো একটির ওপর সক্ষম না হয় তখন উক্ত ব্যক্তি ধারাবাহিকভাবে তিনটি রোজা রাখবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مُتَتَابِعَاتٍ الخ ঃ ইমাম মালিক (র.)-এর নিকট লাগাতার প্রয়োজন বা জরুরি নয়। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর এক কাওল এবং ইমাম আহমদ থেকেও এমন একটি যে, আল্লাহর কথার মধ্যে লাগাতার জরুরি নয়। আমাদের দলিল হযরত ইবনে মাসউদ এবং ইবনে কা'আবের প্রসিদ্ধ কেরাত তিন দিন লাগাতার-এর কথা রয়েছে।

فَإِنْ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْحِنْثِ لَمْ يُجْزِهِ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ مِثْلُ أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَوْ لَا يُكَلِّمَ اَبَاهُ أَوْ لَيَقْتُلَنَّ فُلَانًا فَيَنْبَغِيْ أَنْ يَّحْنَثَ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرَ عَنْ يَمِيْنِهِ وَإِذَا حَلَفَ الْكَافِرُ ثُمَّ حَنَثَ فِيْ حَالِ الْكُفْرِ أَوْ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا يَمْلِكُهُ لَمْ يَصِرْ مُحَرَّمًا وَعَلَيْهِ إِنِ اسْتَبَاحَهُ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ فَإِنْ قَالَ كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهُوَ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا أَنْ يَّنْوِيَ غَيْرَ ذَالِكَ وَمَنْ نَذَرَ مُطْلَقًا فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَإِنْ عَلَّقَ نَذْرًا بِشَرْطٍ فَوُجِدَ الشَّرْطُ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِنَفْسِ النَّذْرِ وَ رُوِىَ أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى رَجَعَ عَنْ ذَالِكَ وَقَالَ إِذَا قَالَ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ حَجَّةٌ أَوْ صَوْمُ سَنَةٍ أَوْ صَدَقَةٌ مَا أَمْلِكُهُ أَجْزَاهُ مِنْ ذَالِكَ كَفَّارَةُ يَمِيْنٍ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ -

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং যদি কেউ শপথ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে কাফ্‌ফারা আদায় করে দেয়, তখন তার কাফ্‌ফরা যথেষ্ট হবে না। এবং যে ব্যক্তি গুনাহের ওপর শপথ করে যেমন এমনটি বলে আমি নামাজ পড়ব না অথবা নিজ পিতার সাথে কথা বলব না অথবা অমুক ব্যক্তিকে অবশ্যই হত্যা করব, তখন উক্ত ব্যক্তির উচিত নিজেই শপথ ভঙ্গ করা এবং শপথের কাফ্‌ফরা দিয়ে দেবে। যদি কোনো কাফির শপথ করে অতঃপর শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যায় কুফরি অবস্থায় অথবা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তখনও উক্ত ব্যক্তির ওপর কাফ্‌ফারা নেই। এবং যে ব্যক্তি নিজের ওপর নিজের অধিকারভুক্ত বস্তু হারাম করে দেন, তখন সেটা হারাম হবে না আর যদি ঐটাকে মুবাহ মনে করে ব্যবহার করে তখন শপথের কাফ্‌ফারা হবে। আর যদি বলে যে, প্রত্যেক হালাল বস্তু আমার ওপর হারাম তখন তা শুধু খাদ্য ও পানীয়কে অন্তর্ভুক্ত করবে। অবশ্য অন্য কিছু নিয়ত করলে তাও অন্তর্ভুক্ত হবে। এবং যে ব্যক্তি (শর্তবিহীন) মুতলক মানতের নিয়ত করে তখন ঐ মানত পূরণ করা অপরিহার্য, আর যদি মানতকে শর্তের সাথে মিলিত করে এরপর শর্ত পাওয়া যায় তখনও শুধু মানত পুরা করা অপরিহার্য এবং বর্ণিত আছে যে, আবূ হানীফা (র.) এ (কথা) থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন এবং বলেছেন যে, যখন এমনটি বলে যে, যদি আমি এমনটি বলি তখন আমার ওপর এক হজ অথবা এক বৎসরের রোজা অথবা নিজের অধীনস্থ বস্তু দান করা আবশ্যক। তার জন্য এগুলোর কারণে শপথের কাফ্‌ফারা যথেষ্ট হবে, আর এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এরও অভিমত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ قَدَّمَ الْكَفَّارَةَ ঃ শপথকারী হওয়ার পূর্বে কাফ্‌ফারা দেওয়া বৈধ নয় ; ইমাম শাফীর নিকট মালের কাফ্‌ফারা শপথ ভঙ্গ করার পূর্বে বৈধ।

نَذْر-এর আভিধানিক অর্থ ঃ

نَذْر-قَوْلُهُ وَمَنْ نَذَرَ الخ শব্দের আভিধানিক অর্থ-মানত, উপঢৌকন, কুরবানি, সদকা, উপহার, ঘুষ দেওয়া এখানে মানত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

نَذْر শব্দের পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় نَذْر বলা হয় কোনো নফলকে নিজের ওপর ওয়াজিব করাকে। যেমন আরবে বলা হয়, نَذَرَ عَلٰى نَفْسِهِ لِلّٰهِ مِنَ الْمَالِ كَذَا অর্থাৎ সে নিজের ওপর এ পরিমাণ মাল আল্লাহর ওয়াস্তে দেওয়া ওয়াজিব করে নিয়েছে।

وَمَنْ حَلَفَ لَايَدْخُلُ بَيْتًا فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ اَوِ الْمَسْجِدَ اَوِ الْبِيْعَةَ اَوِ الْكَنِيْسَةَ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَتَكَلَّمَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فِى الصَّلٰوةِ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ لَايَلْبَسُ هٰذَا الثَّوْبَ وَهُوَ لَابِسُهٗ فَنَزَعَهٗ فِى الْحَالِ لَمْ يَحْنَثْ وَكَذَالِكَ اِذَا حَلَفَ لَايَرْكَبُ هٰذِهِ الدَّابَّةَ وَهُوَ رَاكِبُهَا فَنَزَلَ فِى الْحَالِ لَمْ يَحْنَثْ وَاِنْ لَبِسَ سَاعَةً حَنِثَ وَمَنْ حَلَفَ لَايَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ وَهُوَ فِيْهَا لَمْ يَحْنَثْ بِالْقُعُوْدِ حَتّٰى يَخْرُجَ ثُمَّ يَدْخُلَ وَمَنْ حَلَفَ لَايَدْخُلُ دَارًا فَدَخَلَ دَارًا خَرَابًا لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ لَايَدْخُلُ هٰذِهِ الدَّارَ فَدَخَلَهَا بَعْدَمَا اِنْهَدَمَ وَصَارَتْ صَحْرَاءَ حَنِثَ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ هٰذَا الْبَيْتَ فَدَخَلَ بَعْدَمَا اِنْهَدَمَ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايُكَلِّمَ زَوْجَةَ فُلَانٍ فَطَلَّقَهَا فُلَانٌ ثُمَّ كَلَّمَهَا حَنِثَ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَتَكَلَّمَ عَبْدَ فُلَانٍ اَوْ لَايَدْخُلُ دَارَ فُلَانٍ فَبَاعَ فُلَانٌ عَبْدَهٗ اَوْ دَارَهٗ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ না করার শপথ করে পরে কা'বা, মসজিদ, ইহুদিদের উপাসনাগার, অথবা গির্জায় প্রবেশ করেছে সে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যে ব্যক্তি শপথ করে যে, কথা বলবে না, অতঃপর সে নামাজে কুরআন শরীফ পড়েছে তখন শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যে শপথ করেছে যে, এ কাপড় পরিধান করবেনা, অথচ ঐ কাপড় তার পরিধানেই ছিল, অতঃপর ঐ সময়ই ঐ কাপড় খুলে ফেলল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না, এরূপভাবে যখন শপথ করে যে, এ জন্তুর ওপর সওয়ার হবে না অথচ উহার ওপরই আরোহী ছিল অতঃপর সাথে সাথে অবতরণ করল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি কিছু সময় অবস্থান করে থাকে তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, এ ঘরে প্রবেশ করবে না অথচ সে ঐ ঘরেই ছিল, তবে সে বসে থাকলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বের হয়ে পুনরায় প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি শপথ করেছে যে, ঘরে প্রবেশ করবে না এরপর সে বিরাণ ঘরে প্রবেশ করল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যে ব্যক্তি শপথ করল যে, এ ঘরে প্রবেশ করবে না এরপর ঐ ঘর ধ্বংস হবার পর প্রবেশ করল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। যে ব্যক্তি শপথ করল যে, অমুকের স্ত্রীর সাথে কথা বলবেনা, এরপর অমুক ব্যক্তি স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়ার পর কথা বললে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি শপথ করল যে, অমুকের গোলামের সাথে কথা বলবে না, অথবা অমুকের ঘরে প্রবেশ করবে না এরপর অমুক তার গোলাম বা ঘরকে বিক্রি করে দিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আঞ্চলিক ভাষার ওপর শপথের প্রভাবে মতভেদ ঃ

قَوْلُهٗ لَمْ يَحْنَثْ الخ ঃ কারণ بَيْت বলে যাকে থাকার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, আর কা'বা মসজিদ, গির্জা এবং মন্দির থাকার জন্য বানানো হয়নি, তা সত্ত্বেও এগুলোকে রূপক অর্থ হিসাবে بَيْت বলা হয়। আর সাধারণত بَيْت তার মূল অর্থের মধ্যেই ব্যবহার হয়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে শপথের ভিত্তি মূলত আভিধানিক অর্থের ওপর, ইমাম মালেক (র.)-এর মতে কুরআনে কারীমের ব্যবহারিক শব্দের প্রয়োগের ওপর শপথের ভিত্তি। ইমাম আহমদ (র.)-এর মতে শপথের ভিত্তি নিয়তের ওপর। আর আহনাফ (র.)-এর মতে আঞ্চলিক ভাষার ওপর শপথের ভিত্তি।

ثُمَّ كَلَّمَ الْعَبْدَ وَ دَخَلَ الدَّارَ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَتَكَلَّمَ صَاحِبَ هٰذَا الطَّيْلِسَانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ كَلَّمَهُ حَنِثَ وَكَذَالِكَ إِذَا حَلَفَ اَنْ لَّايَتَكَلَّمَ هٰذَا الشَّابَّ فَكَلَّمَهُ بَعْدَمَا صَارَ شَيْخًا حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ لَحْمَ هٰذَا الْحَمْلِ فَصَارَ كَبْشًا فَاَكَلَهَا حَنِثَ وَإِنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ مِنْ هٰذِهِ النَّخْلَةِ فَهُوَ عَلٰى ثَمَرِهَا وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ مِنْ هٰذَا الْبُسْرِ فَصَارَ رُطَبًا فَاَكَلَهُ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ بُسْرًا فَاَكَلَ رُطَبًا لَمْ يَحْنَثْ وَإِنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ رُطَبًا فَاَكَلَ بُسْرًا مُذَنَّبًا حَنِثَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ لَحْمًا فَاَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَوْ حَلَفَ اَنْ لَّايَشْرَبَ مِنْ دِجْلَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ لَمْ يَحْنَثْ حَتّٰى يَكْرَعَ مِنْهَا كَرْعًا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَشْرَبَ مِنْ مَاءِ دِجْلَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا بِإِنَاءٍ حَنِثَ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ مِنْ هٰذِهِ الْحِنْطَةِ فَاَكَلَ مِنْ خُبْزِهَا لَمْ يَحْنَثْ -

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর ঐ ব্যক্তি ঐ গোলামটির সাথে বলল, বা ঐ ঘরটিতে প্রবেশ করল, তখন শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি শপথ করে যে, এই চাদরওয়ালার সাথে কথা বলবে না এরপর সে চাদর বিক্রি করে দিল, এরপর সে কথা বলল, তখন শপথ ভঙ্গকারী হবে। এরূপভাবে যদি শপথ করে যে, এই যুবকের সাথে কথা বলবে না, এরপর তার সাথে সে বৃদ্ধ হওয়ার পর কথা বলল, তখন শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এবং যদি শপথ করে যে, এই গর্ভের সন্তানের গোশত খাবে না এরপর ঐ গর্ভের সন্তান ভেড়া হওয়ার পর তার গোশত খেয়েছে তখন শপথ ভঙ্গকারী হবে। আর যদি শপথ করে যে, এই খেজুর গাছ থেকে খাবে না, তবে শপথ এ গাছের ফলের ওপর হবে। আর যদি শপথ করে যে, এই অর্ধপক্ক খেজুর খাব না এরপর তা পেকে গেছে এবং সে খেয়েছে তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না, এবং যদি শপথ করে যে, অর্ধপক্ক খেজুর খাবে না এরপর পাকা খেজুর খেয়েছে তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি শপথ করে পাকা খেজুর খাবে না এরপর যে খেজুর নিচে দিয়ে সামান্য পেকেছে খেলে ইমাম আবু হানীফা (র.)-এর মতে, শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি শপথ করল যে, গোশত খাবে না এরপর সে মাছের গোশত খেল তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, সে দজলা নদী থেকে পান করবে না এরপর ঐ নদী থেকে পাত্রে নিয়ে পান করল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মুখ লাগিয়ে চুমুক দিয়ে পান না করে (এটা) ইমাম আযম (র.)-এর মত। আর যে ব্যক্তি শপথ করবে যে, সে দজলা নদীর পানি পান করবে না এরপর ঐ নদী থেকে পাত্রে নিয়ে পান করল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, এই গম খাবে না এরপর তার রুটি খেল তখন শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শপথ حَقِيْقَتْ-এর ওপর প্রয়োগ হওয়ার মধ্যে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ حَتّٰى يَكْرَعَ عَنْهَا كَرْعًا الخ ঃ সাহেবাইন (র.)-এর মতে আলোচ্য মাসআলায় চাই মুখে ঢেলে দিয়ে পান করুক বা হাতের তালু দিয়ে পান করুক বা পাত্রে নিয়ে পান করুক সর্বাবস্থায় শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এই মতানৈক্যের ভিত্তি আসলে একটি মূলনীতির ওপর ; তা এই যে, যখন শপথের মধ্যে ব্যবহৃত মূল অর্থ এবং আঞ্চলিক রূপক অর্থ উভয়টি ব্যবহৃত হয়, তখন ইমাম আযম (র.)-এর মতে শপথ মূল অর্থের ওপর সাব্যস্ত হবে, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে مَجَازِ مُتَعَارَفْ حَقِيْقَتِ مُسْتَعْمَلَه উভয়টির ওপর শপথ সাব্যস্ত হবে।

وَلَوْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ مِنْ هٰذَا الدَّقِيْقِ فَاَكَلَ مِنْ خُبْزٍ حَنِثَ وَلَوْ اِسْتَفَّهُ كَمَا هُوَ لَمْ يَحْنَثْ وَاِنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَتَكَلَّمَ فُلَانًا فَكَلَّمَهُ وَهُوَ بِحَيْثُ يَسْمَعُ اِلَّا اَنَّهُ نَائِمٌ حَنِثَ وَاِنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَتَكَلَّمَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ فَاَذِنَ لَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِالْاِذْنِ حَتّٰى كَلَّمَهُ حَنِثَ وَاِذَا اِسْتَحْلَفَ الْوَالِيْ رَجُلًا لِيُعْلِمَهُ بِكُلِّ دَاعِرٍ دَخَلَ الْبَلَدَ فَهُوَ عَلٰى حَالِ وِلَايَتِهٖ خَاصَّةً وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَرْكَبَ دَابَّةَ فُلَانٍ فَرَكِبَ دَابَّةَ عَبْدِهِ الْمَاذُوْنِ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَايَدْخُلَ هٰذِهِ الدَّارَ فَوَقَفَ عَلٰى سَطْحِهَا اَوْ دَخَلَ دِهْلِيْزَهَا حَنِثَ وَاِنْ وَقَفَ فِيْ طَاقِ الْبَابِ بِحَيْثُ اِذَا غُلِقَ الْبَابُ كَانَ خَارِجًا لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ الشِّوَاءَ فَهُوَ عَلَى اللَّحْمِ دُوْنَ الْبَاذِنْجَانِ اَوِ الْجَزَرِ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاْكُلَ الطَّبِيْخَ فَهُوَ عَلٰى مَا يُطْبَخُ مِنَ اللَّحْمِ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّايَاكُلَ الرُّءُوْسَ فَيَمِيْنُهُ عَلٰى مَايُكْبَسُ فِي التَّنَانِيْرِ وَيُبَاعُ فِي الْمِصْرِ-

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি শপথ করে যে, এই আটা খাব না এরপর তার রুটি খায় তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর যদি ঐ আটাকে হাতের তালুতে রেখে (শুকনা) খেয়ে নেয় তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। এবং যদি শপথ করে যে, অমুকের সাথে কথা বলব না, এরপর তার সাথে এরূপ আওয়াজে কথা বলল যে সে শুনতো কিন্তু সে ঘুমন্ত হওয়ার কারণে শুনেনি, তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর যদি শপথ করে যে, তার সাথে তার অনুমতি ব্যতীত কথা বলবে না, এরপর ঐ ব্যক্তি অনুমতি দিয়েছে কিন্তু সে জানে না এবং সে কথা বলে ফেলল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে এবং যদি বিচারক কারো থেকে শপথ নেয় যে, আমাকে প্রত্যেক ঐ অন্যায়কারী ব্যক্তির সংবাদ দেবে যে শহরে আসে, তবে এ শপথ বিশেষ করে ঐ বিচারকের ক্ষমতা পর্যন্ত হবে। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, অমুকের সওয়ারিতে সওয়ার হবে না এরপর তার অনুমতি প্রাপ্ত গোলামের সওয়ারির ওপর আরোহণ করল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যে ব্যক্তি শপথ করল যে, এ ঘরে প্রবেশ করবে না এরপর ঐ ঘরের ছাদের ওপর দাঁড়াল বা প্রান্তে (অলিন্দে) প্রবেশ করল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর যদি সে দরজার বেদী (চত্বরে) এভাবে দাঁড়ায় যে, যদি দরজা বন্ধ করা যায় তখন বাহিরে থাকবে তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, ভুনাকৃত খাবে না তবে এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে গোশত; বেগুন ও গাজর নয়। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে রন্ধনকৃত খাবে না এর দ্বারা যে সব বস্তু গোশতের সাথে রন্ধন করা হয় তা উদ্দেশ্য হবে। আর যে ব্যক্তি শপথ করল যে, মাথার খুলিসমূহ খাবে না তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে যা চলায় পাকানো হয় এবং শহরে বিক্রি করা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ دَابَّةَ فُلَانٍ الخ ঃ এ মাসআলায় শায়খাইন (র.)-এর মতে শপথ ভঙ্গকারী হবে না ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

قَوْلُهٗ لَايَاكُلَ الرُّؤُوْسَ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে গরু ও ছাগলের মাথার খুলি যেগুলো তন্দুরে পাকিয়ে শহরে বিক্রি করা হয় ঐ গুলো উদ্দেশ্য হবে, কিন্তু সাহেবাইন (র.)-এর মতে শুধু ছাগলের মাথার খুলি উদ্দেশ্য হবে, আর এই মতানৈক্য স্থান ও কালের হিসাবে। কারণ ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুগে মাথার খুলির দ্বারা গরু ও ছাগলের মাথার খুলি উদ্দেশ্য হতো আর সাহেবাইন (র.)-এর যুগে বিশেষ করে ছাগলের মাথার খুলি উদ্দেশ্য হতো।

وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّا يَاكُلَ الْخُبْزَ فَيَمِيْنُهُ عَلٰى مَا يَعْتَادُ أَهْلُ الْبَلَدِ اَكْلَهُ خُبْزًا فَإِنْ اَكَلَ خُبْزَ الْقَطَائِفِ اَوْخُبْزَ الْاَرُزِّ بِالْعِرَاقِ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّا يَبِيْعَ اَوْ لَا يَشْتَرِىَ اَوْ لَا يُوَاجِرَ فَوَكَّلَ مَنْ فَعَلَ ذَالِكَ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّا يَجْلِسَ عَلَى الْاَرْضِ فَجَلَسَ عَلٰى بِسَاطٍ اَوْ عَلٰى حَصِيْرٍ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ اَنْ لَّا يَجْلِسَ عَلٰى سَرِيْرٍ فَجَلَسَ عَلٰى سَرِيْرٍ فَوْقَهُ بِسَاطٌ حَنِثَ وَاِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ سَرِيْرًا اٰخَرَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ وَاِنْ حَلَفَ اَنْ لَّا يَنَامَ عَلٰى فِرَاشٍ فَنَامَ عَلَيْهِ وَفَوْقَهُ قِرَامٌ حَنِثَ وَاِنْ جَعَلَ فَوْقَهُ فِرَاشًا اٰخَرَ فَنَامَ عَلَيْهِ لَمْ يَحْنَثْ وَمَنْ حَلَفَ بِيَمِيْنٍ وَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مُتَّصِلًا بِيَمِيْنِهِ فَلَاحِنْثَ عَلَيْهِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, সে রুটি খাবে না তবে (তার) শপথ ঐ রুটির ওপর হবে শহরবাসীরা যে রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত অতএব সে যদি ইরাকে বাদামের রুটি বা চাউলের রুটি খেয়ে নেয় তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, সে কেনাবেচা করবে না বা ভাড়ার ওপর কোনো বস্তু দেবে না, এরপর কাউকে উকিল নিয়োগ করল যে এসব করল, তবে (সে) শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি শপথ করে যে, বিবাহ করবে না বা তালাক দেবে না বা স্বাধীন করবে না, অতঃপর কাউকে উকিল নিয়োগ করল যে এ সব করল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি শপথ করল যে, জমিনের ওপর বসবে না অতঃপর বিছানা বা চাটাইয়ের ওপর বসল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে সিংহাসনে বসবে না এরপর ঐ সিংহাসনে বসল যার ওপর বিছানা ছিল তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে, আর যদি উহার ওপর অপর একটি সিংহাসন লাগিয়ে বসে তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি শপথ করে যে, বিছানার ওপর ঘুমাবে না, এরপর উহার ওপর এরূপ অবস্থায় ঘুমাল যে উহার ওপর চাদর ছিল তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। আর যদি উহার ওপর অপর একটি বিছানা দিয়ে ঘুমায় তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। এবং যে ব্যক্তি কোনো শপথ করল এবং সাথে সাথে اِنْشَاءَ اللّٰهُ (অর্থাৎ আল্লাহ চাহেতো) বলে দিল, তবে ঐ কাজ করার দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اِنْشَاءَ اللّٰهُ الخ ঃ এ মাসআলার প্রমাণ নবী করীম (সা.)-এর বাণী- مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ وَقَالَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ فَلَاحِنْثَ عَلَيْهِ (رواه النسائى) এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, শপথের সাথে اِنْشَاءَ اللّٰهُ বললে ঐ কাজ করার দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হবে না। কিন্তু কথা হলো اِنْشَاءَ اللّٰهُ শপথের সাথে সাথে বলতে হবে। পৃথকভাবে اِنْشَاءَ اللّٰهُ বললে ঐ কাজ করার দ্বারা শপথ ভঙ্গকারী হবে। হাঁ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, পৃথকভাবে اِنْشَاءَ اللّٰهُ বললেও বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু এই বর্ণনার ওপর উম্মতের আমল নেই, অন্যথায় অন্যান্য শরয়ী عَقْد সমূহ غَيْر مَلْزُوْم হওয়া আবশ্যক হবে, যা প্রকাশ্য বাতিল।

وَإِنْ حَلَفَ لَيَأْتِيَنَّهُ إِنِ اسْتَطَاعَ فَهٰذَا عَلَى اسْتِطَاعِ الصِّحَّةِ دُوْنَ الْقُدْرَةِ وَإِنْ حَلَفَ أَنْ لَّا يُكَلِّمَهُ حِيْنًا أَوْ زَمَانًا أَوِ الْحِيْنَ أَوِ الزَّمَانَ فَهُوَ عَلٰى سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَكَذٰلِكَ الدَّهْرُ عِنْدَ أَبِيْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَّا يُكَلِّمَ أَيَّامًا فَهُوَ عَلٰى ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَّا يُكَلِّمَ الْأَيَّامَ فَهُوَ عَلٰى عَشَرَةِ أَيَّامٍ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى هُوَ عَلٰى أَيَّامِ الْأُسْبُوْعِ وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لَّا يُكَلِّمَهُ الشُّهُوْرَ فَهُوَ عَلٰى عَشَرَةِ أَشْهُرٍ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْ يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُوَ عَلٰى اِثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا وَلَوْ حَلَفَ لَا يَفْعَلُ كَذَا تَرَكَهُ أَبَدًا وَإِنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا فَفَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بَرَّ فِيْ يَمِيْنِهِ وَمَنْ حَلَفَ لَا تَخْرُجُ اِمْرَأَتُهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি শপথ করে যে, যদি সম্ভব হয় তার কাছে আসব তবে এটার দ্বারা উদ্দেশ্য সুস্থতা হবে আসার ক্ষমতা নয়। এবং যদি শপথ করে যে, তার সাথে এক কাল বা সময় কথা বলবে না তবে এটার দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ছয় মাস। এরূপ ভাবে (যদি শপথ করে যে,) এক যুগ (কথা বলবে না তবে) সাহেবাইন (র.)-এর মতে (এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ছয়মাস)। যদি শপথ করে যে কিছু দিন পর্যন্ত তার সাথে কথা বলবে না, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে তিন দিন। এবং যদি শপথ করে যে, কতিপয় দিন কথা বলবে না তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে দশ দিন। আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে সপ্তাহের দিনসমূহ। আর যদি শপথ করে যে, তার সাথে কয়েক মাস কথা বলবে না তবে ইমাম আযম (র.)-এর মতে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে দশ মাস, আর সাহেবাইন (র.)-এর মতে বারোমাস। আর যদি শপথ করে যে, এরূপ করব না, তবে উহা সর্বদার জন্য ছেড়ে দেবে। আর যদি শপথ করে নিশ্চয় এটা করব এরপর একবার করলেই শপথ পূর্ণ হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, তার স্ত্রী যেন তার অনুমতি ব্যতীত বের না হয়,

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَا تَخْرُجُ اِمْرَأَتُهُ اِلَخ ঃ এখানে একটি প্রশ্ন হয়, তা এই কুরআনে কারীমের আয়াতে কারীমা يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ এ আয়াতের মধ্যে নবী করীম (সা.)-এর ঘরে প্রবেশের জন্য প্রতিবার নতুন করে অনুমতি নেওয়ার বিধান বুঝা যায়, অথচ আলোচ্য মাসআলায় اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ -এর মধ্যে বুঝা যায় একবার অনুমতি নিলেই চলবে, পরে স্ত্রী অনুমুতি ছাড়া ঘরে প্রবেশ করলে স্বামী শপথ ভঙ্গকারী হবে না, এর কারণ কি ? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সা.)-এর ঘরে প্রবেশের জন্য বারবার অনুমতি আলোচ্য আয়াত থেকে নয়, বরং اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِيَّ এই আয়াত থেকে বারবার অনুমতি নেওয়ার বিধান বুঝা যায়, তাই আরবি ব্যাকরণের দিক দিয়ে আয়াতের বাক্য اِلَّا اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ এবং মাসআলার বাক্য اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ-এর মধ্যে কোনো অসামঞ্জস্য তা পাওয়া যায় না।

فَاَذِنَ لَهٗ مَرَّةً وَاحِدَةً فَخَرَجَتْ وَ رَجَعَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ مَرَّةً اُخْرٰى بِغَيْرِ اِذْنِهٖ حَنِثَ وَلَابُدَّ مِنَ الْاِذْنِ فِىْ كُلِّ خُرُوْجٍ وَاِنْ قَالَ اِلَّا اَنْ اٰذَنَ لَكِ فَاَذِنَ لَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ خَرَجَتْ بَعْدَهَا بِغَيْرِ اِذْنِهٖ لَمْ يَحْنَثْ وَاِذَا حَلَفَ اَنْ لَايَتَغَدّٰى فَالْغَدَاءُ هُوَ الْاَكْلُ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اِلَى الظُّهْرِ وَ الْعَشَاءُ مِنْ صَلٰوةِ الظُّهْرِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَالسُّحُوْرُ مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاِنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ دَيْنَهٗ اِلٰى قُرْبٍ فَهُوَ عَلٰى مَا دُوْنَ الشَّهْرِ وَاِنْ قَالَ اِلٰى بَعِيْدٍ فَهُوَ اَكْثَرُ مِنَ الشَّهْرِ وَمَنْ حَلَفَ لَايَسْكُنُ هٰذِهِ الدَّارَ فَخَرَجَ مِنْهَا بِنَفْسِهٖ وَتَرَكَ فِيْهَا اَهْلَهٗ وَمَتَاعَهٗ حَنِثَ وَمَنْ حَلَفَ لَيَصْعَدَنَّ السَّمَاءَ اَوْ لَيَقْلِبَنَّ هٰذَا الْحَجَرَ ذَهَبًا اِنْعَقَدَتْ يَمِيْنُهٗ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এরপর স্ত্রীকে একবার অনুমতি দিল তারপর সে বের হয়ে প্রত্যাবর্তন করল, পুনরায় সে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত বের হলে স্বামী শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে, প্রত্যেক বার বের হওয়ার জন্য অনুমতি নেওয়া জরুরি হবে। আর যদি বলে, হাঁ আমি যদি তোমাকে অনুমতি দেই এরপর একবার অনুমতি দিল এবং স্ত্রী বের হলো, তারপর অনুমতি ছাড়া বের হলে স্বামী শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি শপথ করে যে, প্রাতরাশ করবে না তবে প্রাতরাশ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ফজরের সময় থেকে জোহর পর্যন্তের খাওয়া। আর বিকালের খানা দ্বারা উদ্দেশ্য হবে জোহর নামাজ থেকে অর্ধরাত পর্যন্তের খানা, আর সাহরী দ্বারা উদ্দেশ্য হবে অর্ধরাত থেকে ফজরের সময় পর্যন্ত খানা। আর যদি শপথ করে অতি শীঘ্রই তার কর্জ নিশ্চয় আদায় করবে তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এক মাসের কম। আর যদি বলে কিছু দেরীতে, তবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য হবে এক মাসের বেশি। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, এ ঘরে বসবাস করবে না, এরপর নিজেই ঐ ঘর থেকে বের হয়ে গেল আর সন্তান-সন্ততি ও আসবাবপত্র ঐ ঘরে রেখে দিল তবে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি শপথ করল যে, নিশ্চয় আকাশে আরোহণ করবে বা নিশ্চয় এই পাথরটিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করবে তবে তার শপথ স্থির হয়ে যাবে।

وَحَنِثَ عَقِيْبَهَا وَمَنْ حَلَفَ لَيَقْضِيَنَّ فُلَانًا دَيْنَهُ الْيَوْمَ فَقَضَاهُ ثُمَّ وَجَدَ فُلَانٌ بَعْضَهَا زُيُوْفًا اَوْ بِنَهْرَجَةً اَوْ مُسْتَحَقَّةً لَمْ يَحْنَثِ الْحَالِفُ وَاِنْ وَجَدَهَا رُصَاصًا اَوْ سَتُوْقَةً حَنِثَ وَمَنْ حَلَفَ لَايَقْبِضُ دَيْنَهُ دِرْهَمًا دُوْنَ دِرْهَمٍ فَقَبَضَ بَعْضَهُ لَمْ يَحْنَثْ حَتّٰى يَقْبِضَ جَمِيْعَهُ مُتَفَرِّقًا وَاِنْ قَبَضَ دَيْنَهُ فِيْ وَزْنَتَيْنِ لَمْ يَتَشَاغَلْ بَيْنَهُمَا اِلَّا بِعَمَلِ الْوَزْنِ لَمْ يَحْنَثْ وَلَيْسَ ذَالِكَ بِتَفْرِيْقٍ وَمَنْ حَلَفَ لَيَاْتِيَنَّ الْبَصْرَةَ فَلَمْ يَاْتِ حَتّٰى مَاتَ حَنِثَ فِيْ اٰخِرِ جُزْءٍ مِنْ اَجْزَاءِ حَيٰوتِهِ -

সরল অনুবাদ ঃ এবং সে এরপর শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি শপথ করল যে, নিশ্চয় অমুকের কর্জ আজ পরিশোধ করব এরপর পরিশোধ করল, তারপর ঐ ব্যক্তি কিছু অংশ কর্জ কিছু অচল অবস্থায় পেল বা অন্য কারো হক সাথে পেল তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর যদি একবারে রাঙ্গতা বা একেবারে অচল পায় তবে অচল হয়ে যাবে। এবং যে ব্যক্তি শপথ করে যে, স্বীয় কর্জ এক এক দিরহাম করে নেব না এরপর কিছু কর্জ উসুল করল, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কর্জ অল্প অল্প না নেয়। আর যদি দু'বার ওজন করে কর্জ উসুল করে যার মাঝে কোনো কাজ করেনি ওজন করা ব্যতীত, তবে শপথ ভঙ্গকারী হবে না। আর এই নেওয়াটা পৃথকভাবে নেওয়ার গণ্য হবে না। এবং যে, ব্যক্তি শপথ করল যে নিশ্চয় বসরায় যাবে। এরপর সে বসরায় যায়নি শেষ পর্যন্ত সে মরে গেল, তবে সে জীবনের শেষ মুহূর্তে শপথ ভঙ্গকারী হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কতিপয় শাব্দিক বিশ্লেষণ ঃ

قَوْلُهُ زُيُوْفٌ ঃ زُيُوْفٌ বলা হয় ঐ অচল মুদ্রা যা রাষ্ট্রীয় ধনাগারে গ্রহণ করে না।

قَوْلُهُ بِنَهْرَجَةً ঃ بِنَهْرَجَةً বলা হয় ঐ সব অচল মুদ্রা যা সাধারণ ব্যবসায়ীগণ গ্রহণ করেন না। কেউ বলে ঐ মুদ্রা যা সরকারি টাকসাল থেকে মুদ্রিত হয়নি।

قَوْلُهُ رُصَاصًا ঃ رُصَاصٌ অর্থ-সিসা, এখানে رُصَاصٌ দ্বারা উদ্দেশ্য একেবারে অচল মুদ্রা।

قَوْلُهُ اَوْ سَتُوْقَةً ঃ سَتُوْقَةٌ বলা হয় ঐ অচল মুদ্রা যার ওপর রৌপ্যের লেপ (জড়োয়া) হয়।

كِتَابُ الدَّعْوٰى
দাবি পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) শপথ পর্বের পর দাবি পর্বকে আনার যোগসূত্র এই যে, শপথ দ্বারা খবরকে শক্তিশালী করা হয় আর ঐ পর্বে দাবিকে শক্তিশালী করার বিধানাবলী আলোকপাত করা হবে। এ ছাড়া দাবির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে শপথের প্রয়োজন হয়। এ জন্য শপথ পর্বের পর দাবি পর্বকে যোগ করা হয়েছে।

دَعْوٰى-এর আভিধানিক অর্থ ঃ دَعْوٰى এটা فَعْلٰى -এর ওজনে। তার مَصْدَرْ হচ্ছে اِدِّعَاءٌ যার বহুবচন دَعَاوٰى যেমন- فَتْوٰى-এর বহুবচন فَتَاوٰى دَعْوٰى-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- دَعْوٰى ঐ কথাকে বলে যার দ্বারা মানুষে অন্যের ওপর হক ওয়াজিব করার ইচ্ছা করে।

دَعْوٰى-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় دَعْوٰى বলে ঝগড়ার সময় কোনো বস্তুকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করাকে।

اَلْمُدَّعِىْ مَنْ لَّا يُجْبَرُ عَلَى الْخُصُوْمَةِ اِذَا تَرَكَهَا وَالْمُدَّعٰى عَلَيْهِ مَنْ يُّجْبَرُ عَلَى الْخُصُوْمَةِ وَلَا يُقْبَلُ الدَّعْوٰى حَتّٰى يَذْكُرَ شَيْئًا مَعْلُوْمًا فِىْ جِنْسِهٖ وَقَدْرِهٖ فَاِنْ كَانَ عَيْنًا فِىْ يَدِ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ كُلِّفَ اِحْضَارُهَا يُشِيْرُ اِلَيْهَا بِالدَّعْوٰى۔

সরল অনুবাদ ঃ দাবিদার বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যাকে ঝগড়ার ওপর অক্ষম করা যায় না যখন উক্ত ব্যক্তি ঐ বস্তুকে ছাড়িয়ে দেয়। এবং মুদ্দা আলাইহি (যার থেকে দাবি করা হয়) ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যাকে ঝগড়ার ওপর অক্ষম করা যায়। এবং দাবি গ্রহণ করা হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুর প্রকার বর্ণনা করবে না এবং তার পরিমাণ। সুতরাং যদি উক্ত বস্তু হুবহু যার কাছে দাবি করেছে তার কাছে থাকে, তাহলে তাকে উক্ত বস্তু উপস্থিত করানোর ওপর অক্ষম করা যাবে, যেন দাবি করার সময় উক্ত বস্তুর দিকে ইঙ্গিত করে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কতিপয় পরিভাষার বিশ্লেষণ ঃ

مُدَّعِىْ বলা হয় দাবিকারীকে

مُدَّعٰى عَلَيْهِ বলা হয় যার ওপর দাবি করা যায় তাকে।

مُدَّعٰى বলা হয় যে বস্তুর দাবি করা যায় তাকে।

قَوْلُهٗ ؛ عَيْنًا الخ এ স্থলে عَيْن দ্বারা অস্থাবর সম্পদ বুঝানো হয়েছে।

وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاضِرَةً ذَكَرَ قِيمَتَهَا وَإِنْ ادَّعَى عِقَارًا حَدَّدَهُ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَأَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي الذِّمَّةِ ذَكَرَ أَنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ فَإِذَا صَحَّتِ الدَّعْوٰى سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِنْ اِعْتَرَفَ قَضَى عَلَيْهِ بِهَا وَإِنْ أَنْكَرَ سَأَلَ الْمُدَّعِي الْبَيِّنَةَ فَإِنْ أَحْضَرَهَا قَضَى بِهَا وَإِنْ عَجِزَ عَنْ ذَالِكَ وَطَلَبَ يَمِينَ خَصْمِهِ إِسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهَا وَإِنْ قَالَ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ فَطَلَبَ الْيَمِيْنَ لَمْ يُسْتَحْلَفْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا تُرَدُّ الْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعِي .

সরল অনুবাদ ঃ যদি উক্ত বস্তু উপস্থিত না হয় তাহলে ঐ বস্তুর মূল্য বলে দেবে আর যদি জমির দাবি করে তখন জমির সীমা বর্ণনা করবে এবং এটা বলবে যে ঐ জমি যার থেকে দাবি করছে তার আয়ত্তে রয়েছে এবং সে উক্ত জমির দাবিকারী। এবং যদি তার জিম্মায় হকের দাবি হয় তবে বলবে যে, আমি হকের দাবিকারী। অতঃপর যখন দাবি শুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন বিচারক যার থেকে দাবি করা হচ্ছে তাকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করবে। সুতরাং যদি ঐ ব্যক্তি স্বীকার করে নেয় তখন তার স্বীকারের ওপর ফয়সালা দিয়ে দেবে। এবং অস্বীকার করলে দাবিদার থেকে প্রমাণ চাবে। যদি প্রমাণ উপস্থিত করে দেয় তখন প্রমাণ অনুযায়ী ফয়সালা দিয়ে দেবে। যদি প্রমাণ উপাস্থিত করতে অক্ষম হয় এবং প্রতিপক্ষ বিরোধিতা থেকে শপথ চায় তখন তার থেকে দাবির ওপর শপথ নিয়ে নেবে এবং যদি বলে যে আমার কাছে প্রমাণ বিদ্ধমান আছে, এবং শপথ চাবে তখন শপথ নেওয়া যাবেনা ইমাম আবূ হানীফার (র.) নিকট এবং শপথ দাবিদারের ওপর আরোপিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ حَدَّدَهُ الخ ঃ জমিনের দাবিতে দাবি সহীহ হওয়ার জন্য জমিনের সীমানা বর্ণনা করা শর্ত। যদিও জমিন প্রসিদ্ধ হয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট যখন জমিন পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হবে তখন সীমা বয়ান করা শর্ত নয়। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, দাবিকৃত বস্তুর মধ্যে আসল হচ্ছে যে, বস্তু ইশারা দ্বারা জানা হবে। কিন্তু জমিনের দিকে ইশারা করা দুষ্কর। কেননা জমিনকে বহন করে কাজি সাহেবের দরবারে আনা অসম্ভব। এ জন্য সীমা বর্ণনা করার দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে। কেননা জমিন সীমানা দ্বারাই জানা যায়। অতঃপর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তিন আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট শুধু দুই দিকের সীমানা উল্লেখ করাই যথেষ্ট। কিন্তু ইমাম যুফার ও আইম্মায়ে ছালাছার নিকট চারো দিকের সীমানা উল্লেখ করা আবশ্যক।

وَلَا تُرَدُّ الْيَمِيْنُ الخ ঃ আইম্মায়ে ছালাছাহ বলেন, অভিযোগকৃত ব্যক্তি যদি কসম করা থেকে অস্বীকার করে দেয় তাহলে দাবিদারের ওপর কসম (শপথ)-এর হুকুম হবে। যদি সে কসম খেয়ে নেয় তাহলে মীমাংসা করা হবে। আর যদি সেও অস্বীকার করে দেয় তাহলে তাদের ঝগড়া ছিন্ন হয়ে গেছে বুঝা যাবে। আমাদের দলিল হুযূর (সা.)-এর ইরশাদ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বাদী ও বিবাদীর বিধান বণ্টন করে দিয়েছেন অর্থাৎ প্রমাণ দাবিদারের ওপর আর কসম অস্বীকারকারীর ওপর। এখন দাবিদার থেকে যদি কসম নেওয়া হয় তাহলে দাবিদার ও যার ওপর দাবি করা হয়েছে উভয়জন কসমের মধ্যে শরিক হয়ে যাবে। আর শরিক হওয়া বণ্টনের পরিপন্থী।

وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي مِلْكِ الْمُطْلَقِ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ عَنِ الْيَمِيْنِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالنُّكُوْلِ وَأُلْزِمَهُ مَا ادَّعٰى عَلَيْهِ وَيَنْبَغِيْ لِلْقَاضِيْ أَنْ يَّقُوْلَ لَهُ إِنِّيْ أَعْرِضُ عَلَيْكَ الْيَمِيْنَ ثَلَاثًا فَإِنْ حَلَفْتَ وَإِلَّا قَضَيْتُ عَلَيْكَ مَا ادَّعَاهُ وَإِذَا كَرَّرَ الْعَرْضَ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ قَضٰى عَلَيْهِ بِالنُّكُوْلِ وَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوٰى نِكَاحًا لَمْ يُسْتَحْلَفِ الْمُنْكِرُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِي النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالْفَيْءِ فِي الْإِيْلَاءِ وَالرِّقِّ وَالْإِسْتِيْلَادِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالْحُدُوْدِ وَاللِّعَانِ وَقَالَا يُسْتَحْلَفُ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ إِلَّا فِي الْحُدُوْدِ وَاللِّعَانِ وَإِذَا ادَّعٰى إِثْنَانِ عَيْنًا فِيْ يَدِ اٰخَرَ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَزْعَمُ أَنَّهَا لَهُ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ بِهَا بَيْنَهُمَا وَإِنْ ادَّعٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ إِمْرَأَةٍ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَمْ يُقْضَ بِوَاحِدَةٍ مِنَ الْبَيِّنَتَيْنِ وَيُرْجَعُ إِلٰى تَصْدِيْقِ الْمَرْأَةِ لِأَحَدِهِمَا وَإِنِ ادَّعٰى إِثْنَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ إِشْتَرٰى مِنْهُ هٰذَا الْعَبْدَ وَأَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ بِنِصْفِ الْعَبْدِ بِنِصْفِ الثَّمَنِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ মালিকানার মধ্যে আয়ত্তকারীর প্রমাণ গ্রহণ করা যাবে না আর যখন যার থেকে দাবি করা হয়েছে সে ব্যাক্তি শপথ থেকে অস্বীকার করে তখন তার ওপর অস্বীকারের সাথে ফয়সালা করে দিবে এবং তার ওপর ঐ বস্তু জরুরি করে দিবে যার দাবি তার ওপর করা হয়েছে। এবং বিচারকের জন্য এটা বলে দেওয়া উচিত যে, আমি তোমার ওপর তিনবার শপথ উপস্থাপন করছি ও যদি তুমি শপথ করো তবে তুমি উত্তম; অন্যথা তার দাবির হুকুম তোমার ওপর দিয়ে দেব।অতঃপর যখন কাজি উপস্থাপনকে বারবার তিনবার করে ফেলে তখন উক্ত ব্যক্তির ওপর অস্বীকারের কারণে হুকুম দিয়ে দিবে। আর যদি দাবি বিবাহের হয় তখন ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট অস্বীকারকারী থেকে শপথ নেওয়া যাবে না এবং শপথ নেওয়া যায় না বিয়েতে, রজআতের মধ্যে, ঈলার মধ্যে, রুজু-এর মধ্যে, গোলামীর মধ্যে, উম্মে ওলাদ করার মধ্যে, নসবের মধ্যে, ওয়ালার মধ্যে, হুদূদ-এর মধ্যে, লি'আন-এর মধ্যে। এবং ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, হুদূদ এবং লি'আন ব্যতীত অন্যগুলোতে শপথ নেওয়া হবে। যখন দু'ব্যক্তি কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর দাবি করে যা তৃতীয় ব্যক্তির আয়ত্তে আছে তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি বলে, যে এই বস্তু আমার এবং উভয় ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে দেয় ; তখন ঐ বস্তুর সমাধা উভয়জনের জন্য হবে। এবং যদি তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে এক মহিলার সাথে বিয়ের দাবি করে এবং উভয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করে দেয় তখন কারো প্রমাণ অনুযায়ী ফয়সালা হবে না। বরং তাদের মধ্যে থেকে কোনো একজনের জন্য মহিলার সত্যায়নের দিকে লক্ষ্য করা হবে। যদি দুই ব্যক্তির মধ্য থেকে উভয়েই দাবি করে যে, আমি এই ব্যক্তি থেকে এই গোলাম ক্রয় করেছি এবং উভয় ব্যক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করে দেয়, তখন তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে যদি উচিত মনে করে অর্ধেক মূল্যের পরিবর্তে অর্ধেক গোলাম নিয়ে নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ الخ : কেননা এটার ওপর সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের (রা.) এজমা অর্থাৎ ঐকমত্য আছেন। হযরত আলী (রা.)ও এর ওপর একমত হয়েছেন। কাজি শুরাইহ (র.) থেকে বর্ণিত যে, অস্বীকারকারী ব্যক্তি তার সামনে দাবিদার থেকে কসম নেওয়ার দাবি করল, অতঃপর শুরাইহ (র.) বললেন, তোমার কসম দাবি করার হক নেই। এবং হযরত আলী (রা.)-এর সামনে অস্বীকারের সাথে ফয়সালা করে দিয়েছেন এবং হযরত আলী তা সঠিক বলেছেন।

قَوْلُهُ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ الخ : এটা সতর্কতামূলক। অন্যথা একবার উপস্থাপন করার দ্বারাও যদি কাজি শাস্তির ফয়সালা দিয়ে দেয়, তাহলে জায়েজ হবে। উপস্থাপন করার নিয়ম এরূপ যে, কাজি দাবিকৃত ব্যক্তিকে বলবে যে, তুমি এভাবে কসম করো, بِاللّٰهِ مَالِهٰذَا عَلٰى هٰذَا الْمَالِ এমনিভাবে দু'বার এবং তিনবার উপস্থান করবে। যদি সে কসম না খায়, তাহলে কাজি তৃতীয় বার তাকে বলবে। যদি তুমি কসম করো, তাহলে ভালো অন্যথা আমি তোমার ওপর ফয়সালা দিয়ে দেবো।

قَوْلُهُ لَمْ يُسْتَحْلَفْ : কেননা কসমের ফায়দা نُكُوْل এবং ইমাম আযম (র.)-এর নিকট نُكُوْل বদলের পর্যায় এবং বিবাহতে বদল সহীহ নয়।

قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ فِى النِّكَاحِ الخ : নিম্নোক্ত নয়টি জিনিসের ব্যাপারে ইমাম আযম (র.)-এর নিকট দাবিকৃত ব্যক্তির ওপর কসম নেই, (১) বিবাহ, যেমন– যায়েদ বিবাহের দাবিদার এবং মহিলা অস্বীকারকারী, অথবা এর উল্টা। (২) রাজয়াত, যেমন– ইদ্দত অতিবাহিত হওয়ার পর যায়েদ দাবি করল যে, আমি ইদ্দতের মধ্যে রুজু করেছিলাম এবং মহিলা অস্বীকারকারী, অথবা এর উল্টা। (৩) ফাই, যেমন– ঈলার মুদ্দাত শেষ হবার পর বলল যে, আমি ঈলার মুদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই আমি ঈলা থেকে রুজু করেছিলাম এবং মহিলা তার অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, অথবা তার উল্টা। (৪) রিক্বের ব্যাপারে, যেমন– যায়েদ একজন অজ্ঞাত বংশ ব্যক্তির ওপর দাবি করল যে, এ আমার গোলাম এবং ঐ ব্যক্তি তা অস্বীকার করল। (৫) ইসতিলাদের ব্যাপারে, যেমন– বাঁদি মনিবের ওপর দাবি করল যে, আমি তার উম্মেওয়ালাদ এবং এ সন্তান তার থেকেই হয়েছে, আর মনিব তা অস্বীকার করল। (৬) নসবের ব্যাপারে, যেমন– যায়েদ এক ব্যক্তির ওপর দাবি করল যে, এ আমার ছেলে এবং ঐ ব্যক্তি অস্বীকার করল। (৭) ولاء -এর ব্যাপারে, যেমন– যায়েদ এক ব্যক্তির ওপর এ দাবি করল যে, তার ওপর আমার وَلَايَتِ عِتَاقْ বা مُوَالَاتْ আছে, আর ঐ ব্যক্তি উহার অস্বীকারকারী। (৮) হুদূদ-এর ব্যাপারে, যেমন- যায়েদ অন্যের ওপর হদ ওয়াজিব হয় এরূপ কিছু দাবি করল এবং দাবিকৃত ব্যক্তি তার অস্বীকার করল। (৯) লি'আনের ব্যাপারে, যেমন– মহিলা স্বামীর ওপর দাবি করল যে, সে আমাকে লি'আন আসে এরূপ তোহমত লাগিয়ে দিয়েছে এবং স্বামী তা অস্বীকার করল। তাহলে এ সমস্ত অবস্থায় ইমাম আযম (র.)-এর নিকট মুনকের অর্থাৎ দাবিকৃত ব্যক্তির ওপর কসম নেওয়া হবে না। এবং সাহেবাইনের নিকট হদ এবং লি'আন ব্যতীত অন্য সব প্রকারে কসম নেওয়া হবে। কেননা কসম চাওয়ার লাভ হলো শাস্তির ফয়সালা। এবং নুকুলও সাক্ষী। কেননা নুকুল তার মিথ্যাবাদী হওয়ার ওপর প্রমাণ, এবং উল্লেখিত ব্যাপারে সাক্ষী জারি হবে তাহলে ইস্তেলহলাফও জারি হবে। তা সত্ত্বেও উল্লিখিত ব্যাপার এমন হুকুক যে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও সাবেত হয়ে যায়। তাহলে মালের মতো তাতেও ইস্তেহলাফ জারি হয়ে যাবে। হুদূদ এর বিপরীত। কেননা তা সামান্য সন্দেহ দ্বারাও রহিত হয়ে যায়। এ কারণে তাতে ইস্তেহলাফ জারি হবে না। এবং লিয়ান হদের অর্থে, সুতরাং তাতেও ইসতিহলাফ জারি হবে না। ইমাম আযম (র.) বলেন যে, এখানে نُكُوْل সাক্ষী নয়। নতুবা কাজির মজলিস শর্ত হতো না. ঝগড়া বিবাদ বন্ধ করার জন্য এমনটি করা হয়েছে অতএব এ ক্ষেত্রে نُكُوْل-এর সাথে ফয়সালা করা হবে না।

وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ قَضَى الْقَاضِي بِهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ اَحَدُهُمَا لَا اَخْتَارُ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ اَنْ يَّاْخُذَ جَمِيْعَهُ وَإِنْ ذَكَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا تَارِيْخًا فَهُوَ لِلْأَوَّلِ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ تَارِيْخًا وَمَعَ اَحَدِهِمَا قَبْضٌ فَهُوَ اَوْلَى بِهِ وَإِنِ ادَّعَى اَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا وَاَقَامَا الْبَيِّنَةَ وَلَا تَارِيْخَ مَعَهُمَا فَالشِّرَاءُ اَوْلَى مِنَ الْآخَرِ وَإِنِ ادَّعَى اَحَدُهُمَا الشِّرَاءَ وَادَّعَتِ الْمَرْاَةُ اَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءٌ وَادَّعَى اَحَدُهُمَا رَهْنًا وَقَبْضًا وَالْآخَرُ هِبَةً وَقَبْضًا فَالرَّهْنُ اَوْلَى وَإِنْ اَقَامَ الْخَارِجَانِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمِلْكِ وَالتَّارِيْخِ فَصَاحِبُ التَّارِيْخِ الْاَقْدَمِ اَوْلَى وَإِنِ ادَّعَيَا الشِّرَاءَ مِنْ وَاحِدٍ وَاَقَامَا الْبَيِّنَةَ عَلَى تَارِيْخَيْنِ فَالْاَوَّلُ اَوْلَى وَإِنْ اَقَامَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْآخَرِ وَذَكَرَا تَارِيْخًا فَهُمَا سَوَاءٌ وَإِنْ اَقَامَ الْخَارِجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ مُؤَرَّخٍ وَاَقَامَ صَاحِبُ الْيَدِ الْبَيِّنَةَ عَلَى مِلْكٍ اَقْدَمِ تَارِيْخًا كَانَ اَوْلَى -

---

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি চায় তাহলে ছেড়ে দেবে। অতঃপর কাজি যদি উভয়ের জন্য গোলামের হুকুম দিয়ে দেয় অতঃপর একজন বলল, আমি চাই না ; তাহলে দ্বিতীয় জনের জন্য পূর্ণ গোলাম নেওয়া জায়েজ হবে না। আর যদি তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকে তারিখ বয়ান করে দেয় তাহলে গোলাম প্রথম তারিখ ওয়ালার হবে। আর যদি কেউ কোনো তারিখ উল্লেখ না করে এবং কোনো একজনের হাতে আছে তাহলে সেই উত্তম হবে। আর যদি একজন ক্রয় করার দাবি করে আর দ্বিতীয়জন দান ও অধিকার-এর এবং উভয় জন প্রমাণ উপস্থিত করল এবং কারো নিকট তারিখও নেই তাহলে ক্রয় করা উত্তম হবে অপরজন থেকে। আর যদি একজন দাবি করল ক্রয় করার এবং মহিলা দাবি করল যে, সে আমার সাথে বিবাহ করেছে, তাহলে তার ওপর উভয়জনের দাবি সমান হবে। আর যদি একজন বন্ধক ও অধিকারের দাবি করে আর দ্বিতীয়জন হেবা ও অধিকারের তাহলে বন্ধক উত্তম হবে।

আর যদি দুই অনাধিকারকারী প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করল সম্পত্তি এবং তারিখের ওপর, তাহলে প্রথম তারিখ উপস্থাপনকারী উত্তম হবে। আর যদি উভয়ে কোনো একজন থেকে ক্রয় করার দাবি করল এবং উভয়জন প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করল দুই তারিখের ওপর, তাহলে প্রথম তারিখ উপস্থাপনকারী উত্তম হবে। আর যদি তাদের মধ্যে থেকে প্রত্যেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি থেকে ক্রয় করার ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করল এবং উভয়ে তারিখ উল্লেখ করল তাহলে উভয়ে বরাবর হবে। আর যদি অনাধিকারকারী ব্যক্তি তারিখকৃত সম্পত্তির ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করল এবং অধিকারকারী এমন সম্পত্তির ওপর যা তার তারিখের পূর্বে তাহলে অধিকারকারী ব্যক্তি উত্তম হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ هِبَةً وَقَبْضًا الخ ঃ অর্থাৎ একই ব্যক্তি থেকে ক্রয় করল এবং হেবা করা হলো ; কিন্তু যদি দু'ব্যক্তি থেকে করে তাহলে উভয়ের প্রমাণ কবুল হবে এবং ঐ বস্তু দুই অংশ করে প্রত্যেককে এক অংশ করে দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ فَالرَّهْنُ اَوْلَى الخ ঃ এ স্থলে বন্ধক হেবা থেকে উত্তম হবে। এবং এখানে হেবা দ্বারা কোনো বদলা ছাড়া হেবা বুঝানো হয়েছে। যদি বদলার শর্তের সাথে হয় তাহলে তা উত্তম হবে। কেননা বদলা দ্বারা হেবা বাইয় অর্থাৎ বিক্রি করার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বন্ধন থেকে বিক্রি করা উত্তম। এবং বন্ধক হেবা থেকে তখন উত্তম হবে যখন উভয়ের এক ব্যক্তি থেকে হবে, কিন্তু যখন দু'ব্যক্তি থেকে হবে তাহলে উভয়েই বরাবর হবে।

وَإِنْ اَقَامَ الْخَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً بِالنِّتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ اَوْلٰى وَكَذٰلِكَ النَّسْجُ فِى الثِّيَابِ الَّتِىْ لَاتُنْسَجُ اِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَكَذٰلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فِى الْمِلْكِ لَايَتَكَرَّرُ وَاِنْ اَقَامَ الْخَارِجُ بَيِّنَةً عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ بَيِّنَةً عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ اَوْلٰى وَاِنْ اَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْبَيِّنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنَ الْاٰخَرِ وَلَاتَارِيْخَ مَعَهُمَا تَهَاتَرَ الْبَيِّنَتَانِ وَاِنْ اَقَامَ اَحَدُ الْمُدَّعِيَيْنِ شَاهِدَيْنِ وَالْاٰخَرُ اَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ وَمَنِ ادَّعٰى قِصَاصًا عَلٰى غَيْرِهٖ فَجَحَدَ اُسْتُحْلِفَ فَاِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِيْنِ فِيْمَا دُوْنَ النَّفْسِ لَزِمَهُ الْقِصَاصُ وَاِنْ نَكَلَ فِى النَّفْسِ حُبِسَ حَتّٰى يُقِرَّ اَوْيَحْلِفَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَلْزَمُهُ الْاَرْشُ فِيْهِمَا وَاِذَا قَالَ الْمُدَّعِىْ لِىْ بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ قِيْلَ لِخَصْمِهٖ اَعْطِهٖ كَفِيْلًا بِنَفْسِكَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَاِنْ فَعَلَ وَالْاَمْرُ بِمُلَازَمَتِهٖ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ غَرِيْبًا عَلَى الطَّرِيْقِ فَيُلَازِمُهُ مِقْدَارَ مَجْلِسِ الْقَاضِىْ وَاِنْ قَالَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ هٰذَا الشَّيْءُ اَوْدَعَنِيْهِ فُلَانُ الْغَائِبُ اَوْ رَهَنَهُ عِنْدِىْ اَوْ غَصَبْتُهُ مِنْهُ وَاَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلٰى ذٰلِكَ فَلَا خُصُوْمَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعِىْ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি অধিকারকারী এবং অনধিকারকারীর মধ্য থেকে প্রত্যেকেই বাচ্চা প্রস্রবের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করে দিল তাহলে অধিকারকারী ব্যক্তি উত্তম হবে। অনুরূপ ঐ সমস্ত কাপড়ের বুনন যা শুধুমাত্র একবার বুনন করা হয় এবং প্রত্যেক এমন সববে মিলকের ব্যাপারে যা বারংবার হয় না। যদি অনধিকার ব্যক্তি মতলক সম্পত্তির ওপর দলিল প্রতিষ্ঠা করে এবং অধিকারী তার থেকে ক্রয় করার ওপর, তাহলে অধিকারী উত্তম হবে। এবং যদি তাদের মধ্যে উভয়ে প্রত্যেকেই একে অপর থেকে ক্রয় করার ওপর দলিল প্রতিষ্ঠা করে এবং উভয়ের কাছে তারিখ নেই, তাহলে উভয়ের দলিল রহিত হয়ে যাবে। এবং যদি একজন দাবিদার দু'জন সাক্ষী উপস্থাপন করে এবং অন্যজন চারজন, তাহলে দু'জন বরাবর হবে। যে ব্যক্তি অন্যের ওপর কেসাসের দাবি করল, অতঃপর সে অস্বীকার করল, তাহলে কসম নেওয়া হবে। সুতরাং যদি সে নফস ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে কসম থেকে অস্বীকার করে তাহলে তার ওপর কেসাস লাজেম হবে। যদি নফস কতলের ব্যাপারে অস্বীকার করে, তাহলে বন্দী করা হবে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বীকার করবে অথবা কসম খাবে। সাহেবাইন (র.) বলেন যে, তার ওপর উভয় অবস্থায় দিয়াত লাজেম হবে। এবং যখন দাবিদ্বার বলল যে, আমার দলিল হাজির আছে, তাহলে বিপরীত পক্ষকে বলা হবে যে, তুমি তিন দিনের ভিতরে ভিতরে উপস্থিত জামিন দাও। যদি দিয়ে দেয় তাহলে ভালো, অন্যথা তার পেছনে পরার হুকুম দেওয়া হবে। হ্যাঁ, যদি দাবিকৃত ব্যক্তি মুসাফির হয়, সুতরাং তাকে কাজির অফিস পর্যন্ত স্থগিত রাখা হবে। এবং যদি দাবিকৃত ব্যক্তি বলে যে, এ জিনিস আমাকে অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি হাদিয়া স্বরূপ দিয়েছে, অথবা আমার কাছে রেহেন রেখেছে, অথবা আমি তার থেকে জোর পূর্বক নিয়েছি এবং তার ওপর দলিল প্রতিষ্ঠা করে দিল, তাহলে তার মধ্যে আর দাবিকারীর মধ্যে কোনো ঝগড়া থাকবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ بِالنِّتَاجِ الخ ঃ বহিষ্কৃত ও অধিকারকারী উভয়ই মালিকানার এরূপ কারণের ওপর প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন যা বারবার ঘটে না; শুধু একবার হয়। যেমন– নাতাজ, অর্থাৎ কোনো জন্তুর বাচ্চা পয়দা হওয়া, তুলার কাপড়ের বুনন, তুলা কাটা, দুধ দোহন করা, পনির বানানো, পশম ছিলা। এ সবগুলো একবারই হয়, (তাকরার) বারবার হয় না। এখন বহিষ্কৃত ব্যক্তি ও অধিকারকারী উভয় দলিল দ্বারা প্রমাণ করল যে, এ বাচ্চা আমার জন্তুর থেকে, আমার অথবা বিক্রেতা অথবা ওয়ারিশের মালিকানায় জন্ম হয়েছে, তাহলে অধিকারকারীর দলিল গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা হাদীস শরীফে আছে যে, এক ব্যক্তি উটনীর দাবি করল এবং দলিল দিয়ে প্রমাণ করল যে, এটা আমার এবং সে আমার কাছে বাচ্চা দিয়েছে, অধিকারকারীও এভাবে দলিল দিয়ে প্রমাণ করল, তখন রাসূলে আকরাম (সা.) উটনি অধিকারকারীকে দিয়ে দিলেন।

قَوْلُهُ تَهَاتَرَ الخ ঃ এ অবস্থায় সাহেবাইন অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতে উভয়ের দলিল বাদ বলে গণ্য হবে এবং ঘর অস্বীকারকারীকে দেওয়া হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট উভয় দলিল গ্রহণযোগ্য হবে এবং ঘর বহিষ্কৃত ব্যক্তিকে দেওয়া হবে। কেননা উভয় দলিলের ওপর এভাবে আমল হতে পারে যে, এমনটি হওয়া সম্ভব যে, অধিকারকারী ব্যক্তি বহিষ্কৃত ব্যক্তি থেকে খরিদ করে তারপর বহিষ্কৃত ব্যক্তির হাতে বিক্রি করে দিল, এবং কবজ করায়নি। অতঃপর শায়খাইনের (র.) দলিল এই যে, খরিদের ওপর স্বীকারোক্তি করা মানে অন্যের মালিকানার ওপর স্বীকারোক্তি করা, তাহলে যেমন নাকি প্রত্যেক ব্যক্তির দলিল অন্যের স্বীকারোক্তির ওপর কায়েম হলো এবং এ অবস্থায় উভয় একসাথে হওয়া অসম্ভব হওয়ার কারণে ঐকমত্যে উভয় দলিল বাদ বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে এখানেও বাদ বলে গণ্য হবে।

قَوْلُهُ يَلْزَمُ الْاَرْشُ فِيْهِمَا الخ ঃ কেননা সাহেবাইনের নিকট এখানে নুকুলের ধর্তব্য করা হয়, যাতে সন্দেহ আছে। সুতরাং তার দ্বারা স্বীকার সাব্যস্ত হবে না এবং এর দ্বারা اَرْش সাবেত হবে। ইমাম আযম (র.)-এর দলিল এই যে, اَطْرَاف মাল-সম্পদের স্থলাভিষিক্ত।

وَإِنْ قَالَ اِبْتَعْتُهُ مِنْ فُلَانِ الْغَائِبِ فَهُوَ خَصْمٌ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِي سُرِقَ مِنِّيْ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْدَعَنِيْهِ فُلَانٌ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ لَمْ تَنْدَفِعُ الْخُصُوْمَةُ وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِيْ اِبْتَعْتُهُ مِنْ فُلَانٍ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ أَوْدَعَنِيْهِ فُلَانٌ ذٰلِكَ سَقَطَتِ الْخُصُوْمَةُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَالْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى دُوْنَ غَيْرِهِ وَيُؤَكَّدُ بِذِكْرِ أَوْصَافِهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ بِالطَّلَاقِ وَلَا بِالْعِتَاقِ وَتُسْتَحْلَفُ الْيَهُوْدِيُّ بِاللّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ التَّوْرٰةَ عَلٰى مُوْسٰى وَالنَّصْرَانِيُّ بِاللّٰهِ الَّذِيْ أَنْزَلَ الْإِنْجِيْلَ عَلٰى عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالْمَجُوْسِيُّ بِاللّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَ النَّارَ .

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি বলে যে, অমুক অনুপস্থিত ব্যক্তি থেকে আমি ক্রয় করেছি তাহলে সেটা প্রতিদ্বন্দ্বীর লক্ষ্য রয়ে যাবে। আর যদি দাবিদার বলে যে, আমার জিনিস চুরি করা হয়েছে এবং প্রমাণ উপস্থাপন করল এবং অধিকারকারী ব্যক্তি বলল যে, আমাকে অমুক ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু দিয়েছে এবং প্রমাণ উপস্থাপন করে দিল তাহলে ঝগড়া খতম হবে না। যদি দাবিদার বলে যে, আমি অমুক থেকে ক্রয় করেছি এবং অধিকারকারী বলে আমাকে অমুক ব্যক্তি ওদিয়ত (গচ্ছিত বস্তু) দিয়েছে তাহলে দলিল প্রমাণ ছাড়াই ঝগড়া খতম হয়ে যাবে। এবং শপথ আল্লাহর হয় অন্য কারো নয়, এবং আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী আলোচনা করে দৃঢ় ও শক্তিশালী করা হয়। এবং তালাকের শপথ নেওয়া হবে না এবং আজাদেরও শপথ নেওয়া যাবে না। এবং ইহুদি থেকে আল্লাহ তা'আলার শপথ নেওয়া হবে। এভাবে যে, ঐ আল্লাহর কসম যিনি হযরত মূসা (আ.)-এর ওপর তওরাত অবতীর্ণ করেছেন। এবং খ্রিস্টান থেকে এভাবে, ঐ আল্লাহর কসম যিনি হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর ইনজীল অবতীর্ণ করেছেন। এবং অগ্নিপূজক থেকে এভাবে, ঐ আল্লাহর কসম যিনি আগুন সৃষ্টি করেছেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ تَنْدَفِعُ الْخُصُوْمَةُ الخ ঃ এ সমস্ত অবস্থায় (শায়খাইন) ইমাম আযম এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট দাবিকৃত ব্যক্তি থেকে ঝগড়া দূর হবে না। কেননা মোদ্দা আলাইহি নিজেই স্বীকার করেছে যে, আমার অধিকার ঝগড়ার অধিকার নয়। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন, চুরির সুরতে দাবিকৃত ব্যক্তি থেকে ঝগড়া দূর হয়ে যাবে। কেননা দাবিকারী দাবিকৃত ব্যক্তির ওপর কোনো কাজের দাবি করেনি। সুতরাং "সে আমার থেকে জবর দখল করে নিয়ে গেছে" এ বিধানের ন্যায় হয়ে গেল।

قَوْلُهُ وَالْيَمِيْنُ بِاللّٰهِ الخ ঃ কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি কারো কসম খেতে চায়, তাহলে সে যেন আল্লাহর নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে। সুতরাং তালাক এবং আজাদ করা ইত্যাদির কসম হবেনা। যদিও মোদ্দায়ী তার ওপর দৃঢ়তা প্রকাশ করে। হাঁ, যদি আল্লাহর সম্মানিত নামসমূহ যেমন– রহমান, রাহীম, কাদের, জুলজালাল, অথবা আল্লাহ তা'আলার এমন সিফাতের কসম খায় যার দ্বারা কসম খাওয়া হয়, যেমন ঃ ইজ্জত, জুলজালাল, আজমত, কুদরত, ইত্যাদি। তাহলে এ কসম গ্রহণযোগ্য হবে।

وَلَا يُسْتَحْلَفُوْنَ فِيْ بُيُوْتِ عِبَادَتِهِمْ وَلَا يَجِبُ تَغْلِيْظُ الْيَمِيْنِ عَلَى الْمُسْلِمِ بِزَمَانٍ وَلَا بِمَكَانٍ وَمَنِ ادَّعٰى اَنَّهُ اِبْتَاعَ مِنْ هٰذَا عَبْدَهُ بِاَلْفٍ فَجَحَدَ اُسْتُحْلِفَ بِاللّٰهِ مَا بَيْنَكُمَا بَيْعٌ قَائِمٌ فِيْهِ وَلَا يُسْتَحْلَفُ بِاللّٰهِ مَا بِعْتُ وَيُسْتَحْلَفُ فِي الْغَصْبِ بِاللّٰهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيْكَ وَ رَدَّ هٰذِهِ الْعَيْنَ وَلَا رَدَّ قِيْمَتَهَا وَلَا يُسْتَحْلَفُ بِاللّٰهِ مَا غَصَبْتُ وَفِي النِّكَاحِ بِاللّٰهِ مَا بَيْنَكُمَا نِكَاحٌ قَائِمٌ فِي الْحَالِ وَفِيْ دَعْوَى الطَّلَاقِ بِاللّٰهِ مَا هِيَ بَائِنٌ مِنْكَ السَّاعَةَ بِمَا ذَكَرَتْ وَلَا يُسْتَحْلَفُ بِاللّٰهِ مَا طَلَّقْتُهَا وَاِنْ كَانَتْ دَارٌ فِيْ يَدِ رَجُلٍ اِدَّعَاهُ اِثْنَانِ اَحَدُهُمَا جَمِيْعًا وَالْاٰخَرُ نِصْفَهَا وَاَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَلِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِهَا وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ رُبْعُهَا عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى۔

সরল অনুবাদ ঃ এবং তাদেরকে তাদের এবাদত খানায় কসম দেওয়া হবে না। এবং মুসলমানের কসমকে যামান এবং মাকানের সাথে দৃঢ় করা জরুরি নয়। এবং যে ব্যক্তি দাবি করল যে, আমি তার থেকে তার গোলাম এক হাজার দিরহামে ক্রয় করেছি এবং সে তার অস্বীকার করে, তাহলে কসম নেওয়া হবে। এভাবে যে, আল্লাহর কসম আমাদের মাঝে এ সময় বিক্রয় প্রতিষ্ঠিত নেই। এবং এভাবে কসম নেওয়া হবে না যে, আল্লাহর কসম আমি বিক্রি করিনি। আর জোরপূর্বক নেওয়ার ব্যাপারে কসম নেওয়া হবে। এভাবে যে, আল্লাহর শপথ এ ব্যক্তি এ জিনিস ফিরে নেওয়ার উপযুক্ত নয়, এবং এর মূল্য নেওয়ারও উপযুক্ত নয়। এমনভাবে নেওয়া হবে না যে, আমি জোরপূর্বক নেই নাই। এবং বিবাহতে এভাবে যে, আল্লাহর কসম আমাদের মধ্যে বিবাহের সম্পর্ক নেই এখন পর্যন্ত। এবং তালাকের দাবিতে এভাবে যে, আল্লাহর কসম এ আমার থেকে এখনও পৃথক নয়, যেমন সে বর্ণনা করেছে, এমনভাবে নেওয়া হবে না যে, আল্লাহর কসম আমি তাকে তালাক দেইনি। যদি ঘর কারো আয়ত্তে থাকে, যার দাবি দু'ব্যক্তি করে, একজন পুরাঘর, অন্যজন অর্ধঘর এবং উভয়জন প্রমাণ দেয়, তাহলে ইমাম আযম (র.)-এর নিকট পুরা দাবিকারীর চার ভাগের তিনভাগ হবে এবং অর্ধ দাবিকারীর চার ভাগের একভাগ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَحْلَفُوْنَ الخ ঃ কেননা তাদের নিকট ঐ সমস্ত ঘরের সম্মান আছে এবং কাজির জন্য ঐ সমস্ত ঘরে যাওয়া নিষেধ।

قَوْلُهُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ بِاللّٰهِ مَا بِعْتُ الخ ঃ কেননা এটা সম্ভব যে, সে বিক্রি করেছে, অতঃপর সে একালা করেছে, অথবা কোনো দোষের কারণে ফিরিয়ে দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَتْ دَارٌ الخ ঃ এ অবস্থায় ইমাম আযম (র.)-এর নিকট পুরা দাবিকারী তিন চতুর্থাংশ পাবে এবং অর্ধ দাবিকারী এক-চতুর্থাংশ পাবে প্রতিযোগিতার তরিকায়, যার উদ্দেশ্য এই যে, যখন অর্ধ দাবিকারী অর্ধেক দাবি করল, তাহলে বাকি অর্ধেক পুরা দাবিকারীর জন্য রয়ে গেল এবং এক অর্ধেকের মধ্যে উভয়ের প্রতিযোগিতা বাকি আছে। তাহলে এ অর্ধেককে উভয়ের মাঝে অর্ধেক অর্ধেক করে দেওয়া হবে। সাহেবাইনের নিকট পুরা দাবিকারীর জন্য তিন ভাগের দু'ভাগ এবং অর্ধেক দাবিকারীর জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। কেননা মাসআলাতে পুরা এবং অর্ধেক (كُلّ) ও (نِصْف) উভয়টি আছে, তাহলে মাসয়ালা তিন দিয়ে হবে। কেননা অর্ধেকের উৎপত্তি স্থান দুই এবং দু'য়ের (আদদ) সংখ্যা তিনের দিকে ফিরে আসে, তাহলে দু'অংশ পুরা দাবিকারীর হবে, এবং এক অংশ অর্ধেক দাবিকারীর হবে। এবং যদি ঐ ঘর পুরা দাবিকারীর আয়ত্তে হয়, তাহলে পুরাঘর পুরা দাবিকারীর হবে।

وَقَالَا هِيَ بَيْنَهُمَا اَثْلَاثًا وَلَوْكَانَتِ الدَّارُ فِيْ اَيْدِيْهِمَا سُلِّمَتْ لِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ نِصْفُهَا عَلٰى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَنِصْفُهَا لَا لَا عَلٰى وَجْهِ الْقَضَاءِ وَاِذَا تَنَازَعَا فِيْ دَابَّةٍ وَاَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةً نَتَجَتْ وَ ذَكَرَا تَارِيْخًا وَسَنُّ الدَّابَّةِ يُوَافِقُ اَحَدَ التَّارِيْخَيْنِ فَهُوَ اَوْلٰى وَاِنْ اَشْكَلَ ذَالِكَ كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَاِذَا تَنَازَعَا عَلٰى دَابَّةٍ اَحَدُهُمَا رَاكِبُهَا وَلَا مُتَعَلِّقٌ بِلِجَامِهَا فَالرَّاكِبُ اَوْلٰى وَكَذَالِكَ اِذَا تَنَازَعَا بَعِيْرًا وَعَلَيْهِ حَمْلٌ لِاَحَدِهِمَا فَصَاحِبُ الْحَمْلِ اَوْلٰى وَكَذَالِكَ اِذَا تَنَازَعَا قَمِيْصًا اَحَدُهُمَا لَابِسُهُ وَالْاٰخَرُ مُتَعَلِّقٌ بِكُمِّهِ فَاللَّابِسُ اَوْلٰى وَاِذَا اِخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْبَيْعِ فَادَّعَى الْمُشْتَرِيْ ثَمَنًا وَادَّعَى الْبَائِعُ اَكْثَرَ مِنْهُ وَاَقَامَ اَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ قُضِيَ لَهُ بِهَا فَاِنْ اَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الْمُثْبِتَةُ لِلزِّيَادَةِ اَوْلٰى ـ

সরল অনুবাদ ঃ সাহেবাইন (র.) বলেন যে, ঘর উভয়ের মধ্যে তিন তৃতীয়াংশ হিসাবে হবে। এবং যদি ঘর উভয়ের আয়ত্তে হয়, তাহলে পুরাঘর দাবি কারীর জন্য হবে। এবং পুরাঘর অর্ধেক কাজির ফয়সালা অনুযায়ী বাকি অর্ধেক কাজির ফয়সালা ছাড়া ; যদি দু'ব্যক্তি এক জন্তুর ব্যাপারে ঝগড়া করে এবং উভয় প্রমাণ দিয়ে দেয় এ কথার ওপর যে, এজন্তু আমার এখানে জন্ম গ্রহণ করেছে এবং উভয়ে তারিখ বর্ণনা করে, আর জন্তুর বয়সও কারো একজনের তারিখের অনুযায়ী হয়, তাহলে সেই উত্তম (ও অগ্রাধিকার) বলে গণ্য হবে। যদি এটাও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে জন্তু উভয়ের মধ্যে ইজমালী হিসাবে থাকবে। এবং যদি এক জন্তুর ব্যাপারে দু'ব্যক্তি ঝগড়া করে, একজন ঐ জন্তুর ওপর সওয়ার অবস্থায় আর অপরজন লাগাম ধরে আছে, তাহলে সওয়ার উত্তম। এমনিভাবে যদি উটের ব্যাপারে ঝগড়া করে এবং উহার ওপর একজনের বোঝা বহন করা আছে, তাহলে বোঝাওয়ালা উত্তম। এমনিভাবে যদি পোশাক তথা জামার ব্যাপারে ঝগড়া করে এবং একজন উহা পরিহিত আছে এবং অন্যজন হাতা ধরে রেখেছে, তাহলে পরিহিত ব্যক্তি উত্তম। এবং যদি ক্রেতাও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হয়, সুতরাং ক্রেতা কোনো দামের দাবি করে এবং বিক্রেতা এর চেয়ে বেশির দাবি করে, অথবা বিক্রেতা মালের এক পরিমাণের দাবি করে এবং ক্রেতা এর চেয়ে বেশির দাবি করে এবং তাদের মধ্য থেকে একজন প্রমাণ দেখায়, তাহলে তার জন্য ফয়সালা হবে। সুতরাং যদি উভয় জন দলিল দেখায়, তবে অতিরিক্ত প্রমাণকারীর দলিল গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَهُوَ اَوْلٰى الخ ঃ কেননা জন্তুর বয়স দু'তারিখের যে কোনো এক তারিখ অনুযায়ী হওয়া বাহ্যিক অবস্থা তার জন্য সাব্যস্ত রয়েছে সুতরাং তাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

قَوْلُهُ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ الخ ঃ কেননা অতিরিক্ত প্রমাণকার হলো দাবিদার এবং তার অস্বীকারকারী হচ্ছে مُنْكِرْ এবং প্রমাণের মধ্যে দাবিদারের প্রমাণ গ্রহণযোগ্য, অস্বীকারকারীর প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।

فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَيِّنَةٌ قِيلَ لِلْمُشْتَرِى اِمَّا اَنْ تَرْضٰى بِالثَّمَنِ الَّذِى اِدَّعَاهُ الْبَائِعُ وَاِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ وَقِيلَ لِلْبَائِعِ اَنْ تَسْلِمَ مَا ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِى مِنَ الْمَبِيْعِ وَاِلَّا فَسَخْنَا الْبَيْعَ فَاِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا اِسْتَحْلَفَ الْحَاكِمُ كُلَّ وَاحِدٍ عَلٰى دَعْوَى الْاٰخَرِ وَيَبْتَدِئُ بِيَمِيْنِ الْمُشْتَرِى فَاِذَا حَلَفَا فَسَخَ الْقَاضِى الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ نَكَلَ اَحَدُهُمَا عَنِ الْيَمِيْنِ لَزِمَهُ دَعْوَى الْاٰخَرِ وَاِنِ اخْتَلَفَا فِى الْاَجَلِ اَوْ فِى شَرْطِ الْخِيَارِ اَوْ فِى اِسْتِيْفَاءِ بَعْضِ الثَّمَنِ فَلَاتَحَالُفَ بَيْنَهُمَا وَالْقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يُّنْكِرُ الْخِيَارَ وَالْاَجَلَ مَعَ يَمِيْنِهٖ وَاِنْ هَلَكَ الْمَبِيْعُ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِى الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفْ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَاَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি তাদের মধ্যে কারো কাছে প্রমাণ না থাকে, তাহলে ক্রেতাকে বলা হবে যে, হয়তো বিক্রেতার মূল্যের ওপর রাজি হয়ে যাও; অন্যথায় আমরা বেচাকেনা বাদ করে দেব। এবং বিক্রেতাকে বলা হবে যে, তুমি অতটুকু বিক্রিত মাল দিয়ে দাও, যতটকুর দাবি ক্রেতা করে, নতুবা আমরা বেচাকেনা বাদ করে দেব। সুতরাং যদি তারা রাজি না হয়, তাহলে বিচারক তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের কাছে অন্যের দাবির ওপর কসম নেবে। এবং ক্রেতার কসম থেকে শুরু করবে। যখন সে কসম খেয়ে নেবে, তখন কাজি তার বেচাকেনা বাদ করে দেবে। সুতরাং যদি তাদের মধ্য থেকে কেউ কসম থেকে অস্বীকার করে তাহলে তার ওপর দ্বিতীয় জনের দাবি আবশ্যক হয়ে যাবে। এবং যদি তারা দু'জন সময়ের ব্যাপারে অথবা শর্তে খেয়ারের ব্যাপারে অথবা কিছু মূল্য উসুল করে নেওয়ার ব্যাপারে মতানৈক্য করে। তাহলে তাদের মধ্যে কসম নেওয়া হবে না এবং খেয়ারের অস্বীকারকারী এবং সময়ের অস্বীকারকারীর কথা তার কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য। এবং যদি মাল ধ্বংস হয়ে যায়, অতঃপর মূল্যের ব্যাপারে মতভেদ করে, তাহলে শাখাইনের নিকট কসম নেওয়া হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ الخ ঃ অর্থাৎ যখন উভয়ের মধ্য থেকে কারো জন্য প্রমাণ না থাকে এবং উভয় প্রমাণ দেওয়া থেকে অক্ষম হয়, তাহলে উভয়কে এটা বলে দেওয়া হবে যে, হয়তো তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকে অন্যের দাবির ওপর রাজি হয়ে যাও, নতুবা বেচাকেনা বাদ করে দেব। কেননা উদ্দেশ্য হলো ঝগড়া মিটানো, আর তার নিয়ম এমনই।

قَوْلُهٗ وَيَبْتَدِئُ الخ ঃ এটা ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর কথা এবং এটা বিশুদ্ধও। কেননা উভয়ের মধ্য থেকে ক্রেতা অস্বীকারের মধ্যে কঠিন। কেননা সে সর্ব প্রথম মূল্যের দাবিদার।

قَوْلُهٗ فَلَاتَحَالُفَ بَيْنَهُمَا الخ ঃ কেননা তার দ্বারা বিবাহ ঠিক থাকার মধ্যে বাধা সৃষ্টি হয় না। কেননা (মা'কূদ আলাই এবং মা'কূদ বিহী) স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মতভেদ। সুতরাং এ মতানৈক্য حط এবং اِبرَاء-এর মাঝের মতানৈক্যের মতো।

قَوْلُهٗ وَاِنْ هَلَكَ الْمَبِيْعُ الخ ঃ এ অবস্থায়ও শায়খাইনের নিকট কসম নেওয়া হবে না ; বরং অস্বীকারকারীর কথা তার কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ, যুফার, শাফেয়ী, মালেক (র.)-এর নিকট উভয়ে কসম খাবে এবং عَقْد রহিত হয়ে যাবে এবং ধ্বংসিত মালের মূল্য ওয়াজিব হবে।

وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِيْ فِي الثَّمَنِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَتَحَالَفُوْنَ وَيَفْسَخُ الْبَيْعُ عَلٰى قِيْمَةِ الْهَالِكِ وَإِنْ هَلَكَ أَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَّا أَنْ يَّرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَّتْرُكَ حِصَّةَ الْهَالِكِ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَتَحَالَفُوْنَ وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ فِي الْحَيِّ وَقِيْمَةِ الْهَالِكِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَإِذَا اخْتَلَفَا الزَّوْجَانِ فِي الْمَهْرِ فَادَّعَى الزَّوْجُ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفٍ وَقَالَتْ تَزَوَّجْتَنِيْ بِأَلْفَيْنِ فَأَيُّهُمَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ وَإِنْ أَقَامَا مَعًا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَةِ وَإِنْ لَّمْ تَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَمْ يَفْسَخِ النِّكَاحَ وَلٰكِنْ يُحَكَّمُ الْمَهْرُ الْمِثْلَ فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَّ قُضِيَ بِمَا قَالَ الزَّوْجُ .

সরল অনুবাদ ঃ মূল্যের মধ্যে ক্রেতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, উভয়ে কসম খাবে এবং ধ্বংস হওয়া মালের মূল্যের ওপর বেচাকেনা বাদ হয়ে যাবে। এবং যদি দু'গোলামের মধ্য থেকে একজন ধ্বংস হয়ে যায় অতঃপর মূল্যের ব্যাপারে মতভেদ হয়, তাহলে ইমাম আযম (র.)-এর নিকট কসম নেওয়া হবে না। তবে যদি বিক্রেতা ধ্বংস হওয়া গোলামের দামের ওপর রাজি হয়ে যাবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, উভয়ে কসম খাবে এবং বেচাকেনা বাদ হয়ে যাবে জীবিত অবস্থায় এবং ধ্বংসিতের মূলের ব্যাপারে। এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এরও এই মত। এবং যদি স্বামী, স্ত্রী মোহরের ব্যাপারে মতভেদ করে, স্বামী দাবি করে যে, এক হাজার টাকায় বিয়ে করেছে এবং স্ত্রী বলল, তুমি আমার সাথে দু'হাজার টাকায় বিয়ে করেছ ; তাহলে উভয়ের যেই প্রমাণ দেখায় তার প্রমাণ গ্রহণীয় হবে। আর যদি উভয়ে প্রমাণ দেখায়, তাহলে মহিলার প্রমাণ গ্রহণযোগ্য, এবং যদি কারো কাছে প্রমাণ না থাকে, তাহলে ইমাম সাহেবের (র.) নিকট উভয়ে কসম খাবে এবং বিবাহ রহিত হবে না। কিন্তু মোহরে-মিছিলকে বিচারক বানানো হবে। এবং যদি মোহরে মিছিল এতটুকু হয়, যতটুকু স্বামী দাবি করছে, অথবা তার থেকে কম হয়, তাহলে স্বামীর কথায় ফয়সালা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَّرْضَى الخ ঃ অর্থাৎ বিক্রয়কারী ধ্বংসিত গোলামের মূল্য থেকে কিছু নেবে না। এবং তাকে এমন মনে করবে যেন সেটা মালের মধ্যে ছিল না। এবং আকদ শুধু জীবিত গোলামের ওপর ছিল। সুতরাং পুরা মূল্য জীবিত গোলামের পরিবর্তে হবে। এ অবস্থায় বিক্রয়কারী এবং ক্রয়কারী উভয়ের ওপর কসম হবে।

قَوْلُهُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ الخ ঃ মহিলার দলিল গ্রহণ হওয়া তো প্রকাশ্য। কেননা সে অতিরিক্তের দাবি করে। আর স্বামীর দলিল গ্রহণযোগ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন, কেননা স্বামী অতিরিক্তের অস্বীকারকারী। সুতরাং তার ওপর হয়তো কসম নয়তো দলিল। উত্তর এটা যে, স্বামী বাহ্যিক দাবিদার।

قَوْلُهُ لَمْ يَفْسَخْ الخ ঃ কেননা প্রত্যেকের কসম দ্বারা নামকরণের মধ্যে দাবি রহিত হয়ে যায়। সুতরাং আকদ নামকরণ ছাড়াই বাকি থেকে যাবে। আর এটা বিবাহের জন্য ক্ষতিকারক নয়। সুতরাং রহিত করার প্রয়োজন নেই কিন্তু বেচাকেনা এর উল্টা। কেননা নামকরণ না হওয়া বেচাকেনার জন্য ক্ষতিকারক নয়। কেননা ঐ অবস্থায় বেচাকেনা মূল্যবিহীন বাকি থেকে যায় এবং এমন বেচাকেনা শুদ্ধ হবে না, বিধায় রহিত হয়ে যাবে।

وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ أَوْ أَكْثَرَ قُضِيَ بِمَا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ وَإِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَكْثَرَ مِمَّا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْجُ أَوْ أَقَلَّ مِمَّا ادَّعَتْهُ الْمَرْأَةُ قُضِيَ لَهَا بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَإِذَا اخْتَلَفَا فِي الْإِجَارَةِ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَتَرَادَّا وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ الْاسْتِيفَاءِ لَمْ يَتَحَالَفَا وَكَانَ الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِي قَوْلَ الْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِيْنِهِ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَوْلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْكِتَابَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ لَا يَتَحَالَفَانِ وَتَفْسَخُ الْكِتَابَةُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا يَصْلُحُ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُمَا فَهُوَ لِلرَّجُلِ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا وَاخْتَلَفَ وَرَثَتُهُ مَعَ الْآخَرِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُدْفَعُ الْمَرْأَةُ مَا يُجَهَّزُ بِهِ مِثْلُهَا وَالْبَاقِي لِلزَّوْجِ -

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি এতটুকু হয় যতটুকু দাবি মহিলা করছে, অথবা তার থেকে বেশি হয়, তাহলে মহিলার দাবির ওপর ফয়সালা হবে। এবং যদি মোহরে মিছিল স্বামীর দাবিকৃত থেকে বেশি হয় এবং মহিলার দাবিকৃত থেকে কম হয়, তাহলে মহিলার জন্য মোহরে মিছিলের হুকুম করা হবে। এবং যদি এজারার মধ্যে চুক্তিকৃত বস্তু হস্তগত করার পূর্বে মতভেদ হয়, তাহলে কসম খেয়ে এজারা শেষ করে দেবে। আর যদি হস্তগত করার পরে মতভেদ হয়, তাহলে কসম খাবে না। এবং ভাড়া গ্রহীতার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। এবং যদি কিছু চুক্তিকৃত বস্তু হস্তগত করার পর মতভেদ হয়, তাহলে উভয়ে কসম খাবে এবং চুক্তি অবিশিষ্ট গুলোতে ভাঙ্গন হয়ে যাবে। এবং অতীতে ভাড়া গ্রহীতার কথা তার কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। এবং যদি মনিব এবং মোকাতাব কেতাবতের মালের ব্যাপারে মতানৈক্য করে, তাহলে ইমাম আযম (র.)-এর নিকট কসম খাবে না। আর সাহেবাইন বলেন, উভয়ে কসম খাবে এবং লিখিত ভঙ্গ হয়ে যাবে। চুক্তি যদি স্বামী স্ত্রী ঘরের জিনিস নিয়ে মতভেদ করে, তাহলে যা পুরুষের উপযুক্ত হবে তা পুরুষের হবে এবং যা মহিলার উপযুক্ত তা মহিলার হবে এবং যা উভয়ের উপযুক্ত তা পুরুষের হবে। সুতরাং যদি তাদের মধ্য থেকে একজন মারা যায় এবং তার ওয়ারিশগণ অন্যের সাথে মতানৈক্য করে, তাহলে যা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের উপযুক্ত, তা তাদের মধ্য থেকে যে জীবিত থাকবে তার হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, মহিলাকে ঐ জিনিস দেওয়া হবে, যা এ জাতীয় মহিলাকে উপহার হিসাবে দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট স্বামীর হবে (তার কসমের সাথে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اخْتَلَفَا الخ : অর্থাৎ যখন مُبْدَلٌ ও بَدَلٌ উভয়ের মধ্যে মতভেদ হবে। এভাবে যে, ভাড়া গ্রহীতা বলে যে, এক মাসের জন্য ভাড়া দেওয়া হয়েছে। আর ভাড়া গ্রহীতা বলে যে, দু'মাসের জন্য ভাড়া নেওয়া হয়েছে ; তবে উভয় থেকে কসম নেওয়া হবে এবং এজারা বাতিল করা হবে।

قَوْلُهُ فَسَدَ الْعَقْدُ الخ : এজন্য যে, অবশিষ্টগুলোর মধ্যে বাতিলকরণ সম্ভব। কেননা এজারা ক্রমান্বয়ে সংগঠিত হয়, সুতারাং এ ভিত্তিতে অবিশিষ্টগুলো চুক্তিকৃত বস্তু হবে এবং তা তো এখনও হস্তগত হয়নি। আর গ্রহণের পূর্বে কসম সহীহ আছে। বেচাকেনা এর উল্টা। কেননা বেচাকেনার সমস্ত অংশই চুক্তিকৃত বস্তু। সুতরাং কিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দ্বারা কসম সহীহ হবে না।

قَوْلُهُ لَمْ يَتَحَالَفَا الخ : ইমাম আযম (র.)-এর নিকট এ অবস্থায় কসম নেওয়া হবে না, বরং গোলামের কথা তার কসমের সাথে গ্রহণযোগ্য হবে। সাহেবাইন এবং আইম্মায়ে ছালাছাহ অর্থাৎ ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র.)-এর নিকট কসম নেওয়া হবে। কেননা كِتَابَتْ এটা عَقْدِ مُعَاوَضَةٌ যা বাতিল যোগ্য সুতরাং লিখিত চুক্তি বেচাকেনার মতো হয়ে গেল। এ জন্য কসম নেওয়া হবে। ইমাম আযম (র.) বলেন যে, مُعَاوَضَاتْ-এর মধ্যে পরস্পর কসম জরুরি অধিকারসমূহের অস্বীকার কারার সময় হয়, আর মোকাতাবের ওপর বদলে কেতাবত আবশ্যক নয়। কেননা সে নিজেকে অপারগ বানিয়ে সেটাকে শেষ করে দিতে পারে। সুতরাং كِتَابْ বেচাকেনার মতো হলো না। এজন্য পরস্পর কসম নেওয়া হবে না।

قَوْلُهُ فَمَا يَصْلُحُ الخ : পারিবারিক আসবাবপত্রের মধ্যে যে সব স্বামীর কাজে আসে যেমন–পাগড়ি, টুপি, হাতিয়ার, কিতাবসমূহ, ঘোড়া, লোহার পোশাক ইত্যাদির মধ্যে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য। আর যে সব আসবার স্ত্রীর ব্যবহারের যেমন– ওড়না, কামীজ, বোরকা, অলংকার ইত্যাদির মধ্যে স্ত্রীর কথা গ্রহণযোগ্য। আর যে সব আসবাবপত্র উভয়ের প্রয়োজনে আসে যেমন– প্লেট, বিছানা, টাকা-পয়সা, গোলাম-বাঁদি, চতুষ্পদ জন্তু, জমিন, বাগান ইত্যাদির মধ্যে স্বামীর কথা গ্রহণযোগ্য কারণ এগুলোর মধ্যে স্বামীর ক্ষমতা প্রয়োগ হয়।

وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ جَارِيَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ بَاعَهَا فَهُوَ ابْنُ الْبَائِعِ وَأُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ وَيُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ وَإِنِ ادَّعَاهُ الْمُشْتَرِي مَعَ دَعْوَةِ الْبَائِعِ أَوْ بَعْدَهُ فَدَعْوَةُ الْبَائِعِ أَوْلَى وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ دَعْوَةُ الْبَائِعِ فِيهِ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ لَمْ يَثْبُتِ النَّسَبُ فِي الْوَلَدِ وَلَا الْاِسْتِيلَادُ فِي الْأُمِّ وَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ فَادَّعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ فِي الْوَلَدِ وَأَخَذَهُ الْبَائِعُ وَيُرَدُّ الثَّمَنُ كُلُّهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا يُرَدُّ حِصَّةُ الْوَلَدِ وَلَا يُرَدُّ حِصَّةُ الْأُمِّ وَمَنِ ادَّعٰى نَسَبَ أَحَدِ التَّوَامَيْنِ يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا مِنْهُ ـ

সরল অনুবাদ : আর যখন কোনো ব্যক্তি বাঁদি বিক্রয় করে, অতঃপর উক্ত বাঁদি বাচ্চা প্রস্রব করে তারপর বিক্রেতা তার দাবি করে তাহলে যদি সে ছয় মাসের কমে বাচ্চা প্রসব করে যেদিন থেকে বাদিকে বিক্রয় করেছিল তাহলে বাচ্চা বিক্রেতার পিতা হবে এবং তার মা উম্মে ওয়ালাদ হবে, আর বিক্রি রহিত হয়ে যাবে এবং তার মূল্য প্রত্যাবর্তন করা হবে। আর যদি বিক্রেতার দাবির সাথে ক্রেতাও যদি দাবি করে অথবা তারপর তাহলে বিক্রেতার দাবি উত্তম হবে। আর যদি সে ছয় মাসের অধিক সময়ে বাচ্চা প্রসব করে যা দুই বৎসরের কমে হয় তাহলে বিক্রেতার দাবি গ্রহণীয় হবে না। হ্যাঁ যদি ক্রেতা তার সত্যায়ন করে দেয় তাহলে গ্রহণীয় হবে। আর যদি বাচ্চা মারা যায় এরপর বিক্রেতা বাচ্চা তার এ দাবি করে এবং তাকে ছয় মাসের কমে প্রসব করেছে তাহলে বাচ্চার মধ্যে বংশ সাব্যস্ত হবে না এবং মায়ের মধ্যেও উম্মে ওয়ালাদ হওয়া সাব্যস্ত হবেনা। আর যদি মা মারা যায় তারপর বিক্রেতা তার দাবি করে এবং তাকে ছয় মাসের কমে প্রসব করেছিল তাহলে বাচ্চার মধ্যে বংশ সাব্যস্ত হবে এবং বিক্রেতা তাকে নিয়ে নেবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, পূর্ণ মূল্য ফিরিয়ে নেবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, বাচ্চার অংশ ফিরিয়ে নেবে এবং মাতার অংশ ফিরাবে না। আর যে ব্যক্তি জমজ বাচ্চাদ্বয়ের একটার বংশের দাবি করল তাহলে উভয় বাচ্চারই বংশ তার থেকে সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا بَاعَ الرَّجُلُ جَارِيَةً الخ : এ মাসআলার মধ্যে বাচ্চা قِيَاسِ خَفِيٌّ অনুযায়ী বিক্রেতার হবে, আর বাঁদি তার উম্মে ওয়ালাদ হবে। হযরত ইমাম যুফার ও তিন্নো ইমাম বলেন, বিক্রেতার দাবি বাতিল। কিয়াসও এটাই বলে। কেননা বিক্রেতার বাঁদি বিক্রি করা এ কথার স্বীকৃতি হচ্ছে যে, সে তার উম্মে ওয়ালাদ নয়; বরং বাঁদি। সুতরাং পূর্ববর্তী স্বীকৃতি ও পরবর্তী দাবির মধ্যে বৈপরীত্ব ও প্রতিকূলতা। اِسْتِحْسَانٌ তথা قِيَاسِ خَفِيٌّ-এর কারণ এই যে, সন্তান গর্ভধারণ একটি গোপনীয় ব্যাপার। তাই পারস্পরিক প্রতিকূলতার দিকে দেখা যাবেনা, আর বিক্রেতার মালিকানা এর মধ্যে গর্ভধারণ ইহার প্রমাণ যে, বাচ্চা বিক্রেতার, কারণ ভূমিষ্ঠের ছয় মাসের কমের মধ্যে হয়েছে। যখন উল্লিখিত নিয়মে বিক্রেতার দাবি শুদ্ধ হলো। তাই এটা প্রকৃত গর্ভ ধারণের দিকে সম্বন্ধ হবে এতে বুঝা গেল যে, এটাতে উম্মে ওয়ালাদের বেচাকেনা আছে ; সুতরাং বেচাকেনা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা উম্মে ওয়ালাদের বেচাকেনা জায়েজ নেই এবং মূল্য ফিরিয়ে দেওয়া জরুরি হবে এবং ক্রয়কারীর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। চাই বিক্রয়কারীর দাবির সাথে হোক বা তার পরে হোক। কেননা বিক্রয়-কারীর দাবি এমনিতেই সাবেত আছে।

قَوْلُهُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْهُ الخ : কেননা নসবের মধ্যে বাপ আসল, সুতরাং তাকে অনুগামী তথা মা মরে যাওয়া কোনো ক্ষতি করবে না। কেননা মা তার সাথে সম্পর্কশীল বলা হয়, উম্মেওয়ালাদ এবং মা আজাদিকে বাচ্চার দিক থেকে অর্জন করে। হুযূর (সা.) বলেন, أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا সুতরাং মায়ের জন্য আজাদির হক আছে এবং বাচ্চার জন্য বাস্তবে আজাদি রয়েছে। ইমাম আযম (র.)-এর নিকট পুরা মূল্য আদায় করা এ জন্য ওয়াজিব যে, প্রকাশ হয়ে গেল যে, বাদি উম্মে ওয়ালাদ এবং ক্রয়কারীর নিকট ধ্বংস হয়ে গেছে। এবং ইমাম আযম (র.)-এর নিকট এটার জরিমানা নেই, কেননা তাঁর নিকট উম্মে ওয়ালাদের সম্পদ এটা মূল্যবান নয়, এ জন্য বিক্রয়কারী সমস্ত মূল্য ক্রয়কারীকে ফিরিয়ে দেবে।

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

সাক্ষ্যদান পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) সাক্ষ্যদান পর্বকে দাবি পর্বের পর আনার যোগসূত্র এই যে, অধিকাংশ সময় দাবির মধ্যে সাক্ষ্যদানের প্রয়োজন হয়ে থাকে। –(আততানক্বীহুয যারুরী)

شَهَادَاتٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ شَهَادَاتٌ এটা شَهَادَةٌ -এর বহুবচন। شَهِدَ এটা بَابِ سَمِعَ-এর মাসদার। شهادة অর্থ– সাক্ষ্য দেওয়া।

شَهَادَةٌ -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় شَهَادَةٌ বলা হয় বিচারের মজলিসে সত্যের খবর দেওয়া।

شَهَادَةٌ কোন শব্দ থেকে مُشْتَقٌ হয়েছে? شَهَادَةٌ কোন শব্দ থেকে مُشْتَقٌ এ প্রসঙ্গে দু'টি উক্তি রয়েছে– (ক) شَهَادَةٌ এটা مُشَاهَدَةٌ থেকে مُشْتَقٌ অর্থাৎ কোনো বস্তু স্বচক্ষে দেখা। شَهَادَةٌ – কে شَهَادَةٌ বলা হয় এ জন্য যে, شهادة তথা সাক্ষ্য স্বচক্ষে দেখে দেওয়া হয়.। (খ) شَهَادَةٌ এটা شُهُوْدٌ শব্দ থেকে مُشْتَقٌ অর্থাৎ উপস্থিত হওয়া সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তি যেহেতু বিচারকের দরবারে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে তাই উহাকে شَهَادَةٌ বলা হয়। –(তানক্বীহ)

شَهَادَةٌ-এর শর্ত ঃ شَهَادَةٌ –এর শর্ত তিনটি – (১) عَقْلِ كَامِلٌ বা পরিপূর্ণ জ্ঞান-বুদ্ধি (২) ضَبْطٌ অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ (৩) اَهْلِيَّةٌ অর্থাৎ উপযুক্ততা। – (আল জাওহারাতুন নাইয়্যেরাহ)

شَهَادَةٌ -এর سَبَبٌ কি? شَهَادَةٌ -এর سَبَبٌ হচ্ছে, দাবিকারী সাক্ষ্যদানকারীর থেকে সাক্ষ্য প্রদানের তলব করা।

شَهَادَةٌ-এর রোকন ঃ شَهَادَةٌ-এর رُكْن হচ্ছে, شَهَادَةٌ শব্দ।

شَهَادَةٌ-এর বিধান ঃ شَهَادَةٌ-এর বিধান হচ্ছে বিচারক সাক্ষ্য অনুযায়ী নির্দেশ প্রদান করা ও ফয়সালা করা। – (আল জাওহারাতুন নাইয়্যেরাহ)

কুরআনের আলোকে শাহাদাত ঃ কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে, (الاية) وَاَشْهِدُوْآ اِذَا تَبَايَعْتُمْ

অন্যত্রে এরশাদ হচ্ছে, (الاية) وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ

এ দু' আয়াতে কারীমার মধ্যে শাহাদাত-এর গুরুত্ব স্পষ্ট।

اَلشَّهَادَةُ فَرْضٌ تَلْزَمُ الشُّهُوْدَ وَلَا يَسَعُهُمْ كِتْمَانُهَا اِذَا طَالَبَهُمُ الْمُدَّعِىْ وَالشَّهَادَةُ بِالْحُدُوْدِ يُخَيَّرُ فِيْهَا بَيْنَ السِّتْرِ وَالْاِظْهَارِ وَالسِّتْرُ اَفْضَلُ اِلَّا اَنَّهُ يَجِبُ اَنْ يَّشْهَدَ بِالْمَالِ وَالسَّرَقَةِ فَيَقُوْلُ اَخَذَ الْمَالَ وَلَا يَقُوْلُ سَرَقَ وَالشَّهَادَةُ عَلٰى مَرَاتِبَ مِنْهَا الشَّهَادَةُ فِى الزِّنَا يُعْتَبَرُ فِيْهَا اَرْبَعَةٌ مِّنَ الرِّجَالِ وَلَا تُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَمِنْهَا الشَّهَادَةُ بِبَقِيَّةِ الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ تُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ وَلَا تُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنَ الْحُقُوْقِ تُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ سَوَاءٌ كَانَ الْحَقُّ مَالًا اَوْغَيْرَ مَالٍ ـ

সরল অনুবাদ ঃ সাক্ষ্য ফরজ যা সাক্ষীদাতাদের ওপর (লাজেম) জরুরি। এবং তার জন্য সাক্ষী গোপন রাখার সুযোগ নেই, যখন বাদী সাক্ষী তালাশ করে। এবং হদ সমূহের সাক্ষী গোপন রাখা আর প্রকাশ করার মধ্যে এখতিয়ার রয়েছে আর গোপন রাখাই উত্তম। কিন্তু মাল চুরিতে সাক্ষ্য দেওয়া ওয়াজিব। সুতরাং এভাবে বলবে যে, সে নিয়েছে এবং সে চুরি করছে এটা বলবে না। আর সাক্ষ্যের কয়েকটি স্তর আছে, তার থেকে একটা হলো জেনার সাক্ষ্য, যাতে চার ব্যক্তি গ্রহণযোগ্য এবং তাতে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় আর সাক্ষ্য থেকে বাকিগুলো হলো হদ এবং কেসাসের সাক্ষী যাতে দু'পুরুষের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য। এবং তাতে মহিলাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়, এবং এটা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ (অথবা) দু'জন মহিলার সাক্ষ্য চাই সে হক মাল হোক বা মাল না হোক,

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَلشَّهَادَةُ فَرْضٌ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) শাহাদাত প্রদানের বিধান বর্ণনা করছেন। শরিয়তের পরিভাষায় শাহাদাত বলা হয়, কোনো অবস্থা সম্পর্কে খবর দেওয়া, যা ধারণা দ্বারা হয় না বরং প্রত্যক্ষ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهُ اٰثِمٌ قَلْبُهُ (الاية) যদি দু'জন সাক্ষী ছাড়া তাহাম্মুল এবং সাক্ষ্য আদায়ের জন্য অন্য কেউ না থাকে, তাহলে সাক্ষী দেওয়া ফরজে আইন, নতুবা ফরজে কেফায়াহ।

قَوْلُهُ عَلٰى مَرَاتِبَ الخ ঃ সাক্ষ্যের চারটা স্তর আছে, ১ম নম্বর জেনা সাবেত করার জন্য, এর জন্য চারজন পুরুষের সাক্ষ্য প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ الخ এ আয়াতে চারজন সাক্ষীর বর্ণনা করা হয়েছে এবং তারা পুরুষ হওয়া এভাবে জানা গেল যে, اَرْبَعَةً সাথে এসেছে এবং আদদের সাথে (ة) ঐ সময় দাখেল হয়, যখন তার মাদূদ মুযাক্কার হয়। এটা ছাড়াও হযরত আলী কাররামুল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন যে, হুদূদ এবং কেসাসের মধ্যে মহিলাদের সাক্ষী জায়েজ নেই। ২য় নম্বর অন্যান্য হুদূদ সাবেত করার জন্য। অর্থাৎ মিথ্যা অপবাদ, মদ্যপান ও চুরির হুদুদ এবং কেসাসের জন্য দু'জন পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَاسْتَشْهِدُوْا بِشَهِيْدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ الخ-এর মধ্যে পুরুষের কথা বলা হয়েছে। ৩য় নম্বর অন্যান্য হুকুক সাবেত করার জন্য, চাই তা মালি হোক অথবা গায়রে মালি হোক। যেমন– বিবাহ, দুগ্ধ পান, তালাক, আজাদ, অসিয়ত, রাজয়াত, ওকালতী, নসব, এতে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলার সাক্ষীর প্রয়োজন। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ فَاِنْ لَّمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ (الاية) ৪র্থ নম্বর বেলাদাতের জন্য, বেকারাতের জন্য এবং মহিলাদের ঐ সমস্ত দোষ যেগুলো সম্পর্কে পুরুষ জানেনা ; এর জন্য দু'জন মহিলা হওয়া উত্তম। নতুবা একজন আজাদ মুসলমান মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। হাদীস শরিফে আছে যে, ঐ সমস্ত জিনিসে মহিলাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য, যেগুলোর দিকে পুরুষ দৃষ্টি করে না।

مِثْلُ النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَتُقْبَلُ فِى الْوَلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالْعُيُوْبِ بِالنِّسَاءِ فِىْ مَوْضِعٍ لَايَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ اِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَابُدَّ فِىْ ذٰلِكَ كُلِّهِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ لَّمْ يَذْكُرِ الشَّاهِدُ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ اَعْلَمُ اَوْ اَتَيَقَّنُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَقْتَصِرُ الْحَاكِمُ عَلٰى ظَاهِرِ عَدَالَةِ الْمُسْلِمِ اِلَّا فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ فَاِنَّهُ يَسْئَلُ عَنِ الشُّهُوْدِ وَاِنْ طَعَنَ الْخَصْمُ فِيْهِمْ يَسْاَلُ عَنْهُمْ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَابُدَّ اَنْ يُّسْئَلَ عَنْهُمْ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যেমন– বিবাহ, তালাক, আযাদ, ওকালতী, অছিয়ত এবং বিলাদত, কুমারিত্ব এবং মহিলাদের ঐ সমস্ত ব্যাপারে যে ব্যাপারে পুরুষের অবগতি নেই, শুধু একজন মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট। এবং এসব গুলোতে সাক্ষী ইনসাফগার হওয়া এবং 'শাহাদাত' শব্দ হওয়া জরুরি। সুতরাং যদি সাক্ষী 'শাহাদাত শব্দ উল্লেখ না করে এবং বলে যে, আমি জানি অথবা আমি বিশ্বাস করি, তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। আর ইমাম আযম (র.) বলেন যে, বিচারক মুসলমানের প্রকাশ্য ইনসাফের ওপর যথেষ্ট মনে করবে ; কিন্তু হুদূদ এবং কেসাসের মধ্যে যে, তাতে সাক্ষীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। এবং যদি বিবাদী সাক্ষীর মধ্যে অস্বীকার করে তাহলে তাদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। এবং সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, তাদের ব্যাপারে লুক্কায়িত এবং প্রকাশ্যে যাচাই করা জরুরি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَقْتَصِرُ الْحَاكِمُ الخ ঃ কেননা হাদীস শরীফে আছে যে, اَلْمُسْلِمُوْنَ عُدُوْلٌ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ اِلَّا مَحْدُوْدًا فِى قَذْفٍ অর্থাৎ মুসলমান পরস্পর বিচারক مَحْدُوْدٌ فِى الْقَذْفِ ব্যতীত। সাহেবাইন (র.) শ্রবণ কারীদের ইমাম শাফেয়ী (র.) ও ইমাম আহমদ (র.) বলেন, কাজির জন্য সাক্ষীর ইনসাফের ব্যাপারে লুক্কায়িত এবং প্রকাশ্যে মানুষ থেকে জিজ্ঞাসা করা জরুরি, চাই দাবিকৃত ব্যক্তি সাক্ষীর ওপর তিরস্কার করুক বা নাই করুক। এবং এটার ওপরই ফতোয়া।

قَوْلُهُ سِرًّا الخ ঃ লুক্কায়িত ভাবে জিজ্ঞাসার পদ্ধতি এই যে, কাজি একটা কাগজ যাকে মাসতুরা বলা হয়, যাঁচাই কারীকে দিয়ে দেবে। যার মধ্যে সাক্ষীর নাম, নসব, হুলিয়া যে মসজিদে নামাজ পড়া হয় এসব গুলো লেখা থাকবে। এ মাসতূরার ওপর যাঁচাইকারী সাক্ষীর ইনসাফগারী এভাবে লেখবে যে, সে ইনসাফী এবং জায়েজুশ শাহাদাত ; এবং যদি তার ইনসাফগারী এবং ফাসেকী জানা না থাকে, তাহলে লেখে দেবে যে, সে মাসতূরুলহাল ; এবং যদি ফাসেকী জানা থাকে তাহলে তা প্রকাশ করবে না, বরং চুপ থাকবে, যাতে মুসলমানের দোষ প্রকাশ না হয়। এবং শেষে লেখে দেবে اَللّٰهُ تَعَالٰى اَعْلَمُ (আল্লাহ তা'আলা ভালো জানেন) এবং প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করার পদ্ধতি এই যে, কাজি সাক্ষী এবং যাঁচাইকারী উভয় জনকে এক জায়গায় একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করবে যে, তুমি ইনসাফীকেই বলেছ ; এবং প্রকাশ্যে যাঁচাই এবং গোপনে যাঁচাইয়ের পরেই (সাক্ষী) গ্রহণযোগ্য হবে, যেমনটি বর্ণনা হয়েছে আবূ ইউসুফ (র.) থেকে।

وَمَا يَتَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ اَحَدُهُمَا مَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهٖ مِثْلُ الْبَيْعِ وَالْاِقْرَارِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ فَاِذَا سَمِعَ ذٰلِكَ الشَّاهِدُ اَوْ رَاٰهُ وَسِعَهُ اَنْ يَّشْهَدَ بِهٖ وَاِنْ لَّمْ يُشْهَدْ عَلَيْهِ وَيَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنَّهُ بَاعَ وَلَا يَقُوْلُ اَشْهَدَنِىْ وَمِنْهُ مَا لَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ بِنَفْسِهٖ مِثْلُ الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ فَاِذَا سَمِعَ شَاهِدًا يَشْهَدُ بِشَيْءٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ اَنْ يَّشْهَدَ عَلٰى شَهَادَتِهٖ اِلَّا اَنْ يُّشْهِدَهُ وَكَذٰلِكَ لَوْ سَمِعَهُ يُشْهِدُ الشَّاهِدَ عَلٰى شَهَادَةٍ لَمْ يَسَعْ لِلسَّامِعِ اَنْ يَّشْهَدَ عَلٰى ذٰلِكَ وَلَا يَحِلُّ الشَّاهِدُ اِذَا رَاٰى خَطَّهُ اَنْ يَّشْهَدَ اِلَّا اَنْ يَّذْكُرَ الشَّهَادَةَ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاَعْمٰى وَلَا الْمَمْلُوْكِ وَلَا الْمَحْدُوْدِ فِىْ قَذْفٍ وَاِنْ تَابَ وَلَا شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهٖ وَ وَلَدِ وَلَدِهٖ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং সাক্ষ্য যে জিনিসের তাহাম্মুল করে সেটা দু'প্রকার ঃ **১ম প্রকার ঃ** উহা যার হুকুম এমনিতেই সাবেত হয়। যেমন– বেচাকেনা, স্বীকারোক্তি, গসব, কতল এবং বিচারকের হুকুম। সুতরাং সাক্ষী যখন উহা শুনবে অথবা দেখবে, তাহলে তার জন্য তার সাক্ষী দেওয়া জায়েজ আছে, যদিও তার ওপর সাক্ষী না বানানো হয়। এবং সে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সে বিক্রি করছে, এটা বলবে না যে, আমাকে সাক্ষী বানানো হয়েছে।

২য় প্রকার ঃ উহা যার হুকুম এমনিতেই সাবেত হয় না যেমন- সাক্ষীর ওপর সাক্ষী। সুতরাং যখন কাউকেও সাক্ষী দিতে শুনা যায় তাহলে তার সাক্ষীর ওপর সাক্ষী জায়েজ নেই, কিন্তু যদি তাকে সাক্ষী বানায় (তাহলে কোনো অসুবিধা নেই)। এমনিভাবে যদি শুনে যে, সাক্ষী কারো সাক্ষ্যের ওপর সাক্ষ্য দিচ্ছে, তাহলে জন্য এই সুযোগ নেই যে, যে সে তার ওপর সাক্ষ্য দেবে। এবং সাক্ষীর জন্য জায়েজ নেই যে, সে নিজের লেখা দেখেই সাক্ষ্য দিয়ে দেবে। কিন্তু যদি তার সাক্ষ্য খুব স্মরণ থাকে। অন্ধ, গোলাম এবং মিথ্যা অপবাদের শাস্তি প্রাপ্তির সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে না যদিও তওবা করে নেয়। এবং বাপের সাক্ষ্য ছেলে ও নাতির জন্য গ্রহণযোগ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَحِلُّ الخ ঃ সাক্ষীদাতাকে নিজের লিখিত বক্তব্য দেখেও সাক্ষী দেওয়া ইমাম আযম (র.)-এর নিকট জায়েজ নাই। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ এ আয়াতে জানা শর্ত বলেছে এবং ঘটনা স্মরণ রাখা বিহীন জানার তাসাব্বুর হয় না। কিন্তু সাহেবাইনের (র.) নিকট জায়েজ আছে, শর্ত হলো লিখিত বক্তব্য তাদের কাছেই সংরক্ষিত থাকতে হবে। দাবিকৃত ব্যক্তির হাতে না যেতে হবে, নতুবা জায়েজ নেই।

قَوْلُهُ شَهَادَةُ الْاَعْمٰى الخ ঃ ইমাম মালেক (র.)-এর নিকট মতলকান গ্রহণযোগ্য। কেননা সাক্ষী জায়েজ হওয়া বেলায়েত এবং আদালতের দিক দিয়ে হয়। এবং অন্ধ হওয়া তার জন্য ক্ষতি নাই। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, যদি সে তাহাম্মুলে শাহাদাতের সময় ভালো থাকে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। তরফাইন ও ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর মতের কারণ এই যে, সাক্ষী আদায়ের জন্য মশহুদ লাহু অর্থাৎ যার জন্য সাক্ষ্য দেওয়া হয় এবং মশহুদ আলাই অর্থাৎ যার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয় এর মাঝে ইশারার সাথে পার্থক্য করা প্রয়োজন। এবং অন্ধ ব্যক্তি ইশারা দিয়ে পার্থক্য করতে পারে না, সেতো শুধু আওয়াজ দ্বারা পার্থক্য করতে পারে। তাহলে তো খুব সম্ভব যে, (দুশমন) শত্রু তার ফায়দা অনুযায়ী তাকে শিক্ষা দিয়ে দেবে কেননা কয়েকটি আওয়াজ পরস্পর এক রকম হয়ে যায়, এ জন্য (তার) অন্ধের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়।

وَلَا شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِاَبَوَيْهِ وَلَا اَجْدَادِهٖ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ اِحْدَى الزَّوْجَيْنِ لِلْاٰخَرِ وَلَاشَهَادَةُ الْمَوْلٰى لِعَبْدِهٖ وَلَا لِمُكَاتَبِهٖ وَلَا شَهَادَةُ الشَّرِيْكِ لِشَرِيْكِهٖ فِيْمَا هُوَ مِنْ شِرْكَتِهِمَا وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِاَخِيْهِ وَعَمِّهٖ وَلَاتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُخَنَّثٍ وَلَا نَائِحَةٍ وَلَا مُغَنِّيَةٍ وَلَا مُدْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهْوِ وَلَا مَنْ يَّلْعَبُ بِالطُّيُوْرِ وَلَا مَنْ يُغَنِّىْ لِلنَّاسِ وَلَا مَنْ يَّأْتِىْ بَابًا مِنَ الْكَبَائِرِ الَّتِىْ يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحُدُوْدُ وَلَا مَنْ يَّدْخُلُ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ اِزَارٍ وَلَامَنْ يَأْكُلُ الرِّبٰوا وَلَا الْمُقَامِرِ بِالنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ وَلَا مَنْ يَّفْعَلُ الْاَفْعَالَ الْمُسْتَخْفَفَةِ كَالْبَوْلِ عَلَى الطَّرِيْقِ وَالْاَكْلِ عَلَى الطَّرِيْقِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ ছেলের সাক্ষ্য পিতার মাতা-দাদা দাদীর জন্য এবং স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একজনের সাক্ষ্য অন্যের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এবং মনিবের সাক্ষ্য গোলাম এবং মুকাতাবের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়। এবং দু'শরিকের একজনের সাক্ষী অন্যজনের জন্য গ্রহণযোগ্য নয়, ঐ জিনিসের মধ্যে যা তাদের শিরকতে আছে। এবং মানুষের সাক্ষী নিজের ভাই এবং চাচার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে। মোখান্নাছ, শোক পালনকারী, গান-বাদ্যকারী এবং অযথা খেলাধুলা করে মদ্যপানকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এবং পাখি শিকারকারীর সাক্ষ্য এবং ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য যে মানুষের, গানবাদ্য করে গ্রহণযোগ্য নয়। এবং ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় যে, এমন কবীরা গুনাহ করে, যার দ্বারা হদ সম্পৃক্তি হয়। এবং ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় যে পোষাকবিহীন গোসল খানায় প্রবেশ হয়। এবং ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় যে ঘুস খায়। এবং ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় যে নরদ অর্থাৎ দাবার মতো এক প্রকার খেলা ও দাবার ছক দ্বারা খেলে। এবং ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য নয় যে অসম্মানিত এবং নির্লজ্জ কাজ করে, যেমন– রাস্তায় পেশাব করা এবং রাস্তায় খাওয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ شَهَادَةُ مُخَنَّثٍ الخ ঃ মুখান্নাছ ঐ ব্যক্তিকে বলে যে কথা এবং কাজে মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য হয়ে যায়। ফে'লি মোসাবাহাত অর্থাৎ কাজের দিকে দিয়ে সাদৃশ্যতা এই যে, তার গুহ্যদ্বার অর্থাৎ পিছনের রাস্তা আছে। আর কউলি মোসাবাহাত অর্থাৎ কথার দিক দিয়ে এই যে, সে মহিলাদের মতো নরম কথাবার্তা ও মিষ্ট কথা বলে, তাহলে তাদের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তারা লানতকৃত ফাসেক। এবং হাদীস শরীফে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা লা'নত করে পুরুষদের মধ্যে মুখান্নাছদের ওপর এবং মহিলাদের মধ্যে তাদের ওপর যারা পুরুষদের সাথে মোসাবাহাত এখতিয়ার করে। হ্যাঁ যদি কোনো ব্যক্তি জন্ম থেকে এমন হয় যে, তার ভাষা নরম এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে কোমলতা হয়, কিন্তু সে খারাপ কাজ করেনি, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এটা নিজ ইচ্ছায় নয়।

قَوْلُهٗ نَائِحَةٍ الخ ঃ অর্থাৎ নোহাঘুর, মুর্দার ওপর বিঁবিঁ করে ক্রন্দনকারিনী যে অন্যের মসিবতে মূল্য নিয়ে কাঁদে। তার সাক্ষীও গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা হাদীস শরীফে আছে–

عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّوْتَيْنِ الْاَحْمَقَيْنِ النَّائِحَةِ وَالْمُغَنِّيَةِ

مُغَنِّيَة (মোগান্নিয়াহ) অর্থ– বাদ্যগানকারী। মোকামের অর্থ– জুয়াবাজ। নরদ এবং সতরনজ দু'টি খেলার নাম। মোসতাখাফিফাহ অর্থ– নিকৃষ্ট ও অপমান জনক কাজ। খেতাবিয়াহ একটি রওয়াফেজ গোষ্ঠীর নাম। "আলাম্মা" আলমাম থেকে অর্থাৎ ছোট গুনাহসমূহ করা। "আকলাক" অর্থ– যার খতনা করা হয়নি। "খাসি" অর্থ– খাশীকৃত এবং মোখান্নাছ অর্থ– হিজড়া।

وَلَاتُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ اِلَّا الْخَطَابِيَّةَ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ اَهْلِ الذِّمَّةِ بَعْضِهِمْ عَلٰى بَعْضٍ وَاِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ وَلَاتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْحَرْبِيِّ عَلَى الذِّمِّيِّ وَاِنْ كَانَتِ الْحَسَنَاتُ اَغْلَبُ مِنَ السَّيِّاتِ وَالرَّجُلُ مِمَّنْ يَّجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَاِنْ اَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ الْاَقْلَفِ وَالْخَصِيِّ وَ وَلَدِ الزِّنَا وَشَهَادَةُ الْخُنْثٰى جَائِزَةٌ وَاِذَا وَافَقَتِ الشَّهَادَةُ الدَّعْوٰى قُبِلَتْ وَاِنْ خَالَفَتْهَا لَمْ تُقْبَلْ وَيُعْتَبَرُ اِتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِى اللَّفْظِ وَالْمَعْنٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنْ شَهِدَ اَحَدُهُمَا بِاَلْفٍ وَالْاٰخَرُ بِاَلْفَيْنِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ (رح) وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى تُقْبَلُ بِاَلْفٍ وَاِنْ شَهِدَ اَحَدُهُمَا بِاَلْفٍ وَالْاٰخَرُ بِاَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَالْمُدَّعِىْ يَدَّعِىْ اَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا بِاَلْفٍ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্যও গ্রহণযোগ্য হবে না যে পূর্ব পুরুষদেরকে খারাপ বলে। এবং বিদাআতীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে, ফেরকায়ে খতাবিয়াহ ছাড়া। এবং জিম্মিদের সাক্ষ্য তাদের মধ্যে পরস্পরে গ্রহণযোগ্য হবে, যদিও তাদের ধর্ম ভিন্ন হয়। এবং কাফিরদের সাক্ষ্য জিম্মিদের ওপর গ্রহণযোগ্য নয়। এবং যদি কারো ভালো কাজ খারাপ কাজের ওপর প্রাধান্য হয় এবং কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য যদিও সে সগিরা (ছোট) গুনাহ করে। এবং যাকে সুন্নতী করা হয়নী, খাশী ও হারামজাদা এদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এবং খুনছার সাক্ষ্য জায়েজ আছে। এবং যখন সাক্ষ্য দাবি অনুযায়ী পাওয়া যাবে, তাহলে গ্রহণ করা হবে এবং যদি মোখালেফ হয়, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং সাক্ষীদের শব্দ এবং অর্থ এক হওয়া জরুরি ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি এক হাজারের সাক্ষ্য দিল এবং অন্যরা দু' হাজারের, তাহলে ইমাম আযম (র.)-এর নিকট উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং সাহেবাইন (র.) বলেন যে, এক হাজারের ব্যাপারে সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে। এবং যদি একজনে এক হাজারের সাক্ষ্য দিল এবং অন্যজনে পনেরো শত এর সাক্ষ্য দেয়, এবং দাবিকারী পনেরো শত টাকা দাবি করছে, তাহলে তার সাক্ষ্য এক হাজারের সাথে গ্রহণ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ شَهَادَةُ اَهْلِ الْاَهْوَاءِ الخ ঃ এটা দ্বারা উদ্দেশ্য জাবরিয়া, কদরিয়া, মারজিয়া, রাওয়াফেজ, খাওয়ারেজ, আহলে তাসবিহ ইত্যাদি। তাদের সাক্ষ্য মতলকান গ্রহণযোগ্য হবে। চাই আহলে সুন্নত-এর ওপর হোক অথবা তাদের মধ্যে একে অন্যের ওপর হোক, শর্ত হলো তাদের বিশ্বাস কুফরি পর্যন্ত না পৌছে। এটা ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা তাদের মধ্যে ফাসেকী খুব (কঠিন) শক্ত। আহনাফ (হনাফী মাযহাব) বলেন যে, তাদের ফাসেকী বিশ্বাসের দিক দিয়ে, কাজের দিক দিয়ে নয়। এবং বিশ্বাসের দিক দিয়ে ফাসেকী মিথ্যা অপবাদের যোগ্য নয়। পক্ষান্তরে কাজের দিক দিয়ে ফাসেকী সে মিথ্যা অপবাদের যোগ্য তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। এবং "খাতাবিয়াহ" যারা রাওয়াফেজদের মধ্যে একটা দল তাদের সাক্ষ্য মিথ্যা অপবাদের যোগ্য হওয়ার দরুন গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا الخ ঃ কেননা উভয় সাক্ষ্য শব্দের দিক দিয়ে এবং অর্থের দিক দিয়ে মুখতালেফ। কেননা শব্দ اَلْف দ্বারা অর্থাৎ এক হাজার দ্বারা اَلْفَيْن-এর অর্থাৎ দু'হাজারের তাবির করা যায় না।

قَوْلُهُ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُمَا الخ ঃ কেননা اَلْف একহাজার اَلْفَيْن দু'হাজারের মধ্যে দাখেল আছে, সুতারাং উভয় সাক্ষী اَلْف এক হাজারের ওপর একমত হয়েছে, এ হুকুম ঐ সময় যখন দাবিকারী اَلْفَيْن দু'হাজারের দাবি করে। কিন্তু যখন اَلْف এক হাজারের দাবি করে, তাহলে সকলের ঐক্যমত্যে গ্রহণ যোগ্য হবেনা।

وَإِذَا شَهِدَا بِأَلْفٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسَ مِائَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا بِأَلْفٍ وَلَمْ يُسْمَعْ قَوْلُهُ إِنَّهُ قَضَاهُ مِنْهَا خَمْسَ مِائَةٍ إِلَّا أَنْ يَّشْهَدَ مَعَهُ آخَرُ وَيَنْبَغِي لِلشَّاهِدِ إِذَا عَلِمَ ذٰلِكَ أَنْ لَّا يَشْهَدَ بِأَلْفٍ حَتّٰى يُقِرَّ الْمُدَّعِي أَنَّهُ قَبَضَ خَمْسَ مِائَةٍ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ زَيْدًا قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَا آخَرَانِ أَنَّهُ قَتَلَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْكُوفَةِ وَاجْتَمَعُوْا عِنْدَ الْحَاكِمِ لَمْ يُقْبَلِ الشَّهَادَتَيْنِ فَإِنْ سَبَقَتْ إِحْدٰهُمَا وَقَضَا بِهَا ثُمَّ حَضَرَتِ الْأُخْرٰى لَمْ تُقْبَلْ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلٰى جَرْحٍ وَلَا نَفْيٍ وَلَا يَحْكُمُ بِذٰلِكَ إِلَّا مَا اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوْزُ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَّشْهَدَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَايِنْهُ إِلَّا النَّسَبَ وَالْمَوْتَ وَالنِّكَاحَ وَالدُّخُوْلَ وَ وَلَايَةَ الْقَاضِيْ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ أَنْ يَّشْهَدَ بِهٰذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا أَخْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَّثِقُ بِهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি দু'জন এক হাজার টাকার সাক্ষ্য দেয় এবং একজন বলে যে, তার থেকে পাঁচশ দেওয়া হয়েছে। তাহলে তাদের সাক্ষ্য এক হাজারের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। এবং তাদের এ কথা শুনা যাবেনা যে, পাঁচশ আদায় হয়েছে। হ্যাঁ যদি তাদের সাথে অন্য একজন সাক্ষী দেয়। এবং সাক্ষ্যদাতার জন্য উচিত যে, সে যদি এটা জানে (যে পাঁচশ আদায় হয়েছে) এক হাজারের সাক্ষ্য না দেওয়া, যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচশ উসুল করার স্বীকার করে। এবং যদি দু'সাক্ষীদাতা সাক্ষী দেয় যে, যায়েদ কুরবানি ঈদের দিন মক্কাতে তাকে কতল করেছে এবং অন্য দু'জন সাক্ষী দিল যে, কুরবানির ঈদের দিন "কুফাতে" তাকে কতল করেছে এবং এরা সবাই বিচারকের নিকট জমা হলো, তাহলে বিচারক উভয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। সুতরাং যদি একজনের সাক্ষী প্রথমে হয়ে যায়, এবং তার ওপর হুকুমও হয়ে যায়, অতঃপর দ্বিতীয় জনের সাক্ষী এলো, তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং কাজি (বিচারক) মিথ্যা প্রতিপাদন ও অস্বীকৃতির সাক্ষ্য শুনবে না এবং তার ওপর হুকুমও জারি করবে না। হ্যাঁ যার অধিকার সাব্যস্ত হয়ে যায় (বিচারক তার অধিকার দিয়ে দেবে)। এবং সাক্ষ্যের জন্য এটা জায়েজ নেই যে, সে না দেখা জিনিসের সাক্ষ্য দেবে, নসব, মৃত্যু, বিবাহ, সহবাস এবং বেলায়েতে কাজি এগুলো ব্যতীত। কেননা এগুলোতে দেখা বিহীন সাক্ষ্য দিতে পারবে যখন কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি তাকে ঐ সমস্ত জিনিসের খবর দিয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ قَضَاهُ مِنْهَا الخ ঃ এ অবস্থায় এক হাজারের ব্যাপারে উভয়ের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা এর ওপর উভয়ে একমত। এবং একজন সাক্ষীর এটা বলা শুনা যাবেনা যে, সে পাঁচশ উসুল করে নিল। কেননা এটা একটি মোস্তাকেল সাক্ষ্য। এবং সাক্ষী শুধু একটি এবং একজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। হ্যাঁ যদি দ্বিতীয় জনও সে অনুযায়ী সাক্ষ্য দেয়; তাহলে গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهُ اَنْ زَيْدًا قَتَلَهُ الخ ঃ এ সুরতে বিচারক উভয় জনের সাক্ষ্য বাদ দিয়ে দেবেন। কেননা তাদের মধ্য থেকে একজন সাক্ষী অবশ্যই মিথ্যাবাদী, কেননা একজন ব্যক্তি একবার দু'জায়গায় কতল করতে পারে না। এবং তাদের মধ্যে থেকে কাউকেও প্রাধান্য দেওয়া যায় না। সুতরাং উভয়ে বাদ পড়ে যাবে। আর যদি তাদের মধ্য থেকে এক সাক্ষ্য আগে হয়, যার ব্যাপারে বিচারক ফয়সালা দিয়েছেন, অতঃপর দ্বিতীয়জন দিয়েছে, তাহলে এ দ্বিতীয় সাক্ষী বাদ যাবে। কেননা প্রথম সাক্ষী ফয়সালার সাথে মিলার কারণে প্রাধান্য পেয়ে গেছে, তা এখন দ্বিতীয় সাক্ষী দ্বারা ভঙ্গ হবে না।

قَوْلُهُ عَلٰى جَرْحٍ الخ ঃ এখানে جَرْح দ্বারা উদ্দেশ্য হলো جَرْحٍ مُجَرَّدٍ অর্থাৎ ঐ ফাসেকী প্রকাশ করা যা আল্লাহর হক এবং বান্দার হক সাব্যস্ত করা থেকে খালি, এবং উহার ওপর مَشْهُوْد عَلَيْه অর্থাৎ যার বিপক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে তার থেকে ঝগড়াকে প্রতিহত করা উদ্দেশ্য হয় না। সুতরাং যে সাক্ষ্য শুধু মিথ্যা প্রতিপাদনের ওপর হবে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা সাক্ষী হুকুমের কারণে গ্রহণযোগ্য হয়, তাই شُهُوْدِيه হুকুমের অধীনস্থে দাখিল হওয়া জরুরি। আর فِسْق (পাপ) হুকুমের অধীনস্থে দাখিল নয়, কারণ হুকুম অভিযোগ ও দোষারোপ হয়ে থাকে এবং কাজি কারো ওপর ফিসক লাজেম করতে পারবে না। কেননা ফাসেক তওবা করে ফিসককে দূর করতে পারে। এ জন্য কাজি শুধু মিথ্যা প্রতিপাদনের ওপর সাক্ষী শুনবে না এবং তার সাক্ষীও শুনবে না।

قَوْلُهُ لَمْ يُعَايِنْهُ الخ ঃ যে জিনিসের ইলম স্বচোখে হাসেল না হয়, তার সাক্ষ্য দেওয়া সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ নেই। কিন্তু দশ মাসআলায় স্বচোখে দেখাবিহীন সাক্ষ্য দেয়া জায়েজ আছে। যখন কোনো এমন ব্যক্তি তার কাছে বর্ণনা করে যার ওপর তার ভরসা হয়, (১) নসব (২) মউত (৩) নেকাহ (৪) দুখুল (সহবাস) (৫) বেলায়েতে কাজি (৬) ওয়াকফ (৭) আজাদিয়াত (৮) ওয়ালা (৯) মোহর (১০) ওয়াকফ-এর শর্তাবলী। প্রকাশ থাকে যে, উপরোল্লিখিত বিষয়ে চোখে না দেখে শুধু বিশ্বস্ত ব্যক্তিবর্গ থেকে শুনলেই সাক্ষ্য দিতে পারার কারণ এই যে, এসব ব্যাপার সাধারণত বিশেষ ব্যক্তি বর্গগণের সামনেই হয়ে থাকে, জনসাধারণ সেখানে উপস্থিত থাকে না। এখন যদি এ সবের ব্যাপারে স্বচক্ষে দেখা জরুরি করা হয় তবে অসংখ্য অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে।

وَالشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فِى كُلِّ حَقٍّ لَايَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ وَلَاتُقْبَلُ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَيَجُوزُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ وَصِفَةُ الْاِشْهَادِ اَنْ يَّقُوْلَ شَاهِدُ الْاَصْلِ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ اِشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِىْ اَنِّىْ اَشْهَدُ اَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ اَقَرَّ عِنْدِىْ بِكَذَا وَاَشْهَدَنِىْ عَلَى نَفْسِهٖ وَاِنْ لَمْ يَقُلْ اَشْهَدَنِىْ عَلَى نَفْسِهٖ جَازَ وَيَقُوْلُ شَاهِدُ الْفَرْعِ عِنْدَ الْاَدَاءِ اَشْهَدُ اَنَّ فُلَانًا اَشْهَدَنِىْ عَلَى شَهَادَتِهٖ اَنَّهٗ يَشْهَدُ اَنَّ فُلَانًا اَقَرَّ عِنْدَهٗ بِكَذَا وَقَالَ لِىْ اِشْهَدْ عَلَى شَهَادَتِىْ بِذٰلِكَ فَاَنَا اَشْهَدُ بِذٰلِكَ وَلَاتُقْبَلُ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الْفَرْعِ اِلَّا اَنْ يَّمُوْتَ شُهُوْدُ الْاَصْلِ اَوْ يَغِيْبُوْا مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اَوْ يَمْرَضُوْا مَرَضًا لَايَسْتَطِيْعُوْنَ مَعَهٗ حُضُوْرَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ -

সরল অনুবাদ : সাক্ষীর ওপর সাক্ষ্যদেওয়া প্রত্যেক ঐ ব্যাপারে জায়েজ আছে, যা সন্দেহ দ্বারা সাকেত হয় না। এবং হুদূদ এবং কেসাসের মধ্যে গ্রহণ করা হবে না। এবং দু'জন সাক্ষ্যের সাক্ষীর ওপর দু'জন সাক্ষ্যের সাক্ষী দেওয়া জায়েজ আছে। এবং একজনের সাক্ষ্য একজন সাক্ষীর ওপর গ্রহণযোগ্য নয়। এবং সাক্ষী বানানোর নিয়ম এই যে, আসল সাক্ষী (নকল) ফরা সাক্ষীর সাথে বলবে যে, তুমি আমার সাক্ষ্যের ওপর হয়ে যাও, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুকের ছেলে অমুক আমার সামনে এত দেবার স্বীকার করেছে, এবং আমাকে নিজের নফসের ওপর সাক্ষী নিয়েছে এবং যদি اَشْهَدَنِىْ عَلَى نَفْسِهٖ আমাকে নিজের নফসের ওপর সাক্ষী বানিয়েছে না বলে, তখনও জায়েজ। এবং নকল সাক্ষী সাক্ষ্য দেবার সময় বলবে যে, আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, অমুকে আমাকে নিজের সাক্ষীর ওপর সাক্ষী বানিয়েছে। সে সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, অমুকে তার কাছে এত দেবার স্বীকার করেছে। এবং আমাকে বলল যে, তুমি আমার সাক্ষ্যের ওপর সাক্ষ্য দিবে, সুতরাং আমি তার সাক্ষী দিচ্ছি। এবং নকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় : কিন্তু যদি আসল সাক্ষী মারা যায়, অথবা তিনদিন বা এর চেয়েও বেশি দিনের দূরত্বে অনুপস্থিত হয়, অথবা এত অসুস্থ হয় যে, যার কারণে বিচারকের মজলিসে উপস্থিত হতে পারে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ جَائِزَةٌ : কিয়াসের দিক দিয়ে সাক্ষীর ওপর সাক্ষ্য দেওয়া জায়েজ নেই। কেননা সাক্ষী শরীরিক ইবাদত। এবং শারিরিক ইবাদতে প্রতিনিধি করা হয় না ; কিন্তু যখন সাক্ষ্য থেকে অক্ষম হয়ে যায় এখন যদি নকল সাক্ষী জায়েজ না হয় তাহলে বহু হক নষ্ট হয়ে যাবে। তবে হুদূদ এবং কেসাসের ব্যাপারে জায়েজ নেই, কেননা উহাতে প্রতিনিধি করলে সন্দেরহের সম্ভাবনা আছে, এবং হুদূদ ও কেসাস সামান্য সন্দেহ দ্বারা বাদ হয়ে যায়। আইম্মায়ে ছালাছাহ-এর নিকট তাতে গ্রহণযোগ্য হবে।

قَوْلُهٗ وَيَجُوزُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ الخ : আহনাফের নিকট দু'জন সাক্ষ্যদাতার সাক্ষ্যের ওপর অন্য দু'জন সাক্ষীদাতার সাক্ষ্য জায়েজ এবং গ্রহণযোগ্য। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট চারজন সাক্ষী হওয়া জরুরি। কেননা ফরায়ের প্রত্যেক দু'জন সাক্ষী আসলের একজন সাক্ষীর স্থলাবিষিক্ত, আমাদের দলিল হযরত আলী (রা.)-এর উক্তি।

فَإِنْ عَدَلَ شُهُوْدُ الْاَصْلِ شُهُوْدَ الْفَرْعِ جَازَ وَإِنْ سَكَتُوْا عَنْ تَعْدِيْلِهِمْ جَازَ وَيَنْظُرُ الْقَاضِىْ فِىْ حَالِهِمْ وَإِنْ اَنْكَرَ شُهُوْدُ الْاَصْلِ الشَّهَادَةَ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَةُ شُهُوْدِ الْفَرْعِ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ شَاهِدِ الزُّوْرِ اُشَهِّرُهُ فِى السُّوْقِ وَلَا اُعَزِّرُهُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى نُوْجِعُهُ ضَرْبًا وَنَحْبِسُهُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং যদি নকল সাক্ষী আসল সাক্ষীকে আদেল বানায়, তাহলে এটা জায়েজ আছে। এবং যদি তাকে আদেল বানানো থেকে চুপ থাকে তাহলে এটাও জায়েজ আছে। এখন কাজি তাদের অবস্থা নিয়ে গবেষণা করবে। এবং যদি আসল সাক্ষী সাক্ষ্যের অস্বীকার করে, তাহলে নকল সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হবে না। এবং ইমাম আযম (ইমাম আবূ হানীফা) (র.) মিথ্যা সাক্ষীর ব্যাপারে বলেন যে, আমি বাজারে তাকে প্রসিদ্ধ করে দেব এবং তাকে শাস্তি দিব না। সাহেবাইন ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) উভয়ে বলেন, আমরা তাকে খুব শাস্তি দেব এবং তাকে বন্দি করে রাখব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ عَدَلَ الخ ঃ নকল সাক্ষীর تَعْدِيْل আসল সাক্ষীর ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা সে বিচারক মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। আর যদি সে চুপ থাকে তবুও তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য। এখন কাজি আসল সাক্ষীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা সাক্ষ্য ইনসাফবিহীন গ্রহণযোগ্য হয় না। এবং যখন তারা تَعْدِيْل করেননি তাহলে যেমন নাকি তাদের পক্ষ থেকে সাক্ষ্য বর্ণনা করা হয়নি। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট নকল সাক্ষীর ওপর শুধু সাক্ষ্য বর্ণনা করা ওয়াজিব, তাদীল ওয়াজিব নয়। এ জন্য কাজি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে।

قَوْلُهُ اُشَهِّرُهُ فِى السُّوْقِ الخ ঃ ঘোষণা করার নিয়ম কাজি শুরাই (র.) থেকে এভাবে বর্ণিত আছে যে, আসরের সময় মিথ্যা সাক্ষীদাতাকে বাজার ওয়ালাদের দিকে যদি বাজারি হয়, নতুবা তার সম্প্রদয়ের দিকে যদি সে বাজারি না হয় পাঠিয়ে এটা বলতেন যে, কাজি শুরাইহ তোমাদেরকে সালাম বলেছেন এবং এটা বলেছেন যে, আমরা তাকে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা পেয়েছি। সুতরাং তোমরা নিজেরাও তাকে ভয় করো, এবং অন্যদেরকেও তার থেকে ভয় দেখাও। প্রকাশ থাকে যে, পুরুষ ও মহিলা মিথ্যা সাক্ষ্যের বিধানে বরাবর অর্থাৎ উভয়ের বিধানই এক।

بَابُ الرُّجُوْعِ عَنِ الشَّهَادَةِ

সাক্ষ্য রুজু (থেকে প্রত্যাবর্তন) করা অধ্যায়

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) সাক্ষ্য রুজু করার অধ্যায়কে সাক্ষ্যদান পর্বের পর আনার কারণ প্রকাশ্য। কেননা প্রথম সাক্ষ্য দেয়া হয় তারপর তা রুজু করা হয়।

সাক্ষ্য রুজু করার বিধান ঃ সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করা শরিয়তে জায়েজ আছে, কারণ এতে কবীরা গুনাহ-এর শাস্তি থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

رُجُوْعٌ عَنِ الشَّهَادَةِ-এর **রোকন ঃ** সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করার রোকন হলো সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তি এ কথা বলা– رَجَعْتُ مِمَّا شَهِدْتُ بِهٖ অর্থাৎ আমি যে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছি তা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম, বা এরূপ বলা شَهِدْتُ بِزُوْرٍ فِيْمَا شَهِدْتُ بِهٖ অর্থাৎ আমি যে ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছি তা মিথ্যা সাক্ষ্য।

رُجُوْعٌ عَنِ الشَّهَادَةِ–এর **শর্ত ঃ** সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করার শর্ত এই যে, এটা বিচারকের সম্মুখে হতে হবে।

মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর বিধান ঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারী চাই তার সাক্ষ্যনুযায়ী বিচারক ফয়সালা করার পূর্বে সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন করুক বা বিচারের পরে প্রত্যাবর্তন করুক উভয় অবস্থায়ই تَعْزِيْر-এর উপযুক্ত। হ্যাঁ যদি তার সাক্ষ্যানুযায়ী ফয়সালার পর প্রত্যাবর্তন করে এবং যে সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছে তা মাল হয় অথচ সে তা বদলা দেওয়া ব্যতীত দূরীভূত করল এ ক্ষেত্রে تَعْزِيْر-এর সাথে সাথে মিথ্যা সাক্ষ্য দানকারীর ওপর ক্ষতিপূরণ দেওয়া জরুরি।– (আল মোসতাসফা প্রমুখ)

إِذَا رَجَعَ الشُّهُوْدُ عَنْ شَهَادَتِهِمْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا سَقَطَتْ شَهَادَتُهُمْ وَلَاضَمَانَ عَلَيْهِمْ فَاِنْ حُكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوْا لَمْ يَفْسَخِ الْحُكْمُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِمْ ضِمَانُ مَا اَتْلَفُوْهُ بِشَهَادَتِهِمْ

সরল অনুবাদ ঃ যখন সাক্ষীদাতা তার সাক্ষ্য থেকে হুকুমের আগে ফিরে যায়, তাহলে তার সাক্ষ্য বাদ হয়ে যাবে এবং তার ওপর জরিমানা আসবে না। সুতরাং যদি তার সাক্ষী অনুযায়ী হুকুম করে ফেলে তারপর ফিরে গেল তাহলে হুকুম বাদ হবে না এবং তার ওপর তার জরিমানা ওয়াজিব হবে, যাকে তারা তাদের সাক্ষ্য দ্বারা নষ্ট করে ফেলছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اِذَا رَجَعَ الشُّهُوْدُ الخ **ঃ** সাক্ষ্য থেকে প্রত্যাবর্তন সহীহ হওয়ার জন্য কাজির মজলিস শর্ত। কেননা সাক্ষী থেকে ফিরে যাওয়া মানে সাক্ষীকে বাতেল করা। সুতরাং যেমনিভাবে সাক্ষ্যের বহাল থাকার জন্য কাজির মজলিস জরুরি, এমনিভাবে সাক্ষ্য বাতিল করার জন্যও কাজির মজলিস জরুরি। এখন যদি দু'জন সাক্ষী কাজির ফয়সালার আগে রুজু করে নেয়, তাহলে সাক্ষী বাদ বলে গণ্য হবে এবং কাজি তার ওপর কোনো হুকুম করবে না। যখন কাজির পক্ষ থেকে কোনো হুকুম না হয়, তাহলে উভয় সাক্ষীর কোনো জরিমানা আসবে না। কেননা তারা মোদ্দায়ি অথবা মোদ্দ'আলাহির কোনো জিনিস নষ্ট করেনি। এবং যদি কাজির ফয়সালার পরে রুজু করে, তাহলে কাজির ফয়সালা বাদ হবে না। কেননা সত্যের ওপর দালালত করার দিক দিয়ে দ্বিতীয় খবর প্রথম খবরের মতো। এবং প্রথম খবর ফয়সালার সাথে একসাথ হয়েছে, সুতরাং কাজির ফয়সালা বাদ হয় না ; বরং সাক্ষীরা মশহুদ আলাইহির যে মাল নষ্ট করেছে, তার জরিমানা দিবে।

وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ اِلَّا بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ وَاِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِمَالٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهٖ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الْمَالَ لِلْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ وَاِنْ رَجَعَ اَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ وَاِنْ شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةٌ فَرَجَعَ اَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَاِنْ رَجَعَ اٰخَرُ ضَمِنَ الرَّاجِعَانِ نِصْفَ الْمَالِ وَاِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَّامْرَأَتَانِ فَرَجَعَتْ اِمْرَأَةٌ ضَمِنَتْ رُبْعَ الْحَقِّ وَاِنْ رَجَعَتَا ضَمِنَتَا نِصْفَ الْحَقِّ وَاِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشَرُ نِسْوَةٍ فَرَجَعَ ثَمَانُ نِسْوَةٍ مِنْهُنَّ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ -

সরল অনুবাদ ঃ রুজু করা সহীহ নয়, কিন্তু হাকিমের সামনে। এবং যখন দু'জন সাক্ষী মালের সাক্ষী দেয় এবং বিচারক সে অনুযায়ী হুমুম করে দিল তার পরে সে ফিরে গেল, তাহলে উভয়জন মশহুদ আলাইহি-এর জন্য মালের জিম্মাদার হবে। যদি তাদের মধ্য থেকে একজন ফিরে যায়, তাহলে অর্ধেকের জামেন হবে। এবং যদি তিনজন ব্যক্তি মালের সাক্ষী দেয় এবং একজন ফিরে যায়, তাহলে তার জেমান আসবে না। যদি আরেকজন ফিরে যায়, তাহলে উভয়জন অর্ধেকের জামেন হবে। এবং যদি একজন পুরুষ এবং দু'জন মহিলা সাক্ষী দেয় এবং একজন মহিলা ফিরে যায়, তাহলে সে চতুর্থাংশের জামেন হবে। এবং যদি দু'জন মহিলা ফিরে যায়, তাহলে উভয়জন অর্ধেকের জামিন হবে। এবং যদি একজন পুরুষ এবং দশজন মহিলা সাক্ষী দেয় এবং তাদের মধ্য থেকে আটজন মহিলা ফিরে যায়, তাহলে তাদের ওপর জেমান নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ لِلْمَشْهُوْدِ عَلَيْهِ الخ ঃ আমাদের এখানে জরিমানার মূলনীতি এই যে, অবশিষ্ট গুলোর ধর্তব্য করা হবে, রুজু কারীর নয়। অন্যান্য ইমামের নিকট এর উল্টা। সুতরাং যদি উভয় সাক্ষী থেকে একজন প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে তার ওপর অর্ধ মালের জরিমানা আসবে। কেননা দু'জন পুরুষের সাক্ষীর মধ্যে প্রত্যেক সাক্ষীদাতার সাক্ষী দ্বারা অর্ধ প্রমাণ কায়েম হয়। এবং এর ওপর কিতাবে বর্ণিত অবশিষ্ট মাসআলা কেয়াস করে নাও।

قَوْلُهٗ عَشَرُ نِسْوَةٍ الخ ঃ যখন আটজন মহিলা রুজু করে নিল, তাহলে তাদের ওপর জেমান আসবে না কেননা একজন পুরুষ, দু'জন মহিলার পুরা সাক্ষী বাকি আছে। এবং যদি একজন মহিলা রুজু করে নিল, তাহলে সমস্ত মহিলার ওপর চতুর্থাংশের জরিমানা হবে। কেননা একজন পুরুষ এবং একজন মহিলা বাকি থাকার দরুন হকের তিন চতুর্থাংশ বাকি আছে।

فَإِنْ رَجَعَتْ أُخْرَى كَانَ عَلَى النِّسْوَةِ رُبْعُ الْحَقِّ فَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَقِّ وَعَلَى النِّسَاءِ خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْحَقِّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَالَا عَلَى الرَّجُلِ النِّصْفُ وَعَلَى النِّسْوَةِ النِّصْفُ وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ رَجَعَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ شَهِدَا بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَا -

সরল অনুবাদ ঃ যদি আরেকজন ফিরে যায়, তাহলে মহিলাদের ওপর চতুর্থাংশ ওয়াজিব হবে। অতঃপর যদি পুরুষ মহিলা সবাই ফিরে যায়, তাহলে পুরুষের ওপর ষষ্ঠাংশ ওয়াজিব হবে এবং মহিলাদের ওপর পাঁচ অংশ ওয়াজিব হবে, ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। এবং সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, পুরুষের ওপর র্অধেক ওয়াজিব হবে এবং অর্ধেক মহিলাদের ওপর। যদি দু'জন সাক্ষী একজন মহিলার ব্যাপারে মোহরে মিছিল বা এর চেয়ে বেশির ওপর বিবাহ হওয়ার ওপর সাক্ষী দেয় এরপর সে ফিরে যায়, তাহলে তার ওপর জেমান আসবে না এবং যদি মোহরে মিছিল থেকে কমের ওপর সাক্ষী দেয়, অতঃপর ফিরে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ عَلَى امْرَأَةٍ بِالنِّكَاحِ الخ ঃ প্রথমে একটি নিয়ম বুঝে নিন যে, যদি মশহুদবিহী মাল না হয়, যেমন- কেসাস, বিবাহ ইত্যাদি তাহলে আহনাফের নিকট সাক্ষী জামেন হবে না, এতে শাফেয়ী (র.)-এর মত ভিন্ন। এবং যদি মশকবিহীন মাল হয় এবং সাক্ষী রুজুর কারণে সেটা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে যদি নষ্টের মেছাল থাকে তখনও সাক্ষীর ওপর জেমান আসবে না। কেননা নষ্টের মেছাল থাকা এটা নষ্ট না হওয়ার মতো। এবং যদি নষ্টের মেছাল না থাকে, তাহলে এওয়াজ পরিমাণ জেমান আসবে না, অবশিষ্ট গুলোতে জেমান আসবে। এবং যদি নষ্টের এওয়াজ না থাকে, তাহলে পুরা জরিমানা দিতে হবে। যখন এ কায়দা জানা হয়ে গেল, তাহলে কিতাবের মাসআলা বুঝা সহজ হয়ে গেল যে, কোনো মহিলার ওপর বিবাহের দাবি করার পর যখন দাবিকারী সাক্ষী কায়েম করল এবং মহিলা অস্বীকার করে এবং কাজি সাক্ষ্যের কারণে বিবাহের ফয়সালা শুনিয়ে দিল, অতঃপর সাক্ষীদাতা সাক্ষ্য থেকে রুজু করল তাহলে তার ওপর জেমান আসবে না। কেননা সাক্ষীদাতা সাক্ষ্য দ্বারা "মানাফে'য়ে বোজা' তথা স্ত্রী যৌনাঙ্গের উপকার সমূহকে নষ্ট করল। আর এটা নষ্ট হওয়ার সময় মূল্যের অধিকারী হতে পারে না। কেননা ক্ষতিপূরণ দেওয়া পরস্পর সামঞ্জস্য হওয়াকে চায় অথচ স্ত্রীর যৌনাঙ্গ ও মালের মধ্যে কোনো প্রকার সামঞ্জস্য নেই। এবং যদি মহিলা পুরুষের ওপর বিবাহের দাবি করল, অতঃপর উল্লিখিত সুরত দেখা দিল, তাহলে যদি নির্ধারিত মোহরে মিছিলের বরাবর হয়, অথবা তার চেয়ে কম হয়, তবুও সাক্ষী দাতা ক্ষতিপূরণ দাতা হবে না। কেননা এই নষ্ট করাটা বদলার পরিবর্তে এদিক দিয়ে যে, মালিকানার মধ্যে দাখিল হওয়া অবস্থায় বুজা' এটা মূল্যের বস্তু হিসাবে গণ্য। এবং যদি নির্ধারিত মোহরে মিছিল থেকে অতিরিক্ত হয়, তাহলে সাক্ষীর ওপর অতিরিক্তের পরিমাণ জেমান আসবে, যা সে স্বামীকে দেবে। কেননা সাক্ষী দাতাগণ স্বামীর ওপর অতিরিক্তের পরিমাণকে বদলা ছাড়াই নষ্ট করে ফেলেছে।

لَمْ يَضْمَنَا النُّقْصَانَ وَكَذٰلِكَ إِذَا شَهِدَا عَلٰى رَجُلٍ بِتَزْوِيْجِ اِمْرَأَةٍ بِمِقْدَارِ مَهْرِ مِثْلِهَا اَوْ اَقَلَّ وَاِنْ شَهِدَا بِاَكْثَرِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا الزِّيَادَةَ وَاِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ شَيْءٍ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ اَوْ اَكْثَرَ ثُمَّ رَجَعَا لَمْ يَضْمَنَا وَاِنْ كَانَ بِاَقَلَّ مِنَ الْقِيْمَةِ ضَمِنَا النُّقْصَانَ وَاِنْ شَهِدَا عَلٰى رَجُلٍ اَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُوْلِ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا نِصْفَ الْمَهْرِ وَاِنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُوْلِ لَمْ يَضْمَنَا وَاِنْ شَهِدَا اَنَّهُ اَعْتَقَ عَبْدَهُ ثُمَّ رَجَعَا ضَمِنَا قِيْمَتَهُ وَاِنْ شَهِدَا بِقِصَاصٍ ثُمَّ رَجَعَا بَعْدَ الْقَتْلِ ضَمِنَا الدِّيَةَ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ তাহলে কমের জামেন হবে না। এমনিভাবে যখন পুরুষের ওপর কোনো মহিলা বিবাহ করার সাক্ষ্য দিল, তার মোহরে মিছিল অথবা তার চেয়ে কম পরিমাণের ওপর। এবং যদি মোহরে মিছিল থেকে অতিরিক্তের ওপর সাক্ষী দেয় তারপর ফিরে যায়, তাহলে অতিরিক্ত গুলোর জামেন হবে। এবং যদি দু'জন সাক্ষী মূল্য পরিমাণ অথবা এর চেয়ে বেশির পরিবর্তে বিক্রি হওয়ার সাক্ষী দেয়, এরপর উভয় ফিরে গেল তাহলে জামেন হবে না। এবং যদি কম মূল্য হয়, তাহলে কমের জামেন হবে। এবং যদি উভয়জন এক ব্যক্তির ওপর সাক্ষী দিল যে, সে নিজ স্ত্রীকে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল, তারপর উভয় ফিরে গেল ; তাহলে অর্ধ মোহরের জামেন হবে। আর যদি সহবাসের পরে হয়, তাহলে জামেন হবে না। এবং যদি কেউ সাক্ষী দেয় যে, সে নিজ গোলামকে আজাদ করে দিয়েছে, তার পর ফিরে গেল তাহলে তার মূল্যের জামেন হবে। যদি কেসাসের সাক্ষী দেওয়ার পর কতলের পরে ফিরে গেল তাহলে দিয়তের জামেন হবে এবং তাদের দু'জন থেকে কেসাস নেয়া হবে না।

প্রসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنَا الخ ঃ কেননা উভয় সাক্ষীদাতা সাক্ষ্য দ্বারা বিক্রেতার জন্য ঐ জিনিসের মিছিল হাসেল করিয়েছে, যাকে তারা বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের করে দিয়েছে।

قَوْلُهُ وَاِنْ شَهِدَا بِقِصَاصٍ الخ ঃ যেমন – সাক্ষীদাতা সাক্ষী দিল যে, খালেদ মাহমুদকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করেছে। কাজি তার সাক্ষ্যের কারণে খালেদের কতলের হুকুম দিল এবং সে মারা গেল। এরপর সাক্ষীদাতা সাক্ষ্য থেকে ফিরে গেল তাহলে তার ওপর দিয়ত লাজেম হবে, কেসাস নেওয়া যাবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর নিকট কেসাস নেওয়া যাবে। কেননা সে হত্যার কারণ হলো, অতএব কারণের দিক দিয়ে তার থেকে হত্যা পাওয়া গেল। তার জবাব এই যে, তার থেকে হত্যা পাওয়া যায়নি, সরাসরিও নয় কারণের দিক দিয়েও নয়। কেননা কারণ উহাই হয় যা প্রাধান্যতার দিক দিয়ে কতল পর্যন্ত পৌছে দেয়। আর এখানে এমনটি নয়। কেননা মাফ করে দেওয়া মোস্তাহাব। আল্লাহ তাআলা বলেন– وَاَنْ تَعْفُوْا اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى

وَإِذَا رَجَعَا شُهُوْدُ الْفَرْعِ ضَمِنُوْا وَإِنْ رَجَعَ شُهُوْدُ الْاَصْلِ وَقَالُوْا لَمْ نُشْهِدْ شُهُوْدَ الْفَرْعِ عَلٰى شَهَادَتِنَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ وَإِنْ قَالُوْا شَهِدْنَاهُمْ وَغَلِطْنَا ضَمِنُوْا وَإِنْ قَالَ شُهُوْدُ الْفَرْعِ كَذَبَ شُهُوْدُ الْاَصْلِ اَوْ غَلِطُوْا فِيْ شَهَادَتِهِمْ لَمْ يُلْتَفَتْ اِلٰى ذَالِكَ وَإِذَا شَهِدَ اَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا وَشَاهِدَانِ بِالْاِحْصَانِ فَرَجَعَ شُهُوْدُ الْاِحْصَانِ لَمْ يَضْمَنُوْا وَإِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّوْنَ عَنِ التَّزْكِيَةِ ضَمِنُوْا وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَمِيْنِ وَشَاهِدَانِ بِوُجُوْدِ الشُّرُوْطِ ثُمَّ رَجَعُوْا فَالضَّمَانُ عَلٰى شُهُوْدِ الْيَمِيْنِ خَاصَّةً.

সরল অনুবাদ ঃ যদি নকল সাক্ষী ফিরে যায়, তাহলে সে জামেন হবে এবং যদি আসল সাক্ষী ফিরে যায়, এবং বলে যে আমরা নকল সাক্ষীকে সাক্ষী বানাইনি নিজ সাক্ষীর ওপর, তাহলে তাদের ওপর জেমান আসবে না। এবং যদি এটা বলে যে, আমরা তাহাদেরকে সাক্ষী বানিয়েছি। আমরা ভুল করেছি তাহলে জামেন হবে। এবং যদি নকল সাক্ষী বলে যে, আসল সাক্ষী মিথ্যা বলেছে অথবা তারা সাক্ষ্যতে ভুল করেছে তাহলে তার দিকে নজর করা যাবে না। এবং যখন চারজন ব্যক্তি জেনার সাক্ষ্য দিল এবং দু'জন মোহসান হওয়ার (সাক্ষ্য দিল) অতঃপর মোহসান হওয়ার সাক্ষী ফিরে গেল, তাহলে জামেন হবে না। এবং যখন যাঁচাইকারী যাঁচাই থেকে ফিরে যায় তাহলে সে জামেন হবে। এবং যখন দু'জন সাক্ষীদাতা কসমের সাক্ষ্য দিল এবং দু'জন শর্ত পাওয়া যাওয়ার (সাক্ষ্য দিল) অতঃপর সবাই ফিরে গেল, তাহলে জেমান খাস করে কসমের সাক্ষীদের ওপর হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا رَجَعَ شُهُوْدُ الْفَرْعِ الخ **ঃ** এবং যদি নকল সাক্ষীদাতা সাক্ষ্য থেকে ফিরে যায় তাহলে জামেন হবে। কেননা কাজির দরবারে সাক্ষ্য তার থেকে বাহির হয়, আসল সাক্ষীদাতা থেকে নয় এবং তার সাক্ষ্যের ওপরই কাজির হুকুম নির্ভরশীল, এ জন্য ক্ষতিটা তার দিকেই ফিরানো হবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا شَهِدَ اَرْبَعَةٌ بِالزِّنَاءِ الخ **ঃ** মোহসান সাক্ষীর ফিরে যাওয়ার কারণে তাদের ওপর জেমান লাজেম হবে না। কেননা মোহসান রজমের কারণ নয় ; বরং রজমের কারণ হলো জেনা।

قَوْلُهُ الْمُزَكُّوْنَ الخ **ঃ** অর্থাৎ সাক্ষীদাতাদের ইনসাফী জাহেরকারী ইনসাফ থেকে রুজু করে নেয়, তাহলে ইমাম আযম (র.)-এর নিকট সে জামেন হবে, সাহেবাইনের নিকট জামেন হবে না। কেননা তারা তো সাক্ষীর সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন। ইমাম আযম (র.) বলেন, যে হুকুম সাক্ষীর দিকে সম্বন্ধ যুক্ত হয় এবং সাক্ষ্য ইনসাফ বিহীন দলিল হয় না এবং ইনসাফ সার্টিফিকেট ব্যতীত সাব্যস্ত হয় না, তাহলে সার্টিফিকেট দানকারীর সার্টিফিকেট হুকুমের জন্য করণের কারণ হলো, এ কারণে সার্টিফিকেট দানকারী ও সত্যায়নকারী ক্ষতিপূরণদাতা হলো।

كِتَابُ اٰدَابِ الْقَاضِىْ

বিচারকের শিষ্টাচার পর্ব

যোগসূত্র : গ্রন্থকার (র.) সাক্ষ্য দান পর্বের পর বিচারকের শিষ্টাচার পর্ব এ জন্য এনেছেন যে, সাক্ষ্য দানের জন্য সাক্ষীকে বিচারকের কাছে তলব করা হয়, আর বিচারকের জন্য শরিয়তে কতিপয় শিষ্টাচার রেখেছেন, এ পর্বে ঐসব শিষ্টাচার আলোচনা করা হয়েছে। - (আত্তানকীহুদ্ব দ্বারুরী)

لَاتَصِحُّ وِلَايَةُ الْقَاضِىْ حَتّٰى تَجْتَمِعَ فِى الْمُوَلّٰى شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ وَيَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الْاِجْتِهَادِ وَلَابَأْسَ بِالدُّخُوْلِ فِى الْقَضَاءِ لِمَنْ يَثِقُ بِنَفْسِهِ اَنَّهُ يُؤَدِّىْ فَرْضَهُ وَيُكْرَهُ الدُّخُوْلُ فِيْهِ لِمَنْ يَّخَافُ الْعَجْزَ عَنْهُ وَلَايَامَنُ عَلٰى نَفْسِهِ الْحَيْفَ فِيْهِ وَلَايَنْبَغِىْ اَنْ يُّطْلَبَ الْوِلَايَةُ وَلَايُسْئَلَهَا وَمَنْ قُلِّدَ فِى الْقَضَاءِ سُلِّمَ اِلَيْهِ دِيْوَانُ الْقَاضِى الَّذِىْ كَانَ قَبْلَهُ وَيَنْظُرُ فِىْ حَالِ الْمَحْبُوْسِيْنَ فَمَنْ اِعْتَرَفَ مِنْهُمُ الْحَقَّ اَلْزَمَهُ اِيَّاهُ وَمَنْ اَنْكَرَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُ الْمَعْزُوْلِ عَلَيْهِ اِلَّا بِبَيِّنَةٍ فَاِنْ لَّمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ لَمْ يُعَجِّلْ بِتَخْلِيَتِهِ حَتّٰى يُنَادِىَ عَلَيْهِ وَيَسْتَظْهِرَ فِىْ اَمْرِهِ وَيَنْظُرُ فِى الْوَدَائِعِ وَارْتِفَاعِ الْوُقُوْفِ فَيَعْمَلُ عَلٰى حَسْبِ مَاتَقُوْمُ بِهِ الْبَيِّنَةُ اَوْيَعْتَرِفُ بِهِ مَنْ هُوَ فِىْ يَدِهِ ـ

সরল অনুবাদ : কাজি হওয়া ঐ সময় পর্যন্ত সহীহ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত যাঁকে কাজি বানোনো হয়েছে তাঁর মধ্যে শাহাদাতের (সাক্ষ্যের) শর্তসমূহ পাওয়া না যাবে এবং সে মুজতাহিদ হবে। আর যে বিচারকার্য সম্পাদনে নিজের ওপর পুরোপুরি বিশ্বাস রাখে তার কাজি হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। এবং যে ব্যক্তি এর থেকে অপারগ হওয়ার ভয় থাকে এবং তার থেকে অত্যাচার না হওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত না হয় তার জন্য কাজির অন্তর্ভুক্ত হওয়া মাকরূহ। এবং কাজি হওয়ার জন্য দরখাস্ত করাও উচিত নয় এবং তা অন্বেষণ করাও উচিত নয়। এবং যে ব্যক্তি কাজি হওয়াকে কবুল করে নিয়েছে তাহলে কাজির সরকারি খাতাপত্র যা তার পূর্বে ছিল তার হাওলা করে দেওয়া হবে। এখন সে কারাবন্দীদের অবস্থার মধ্যে চিন্তা করবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের মধ্য থেকে সত্যের স্বীকার করে তবে তার ওপর হককে আবশ্যকীয় করে দেবে। এবং যে অস্বীকার করে তাহলে পদচ্যুত কাজীর কথা দলিল প্রমাণ ব্যতীত মানবে না। অতঃপর যদি দলিল উপস্থাপন না হয় তাহলে রেহাই করার মধ্যে তাড়াহুড়া করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার ঘোষণা না করে এবং তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করবে অথবা তার লেনদেন খুব স্পষ্ট করবে এবং গচ্ছিত বস্তুসমূহ ও দাতব্য কর্ম আনার মধ্যে চিন্তা করবে অতঃপর এটার অনুপাতেই আমল করবে যেটা প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অথবা তার সাথে ঐ ব্যক্তি স্বীকার করবে যার হাতে এ সমস্ত জিনিস রয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিচারক হওয়ার উপযোক্ততা ঃ

قَوْلُهُ لَاتَصِحُّ وِلَايَةُ الخ ঃ যে সব লোক সাক্ষ্য দেওয়ার উপযুক্ত তারাই বিচারক হওয়ার যোগ্যতা রাখে অর্থাৎ জ্ঞানী, প্রাপ্তবয়স্ক, স্বাধীন, মুসলমান, ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি যে, অন্ধ, অপবাদের শাস্তিপ্রাপ্ত, বধির ও বোবা না হয়।

قَوْلُهُ اَهْلِ الْاِجْتِهَادِ الخ ঃ বিচারকের মধ্যে কুরআন হাদীস থেকে বিধান রিসার্চ করার যোগ্যতা থাকা উত্তম, জরুরি নয়। এটাই হাদীসের আলোকে সঠিক মত। কেননা ইমাম আবূ দাউদ (র.) স্বীয় সনদে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে ইয়ামন দেশের বিচারক হিসাবে পাঠিয়েছেন অথচ তিনি ঐ সময় নূতন যুবক ছিলেন রিসার্চের যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন না।

বিচারক হওয়ার দাবি করা ও প্রত্যাশা করা ঠিক নয় ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَنْبَغِيْ اَنْ يَّطْلُبَ الْوِلَايَةَ وَلَايَسْئَلُهَا الخ ঃ যেরূপ মুখে কাজি হওয়ার জন্য চাইবে না অনুরূপ নিজের অন্তরেও এটা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ না করা চাই। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে যে, যে ব্যক্তি কাজি হওয়ার ইচ্ছা, করবে তাকে তার নিজের জাতের ওপর সোপর্দ করা হবে অর্থাৎ আল্লাহর পক্ষ থেকে করুণা, অনুগ্রহ হবে না। আর যাকে জোরপূর্বক বানানো হয় তার ওপর ফেরেশতা অবতীর্ণ হবে যে ফেরেশতা তাকে সঠিক পথে পরিচালনা করবে এবং এর ওপর দৃঢ় রাখবে।-(আবূ দাউদ)

জনৈক কবি বলেন ঃ

اِحْذَرْ مِنَ الْوَاوَاتِ اَرْ * بَعَةً فَهُوَ مِنَ الْحُتُوْفِ ـ وَاوُ الْوِلَايَتِ وَالْوِكَا * لَتِ وَالْوِصَايَا وَالْوُقُوْفِ

ভাবার্থ ঃ তুমি চারটি وَاوْ ওয়ালা শব্দ থেকে সর্বদা দূরে থাকবে কারণ সেগুলো তোমাকে ধ্বংস করে ফেলবে। শব্দগুলো হচ্ছে, যথাক্রমে-

(১) وِلَايَتْ অর্থাৎ রাজত্ব (২) وِكَالَتْ অর্থাৎ প্রতিনিধিত্ব ও ওকালতী (৩) وِصَايَا অর্থাৎ মৃত্যুকালে প্রদত্ত সম্পত্তিসমূহ, অন্তিম উপদেশাবলী (৪) وُقُوْف অর্থাৎ কোনো বস্তু সম্পর্কে সংবাদপ্রাপ্ত হওয়া।

وَلَايَقْبَلُ قَوْلَ الْمَعْزُوْلِ اِلَّا اَنْ يَّعْتَرِفَ الَّذِىْ هُوَ فِىْ يَدِهٖ اَنَّ الْمَعْزُوْلَ سَلَّمَهَا اِلَيْهِ فَيَقْبَلُ قَوْلَهٗ فِيْهَا وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوْسًا ظَاهِرًا فِى الْمَسْجِدِ وَلَايَقْبَلُ هَدِيَّةً اِلَّا مِنْ ذِىْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ اَوْ مَنْ جَرَتْ عَادَتُهٗ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمُهَادَاتِهٖ وَلَايَحْضُرُ دَعْوَةً اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ عَامَّةً وَيَشْهَدُ الْجَنَازَةَ وَيَعُوْدُ الْمَرِيْضَ وَلَايُضِيْفُ اَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُوْنَ خَصْمِهٖ فَاِذَا حَضَرَ سَوّٰى بَيْنَهُمَا فِى الْجُلُوْسِ وَالْاِقْبَالِ وَلَايُسَارُّ اَحَدَهُمَا وَلَايُشِيْرُ اِلَيْهِ وَلَايُلَقِّنُهٗ حُجَّةً فَاِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَهٗ .

সরল অনুবাদ ঃ এবং পদচ্যুত কাজির কথা মানবে না। হ্যাঁ যদি ঐ ব্যক্তি স্বীকার করে যার অধীনে ও হাতে আছে সে একথা বলবে যে, (এসব) পদচ্যুত কাজি তার হাওলা করেছে। সুতরাং তার কথা মেনে নেবে এবং মীমাংসার জন্য মসজিদে ব্যাপকভাবে বৈঠক করবে। এবং হাদিয়া কবুল করবে না তবে আত্মীয় কোনো মহরাম ব্যক্তির অথবা এ ব্যক্তির যার অভ্যাস কাজি হওয়ার পূর্বে হাদিয়া দেওয়ার সাথে জারি ছিল এবং ব্যাপক দাওয়াত ব্যতীত দাওয়াতে যাবে না। এবং কাজি সাহেব জানাযার নামাজে উপস্থিত হবে এবং রোগীদের দেখা শুনা করবে। এবং বাদী বিবাদীর মধ্য থেকে একা একজনের মেহমানদারী করবে না এবং যখন সে আসে তাহলে বৈঠক এবং দৃষ্টির মধ্যে বরাবর রাখবে। এবং কোনো একজন থেকে কানাঘুষা করবে না, কোনো ইশারাও করবে না এবং কোনো দলিলও শিখাবে না। অতঃপর যখন তার নিকট সত্যতা প্রকাশ পেয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিচারক কোনো স্থানে বিচার করবে?

قَوْلُهٗ وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ الخ ঃ বিচারক ফয়সালার জন্য মসজিদে অথবা স্বীয় ঘরে বসবে এবং লোকদেরকে আসার সাধারণ অনুমতি দিয়ে দেবে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে মসজিদে ফয়সালার জন্য বলা মাকরুহ। কারণ বিচার চাওয়ার জন্য মুশরিকও আসবে যারা কুরআনের হুকুম মতে নাপাক। এভাবে ঋতুবতী নারীরাও আসবে যাদের মসজিদে প্রবেশে করা হারাম।

আমাদের প্রমাণ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা.) স্বীয় ইতিকাফের স্থানে এভাবে খোলাফায়ে রাশেদীন, তাবেঈন, তাবে তাবেঈন বিচারের জন্য মসজিদে বসতেন।

ইমাম শাফেয়ীর (র.) প্রমাণের খণ্ডন ঃ কুরআন কারীমের আয়াত (الاية) اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ এখানে নাপাক-এর দ্বারা উদ্দেশ্য ভিতরগত নাপাক অর্থাৎ মুশরিকরা আকিদা-বিশ্বাসের কারণে নাপাক।

আর ঋতুবতী মহিলারা বিচারের জন্য এলে স্বীয় ঋতুবতী হওয়ার কথা বিচারককে বলবে, তখন বিচারক তার জন্য মসজিদের দরজা পর্যন্ত এসে যাবে। – (আল-মিছ্বাহুন নূরী)

وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيْمِهٖ لَمْ يُعَجِّلْ بِحَبْسِهٖ وَاَمَرَهٗ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ فَاِنِ امْتَنَعَ حَبَسَهٗ فِىْ كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهٗ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِىْ يَدِهٖ كَثَمَنِ الْمَبِيْعِ وَبَدَلِ الْقَرْضِ اَوِ الْتَزَمَهٗ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ وَلَا يَحْبِسُهٗ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ اِذَا قَالَ اِنِّىْ فَقِيْرٌ اِلَّا اَنْ يَثْبُتَ غَرِيْمُهٗ اَنَّ لَهٗ مَالًا وَيَحْبِسُهٗ شَهْرَيْنِ اَوْثَلَاثَةً ثُمَّ يَسْئَلُهٗ عَنْهُ فَاِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهٗ مَالٌ خَلّٰى سَبِيْلَهٗ وَلَا يَحُوْلُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ غُرَمَائِهٖ وَيَحْبِسُ الرَّجُلَ فِىْ نَفَقَةِ زَوْجَتِهٖ وَلَا يَحْبِسُ الْوَلَدُ فِىْ دَيْنِ وَلَدِهٖ اِلَّا اِذَا امْتَنَعَ مِنَ الْاِنْفَاقِ عَلَيْهِ وَيَجُوْزُ قَضَاءُ الْمَرْاَةِ فِىْ كُلِّ شَىْءٍ اِلَّا فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِىْ اِلَى الْقَاضِىْ فِى الْحُقُوْقِ اِذَا شَهِدَ بِهٖ عِنْدَهٗ فَاِنْ شَهِدُوْا عَلٰى خَصْمٍ حَاضِرٍ حُكِمَ بِالشَّهَادَةِ وَكَتَبَ بِحُكْمِهٖ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং হকপন্থী ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বন্দী করার দরখাস্ত করে তাহলে বন্দী করার মধ্যে অধিক তাড়াহুড়া করবে না; বরং তার জিম্মায় যা আছে তা তাকে আদায় করে দেওয়ার হুকুম করবে। যদি সে আদায় করা থেকে বিরত থাকে তাহলে বন্দী করবে প্রত্যেক এমন ঋণে যা তাকে এমন সম্পদের পরিবর্তে লাযেম হয়েছে যা তার হাসেল হয়েছে। যথা– বিক্রিত জিনিসের মূল্য ঋণের পরিবর্তে অথবা কোনো আক্‌দ দ্বারা তার এলতেযাম করেছে। যথা– মোহর এবং কাফালাহ এগুলো ব্যতীত অন্য কোনো জিনিসে বন্দী করবে না যখন সে বলে যে, আমি ফকির। হ্যাঁ, যদি ঋণদাতা স্থির করে দেয় যে তার নিকট মাল আছে। এবং তাকে দুই তিন মাস পর্যন্ত বন্দী রাখবে অতঃপর সম্পদের খোঁজ করবে। অতঃপর যদি সম্পদ প্রকাশ না হয় তাহলে তাকে মুক্ত করে দেবে। ঋণ দাতাগণ এবং তার মধ্যে ব্যবধান হবে না। স্বামী-স্ত্রীর খরচের মধ্যে বন্দী করা হবে। এবং পিতা ছেলের ঋণে বন্দী করা হবে না। হ্যাঁ যদি সে তার ওপর খরচ করা থেকে বিরত থাকে। এবং মহিলা ব্যক্তির কাজি হওয়া প্রত্যেক লেনদেনের মধ্যে জায়েজ আছে হুদূদ এবং কেসাস ব্যতীত। এবং এক কাজির চিঠি দ্বিতীয় কাজির নামে সমস্ত হকের মধ্যে কবুল হবে, যখন তার পক্ষ হতে চিঠির সাক্ষ্য দেওয়া হবে। যদি مُدَّعٰى عَلَيْهِ -এর সামনে সাক্ষ্য দেয় তাহলে সাক্ষীর ওপর হুকুম লাগাবে এবং নিজের হুকুম লিখে দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَلَا يَحْبِسُهٗ فِىْ مَا سِوٰى ذٰلِكَ الخ ঃ যদি বাদীর হক উল্লিখিত চার জিনিস ব্যতীত হয়, অর্থাৎ (১) বদলে খোলা, (২) বদলে মাগসূব (৩) বদলে মাতলুফ (৪) বদলে দমে আমদ (৫) আরশে জানায়াত (৬) নফকায়ে কিরাবাত (৭) নফকায়ে জাওযাহ (৮) মোহরে মুয়াজ্জাল প্রভৃতি হয় এবং مُدَّعٰى عَلَيْهِ নিজের فَلَاسٌ -এর দাবি করে তাহলে কাজি তাকে কয়েদ করবে না ; এ জন্য যে, প্রত্যেক মানুষ عَدِيْمُ الْمَالِ হিসেবে সৃষ্টি হয়। আর যদি مُدَّعِىْ বা দাবি اَمْرٌ عَارِضٌ হয় অর্থাৎ ধনীর দাবি হয় তাহলে তবে তার দাবি নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য হবে না।

قَوْلُهٗ عَلٰى خَصْمٍ حَاضِرٍ الخ ঃ যদি خَصْمٌ حَاضِرٌ -এর ওপর সাক্ষ্য দেয় তাহলে কাজি সাক্ষ্যর মাধ্যমে হুকুম করে নিজের হুকুমকে লিপিবদ্ধ করে নেবে যাতে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে ভুলে না যায়। যে পত্রে কাজির হুকুম সংগৃহীত হয় তাকে سَجَلْ حُكْمِىْ বলা হয়। আর যদি خَصْمٌ حَاضِرٌ না হয় তাহলে কাজি তার ওপর হুকুম করবে না। কেননা তা قَضَا عَلَى الْغَائِبِ (গায়েবের বিচার) যা না-জায়েজ।

وَاِنْ شَهِدُوا بِغَيْرِ حَضْرَةِ خَصْمِهِ لَمْ يُحْكَمْ وَكُتِبَ بِالشَّهَادَةِ لِيَحْكُمَ بِهَا الْمَكْتُوْبُ اِلَيْهِ وَلَا يُقْبَلُ الْكِتَابُ اِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ اَوْرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَيَجِبُ اَنْ يَقْرَءَ الْكِتَابَ عَلَيْهِمْ لِيَعْرِفُوا مَافِيْهِ ثُمَّ يَخْتِمَهُ وَيُسَلِّمَهُ اِلَيْهِمْ وَاِذَا وَصَلَ اِلَى الْقَاضِىْ لَمْ يُقْبَلْهُ اِلَّا بِحَضْرَةِ الْخَصْمِ فَاِذَا سَلَّمَهُ الشُّهُوْدُ اِلَيْهِ نَظَرَ اِلٰى خَتْمِهِ فَاِذَا شَهِدُوْا اِنَّهُ كِتَابُ فُلَانِ الْقَاضِىْ سَلَّمَهُ اِلَيْنَا فِىْ مَجْلِسِ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَرَأَهُ عَلَيْنَا وَخَتَمَهُ فَتَحَهُ الْقَاضِىْ وَقَرَأَهُ عَلَى الْخَصْمِ وَاَلْزَمَهُ مَافِيْهِ وَلَا يُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِىْ اِلَى الْقَاضِىْ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَلَيْسَ لِلْقَاضِىْ اَنْ يَسْتَخْلِفَ عَلَى الْقَضَاءِ اِلَّا اَنْ يُفَوَّضَ اِلَيْهِ ذٰلِكَ وَاِذَا رُفِعَ اِلَى الْقَاضِىْ حُكْمَ حَاكِمٍ اَمْضَاهُ اِلَّا اَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ اَوِالسُّنَّةَ اَوِالْاِجْمَاعَ ۔

সরল অনুবাদ ঃ আর যার ওপর দাবি করা হয়েছে তার অনুপস্থিতি অবস্থায় যদি সাক্ষ্য দেয় তাহলে হুকুম লাগবে না; বরং সাক্ষ্য লিখে দেবে যাতে তার ওপর মাকতূব ইলাইহি (مَكْتُوْبُ اِلَيْهِ) বা কাজি হুকুম দিতে পারে। দু'জন পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য ব্যতীত চিঠি গ্রহণযোগ্য হবে না। সাক্ষ্যদাতাদের সামনেই চিঠি পড়া উচিত। যাতে তারা তার বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হতে পারে। এরূপ সীলমোহর দিয়ে চিঠি তাদের হাতে দিয়ে দেবে। চিঠি যখন কাজির নিকট পৌঁছবে তখন مُدَّعٰى عَلَيْهِ -এর উপস্থিতি ব্যতীত চিঠি গ্রহণযোগ্য হবে না। যখন সাক্ষ্যদাতা চিঠি কাজির হস্তগত করাবে অতঃপর কাজি উক্ত চিঠির সীলমোহর দেখবে। যখন সাক্ষ্য দেবে যে, এই চিঠি অমুক কাজির যা তিনি আমাদেরকে দিয়েছেন নিজের বিচারালয়ে এবং আমাদের সামনেই পড়েছেন ও সীলমোহর লাগিয়েছেন; তখন কাজি চিঠি খুলবে ও مُدَّعٰى عَلَيْهِ -এর সামনে পড়বে এবং যা কিছু ঐ পত্রে আছে তা বাস্তবায়ন করবে। এক কাজির প্রতি অন্য কাজির হুদূদ (حُدُوْد) ও কেসাস (قِصَاصْ) সম্পর্কীয় চিঠি গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজি বা বিচারকের জন্য উক্ত পদের জন্য অন্য কাউকে প্রতিনিধি বানানো জায়েজ নেই; তবে এতটুকু হতে পারে যে তার ওপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব সমর্পণ করে দেওয়া হবে। যখন কাজির কাছে কোনো হাকিমের হুকুম ফয়সালার জন্য আনা হবে তখন ঐ হুকুম জারি করে দেবে, কিন্তু। যদি তা কুরআন, হাদীস ও ইজমা' পরিপন্থী হয় তবে জারি করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ اَنْ يَسْتَخْلِفَ الخ ঃ কাজি অন্য কাউকে বিচারের মধ্যে নিজের নায়েব বা প্রতিনিধি বানাতে পারবে না। কেননা তৎকালীন প্রশাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানই তাকে কাজি বানিয়েছে। তবে প্রশাসকের পক্ষ থেকে তাকে যদি সরাসরি বা ইঙ্গিত অনুমতি দেওয়া হয় তাহলে পারবে।

قَوْلُهُ وَاِذَا رُفِعَ الخ ঃ কাজির কাছে যদি অন্য কাজির হুকুম হস্তান্তর করা হয়, এমতাবস্থায় প্রথম কাজির হুকুম যদি কুরআন, হাদীস ও ইজমার পক্ষে হয় তাহলে দ্বিতীয় কাজি ঐ হুকুমকে বাস্তবায়ন করবে। তবে এক্ষেত্রে ঐ হুকুমের জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। তার মধ্যে মতবিরোধ থাকতে হবে বা مُخْتَلَفٌ فِيْهِ হবে, (২) প্রত্যেক কথার দলিল থাকতে হবে। অন্যথা বাস্তবায়ন করতে পারবে না।

اَوْ يَكُوْنَ قَوْلًا لَادَلِيْلَ عَلَيْهِ وَلَايَقْضِى الْقَاضِىْ عَلٰى غَائِبٍ اِلَّا اَنْ يَّحْضُرَ مَنْ يَّقُوْمُ مَقَامَهٗ وَاِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ رَجُلًا بَيْنَهُمَا وَ رَضِيَا بِحُكْمِهٖ جَازَ اِذَا كَانَ بِصِفَةِ الْحَاكِمِ وَلَايَجُوْزُ تَحْكِيْمُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالذِّمِّىِّ وَالْمَحْدُوْدِ فِى الْقَذْفِ وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِىِّ وَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُحَكِّمِيْنَ اَنْ يَّرْجِعَ مَا لَمْ يَحْكُمْ عَلَيْهِمَا وَاِذَا حَكَمَ عَلَيْهِمَا لَزِمَهُمَا وَاِذَا رُفِعَ حُكْمُهٗ اِلَى الْقَاضِىْ فَوَافَقَ مَذْهَبَهٗ اَمْضَاهُ وَاِنْ خَالَفَهٗ اَبْطَلَهٗ وَلَايَجُوْزُ التَّحْكِيْمُ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ وَاِنْ حَكَّمَاهُ فِىْ دَمِ خَطَاءٍ فَقَضَى الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ لَمْ يَنْفُذْ حُكْمُهٗ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّسْمَعَ الْبَيِّنَةَ وَيَقْضِىْ بِالنُّكُوْلِ وَحُكْمُ الْحَاكِمِ لِاَبَوَيْهِ وَ وَلَدِهٖ وَ زَوْجَتِهٖ بَاطِلٌ ـ

সরল অনুবাদ : অথবা এমন বাক্য যার ওপর কোনো দলিল প্রমাণ নেই এবং কাজি সাহেব অনুপস্থিত ব্যক্তির ওপর হুকুম লাগাবে না, হ্যাঁ যদি তার স্থলাভিষিক্ত কোনো ব্যক্তি উপস্থিত থাকে, যখন দুই ব্যক্তি কাউকে মীমাংসাকারী বানিয়ে নেয় এবং তার মীমাংসার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে জায়েজ হবে, যখন হাকিম বানানো (تَحْكِيْم) হাকিমের সিফাত অনুযায়ী হবে। কাফের, গোলাম, জিম্মি, কয্‌ফ (قَذْف)-এর কারণে সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ফাসিক ও বাচ্চাকে হাকিম বানানো জায়েজ নেই। যারা হাকিম বা মীমাংসাকারী বানায় তাদের প্রত্যেকের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত তার ওপর সিদ্ধান্ত গৃহীত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার থেকে প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ আছে; কিন্তু যদি তার ওপর কোনো সিদ্ধান্ত আরোপিত হয় তা তার ওপর আবশ্যক হয়ে যায়। এরপর উক্ত লোক যদি তার প্রতি আরোপিত হুকুম কাজির নিকট নিয়ে যায় এবং হুকুমটি তার মাযহাব অনুযায়ী হয় তাহলে তাকে বহাল রাখবে আর যদি মাযহাবের বিপরীত হয় তাহলে বাতিল করে দেবে। স্মর্তব্য যে হুদূদ (حُدُوْد) ও কেসাস (قِصَاص)-এর মধ্যে পরস্পরে হাকিম বানানো জায়েজ নেই। যদি কাউকে অনিচ্ছাকৃত হত্যার (دَمُ الْخَطَا) হাকিম বানানো হয় এবং সে দিয়ত-এর সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয়, তবে তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হবে না। দলিল শ্রবণ ও অস্বীকার করার ওপর ফয়সালা করা জায়েজ আছে। হাকিমের জন্য নিজের পিতামাতা, সন্তান ও স্ত্রী পরিজনের ওপর ফয়সালা দেয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا حَكَّمَ رَجُلَانِ الخ : যখন দুইপক্ষ ঝগড়াকারী কাউকে তাদের মধ্যে মীমাংসার জন্য নির্ধারণ করে নেয় এরপর সে সাক্ষ্য অথবা স্বীকৃতি অথবা অস্বীকৃতি দ্বারা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে তাহলে সহীহ্ হবে। কেননা হাদীস শরীফে আছে যে, হযরত আবূ শুরাইহ্ (রা.) হুযূর (সা.)-এর দরবারে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.) যখন আমার গোত্রের কোনো জিনিসের মধ্যে মতভেদ হয় তখন সে আমার নিকট আসে আমি মীমাংসা করে দেই এবং উভয় দল আমার মীমাংসা দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করলেন এটা কতই না ভাল কাজ।

قَوْلُهٗ بِصِفَةِ الْحَاكِمِ الخ : অর্থাৎ জ্ঞানী, প্রাপ্ত বয়স্ক, ন্যায়পরায়ণ এবং আজাদ মুসলমান হওয়া শর্ত।

قَوْلُهٗ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ الخ : এর মধ্যে পরস্পরে হাকিম বানানো (تَحْكِيْم) জায়েজ নেই। এ সম্পর্কে কায়দা হচ্ছে যে, তাহকীম (হাকিম বানানো) প্রত্যেক ঐ জিনিসের মধ্যে সহীহ্ হবে যাকে করা প্রতিদ্বন্দ্বী উভয় দলে এখতিয়ার হবে আর সন্ধি দ্বারা সঠিক হয়ে যায় এবং যেটা সন্ধির মাধ্যমে জায়েজ হয় না তার মধ্যে তাহকীম সহীহ্ হবে না। সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়, বিবাহ, তালাক, আজাদ, কেতাবত, কাফালত, শফআ, নফক্বা, আহওয়াল এবং ঋণসমূহে তাহকীম সহীহ হবে। জেনার শাস্তি, চুরির শাস্তি, তুহমতের শাস্তি, কেসাস, আক্বেলার দিয়তের ওপর তাহ্কীম সহীহ্ হবে না।

كِتَابُ الْقِسْمَةِ
ভাগ-বণ্টন পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) বিচারকের শিষ্টাচার পর্বের পর ভাগ-বণ্টন পর্বকে আনার কারণ এই যে, ভাগ-বন্টন এটা বিচারকার্যের সম্পর্কীয় বিধানাবলীর অন্তর্ভুক্ত, অধিকন্তু ভাগ বণ্টনকারীকে বিচারকের পক্ষ থেকে নিয়োগ দেওয়া হয়। -(আত্‌তানক্বীহ)

قِسْمَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ قِسْمَةٌ এটা تَقْسِيْم বা اِقْتِسَام থেকে اِسْم-এর আভিধানিক অর্থ; বণ্টন করে নেওয়া।

قِسْمَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় কারো (এজমালি) বণ্টনবিহীন ভাগ কে এক নির্দিষ্ট ভাগে জমা করার নাম হচ্ছে قِسْمَةٌ ;কারো মতে قِسْمَةٌ বলা হয় تَمْيِيْزُ الْحُقُوْقِ وَتَعْدِيْلُ الْحِصَصِ কে অর্থাৎ অধিকার সমূহকে পৃথক করা ও অংশসমূহকে বরাবর করা। -(আল-মিসবাহুননূরী)

قِسْمَةٌ-এর سَبَبْ ঃ قِسْمَةٌ-এর سَبَبْ হচ্ছে সকল অংশীদার বা কোনো কোনো অংশীদার বণ্টনের দাবি করা। -(আত্‌তানক্বীহ)

قِسْمَةٌ-এর রোকন ঃ قِسْمَةٌ-এর রোকন হচ্ছে ঐ কর্মকাণ্ড যার দ্বারা اِنْصِبَاءُ-এর মাঝে اِفْرَازْ এবং تَمْيِيْزْ লাভ করা যায় অর্থাৎ প্রত্যেক অংশীদার স্বীয় সম্পদকে সম্পূর্ণভাবে নিজের অধিকারে পৃথকভাবে লাভ করা। যথাক্রমে কিলু পরিমাপ বস্তুকে কিলু হিসাবে বণ্টন করা, ওজনী জিনিসকে ওজন হিসাবে বণ্টন করা, গণনা বিশিষ্ট দ্রব্যাদিকে গণনা করে বণ্টন করা এবং জাতি ও রকমারী বস্তুকে রকম জাত ও রকম হিসাবে বণ্টন করা।

قِسْمَةٌ-এর শর্ত ঃ قِسْمَةٌ-এর শর্ত হচ্ছে বণ্টন করার দ্বারা যেন সম্পদের থেকে উপকার লাভ করতে বেঘাত না ঘটে। -(আত্‌তানক্বীহুদ্ব দ্বারুরী)

قِسْمَةٌ -এর বিধান ঃ قِسْمَةٌ-এর বিধান হচ্ছে প্রত্যেক অংশীদারকে স্বীয় অংশকে পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া।

ইসলামে قِسْمَةٌ-এর প্রমাণ ঃ নবী করীম (সা.) খায়বার-এর ভূমিকে সাহাবীগণের মাঝে বণ্টন করেছিলেন। -(আত্‌তানক্বীহ)

يَنْبَغِيْ لِلْاِمَامِ اَنْ يَنْصِبَ قَاسِمًا يَرْزُقُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِيُقَسِّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِغَيْرِ اَجْرٍ فَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ نَصَبَ قَاسِمًا يَقْسِمُ بِالْاُجْرَةِ وَيَجِبُ اَنْ يَّكُوْنَ عَدْلًا مَامُوْنًا عَالِمًا بِالْقِسْمَةِ وَلَايُجْبِرُ الْقَاضِيْ النَّاسَ عَلٰى قَاسِمٍ وَاحِدٍ وَلَايَتْرُكُ الْقِسَامَ يَشْتَرِكُوْنَ وَاُجْرَةُ الْقِسَامِ عَلٰى عَدَدِ رُؤُوْسِهِمْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى قَدْرِ الْاَنْصِبَاءِ وَاِذَا حَضَرَ الشُّرَكَاءُ عِنْدَ الْقَاضِىْ وَفِىْ اَيْدِيْهِمْ دَارًا وَضَيْعَةٌ وَادَّعُوْا اَنَّهُمْ وَرِثُوْهَا عَنْ فُلَانٍ لَمْ يَقْسِمْهَا الْقَاضِىْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يُقِيْمُوا الْبَيِّنَةَ عَلٰى مَوْتِهٖ وَعَدَدِ وَرَثَتِهٖ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَقْسِمُهُمَا بِاِعْتِرَافِهِمْ وَيُذْكَرُ فِىْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ اَنَّهُ قَسَّمَهَا بِقَوْلِهِمْ۔

সরল অনুবাদ ঃ ইমামের উচিত যে, তিনি একজন বণ্টনকারী ঠিক করবেন যার বেতন বাইতুল মাল থেকে দেওয়া হবে, যাতে করে সে মানুষের মধ্যে বিনিময় ব্যতীত বণ্টন করে দেয়। আর যদি এটা সম্ভব না হয়, বিনিময় নিয়ে বন্টনকারীদেরকে নির্ধারিত করে দেবে। এবং তাকসীমকারী ইনসাফগার এবং আমানতদার এবং বণ্টন সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি হওয়া জরুরি। কাজি একজন বণ্টনকারীর ওপরই মানুষকে বাধ্য করবে না; এবং বণ্টনকারীদেরকে সন্ধি করার ব্যাপারে ছেড়ে দিবে না। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট তাকসীমকারীদের বিনিময় অংশীদারদের সংখ্যা অনুযায়ী হবে। ইমাম আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট অংশ হিসাবে হবে, যখন অংশীদাররা কাজির নিকট উপস্থিত হবে এবং তাদের দখলে বা অধীনে কোনো বাড়ি অথবা জমিন থাকে এবং তারা এ দাবি করে যে, আমরা অমুক থেকে মিরাস সূত্রে পেয়েছি। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফার (র.) নিকট কাজি উহাকে তাকসীম করাবে না; তারা ঐ ব্যক্তির মৃত্যু এবং ওয়ারিশদের সংখ্যার ওপর দলিল কায়েম করা পর্যন্ত। এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, তাদের স্বীকার করার ওপর বণ্টন করিয়া দেবে। এবং তাকসীমের রেজিস্টার খাতায় লিখে দেবে যে, তাদের কথার ওপর বণ্টন করানো হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاُجْرَةُ الْقِسْمَةِ الخ ঃ ইমাম আযম (র.)-এর নিকট কাসেমদের বিনিময় ওয়ারিশ এবং অংশীদারদের হিসাবে হবে।

সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.); ইমাম শাফিয়ী, ইমাম আহমদ এবং কোনো কোনো মালেকীদের নিকট অংশ হিসাবে হবে, অর্থাৎ যার যে পরিমাণ ভাগ হবে, তার থেকে সে অনুপাতে বিনিময় নেওয়া হবে। কেননা বেতন মিলিক তাকসীম করার খরচের মধ্যে থেকে এ জন্য মিলিক হিসাবে ঠিক করা হবে।

ইমাম আযম (র.) বলেন যে, প্রতিদান বা বেতন সুবিবেচনার কারণে দেওয়া হয়, আর সুবিবেচনার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা বণ্টনকারীর যে পরিমাণ কাজ বেশি অংশ ওয়ালার জন্য করবে সে পরিমাণ কম অংশ ওয়ালার জন্যও করতে হবে। আর হিসাব করা কখনো কম অংশের মধ্যে কষ্টকর হয় আবার কখনো বেশি অংশের মধ্যে এ জন্য মালিকানার হিসাব করা কঠিন। তাই শুধু পৃথক করা ও বণ্টন করা হিসাবে বণ্টনকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া হবে।

وَإِنْ كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ مِمَّا سِوَى الْعِقَارِ وَادَّعَوْا أَنَّهُ مِيْرَاثٌ قَسَمَهُ فِيْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا وَإِنِ ادَّعَوْا فِى الْعِقَارِ أَنَّهُمُ اشْتَرَوْهُ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَإِنِ ادَّعَوُا الْمِلْكَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا كَيْفَ انْتَقَلَ إِلَيْهِمْ قَسَمَهُ بَيْنَهُمْ وَإِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشُّرَكَاءِ يَنْتَفِعُ بِنَصِيْبِهِ قُسِمَ بِطَلَبِ أَحَدِهِمْ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ يَنْتَفِعُ وَالْآخَرُ يَسْتَضِرُّ لِقِلَّةِ نَصِيْبِهِ فَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْكَثِيْرِ قُسِمَ وَإِنْ طَلَبَ صَاحِبُ الْقَلِيْلِ لَمْ يُقْسَمْ وَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَسْتَضِرُّ لَمْ يَقْسِمْهُمَا إِلَّا بِتَرَاضِيْهِمَا وَيُقْسَمُ الْعُرُوْضُ إِذَا كَانَتْ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلَا يُقْسَمُ الْجِنْسَيْنِ بَعْضُهَا فِيْ بَعْضٍ إِلَّا بِتَرَاضِيْهَا وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يُقْسَمُ الرَّقِيْقُ وَلَا الْجَوَاهِرُ وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُقْسَمُ الرَّقِيْقُ وَلَا يُقْسَمُ الْحَمَّامُ وَلَا بِئْرٌ وَلَا رَحًى إِلَّا أَنْ يَتَرَاضَى الشُّرَكَاءُ وَإِذَا حَضَرَ وَارِثَانِ عِنْدَ الْقَاضِيْ وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি যৌথ মাল জমিন ব্যতীত হয় এবং তারা দাবি করে যে, এটা মিরাস তাহলে তাকে বণ্টন করিয়ে দেবে তাদের সকলের কথা অনুযায়ী। আর যদি জমিনের মধ্যে দাবি করে যে তারা এটাকে ক্রয় করেছে তাদের মধ্যে বণ্টন করিয়ে দিবে। এবং যদি মিলিকের দাবি করে এবং এ কথাকে উল্লেখ না করে যে, তাদের নিকট কিভাবে এসেছে তাও ভাগ করিয়ে দিবে। এবং যখন শরিকদারদের মধ্যে প্রত্যেকে নিজ অংশ দ্বারা লাভ উঠাতে পারে, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যে কোনো একজনে চাওয়ার দ্বারা ভাগ করিয়ে দিবে। আর যদি একজনে লাভ উঠাতে পারে অন্য জনে ক্ষতি পৌঁছে তার অংশ কম হওয়ার কারণে, তখন যদি বেশি অংশ ওয়ালা তাকসীমকে চায় তাকসীম করিয়ে দেবে। আর যদি কম অংশ ওয়ালা তাকসীমকে তলব করে তো তাকসীম করা হবে না। এবং যদি প্রত্যেকের ক্ষতি হয় তবে তাকসীম করবে না, কিন্তু তাদের সম্মতিক্রমে। এবং আসবাবপত্র ভাগ করে দিবে যখন ঐগুলো এক ধরনের হবে। এবং দুই প্রকারের জিনিস পত্র একটাকে অন্যটা দিয়ে ভাগ করবে না, কিন্তু তাদের সম্মতিক্রমে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, গোলামদেরকে এবং মনিমুক্তাসমূহ ভাগ করা যাবে না। এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এবং মুহাম্মদ (র.) বলেন, গোলামদেরকে ভাগ করা যাবে, হাম্মামখানা, কূপ, পানচাক্কী ভাগ করা যাবে না, কিন্তু যখন অংশীদারগণ সম্মত থাকে। এবং যখন দুই ওয়ারিশ কাজির নিকট উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুর ওপর প্রমাণ দাঁড় করায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِنِ ادَّعَوُا الْمِلْكَ الخ ঃ যখন কোনো জমিন তাদের কব্জায় থাকে এবং দাবি করে যে সেটা তার মিলিক এবং এ দাবি করে না যে, সে জমিন তার মিলিকে অন্যের থেকে প্রত্যাবর্তন হয়ে এসেছে। তবে সে জমিন তার স্বীকারোক্তির ওপর তাদের মধ্যে ভাগ করা যাবে। এ জন্য যে, এ ভাগের মধ্যে অন্যের ওপর ফয়সালা নয়। কেননা তারা এটা স্বীকার করেনি যে, তাদের গায়রের মিলিক ছিল।

যদি কয়েকটি জিনিস একই রকমের হয় যেমন– জিনিস যে কায়ল দ্বারা মাপা হয়, অথবা দাঁড়িপাল্লা দ্বারা মাপা হয়, অথবা গণনা করা হয়, অথবা স্বর্ণ রুপা হয় তো একজন শরিকদার চাওয়ার দ্বারা কাজি ভাগ করার ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারবে। অতএব এই তাকসীমটা উপযুক্ত তাকসীম হবে না বরং বদলা হবে। আর কাজির জবরদস্তির এখতিয়ার ঐ জায়গায় যেখানে তাকসীম উপযুক্তের অর্থে ব্যবহার হয় এ জন্য এখানে অংশীদারদের সন্তুষ্ট থাকার ওপর নির্ভর হবে; কাজীর জবরদস্তি এখতিয়ারের ওপর নয়।

যে সব বস্তু বণ্টন করা যাবে না ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يُقْسَمُ حَمَّامٌ الخ ঃ এ সমস্ত জিনিস ভাগ করা যাবে না। কেননা এগুলো ভাঙ্গার দ্বারা উভয়ের ক্ষতি, এ জন্য সমস্ত অংশীদারদের সম্মতি ব্যতীত এ সমস্ত জিনিসের ভাগ করা যাবে না।

عَلَى الْوَفَاتِ وعَدَدِ الْوَرَثَةِ وَالدَّارُ فِيْ اَيْدِيْهِمْ ومَعَهُمْ وَارِثٌ غَائِبٌ قَسَّمَهَا الْقَاضِيْ بِطَلَبِ الْحَاضِرِيْنَ وَنَصَبَ لِلْغَائِبِ وَكِيْلاً يَقْبَضُ نَصِيْبَهُ وَاِنْ كَانُوْا مُشْتَرِيْنَ لَمْ يُقَسِّمْ مَعَ غَيْبَةِ اَحَدِهِمْ وَاِنْ كَانَ الْعِقَارُ فِيْ يَدِ الْوَارِثِ الْغَائِبِ اَوْشَئٌ مِنْهُ لَمْ يُقَسِّمْ وَاِنْ حَضَرَ وَارِثٌ وَاحِدٌ لَمْ يُقَسِّمْ وَاِذَا كَانَتْ دُوْرٌ مُشْتَرِكَةٌ فِيْ مِصْرٍ وَاحِدٍ قُسِمَتْ كُلُّ دَارٍ عَلَى حِدَّتِهَا فِيْ قَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ كَانَ الْاَصْلَحُ لَهُمْ قِسْمَةُ بَعْضِهَا فِيْ بَعْضٍ قَسَمَهَا وَاِنْ كَانَتْ دَارًا وَضَيْعَةً اَوْ دَارًا وَحَانُوْتًا قُسِمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং ওয়ারিশদের সংখ্যার ওপর এবং বাড়ি তাদের দখলে এবং তাদের সাথে একজন অনুপস্থিত ওয়ারিশ থাকে তাহলে বাকি উপস্থিতিদের চাওয়ার ভাগ করে দেবে এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য একজন উকিল ঠিক করে দেবে যে তার অংশ কব্জা করবে। আর যদি তারা খরিদদার হয় একজনের অনুপস্থিতিতে ভাগ করবে না, আর যদি জমিন অনুপস্থিত ওয়ারিশের দখলে বা হাতে থাকে অথবা ঐ জমিনের কিছু অংশ ভাগ করবে না। আর যদি শুধু একজন ওয়ারিশ উপস্থিত হয় তো ভাগ করবে না এবং যদি কয়েকটি মালিকানা বাড়ি এক শহরে থাকে, তো ইমাম আযম (র.)-এর এক ভাষ্য অনুযায়ী প্রত্যেকটাকে পৃথকভাবে ভাগ করবে। হযরত আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, যদি একটাকে অন্যটার মধ্যে ভাগ করা তাদের জন্য ভাল হয়, তাহলে ভাগ করে দেবে। আর যদি বাড়ি এবং জমি অথবা বাড়ি এবং দোকান হয় তাহলে প্রত্যেকটাকে পৃথক পৃথক ভাগ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانُوْا مُشْتَرِيْنَ الخ ঃ যদি ভাগ তালাশকারী ক্রেতা হয়, অর্থাৎ তাদের শরিকদার ওয়ারিশ সূত্রে নয় এবং ক্রয়ের দ্বারা হয় এবং তাদের একজন অনুপস্থিত হয় তো উপস্থিতিদের চাওয়ার ওপর ভাগ হবে না। কেননা যে মিলিক কিনার দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে সেটা নতুন মিলিক; সুতরাং উপস্থিত অংশীদার অনুপস্থিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে 'খাসেম' হতে পারে না ওয়ারিশ সূত্রের বিপরীত, যে ঐ মিলিকটা কেবল মূল ব্যক্তির পক্ষ থেকে মিলিকের স্থলাভিষিক্ত হয়।

قَوْلُهُ دُوْرٌ مُشْتَرِكَةٌ الخ ঃ যদি কয়েকটি বাড়ি মিলিত থাকে এবং একই শহরে সমস্ত শরিকদার উপস্থিত থাকে তো ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট সেগুলো থেকে প্রত্যেকটাকে পৃথক পৃথক ভাগ করা হবে। চাই একসাথে মিলিত হোক অথবা এক শহরের দুই পাড়ায় হোক। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট পৃথক পৃথক ভাগ করা জরুরি নয়; বরং এভাবেও করা যেতে পারে যে, একটা বাড়ি একজনে এবং অন্য বাড়ি দ্বিতীয়জনে নিয়ে নেবে। কেননা এটা নাম এবং আকৃতির দিক দিয়ে একই প্রকার আর মতভেদ উদ্দেশ্য অনুপাতে বিভিন্ন প্রকার। এ জন্য তাদের ব্যাপার কাজির রায়ের ওপর ছেড়ে দেওয়া হবে। যে শরিকদারদের মধ্যে যে সুরত উত্তম হয় উহার ওপর আমল করবে। ইমাম আযম (রা.) বলেন, যে মহল্লা এবং পড়শীদের ভাল খারাপ হওয়া অনুযায়ী মসজিদ এবং পানি নিকটে এবং দূরে হওয়া অনুযায়ী বাড়ির উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রকার হয় যার মধ্যে সমান সমান হওয়া অসম্ভব। এজন্য এক বাড়ির মধ্যে এক অংশীদারের অংশ পরস্পরের মধ্যে রাজি থাকা ব্যতীত একত্রিত করা যায় না। যদি এক বাড়ি এবং জমিন অথবা বাড়ি এবং বাড়ি মিলিত হয় তাহলে প্রত্যেকটার ভাগ পৃথক পৃথক হবে।

وَيَنْبَغِي لِلْقَاسِمِ اَنْ يُصَوِّرَ مَا يُقَسِّمُهُ وَيَعْدِلُهُ وَيَذْرَعُهُ وَيَقُوْمُ الْبِنَاءُ وَيُفْرِدُ كُلَّ نَصِيْبٍ عَنِ الْبَاقِيْ بِطَرِيْقِهِ وَشُرْبِهِ حَتّٰى لَايَكُوْنَ لِنَصِيْبِ بَعْضِهِمْ بِنَصِيْبِ الْاٰخَرِ تَعَلُّقٌ وَيَكْتُبُ اَسَامِيْهِمْ وَيَجْعَلُهَا قُرْعَةً ثُمَّ يُلَقِّبُ نَصِيْبًا بِالْاَوَّلِ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ بِالثَّانِيْ وَالَّذِيْ يَلِيْهِ بِالثَّالِثِ وَعَلٰى هٰذَا ثُمَّ يَخْرُجُ الْقُرْعَةُ فَمَنْ خَرَجَ اِسْمُهُ اَوَّلًا فَلَهُ السَّهْمُ الْاَوَّلُ وَمَنْ خَرَجَ ثَانِيًا فَلَهُ السَّهْمُ الثَّانِيْ وَلَايَدْخُلُ فِي الْقِسْمَةِ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيْرُ اِلَّا بِتَرَاضِيْهِمْ فَاِنْ قُسِّمَ بَيْنَهُمْ وَلِاَحَدِهِمْ مَسِيْلٌ فِيْ مِلْكِ الْاٰخَرِ اَوْطَرِيْقٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فِي الْقِسْمَةِ فَاِنْ اَمْكَنَ صَرْفُ الطَّرِيْقِ وَالْمَسِيْلِ عَنْهُ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَسْتَطْرِقَ وَيَسِيْلَ فِيْ نَصِيْبِ الْاٰخَرِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَخَتِ الْقِسْمَةُ وَاِذَا كَانَ سِفْلٌ لَاعِلْوَلَهُ اَوْ عِلْوٌ لَاسِفْلَ لَهُ اَوْ سِفْلٌ لَهُ عِلْوٌ قَوْمٍ كُلُّ وَاحِدٍ عَلٰى حِدَتِهِ وَقُسِّمَ بِالْقِسْمَةِ وَلَايُعْتَبَرُ بِغَيْرِ ذَالِكَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং ভাগকারীর উচিত যে, সে যে জিনিসটাকে ভাগ করবে তার নক্শা করে নেওয়া এবং সমান সমান করে মেপে দেবে এবং ঘরের দাম ঠিক করবে এবং প্রত্যেকের অংশ অন্যদের থেকে পৃথক করে দেবে তার রাস্তা এবং পানির নালা থেকে যাতে করে একজনের অংশ অন্য জনের অংশের সাথে কোনো সম্পর্ক না থাকে এবং তাদের নাম লিখে নেবে। অতঃপর লটারি বানিয়ে নেবে এবং এক অংশকে প্রথম জনের সাথে এবং তার সমপর্যায় জনকে দ্বিতীয় জনের সাথে এবং তার সমপর্যায় জনকে তৃতীয় জনের সাথে এরকমভাবে নাম রাখা হবে, এরপর লটারী বের করবে। সুতরাং যার নাম প্রথমে বের হবে তার জন্য প্রথম অংশ হবে এবং যার নাম দ্বিতীয় বার বের হবে তার জন্য দ্বিতীয় অংশ এবং ভাগের মধ্যে দিরহাম দিনার থাকবে না; কিন্তু তাদের খুশি অনুযায়ী। সুতরাং যদি ঘর তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং কারো পানির নালা অথবা রাস্তা অপরের মিলিকে পড়ে যায়, অথচ ভাগের মধ্যে এটার শর্ত ছিল না। অতঃপর যদি তার পক্ষ থেকে রাস্তা অথবা পানির নালা সরানো সম্ভব হয় তাহলে তার জন্য জায়েজ হবে না যে, সে অন্যের অংশে রাস্তা অথবা পানির নালা বের করবে। আর যদি সম্ভব না হয় তো ভাগ ভেঙ্গে যাবে। আর যখন নিচ তলা ভবন এমন হয় যে, তার ওপরের ভবন নয় অথবা ওপরের ভবন এরকম হয় যে, তার নিচের ভবন তার না অথবা নিচ তলা এবং ওপরের তলা উভয়টা হয় তো প্রত্যেকটার পৃথক দাম ধরে ভাগ করা হবে। এটা ব্যতীত অন্যটার ধর্তব্য করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ يَنْبَغِي لِلْقَاسِمِ الخ ঃ ভাগ করার নিয়ম এই যে, বণ্টনকারী একটা কাগজের ওপর বাড়ি অথবা জমিনের যেটার সে ভাগ করতে চায় একটা নক্শা বানিয়ে নেবে।

وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَقَاسِمُوْنَ فَشَهِدَ الْقَاسِمَانِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا وَإِنِ ادَّعٰى اَحَدُهُمَا الْغَلَطَ وَ زَعَمَ اَنَّهُ اَصَابَهُ شَيْءٌ فِيْ يَدِ صَاحِبِهِ وَقَدْ اَشْهَدَ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْاِسْتِيْفَاءِ لَمْ يُصَدَّقْ عَلٰى ذٰلِكَ اِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَإِنْ قَالَ اِسْتَوْفَيْتُ حَقِّيْ ثُمَّ قَالَ اَخَذْتُ بَعْضَهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ خَصْمِهِ مَعَ يَمِيْنِهِ وَإِنْ قَالَ اَصَابَنِيْ اِلٰى مَوْضِعِ كَذَا فَلَمْ يُسَلِّمْهُ اِلَيَّ وَلَمْ يَشْهَدْ عَلٰى نَفْسِهِ بِالْاِسْتِيْفَاءِ وَكَذَّبَهُ شَرِيْكُهُ تَحَالَفَا وَفُسِخَتِ الْقِسْمَةُ وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ نَصِيْبِ اَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ لَمْ تُفْسَخِ الْقِسْمَةُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ ذَالِكَ مِنْ نَصِيْبِ شَرِيْكِهِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ (رح) تُفْسَخُ الْقِسْمَةُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আর যখন ভাগ গ্রহণকারীগণ পরস্পর ইখতেলাফ করে এবং দু'জন তাকসীমকারী সাক্ষ্য দেয় তো ঐ উভয়জনের সাক্ষী গ্রহণ করা হবে, আর যদি শরিকদারদের মধ্যে একজনে ভুলের দাবি করে এবং বলে যে, আমার কিছু অংশ অন্যের কব্জায় আছে অথচ সে নিজে স্বীকার করেছিল যে, নিজ হক নিয়ে নেওয়ার তো তাকে বিশ্বাস করা যাবে না কিন্তু প্রমাণ ও দলিলের ভিত্তিতে। আর যদি বলে যে, আমি আমার হক নিয়ে নিয়েছি এর পরে বলে যে, আমি কিছু অংশ নিয়েছি তো তার বিপক্ষের কথা গ্রহণযোগ্য হবে তার কসমের সাথে। আর যদি সে বলে যে, আমার ভাগে অমুক জায়গা পর্যন্ত পৌঁছেছে এবং আমাকে সে পর্যন্ত দেয়নি এবং সে পুরোপুরী নেওয়ার স্বীকার করেনি আর তার অংশীদার তাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, তো উভয়জন শপথ করবে এবং ভাগ ভেঙ্গে যাবে আর যদি তাদের মধ্য থেকে কোনো এক ব্যক্তির কিছু অংশ তার শরিকদারের মধ্যে পাওয়া যায় তো ইমাম আযম (র.)-এর নিকট ভাগ ভঙ্গ হবে না; বরং সে পরিমাণ অংশ নিজের শরিকদারের অংশ থেকে নিয়ে নেবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, ভাগ ভেঙ্গে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَقَاسِمُوْنَ الخ ঃ বণ্টন হয়ে যাওয়ার পর কোনো অংশীদার বলল যে, আমার পূর্ণ প্রাপ্য মিলেনি এবং দুই বণ্টনকারী সাক্ষ্য দিল যে, সে পূর্ণ হক নিয়েছে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট সাক্ষ্য কবুল হবে। ইমাম মুহাম্মদ ও তিন ইমামের নিকট কবুল হবে না। কেননা তার এ সাক্ষ্য স্বয়ং তার কর্মের ওপর যার মধ্যে অপবাদের সম্ভাবনা। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, তাদের কাজ হচ্ছে বণ্টন করা। আর সাক্ষ্য হক পূর্ণ করার ওপর যা দ্বিতীয় ব্যক্তির কাজ। যদি কোনো অংশীদার এটা বলল যে, বণ্টন করার মধ্যে ভুল হয়ে গেছে এবং আমার কিছু অংশ দ্বিতীয় অংশীদারের কবজায় আছে অথচ সে প্রথমে তার অংশ উসুল করার স্বীকার করে নিয়েছে, তাহলে সাক্ষ্য ব্যতীত তার সত্যায়ন হবে না। কেননা পূর্ণ বণ্টনের পর তার ফসখের দাবিদার।

قَوْلُهُ وَإِنْ قَالَ اَصَابَنِيْ الخ ঃ এ স্থলে উভয়ে শপথ করবে এবং বণ্টন ফসখ হয়ে যাবে। কেননা যা উসুল করেছে উহাতে মতানৈক্য হওয়ার কারণে আক্দ পূর্ণ হয়নি।

كِتَابُ الْإِكْرَاهِ

বাধ্য করার পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) কাজা ও কিসমত তথা বিচার-আচারের বিধানাবলী ও ভাগ-বণ্টনের বিধানাবলী, যা, বিচার-আচারে বিধানাবলীর সাথে সম্পৃক্ত এগুলো বর্ণনা করার পর এখন একরাহ্ তথা কাউকে বাধ্য করার বিধানাবলী বর্ণনা করা এ জন্য আরম্ভ করেছেন যে, قَضَاءٌ বলা হয় إِلْزَامُ الْحَقِّ بِالْحَقِّ مِنَ الْحَقِّ -কে অর্থাৎ কোনো সত্য অধিকারকে সত্যের মাধ্যমে অন্যের ওপর অধিকারের অভিযোগ করা। আর اِكْرَاهٌ বলা হয় إِجْبَارُ الْبَاطِلِ بِالْبَاطِلِ مِنَ الْبَاطِلِ -কে অর্থাৎ কোনো বাতেলকে বাতিল তথা মিথ্যার মাধ্যমে অন্যের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়া। অতএব حَقٌّ-এর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় যেহেতু بَاطِلٌ আসে তাই এখানে حَقٌّ ও بَاطِلٌ -এর মধ্যে স্পষ্ট যোগসূত্র পাওয়া গেল।

اِكْرَاهٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ اِكْرَاهٌ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– কাউকে জবরদস্তী ও বাধ্য করা। اِكْرَاهٌ এটা বাবে اِفْعَالٌ-এর مَصْدَرٌ

اِكْرَاهٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ اِكْرَاهٌ দু' প্রকার ঃ (১) مُلْجِئٌ (২) غَيْرُ مُلْجِئٍ

(১) مُلْجِئٌ বলা হয় যার মধ্যে বাধ্যকৃত ব্যক্তির জান বা কোনো অঙ্গ ধ্বংস হওয়ার ভয়ভীতি থাকে ঐ অবস্থায় বাধ্যকৃত ব্যক্তির সন্তুষ্টি চলে যায়। এ সুরতে বাধ্যকৃত ব্যক্তির সন্তুষ্টি বিলুপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং সন্তুষ্টি বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া ইচ্ছা বাদ হওয়া থেকে ব্যাপক। কেননা সন্তুষ্টির মোকাবেলায় অসন্তুষ্টি, আর ইচ্ছার মোকাবেলায় জোরপূর্বক। এবং বাধা দেওয়া এবং মারার বাধ্যবাধকতার মধ্যে নিঃসন্দেহে অপছন্দনীয়তা বিদ্যমান রয়েছে। তবে সন্তুষ্টি বিলুপ্ত। কিন্তু ইচ্ছা শুদ্ধতার সাথে বাকি আছে। কেননা ইচ্ছা ঐ সময় বাতিল হয়ে যায়, যখন জান অথবা কোনো অঙ্গ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হয়।

(২) غَيْرُ مُلْجِئٍ বলা হয় যার মধ্যে বাধ্যকৃত ব্যক্তির জান বা কোনো অঙ্গ ধ্বংস হওয়ার আশঙ্কা ও ভয়ভীতি থাকে না। সুতরাং একরাহে গায়রে মুলজি ঐ সব কর্মকাণ্ডসমূহের মধ্যে প্রভাব বিস্তারকারী হবে, যার মধ্যে সন্তুষ্টির মুখাপেক্ষী হয়, যেমন– বাধ্যবাধতামূলক বেচাকেনা, ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি। এবং একরাহে মুলজি সমস্ত কর্মকাণ্ডে প্রভাব বিস্তার করবে।

اِكْرَاهٌ مُلْجِئٌ وَغَيْرُ مُلْجِئٍ-এর বিধান ঃ اِكْرَاهٌ مُلْجِئٌ-এর বিধান এই যে, ঐ সময় কোনো হারাম কাজ যেমন মদ্যপান করা ইত্যাদি কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েজ এবং ঐ অবস্থার কার্যক্রমসমূহ সন্তুষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

اِكْرَاهٌ غَيْرُ مُلْجِئٍ-এর বিধান এই যে, এই প্রকারের اِكْرَاهٌ -এর মধ্যে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়া জায়েজ নেই। হাঁ বিক্রি ইত্যাদি কার্যক্রমের মধ্যে اِكْرَاهٌ চলে গেলে বাধ্যকৃত ব্যক্তির ক্ষমতা বাকি থাকবে।

تَصَرُّفَاتُ مُكْرَهٍ-এর প্রকারভেদ ঃ تَصَرُّفَاتُ مُكْرَهٍ দু'প্রকার ঃ (১) مَالَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ অর্থাৎ যা বাতিল হওয়া সম্ভব নয়। যেমন– তালাক, মুক্ত করা, মোদাব্বার বানানো ইত্যাদি। এটা সাথে সাথে জারি ও বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। (২) مَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ অর্থাৎ যা বাতিল হওয়া সম্ভব। যেমন– বিক্রয় ইত্যাদি এটার বিধানে সামান্য বিশ্লেষণ আছে। যদি ক্রয়কারী প্রমুখ উহাতে এরূপ কাজ না করে যা বাতিল হওয়া অসম্ভব, তবে ঐ সময় বিক্রয়কারী প্রমুখ স্বীয় কার্য বাতিল করার এবং স্থির রাখার অনুমতি হবে। আর যদি উহাতে এরূপ কার্য করে ফেলে যা বাতিল করা সম্ভব নয় যেমন মুক্ত করা, মোদাব্বার করা, মানত করা ইত্যাদি। তবে ঐ সময় এসব কার্যক্রম জারি হয়ে যাবে এবং ক্রয়কারী অধিগৃহীত বস্তুর قِيْمَتٌ দেওয়া ওয়াজিব হবে ثَمَنٌ নয়। হ্যাঁ, যদি বাধ্যকৃত ব্যক্তির বাধ্যকতা চলে যাওয়ার পর সন্তুষ্টির সাথে অনুমোতি দিয়ে দেয় তবে বাধ্যকৃত ব্যক্তির সকল প্রকার কার্যক্রম জারি ও স্থির থাকবে।

اَلْاِكْرَاهُ يَثْبُتُ حُكْمُهُ اِذَا حَصَلَ مِمَّنْ يَّقْدِرُ عَلٰى اِيْقَاعِ مَا يُوْعَدُ بِهٖ سُلْطَانًا كَانَ اَوْلِصًّا وَاِذَا اُكْرِهَ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ مَالِهٖ اَوْ عَلٰى شِرَاءِ سِلْعَةٍ اَوْ عَلٰى اَنْ يَقِرَّ لِرَجُلٍ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ اَوْ يُوْجِرُ دَارَهٗ وَاُكْرِهَ عَلٰى ذَالِكَ بِالْقَتْلِ اَوْ بِالضَّرْبِ الشَّدِيْدِ اَوْ بِالْحَبْسِ فَبَاعَ اَوِاشْتَرٰى فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَمْضَى الْبَيْعَ وَاِنْ شَاءَ فَسَخَهٗ وَرَجَعَ بِالْمَبِيْعِ فَاِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ طَوْعًا فَقَدْ اَجَازَ الْبَيْعَ وَاِنْ قَبَضَهٗ مُكْرَهًا فَلَيْسَ بِاِجَازَةٍ وَعَلَيْهِ رَدُّهٗ اِنْ كَانَ قَائِمًا فِىْ يَدِهٖ وَاِنْ هَلَكَ الْمَبِيْعُ فِىْ يَدِ الْمُشْتَرِىْ وَهُوَ غَيْرُ مُكْرَهٍ ضَمِنَ قِيْمَتَهٗ.

সরল অনুবাদ ঃ একরাহ (বাধ্য করা)-এর বিধান স্থির হবে যখন এরূপ ব্যক্তির থেকে বাধ্য করা হবে যে ধমকি সংঘটিত করার ওপর ক্ষমতাবান হয় (চাই) সে রাষ্ট্রপ্রধান হোক বা চোর। এবং যদি কাউকে স্বীয় মাল বিক্রি করা বা কোনো আসবাব ক্রয় করা বা কারো জন্য এক হাজার দিরহামের স্বীকার করা বা স্বীয় বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ওপর বাধ্য করা হয় আর তাকে হত্যা করার বা কঠোরভাবে মারার বা বন্দী করার ধমকি দেওয়ার সাথে বাধ্য করা হয়। এরপর সে বিক্রয় করল বা ক্রয় করল তবে তার অধিকার আছে, চাইলে বিক্রয়কে ঠিক রাখবে চাইলে ভঙ্গ করে দেবে। আর বিক্রিত মাল ফেরত নিয়ে নেবে, যদি সে মূল্যকে খুশির সাথে গ্রহণ করে থাকে তবে বুঝা যাবে যেন বিক্রয়কে বৈধ করে দিয়েছে। আর যদি (মূল্য) বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে থাকে তবে এটা (তার পক্ষ থেকে) অনুমতি হবে না। যদি তার কাছে মূল্য থাকে মূল্য ফেরত দিয়ে দেবে, (এ অবস্থায়) যদি ক্রয়কারীর কাছে বিক্রিত মাল ধ্বংস হয়ে যায় অথচ ক্রয়কারী বাধ্যকৃত ছিল না তবে তার মূল্য পরিশোধ করার জিম্মাদার হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا اُكْرِهَ الرَّجُلُ الخ ঃ তার সমষ্টিগত কায়দা এই যে, আহনাফ তথা হানাফি মাযহাবীর অনুসারীদের নিকট বাধ্যকৃত ব্যক্তির সব ব্যাপার কথার দিক দিয়ে সংঘটিত হবে। এখন যে চুক্তিসমূহ বাতিল হওয়া সম্ভব যেমন– বেচাকেনা, ভাড়া দেওয়া ইত্যাদি সেগুলো সে বাতিল করতে পারবে। এবং যে চুক্তিসমূহ বাতিল হওয়া সম্ভব নয়, যেমন– বিবাহ, তালাক, আজাদ করা, গোলামকে মোদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ বানানো এবং (নজর) মানত ইত্যাদি এগুলোকে বাতিল করা যায় না; বরং তা জরুরি হয়ে যায়। তা বাকি তিন ইমামের নিকট জরুরি নয়।

قَوْلُهٗ وَاِنْ هَلَكَ الخ ঃ বিক্রেতা জোরপূর্বক একটা জিনিস বিক্রি করেছে এবং ক্রয়কারী বিনামূল্যে তা ক্রয় করে নিল, অতঃপর মাল ক্রয়কারীর কাছে ধ্বংস হয়ে গেল, তাহলে ক্রয়কারী বিক্রয়কারীকে তার মূল্য জরিমানা দেবে। কেননা বাধ্যকৃত ব্যক্তির বেচাকেনা বাতিল এবং বাতিল বেচা-কেনার মধ্যেও মালের জরিমানা ক্রয়কারী দিতে হয় কিন্তু বাধ্যকৃত ব্যক্তির এটাও ইচ্ছা যে, বাধ্যকারী থেকে মূল্যের জরিমানা নিয়ে নেবে। এ সুরতে বাধ্যকৃত ব্যক্তি ক্রয়কারী থেকে উসুল করে নেবে।

وَلِلْمُكْرَهِ اَنْ يَّضْمَنَ الْمُكْرِهَ اِنْ شَاءَ وَاِنْ اُكْرِهَ عَلٰى اَنْ يَّاْكُلَ الْمَيْتَةَ اَوْ يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَاُكْرِهَ عَلٰى ذَالِكَ بِحَبْسٍ اَوْ بِضَرْبٍ اَوْ قَيْدٍ لَمْ يَحِلَّ لَهٗ اِلَّا اَنْ يُّكْرَهَ بِمَا يَخَافُ مِنْهُ عَلٰى نَفْسِهٖ اَوْ عَلٰى عُضْوٍ مِنْ اَعْضَائِهٖ فَاِذَا خَافَ ذَالِكَ وَسِعَهٗ اَنْ يُّقْدِمَ عَلٰى مَا اُكْرِهَ عَلَيْهِ وَلَا يَسَعُهٗ اَنْ يَّصْبِرَ عَلٰى مَا تُوْعِدَ بِهٖ فَاِنْ صَبَرَ حَتّٰى اَوْقَعُوْا بِهٖ وَلَمْ يَاْكُلْ فَهُوَ اٰثِمٌ وَاِذَا اُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ بِاللّٰهِ تَعَالٰى وَبِسَبِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِقَيْدٍ اَوْ حَبْسٍ اَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَكُنْ ذٰلِكَ اِكْرَاهًا حَتّٰى يُكْرَهَ بِاَمْرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلٰى نَفْسِهٖ اَوْ عَلٰى عُضْوٍ مِنْ اَعْضَائِهٖ فَاِذَا خَافَ عَلٰى ذَالِكَ وَسِعَهٗ اَنْ يُّظْهِرَ مَا اَمَرُوْهُ بِهٖ وَيُوَرِّى فَاِذَا اَظْهَرَ ذَالِكَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَاِنْ صَبَرَ حَتّٰى قُتِلَ وَلَمْ يُظْهِرِ الْكُفْرَ كَانَ مَاجُوْرًا ـ

__সরল অনুবাদ ঃ__ আর যাকে বাধ্য করা হয়েছে সে যদি চায় তবে বাধ্যকারী থেকে ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে। এবং যদি মৃত খাওয়া বা মদ্য পান করার ওপর বন্দী করার বা মেরে ফেলার ধমকি দ্বারা বাধ্য করা হয় তবে তার জন্য হালাল হবে না। হ্যাঁ যদি এরূপ ধমকি দ্বারা বাধ্য করা হয় যার কারণে স্বীয় জান বা কোনো অঙ্গের (ক্ষতির) আশঙ্কা হয়, তখন ঐ আশঙ্কার সময় যার ওপর বাধ্য করা হয়েছে সে কাজ করা বৈধ, তারপরও যদি সে বাধ্যকারীর কথা অনুযায়ী না খায় ও বাধ্যকারীর অঙ্গীকারকৃত শাস্তির ওপর ধৈর্য ধারণ করে তবে সে গুনাহগার হবে। এবং যখন আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করার ওপর বা নবী করীম (সা.)-কে মন্দ বলার ওপর বন্দী করার বা হত্যা করার ধমকি দ্বারা বাধ্য করা হয় তবে এটা (প্রকৃত) এক্রাহ বা বাধ্য করার মধ্যে শামিল হবে না। শেষ পর্যন্ত যদি এরূপ ধমকী দ্বারা বাধ্য করা হয় যার দ্বারা জানের ওপর বা কোনো অঙ্গের ওপর আশঙ্কা হয় তখন ঐরূপ আশঙ্কার সময় যার নির্দেশ করেছে তা প্রকাশ করা বৈধ আছে। আর তার প্রকাশ تَوْرِيَةٌ দ্বারা করবে, অতএব যখন সে কুফরি বাক্য প্রকাশ করবে অথচ তার অন্তর ঈমানের দ্বারা প্রশান্তি লাভকারী তখন তার গুনাহ হবে না, আর যদি (এরূপ অবস্থায়) সে ধৈর্য ধারণ করে এবং তাকে হত্যা করা হয় তথাপিও কুফর প্রকাশ করেনি তবে সে ছওয়াব প্রাপ্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ وَاِذَا اُكْرِهَ عَلَى الْكُفْرِ الخ ঃ যদি কাউকে মারপিট করে হুমকি দিয়ে কুফরি কালাম অথবা হুযূর (সা.)-কে গালি দেওয়ার ওপর বাধ্য করে, তাহলে এটা বাধ্যকতা হবে না। এবং যদি জান হত্যা অথবা অঙ্গ কাটার হুমকি দেওয়া হয়, তাহলে তার জন্য মুখে বলার অনুমতি আছে। শর্ত হলো তার অন্তর ঈমানের সাথে মজবুত থাকতে হবে। কেননা আল্লাহ বলেছেন- اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ (الاية) কিন্তু যদি সে এ অবস্থায় ধৈর্য ধরে এবং মুখে কুফরি কালাম করল না, তাহলে প্রতিদানের উপযুক্ত হবে। এমনিভাবে যদি জান হত্যা অথবা অঙ্গ কাটার হুমকি দিয়ে কোনো মুসলমানের মাল ধ্বংসের ওপর বাধ্য করে, তাহলে তার জন্য তা অনুমতি আছে। যদি ধ্বংস না করে কষ্টের ওপর ধৈর্য ধরে, তাহলে ছওয়াব পাবে।

وَاِنْ اُكْرِهَ عَلٰى اِتْلَافِ مَالِ مُسْلِمٍ بِاَمْرٍ يَخَافُ مِنْهُ عَلٰى نَفْسِهٖ اَوْعَلٰى عَضْوٍ مِنْ اَعْضَائِهٖ وَسِعَهٗ اَنْ يَّفْعَلَ ذٰلِكَ وَلِصَاحِبِ الْمَالِ اَنْ يُّضَمِّنَ الْمُكْرِهَ وَاِنْ اُكْرِهَ بِقَتْلٍ عَلٰى قَتْلِ غَيْرِهٖ لَمْ يَسَعْهُ اَنْ يُّقْدِمَ عَلَيْهِ وَيَصْبِرُ حَتّٰى يُقْتَلَ فَاِنْ قَتَلَهٗ كَانَ اٰثِمًا وَالْقِصَاصُ عَلَى الَّذِىْ اَكْرَهَ اِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا وَاِنْ اُكْرِهَ عَلٰى طَلَاقِ اِمْرَأَتِهٖ اَوْ عِتْقِ عَبْدِهٖ فَفَعَلَ وَقَعَ مَا اُكْرِهَ عَلَيْهِ وَيَرْجِعُ عَلَى الَّذِىْ اَكْرَهَهٗ بِقِيْمَةِ الْعَبْدِ وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهْرِ الْمَرْأَةِ اِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ وَاِنْ اُكْرِهَ عَلَى الزِّنَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا اَنْ يُّكْرِهَهُ السُّلْطَانُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ وَاِذَا اُكْرِهَ عَلَى الرِّدَّةِ لَمْ تَبِنْ اِمْرَأَتُهٗ مِنْهُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি মুসলমানের মাল নষ্ট করার জন্য এরূপ ধমকি দ্বারা বাধ্য করা হয় যার দ্বারা জান বা কোনো অঙ্গের ওপর আশঙ্কা হয় তখন ঐ কাজ করা বৈধ। এবং মালের মালিক বাধ্যকারী থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নেবে। আর যদি হত্যা করার ধমকি দিয়ে অন্যকে হত্যা করার জন্য বাধ্য করা হয় তবে তাকে হত্যা করা বৈধ নয়, বরং ধৈর্য ধারণ করবে। আর শেষ পর্যন্ত হত্যা হয়ে যাবে, (এ অবস্থায়) হত্যাকারী গুনাহগার হবে। যদি হত্যা ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে তবে বাধ্যকারীর ওপর কেসাস (তথা জানের বদলায় জান) আসবে। এবং যদি স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার বা স্বীয় গোলামকে মুক্ত করার ওপর বাধ্য (জোর) করা হয় আর সে করে ফেলে তবে উহা পতিত হয়ে যাবে। যার ওপর বাধ্য (জোর) করা হয়েছে, আর যে ব্যক্তি বাধ্য করেছে তার থেকে গোলামের মূল্য আর স্ত্রীকে যদি সঙ্গম না করে থাকে তবে স্ত্রীর অর্ধেক মোহর নিয়ে নেবে। আর যদি জেনা (ব্যভিচার)-এর জন্য বাধ্য করা হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে তার ওপর হদ ওয়াজিব। হ্যাঁ যদি রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে বাধ্য করা হয় (তখন হদ ওয়াজিব নয়)। সাহেবাইন (র.) বলেন, (যাকে জেনার ওপর বাধ্য করা হয়েছে) তার ওপর হদ ওয়াজিব নয় এবং যদি মোরতাদ (তথা ধর্মদ্রোহী) হওয়ার ওপর বাধ্য করা হয় তবে তার স্ত্রী তালাকে বায়েন হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ كَانَ اٰثِمًا الخ ঃ কেননা মুসলমানকে হত্যা করা হারাম, প্রয়োজনের কারণে (মুবাহ) সহীহ হবে না।

قَوْلُهٗ عَلٰى طَلَاقِ الخ ঃ তালাক, আবাদ হওয়া আহনাফের নিকট তথা হানাফী মাযহাবে বাধ্যতার সময় পতিত হয়ে যায়। শাফেয়ী (র.)-এর মত এর বিপরীত, যেমন কিতাবুত তালাক-এর মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে। –(আল্‌মিছবাহুন্নূরী)

كِتَابُ السِّيَرِ
যুদ্ধ পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) একরাহ বা বাধ্যকরণ পর্বের পর যুদ্ধ পর্বকে অনার যোগসূত্র এই যে, বাধ্যকরণের মধ্যে যেমন মানুষ কষ্টক্লেশ সহ্য করতে হয় ঠিক তেমনি যুদ্ধের মধ্যেও কষ্টক্লেশ সহ্য করতে হয়।

سِيَرٌ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ سِيَرٌ এটা سِيْرَةٌ-এর বহুবচন। سِيَرٌ শব্দের অর্থ– অভ্যাস; নিয়ম, জীবন পদ্ধতি।

سِيَرٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় سِيَرٌ বলা হয় কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধ সম্পর্কীয় কার্যক্রমকে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার বিধান ঃ কুরআনে কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন– وَقَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ

অর্থ ঃ আর লড়াই করো আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের সাথে যারা লড়াই করে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না।

অন্যত্র এরশাদ হচ্ছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ يَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ হে মু'মিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেবে। তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধনসম্পদ ও জীবনপণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বুঝতে। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে দাখিল করাবেন যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং বসবাসের জন্য জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে এটা মহাসাফল্য এবং আরও একটি অনুগ্রহ দেবেন যা তোমরা পছন্দ করো আল্লাহর পক্ষ হতে সাহায্য এবং আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে এর সুসংবাদ দান করুন।–(সূরা সফ)

اَلْجِهَادُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ اِذَا قَامَ بِهٖ فَرِيْقٌ مِنَ النَّاسِ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِيْنَ وَاِنْ لَمْ يَقُمْ بِهٖ اَحَدٌ اٰثِمَ جَمِيْعُ النَّاسِ بِتَرْكِهٖ وَقِتَالُ الْكُفَّارِ وَاجِبٌ وَاِنْ لَّمْ يَبْدَؤُنَا وَلَايَجِبُ الْجِهَادُ عَلٰى صَبِيٍّ وَلَاعَبْدٍ وَلَا اِمْرَأَةٍ وَلَا اَعْمٰى وَلَا مُقْعَدٍ وَلَا اَقْطَعَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ জিহাদ ফরজে কেফায়া। যদি কিছু লোক আদায় করে নেয়, তাহলে বাকিদের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি কেউ না করে তাহলে তা ছাড়ার কারণে সবাই গুনাহগার হবে। এবং কাফিরদেরকে কতল করা ওয়াজিব, যদিও তারা শুরু না করে। ছোট ছেলে, গোলাম, মহিলা, অন্ধ ও লুলা পঙ্গুর ওপর জিহাদ ওয়াজিব নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ الْجِهَادُ الخ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ جِهَادٌ শব্দটি جُهْدٌ হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো– প্রচেষ্টা, সাধনা, চেষ্টা, পরিশ্রম ইত্যাদি। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেন, اَلْجِهَادُ-এর জীম অক্ষরটি যের বিশিষ্ট, এর আভিধানিক অর্থ হলো– পরিশ্রম।

جِهَادٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ্‌র দীনকে প্রতিষ্ঠা করার নিমিত্তে বিভিন্ন উপায়ে প্রচেষ্টা চালানোকে جِهَادٌ বলে। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেন, শরিয়তের পরিভাষায় جِهَادٌ বলে কাফিরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রচেষ্টা চালানো, চাই মুজাহিদীনের সহযোগিতার মাধ্যমে হোক। অথবা পরামর্শদানের মাধ্যমে হোক কিংবা লেখনীর দ্বারা হোক। ইত্যাকার যে কোনো পন্থায়।

জিহাদের হুকুমের মধ্যে মতভেদ ঃ (ক) একদল আলিমগণের মতে জিহাদ ফরজে কেফায়া। তাঁদের দলিলসমূহ নিম্নরূপ। আল্লাহর বাণী–

(ا) فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ (ب) وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ (ج) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ (د) اِنْفِرُوْا خِفَافًا وَّثِقَالًا ـ

রাসূলে কারীম (সা.)-এর বাণী–

(ا) اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَقُوْلُوْا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ (ب) اَلْجِهَادُ مَاضٍ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

(খ) ইমাম খাত্তাবীসহ একদল আলিমের মতে জেহাদ মোস্তাহাব। কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত জিহাদের সম্পর্কে নির্দেশসূচক শব্দগুলোকে তারা اِسْتِحْبَابٌ-এর অর্থে গ্রহণ করেন।

(গ) ইবনে ওমরের মতে জিহাদ ফরজে আইন নয় বরং ওয়াজিব।

(ঘ) সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাবের মতে জিহাদ ফরজে আইন।

মোটকথা জিহাদ ক্ষেত্রে বিশেষ ফরজে আইন হয়ে থাকে। এটাই জমহুর ওলামার মত।

জিহাদের অপরিহার্যতা সামর্থ্যের সাথে সম্পর্কিত ঃ জিহাদের ফরজিয়ত তথা বাধ্যবাধকতা সামর্থ্যের ওপর নির্ভর করে। আর সামর্থ্য বলতে বুঝায় প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, আরোহণের পশু, বাহন, পাথেয় ইত্যাদি।

জিহাদ কখন ফরজে আইন হয়? এবং সাধারণ অবস্থায় জিহাদ ফরজে কেফায়া হওয়ার রহস্য কি?

قَوْلُهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَةِ ঃ অর্থাৎ জিহাদ সাধারণ অবস্থায় ফরজে কেফায়া। কিন্তু যদি শত্রুরা মুসলিম রাষ্ট্রের ওপর আক্রমণ করে বসে তাহলে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়। একে ব্যাপক অভিযান বলে 'সিয়ারে কবীর' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ইমাম সারাখ্‌সী (র.) লিখেছেন যে, এর রহস্য হলো জিহাদের ফরজিয়ত (অপরিহার্যতা) মৌলিক সত্তাগত সৌন্দর্যের কারণে হয়নি। কেননা এর দ্বারা আল্লাহর বান্দাদেরকে কষ্ট দেওয়া এবং জনবসতিকে ধ্বংস করা হয়ে থাকে। যার মধ্যে সত্তাগত কোনো সৌন্দর্য নিহিত নেই। কেবল আল্লাহ্‌র বাণীর বিজয় এবং আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে অকল্যাণ ও বিপর্যয় হতে রক্ষা করার জন্য একে ফরজ করা হয়েছে। আর যা অন্যের কারণে ফরজ হয়ে থাকে তা যদি কতিপয়ের দ্বারা অর্জিত হয়ে যায় তাহলে 'ফরজে কেফায়া' হয়ে থাকে। আর যদি কতিপয়ের দ্বারা উহা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব না হয় তাহলে সকলের ওপর ফরজ হয়ে যায়। এ কারণেই নবী করীম (সা.) জিহাদে তাশ্‌রীফ নিতেন, কিন্তু মদীনার প্রত্যেক মুসলমানকে তাঁর সহিত যাওয়ার জন্য বাধ্য করতেন না। আর নফীরে আম ব্যাপক অভিযান না হলে জিহাদ হতে পশ্চাদপসারণকারীদেরকে ভর্ৎসনা করতেন না। তাই যদি কাফিররা একজোটে কোনো মুসলিম এলাকার ওপর আক্রমণ করে বসে আর কতিপয় মুসলমানদের দ্বারা জিহাদের উদ্দেশ্য হাসিল না হয় অর্থাৎ কাফিরদের অন্যায় আচরণকে ঠেকানো না যায়; তাহলে জিহাদ 'ফরজে আইন' হয়ে যায়। এমনকি মনিবের অনুমতি ছাড়া গোলাম এবং স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী ও মাতা-পিতার অনুমতি ব্যতীত প্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান জিহাদের জন্য বের হয়ে পড়া ফরজ হয়ে যাবে। কেননা ফরজ আদায়ের জন্য বান্দার অনুমতির প্রয়োজন হয় না। স্রষ্টার আদেশ লঙ্ঘনে সৃষ্টির আনুগত্য বৈধ নয়। যা হাদীসে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত রয়েছে। (তিরমিযী) বরং এমতাবস্থায় যে জিহাদে বাধা দেবে সে গুনাহগার হবে।

فَاِنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ عَلٰى بَلَدٍ وَجَبَ عَلٰى جَمِيْعِ الْمُسْلِمِيْنَ الدَّفْعُ تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا وَالْعَبْدُ بِغَيْرِ اِذْنِ الْمَوْلٰى وَاِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُوْنَ دَارَ الْحَرْبِ فَحَاصَرُوْا مَدِيْنَةً اَوْحِصْنًا دَعُوْهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاِنْ اَجَابُوْا هُمْ كَفُوا عَنْ قِتَالِهِمْ وَاِنِ امْتَنَعُوْا دَعُوْهُمْ اِلٰى اَدَاءِ الْجِزْيَةِ فَاِنْ بَذَلُوْهَا فَلَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ وَلَايَجُوْزُ اَنْ يُّقَاتِلَ مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ دَعْوَةُ الْاِسْلَامِ اِلَّا بَعْدَ اَنْ يَّدْعُوَهُمْ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَّدْعُوَ مَنْ بَلَغَتْهُ الدَّعْوَةُ اِلَى الْاِسْلَامِ وَلَايَجِبُ ذَالِكَ فَاِنْ اَبَوْا اِسْتَعَانُوْا بِاللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ وَحَارَبُوْهُمْ وَنَصَبُوْا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِيْقَ وَحَرَّقُوْهُمْ وَاَرْسَلُوْا عَلَيْهِمُ الْمَاءَ وَقَطَعُوْا اَشْجَارَهُمْ وَاَفْسَدُوْا زُرُوْعَهُمْ وَلَابَأْسَ بِرَمْيِهِمْ وَاِنْ كَانَ فِيْهِمْ مُسْلِمٌ اَسِيْرًا وَتَاجِرٌ وَاِنْ تَتَرَّسُوْا بِصِبْيَانِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْبِالْاُسَارٰى لَمْ يَكُفُّوْا عَنْ رَمْيِهِمْ وَيَقْصُدُوْنَ بِالرَّمْيِ الْكُفَّارَ دُوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ.

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং যদি দুশমন কোনো শহরের ওপর আক্রমণ করে, তাহলে সমস্ত মুসলমানদের ওপর তাদেরকে বাধা দেওয়া ওয়াজিব। স্ত্রী নিজ স্বামীর অনুমতি ছাড়া বের হবে এবং গোলাম নিজ মনিবের অনুমতি ছাড়া বের হবে। এবং যখন মুসলমান দারুল হরবে প্রবেশ করে এবং কোনো শহর বা দুর্গকে ঘেরাও করে নেয়, তাহলে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে, যদি তারা মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। আর যদি তারা না মেনে নেয় তাহলে তাদেরকে ট্যাক্স আদায় করতে বলবে, যদি তারা ট্যাক্স দিয়ে দেয় তাহলে তাদের জন্য তাই হবে যা মুসলমানদের জন্য। আর যা মুসলমানদের বিপরীত তা তাদেরও এবং যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি তার সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ নেই। কিন্তু দাওয়াতের পর এবং যার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে তাকে দাওয়াত দেওয়া মুস্তাহাব, এবং এটা ওয়াজিব নয়। এবং যদি তারা অস্বীকার করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা থেকে সাহায্য চেয়ে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তাদের ওপর মিনজানীক্ব চালাবে এবং তাদেরকে আগুনে জ্বালাবে এবং তাদেরকে পানি দ্বারা ভাসাবে এবং তাদের গাছসমূহ কেটে দেবে এবং তাদের ক্ষেতসমূহ নষ্ট করে দেবে এবং তাদের ওপর তীর মারাতে কোনো ক্ষতি নেই, যদিও তাদের মধ্যে কোনো বন্দী মুসলমান অথবা ব্যবসায়ী থাকে, এবং যদি তারা মুসলমান বাচ্চাদেরকে অথবা বন্দীদেরকে ঢাল স্বরূপ করে নেয়, তবুও তীর মারা থেকে ক্ষান্ত হবে না এবং তীর মারার মধ্যে কাফিরদের ইচ্ছা করবে মুসলমানদের নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ هَجَمَ الْعَدُوُّ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) জিহাদ কখন ফরজে আইন হবে তার বিবরণ আরম্ভ করেছেন, এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনা পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে।

কাফিরদেরকে দাওয়াত দেওয়ার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ دَعُوْهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ الخ ঃ অর্থাৎ ইমাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ তাদেরকে (কাফিরদেরকে) ইসলামের দাওয়াত দেবেন। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তো যুদ্ধের প্রশ্নই উঠে না। কেননা হুযূর (সা.)-এর কাজের দ্বারা এই পদ্ধতিই সাব্যস্ত হয়ে থাকে। যখনই হুযূর (সা.) কোনো সম্প্রদায়ের সাথে যুদ্ধের মনস্থ করতেন তাদেরকে প্রথমেই ইসলামের দাওয়াত দিতেন। -(হাকেম, আবদুর রায্যাক, তিবরানী, মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি।)

যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শর্ত ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يُّقَاتِلَ الخ ঃ অর্থাৎ যাদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি তাদের সাথে যুদ্ধ করা জায়েজ হবে না; বরং যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছাতে হবে। যেন তারা বুঝতে পারে যে, মুসলমানরা সম্পদ লুটতরাজ করা বা শত্রুদেরকে বন্দী করে তাদেরকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য যুদ্ধ করে না। কেননা সে মুহূর্তে যদি কাফিররা ইসলামে দীক্ষিত হয় তাহলে যুদ্ধের কোনো প্রয়োজনই থাকে না। বহু হাদীসে যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

ফিকহ শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে যে, যদি দাওয়াত দেওয়ার পূর্বেই যুদ্ধ করে তাহলে গুনাহগার হবে। কিন্তু ধর্মীয় অথবা দেশগত নিরাপত্তার আওতাধীন না হওয়ার কারণে ক্ষতিপূরণ অথবা কেসাস ওয়াজিব হবে না। যেমন যুদ্ধের সময় মহিলা বা শিশু নিহত হলে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না।

ক্ষেপণাস্ত্র ও অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির প্রমাণ ঃ

قَوْلُهُ وَنَصَبُوْا عَلَيْهِمُ الْمَجَانِيْقَ الخ ঃ আলোচ্য বাক্যসমূহে যে সব শাস্তির কথা বলা হয়েছে এ সবের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদেরকে ব্যথিত করা, তাদের শক্তি ও দাম্ভিকতাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া, তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। এ একই উদ্দেশ্যে তাদের গাছ-পালা উজাড় করাও জায়েজ হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীকে মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفَاسِقِيْنَ -

তোমরা (কাফিরদের) যে বৃক্ষগুলোকে কর্তন করেছ, কিংবা বৃক্ষগুলিকে (অকর্তিত অবস্থায়) তাদের মূল ও কাণ্ডের ওপর বিরাজমান রেখেছ সবই আল্লাহ্‌র অনুমোদনে হয়েছে। আর অপকর্মকারী (কাফির) দেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই এরূপ করা হয়েছে।

আবূ দাউদ এবং তাবাকাতে ইবনে সা'দ নামক গ্রন্থদ্বয়ে রয়েছে যে, তায়েফের অবরোধকালে হুযূর (সা.) মানজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) ব্যবহার করেছেন। সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, মদীনা মুনাওয়ারাহ হতে নবী করীম (সা.) ইহুদি গোত্র বনূ নজীরকে বিতাড়নের সময় তাদের বৃক্ষরাজি কর্তন করেছেন এবং সেগুলোতে অগ্নি সংযোগ করেছেন।

وَلَابَأْسَ بِإِخْرَاجِ النِّسَاءِ وَالْمَصَاحِفِ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ إِذَا كَانُوْا عَسْكَرًا عَظِيْمًا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ وَيُكْرَهُ إِخْرَاجُ ذَالِكَ فِىْ سَرِيَّةٍ لَايُؤْمَنُ عَلَيْهَا وَلَاتُقَاتِلُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَلَا الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ إِلَّا اَنْ يَّهْجَمَ الْعَدُوُّ وَيَنْبَغِىْ لِلْمُسْلِمِيْنَ اَنْ لَّا يَغْدِرُوْا وَلَا يَغُلُّوْا وَلَا يُمَثِّلُوْا وَلَا يَقْتُلُوْا اِمْرَأَةً وَلَاصَبِيًّا وَلَا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا اَعْمٰى وَلَامُقْعَدًا اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ اَحَدُ هٰؤُلَاءِ مِمَّنْ يَّكُوْنُ لَهُ رَأْىٌ فِى الْحَرْبِ اَوْتَكُوْنُ الْمَرْأَةُ مَلِكَةً وَلَا يَقْتُلُوْا مَجْنُوْنًا وَاِنْ رَأَى الْاِمَامُ اَنْ يُّصَالِحَ اَهْلَ الْحَرْبِ اَوْفَرِيْقًا مِنْهُمْ وَكَانَ فِىْ ذَالِكَ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ فَلَا بَأْسَ بِهِ فَاِنْ صَالَحَهُمْ مُدَّةً ثُمَّ رَاٰى اَنَّ نَقْضَ الصُّلْحِ اَنْفَعُ نَبَذَ اِلَيْهِمْ وَقَاتَلَهُمْ فَاِنْ بَدَؤُوْا بِخِيَانَةٍ قَاتَلَهُمْ وَلَمْ يَنْبِذْ اِلَيْهِمْ اِذَا كَانَ ذَالِكَ بِاِتِّفَاقِهِمْ وَاِذَا خَرَجَ عَبِيْدُهُمْ اِلَى عَسْكَرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَهُمْ اَحْرَارٌ وَلَا بَأْسَ اَنْ يَعْلِفَ الْعَسْكَرَ فِىْ دَارِ الْحَرْبِ وَيَاْكُلُوْا مَا وَجَدُوْهُ مِنَ الطَّعَامِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং মহিলাদেরকে এবং কুরআন শরীফকে মুসলমানদের সাথে নিয়ে যাওয়াতে কোনো ক্ষতি নেই, যখন বিশাল সৈন্য দল হয় এবং তাদের ওপর নির্ভয় হয় এবং কুরআন শরীফকে এমন ছোট সৈন্যদল যাদের ওপর রক্ষা করার ভরসা হয় না নেয়া মাকরূহ। এবং মহিলা যুদ্ধ করবে না কিন্তু স্বামীর অনুমতিতে এবং গোলাম যুদ্ধ করবে না। কিন্তু মনিবের অনুমতিতে যুদ্ধ করবে ; তবে যদি শত্রু হঠাৎ আক্রমণ করে। আর মুসলমানদের জন্য উচিত যে, তারা ধোঁকাবাজি করবে না এবং খেয়ানত করবে না এবং মোছলা করবে না এবং মহিলাদেরকে হত্যা করবে না এবং শিশুদেরকে এবং একেবারে বৃদ্ধদেরকে এবং অন্ধদেরকে এবং পঙ্গুদেরকে হত্যা করবে না. কিন্তু যদি তাদের মধ্যে কেউ যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শদাতা হয়, অথবা মহিলা রাণী হয়। এবং পাগলদেরকে হত্যা করবে না। আর যদি ইমাম আহলে হরব অথবা তাদের কোনো জামাতের সাথে চুক্তি করাকে ভাল মনে করে এবং তাতে মুসলমানদের ভালো হয়, তাহলে এটা করাতে কোনো ক্ষতি নেই। সুতরাং যদি নির্দিষ্ট এক সময়ের জন্য সন্ধি করে নেয় অতঃপর সন্ধি ভঙ্গ করাকে ভালো মনে করে তাহলে সন্ধি ভঙ্গ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করবে। আর যদি তারা প্রথমে খেয়ানত করে তাহলে সন্ধি ভঙ্গের সংবাদ ছাড়া তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যখন এসব তাদের ঐকমত্যে হয়। আর যখন তাদের গোলাম মুসলমানদের সৈন্যের ভিতরে এসে যাবে তখন সে আজাদ। এবং কোনো ক্ষতি নেই যে, লস্কর নিজের জন্তুকে দারুল হরবে ঘাঁস খাওয়াবে এবং নিজেরাও যা কিছু খাদ্য পাবে তা খাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যুদ্ধে কুরআন শরীফ সাথে নেওয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَابَأْسَ بِإِخْرَاجِ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) বুখারী ও মুসলিম শরীফের দু'টি বর্ণনার নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রকে ব্যাখ্যা করছেন। বর্ণনা দু'টি এই- (ক) হাদীসে রয়েছে হুযূর (সা.) এরশাদ করেছেন, তোমরা কুরআন সঙ্গে নিয়ে ভ্রমণে যেয়ো না। কেননা আমার ভয় হচ্ছে এটা শত্রুর হাতে গিয়ে পড়তে পারে। -(মুসলিম শরীফ) অন্য হাদীসে রয়েছে হুযূর (সা.) কুরআন সঙ্গে করে শত্রুর এলাকায় ভ্রমণ করতে নিষেধ করেছেন। -(বুখারী ও মুসলিম) সেনাবাহিনী বিশাল হলে এবং এর নিরাপত্তার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হলে কুরআনে মাজীদ ও মহিলাদের সঙ্গে করে জেহাদে যাওয়ার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কেননা এরূপ স্থলে নিরাপত্তার ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আর প্রাধান্যকেই অস্তিত্ব হিসাবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

মোছলা তথা লাশের দেহ বিকৃতি করা যাবে কিনা?

قَوْلُهُ وَلَايُمَثِّلُوْ الخ ঃ এ স্থলে একটি প্রশ্ন হয়, তা হলো উরায়নাবাসীদের ঘটনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং নবী করীম (সা.) মুসলাহ করেছেন তা সত্ত্বেও মুসলাহ কিভাবে অবৈধ হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তরের পূর্বে হাদীসের আলোকে উরায়নাবাসীদের ঘটনা জানা দরকার। উরায়নাদের সংক্ষিপ্ত ঘটনা হলো, উকল এবং উরায়না গোত্রের কতিপয় লোক হুযূর (সা.)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। মদীনার আবহাওয়া তাদের অনুকূলে রইল না। তারা অসুস্থ হয়ে পড়ল। তাদের পেট ফুলে গেল। নবী করীম (সা.)-এর নিকট তাদের অভিযোগ উত্থাপিত হলে তিনি তাদেরকে মদীনার বাইরে সদ্‌কার উটের আবাসস্থলে যেতে এবং উটের দুধ ও প্রস্রাব পান করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তারা উটের দুধ পান করে সুস্থ হলো। তারপর মোরতাদ হয়ে রাখালদের হত্যা করে উটগুলো হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। সংবাদ পেয়ে হুযূর (সা.) কতিপয় সাহাবীকে তাদের পাকড়াও করার জন্য পাঠালেন। তাদেরকে পাকড়াও করা হলো। হুযূর (সা.) তাদের হাত পা কেটে দিলেন। তাদের চোখে শিশা গলিয়ে দিলেন। আর এই অবস্থায় তাদেরকে মদীনার 'হাররাহ' নামক স্থানে গরম বালুতে রাখা হলো। তারা সেখানেই ছটফট করতে করতে মারা গেল। -(সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

ঘটনার বিবরণের পর উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে মুহাদ্দেসীনগণ বলেন যে, এটা প্রথম দিকের ঘটনা এটা পরে কাওলী হাদীস দ্বারা মানসূখ হয়ে গেছে।

অক্ষম ও দুর্বলদের হত্যা না করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَايُقْتَلُوْا اِمْرَأَةً الخ ঃ আলোচ্য মাসআলার প্রমাণ এই যে, হাদীস শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, তোমরা অতি বৃদ্ধ শিশু এবং মহিলাদেরকে হত্যা করো না। -(আবূ দাউদ) সহীহ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, কোনো এক যুদ্ধে নবী করীম একজন কাফির মহিলাকে নিহত দেখতে পেলেন। হুযূর (সা.) এটা অপছন্দ করলেন এবং আফসোস করে বললেন, সে তো যুদ্ধকারীণী ছিল না তাকে হত্যা করা হলো কেন?

যা হোক এ ব্যাপারে মূলকথা হলো, অনর্থক ধ্বংসলীলা ও হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করা মূলত জিহাদের উদ্দেশ্য নয়; বরং আল্লাহর বাণীর বিজয় ও কাফিরদের অপকর্ম ও বিপর্যয়কে প্রতিহত করাই জিহাদের মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং যাদের পক্ষ থেকে দুষ্কর্ম ও বিপর্যয়ের আশঙ্কা হবে তাদেরকে হত্যা করা হবে। অপারগ ও অক্ষমদেরকে হত্যা করা যাবে না।

وَيَسْتَعْمِلُوا الْحَطَبَ وَيَدَّهِنُوا بِالدُّهْنِ وَيُقَاتِلُوا بِمَا يَجِدُوْنَهُ مِنَ السِّلَاحِ كُلَّ ذَالِكَ بِغَيْرِ قِسْمَةٍ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَّبِيْعُوا مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا وَلَا يَتَمَوَّلُوْنَهُ وَمَنْ اَسْلَمَ مِنْهُمْ اَحْرَزَ بِاِسْلَامِهِ نَفْسَهُ وَاَوْلَادَهُ الصِّغَارَ وَكُلَّ مَالٍ هُوَ فِيْ يَدِهِ اَوْ وَدِيْعَةً فِيْ يَدِ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّيٍّ فَاِنْ ظَهَرْنَا عَلَى الدَّارِ فَعِقَارُهُ فَيْءٌ وَزَوْجَتُهُ فَيْءٌ وَحَمْلُهَا فَيْءٌ وَاَوْلَادُهُ الْكِبَارُ وَلَا يَنْبَغِيْ اَنْ يُّبَاعَ السِّلَاحَ مِنْ اَهْلِ الْحَرْبِ وَلَا يُجَهَّزُ اِلَيْهِمْ وَلَا يُفَادِيْ بِالْاُسَارٰى عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُفَادِيْ بِهِمْ اُسَارٰى الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا يَجُوْزُ الْمَنُّ عَلَيْهِمْ وَاِذَا فَتَحَ الْاِمَامُ بَلْدَةً عَنْوَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ وَاِنْ شَاءَ اَقَرَّ اَهْلَهَا عَلَيْهَا وَوَضَعَ عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ وَعَلٰى اَرَاضِيْهِمُ الْخَرَاجَ وَهُوَ فِي الْاُسَارٰى بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ وَاِنْ شَاءَ اِسْتَرَقَّهُمْ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهُمْ اَحْرَارًا ذِمَّةً لِّلْمُسْلِمِيْنَ.

সরল অনুবাদ ঃ এবং জ্বালানি কাঠ কাজে নেবে, এবং তৈল ব্যবহার করবে এবং যে অস্ত্র পাওয়া যায় তা দ্বারা যুদ্ধ করবে, এসব বন্টন করা ব্যতীত। এবং তা থেকে কোনো জিনিস বিক্রি করা জায়েজ নেই এবং নিজের জন্য জমা রাখা জায়েজ নেই। এবং তাদের মধ্যে যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাহলে সে ইসলাম গ্রহণের কারণে নিজের জানকে হেফাজত করে নেবে এবং নিজের কম বয়সী সন্তানকেও এবং প্রত্যেক ঐ সম্পদকেও যা তার কাছে আছে। অথবা কোনো মুসলমান অথবা জিম্মির কাছে আমানত আছে। সুতরাং যদি আমরা তার ঘরের ওপর বিজয় হয়ে যাই, তাহলে তার স্ত্রী, জমিন, তার গর্ভের বাচ্চা, এবং বালেগ সন্তান সব মালই ফাইয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর আহলে হরবের কাছে অস্ত্র বিক্রি করা উচিত নয় এবং তাদের কাছে আসবাব না নিয়ে যাওয়া এবং ইমাম আযম (র.)-এর নিকট বন্দীদের মোকাবেলায় তাদেরকে মুক্তি দেয়া যাবে না এবং সাহেবাইন ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, মুসলমান বন্দীদের মোকাবেলায় তাদেরকে মুক্তি দেওয়া যাবে এবং তাদের ওপর দয়া করা জায়েজ নেই। যখন ইমাম কোনো শহরকে বাহু বলে জয় করবে তখন তার (এখতিয়ার) ইচ্ছা, চাই তা গাজীদের মধ্যে বণ্টন করে দেক, চাই তার জনগণকে ঠিক রেখে তাদের ওপর ট্যাক্স এবং তাদের জমিনের ওপর খাজনা নির্ধারিত করে দেক। এবং বন্দিদের ব্যাপারেও ইচ্ছা, চাই তাদেরকে হত্যা করে দেক, চাই গোলাম বানিয়ে নেক, চাই মুসলমানদের জন্য জিম্মি বানিয়ে আজাদ ছেড়ে দেওয়া হোক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَيْءٌ-এর অর্থ ঃ

قَوْلُهُ فَعِقَارُهُ فَيْءٌ الخ ঃ فَيْءٌ শব্দটির فَاءٌ অক্ষরটি যবর বিশিষ্ট। এটা شَيْءٌ শব্দের সম আকারের فَيْءٌ ঐ সম্পদকে বলা হয়, যা যুদ্ধ করা ছাড়াই হস্তগত হয়ে থাকে।

فَيْءٌ-এর বিধান ঃ فَيْءٌ -এর মধ্যে পঞ্চমাংশ ভিত্তিক কোনো বণ্টন হয় না। বরং এটা বায়তুল মালে জমা হয়ে থাকে এবং প্রয়োজনীয় স্থানে খরচ করা হবে।

وَلَايَجُوزُ اَنْ يَّرُدَّهُمْ اِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَاِذَا اَرَادَ الْاِمَامُ الْعَوْدَ اِلَى دَارِ الْاِسْلَامِ وَمَعَهُ مَوَاشٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَقْلِهَا اِلَى دَارِ الْاِسْلَامِ ذَبَحَهَا وَحَرَّقَهَا وَلَايَعْقِرُهَا وَلَايَتْرُكُهَا وَلَايَقْسِمُ غَنِيْمَةً فِيْ دَارِ الْحَرْبِ حَتّٰى يُخْرِجَهَا اِلَى دَارِ السَّلَامِ وَالرِّدْءِ وَالْمُقَاتِلِ فِي الْعَسْكَرِ سَوَاءٌ وَاِذَا لَحِقَهُمُ الْمَدَدُ فِيْ دَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ اَنْ يَّخْرُجُوا الْغَنِيْمَةَ اِلَى دَارِ الْاِسْلَامِ شَارَكُوْهُمْ فِيْهَا وَلَا حَقَّ لِاَهْلِ سُوْقِ الْعَسْكَرِ فِي الْغَنِيْمَةِ اِلَّا اَنْ يُّقَاتِلُوْا وَاِذَا اٰمَنَ رَجُلٌ حُرٌّ اَوْ اِمْرَأَةٌ حُرَّةٌ كَافِرًا اَوْ جَمَاعَةً اَوْ اَهْلَ حِصْنٍ اَوْ مَدِيْنَةً صَحَّ اَمَانُهُمْ وَلَمْ يَجُزْ لِاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَتْلُهُمْ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ فِيْ ذَالِكَ مُفْسِدَةٌ فَيُنْبِذُ اِلَيْهِمُ الْاِمَامُ وَلَايَجُوزُ اَمَانُ ذِمِّيٍّ وَلَا اَسِيْرٍ وَلَا تَاجِرٍ يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَلَايَجُوْزُ اَمَانُ الْعَبْدِ الْمَحْجُوْرِ عَلَيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا اَنْ يَّاْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْقَتْلِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَصِحُّ اَمَانُهُ.

সরল অনুবাদ ঃ এবং তাদেরকে দারুল হরবে যেতে দেওয়া জায়েজ নেই। এবং ইমাম যখন ইসলামি রাষ্ট্রে ফিরে আসতে চায় এবং তার সাথে গবাদি পশু থাকে, যাকে ইসলামি রাষ্ট্রে নিতে না পারে তাহলে সেগুলো জবাই করে জ্বালিয়ে দেবে। এবং তাকে ক্ষত করবে না এবং তাকে এমনিতে ছেড়ে দেবে না। এবং দারুল হরবে গনিমতের মাল বণ্টন করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে ইসলামি রাষ্ট্রে নিয়ে আসবে। সাহায্যকারী এবং হত্যাকারী বরাবর। এবং যখন দারুল হরবে তাদের সাহায্য পৌঁছে ইসলামি রাষ্ট্রে গনিমত নিয়ে যাওয়ার পূর্বে, তাহলে সাহায্যকারীগণ গনিমতের মধ্যে শরিক হবে। এবং সৈন্যদের বাজার ওয়ালাদের গনিমতের মধ্যে কোনো হক নেই, কিন্তু যদি তারা হত্যা করে। এবং যখন কোনো আজাদ পুরুষ অথবা আজাদ মহিলা কোনো কাফিরকে অথবা একটা জামাতকে অথবা দুর্গবাসীদেরকে অথবা শহরবাসীদেরকে আশ্রয় দিয়ে দেয়, তাহলে তাদের আশ্রয় দেওয়া সহীহ হবে। এবং কোনো মুসলমানের জন্য তাদেরকে কতল করা জায়েজ হবে না, কিন্তু যদি তাতে কোনো খারাবি হয়। সুতরাং ইমাম তাদের আশ্রয় দেওয়াকে ভেঙ্গে দিবে। এবং জিম্মি (যদি) বাঁদি এবং এমন ব্যবসায়ীকে আশ্রয় দেওয়া জায়েজ নেই, যারা তাদের কাছে যায়। এবং ইমাম আযম (র.)-এর নিকটে مَحْجُوْرٌ عَلَيْهِ গোলামকে আশ্রয় দেওয়া জায়েজ নেই, কিন্তু যদি তার মনিব তাকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়ে দেয়। এবং সাহেবাইন (র.) বলেন যে, তাকে আশ্রয় দেওয়া সহীহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

غَنِيْمَتْ-এর সংজ্ঞা ও বণ্টন বিধি :

قَوْلُهُ وَلَا يُقْسَمُ غَنِيْمَةٌ الخ : আলোচ্য বিধানটি জানার পূর্বে غَنِيْمَتْ-এর সংজ্ঞা জানা দরকার। গনিমত বলে যে সম্পদ মুজাহিদগণ যুদ্ধ করে কাফিরদের হতে হস্তগত করে। গনিমতের এক পঞ্চমাংশে ইমামের এখতিয়ার থাকে। আর বাদ বাকি চার অংশ মুজাহিদদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়।

যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সাহায্যকারীদের গনিমতের বিধান :

قوله وَالرِّدْءُ وَالْمُقَاتِلُ الخ : رِدْء এখানে ر যের বিশিষ্ট د জযম বিশিষ্ট এবং তারপর হামযাহ হবে। এর অর্থ হলো– সাহায্য সহানুভূতিকারী। আর ر যবর বিশিষ্ট হলে মাসদার হবে। যেমন বলা হয়ে থাকে ردء - ردء অর্থাৎ যে, তার সাহায্য করল। এটার যথার্থ অর্থ হলো কোনো দল যদি দারুল হারবে মুজাহিদগণের সাহায্যের নিমিত্তে তাঁদের সাথে যোগ দেয় তাহলে তারাও মুজাহিদগণের সাথে গনিমতের অংশীদার হবে।

প্রাসঙ্গিক ব্যবসায়ীদের গনিমত প্রাপ্তির বিধান :

قَوْلُهُ وَلَا حَقَّ لِاَهْلِ سُوْقِ الْعَسْكَرِ الخ : অর্থাৎ মুসলিম মুজাহিদগণের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করার মানসে গিয়েছে তারা গনিমতের মালে অংশীদার হবে না। হ্যাঁ, লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করলে তারাও অংশীদার হবে। যেহেতু সে যুদ্ধের নিয়তে দারুল হরবে যায়নি। তাই তার বেলায় বাহ্যিক কারণ (পরিস্থিতি) ধর্তব্য হবে না বরং প্রকৃত কারণ অর্থাৎ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করা ধর্তব্য হবে। হযরত ওমর (রা.) নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা এটাই বুঝাতে চেয়েছেন। اَلْغَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ অর্থাৎ যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারীই গনিমতের মালে অংশীদার হবে।

قَوْلُهُ مَحْجُوْرٌ عَلَيْهِ الخ : مَحْجُوْرٌ عَلَيْهِ অর্থাৎ ঐ গোলাম যার ওপর তার মনিবের পক্ষ থেকে সর্বপ্রকার কর্মকাণ্ডে শরিক হওয়া নিষেধ করা হয়েছে।

وَاِذَا غَلَبَ التُّرْكُ عَلَى الرُّوْمِ فَسَبَوْهُمْ وَاَخَذُوْا اَمْوَالَهُمْ مَلَكُوْهَا وَاِنْ غَلَبْنَا عَلَى التُّرْكِ حَلَّ لَنَا مَا نَجِدُهٗ مِنْ ذَالِكَ وَاِذَا غَلَبُوْا عَلٰى اَمْوَالِنَا وَاَحْرَزُوْهَا بِدَارِهِمْ مَلَكُوْهَا فَاِنْ ظَهَرَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُوْنَ فَوَجَدُوْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهِىَ لَهُمْ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَاِنْ وَجَدُوْهَا بَعْدَ الْقِسْمَةِ اَخَذُوْهَا بِالْقِيْمَةِ اِنْ اَحَبُّوْا وَاِنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرٌ فَاشْتَرٰى ذَالِكَ وَاَخْرَجَهٗ اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ فَمَالِكُهُ الْاَوَّلُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهٗ بِالثَّمَنِ الَّذِىْ اِشْتَرَاهُ بِهٖ التَّاجِرُ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهٗ وَلَا يَمْلِكُ عَلَيْنَا اَهْلُ الْحَرْبِ بِالْغَلَبَةِ مُدَبَّرِيْنَا وَاُمَّهَاتِ اَوْلَادِنَا وَمُكَاتِبِيْنَا وَاَحْرَارَنَا وَنَمْلِكُ عَلَيْهِمْ جَمِيْعَ ذَالِكَ.

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি তুর্কিগণ রুমীদের ওপর বিজয়ী হয়ে যায় অতঃপর তাদেরকে বন্দী করে নেয় এবং তাদের মালামাল নিয়ে নেয়, তাহলে তারা তার মালিক হয়ে যাবে এবং যদি আমরা তুর্কিদের ওপর বিজয় হয়ে যাই, তাহলে যা কিছু আমরা পাবো, উহা আমাদের জন্য হালাল হবে এবং যখন তারা আমাদের মালের ওপর বিজয় লাভ করে দারুল হরবে নিয়ে যায়, তখন তারা তার মালিক হয়ে যাবে। অতঃপর যদি মুসলমান তার ওপর বিজয় হয়ে যায় এবং বণ্টনের পূর্বে ঐ মাল পায়, তাহলে তা কোনো মূল্য ছাড়া তাদেরই হবে। এবং যদি বণ্টনের পরে পায় তাহলে ইচ্ছা হলে তা মূল্য দিয়ে নিয়ে নেবে। আর যদি দারুল হরবে কোনো ব্যবসায়ী প্রবেশ করে, এবং সেখান থেকে মাল ক্রয় করে ইসলামি রাষ্ট্রে নিয়ে আসে তাহলে প্রথম মালিকের ইচ্ছা চাই ঐ মাল ক্রয় করুক ঐ মূল্য দিয়ে যে মূল্য দিয়ে ব্যবসায়ী ক্রয় করেছে। এবং যদি চায় তা ছেড়ে দেক। আর আহলে হরব্ আমাদের ওপর বিজয় হয়ে আমাদের মোদাব্বার, উম্মে ওয়ালাদ, মোকাতাব গোলামসমূহ এবং স্বাধীনদের মালিক হবে না এবং আমরা তাদের সবার মালিক হয়ে যাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জবরদখলের দ্বারা কাফিররা আমাদের সম্পদের মালিক হওয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَاِذَا غَلَبُوْا عَلٰى اَمْوَالِنَا الخ ঃ আমাদের (হানাফীদের) মতে কাফিররা মুসলমানদের যে সম্পদের ওপর জবরদখল করেছে এবং তা দরুল হরবে নিয়ে গেছে তার মালিক হবে। কেননা সূরায়ে হাশবে فَيْئ-এর مَصْرَفْ (ব্যয় খাত) বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ বলেছেন– لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ অর্থাৎ ঐসব দরিদ্র মুহাজিরগণের জন্য যারা তাদের ঘর-বাড়ি ও সম্পদ হতে বিতাড়িত হয়েছে। এখানে এমন সাহাবীদেরকে ফকির বলা হয়েছে যারা মক্কাতে প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। এর দ্বারা পরোক্ষভাবে বুঝা যায় যেন কাফিররা তাঁদের সম্পদ দখল করে মালিক হয়ে বসেছে, আর তাঁরা ফকির হয়ে সদকা খাওয়ার যোগ্য হয়েছেন। কিতাবে এটার কারণ আলোচিত হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে কাফিররা দখল করা সত্ত্বেও মুসলমানদের সম্পদের মালিক হবে না। তিনি উহাকে কাবীহ লেআইনীহি (মৌলিকভাবে কদর্য) সাব্যস্ত করে স্বীয় মত প্রমাণ করেছেন। আমরা বলে থাকি, অন্যের মালে হস্তক্ষেপ করা হুরমত লেআইনিহী নয়; বরং এটা হুরমত লেগায়রিহী।

وَإِذَا اَبَقَ عَبْدُ الْمُسْلِمِ فَدَخَلَ اِلَيْهِمْ فَأَخَذُوْهُ لَمْ يَمْلِكُوْهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا مَلَكُوْهُ وَاِنْ نَدَّ اِلَيْهِمْ بَعِيْرٌ فَاَخَذُوْهُ مَلَكُوْهُ وَاِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْاِمَامِ حَمُوْلَةٌ يَحْمِلُ عَلَيْهَا الْغَنَائِمَ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ قِسْمَةَ اِيْدَاعٍ لِيَحْمِلُوْهَا اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ يَرْتَجِعُهَا مِنْهُمْ فَيَقْسِمُهَا وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْغَنَائِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ فِىْ دَارِ الْحَرْبِ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْغَانِمِيْنَ فِىْ دَارِ الْحَرْبِ فَلَا حَقَّ لَهُ فِى الْقِسْمَةِ وَمَنْ مَاتَ مِنَ الْغَانِمِيْنَ بَعْدَ اِخْرَاجِهَا اِلٰى دَارِ الْاِسْلَامِ فَنَصِيْبُهُ لِوَرَثَتِهٖ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يُّنَفِّلَ الْاِمَامُ فِىْ حَالِ الْقِتَالِ وَيُحَرِّضُ بِالنَّفْلِ عَلَى الْقِتَالِ.

সরল অনুবাদ ঃ যখন মুসলমানের গোলাম পলায়ন করে তাদের নিকট চলে যায় এবং তারা তাকে ধরে নেয়, তাহলে ইমাম আযমের (র.) নিকটে তারা মালিক হবে না। এবং সাহেবাইন (র.) বলেন যে, তারা মালিক হয়ে যাবে। এবং যদি কোনো উট পরিবর্তন হয়ে তাদের নিকট চলে যায় এবং তারা তাকে ধরে নেয়, তাহলে তার মালিক হয়ে যাবে। এবং যখন ইমামের নিকট এমন জন্তু না থাকে যার ওপর গনিমতের মাল নিতে পারে তাহলে বণ্টন করে দেবে গনিমতের মাল গাজীদের মধ্যে আমানতের ভিত্তিতে, যেন তারা তা ইসলামি রাষ্ট্রে নিয়ে আসে, অতঃপর তাদের থেকে ফেরত নিয়ে বণ্টন করে দেবে। গনিমতের মাল বণ্টনের পূর্বে দারুল হরবে বিক্রি করা জায়েজ নেই এবং গাজীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি দারুল হরবে বণ্টনের পূর্বে মরে যায় তাহলে বণ্টনের মধ্যে তার কোনো হক নেই এবং যে ব্যক্তি ওখান থেকে নিয়ে আসার পর মারা যায় তাহলে তার অংশ তার ওয়ারিশিদের হবে এবং ইমাম যুদ্ধের– সময় পুরস্কারের ওয়াদা করাতে কোনো ক্ষতি নেই, এবং পুরস্কারের দ্বারা হত্যাকারীদেরকে উত্তেজিত করাতেও কোনো ক্ষতি নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বণ্টনের পূর্বে গনিমতের মাল বিক্রি করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْغَنَائِمِ الخ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) কিতাবুল খারাজে উল্লেখ করেছেন যে, গনিমতের মাল বণ্টন হওয়ার পূর্বে কোনো মুজাহিদের তার অংশ বিক্রি করা জায়েজ হবে না। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) বণ্টনের পূর্বে গনিমতের মাল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তবে গনিমতের মাল হতে খাওয়া ও পশুদেরকে ঘাস খাওয়ানো জায়েজ হবে। এমনকি প্রয়োজনে গনিমতের পশু জবাই করে খাওয়াও জায়েজ হবে। খাদ্য ও ঘাসের বেলায় পঞ্চমাংশ ভিত্তিক বণ্টন নেই। সাহাবায়ে কেরাম তাই করতেন তবে তাঁরা বিক্রি করতেন না। কেউ বিক্রি করলে তার জন্য খাওয়া জায়েজ হবে না। এমনকি উহা হতে কোনোভাবে উপকৃত হওয়াও তার জন্য বৈধ হবে না; বরং এটাকে ফেরত দেবে। অনুমতি তো শুধু খাওয়ার মধ্যে সীমিত। এটা হতে অতিক্রম করলে বিশ্বাসঘাতকতা হবে।

تَنْفِيْل ও نَفْل-এর সংজ্ঞা ও পরিমাণ ঃ

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يُّنَفِّلَ الخ ঃ يُنَفِّلَ শব্দ এটা نَفْل হতে مُضَارِعْ -এর সীগাহ। نَفْل অতিরিক্তকে বলে। সুতরাং تَطَوُّعْ -কে نَفْل বলা হয়ে থাকে। আর ইমাম মুজাহিদকে তার অংশের অতিরিক্ত কিছু দিলে তাকেও نَفْل বলে। মোটকথা হলো تَنْفِيْل ও গনিমতের শ্রেণীভুক্ত। তবে এটার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম কানুন নেই। বরং ইমামের মর্জির ওপর নির্ভরশীল।

فَيَقُوْلُ مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًا فَلَهُ سَلَبُهُ اَوْ يَقُوْلُ لِسَرِيَّةٍ قَدْ جَعَلْتُ لَكُمُ الرُّبُعَ بَعْدَ الْخُمُسِ وَلَا يُنَفِّلُ بَعْدَ اِحْرَازِ الْغَنِيْمَةِ اِلَّا مِنَ الْخُمُسِ وَاِذَا لَمْ يُجْعَلِ السَّلْبُ لِلْقَاتِلِ فَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْغَنِيْمَةِ وَالْقَاتِلُ وَغَيْرُهُ فِيْهِ سَوَاءٌ وَالسَّلْبُ مَا عَلَى الْمَقْتُوْلِ مِنْ ثِيَابِهِ وَسَلَاحِهِ وَمَرْكَبِهِ وَاِذَا خَرَجَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يَجُزْ اَنْ يَّعْلِفُوْا مِنَ الْغَنِيْمَةِ وَلَا يَأْكُلُوْا مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ فَضَلَ مَعَهُ عَلَفٌ اَوْطَعَامٌ رَدَّهُ اِلَى الْغَنِيْمَةِ وَيَقْسِمُ الْاِمَامُ الْغَنِيْمَةَ فَيُخْرِجُ خُمُسَ وَيُقَسِّمُ الْاَرْبَعَةَ الْاَخْمَاسِ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَقَالَا لِلْفَارِسِ ثَلٰثَةُ اَسْهُمٍ ـ

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং বলবে যে, যাকে হত্যা করবে, তাহলে নিহত ব্যক্তির আসবাবপত্র তারই হবে। অথবা কোনো সৈন্যদলকে বলবে যে, আমি তোমাদের জন্য পঞ্চমাংশের পর চতুর্থাংশ ধার্য করলাম। এবং গনিমত জমা করার পরে পুরস্কার দেবে না, কিন্তু পঞ্চমাংশ থেকে। এবং যদি নিহত ব্যক্তির আসবাবপত্র হত্যাকারীর জন্য না করা হয়, তাহলে সে মাল মোটামুটি গনিমতেরই হবে যার মধ্যে হত্যাকারী এবং গায়রে হত্যাকারী সবাই বরাবর হবে। (সলব) আসবাব তা যা নিহত ব্যক্তির ওপর থাকে, তার কাপড়সমূহ, তার অস্ত্রসমূহ এবং সাওয়ারিসমূহ থেকে। এবং যখন মুসলমান দারুল হরব থেকে বের হয়, তাহলে গনিমত থেকে জানওয়ারকে খাদ্য দেওয়া জায়েজ নেই এবং তা থেকে কিছু নিজে খাওয়াও জায়েজ নেই। এবং যার কাছে জন্তুর খাদ্য অথবা মানুষের খাদ্য বেঁচে যায় তা গনিমতের মধ্যে শামিল করে দেবে এবং ইমাম গনিমতকে বণ্টন করবে। সুতরাং তার পঞ্চমাংশ বাহির করে নেবে এবং চার পঞ্চমাংশ গাজীদের মধ্যে বণ্টন করবে, ইমাম আযম (র.)-এর নিকটে সওয়ারিদের জন্য দুই অংশ এবং পদব্রজে গমনকারীদের জন্য এক অংশ এবং সাহেবাইন (র.) বলেন– যে, সওয়ারিদের জন্য তিন অংশ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سَلْبٌ এর সংজ্ঞা ঃ প্রকাশ থাকে যে, سَلْبٌ বলা হয় নিহতের সঙ্গে যা কিছু রয়েছে তথা বাহন, পোশাক, যুদ্ধাস্ত্র, আংটি, বেল্ট ইত্যাদি। এমনকি তার বাহনের ওপর যে স্বর্ণ রৌপ্য থলি ও থলির মধ্যস্থ সামগ্রী সব কিছু সলবের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে যে মাল তার গোলামের নিকট অথবা এমন চতুষ্পদ পশুর নিকট পাওয়া যাবে যার ওপর সে আরোহণ করে নি– এরা সালব হিসাবে গণ্য হবে না।

قَوْلُهُ وَيُقَسِّمُ الْاِمَامُ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) গনিমতের মালের বণ্টন পদ্ধতি বর্ণনা করা আরম্ভ করছেন। সকল ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, পদচারী মুজাহিদ গনিমতের মাল একাংশ পাবে, এ প্রসঙ্গে হাদীস গ্রন্থে বহু হাদীস রয়েছে।

অশ্বারোহীর অংশ নির্ধারণে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) অশ্বারোহীর অংশ বর্ণনা করছেন। আরোহীর অংশের ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম তিবরানী, ওয়াকেদী, ইবনে মারদাবিয়্যাহ, ইমাম আবীশায়বাহ এবং দারে কুতনী (র.), হযরত মেকদাদ (রা.), আয়েশা (রা.), যুবায়ের (রা.), আবূ উসামাহ (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম (সা.) আরোহীর জন্য দুই অংশ এবং পদচারীর জন্য এক অংশ নির্ধারণ করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) উক্ত মত জ্ঞাপন করে থাকেন। উপরোক্ত বর্ণনাগুলো ছাড়া তাঁর যুক্তি হলো, পশুর অংশ মানুষের অংশ হতে অতিরিক্ত হওয়ার কোনো মতেই যুক্তিসঙ্গত হতে পারে না।

ইমাম আবূ ইউসুফ (র.), মুহাম্মদ (র.) ও শাফেয়ী (র.)-এর মতে অশ্বারোহীর জন্য তিন অংশ হবে, আর পদচারী এক অংশ পাবে। যেমন– ইবনে ওমর (রা.), জাবের (রা.), আবূ হুরায়রা (রা.) প্রমুখ সাহাবীগণ হতে সিহাহ সিত্তা য় বর্ণিত রয়েছে.

وَلَا يُسْهَمُ اِلَّا لِفَرَسٍ وَاحِدٍ وَالْبَرَاذِيْنَ وَالْعِتَاقُ سَوَاءٌ وَلَا يُسْهَمُ لِرَاحِلَةٍ وَلَا بَغْلٍ وَمَنْ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ فَارِسًا فَنَفَقَ فَرَسُهٗ اِسْتَحَقَّ سَهْمَ فَارِسٍ وَمَنْ دَخَلَ رَاجِلًا فَاشْتَرٰى فَرَسًا اِسْتَحَقَّ سَهْمَ رَاجِلٍ وَلَا يُسْهَمُ لِمَمْلُوْكٍ وَلَا اِمْرَأَةٍ وَلَا ذِمِّيٍّ وَلَا صَبِيٍّ وَلٰكِنْ يُرْضَخُ لَهُمْ عَلٰى حَسْبِ مَا يَرٰى الْاِمَامُ وَاَمَّا الْخُمُسُ فَيُقْسَمُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلْيَتَامٰى وَسَهْمٌ لِلْمَسَاكِيْنِ وَسَهْمٌ لِاَبْنَاءِ السَّبِيْلِ وَيَدْخُلُ فُقَرَاءُ ذَوِى الْقُرْبٰى فِيْهِمْ وَيُقَدَّمُوْنَ وَلَا يُدْفَعُ اِلٰى اَغْنِيَائِهِمْ شَيْءٌ فَاَمَّا ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى لِنَفْسِهٖ فِىْ كِتَابِهٖ مِنَ الْخُمُسِ فَاِنَّمَا هُوَ لِاِفْتِتَاحِ الْكَلَامِ تَبَرُّكًا بِاسْمِهٖ .

সরল অনুবাদ ঃ এবং অংশ দেবে না কিন্তু একই ঘোড়ার এবং দেশীয় ঘোড়া এবং আরবি ঘোড়া উভয়টা বরাবর এবং সওয়ারির উপযুক্ত উটের এবং খচ্চরের অংশ দিবে না, এবং যে ব্যক্তি সওয়ার হয়ে দারুল হরবে প্রবেশ হলো, অতঃপর তার ঘোড়া মারা গেল, তাহলে সে ছওয়াবের অংশের হকদার হবে, এবং যে পায়ে হেঁটে প্রবেশ হলো অতঃপর সে ঘোড়া ক্রয় করে নিল, তাহলে সে পায়ে চলাচলকারীর অংশের যোগ্য হবে। গোলাম, মহিলা এবং জিম্মির অংশ দেবে না এবং সন্তানেরও অংশ দেবে না, কিন্তু ইমাম যাকে ভালো মনে করে তাকে দিয়ে দেবে। বাকি রইল পঞ্চমাংশ, সুতরাং তাকে তিন ভাগ করবে, এক ভাগ এতিমদের জন্য, এক ভাগ মিসকিনদের জন্য এবং এক ভাগ মুসাফিরদের জন্য এবং আত্মীয় ফকিরগণও তাদের মধ্যে দাখেল হবে এবং তাদেরকে অগ্রগামী করা হবে। এবং তাদের ধনসম্পদ শালীদেরকে কিছুই দেবে না। সুতরাং পঞ্চামাংশ থেকে যে অংশ আল্লাহ তা'আলা কুরআন শরীফে নিজের জাতের জন্য উল্লেখ করেছেন। সুতরাং তা কালামের শুরুতে আল্লাহ তা'আলার নাম দ্বারা বরকত হাসিল করার জন্য

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গনিমতের পঞ্চমাংশ বন্টন পদ্ধতি ও মতভেদ ঃ

قَوْلُهٗ وَاَمَّا الْخُمُسُ الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, غَنِيْمَتْ (গনিমতের) মালের পাঁচ ভাগের চার ভাগ মুজাহিদদের মধ্যে বন্টন রীতি বর্ণনা করবার পর এখানে বাকি এক পঞ্চমাংশ বন্টনের রীতি বর্ণনা করা হচ্ছে। এই স্থলে আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী মূলনীতি নির্ধারক–

وَاعْلَمُوْا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ .

অর্থাৎ জেনে রাখো, তোমরা গনিমতের যে মাল লাভ করবে তার এক পঞ্চমাংশ আল্লাহ, তদীয় রাসূল, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও মুসাফির পাবে। এ আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গনিমতের এক পঞ্চমাংশ ছয় ভাগে বিভক্ত করা হবে। তবে সমস্ত ওলামা এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, আল্লাহর উল্লেখ বরকতের জন্য করা হয়েছে। তাই আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের অংশ একই হবে। এভাবে খুমুস পাঁচ অংশে সীমিত হয়ে যায়। আর এ ব্যাপারেও ওলামায়ে কেরাম একমত যে, এতিম, মিসকিন এবং মুসাফির ব্যয়ের স্থলসমূহের অন্তর্গত। এদের মতে রাসূল ও নিকটাত্মীয়গণের অংশের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীদের মতে রাসূলের ইন্তেকালের পর তাঁর অংশ বিলোপ পেয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর মতে তাঁর অংশ খলীফা পাবে।

وَسَهْمُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَطَ بِمَوْتِهٖ كَمَا سَقَطَ الصَّفِيُّ وَسَهْمُ ذَوِى الْقُرْبٰى كَانُوْا يَسْتَحِقُّوْنَهٗ فِىْ زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنُّصْرَةِ وَبَعْدَهٗ بِالْفَقْرِ وَاِذَا دَخَلَ الْوَاحِدُ اَوِ الْاِثْنَانِ اِلٰى دَارِ الْحَرْبِ مُغِيْرِيْنَ بِغَيْرِ اِذْنِ الْاِمَامِ فَاَخَذُوْا شَيْئًا لَمْ يُخَمَّسْ وَاِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ لَهُمْ منعة فَاَخَذُوْا شَيْئًا خُمِّسَ وَاِنْ لَمْ يَاْذَنْ لَهُمُ الْاِمَامُ وَاِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ تَاجِرًا فَلَا يَحِلُّ لَهٗ اَنْ يَتَعَرَّضَ بِشَيْءٍ مِنْ اَمْوَالِهِمْ وَلَا مِنْ دِمَائِهِمْ ـ

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অংশ বাদ হয়ে গেছে, হুযূর (সা.)-এর মৃত্যুর দ্বারা। যেমনিভাবে সফী এবং আত্মীয়স্বজনদের অংশ বাদ হয়ে গেছে এবং তারা তার যোগ্য হয়েছিল হুযূর (সা.)-এর জমানার সাহায্যের কারণে এবং তাঁর পরে দারিদ্র্যের কারণে। যখন ইমামের অনুমতি ছাড়া একজন বা দু'জন মানুষ দারুল হরবে লুণ্ঠন করে প্রবেশ হয় এবং কোনো জিনিস নিয়ে আসে, তাহলে পঞ্চমাংশ নেওয়া যাবে না। এবং যদি শক্তিশালী দল প্রবেশ করে কিছু নিয়ে আসে, তাহলে পঞ্চমাংশ নেওয়া হবে, যদিও ইমাম তাকে অনুমতি না দেয়। এবং যখন কোনো মুসলমান দারুল হরবে ব্যবসায়ী হিসাবে প্রবেশ করে তাহলে তাদের জন্য তার মাল এবং জানের ক্ষতি করা হালাল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اَلصَّفِيُّ ঃ صَفِىٌّ দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য এসব বস্তু যাকে রাসূলুল্লাহ (সা.) গনিমতের মাল থেকে আল্লাহর হুকুমে নিজের জন্য পছন্দ করে নিতেন, চাই উহা লৌহবর্ম হোক, বা তরবারি হোক বা দাসী হোক। হযরত সফইয়া (রা.) তিনিও এই সফীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। –(আল্ মিসবাহুন্নূরী)

<u>ব্যাবসার উদ্দেশ্যে দারুল হরবে প্রবেশ করলে তার বিধান ঃ</u>

قَوْلُهٗ وَاِذَا دَخَلَ الْمُسْلِمُ دَارَ الْحَرْبِ ঃ প্রকাশ থাকে যে, কোনো মুসলমান আশ্রয় প্রার্থনাকারী যদি কুফরি স্থানে ব্যবসার কাজে রত থাকে, তাহলে তাদের জানমাল ও অন্যান্য কাজে হস্তক্ষেপ করা হারাম হবে। কেননা চুক্তির মাধ্যমে সে অঙ্গীকার করেছে যে, তাদের হত্যা বা সম্পদ বিনষ্ট ও কোনোরূপ সীমা লঙ্ঘন করবে না। এরূপ সীমালঙ্ঘন গদর-এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যা সর্বদা নিষিদ্ধ ও হারাম বলে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। গদর ও যুদ্ধের ধোঁকা সম্পর্কে ইতঃপূর্বে উহার পার্থক্য বলা হয়েছে যে, গদর নিষেধ কিন্তু যুদ্ধ চলাকালীন ধোঁকা নিষেধ নয়। হ্যাঁ, যদি কাফিরদের বাদশাহ বা তার আদেশে অন্য কেউ তাকে বন্দী করে বা তার মাল ও সম্পদ লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় তখন উক্ত আশ্রয় প্রার্থনাকারী ব্যবসায়ী সীমালঙ্ঘন করতে পারবে। কেননা এ স্থলে প্রথমে কাফিরগণ চুক্তিভঙ্গ করে অন্যায় আচরণ করেছে। আর কাফিরদের হাতে বন্দী মুসলমান-এর জন্য গদর নিষেধ নয়। কারণ পরস্পর চুক্তি না থাকার দরুন তাদেরকে হত্যা করা বা তাদের মাল ছিনিয়ে আনলে অবৈধ হবে না।

فَإِنْ غَدَرَ بِهِمْ وَاَخَذَ شَيْئًا مَلَكَهُ مِلْكًا مَحْظُوْرًا وَيُؤْمَرُ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهِ وَاِذَا دَخَلَ الْحَرْبِيُّ اِلَيْنَا مُسْتَأْمِنًا لَمْ يَمْلِكْنَ لَهُ اَنْ يُّقِيْمَ فِيْ دَارِنَا سَنَةً وَيَقُوْلُ لَهُ الْاِمَامُ اِنْ اَقَمْتَ تَمَامَ السَّنَةِ وَضَعْتُ عَلَيْكَ الْجِزْيَةَ فَاِنْ اَقَامَ سَنَةً اُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ وَصَارَ ذِمِّيًّا وَلَا يَتْرُكُ اَنْ يَّرْجِعَ اِلَى دَارِ الْحَرْبِ فَاِنْ عَادَ اِلَى دَارِ الْحَرْبِ وَتَرَكَ وَدِيْعَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ اَوْ ذِمِّيٍّ اَوْ دَيْنًا فِيْ ذِمَّتِهِمْ فَقَدْ صَارَ دَمُهُ مُبَاحًا بِالْعَوْدِ وَمَا فِيْ دَارِ الْاِسْلَامِ مِنْ مَالِهِ عَلَى خَطَرٍ فَاِنْ اُسِرَ اَوْظُهِرَ عَلَى الدَّارِ فَقُتِلَ سَقَطَتْ دُيُوْنُهُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং যদি গাদ্দারী করে কোনো জিনিস নিয়ে নেয়, তাহলে নিষিদ্ধ পন্থায় তার মালিক হয়ে যাবে এবং তাকে সদ্কা করার হুকুম করা হবে। এবং যখন কাফির আমাদের নিকট আশ্রয় চেয়ে এসে যায়, তাহলে তার জন্য আমার নিকট অবস্থান করা সম্ভব হবে না পুরা বৎসর; বরং ইমাম তাকে বলে দেবে যে, যদি তুমি পুরা বৎসর অবস্থান করো, তাহলে আমি তোমার ওপর কর নির্ধারিত করে দেব। যদি যে পুরা বৎসর থাকে তাহলে তার থেকে ট্যাক্স নেওয়া হবে এবং সে জিম্মি হয়ে যাবে এবং তাকে দারুল হরবে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে না। সুতরাং যদি সে দারুল হরবে চলে যায় এবং কোনো মুসলমানের কাছে অথবা জিম্মির কাছে কিছু আমানত অথবা করজ ছেড়ে যায় তাদের জিম্মায় তাহলে সে ফিরে যাওয়ার কারণে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে গেল। এবং তার মাল থেকে যা কিছু ইসলামি রাষ্ট্রে আছে, তা নিরাপদহীন অবস্থায় থাকবে। সুতরাং যদি তাকে বন্দি করে নেওয়া হয় অথবা দারুল হরবের ওপর বিজয় হয়ে যায় এবং তাকে হত্যা করে দেওয়া হয়, তাহলে তার ঋণ বাদ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

غَدْرٌ বা বিশ্বাসঘাতকতা ও যুদ্ধের প্রতারণার মধ্যে পার্থক্য ঃ যুদ্ধের প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপ ঃ غَدْرٌ বা বিশ্বাসঘাতকতা হলো, আমাদের এবং তাদের মধ্যে যে সন্ধি ও চুক্তি হয়েছে উহা লঙ্ঘন করা। সুতরাং আবূ দাউদ নাসায়ী এবং তিরমিযী শরীফে রয়েছে যে, হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এবং কর্মীদের মধ্যে একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য সন্ধি হয়েছিল। যখন চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সময় ঘনিয়ে আসল তখন তিনি সেদিকে সেনাবাহিনী পাঠালেন, যেন নির্ধারিত সময় পুরো হওয়ার সাথে সাথেই আক্রমণ করা সম্ভব হয়। এই সংবাদ শুনে এক ব্যক্তি এই বলতে বলতে ঘোড়ায় চড়ে আসল। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়াদা পূর্ণ করো, বিশ্বাসঘাতকতা করো না। লোকেরা দেখল ইনি তো আমর ইবনে আম্বাসাহ (রা.)। হযরত মুয়াবিয়া (রা.) তাকে ডেকে পাঠালেন। কারণ জিজ্ঞাসার পর তিনি বললেন, আমি স্বয়ং নবী করীম (সা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ফরমায়েছেন কারো যদি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তি থাকে, তবে সময় উত্তীর্ণ হওয়া বা প্রকাশ্যভাবে চুক্তি প্রত্যাহার করা ব্যতীত যেন অভিযান না করে। এটা শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা.) সৈন্যদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে আসলেন। আর যুদ্ধের মধ্যে خِدَاعٌ প্রকৃতপক্ষে ঐ কৌশলকে বলা হয়ে থাকে যা যুদ্ধ চলাবস্থায় যুদ্ধে জয় লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে।

হরবীকে মুসলিম দেশে বসবাস করতে দেয়ার বিধান ঃ কোনো হারবীকেই এক বৎসরের অধিক সময় আমাদের দেশে বসবাস করার অনুমতি দেওয়া হবে না। কেননা বেশি দিন অবস্থান করলে সে ইসলামি রাষ্ট্রের ক্ষতিজনক কোনো আচরণ করার সম্ভাবনা থাকতে পারে। যেমন– গুপ্তচর কাজ করত রাষ্ট্রের ক্ষতিজনক ষড়যন্ত্র করতে পারে। ইমাম কর্তৃক নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যদি দেশ ত্যাগ না করে তখন তাকে জিম্মি ঘোষণা করে জিজিয়া বা টেক্স ধার্য করে দেবে। তৎপর সে দারুল হরবে যেতে চাইলে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, এটা মুসতামিনের হুকুম।

وَصَارَتِ الْوَدِيْعَةُ فَيْئًا وَمَا اَوْجَفَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ اَمْوَالِ اَهْلِ الْحَرْبِ بِغَيْرِ قِتَالٍ يُصْرَفُ فِيْ مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ كَمَا يُصْرَفُ الْخَرَاجُ وَاَرْضُ الْعَرَبِ كُلُّهَا اَرْضُ عُشْرٍ وَ هِيَ مَابَيْنَ الْعُذَيْبِ اِلَى اَقْصَى حِجْرٍ بِالْيَمِيْنِ وَبِمَهْرَةٍ اِلَى حَدِّ مَشَارِقِ الشَّامِ وَالسَّوَادِ كُلُّهَا اَرْضُ خَرَاجٍ وَهِيَ مَابَيْنَ الْعُذَيْبِ اِلَى عُقْبَةِ حَلْوَانَ مِنَ الْعَلْثِ اِلَى عُبَّادَانَ وَاَرْضُ السَّوَادِ مَمْلُوْكَةٌ لِاَهْلِهَا وَيَجُوْزُ بَيْعُهُمْ لَهَا وَتَصَرُّفُهُمْ فِيْهَا وَكُلُّ اَرْضٍ اَسْلَمَ اَهْلُهَا عَلَيْهَا اَوْ فُتِحَتْ عَنْوَةً وَقُسِمَتْ بَيْنَ الْغَانِمِيْنَ فَهِيَ اَرْضُ عُشْرٍ وَكُلُّ اَرْضٍ فُتِحَتْ عَنْوَةً فَاَقَرَّ اَهْلُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ اَرْضُ خَرَاجٍ وَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَوَاتًا فَهِيَ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ (رح) مُعْتَبَرَةٌ بِحَيِّزِهَا فَاِنْ كَانَتْ مِنْ حَيِّزِ اَرْضِ الْخَرَاجِ فَهِيَ خَرَاجِيَّةٌ وَاِنْ كَانَتْ مِنْ حَيِّزِ اَرْضِ الْعُشْرِ فَهِيَ عُشْرِيَّةٌ وَالْبَصْرَةُ عِنْدَنَا عُشْرِيَّةٌ بِاِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ.

সরল অনুবাদ ঃ এবং আমানত গনিমত হয়ে যাবে। আহলে হরবদের যেই মাল মুসলমানগণ হামলা করে যুদ্ধ বিহীন নিয়ে আসে তাহলে তা মুসলমানদের ভালো কাজে খরচ করা হবে, যেমনিভাবে চাঁদা (খাজনা) খরচ করা হবে। আরবের সব জমিন উশরী এবং তা আ'জীব থেকে নিয়ে হজরে ইয়ামনের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত এবং মোহরা থেকে উত্তর শামের সীমা পর্যন্ত। এবং সাওয়াদে ইরাকের সব জমিন খারাজী যা আজীব থেকে উকবায়ে হালওয়ান পর্যন্ত এবং আলছ স্থান থেকে ইবাদান স্থান পর্যন্ত। এবং সাওয়াদে ইরাকের সব জমিন সেখানের বাসিন্দাদের মালিকানা, তাদের জন্য তা বিক্রি করা এবং খরচ করা জায়েজ। এবং যে জমিনের বাসিন্দারা ইসলাম গ্রহণ করে নেয় অথবা বাহুবলে তা জয় করে নিল এবং গাজীদের মধ্যে বণ্টন করে দিল তাহলে তা উশরী জমিন এবং যে জমিন জয় করে নিল এবং তার বাসিন্দাগণকে সেখানে রাখা হলো, তাহলে তা খারাজী। এবং যে মৃত জমিনকে জীবিত করেছে তাহলে কাজী আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট তার ধর্তব্য তার সমতুল্য জমিন দ্বারা হবে। সুতরাং যদি সমতুল্য জমিন খারাজী হয় তাহলে তা খারাজী হবে এবং যদি সমতল জমিন উশরী হয় তাহলে তা উশরী হবে এবং বসরা আমাদের নিকট উশরী সাহাবায়ে কেরামের (রা.) ঐকমত্যে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَدِيْعَتْ ও دَيْن-এর পার্থক্য ঃ

قَوْلُهُ وَصَارَتِ الْوَدِيْعَةُ ঃ প্রকাশ থাকে যে, এখানে وَدِيْعَتْ তথা আমানত ও دَيْن তথা ঋণের মধ্যে অধিকার থাকে। আমানতদার শুধু প্রতিনিধি হিসাবে থাকে, প্রয়োজনে সময় মতো তা হতে মালামাল ছিনিয়ে নেওয়া যায়। আর যা ধার করেছে বা বদল নিয়েছে উহা তার নিকটে অপরের আমানত নয় । কিন্তু তার নিকট রক্ষিত বন্ধকী মাল فَيْئ গনিমত হবে। কেননা তার প্রদত্ত ঋণের বিনিময়ে এক বন্ধকী মাল লাভ করেছে, অতএব উহা তারই মাল বলে গণ্য হবে।

আরব ভূমির ভৌগোলিক সীমারেখা :

قَوْلُهُ وَاَرْضُ الْعَرَبِ الخ : এখানে اَرض عَرَب আরব ভূমি বলে আরব উপদ্বীপ বুঝিয়েছেন। আরব উপদ্বীপ ৫টি অঞ্চল নিয়ে ভৌগলিক ধারা সাব্যস্ত হয়েছে- (১) তাহামাহ (২) নজদ (৩) হিজাজ (৪) উরুজ (৫) ইয়ামামা। হিজাজের দক্ষিণে তাহামাহ, হিজাজ ও ইরাকের মধ্যবর্তী অঞ্চল নজদী, ইয়ামন সীমান্তের পার্বত্য এলাকা হতে উত্তরে সিরিয়া পর্যন্ত হিজাজ, ইয়ামামা হতে বাহরাইন পর্যন্ত হলো উরুজ।

قَوْلُهُ اَرْضُ عُشْرٍ الخ : প্রকাশ থাকে যে, এখানে গ্রন্থকার (র.) ভূমি সম্পর্কীয় অজিফার আলোচনা করছেন। এটা দু'প্রকার : (১) عُشْر (২) خَرَاج যে জমিন ইমামের পক্ষ থেকে কাফেরদের মধ্যে বন্টন করা হয় উহা খারাজী হবে। আর মুসলমানদের বন্টন করলে উহা উশরী হবে।

عُشْر ও خَرَاج-এর পরিমাণ : عُشْر ফসলের দশ ভাগের এক ভাগ আদায় করতে হয়, আর خَرَاج জমির পরিমাণ অনুযায়ী ধার্যকৃত টেক্স বা কর আদায় করতে হয়।

আরব ভূমির বিধান : উপরোক্ত আলোচনার পর এখন আরব ভূমির অজিফার বিধান প্রমাণসহ পেশ করছি। আরবের জমিনের উৎপাদনের শুধুমাত্র ওশর ওয়াজিব হয়। কেননা হুযূর (সা.) ও খলিফাগণ হতে কোনোরূপ প্রমাণ নেই যে, আরববাসী হতে খেরাজ আদায় করিয়েছেন এবং এই মর্মে কোনো হাদীসও উল্লেখ নেই। কেননা, আরববাসীদের সাথে শুধুমাত্র ২টি বস্তুর মোকাবিলা, ইসলাম অন্যথা যুদ্ধ। অতএব কারণে তাদের ওপর জিজিয়ার বিধান করা হয়নি।

মৃত জমিনকে ফসলের উপযোগী করার বিধান :

قَوْلُهُ وَمَنْ اَحْيَا اَرْضًا مَوَاتًا الخ : আলোচ্য মাসআলার মর্মে ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, যে ব্যক্তি পরিশ্রম করতঃ কোনো একটি মৃত জমিনকে জীবিত করেছে। অর্থাৎ ফসলের উপযোগী করেছে এটা তারই অধীনে থাকবে, যদি ইমামের অনুমতি নিয়ে থাকে। অন্যথা ইমাম ইচ্ছা করলে অন্য কাউকেও দিতে পারে।

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ اَحْيَاهَا بِبِئْرٍ حَفَرَهَا اَوْ بِعَيْنٍ اِسْتَخْرَجَهَا اَوْ بِمَاءِ دَجْلَةٍ اَوِ الْفُرَاةِ اَوِ الْاَنْهَارِ الْعِظَامِ الَّتِى لَا يَمْلِكُهَا اَحَدٌ فَهِىَ عُشْرِيَّةٌ وَاِنْ اَحْيَاهَا بِمَاءِ الْاَنْهَارِ الَّتِى اِحْتَفَرَهَا الْاَعَاجِمُ مِثْلَ نَهْرِ الْمَلِكِ وَنَهْرِ يَزْدَجَرْد فَهِىَ خَرَاجِيَّةٌ وَالْخَرَاجُ الَّذِىْ وَضَعَهُ عُمَرُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَلٰى اَهْلِ السَّوَادِ مِنْ كُلِّ جُرَيْبٍ يَبْلُغُهُ الْمَاءُ وَيَصْلُحُ لِلزَّرْعِ قَفِيْزٌ هَاشِمِيٌّ وَهُوَ الصَّاعُ وَدِرْهَمٌ وَمِنْ جُرَيْبِ الرَّطْبَةِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَمِنْ جُرَيْبِ الْكَرْمِ الْمُتَّصِلِ وَالنَّخْلِ الْمُتَّصِلِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ وَمَا سِوٰى ذَالِكَ مِنَ الْاَصْنَافِ يُوْضَعُ عَلَيْهَا بِحَسْبِ الطَّاقَةِ فَاِنْ لَمْ تُطِقْ مَا وُضِعَ عَلَيْهَا نَقَصَهَا الْاِمَامُ وَاِنْ غَلَبَ عَلٰى اَرْضِ الْخَرَاجِ الْمَاءُ اَوْ اِنْقَطَعَ عَنْهَا اَوْ اِصْطَلَمَ الزَّرْعَ اٰفَةٌ فَلَا خَرَاجَ عَلَيْهِمْ وَاِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ وَمَنْ اَسْلَمَ مِنْ اَهْلِ الْخَرَاجِ اُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ عَلٰى حَالِهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং ইমাম মুহাম্মদ (র.) বলেন যে, যদি তাকে কূপ খনন করে অথবা ঝর্ণা বের করে জীবিত করে, অথবা দাজলা, অথবা ফুরাত, অথবা এ জাতীয় বড় নদীর পানি দ্বারা, যার কোনো মালিক নেই, তাহলে তা উশরী জমিন এবং যদি ঐ সমস্ত নদীর পানি দ্বারা জীবিত করে যাকে আজমীগণ খনন করেছে। যেমন– নহরে মুলক, নহরে ইয়াযিদজারদ তাহলে তার খারাজী জমিন। এবং হযরত ওমর (রা.) আহলে সওয়াদদের ওপর যে খাজনা (চাঁদা) নির্ধারণ করেছেন, তা প্রত্যেক ঐ জারীব থেকে যাতে পানি পৌঁছে এবং চাষাবাদের উপযুক্ত হয় এক হাসেমী কফীজ অর্থাৎ এক সা এবং এক দিরহাম এবং তুর্কিদের এক জারীবে পাঁচ দেরহাম এবং মিলিত আঙ্গুর এবং মিলিত খেজুরের এক জারীবে দশ দিরহাম। এবং তা ছাড়া অন্য রকমের জমিনে তাদের বিধি অনুযায়ী নির্ধারণ করা হবে। সুতরাং যদি তারা তা সহ্য না করে যা নির্ধারণ করা হবে, তাহলে ইমাম তাকে কম করে দেবে এবং যদি খারাজী জমিনের ওপর পানি গালেব এসে যায় অথবা তার দ্বারা পানি বন্ধ হয়ে যায় অথবা কোনো বিপদাপদ ও দূর্ঘটনার খেতকে নষ্ট করে দেয় তাহলে ঐ কৃষকদের ওপর খারাজ হবে না এবং যদি জমিনের মালিক তাকে বেকার ছেড়ে দেয় তাহলে তার ওপর খাজনা লাগবে। এবং খাজনাদাতা ইসলাম গ্রহণ করে নেয় তাহলে তার থেকে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী খারাজ নেওয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল বিনষ্ট হলে খারাজের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ غَلَبَ عَلٰى اَرْضِ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলা সমূহে সিদ্ধান্ত এই যে, যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। যথা– প্লাবন, অগ্নি, খরা, ইঁদুর ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দ্বারা ফসল বিনষ্ট হয়ে যায় তখন খারাজ মওকুফ হবে। কিন্তু যদি মানুষের চেষ্টায় উহা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় তখন খারাজ মওকুফ হবে না। বিশেষত বর্ণিত দুর্যোগ যদি ফসল কাটার পূর্বে দেখা দেয়। আর ফসল কাটার পরে দেখা দিলে খারাজ মওকুফ হবে না।

একই জমিনের خَرَاجٌ ও عُشْرٌ সম্পর্কে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ اَنْ يَشْتَرِىَ الْمُسْلِمُ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) ভিন্ন মত প্রকাশ করে বলেন যে, খারাজী জমির মালিক যদি মুসলমান হয়, অথবা মুসলমান জমি ক্রয় করলে খারাজের সাথে ওশর ওয়াজিব হবে। কেননা খারাজ একবার নির্ধারিত হলে উহা খারাজীই থাকবে। এ মর্মে খারাজ আদায় করতেই হবে। আর ওশর একটি এবাদত বিশেষ, ছাওয়াব লাভের উদ্দেশে মুসলমানের জমি হিসাবে এটাও আদায় করা ওয়াজিব। আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে বর্ণিত কথাটি সরাসরি অবিচারের পরিচায়ক। কেননা রাসূল (সা.) হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, لَا يَجْتَمِعُ عَلٰى مُسْلِمٍ خَرَاجٌ وَعُشْرٌ অর্থ– মুসলমানদের ওপর একত্রে খারাজ ও ওশর চাপানো যাবে না। সুতরাং ওশর ওয়াজিব হবে না।

وَيَجُوْزُ اَنْ يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ اَرْضَ الْخَرَاجِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَرَاجُ وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ اَرْضِ الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ جِزْيَةٌ تُوْضَعُ بِالتَّرَاضِيْ وَالصُّلْحِ فَتَتَقَدَّرُ بِحَسْبِ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الْاِتِّفَاقُ وَجِزْيَةٌ يَتَبْدِئُ الْاِمَامُ بِوَضْعِهَا اِذَا غَلَبَ الْاِمَامُ عَلَى الْكُفَّارِ وَاَقَرَّهُمْ عَلٰى اَمْلَاكِهِمْ فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ الظَّاهِرِ الْغِنَاءِ كُلَّ سَنَةٍ ثَمَانِيَةً وَاَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا يَأْخُذُ مِنْهُ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ اَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ الْحَالِ اَرْبَعَةً وَعِشْرِيْنَ دِرْهَمًا فِيْ كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمَيْنِ وَعَلَى الْفَقِيْرِ الْمُعْتَمِلِ اِثْنَيْ عَشَرَةَ دِرْهَمًا فِيْ كُلِّ شَهْرٍ دِرْهَمٌ وَتُوْضَعُ الْجِزْيَةُ عَلٰى اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمَجُوْسِيْ وَعَبْدَةِ الْاَوْثَانِ مِنَ الْعَجَمِ وَلَا تُوْضَعُ عَلٰى عَبْدَةِ الْاَوْثَانِ مِنَ الْعَرَبِ وَلَا عَلَى الْمُرْتَدِّيْنَ وَلَاجِزْيَةَ عَلٰى اِمْرَأَةٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا زَمِنٍ وَلَا عَلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ وَلَا عَلَى الرُّهْبَانِ الَّذِيْنَ لَا يُخَالِطُوْنَ النَّاسَ وَمَنْ اَسْلَمَ وَعَلَيْهِ جِزْيَةٌ سَقَطَتْ عَنْهُ.

সরল অনুবাদ ঃ এবং মুসলমানদের জন্য জায়েজ আছে জিম্মি থেকে খারাজী জমিন খরিদ করা এবং তার থেকে খাজনাই নেওয়া হবে এবং খারাজী জমিনের উৎপাদিত জিনিসের উশর নেই এবং ট্যাক্স দু' প্রকার ঃ (১) ঐ ট্যাক্স যা উভয়ের সম্মতি এবং সন্ধি দ্বারা নির্ধারণ করা হয়, সুতরাং যার ওপর একমত হয়ে যায় তা নির্ধারিত করা হবে। (২) ঐ ট্যাক্স যা ইমাম প্রথমে নির্ধারণ করে যখন তারা কাফিরদের ওপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং তাদের মালিকানা জিনিসকে তাদের মালিকানায় ঠিক রেখে দেয়। সুতরাং প্রকাশ্য ধনীদের ওপর প্রতি বৎসর আটচল্লিশ দিরহাম নির্ধারিত করবে এবং প্রতি মাসে তাদের থেকে চার দিরহাম নিয়ে নেবে এবং মধ্যমস্তরের লোকদের ওপর চব্বিশ দিরহাম প্রতিমাসে দুই দিরহাম এবং শ্রমিক ফকিরদের ওপর বারো দিরহাম প্রতি মাসে এক দিরহাম এবং আহলে কিতাব (ইহুদি খ্রিস্টান) দের ওপর এবং অগ্নি পূজকদের ওপর, আজমী মূর্তি পূজকদের ওপর ট্যাক্স নির্ধারণ করবে। এবং আরবের মূর্তি পুজকদের ওপর ট্যাক্স নির্ধারণ করবে না এবং মুরতাদদের ওপর এবং মহিলাদের ওপর, সন্তান (শিশু) পঙ্গু এবং এমন ফকিরের ওপর যে বেকার ট্যাক্স নেই। ঐ সমস্ত পাদ্রীদের ওপরও ট্যাক্স নেই যারা মানুষের সাথে মেলামেশা করে না এবং যে ব্যক্তি মুসলমান হয়ে গেছে অথচ তার দায়িত্বে ট্যাক্স ছিল, তাহলে তার জিম্মা থেকে জিজিয়া বাদ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَالْجِزْيَةُ عَلٰى الخ ঃ جِزْيَةٌ (জিজিয়া) অর্থ নিরাপত্তার বিনিময় বা কর। جِزْيَةٌ-এর মাধ্যমে অমুসলিম ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে তাদের জান ও মালের হেফাজত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এটাতে ব্যর্থ হলে সরকার جِزْيَةٌ বাবত গচ্ছিত অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হয়।

قَوْلُهُ بِالتَّرَاضِيْ الخ ঃ এ মাসআলার প্রমাণ এই যে, নবী করীম (সা.) না:জরানের খ্রিস্টানদের সাথে দু'হাজার জোড়া কাপড়, ত্রিশটি ঘোড়া ও উট এবং যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্র সরবরাহের চুক্তি করেছিলেন।

ধনী কাকে বলে? ঃ

قَوْلُهُ الْغَنِيُّ الظَّاهِرُ الخ ঃ আলমগীরী কিতাবে উল্লেখ আছে যে, যার দশ হাজার দিরহামের বেশি মূল্যের সম্পদ আছে তাকে ধনী বলে। আর যার নিকট দু'শত দিরহামের অধিক ও দশ হাজার দিরহামের কম মূল্যের সম্পদ আছে তাকে মধ্যবিত্ত বলে। আর যার দুইশত দিরহামের কম মূল্যের সম্পদ আছে তাকে গরিব বলে। আর অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, এলাকাবাসীরা যাকে ধনী বলে সে ধনী, আর যাকে গরিব বলে সে গরিব। তবে দুইশত দিরহামের মালিক হলে তাকে গরিব বলে গণ্য করা বৈধ হবে না।

قَوْلُهُ اَهْلُ الْكِتَابِ وَالْمَجُوْسِيِّ الخ ঃ ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন, কিতাবী ও অগ্নি পূজকদের ওপর জিজিয়া নেই, আমাদের মতে দিতে হবে। কারণ কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে–

فَاقْتُلُوا الَّذِيْنَ لَايُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (الاية)

এ আয়াতের তাফসীরে মুজাহিদ (র.) বলেন, আয়াতটি তাবুকের যুদ্ধ প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়।

আজম তথা আরবের বহির্ভূত পৌত্তলিকদের জিজিয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ مِنَ الْعَجَمِ الخ ঃ প্রকাশ থাকে যে, আরবের বহির্ভূত পৌত্তলিকদের ওপর জিজিয়া ধার্য করার মধ্যে ওলামাগণ মতানৈক্য করেছেন। আমাদের মতে জিজিয়া ধার্য করা যেতে পারে। ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, জিজিয়া ধার্য করা যাবে না। আমাদের প্রমাণ এই যে, অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিক আহলে কিতাব বহির্ভূত হওয়ার ক্ষেত্রে একই পর্যায়। অতএব উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নেই। অবশ্য আরব পৌত্তলিকগণের ব্যাপারে নির্দেশ আছে যে, তারা মুসলমান হবে নতুবা তরবারির সম্মুখীন হবে। তাদের সম্বন্ধে অন্য কোনো বিধিবিধান ভিন্নভাবে নেই।

قَوْلُهُ وَلَاجِزْيَةَ عَلٰى اِمْرَأَةٍ الخ ঃ অর্থাৎ جِزْيَةٌ শুধু সক্ষম প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের ওপর ধার্য করা হয়। নারী, শিশু দরিদ্র ও প্রতিবন্ধীদের ওপর جِزْيَةٌ ধার্য হয় না এবং সংসার বিরাগী সন্ন্যাসী ও ধর্ম জাযকদের ওপরও جِزْيَةٌ ধার্য করা হয় না।

অক্ষম দরিদ্রের জিজিয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَا عَلٰى فَقِيْرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলায় মতভেদ আছে, গ্রন্থকার (র.) এখানে তা উল্লেখ করেননি। অন্যান্য ফিকহ শাস্ত্রের কিতাবে উল্লেখ আছে যে, অক্ষম দরিদ্রের থেকে জিযিয়া নেওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। জমহুরের মতে উপার্জনহীন দরিদ্রের ওপর জিজিয়া ধার্য হবে না। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে ধার্য হবে। জমহুরের দলিল হলো, হযরত উসমান (রা.) এরূপ ব্যক্তিগণকে জিজিয়া হতে অব্যাহতি দিয়েছেন। আর সমকালীন সাহাবীগণও এটাকে সমর্থন করেছেন। তা ছাড়া হযরত ওমর (রা.) অক্ষম ও বৃদ্ধ উভয়ের ওপর জিজিয়া ধার্য করা ঠিক হবে না বলেছেন।

وَإِنْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَوْلَانُ تَدَاخَلَتِ الْجِزْيَتَانِ وَلَا يَجُوْزُ إِحْدَاثُ بِيْعَةٍ وَلَا كَنِيْسَةٍ فِيْ دَارِ الْإِسْلَامِ وَإِذَا انْهَدَمَتِ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسُ الْقَدِيْمَةُ أَعَادُوْهَا وَيُؤْخَذُ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالتَّمْيِيْزِ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ زِيِّهِمْ وَمَرَاكِبِهِمْ وَسُرُوْجِهِمْ وَقَلَانِسِهِمْ وَلَا يَرْكَبُوْنَ الْخَيْلَ وَلَا يَحْمِلُوْنَ السِّلَاحَ وَمَنِ امْتَنَعَ مِنَ الْجِزْيَةِ أَوْ قَتَلَ مُسْلِمًا أَوْ سَبَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوْ زَنٰى بِمُسْلِمَةٍ لَمْ يَنْتَقِضْ عَهْدُهٗ وَلَا يَنْقُضُ الْعَهْدَ إِلَّا بِأَنْ يَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ أَوْ يَغْلِبُوْا عَلٰى مَوْضِعٍ فَيُحَارِبُوْنَنَا وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ كَانَتْ لَهٗ شُبْهَةٌ كُشِفَ لَهٗ وَيُحْبَسُ ثَلٰثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ أَسْلَمَ وَإِلَّا قُتِلَ فَإِنْ قَتَلَهٗ قَاتِلٌ قَبْلَ عَرْضِ الْإِسْلَامِ عَلَيْهِ كُرِهَ لَهٗ ذٰلِكَ وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاتِلِ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ فَلَا تُقْتَلُ وَلٰكِنْ تُحْبَسُ حَتّٰى تُسْلِمَ وَيَزُوْلُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ مِنْ أَمْوَالِهٖ بِرِدَّتِهٖ زَوَالًا مُرَاعًى فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَتْ إِلٰى حَالِهَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি তার ওপর দু'বৎসরের ট্যাক্স জমা হয়ে যায় তাহলে তাতে অনুপ্রবেশ হয়ে যাবে। ইহুদি নাসারার ইসলামি রাষ্ট্রে নতুন গীর্জা বানানো জায়েজ নেই। যখন পুরাতন ইবাদত খানা ও গীর্জা ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে, তাহলে দ্বিতীয়বার বানাতে পারবে। এবং জিম্মিদের থেকে অঙ্গীকার নেওয়া হবে মুসলমানদের লেবাস-পোশাক, সওয়ারি, জমিন এবং টুপিসমূহের মধ্যে পার্থক্য থাকার। এবং তারা ঘোড়ার ওপর সওয়ার হবে না, এবং অস্ত্র উঠাবে না। যে ব্যক্তি ট্যাক্স দেওয়া থেকে বিরত থাকে, অথবা মুসলমানদেরকে হত্যা করে, অথবা হুযূর (সা.)-কে খারাপ বলে,অথবা মুসলমান মহিলার সাথে জেনা করে, তাহলে তার অঙ্গীকার ভাঙ্গবে না। এবং অঙ্গীকার ভাঙ্গবে না কিন্তু যদি সে দারুল হরবে চলে যায়, অথবা কোনো জায়গার ওপর বিজয় হয়ে আমাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। এবং যখন মুসলমান ও ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যায়, তাহলে তার কাছে ইসলাম পেশ করা হবে, যদি তার কোনো সন্দেহ হয় তাহলে তা দূর করা হবে এবং তিনদিন পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হবে। যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে ভালো, নতুবা হত্যা করে দেওয়া হবে। সুতরাং যদি তাকে কেউ ইসলাম পেশ করার আগে হত্যা করে দেয় তাহলে এটা অপছন্দনীয় এবং হত্যাকারীর ওপর কোনো জিনিস ওয়াজিব হবে না। অতঃপর মুরতাদ মহিলাকে হত্যা করা হবে না; বরং বন্দী করে রাখা হবে ইসলাম গ্রহণ করা পর্যন্ত। এবং মুরতাদের মালিকানা তার মাল থেকে স্থগিত হিসাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং যদি ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তাহলে স্বীয় অবস্থায় ফিরে আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ بِيْعَةٌ وَلَا كَنِيْسَةٌ الخ ঃ بِيْعَةٌ বলা হয় ইহুদিদের উপাসনালয়কে। আর كَنِيْسَةٌ বলা হয় নাসারা তথা খ্রিস্টানদের উপাসনাগার বা গীর্জাকে।

قَوْلُهٗ وَإِذَا انْهَدَمَتْ الخ ঃ অর্থাৎ ইহুদি ও নাসারা যারা ইসলামি রাষ্ট্রে জিম্মি হিসাবে থাকে তারা ইসলামি রাষ্ট্রে নতুন উপাসনাগার তৈরি করতে পারবে না। হাঁ পূর্বের কোনো উপাসনাগার যদি ভগ্ন অবস্থায় থাকে উহাকে পূর্বের ন্যায় মেরামত করতে পারবে, বর্ধিত করতে পরবে না। আর যদি ইমাম ইচ্ছা করেন, তখন উহাকে পুন নির্মাণ ও মেরামত না করার নির্দেশও দিতে পারেন।

مُرْتَدْ-এর ব্যাপারে ইমামের প্রাথমিক দায়িত্ব :

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ كَشَفَ الخ : অর্থাৎ ধর্মত্যাগীদের ব্যাপারে মুসলিম ইমামের প্রাথমিক দায়িত্ব এই যে, জ্ঞানের আলোকে তার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা নেওয়া হবে। তার উথাপিত যুক্তি খণ্ডন করার চেষ্ট করা হবে। তাকে সন্তুষ্ট করা কর্তব্য নয়। সুতরাং আলিমগণ যথাসাধ্য তাকে বুঝাবার প্রচেষ্টা চালাবেন। তাতেও সে পথে না আসলে শরিয়তের ভিত্তিতে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা হবে।

مُرْتَدْ পুরুষকে সময় দেওয়ার বিধান ও এ সম্পর্কে মতভেদ :

قَوْلُهُ وَيُحْبَسُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ الخ : এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) مُرْتَدْ-এর বিধান বর্ণনা করছেন। অর্থাৎ মুরতাদ যদি ইসলাম ত্যাগ করার পর তার নিকট ইসলাম পেশ করা হয় এবং তার অন্তরের সন্দেহ ইত্যাদি দূর করার জন্য সে যদি সময় চায় তখন তাকে তিন দিন যাবৎ আটক করে রাখবে। যদি সে সময়ের মধ্যে তওবা করে তবে উত্তম, অন্যথা তাকে হত্যা করা হবে। কেননা 'জামে সগীর' নামক কিতাবে উল্লেখ আছে যে, অনুতপ্ত হয়ে তওবা না করলে তখনই তাকে হত্যা করা হবে। এতে বুঝা গেল যে, তিন দিন সময় দেওয়া জরুরি নয়। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা অনুসারে এটা মোস্তাহাব। তবে ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উহা ওয়াজিব। কেননা জনৈক মুরতাদকে সময় না দিয়ে হত্যা করাতে হযরত ওমর (রা.) ইহা শুনে বহু তিরস্কার করেছেন এবং বলেছেন যে, হে আল্লাহ আমি উপস্থিত ছিলাম না এবং নির্দেশও দেইনি এবং আমি এটা সমর্থনও করি না। আমাদের বক্তব্য এই যে, সময় চাইলে সময় দেওয়া ওয়াজিব। উক্ত ঘটনায় ঐ ব্যক্তি সময় চেয়েছিল। সময় না দেওয়াতে হযরত ওমর (রা.) তাদেরকে তিরস্কার করেন।

مُرْتَدَّةٌ মহিলাকে হত্যা না করার ব্যাপারে মতভেদ :

قَوْلُهُ وَاَمَّا الْمَرْأَةُ اِذَا ارْتَدَّتْ الخ : ধর্ম ত্যাগ ও পরিবর্তন করা সম্পর্কে হাদীস শরীফের মূল ভাষ্য এই– "যে ধর্ম পরিবর্তন করেছে তাকে হত্যা করো।" এতে নারী পুরুষের পার্থক্য করা হয়নি। এ জন্য ইমাম শাফেয়ী (র.) বলেন যে, ধর্মত্যাগী নারীকেও হত্যা করতে হবে। আমাদের মতে কোনো মহিলাকে ধর্ম ত্যাগের অপরাধে হত্যা করা বৈধ নয়। কেননা, বুখারী শরীফে আছে যে, যদি কোনো নারী ধর্ম ত্যাগ করে তবে তাকে ইসলামের দিকে আহবান করবে। যদি সে ফিরে আসে তবে তাকে গ্রহণ করবে। যদি অস্বীকার করে তাকে বন্দী করে রাখবে।

وَاِنْ مَاتَ اَوْقُتِلَ عَلٰى رِدَّتِهٖ اِنْتَقَلَ مَا اكْتَسَبَهٗ فِىْ حَالِ الْاِسْلَامِ اِلٰى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَكَانَ مَااكْتَسَبَهٗ فِىْ حَالِ رِدَّتِهٖ فَيْئًا فَاِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِلِحَاقِهٖ عَتَقَ مُدَبَّرُوْهُ وَاُمَّهَاتُ اَوْلَادِهٖ وَحَلَّتِ الدُّيُوْنُ الَّتِىْ عَلَيْهِ وَانْتَقَلَ مَااكْتَسَبَهٗ فِىْ حَالِ الْاِسْلَامِ اِلٰى وَرَثَتِهٖ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَتُقْضَى الدُّيُوْنُ الَّتِىْ لَزِمَتْهُ فِىْ حَالِ الْاِسْلَامِ مِمَّا اكْتَسَبَهٗ فِىْ حَالِ الْاِسْلَامِ وَمَا لَزِمَهٗ مِنَ الدُّيُوْنِ فِىْ حَالِ رِدَّتِىْ يُقْضٰى مِمَّا فِىْ حَالِ رِدَّتِهٖ وَمَا بَاعَهٗ اَوْ اِشْتَرَاهُ اَوْ تَصَرَّفَ فِيْهِ مِنْ اَمْوَالِهٖ فِىْ حَالِ رِدَّتِهٖ مَوْقُوْفٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং সে যদি ঐ মুরতাদ অবস্থায় মারা যায় অথবা হত্যা করা হয়, তাহলে তার মুসলমান অবস্থার কামাই মুসলমান ওয়ারিশদের দিকে ফিরবে এবং তার মুরতাদ অবস্থার কামাই গনিমত হয়ে যাবে। সুতরাং যদি মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে গেল এবং হাকিমে তাকে চলে যাওয়ার হুকুম করেছে, তাহলে তার মোদাব্বার ও উম্মে ওয়ালাদ গোলাম সব আজাদ হয়ে যাবে। এবং ঐ কর্জ যা তার দায়িত্বে মেয়াদি (র্নিদিষ্ট সময় বিশিষ্ট) ছিল, তা পুরা হয়ে যাবে এবং তার মুসলমান অবস্থার কামাই মুসলমান ওয়ারিশদের দিকে ফিরবে। এবং তার ঐ কর্জ যা তার মুসলামন অবস্থায় জরুরি হয়েছে, তার মুসলমান অবস্থার কামাই থেকে মীমাংসা করা হবে এবং তার এ কর্জ যা তার মুরতাদ অবস্থায় জরুরি হয়েছে, তা মুরতাদ অবস্থার কামাই থেকে মীমাংসা করা হবে। এবং সে যা কিছু বিক্রি করেছে অথবা ক্রয় করেছে অথবা খরচ করেছে নিজ মালের মধ্যে মুরতাদ অবস্থায় তো এসব মওকুফ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُرْتَدْ-এর সম্পদের মালিকানার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَاِنْ مَاتَ اَوْقُتِلَ الخ ঃ অর্থাৎ مُرْتَدْ যদি দারুল ইসলামে মারা যায় অথবা হত্যা করা হয় অথবা সে দারুল হারবে চলে যায়, তখন সমস্ত সম্পদের মালিকানা থাকবে না। কেননা দারুল হরবে চলে যাওয়ার কারণে সে ইসলামি বিধানের আওতার বাইরে চলে গেছে। এ জন্য মৃত ব্যক্তির ন্যায় হয়েছে। এ কারণেই শরিয়তের বিধান অনুযায়ী তার সম্পদের মালিকানা রহিত হয়ে যায়।

مُرْتَدْ-এর مُسْلمَانْ অবস্থায় অর্জিত সম্পদের বিধানে ইমামদের মতভেদ ঃ

وَكَانَ مَا اكْتَسَبَهٗ فِىْ حَالِ رِدَّتِهٖ فَيْئًا الخ ঃ ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর মতে مُرْتَدْ-এর মুসলমান অবস্থায় অর্জিত সম্পদ মুসলমান ওয়ারিশগণ পাবে, আর مُرْتَدْ অবস্থায় অর্জিত সম্পদ فَيْئ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। সাহেবাইন (র.)-এর মতে উভয় অবস্থার অর্জিত সম্পদ মুসলমান ওয়ারিশগণ পাবে। ইমাম শাফেয়ীর অভিমত এই যে, মুরতাদ অবস্থায় এবং মুসলমান অবস্থায় উপার্জনকৃত সম্পদ ফাই হিসেবে সরকারি ট্রেজারীতে জমা হবে এবং খেরাজ ও জিজিয়ার খাতে ব্যয় হবে। কেননা মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথে কাফির হয়ে গেছে। এজন্য فَيْئ-এর অন্তর্ভুক্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফার (র.)-এর যুক্তি এই যে, মুরতাদ হওয়ার সাথে সাথে যায়েদকে মৃত বলে সাব্যস্ত করা হবে। কারণ সেই সময় সে নিহত হওয়ার অধীনে হয়ে গেছে। অতএব এই কৃত্রিম মৃত্যুকালীন সময় সে মুসলমান ছিল। একজন মুসলমান মৃত হলে তার ওয়ারিশগণ সম্পত্তি পায় এখানেও তেমনি পাবে।

فَإِنْ أَسْلَمَ صَحَّتْ عُقُودُهُ وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتْ وَإِنْ عَادَ الْمُرْتَدُّ بَعْدَ الْحُكْمِ بِلِحَاقِهِ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ مُسْلِمًا فَمَا وَجَدَهُ فِي يَدِ وَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ بِعَيْنِهِ أَخَذَهُ وَالْمُرْتَدَّةُ إِذَا تَصَرَّفَتْ فِي مَالِهَا فِي حَالِ رِدَّتِهَا جَازَ تَصَرُّفُهَا وَنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ يُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنَ الزَّكٰوةِ وَيُؤْخَذُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْ صِبْيَانِهِمْ . وَمَا جَبَاهُ الْإِمَامُ مِنَ الْخَرَاجِ وَمِنْ أَمْوَالِ بَنِي تَغْلِبَ وَمَا أَهْدَاهُ أَهْلُ الْحَرْبِ إِلَى الْإِمَامِ وَالْجِزْيَةُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ فَيُسَدُّ مِنْهُ الثُّغُوْرُ وَتُبْنَى الْقَنَاطِرُ وَالْجُسُوْرُ .

সরল অনুবাদ ঃ যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে তার এই চুক্তি সহীহ হয়ে যাবে এবং যদি মরে যায় অথবা হত্যা করে দেওয়া হয় অথবা দারুল হরবে চলে যায় তাহলে (তার চুক্তি) বাতিল হয়ে যাবে। এবং যখন মুরতাদের কাফেরের হুকুম লাগানোর পর মুরতাদ মুসলমান হয়ে ইসলামি রাষ্ট্রের দিকে ফিরে আসে তখন যে মাল তার ওয়ারিশদের জিম্মায় সঠিকভাবে পাবে, তা নিয়ে নেবে। মুরতাদ মহিলা যদি তার মুরতাদী জামানায় তার মাল ব্যয় করে, তাহলে তার এই (তাসাররুফ) খরচ জায়েজ আছে। এবং বনি তাগলবের (তাগলব বাসীদের) থেকে তার ডবল নেওয়া হবে মুসলমানদের থেকে যে জাকাত নেওয়া হয় এবং তাদের মহিলাদের থেকেও জাকাত নেওয়া হবে এবং তাদের বাচ্চাদের থেকে নেওয়া হবে না। এবং ইমামে খাজনা এবং বনী তাগলবের মাল যা কিছু জমা করছে এবং আহলে হরব যা কিছু ইমামকে হাদিয়া দিয়েছে এবং ট্যাক্সের মাল মুসলমানদের ভালো কাজে খরচ করা হবে। সুতরাং তার দ্বারা সীমান্তসমূহ বন্ধ করা হবে, এবং তার দ্বারা পুল বানানো হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

جِزْيَةٌ খরচ করার খাতসমূহ ও অন্যান্য আয়ের উৎস ও খাতসমূহ ঃ

قَوْلُهُ وَالْجِزْيَةُ يُصْرَفُ فِي مَصَالِحِ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) جِزْيَةٌ-এর খাতসমূহ বর্ণনা করছেন, প্রকাশ থাকে যে, ফিকহ শাস্ত্রে বর্ণিত আয়ের উৎসসমূহ হতে যে অর্থ সংগ্রহ করা হয় তা খরচ করার খাতসমূহ নিম্নরূপ ঃ (ক) আয়ের উৎস ঃ পশুর জাকাত, মুসলিম ব্যবসায়ীদের মালের জাকাত এবং উৎপাদিত ফসলের ওপর হতে সংগ্রহকৃত অর্থ– বা উশর ; কুরআন পাকের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে। যথা– গরীব নিঃস্ব মুকাতাব গোলাম ইত্যাদি। (খ) আয়ের উৎস ঃ গনিমতের এক পঞ্চমাংশ খুমুস ব্যয়খাত। এটা রাসূল (সা.)-এর নিকটাত্মীয় অনাথ, নিঃস্ব ও পথিকদের কাজে ব্যয় হবে। (গ) আয়ের উৎস ঃ খারাজ, জিজিয়া যুদ্ধ ছাড়া অর্জিত সম্পদ। যেমন– উপঢৌকন বা চুক্তির মাধ্যমে লব্ধ সম্পদ এবং কাফির ব্যবসায়ী হতে ছিনিয়ে নেওয়া মাল। (ঘ) আয়ের উৎস ঃ ওয়ারিশী মাল, অভিভাবকহীন নিহত ব্যক্তির দিয়ত বা রক্ত মূল্য ব্যয়ের খাত। দরিদ্রের চিকিৎসা, লাওয়ারিশ মৃতের দাফন, এতিম ও লাওয়ারিশ শিশুদের শিক্ষা-দীক্ষা, লালন-পালন ইত্যাদি খাতে ব্যয় করা হবে।

قَوْلُهُ الثُّغُوْرُ الخ ঃ ثُغُوْرٌ এটা ثَغْرٌ-এর বহুবচন ثَغْرٌ অর্থ– সীমান্ত, বর্ডার। قَنَاطِرُ এটা قَنْطَرَةٌ-এর বহুবচন فَعْلَلَةٌ এটা قَنْطَرَةٌ -এর মাপকাঠিতে ব্যবহার হয়, দরিয়া ও নদী অতিক্রম করার জন্য যে মজবুত পুল তৈরি করা হয় উহাকে قَنْطَرَةٌ বলে। جُسُوْرٌ এটা جِسْرٌ-এর বহুবচন, ছোট খাল নালা অতিক্রম করার জন্য যে ব্যবস্থা করা হয় উহাকে جِسْرٌ বলে।

وَيُعْطَى مِنْهُ قُضَاةُ الْمُسْلِمِيْنَ وَعُمَّالُهُمْ وَعُلَمَائُهُمْ مَايَكْفِيْهِمْ وَيُدْفَعُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتِلَةِ وَذَرَارِيْهِمْ وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى بَلَدٍ وَخَرَجُوْا مِنْ طَاعَةِ الْإِمَامِ دَعَاهُمْ إِلَى الْعَوْدِ إِلَى الْجَمَاعَةِ وَكَشَفَ عَنْ شُبْهَتِهِمْ وَلَايَبْدَأُهُمْ بِالْقِتَالِ حَتَّى يَبْدَؤُهُ فَإِنْ بَدَؤُا قَاتَلَهُمْ حَتَّى يُفَارِقَ جَمَاعَتَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ أُجْهِزَ عَلَى جَرِيْحِهِمْ وَاتُّبِعَ مُوَلِّيْهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِئَةٌ لَمْ يُجْهَزْ عَلَى جَرِيْحِهِمْ وَلَمْ يُتَّبَعْ مُوَلِّيْهِمْ وَلَاتُسْبَى لَهُمْ ذُرِّيَّةٌ وَلَا يُقْسَمُ لَهُمْ مَالٌ.

সরল অনুবাদ ঃ এবং তার থেকে মুসলমানদের কাজিদেরকে এবং আমেলদেরকে এবং আলেমদেরকে এতটুকু দেবে, যা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়। এবং তার দ্বারা গাজীদেরকে এবং তাদের সন্তানদেরকে বেতন দেওয়া হবে। এবং যখন মুসলমানদের কোনো জাতি কোনো শহরের ওপর বিজয়ী হয়ে যায় এবং ইমামের অনুসরণ থেকে বের হয়ে যায়, তাহলে ইমাম তাদেরকে জামাতে গণ্য হওয়ার জন্য দাওয়াত দেবে। আর তাদের সন্দেহ দূর করবে এবং তাদের সাথে প্রথমে যুদ্ধ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শুরু করবে। সুতরাং যখন তারা আমাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করবে, তখন আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের দল ভেঙ্গে যাবে। এবং তাদের অন্য জামাত হলে তাদের আহতদেরকে কয়েদ করা হবে এবং পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করা হবে। এবং যদি অন্য জামাত না হয় তাহলে তাদের আহতদেরকে কয়েদ করা হবে না এবং তাদের পলায়নকারীদের পিছু ধাওয়া করবে না এবং তাদের সন্তানদের বন্দী করবে না এবং তাদের মালও বণ্টন করবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ بَدَءُوْا قَاتَلَهُمْ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলার প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ

فَقَاتِلُوا الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِيْئَ إِلَى أَمْرِ اللّٰهِ (الاية)

এ আয়াতে কারীমা আলোচ্য মাসআলার স্পষ্ট প্রমাণ।

قَوْلُهُ وَلَاتُسْبَى الخ ঃ এ মাসআলার প্রমাণ একটি হাদীসে মওকুফ তথা হযরত আলী (রা.)-এর বাণী ঃ

وَلَايُقْتَلُ أَسِيْرُهُمْ وَلَايُكْشَفُ لَهُمْ سِتْرٌ وَلَايُؤْخَذُ مَالٌ

বিদ্রোহের প্রকারভেদ ঃ সাধারণত বিদ্রোহ ৩ প্রকার– (১) লুটতরাজকারী অন্যায়ের সংশোধন বা ইমামের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পেশ করা উদ্দেশ্য নয়। (২) শাসকের অত্যাচারের কারণে যারা বিদ্রোহী হয়েছে ঐ ধরনের অত্যাচারী শাসকের সহযোগিতা বৈধ নয়। (৩) নিজেদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে ইমামের পক্ষ ত্যাগ করা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান ইমামের পক্ষে থাকে।

وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يُّقَاتِلُوْا بِسِلَاحِهِمْ اِنِ احْتَاجَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَيْهِ وَيَحْبِسُ الْاِمَامُ اَمْوَالَهُمْ وَلَا يَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ وَلَا يَقْسِمُهَا حَتّٰى يَتُوْبُوْا فَيَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ وَمَا جَبَاهُ اَهْلُ الْبَغْيِ مِنَ الْبِلَادِ الَّتِيْ غَلَبُوْا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَالْعُشُرِ لَمْ يَأْخُذْهُ الْاِمَامُ ثَانِيًا فَاِنْ كَانُوْا صَرَفُوْهُ فِيْ حَقِّهِ اَجْزَاَ مَنْ اَخَذَ مِنْهُ وَاِنْ لَمْ يَكُوْنُوْا صَرَفُوْهُ فِيْ حَقِّهِ فَعَلٰى اَهْلِهِ فِيْمَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يُّعِيْدُوْا ذَالِكَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি মুসলমানদের প্রয়োজন হয় তাহলে তাদেরই অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করাতে কোনো ক্ষতি নেই। ইমাম তাদের মাল রেখে দেবে এবং তাদেরকে দেবে না এবং বণ্টনও করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তওবা করবে। সুতরাং তাদেরকে তাদের মাল দিয়ে দিবে, এবং যা কিছু রাষ্ট্রদ্রোহীরা উসুল করেছে ঐ সমস্ত শহর থেকে যাদের ওপর তারা বিজয়ী হয়েছিল খাজনা অথবা ট্যাক্স থেকে, তাহলে ইমাম দ্বিতীয়বার তাদের থেকে নিবে না। সুতরাং যদি তারা সঠিক জায়গায় খরচ করে তাহলে যার থেকে নেওয়া হয়েছে তার পক্ষ থেকে যথেষ্ট হয়ে যাবে এবং যদি সঠিক জায়গায় খরচ না করে, তাহলে ঐ সমস্ত লোকদের ওপর দ্বিতীয় বার আদায় করা দীয়ানাতান (অর্থাৎ আল্লাহ ও বান্দার মাঝের হক আদায় হিসাবে) ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ الخ ঃ এ মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) দ্বিমত প্রকাশ করেছেন।

বিদ্রোহী কাকে বলে ?

قَوْلُهُ اَهْلُ الْبَغْيِ الخ ঃ যদি ভুল বুঝার দরুন নিজেকে ন্যায় এবং ইমামকে অন্যায় মনে করে আনুগত্য ত্যাগ করে তবে তাদেরকে বিদ্রোহী বলা হবে। কিন্তু অত্যাচারী ইমামের আনুগত্য পরিত্যাগ করলে শরিয়তের পরিভাষায় তাকে বিদ্রোহী বলা যাবে না।

قَوْلُهُ فَاِنْ كَانُوْا صَرَفُوْهُ فِيْ حَقِّهِ الخ ঃ অর্থাৎ বিদ্রোহী ও রাষ্ট্রদ্রোহীরা কোনো শহরকে বিজয় করে যদি শহরবাসী থেকে عُشُر ও خَرَاج উসুল আদায় করে নেয়, ইমামুল মুসলিমীন দ্বিতীয়বার উহা আর উসুল করবে না। বাকি কথা হলো, বিদ্রোহীরা যদি بِشْر ও خَرَاج-কে তার পূর্বে বর্ণিত নির্ধারিত খাতসমূহে খরচ করে তবে তো যাদের থেকে আদায় করেছে তাদের জিম্মা থেকে আদায় হয়ে যাবে। আর যদি عُشُر ও خَرَاج-কে তার খাতসমূহে খরচ না করে তবে এ عُشُر ও خَرَاج দানকারীরা তাদের ও আল্লাহ তা'আলার মাঝের হক আদায় হিসাবে পুনরায় عُشُر ও خَرَاج দিয়ে দেবে।

كِتَابُ الْحَظْرِ وَالْإِبَاحَةِ

অবৈধ (হারাম) ও বৈধ পর্ব

অর্থাৎ কোন বস্তুর ব্যবহার মানুষের জন্য অবৈধ ও হারাম এবং কোন বস্তুর ব্যবহার বৈধ উহার বিধানবলী এ পর্বে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হবে।

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) হজর ও ইবাহাত পর্বকে জিহাদ ও যুদ্ধ পর্বের পর এ জন্য এনেছেন যে, যুদ্ধের মধ্যে অধিকাংশই গনিমতের মাল লাভ হয়ে থাকে, আর গনিমতের মালের মধ্যে কিছু আছে যা ব্যবহার করা বৈধ আবার কিছু আছে যা ব্যবহার করা অবৈধ, এভাবে গনিমতের মাল ব্যতীত অন্যান্য বস্তুতেও বৈধ ও অবৈধের বিধানাবলী সম্পৃক্ত। তাই এখানে নকল বস্তুর কোনটি অবৈধ ও কোনটি বৈধ তা আলোচনা করা হবে।

حَظْر-এর আভিধানিক অর্থ ঃ حَظْر-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বাধা দেওয়া, বিরত রাখা, যেমন কুরআনে কারীমে এরশাদ হচ্ছে, وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا (الاية)

حَظْر -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় حَظْر বলা হয় مُبَاحٌ -এর বিপরীতকে অর্থাৎ অবৈধ বা হারাম।

বিঃ দ্রঃ গ্রন্থকার (র.) এ পর্বে পুরুষের জন্য রেশম ও স্বর্ণ ব্যবহার করা অবৈধ বলেছেন, তাই আমরা এ পর্বের ভূমিকায় স্বর্ণ ও রেশম পুরুষের জন্য হারাম হওয়ার কারণসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করছি।

পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হারাম হওয়ার কারণ ঃ (১) স্বর্ণ এমন বস্তু যা নিয়ে অনারব লোকেরা গর্ববোধ করে। যদি এ জাতীয় উদ্দেশ্য নারী পুরুষ সকলের মাঝে স্বর্ণের অলঙ্কার পরিধান করার ব্যাপক প্রচলন হয়ে যায়, তাহলে অধিক পরিমাণে পার্থিব সম্পদ অন্বেষণের প্রয়োজন হয়ে পড়বে, যার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। তবে রুপার বেলায় পুরুষকে শুধু আংটি ব্যবহারের অনুমতি দেওয়াতে এই মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় না। অপরপক্ষে মহিলাদেরকে স্বর্ণ ব্যবহারের অনুমতি দেওয়ার কারণ এই যে, স্বামীর মনতুষ্টি ও তাদের আকৃষ্ট করার জন্য মহিলাদেরই সাজ-সজ্জার প্রয়োজন অধিক। এ জন্যই পৃথিবীর সর্বত্র পুরুষের তুলনায় নারীর সাজ-সজ্জার প্রচলন বেশি। তাই পুরুষের তুলনায় নারীকে সাজ-সজ্জা ও সৌন্দর্য চর্চার অধিক সুযোগ দেওয়া অবশ্যক। সুতরাং হযরত (সা.) নারী পুরুষের এই পার্থক্য প্রকাশ করে এরশাদ করেছেন– أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا অর্থাৎ "আমার উম্মতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে।" অন্যত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত (সা.) একদিন এক ব্যক্তির আঙ্গুলে একটি স্বর্ণের আংটি দেখে এরশাদ করেন, তোমাদের মধ্যে যে আগুনের অঙ্গার পেতে চায়, সে যেন হাতে স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করে। রেশম সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে– مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ "যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশম পরিধান করবে, সে কিয়ামতের দিন উহা পরিধান করতে পারবে না।" এটা হলো পরিধানের হুকুম। বাকি স্বর্ণ ও রুপা ব্যবহারের অন্যান্য পন্থা ও পদ্ধতির বেলায় নারী পুরুষ সকলেই একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত। তাই হযরত (সা.) স্বর্ণ ও রুপার পাত্রে পানি পান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি এরশাদ করেছেন–

لَا تَشْرَبُوا اٰنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَاتَأْكُلُوْا فِيْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ ـ

অর্থাৎ তোমরা স্বর্ণ-রুপার গ্লাসে পান করবে না। এবং সেগুলোর প্লেটে আহারও করবে না। কেননা এগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য, আর তোমাদেরকে এসব দেওয়া হবে আখেরাতে।

(২) নারীর পোশাক-পরিচ্ছদ ও সাদৃশ্য বিধান হতে পুরুষদের পার্থক্য করা জরুরি। সুতরাং স্বর্ণ, রুপা ও রেশম ব্যবহারের অনুমতি সাধারণভাবে নারীর বৈশিষ্ট্য হওয়ায় রুপার আংটি ব্যতীত সেগুলো পুরুষের জন্য হারাম করে দেওয়া হয়েছে। আল্লামা ইবনে কাইয়্যিম (র.) এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করে লিখেছেন–

بِتَحْرِيْمِ الذَّهَبِ وَالْحَرِيْرِ عَلَى الرِّجَالِ حَرَّمَ اللّٰهُ ذَرِيْعَةَ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ الْمَلْعُوْنَ فَاعِلُهُ ـ

অর্থাৎ পুরুষের জন্য স্বর্ণ ও রেশম হারাম করে আল্লাহ তা'আলা নারীর সাথে সাদৃশ্য বিধানের যাবতীয় পন্থাকেই হারাম করে দিয়েছেন। কেননা এরূপ সাদৃশ্য অবলম্বনকারীর ওপর অভিসম্পাত বর্ষিত হয়েছে।

(৩) মাত্রাতিরিক্ত বিলাস প্রিয়তা আল্লাহর অপছন্দনীয়। রেশমের পোশাক ও স্বর্ণ-রৌপ্যের নির্মিত পাত্রের ব্যবহার মানুষকে অত্যন্ত নিম্ন পার্যায়ে নামিয়ে দেয় এবং চিন্তা চেতনাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। সুতরাং মাত্রাতিরিক্ত বিলাসিতা নিতান্ত গর্হিত কাজ। কিন্তু বিলাসিতা এমন কোনো চিহ্নিত বিষয় নয়, যার ক্ষেত্রসমূহ বাহ্যিক নিদর্শন দ্বারা এমনভাবে পরিস্ফুট হয়ে যাবে যে, যে কোনো উচ্চ পর্যায়ের ও নিম্ন পর্যায়ের মানুষকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা যাবে। সুতরাং মানুষের অবস্থা বিভিন্ন হওয়ার কারণে বিলাস সামগ্রীও বিভিন্ন হয়ে থাকে। একজনের বিলাস সামগ্রী আরেক জনের দৃষ্টিতে কৃচ্ছতার উপকরণ মনে হবে। একজনের দৃষ্টিতে যা উত্তম, আরেকজনের দৃষ্টিতে সেই উত্তমটিই নিম্নমানের মনে হবে। তাই শরিয়ত যখন বিলাসিতার নিন্দাবাদ বর্ণনা করেছে, তখন সেই জিনিস গুলোকেই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, যেগুলোর মাধ্যমে মানুষ কেবল আরাম বিলাসিতাই লাভ করে থাকে এবং যেগুলোর মাধ্যমে মানুষের বিলাস প্রিয়তার অভ্যাস গড়ে উঠেছিল। শরিয়ত প্রবর্তক আরব আজমের সকল মানুষকেই বিলাসের জন্য এই জিনিস গুলোর ব্যাপারে একমত পেয়েছিলেন। তাই শরিয়ত প্রবর্তক হযরত (সা.) যেগুলোকে আরাম ও বিলাসের পূর্ণাঙ্গ সামগ্রীরূপে আখ্যায়িত করে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আর যে সকল বস্তুর মাধ্যমে কদাচিৎ উপকৃত হওয়া যায় বা আশে-পাশের দেশগুলোতে যে গুলোর ব্যবহারের অভ্যাস ও প্রচলন রয়েছে। সেগুলোর প্রতি তিনি লক্ষ্য করেননি। তাই রেশম, স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত পাত্র হারাম বস্তুর তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। হযরত (সা.) এরশাদ করেছেন–

لَاتَأْكُلُوْا فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهْبِ وَالْفِضَّةِ وَلَاتَشْرَبُوْا فِىْ صِحَافِهَا فَاِنَّهَا لَهُمْ فِى الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِى الْاٰخِرَةِ -

অর্থাৎ তোমরা স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে আহার করবে না এবং স্বর্ণ-রৌপ্যের পেয়ালায় পান করবে না। কেননা দুনিয়াতে এগুলো অমুসলিমদের জন্য দেওয়া হয়েছে। তোমাদেরকে (এর চেয়েও উত্তম বস্তু) আখেরাতে দেওয়া হবে। তিনি আরও এরশাদ করেছেন– اَلَّذِىْ يَشْرَبُ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهْبِ وَالْفِضَّةِ اِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি স্বর্ণ-রৌপ্যের পেয়ালায় পান করবে, তার পেটে দোযখের আগুন টগবগ করবে।" পেটের ভিতর দোযখের আগুন টগবগ করা শুধু পানাহারের সাঙ্গেই সম্পৃক্ত নয়, বরং এসব ব্যবহারের যে কোনো পন্থা ও পদ্ধতির সাথেই এ হুকুম সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং কোনো পন্থা ও পদ্ধতিতেই সোনা-রোপা ব্যবহার করা হালাল হবে না। যেমন– স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত পাত্রে গোসল করা বা অজু করা, তেলের পাত্র বা সুরমাদানী বানানো ইত্যাদি। এ আলোচনার দ্বারা অমুসলিমদের সাথে পোশাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বনের নিষিদ্ধতার কথাও জানা গেল। এই নিষিদ্ধতার উদ্দেশ্য হলো তাদের আকৃতি ও পোশাক ধারণ হতে দূরে থাকা। পুরুষদের পক্ষে মেয়েলী পোশাক পরিধানে লজ্জাবোধ করা এটার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

لَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ لُبْسُ الْحَرِيْرِ وَيَحِلُّ لِلنِّسَاءِ وَلَابَأْسَ بِتَوَسُّدِهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ يَكْرَهُ تَوَسُّدَهُ وَلَابَأْسَ الْحَرِيْرُ وَالدِّيْبَاجُ فِي الْحَرْبِ عِنْدَهُمَا وَيَكْرَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ (رحـ) وَلَابَأْسَ بِلُبْسِ الْمُلْحَمِ إِذَا كَانَ أَبْرِيْسَمًا وَلُحْمَتُهُ قُطْنًا أَوْ خَزًا وَلَا يَجُوْزُ لِلرَّجُلِ التَّحَلِّيْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَابَأْسَ بِالْخَاتَمِ وَالْمِنْطَقَةِ وَحِلْيَةِ السَّيْفِ مِنَ الْفِضَّةِ وَيَجُوْزُ لِلنِّسَاءِ التَّحَلِّيْ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَيَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ الصَّبِيُّ الذَّهَبَ وَالْحَرِيْرَ .

সরল অনুবাদ ঃ পুরুষগণের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা হালাল নয় এবং মহিলাদের জন্য হালাল। এবং ইমাম আযম (র.)-এর নিকট তার সাথে টেক লাগানোর দ্বারা কোনো অসুবিধা হবে না এবং সাহেবাইন (র.) বলেন– তার সাথে টেক লাগানো মাকরূহ। এবং সাহেবাইন (র.)-এর নিকট যুদ্ধের সময় রেশম এবং দীবাজ পরলে কোনো ক্ষতি নেই এবং ইমাম আযম (র.)-এর নিকট মাকরূহ হবে। এবং মালহাম পরলে কোনো অসুবিধা নেই যখন তার তানা (কাপড়ের লম্বার দিকের সুতা) রেশমের হয় আর বানা (কাপড় বুনন করার সুতা) রুই ইত্যাদির হয়। এবং পুরুষের জন্য স্বর্ণ রূপার অলঙ্কার পরা জায়েজ নেই। এবং আংটি, কোমরবন্দ এবং তলোয়ারের অলংকার যা রুপার হয়ে থাকে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। এবং মহিলাদের জন্য স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কার পরিধান করা জায়েজ। এবং শিশুদেরকে স্বর্ণ এবং রেশম পরানো মাকরূহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فِي الْحَرْبِ الخ ঃ সাহেবাইন (র.) ইমাম মালেক (র.) এবং ইমাম শাফিয়ী (র.)-এর নিকট যুদ্ধস্থলে হারীর এবং দীবাজ ব্যবহার করা হালাল। কেননা এর দ্বারা দুশমনের ওপর ভয় অর্পিত হয় এবং তাতে তলোয়ার কাটতে পারে না। এবং ইমাম আযম (র.)-এর নিকট যুদ্ধাস্থলেও হারাম। কেননা কুরআন এটা হুরমতের ব্যাপারে যুদ্ধ ইত্যাদির কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি। আর মালহাম ঐ কাপড় যার তানা (কাপরের লম্বার দিকের সুতা) রেশমী হয় এবং 'বানা' (কাপড় বুনার সুতা) রুই বা আউনের হয়। তখন এটা পরিধান করা হালাল। কেননা কাপড় বুনন থেকে হয়, আর বুনন সুতা থেকে হয়। সুতরাং কাপড়ের বাস্তবতার মধ্যে সুতাই গ্রহণযোগ্য হবে। তাছাড়া ফখর-এর ব্যবহার অনেক সাহাবীর থেকে প্রমাণিত আছে।

قَوْلُهُ وَالْفِضَّةَ الخ ঃ এবং তদ্রূপ হুকুম মনিমুক্তারও।

وَلَا يَجُوْزُ الْاَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْاِدِّهَانُ وَالتَّطَيُّبُ فِىْ اٰنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ اٰنِيَةِ الزُّجَاجِ وَالرَّصَاصِ وَالْبِلَّوْرِ وَالْعَقِيْقِ وَيَجُوْزُ الشُّرْبُ فِى الْاِنَاءِ الْمُفَضَّضِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالرُّكُوْبُ عَلَى السَّرْجِ الْمُفَضَّضِ وَالْجُلُوْسُ عَلَى السَّرِيْرِ الْمُفَضَّضِ وَيُكْرَهُ التَّعْشِيْرُ فِى الْمُصْحَفِ وَالنَّقْطِ وَلَا بَأْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمُصْحَفِ وَنَقْشُ الْمَسْجِدِ وَزَخْرَفَتُهُ بِمَاءِ الذَّهَبِ وَيُكْرَهُ اِسْتِخْدَامُ الْخُصْيَانِ۔

সরল অনুবাদ ঃ এবং পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পাত্রের মধ্যে খাওয়া, পান করা, তৈল এবং সুগন্ধিময় বস্তু ব্যবহার করা জায়েজ নেই। কাঁচ, হালকা দস্তা স্ফটিক এবং লাল স্বর্ণ মুদ্রার পাত্র ব্যবহার করার দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই। এবং ইমাম আযম (র.)-এর নিকট রৌপ্য মিশ্রিত পাত্রতে পানি পান করা জায়েজ। এবং রৌপ্য মিশ্রিত জিন (গদি)-এর ওপর আরোহণ করা এবং রৌপ্য মিশ্রিত শাহী আসনে বসাও। এবং কুরআন মসজিদের প্রত্যেক দশ আয়াত পর চিহ্ন লাগানো এবং নুকতা লাগানো মাকরূহ। এবং কুরআন মসজিদকে সুন্দর করা এবং মসজিদকে স্বর্ণের পানি দিয়ে নকশা ও সজ্জিত করার দ্বারা কোনো ক্ষতি নেই। এবং খাসীর থেকে খেদমত নেওয়া মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوْزُ الْاَكْلُ ঃ স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রের মধ্যে মধ্যে খাওয়া পান করা তৈল লাগানো পুরুষ মহিলা উভয়ের জন্যই জায়েজ নেই। কেননা হযরত উম্মে সালমা (রা.) থেকে বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্রে খানা পিনা করল সে যেন তার পেটে জাহান্নামের আগুন ঢুকাল। যখন এতে খাওয়া পান করা হারাম হলো, অতঃপর তার থেকে তৈল লাগানোও নিষিদ্ধ হবে। কারণ উভয় তো একই।

قَوْلُهُ اَلْاِنَاءُ الْمُفَضَّضُ ঃ ঐ পাত্র যার মধ্যে রৌপ্য মিশ্রিত তাকে ফার্সী ভাষায় سِيْحِيْن كُوْب (সিইহীন কোব) বলা হয়। আর উর্দু ভাষায় جَرَاؤ (জড়াউ) বলা হয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট এতেও পানি পান করা মাকরূহ। কারণ যে ব্যক্তি কোনো পাত্রের একাংশ ব্যবহার করল সে যেন পুরা পাত্রই ব্যবহার করল। অতঃপর যখন পুরা পাত্র ব্যবহার করা জায়েজ নেই, সুতরাং কোনো অংশ ব্যবহার করা জায়েজ হবে না। ইমাম আযম (র.) বলেন যে, রৌপ্যের সাথে মিশ্রিত এটা হলো অনুগামী, আর অনুগামী গ্রহণযোগ্য নয়।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ التَّعْشِيْرُ ঃ অর্থাৎ কুরআন শরীফের প্রত্যেক দশ আয়াত পর চিহ্ন লাগানো এবং তার নুকতা ও এরাবকে লেখায় প্রকাশ করা মাকরূহ হবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেন, কুরআনের মধ্যে ঐ বস্তু সংযুক্ত করা থেকে মুক্ত রাখো যা কুরআনের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু পরবর্তী ওলামাগণ বলেন, সহজের উদ্দেশ্যে এরাবকে প্রকাশ করা উত্তম। কেননা আজমীদের জন্য এটা অবশ্যকীয়। সুতরাং এটাকে ছেড়ে দেওয়া দ্বারা যেহেতু কুরআন তেলায়াত মুখস্থ করার মধ্যে ক্রটি দেখা দেয় তাই মাকরূহ হবে না।

قَوْلُهُ تَحْلِيَةُ الْمُصْحَفِ ঃ এ জন্য যে, এর দ্বারা কুরআনের তাজিম এবং তাকরিম উদ্দেশ্য হয়। এবং মসজিদকে স্বর্ণের পানি দ্বারা অঙ্কন করা জায়েজ আছে এই শর্তের সাথে যাতে করে মসজিদের আয় ও ওয়াকফকৃত মাল দ্বারা না হয়, তা ছাড়া জায়েজ হবে না এবং মসজিদের ব্যবস্থাপনা কারীরা জিম্মাদার হবে।

وَلَا بَأْسَ بِخَصَاءِ الْبَهَائِمِ وَاِنْزَاءِ الْحَمِيْرِ عَلَى الْخَيْلِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّقْبَلَ فِى الْهَدِيَّةِ وَالْاِذْنِ قَوْلَ الْعَبْدِ وَالصَّبِيِّ وَيُقْبَلُ فِى الْمُعَامَلَاتِ قَوْلُ الْفَاسِقِ وَلَا يُقْبَلُ فِىْ اِخْبَارِ الدِّيَانَاتِ اِلَّا قَوْلُ الْعَدْلِ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَّنْظُرَ الرَّجُلُ مِنَ الْاَجْنَبِيَّةِ اِلَّا اِلٰى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا فَاِنْ كَانَ لَا يَاْمَنُ مِنَ الشَّهْوَةِ لَمْ يَنْظُرْ اِلٰى وَجْهِهَا اِلَّا لِحَاجَةٍ وَيَجُوْزُ لِلْقَاضِىْ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّحْكُمَ عَلَيْهَا وَلِلشَّاهِدِ اِذَا اَرَادَ الشَّهَادَةَ عَلَيْهَا النَّظَرُ اِلٰى وَجْهِهَا وَاِنْ خَافَ اَنْ يَّشْتَهِىَ وَيَجُوْزُ لِلطَّبِيْبِ اَنْ يَّنْظُرَ اِلٰى مَوْضِعِ الْمَرَضِ مِنْهَا وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنَ الرَّجُلِ فِىْ جَمِيْعِ بَدَنِهٖ اِلَّا مَا بَيْنَ سُرَّتِهٖ اِلٰى رُكْبَتِهٖ وَيَجُوْزُ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُلِ اِلٰى مَا يَنْظُرُ اِلَيْهِ الرَّجُلُ مِنْ اَمَتِهِ الَّتِىْ تَحِلُّ لَهٗ وَ زَوْجَتَهٗ اِلٰى فَرْجِهَا وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهٖ اِلَى الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالصَّدْرِ وَالسَّاقَيْنِ وَالْعَضُدَيْنِ وَلَا يَنْظُرُ اِلٰى ظَهْرِهَا وَبَطْنِهَا وَفَخِذِهَا وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَّمَسَّ مَا جَازَ لَهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهِ مِنْهَا وَيَنْظُرُ الرَّجُلُ مِنْ مَمْلُوْكَةِ غَيْرِهٖ اِلٰى مَا يَجُوْزُ لَهٗ اَنْ يَّنْظُرَ اِلَيْهِ مِنْ ذَوَاتِ مَحَارِمِهٖ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَّمَسَّ ذٰلِكَ اِذَا اَرَادَ الشِّرَاءَ وَاِنْ خَافَ اَنْ يَّشْتَهِىَ -

সরল অনুবাদ ঃ চতুষ্পদ জন্তুকে খাসী করা এবং গাধাকে (স্ত্রী) ঘোড়ার ওপর বাঁও দিলে কোনো অসুবিধা নেই। এবং হাদিয়া ও অনুমতির ব্যাপারে গোলাম এবং শিশুদের কথা গ্রহণ করা যাবে। এবং লেনদেনের মধ্যে ফাসেকের কথা গ্রহণ করা জায়েজ আছে। এবং দিয়াত (জরিমানা)-এর ব্যাপারে ইনসাফকারী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো কথা গ্রহণ করা যাবে না। এবং পুরুষের জন্য অপরিচিত মহিলার মুখমণ্ডল এবং হাতের তালু ব্যতীত তার শরীর দেখা জায়েজ নেই। কিন্তু যদি সে খাহেশ থেকে নিরাপদ না হয় তাহলে প্রয়োজন ছাড়া তার মুখমণ্ডলও দেখতে পারবে না। এবং কাজির জন্য তার মুখমণ্ডল দেখা জায়েজ আছে যখন তাকে হুকুম লাগানোর ইচ্ছা করে। এবং সাক্ষীদাতার জন্য যখন ঐ মহিলার ওপর সাক্ষী দিতে চায় যদিও নাকি খায়েশের আশঙ্কা হয়। এবং ডাক্তারের জন্য মহিলার রোগের স্থানকে দেখা জায়েজ আছে। এবং এক পুরুষ অন্য পুরুষের নাভি এবং হাঁটুর মধ্যবর্তী স্থান ছাড়া সমস্ত শরীর দেখতে পারবে। এবং মহিলা পুরুষের এ পরিমাণ শরীর দেখা জায়েজ আছে যে পরিমাণ পুরুষে দেখতে পারে। এবং এক মহিলা অন্য মহিলার ঐ পরিমাণ শরীর দেখতে পারবে, যে পরিমাণ এক পুরুষ অন্য পুরুষের দেখতে পারে। এবং পুরুষ তার হালাল বাঁদি এবং স্ত্রীর লজ্জা স্থানকে দেখতে পারবে এবং পুরুষ যে সমস্ত মহিলাকে বিবাহ করা হারাম ঐ সমস্ত মহিলার মুখমণ্ডল, মাথা, বুক, পায়ের গোছা, বাজু দেখতে পারবে। এবং তার পেটও পিঠ এবং রানকে দেখতে পারবে না। এবং মহিলার যে সমস্ত অঙ্গ দেখা জায়েজ ঐ সমস্ত অঙ্গ ধরার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই। পুরুষ অন্য একজনের বাঁদির ঐ পরিমাণ শরীর দেখতে পারবে যে পরিমাণ দেখা তার জন্য জায়েজ ঐ সমস্ত মহিলার যাদেরকে বিবাহ করা তার জন্য হারাম। এবং বাঁদি যখন কিনার ইচ্ছা করে তখন তাকে ধরার দ্বারা কোনো অসুবিধা নেই যদিও নাকি খাহেশের আশঙ্কা হয়।

وَالْخَصِيُّ فِي النَّظَرِ اِلَى اَجْنَبِيَّةٍ كَالْفَحْلِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمَمْلُوكِ اَنْ يَنْظُرَ مِنْ سَيِّدَتِهِ اِلَّا اِلَى مَا يَجُوْزُ لِلْاَجْنَبِيِّ النَّظَرُ اِلَيْهِ مِنْهَا وَيَعْزِلُ عَنْ اَمَتِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهَا وَلَا يَعْزِلُ عَنْ زَوْجَتِهِ اِلَّا بِاِذْنِهَا وَيُكْرَهُ الْاِحْتِكَارُ فِيْ اَقْوَاتِ الْاٰدَمِيِّيْنَ وَالْبَهَائِمِ اِذَا كَانَ ذَالِكَ فِيْ بَلَدٍ يَضُرُّ الْاِحْتِكَارُ بِاَهْلِهِ وَمَنِ احْتَكَرَ غِلَّةَ ضَيْعَتِهِ اَوْ مَا جَلَبَهُ مِنْ بَلَدٍ اٰخَرَ فَلَيْسَ بِمُحْتَكِرٍ وَلَا يَنْبَغِيْ لِلسُّلْطَانِ اَنْ يُسَعِّرَ عَلَى النَّاسِ وَيُكْرَهُ بَيْعُ السِّلَاحِ فِيْ اَيَّامِ الْفِتْنَةِ وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْعَصِيْرِ مِمَّنْ يَعْلَمُ اَنَّهُ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ـ

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ এবং খাসী পুরুষ অপরিচিত মহিলাকে দেখা (আসল) পুরুষের মতো। এবং গোলামের জন্য তার মহিলা মালিকের শরীর দেখা জায়েজ নেই, ঐ পরিমাণ ব্যতীত যে পরিমাণ দেখা জায়েজ অপরিচিত পুরুষের জন্য ঐ মহিলাকে। পুরুষ তার বাঁদির অনুমতি ছাড়া আযল করতে পারবে কিন্তু তার স্ত্রীর সাথে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া আযল করতে পারবে না। এবং ইহতেকার অর্থাৎ মানুষ এবং চতুষ্পদ জন্তুদের খাদ্য এমন শহরে আটকে রাখা যেখানে শহরবাসীর জন্য কষ্টদায়ক হয়। এটা মাকরূহ। এবং যে ব্যক্তি নিজের জমিনের (১) খাদ্যকে অথবা ঐ খাদ্যকে যা অন্য শহর থেকে নিয়েছে । বাদশার জন্য উচিত নয় যে, সে মূল্য নির্দিষ্ট করবে মানুষের ওপর। এবং ফিতনা-ফ্যাসাদের সময় অস্ত্র বিক্রয় করা মাকরূহ। এবং এমন ব্যক্তির নিকট আঙ্গুরের রস বিক্রয় করা যার সর্ম্পকে জানা আছে যে, সে এটা দ্বারা মদ বানাবে, কোনো অসুবিধা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَعْزِلُ الخ ঃ 'আ'যল'-এর অর্থ এই যে, পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা এবং যখন মনী বের হওয়ার সময় আসে তখন বিশেষ অঙ্গকে তার লজ্জাস্থান থেকে বের করে লজ্জাস্থানের বাইরে মনী বের করা। ইমাম আহমদ (র.)-এর নিকট আযল (মুতলাকান) একেবারে নিষিদ্ধ, কেননা হুযূর (সা.) বলেছেন- ذَالِكَ الْوَادُ الْخَفِيُّ যে, আযল এক ধরনের জীবিত কবর দেওয়া। ইমাম শাফেয়ী (র.) ইমাম মালেক (রা.) ইমাম আহমদের (বায়াজ) কিছু লোক এবং আহনাফ (র.)-এর নিকট আযল (মুতলকান) সম্পূর্ণভাবে জায়েজ। কেননা এ সম্পর্কে হযরত আলী (রা.), যায়েদ ইবনে ছাবেত (রা.), আবূ আইয়ূব (রা.), জাবের (রা.), ইবনে আব্বাস (রা.), আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) ইত্যাদি অনেক সাহাবীর পক্ষ থেকে অনুমতি পাওয়া যায়। এবং কিছু কিছু হযরাত মহিলা আজাদ হওয়া এবং বাঁদি হওয়ার ধর্তব্য করেন এবং এভাবে তা ব্যাখ্যা করেন, যেহেতু হাফেজ (র.) 'ফাতহুল বারীর' মধ্যে উল্লেখ করেন যে, বাকি তিন মাযহাব এ ব্যাপারে একমত যে, আজাদ মহিলার সাথে তার অনুমতি ব্যতীত আযল করা জায়েজ নেই। এবং বাঁদির সাথে বিনা অনুমতিতে জায়েজ আছে। কেননা নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আজাদ মহিলার সাথে তার অনুমতি ব্যতীত আযল করার থেকে নিষেধ করেছেন। বিস্তারিত বড় বড় কিতাবে আছে।

قَوْلُهُ اِحْتِكَارُ الخ ঃ আভিধানিক অর্থ- উচ্চ মূল্যে বিক্রি করার জন্য দ্রব্য বিক্রি থেকে বিরত থাকা । পারিভাষিক অর্থ হলো, মানুষের খাদ্য যেমন- গম, চাউল ইত্যাদি এবং চতুষ্পদ জন্তুর খাদ্য অথবা শুষ্ক বীজকে অধিক মূল্য হওয়ার অপচেষ্টায় বাধা দিয়ে রাখা এবং বিক্রি না করা। ইমাম আযম (র.)-এর নিকট মাকরূহে তাহরীমী, যদি শহরবাসী এর দ্বারা কষ্ট হয়। এর ওপরই ফতোয়া। কেননা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন- اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ (اَلْحَدِيْث) এবং ইহতেকারের পরিমাণ চল্লিশ দিন অথবা এর চেয়ে বেশি দিন বাধা দিয়ে রাখার দ্বারা হয়, যেমনিভাবে হাদীস শরিফে এসেছে। এবং যদি নিজের জমিনের ফসল হয় অথবা অন্য শহরের থেকে নেওয়া হয়, তাহলে তা আটকে রাখা ইহতেকারের মধ্যে দাখেল নয়। ইমাম মোহাম্মদ (র.) বলেন, যদি ফসল এমন স্থান থেকে নেওয়া হয় যেখান থেকে শহরবাসী নেয়, তাহলে মাকরূহ হবে নতুবা মাকরূহ নয়।

كِتَابُ الْوَصَايَا

অসিয়ত পর্ব

اَلْوَصِيَّةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ وَلَا تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ اِلَّا اَنْ يُّجِيْزَهَا الْوَرَثَةُ وَلَا يَجُوْزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ وَلَا تَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ وَيَجُوْزُ اَنْ يُّوْصِيَ الْمُسْلِمُ لِلْكَافِرِ وَالْكَافِرُ لِلْمُسْلِمِ وَقُبُوْلُ الْوَصِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَاِنْ قَبِلَهَا الْمُوْصٰى لَهٗ فِيْ حَالِ الْحَيٰوةِ اَوْ رَدَّهَا فَذٰلِكَ بَاطِلٌ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُّوْصِيَ الْاِنْسَانُ بِدُوْنِ الثُّلُثِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ অসিয়ত ওয়াজিব নয় বরং এটা মুস্তাহাব। এবং ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা জায়েজ নেই কিন্তু (হবে) যদি তাকে সমস্ত ওয়ারিশগণ জায়েজ মনে করে। এক-তৃতীয়াংশের অধিক পরিমাণ সম্পত্তির অসিয়ত করা জায়েজ নয়। হত্যাকারীর জন্যও অসিয়ত জায়েজ নয়। এবং মুসলমান কাফিরের জন্য অসিয়ত করা জায়েজ আছে ও কাফির মুসলমানের জন্য অসিয়ত করা জায়েজ। আর অসিয়ত মৃত্যুর পর কবুল করা হবে। সুতরাং অসিয়তকারীর জীবদ্দশায়ই مُوْصٰى لَهٗ যদি অসিয়ত গ্রহণ করে অথবা অসিয়ত প্রত্যাখ্যান করে তাহলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। আর মানুষ (তার সম্পত্তির) এক-তৃতীয়াংশের কমের অসিয়ত করা মোস্তাহাব।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার অসিয়ত পর্বকে কিতাবের শেষের দিকে এনেছেন এ জন্য যে, পূর্বেকার সকল পর্বসমূহ জীবিত থাকার সময় কালীন বিধি-বিধান আর অসিয়ত হচ্ছে মৃত্যু শয্যার বিধি বিধান তাই কিতাবের শেষের দিকে আনাই যুক্তি সঙ্গত।

وَصِيَّتْ -এর সংজ্ঞা ঃ

قَوْلُهٗ اَلْوَصِيَّةُ غَيْرُ وَاجِبَةٍ الخ ঃ وَصِيَّتْ শব্দটি একবচন, বহুবচনে اَلْوَصَايَا আভিধানিক অর্থ হলো– জোরালো নির্দেশ প্রদান, হুকুম করা ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় মৃত্যুর পর কাউকে নিজের পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক বানানোর অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করাকে অসিয়ত (وَصِيَّتْ) বলে।

অসিয়তের বিধান ঃ অসিয়ত সাব্যস্ত হওয়ার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য (ইজমা) রয়েছে। তাবে তা ওয়াজিব না মোস্তাহাব এ ব্যাপারে কিছুটা মতপার্থক্য দেখা যায়। জমহুরের মতে এটা ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব। মূলত মিরাস সম্পর্কীয় বিস্তারিত বিধান নাজিল হওয়ার পূর্বে (কুরআনের আয়াতের মাধ্যমেই) অসিয়ত ফরজ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মিরাস সম্পর্কীয় হুকুমের দ্বারা এটা مَنْسُوْخٌ হয়ে গেছে। অর্থাৎ فَرْضِيَّتْ মানসুখ হয়ে اِسْتِحْبَابْ -এ রূপান্তরিত হয়ে গেছে। উল্লেখ্য যে, মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে চারটি হক বা অধিকার সম্পর্কিত রয়েছে। এক ঃ প্রথমত এটা থেকে তার কাফন দাফন করা হবে। দুইঃ অতঃপর তার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তিন ঃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা তার অসিয়ত পূর্ণ করা হবে। চার ঃ সর্বশেষ (অবশিষ্ট সম্পত্তি) ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

অসিয়তের শর্তাবলী ঃ অসিয়ত কার্যকরী হওয়ার জন্য কতিপয় শর্তাবলী রয়েছে। যেমন যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে সে জীবিত থাকতে হবে, সে ওয়ারিশ হতে পারবে না ইত্যাদি। তাছাড়া মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিকের মধ্যে ওয়ারিশগণের রেজামন্দি ব্যতীত অসিয়ত কার্যকর হবে না। তবে তার কম হলে তাদের রেজামন্দি ছাড়াই অসিয়ত কার্যকরী হবে।

ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা অবৈধ ঃ

قَوْلُهُ وَلَاتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ الخ ঃ ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েজ নেই। কেননা এতে যে এক ওয়ারিশকে অন্য ওয়ারিশের ওপর (অবৈধভাবে) প্রাধান্য দেওয়া হবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, অথচ হাদীস শরীফে এসেছে

إِنَّ اللّٰهَ اَعْطٰى كُلَّ ذِىْ حَقٍّ حَقَّهُ اَلَا لَاوَصِيَّةَ لِوَارِثٍ.

অপর হাদীসে আছে اَلْحَيْفُ فِى الْوَصِيَّةِ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ অর্থাৎ এক-তৃতীয়াংশের বেশির অসিয়ত করা এবং ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা কবীরা গুনাহের মধ্যে অন্যতম। কেননা এক-তৃতীয়াংশের অধিকের অসিয়ত হতে ওয়ারিশদের হক (অধিকার) বিনষ্ট করা হবে, আর তা কবীরা গুনাহ। অপর দিকে ওয়ারিশদের যার যা প্রাপ্য তা আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাদের কারো জন্য অসিয়ত করা হলে তাকে অপরের ওপর অন্যায়ভাবে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আর তাও জুলুম হিসেবে গণ্য হয়ে হারাম হবে। হ্যাঁ বালেগ ওয়ারিশদের অনুমতি সাপেক্ষে এক-তৃতীয়াংশের অধিকের ওপর অসিয়ত কার্যকর হতে পারে। কেননা হাদীস শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত আছে, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন- لَاتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِوَارِثٍ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ الْوَرَثَةُ

অর্থাৎ কোনো ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করা বৈধ হবে না, তবে যদি ওয়ারিশরা তার অনুমোদন করে তবে বৈধ হবে।

এক-তৃতীয়াংশের বেশি অসিয়ত কার্যকর হবে না ঃ

قَوْلُهُ وَلَاتَجُوزُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ الخ ঃ পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের অধিকের অসিয়ত করা জায়েজ নেই। কেননা বুখারী, মুসলিম ও কিতাবুল আছার ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, হযরত সায়াদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) রোগগ্রস্ত হয়ে নবী করীম (সা.)-এর নিকট আরজ করলেন, হুযূর ! আমার একমাত্র কন্যা উত্তরাধিকারী, আমি আমার সম্পূর্ণ সম্পত্তি অসিয়ত করে যেতে চাই। হুযূর (সা.) নিষেধ করলেন। তিনি আবার নিবেদন করলেন, তাহলে অর্ধেক অসিয়ত করতে চাই। হুযূর (সা.) তাও নিষেধ করলেন। অতঃপর নবীজী (সা.) বলেছিলেন যদি অসিয়ত করতে চাও তাহলে এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত করো। আর এটাও অনেক। কাজেই এক তৃতীয়াংশে অধিকের মধ্যে অসিয়ত কার্যকর হবে না।

হত্যাকারীর জন্য অসিয়ত করা বৈধ নয় ঃ

قَوْلُهُ وَلَاتَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لِلْقَاتِلِ ঃ এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে আহত করল। অতঃপর যাকে আহত করল সে আহতকারীর জন্য সম্পত্তির অসিয়ত করল। তারপর অসিয়তকারী মৃত্যুবরণ করল অথবা অসিয়ত করার পর তাকে হত্যা করল এমতাবস্থায় উক্ত অসিয়ত জায়েজ হবে কিনা ? আর যার জন্য অসিয়ত করেছে সে তা পাবে কিনা ? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.) তথা আহনাফের মতে যদি সে প্রত্যক্ষভাবে (আহত করত) হত্যা করে থাকে, তাহলে ইচ্ছাকৃত করুক আর ভুলক্রমে করুক তার জন্য অসিয়ত জায়েজ (ও কার্যকর) হবে না। (এবং মিরাস ও পাবে না) কিন্তু সরাসরি যদি সে হত্যা করে না থাকে, যেমন যে কুয়া খনন করেছিল অথবা (পথে) পাথর রেখেছিল তাতে পড়ে (অসিয়তকারী) মৃত্যুবরণ করেছে। তাহলে (সর্ব সনম্মতভাবে তার জন্য কৃত অসিয়ত বাতিল হবে না। (এবং মিরাস হতেও মাহরুম হবে না)।

আমাদের হানাফী ফকীহগণের নকলী দলিল একখানা হাদীস, যা দারেকুতনী (র.) হযরত আলী (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন- قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِقَاتِلٍ وَصِيَّةٌ

অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) বলেছেন, নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, হত্যাকারীর জন্য অসিয়ত জায়েজ নেই।

আমাদের আকলী দলিল হলো, তার জন্য আল্লাহ যা বিলম্বে পাওয়া নির্ধারিত করেছেন তা সে তড়িঘড়ি পাওয়ার চেষ্টা করেছে। কাজেই তা হতে সে বঞ্চিত হবে, যদ্রূপ অনুরূপ কারণে মিরাস হতে বঞ্চিত হয়ে থাকে। ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর মতে উক্ত হত্যাকারীর অসিয়ত কার্যকর (ও জায়েজ) হবে। চাই হত্যাকারী কর্তৃক আহত হওয়ার পর তার জন্য অসিয়ত করুক, অথবা অসিয়ত করার পর তাকে হত্যা করা হোক।

আমরা পূর্বে যে আকলী ও নকলী দলিল পেশ করেছি তা উভয় মাসআলায় অর্থাৎ অসিয়ত করার পর হত্যা করুক বা হত্যা করার জন্য আহত করার পর অসিয়ত করুক ইমাম শাফিয়ীর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য হবে। কেননা উপরোক্ত হাদীসখানা ও আমাদের উপস্থাপিত যুক্তি উভয় অবস্থা (মাসআলা)-কে অন্তর্ভুক্ত করে।

মুসলমান ও কাফির পরস্পর অসিয়ত করা বৈধ ঃ

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ اَنْ يُوْصِىَ الْمُسْلِمُ الخ ঃ অর্থাৎ মুসলমান কাফিরের জন্য এবং কাফির মুসলমানের জন্য অসিয়ত করা জায়েজ। প্রথমটি অর্থাৎ কাফিরের জন্য মুসলমানের অসিয়ত জায়েজ হওয়া-এর দলিল হলো আল্লাহর বাণী–

لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ (اَلْاٰيَةَ)

অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ি হতে বের করেও দেয়নি, তাদের প্রতি দয়া করতে ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আর দ্বিতীয়টি তথা মুসলমানের জন্য কাফিরের অসিয়ত জায়েজ হওয়া দলিল হলো, জিম্মার আকদ তথা জিম্মী হওয়ার কারণে তারা মোয়ামালাত তথা লেনদেনের ব্যাপারে মুসলমানদের সমপর্যায়ভুক্ত, যদ্দরুন জীবিতকালে এতদুভয় তথা মুসলমান ও কাফির উভয়ে একের পক্ষ হতে অপরের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন জায়েজ। সুতরাং মৃত্যুর পরও তদ্রূপ জায়েজ হবে। জামে সাগীর গ্রন্থে আছে যে, শত্রুদেশের লোকদের (আহলে হারবের) জন্য অসিয়ত করা নাজায়েজ (বাতিল) হবে। এর দলিল আল্লাহর বাণী–

اِنَّمَا يَنْهَاكُمْ عَنِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ فِى الدِّيْنِ (اَلْاٰيَةَ)

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তো তোমাদেরকে ঐ সব লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে এবং তোমাদের ঘর-বাড়ি হতে তোমাদেরকে বের করে দিয়েছে, তোমাদেরকে নির্বাসিত করার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেছে (এবং বের হতে বাধ্য করেছে।)

অসিয়ত হেবা মিরাসের আংশিক সাদৃশ্য ঃ

قَوْلُهُ وَقَبُوْلُ الْوَصِيَّةِ بَعْدُ الخ ঃ আর অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর অসিয়ত কবুল করতে হবে। সুতরাং অসিয়তকারীর মৃত্যুর পূর্বে যদি কবুল করে কিংবা প্রত্যাখ্যান করে তাহলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, অসিয়ত সহীহ হওয়ার জন্য কবুল (গ্রহণ করা) শর্ত নয়; বরং مُوْصٰى لَهُ-এর মালিকানা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কবুল শর্ত। আর অসিয়ত এক দিক দিয়ে মিরাসের সাথে সাদৃশ্য রাখে। কেননা, মিরাসের ন্যায় এর মালিকানাও অসিয়তকারীর মৃত্যুর পরে লাভ হয়। অপরদিক দিয়ে অসিয়ত হেবা (দান)-এর সাদৃশ। কেননা, হেবার ন্যায় এটাও (বিনিময় ব্যতীত) অন্যকে মালিকানা দান বিশেষ। সুতরাং مُوْصٰى لَهُ-এর পক্ষ হতে আমরা কবুলের ব্যাপারে যথাসম্ভব হেবার সাথে সামঞ্জস্য বিধানে চেষ্টা করেছি। সুতরাং আমরা বলেছি যে, কবুলের পূর্বে অসিয়তের মালিক হবে না, যদ্রূপ হেবার বেলায় কবুলের পূর্বে মালিক হয় না। আর কবুলের পর মিরাসের সামঞ্জস্যতার দিকে আমরা লক্ষ্য করেছি। সুতরাং আমরা বলেছি যে, অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর হস্তগত করা ব্যতীতই مُوْصٰى لَهُ-এর মালিক হয়ে যাবে। মোট কথা হেবা ও মিরাস উভয়ের সাথে অসিয়তের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধানের প্রতি আমরা দৃষ্টি রেখেছি।

আর যদি مُوْصٰى لَهُ কবুল বা প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত মারা যায় তাহলে ইমাম কুদূরীর (র.) মতে কিয়াসের দৃষ্টিকোণ হতে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু اِسْتِحْسَانْ-এর দিক বিবেচনা করত مُوْصٰى لَهُ-এর ওয়ারিশদের নিকট তা পেশ করা হবে। ইচ্ছা করলে তারা উহা কবুল করতে পারবে আর চাইলে প্রত্যাখ্যানও করতে পারবে।

সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশের কমের অসিয়ত করা মোস্তাহাব ঃ

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يُوْصِى الخ ঃ অর্থাৎ আর মানুষ (তার সম্পত্তির) এক-তৃতীয়াংশের কমের অসিয়ত করা মোস্তাহাব। চাই ওয়ারিশগণ ধনী হোক অথবা দরিদ্র হোক। কেননা, (এক-তৃতীয়াংশ হতে) কমানোর মধ্যে ওয়ারিশদের জন্য তার সম্পদ রেখে গিয়ে তাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয়, এটা এক-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার বিপরীত। কেননা, এতে অসিয়তকারী (مُورث)-এর অধিকার পূর্ণভাবে আদায় হয়ে যায়। কাজেই এতে (নিকটাত্মীয়দের প্রতি) ইহসান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হয় না।

অতঃপর (এই প্রশ্ন থেকে যায় যে,) এক-তৃতীয়াংশের কম পরিমাণের মধ্যে অসিয়ত করা উত্তম না অসিয়ত (সম্পূর্ণরূপে) বর্জন করা উত্তম? (এর ও উত্তরে) ফিকহবিদগণ বলেছেন, যদি ওয়ারিশগণ দরিদ্র হন এবং ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্য অংশের অমুখাপেক্ষী না হন (বরং মুখাপেক্ষী হন) তাহলে অসিয়ত (সম্পূর্ণরূপে) পরিহার করা উত্তম। কেননা এতে নিকটাত্মীয়ের জন্য সদকা করা রয়েছে। তা ছাড়া নবী করীম (সা.) এরশাদ করেছেন, "উত্তম সদকা হলো যা সদাচারী নিকটাত্মীয়ের প্রতি করা হয়।" এতদ্ব্যতীত এটা দরিদ্র ও নিকটাত্মীয় উভয়ের হকের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়। (ফিকহ বিদগণ আরো বলেন।) আর যদি ওয়ারিশগণ ধনী হয় এবং (مُوَرِّثٌ হতে) তাদের প্রাপ্য অংশের মুখাপেক্ষী না হয়, তাহলে (এক-তৃতীয়াংশের কম পরিমাণ) অসিয়ত করা উত্তম। কেননা এতে অনাত্মীয়ের প্রতি সদকা করা হবে এবং আত্মীয়ের জন্য হেবা করা পরিহার করা হবে। আর প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা উত্তম। কেননা সদকার দ্বারা আল্লাহর সন্তোষ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কেউ কেউ বলেছেন, এমতাবস্থায় (অসিয়ত করা, না করার ব্যাপারে অসিয়তকারীকে) এখতিয়ার দেওয়া হবে। কেননা এদের উভয়ের মধ্যেই ফজিলত নিহিত রয়েছে, আর তা হলো সদকা (যদি অনাত্মীয়ের জন্য অসিয়ত করে) অন্যথা صِلَهْ رَحْمِى (আত্মীদের সাথে সদ্ব্যবহার, যদি অসিয়ত না করে) সুতরাং (مُوَرِّثٌ কে) দু'টি ভাল কাজের যে কোনোটি গ্রহণের এখতিয়ার দেওয়া হবে।

কতিপয় পারিভাষিক শব্দ ঃ

مُوْصِىْ ঃ অসিয়তকারীকে مُوْصِىْ বলা হয়

وَصِىْ وَمُوْصٰى اِلَيْهِ ঃ যার কাছে বা যাকে অসিয়ত করা হয় তাকে وَصِىْ বা مُوْصٰى اِلَيْهِ বলা হয়।

مُوْصٰى لَهٗ ঃ যার জন্য অসিয়ত করা হয় তাকে مُوْصٰى لَهٗ বলা হয়।

مُوْصٰى بِهٖ ঃ অসিয়তকৃত বস্তুকে مُوْصٰى بِهٖ বলা হয়।

وَإِذَا أَوْصَى إِلَى رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَصِيَّةَ فِيْ وَجْهِ الْمُوْصِيْ وَ رَدَّهَا فِيْ غَيْرِ وَجْهِهِ فَلَيْسَ بِرَدٍّ وَإِنْ رَدَّهَا فِيْ وَجْهِهِ فَهُوَ رَدٌّ وَالْمُوْصَى بِهِ يَمْلِكُ بِالْقَبُوْلِ إِلَّا فِيْ مَسْئَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ أَنْ يَّمُوْتَ الْمُوْصِيْ ثُمَّ يَمُوْتَ الْمُوْصَى لَهُ قَبْلَ الْقَبُوْلِ فَيَدْخُلُ الْمُوْصَى بِهِ فِيْ مِلْكِ وَرَثَتِهِ وَمَنْ أَوْصَى إِلَى عَبْدٍ أَوْكَافِرٍ أَوْ فَاسِقٍ أَخْرَجَهُمُ الْقَاضِيْ مِنَ الْوَصِيَّةِ وَنَصَبَ غَيْرَهُمْ وَمَنْ أَوْصَى إِلَى عَبْدِ نَفْسِهِ وَفِي الْوَرَثَةِ كِبَارٌ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ .

সরল অনুবাদ ঃ যখন কোনো ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তিকে অসিয়ত করে এবং সে অসিয়তকারীর সামনে অসিয়ত গ্রহণ করল এবং সে অসিয়তকারীর অনুপস্থিতি উহা অস্বীকার করে, তাহলে উহা গ্রহণযোগ্য হবে না। এবং যদি সে অসিয়তকারীর সামনে উহা অস্বীকার করে তাহলে তার অস্বীকার গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য হবে। এবং অসিয়তকৃত বস্তু গ্রহণ করার দ্বারা তার অধিনস্থ হয়ে যায়; কিন্তু একটি মাসআলাতে। তা হলো, যদি অসিয়তকারী মৃত্যুবরণ করে, পুনরায় অসিয়তকৃত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে, তখন অসিয়তকৃত বস্তু অসিয়তকৃত ব্যক্তির অধীনস্থ হয়ে যায়। যে ব্যক্তি গোলাম অথবা কাফির অথবা ফাসেককে অসিয়ত করল, তখন বিচারক তাদেরকে অসিয়ত থেকে বহির্ভূত করে দেবে। তাদের ব্যতীত অন্য ব্যক্তিকে নির্ধারণ করে দিবে। এবং যে ব্যক্তি নিজের গোলামকে অসিয়ত করল, অথচ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিবর্গ আছে, তখন তার অসিয়ত শুদ্ধ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কোন সময় অসিয়তকৃত বস্তু مُوْصَى لَهُ-এর মালিকানায় আসে ঃ

قَوْلُهُ وَالْمُوْصَى بِهِ يَمْلِكُ بِالْقَبُوْلِ إِلَّا فِيْ الخ ঃ অর্থাৎ مُوْصَى بِهِ (অসিয়কৃত বস্তু) مُوْصَى لَهُ এর মালিকানায় ঐ সময় আসবে যখন مُوْصَى لَهُ অসিয়তকৃত বস্তুকে কবুল করে। হাঁ একটি মাসআলার মধ্যে কবুল করা ছাড়াও মালিক হয়ে যাবে, মাসআলাটি এই যে, مُوْصِيْ (অসিয়তকারী) অসিয়ত করে যদি মারা যায়, অতঃপর مُوْصَى لَهُ ও مُوْصَى بِهِ (অসিয়তকৃত বস্তু) কবুল করার পূর্বে মারা যায়, তখন এ অবস্থায় অসিয়তকৃত বস্তু مُوْصَى لَهُ-এর উত্তরাধিকারীদের মালিকানায় এসে যাবে, উপরোক্ত বিধানটি إِسْتِحْسَانْ তথা قِيَاسْ خَفِيْ-এর দ্বারা প্রমাণিত। قِيَاسْ তথা قِيَاسْ جَلِيْ -এর দৃষ্টিতে উল্লিখিত অসিয়তটি বাতিল হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ মালিকানা সাব্যস্ত হবে কবুল করার পর, অতএব এ বিধানটি ঐ ক্রেতার মতো হয়ে গেছে যে ক্রয়ের পর ক্রয়কৃত বস্তু কবুল করার পূর্বে মারা গেছে।

إِسْتِحْسَانْ-এর প্রমাণ এই যে, مُوْصِيْ (অসিয়তকারী)-এর পক্ষ থেকে সে মৃত্যুবরণ করার কারণে অসিয়ত পূরণ হয়ে গিয়েছে যা কোনো ভাবেই ভঙ্গ হতে পারে না, আর তাতে শুধু مُوْصَى لَهُ-এর অধিকারের কারণে বিলম্ব হচ্ছিল। যখন সেও মারা যায়, তখন এ অসিয়ত কৃত বস্তু مُوْصَى لَهُ-এর (তথা উত্তরাধিকারীদের) মালিকানায় এসে যাবে। যেমনটি হয় ঐ ক্রয়ের মধ্যে যাতে ক্রয়কারীর জন্য خِيَارْ شَرْط ছিল আর সে ক্রয়কে সম্পাদন না করে মারা যায়।

قَوْلُهُ لَمْ تَصِحَّ الْوَصِيَّةُ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলার মধ্যে অসিয়ত শুদ্ধ না হওয়ার কারণ এই যে, মৃতের প্রাপ্ত বয়স্ক উত্তরাধিকারীদের ওপর مُوْصَى إِلَيْهِ বা وَصِيْ গোলামের কর্তৃত্ব চলে না। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরাধিকারীর, গোলাম (وَصِيْ)-কে تَصَرُّفْ থেকে বিরত রাখার অধিকার আছে, এতে বুঝা গেল গোলাম (وَصِيْ) অসিয়ত-এর হক আদায় করতে অক্ষম। মোটামুটি আলোচ্য মাসআলাটি তিনটি শাখায় বিভক্ত ঃ (১) মৃতের প্রাপ্ত বয়স্ক উত্তরাধিকার থাকলে নিজ গোলামকে অসিয়ত করা শুদ্ধ হবে না (২) উত্তরাধিকারীরা সব অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে অসিয়ত শুদ্ধ হবে (৩) অপরের গোলামকে অসিয়ত করা শুদ্ধ হবে না।

وَمَنْ اَوْصٰى اِلٰى مَنْ يَعْجِزُ عَنِ الْقِيَامِ بِالْوَصِيَّةِ ضَمَّ اِلَيْهِ الْقَاضِىْ غَيْرَهُ وَمَنْ اَوْصٰى اِلٰى اِثْنَيْنِ لَمْ يَجُزْ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يَتَصَرَّفَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ دُوْنَ صَاحِبِهِ اِلَّا فِىْ شِرَاءِ كَفْنِ الْمَيِّتِ وَتَجْهِيْزِهِ وَطَعَامِ اَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَكِسْوَتِهِمْ وَرَدِّ وَدِيْعَةٍ بِعَيْنِهَا وَتَنْفِيْذِ وَصِيَّتِهِ بِعَيْنِهَا وَعِتْقِ عَبْدٍ بِعَيْنِهِ وَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالْخُصُوْمَةِ فِىْ حُقُوْقِ الْمَيِّتِ وَمَنْ اَوْصٰى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلِلْاٰخَرِ ثُلُثُ مَالِهِ وَلَمْ تَجُزِ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَاِنْ اَوْصٰى لِاَحَدِهِمَا بِثُلُثٍ وَلِلْاٰخَرِ بِالسُّدُسِ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا اَثْلَاثًا وَاِنْ اَوْصٰى لِاَحَدِهِمَا بِجَمِيْعِ مَالِهِ وَلِلْاٰخَرِ بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَمْ تَجُزِ الْوَرَثَةُ فَالثُّلُثُ بَيْنَهُمَا عَلٰى اَرْبَعَةِ اَسْهُمٍ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি এ ধরনের কোনো ব্যক্তিকে অসিয়ত করে, যে অসিয়ত আঞ্জাম দিতে সক্ষম নয়, তখন বিচারক অন্য এক ব্যক্তিকে তার সাথে শামিল করে দেবে। এবং যে ব্যক্তি দু'জনকে অসিয়ত করল তখন তরফাইনদের মতে এটা জায়েজ হবে না যে এক ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তি ব্যতীত সম্পদ ব্যয় করা। তরফাইন দ্বারা উদ্দেশ্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মদ (র.)। কিন্তু মৃত ব্যক্তির কাফনের কাপড় ক্রয়, তার কাফন-দাফন, মৃত ব্যক্তির ছোট বাচ্চাদের খাদ্য, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, নির্দিষ্ট কোনো আমানত ফেরত দেওয়া, খাছ কোনো অসিয়ত জারি করা, নির্দিষ্ট কোনো গোলাম মুক্ত করা, ঋণ আদায় করা এবং মৃত ব্যক্তির কোনো অধিকারের ব্যাপারে নালিশ করার মধ্যে একজন অপর জনের অনুমতি ব্যতীত মৃত ব্যক্তির সম্পদ ব্যয় করতে পারবে। এবং যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির জন্য তার তৃতীয়াংশ মালের অসিয়ত করে এবং দ্বিতীয় আরেক ব্যক্তির জন্য তৃতীয়াংশের অসিয়ত করে, আর অসিয়তকারীর উত্তরাধীকারীগণ উহাকে নাকচ করল, তখন মালের তৃতীয়াংশের অর্ধেক অর্ধেক হারে উভয়জন প্রাপ্য হবে। এবং যদি অসিয়তকারী একজনের জন্য মালের তৃতীংশের এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ষষ্ঠাংশের অসিয়ত করে তখন তৃতীয়াংশ উভয়ের জন্য তিন ভাগ হবে। যদি অসিয়তকারী দু'জনের একজনের সমস্ত মাল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য ঐ মালের তৃতীয়াংশের অসিয়ত করল এবং অসিয়তকারীর উত্তরাধিকারগণ অসিয়তকৃত মাল দিতে অস্বীকার করে, তখন সাহেবাইনের নিকট (অর্থাৎ ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.) বলেন, মালের তৃতীয়াংশকে উভয়ের মধ্যে চার ভাগে বিভক্ত করবে। এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, তৃতীয়াংশকে তাদের মাঝে অর্ধাঅর্ধি করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَطَعَامُ اَوْلَادِهِ الصِّغَارِ الخ ঃ অর্থাৎ মৃতের ছোট বাচ্চাদের খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ দু'জন وَصِىْ থাকলে একে অপরের অনুপস্থিতে দিতে পারবে, কারণ না হলে তারা অন্ন-বস্ত্রের অভাবে মারা যাওয়ার ভয় আছে।

قَوْلُهُ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ الخ ঃ সাহেবাইন ও ইমাম আযম (র.)-এর এ মতভেদ একটি মতভেদযুক্ত মূলনীতির ওপর ভিত্তি। এবং তা এই যে, ইমাম আযম (র.)-এর মতে যার জন্য অসিয়ত করা হয়েছে তাকে ত্যাজ্য সম্পত্তির তৃতীয়াংশের বেশি ভাগ দেওয়া যাবে না, কিন্তু তিনটি ক্ষেত্রে পারবে, (১) مُحَابَاةٌ (২) سِعَايَتٌ (৩) دَرَاهِمُ مُرْسَلَةٌ

وَلَا يَضْرِبُ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْمُوْصِى لَهُ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ اِلَّا فِى الْمُحَابَاةِ وَالسِّعَايَةِ وَالدَّرَاهِمِ الْمُرْسَلَةِ وَمَنْ اَوْصٰى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُحِيْطُ بِمَالِهِ لَمْ يَجُزِ الْوَصِيَّةُ اِلَّا اَنْ يَّبْرَأَ الْغُرَمَاءُ مِنَ الدَّيْنِ۔

সরল অনুবাদ ঃ ইমাম আযম (র.) অসিয়তকৃত ব্যক্তিকে তৃতীয়াংশের বেশি দিচ্ছেন না। কিন্তু তিন অবস্থাতে দেন। (১) মুহাবাত (২) সাআয়াহ (৩) দিরহামে-মুরসালা। যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় অসিয়ত করল যে, তার জিম্মায় এতটুকু পরিমাণ ঋণ আছে যা তার সম্পূর্ণ মালকে গ্রাস করে ফেলবে, তখন তার অসিয়ত জায়েজ হবে না, হ্যাঁ যদি ঋণ প্রাপ্য ব্যক্তিগণ তাকে ঋণ থেকে মুক্ত করে দেন (তখন অসিয়ত জায়েজ হবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُحَابَاةٌ، سَعَايَةٌ ও دَرَاهِم مُرْسَلَة-এর বিস্তারিত বিবরণ ঃ (১) مُحَابَاةٌ শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার এটা حَبْوٌ মূলবর্ণ হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো, এক দিকে ঝুঁকে যাওয়া, সাহায্য সহানুভূতি করা, যেমন– উদারতা প্রদর্শন করা ইত্যাদি।

শরিয়তের পরিভাষায় مُحَابَاةٌ বলে কারো প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য কোনো বস্তু তার নিকট উহার প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা অনেক কম দামে বিক্রয় করা।

مُحَابَاةٌ-এর صُوْرَتْ এই যে, কোনো ব্যক্তির নিকট দু'টি গোলাম আছে, একটির দাম এক হাজার দুই শত টাকা এবং অপরটির দাম ছয় শত টাকা। উক্ত গোলামদ্বয় ছাড়া তার অন্য কোনো সম্পদ নেই। উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুর সময় অসিয়ত করে গেল যে, প্রথম গোলামটি রহিমের নিকট দুই শত টাকায় বিক্রয় করা হোক, আর দ্বিতীয় গোলামটি করিমের নিকট একশত টাকায় বিক্রয় করা হোক। এখন দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম গোলামটিতে এক হাজার টাকা রহিমের জন্য অসিয়ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় গোলামটিতে পাঁচ শত টাকা করিমের জন্য অসিয়ত হয়েছে। সুতরাং মৃত্যুর পর উক্ত গোলামদ্বয়ের এক-তৃতীয়াংশ রহিম ও করিমের মধ্যে এমন ভাবে বণ্টন করে দিতে হবে যাতে রহিম এর $\frac{২}{৩}$ অংশ ও করিম $\frac{১}{৩}$ -এর অংশ পায়। সুতরাং গোলামদ্বয়ের মোট দাম দাঁড়ায়, ১২০০ + ৬০০ = ১৮০০ টাকা, আর এটার তৃতীয়াংশ হলো ১৮০০ ÷ ৩ = ৬০০ টকা। এখানে ৬০০ -এর $\frac{২}{৩}$ = ৪০০ টাকা পাবে রহিম এবং ৬০০ এর $\frac{১}{৩}$ = ২০০ টাকা পাবে করিম।

(২) سَعَايَةٌ এটা سَعْىٌ হতে বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। অর্থাৎ চেষ্টা করা। এটার صُوْرَتْ এই যে, কেউ তার একমাত্র সম্পদ দু'টি গোলাম আজাদ করে দেওয়ার জন্য অসিয়ত করে গেল। গোলামদ্বয়ের একটির মূল্য এক হাজার টাকা এবং অপরটির মূল্য দুই হাজার টাকা। কিন্তু ওয়ারিশরা তা অনুমোদন করল না। এক্ষণে গোলামদ্বয় আজাদ হয়ে যাবে। তবে ১০০০ + ২০০০ = ৩০০০ -এর $\frac{১}{৩}$ = ১০০০ টাকার মধ্যে অসিয়ত কার্যকর হবে। অবশিষ্ট ২০০০ টাকা গেলামদ্বয় উপার্জন (চেষ্টা) করত পরিশোধ করবে। সুতরাং যার মূল্য ১০০০ টাকা ছিল সে ২০০০ টাকার $\frac{১}{৩}$ অংশ এ যার মূল্য ২০০০ টাকা সে ২০০০ টা কার $\frac{২}{৩}$ অংশ পরিশোধ করবে। আর دَرَاهِم مُرْسَلَة (নগদ অর্থ) অসিয়তের صُوْرَتْ হলো কারো একমাত্র সম্পদ নগদ অর্থ যদি দু'জনের জন্য অসমভাবে অসিয়ত করে যায় তাহলে তার $\frac{১}{৩}$ অংশ তথা যাদের জন্য অসিয়ত করেছে তাদের মধ্যে আনুপাতিক অংশের হারে বণ্টন করে দেওয়া হবে।

وَمَنْ اَوْصٰى بِنَصِيْبِ اِبْنِهٖ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ وَمَنْ اَوْصٰى بِمِثْلِ نَصِيْبِ اِبْنِهٖ جَازَتْ فَاِنْ كَانَ لَهُ اِبْنَانِ فَلِلْمُوْصٰى لَهُ الثُّلُثُ وَمَنْ اَعْتَقَ عَبْدَهُ فِىْ مَرَضِهٖ اَوْ بَاعَ اَوْ حَابٰى اَوْ وَهَبَ فَذٰلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ وَهُوَ مُعْتَبَرٌ مِنَ الثُّلُثِ وَيُضْرَبُ بِهٖ مَعَ اَصْحَابِ الْوَصَايَا فَاِنْ حَابٰى ثُمَّ اَعْتَقَ فَالْمُحَابَاةُ اَوْلٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ اَعْتَقَ ثُمَّ حَابٰى فَهُمَا سَوَاءٌ وَقَالَا الْعِتْقُ اَوْلٰى فِى الْمَسْئَلَتَيْنِ وَمَنْ اَوْصٰى بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهٖ فَلَهُ اَخَسُّ سِهَامِ الْوَرَثَةِ اِلَّا اَنْ يَنْقُصَ عَنِ السُّدُسِ فَيَتِمُّ لَهُ السُّدُسُ وَاِنْ اَوْصٰى بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهٖ قِيْلَ لِلْوَرَثَةِ اَعْطُوْهُ مَاشِئْتُمْ وَمَنْ اَوْصٰى بِوَصَايَا مِنْ حُقُوْقِ اللّٰهِ تَعَالٰى قُدِّمَتِ الْفَرَائِضُ مِنْهَا عَلٰى غَيْرِهَا قَدَّمَهَا الْمُوْصِىْ اَوْ اَخَّرَهَا مِثْلُ الْحَجِّ وَالزَّكٰوةِ وَالْكَفَّارَاتِ وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ قُدِّمَ مِنْهُ مَا قَدَّمَهُ الْمُوْصِىْ وَمَنْ اَوْصٰى بِحَجَّةِ الْاِسْلَامِ اَحَجُّوْا عَنْهُ رَجُلًا مِنْ بَلَدِهٖ يَحُجُّ رَاكِبًا فَاِنْ لَمْ تَبْلُغِ الْوَصِيَّةُ النَّفْقَةَ اَحَجُّوْا عَنْهُ مِنْ حَيْثُ تَبْلُغُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যে ব্যক্তি নিজের পুত্রে অংশের অসিয়ত করল, তার অসিয়ত নাকচ হবে। এবং যে ব্যক্তি পুত্র সম্পদের সমপরিমাণের অসিয়ত করল তখন উহা জায়েজ হবে। এখন যদি অসিয়তকারীর দুই পুত্র সন্তান হয়, তখন অসিয়তকৃত ব্যক্তির জন্য তৃতীয়াংশ হবে। এবং যে ব্যক্তি নিজের গোলামকে অসুস্থ অবস্থায় মুক্ত করে দিল, অথবা বিক্রি করে দিল, অথবা মুহাবাত করল, অথবা হাবাহ করল, তখন এটা জায়েজ হবে। এবং সে তৃতীয়াংশের প্রাপক বলে গণ্য হবে। এবং তার সাথী-সঙ্গীদের সঙ্গে অংশীদার ভুক্ত করা হবে। সুতরাং যদি প্রথম মুহাবাত করল পুনরায় মুক্ত করে দিল, তখন ইমাম আযম (র.)-এর নিকট মুহাবাতই উত্তম হবে এবং যদি প্রথমত মুক্ত করে পুনরায় মুহাবাত করল তখন উভয়ই সমান। এবং সাহেবাইনের নিকট মুক্ত করাই উত্তম উভয় মাসআলার মধ্যে। এবং যে ব্যক্তি তার গচ্ছিত মাল থেকে একাংশের অসিয়ত করল, তখন তার জন্য উত্তরাধিকারদের নিম্নমানের অংশের অংশীদার হবে, কিন্তু এটা সে ছয় ভাগ থেকে কম হয়। তখন তার জন্য ছয়াংশ পূর্ণ করে দেবে। এবং যদি তার সম্পদের একাংশের অসিয়ত করল, তখন উত্তরাধিকারদের বলা উচিত হবে যে, যা চাও তা তাকে দিয়ে দাও। এবং যদি আল্লাহর প্রাপ্য বস্তু হতে অসিয়ত করে তখন ফরজ অসিয়ত গুলোকে অন্য সবগুলোর ওপর প্রাধান্য দেবে, চাই অসিয়তকারী তাকে প্রাধান্য দেক বা নাই দেক। যেমন– হজ, জাকাত, কাফ্ফারা। এবং যদি ফরজ না হয়, তখন ঐগুলোর মধ্যে তাকে আগে আদায় করবে যা অসিয়তকারী আগে বলছে। এবং যে ব্যক্তি হজের অসিয়ত করল, তখন হজের জন্য এক ব্যক্তিকে ঐ শহর থেকে পাঠিয়ে দেবে। এবং যে আরোহণ হয়ে হজে যায়। সুতরাং অসিয়ত যদি পরিবারিক ব্যয় থেকেও বেশি হয় (অর্থাৎ পারিবারিক খরচ না হয়) তখন যেখান থেকে পারে হজ করাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ جَازَتْ الخ ঃ প্রথম অবস্থায় অসিয়ত নাজায়েজ হওয়ার কারণ এই যে, সে অন্যের মাল অসিয়ত করেছে। কেননা অংশ তো হলো যা (অসিয়তকারীর) মৃত্যুর পর সে পাবে। (আর অপরের হক অসিয়ত করার অধিকার কারো নেই।) আর দ্বিতীয় অবস্থায় জায়েজ হওয়ার কারণ এই যে, অসিয়তকারী তার পুত্রের অংশের مِثْل (মেছাল-অনুরূপ পরিমাণ)-এর অসিয়ত করেছে। আর কোনো বস্তুর مِثْل ভিন্ন বস্তু হয়ে থাকে। যদিও সেই বস্তুর দ্বারা مِثْل এর পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। কাজেই তা জায়েজ হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ أَوْصَى بِسَهْمٍ الخ ঃ কেউ তার সম্পত্তির একটি سَهْم (অংশ) অসিয়ত করলে উক্ত ব্যক্তি কি পরিমাণ সম্পত্তি পাবে? এ ব্যাপারে হানাফী ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে সে ওয়ারিশগণের অংশসমূহ হতে যা সর্বনিম্ন তাই লাভ করবে।তবে তা $\frac{১}{৬}$ -এর কম হলে ৬ পূর্ণ করে দেবে, এর বেশি করবে না। পক্ষান্তরে সাহেবাইন তথা ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও মুহাম্মাদের (র.) মতে উক্ত مُوْصَى لَهٗ একজন ওয়ারিশের অংশের পরিমাণ পাবে। তবে ওয়ারিশগণ অনুমতি না দিলে তা $\frac{১}{৩}$ -এর অধিক হতে পাবেনা। যেমন– এক মহিলা কারো জন্য তার সম্পত্তির একটির অংশ অসিয়ত করে মারা গেল আর তার এক কন্যা ও স্বামী রয়েছে। এমতাবস্থায় কন্যা $\frac{১}{২}$ অংশ ও স্বামী $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। সুতরাং এই মাসআলায় সাহেবাইনের (র.) মতে مُوْصَى لَهٗ তথা যার জন্য অসিয়ত করেছে সে $\frac{১}{৪}$ অংশ পাবে। আর ইমাম সাহেবের মতে $\frac{১}{৮}$ অংশ পাবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا مِنَ الخ ঃ এ স্থলে গ্রন্থকার (র.) একটি মূলনীতি বর্ণনা করেছেন। মূলনীতিটি এই যে, কেউ যদি আল্লাহর হকসমূহের মধ্য হতে কোনো হকের অসিয়ত করে তাহলে (حُقُوْقُ اللّٰهِ-এর মধ্যে) ফরজসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অসিয়তকারী ফরজকে পূর্বে উল্লেখ করুক অথবা পরে উল্লেখ করুক। যথা– হজ, জাকাত ও কাফফারা। কেননা ফরজের গুরুত্ব নফলের অপেক্ষা অধিক। আর প্রকাশ্যত আমরা এটাই বুঝে থাকব যে, অসিয়তকারী অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে পূর্ব উল্লেখ করেছে।

আলোচ্য মূলনীতিটির পূর্ণাঙ্গ বিধান এই যে, কেউ মৃত্যুকালে حُقُوْقُ اللّٰهِ (আল্লাহর হকসমূহ) যেমন– নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ইত্যাদি নিজ দায়িত্বে রেখে গেল। এমতাবস্থায় দেখতে হবে যে, মৃত ব্যক্তি মৃতুকালে উহাদের পূরণ করার জন্য অসিয়ত করে গিয়েছে কিনা? যদি অসিয়ত করে গিয়ে থাকে তাহলে তার মোট সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ হতে পূর্ণ করতে হবে। আর অসিয়ত করে না গেলে তা পূর্ণ করা ওয়ারিশদের ওপর ওয়াজিব নয়। তবে আদায় করলে নফল হবে। আর এটার ছওয়াব মৃত ব্যক্তির রূহের ওপর পৌছবে।

নফল-এর অসিয়তে বিন্যাসের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ قُدِّمَ مِنْهُ الخ ঃ ওয়াজিব ব্যতীত কোনো একাধিক বস্তুর যদি অসিয়ত করা হয় তাহলে অসিয়তকারী যাকে পূর্বে উল্লেখ করবে তার মধ্যে পূর্বে (এভাবে ক্রমান্বয়ে) অসিয়ত কার্যকারী হবে। যেমন– কেউ মৃত্যুকালে বলল, আমার পক্ষ হতে যেন নফল হজ করা হয়, আমার পক্ষ হতে ফকিরদেরকে যেন একশত টাকা দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে অসিয়তকারী যার উল্লেখ পূর্বে করেছে, তার মধ্যে পূর্বে অসিয়ত কাযর্কর করা হবে। এভাবে যতটুকু পর্যন্ত গিয়ে মালের এক-তৃতীয়াংশ নিঃশেষ হয়ে যাবে ততটুকু পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে অসিয়ত কার্যকর হবে। কেননা এ ধরনের অসিয়ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শুধুমাত্র হয়ে থাকে এটাতে বান্দার দাবি করার কিছু নেই। সুতরাং অসিয়তকারী যে ধারবাহিকতার উল্লেখ করেছে। তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

তা ছাড়া এর দ্বারা অসিয়তকারী যেন মুখেই বলে গেল যে, উহাকে পূর্বে তারপর উহাকে অতঃপর এটাকে করো। এটিই জাহের রেওয়ায়তে উল্লেখ রয়েছে। আর জাহের রেওয়ায়ত বলতে ইমাম মুহাম্মদ (র.) কর্তৃক বিরচিত ছয়টি কিতাবের বর্ণনাকে বুঝানো হয়ে থাকে। অপরদিকে হাসান ইবনে যিয়াদ (র.) মুতাকাদ্দেমীন আহনাফের মাযহাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, ইবাদতের গুরুত্বের তারতম্য হিসাবে আদায়ের ব্যপারে আগ-পর করতে হবে, উল্লেখের আগ-পর ধর্তব্য নয়। সুতরাং প্রথমত হজ তারপর সদকা অতঃপর আজাদ করতে হবে।

<u>একটি বিধান</u> ঃ এখানে এ বিধানটি খেয়াল রাখতে হবে যে, যদি حُقُوقُ اللهِ-এর সাথে حُقُوقُ الْعِبَادِ -এরও অসিয়ত করে তাহলে مُوْصىٰ لَهُ ইবাদত আদায়ের অসিয়তের প্রাপক হিসাবে পরিগণিত হবে। আর যত প্রকারের এবাদতের উল্লেখ করবে সব কয়টিকে পৃথক গণ্য করা হবে। যেমন- হজ, সদকা, কাফফারা ও গোলাম আজাদের উল্লেখ করবে। তদ্রূপ মানুষের বেলায় যতজন ফকির মিসকিনের উল্লেখ করা হয়, সকলের অসিয়ত পৃথক ধরা হয়। তদ্রূপ ইবাদতের বেলায়ও হবে।

قَوْلُهُ وَمَنْ اَوْصىٰ بِحَجَّةِ الخ ঃ অর্থাৎ যদি কেউ ইসলামি হজের অসিয়ত করে তখন তার শহরের লোক দ্বারা (ওয়ারিশরা হজ করাবে) সে সওয়ার হয়ে হজে যাতায়াত করবে। কেননা তার শহর হতে আল্লাহর জন্য হজ করা ওয়াজিব। সুতরাং তার শহর হতে হজ করতে যে পরিমাণ মালের প্রয়োজন তা হিসাব করতে হবে। আর তার ওপর যা (যে হজ) ওয়াজিব হয়েছিল তা আদায়ের জন্যই অসিয়ত করা হয়েছে। সওয়ার হওয়ার শর্ত এ জন্য উল্লেখ করেছেন যে, পায়ে হেঁটে হজ করা তার ওপর ওয়াজিব নয়। সুতরাং যেভাবে তার ওপর ওয়াজিব হয়েছে সে নিয়মে অন্যের দিকেও তা প্রত্যাবর্তন করবে। যদি সওয়ার অবস্থায় হজ করলে অসিয়ত পূর্ণ করার মতো খরচ (টাকা) না থাকে তাহলে যেভাবে অসিয়ত পূর্ণ করা যায় সেভাবে হজ করবে। কেয়াসের দাবি হলো, তার পক্ষ হতে হজ করা হবে না। কেননা সে এমনভাবে হজ করার অসিয়ত করেছে যে অবস্থার উপাদান আমরা পাইনি। তথাপি আমরা একে এ জন্য জায়েজ রেখেছি যে, আমরা জানি অসিয়তকারীর অসিয়ত কার্যকর হওয়ার ইচ্ছা করেছে, সুতরাং যথাসম্ভব তা কার্যকর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। আর আমরা যার উল্লেখ করেছি ইহা এই অবস্থায়ই সম্ভব। সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেওয়ার চেয়ে এটা উত্তম।

<u>ইবাদতের মধ্যে প্রতিনিধিত্বের হুকুম</u> ঃ উল্লেখ্য যে, ইবাদত সাধারণত তিন প্রকার ঃ (ক) খাঁটি দৈহিক ইবাদত, (খ) খাঁটি মালী ইবাদত, (গ) দেহ ও মাল সমন্বয়ের ইবাদত। খাঁটি দৈহিক ইবাদত যেমন নামাজ এতে প্রতিনিধিত্ব জায়েজ নেই। আর যা মালী ইবাদত যেমন জাকাত। যা দেহ ও মাল দ্বারা পালন করা হয় যেমন- হজ এই দু'প্রকার ইবাদতে প্রতিনিধিত্ব জায়েজ আছে। সুতরাং হজে প্রতিনিধিত্ব জায়েজ আছে বলে কেও হজ না করে মারা গেলেও তার পক্ষ হতে হজের অসিয়ত করে থাকলে বা ব্যক্তি অক্ষম হলে তার পক্ষ হতে অর্থের দ্বারা তার হজ সমাধা করানো জায়েজ আছে।

وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهٖ حَاجًّا فَمَاتَ فِي الطَّرِيْقِ وَاَوْصٰى اَنْ يَحُجَّ عَنْ حَجٍّ عَنْهُ مِنْ بَلَدِهٖ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ وَلَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ الصَّبِيِّ وَالْمُكَاتَبِ وَاِنْ تَرَكَ وَفَاءً وَيَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ الرُّجُوْعُ عَنِ الْوَصِيَّةِ وَاِذَا صَرَّحَ بِالرُّجُوْعِ كَانَ رُجُوْعًا وَمَنْ جَحَدَ الْوَصِيَّةَ لَمْ يَكُنْ رُجُوْعًا وَمَنْ اَوْصٰى لِجِيْرَانِهٖ فَهُمُ الْمُلَاصِقُوْنَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ اَوْصٰى لِاَصْهَارِهٖ فَالْوَصِيَّةُ لِكُلِّ ذِيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ اِمْرَأَتِهٖ وَمَنْ وَصّٰى لِاَخْتَانِهٖ فَالْخَتَنُ زَوْجُ كُلِّ ذَاتِ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَمَنْ اَوْصٰى لِاَقَارِبِهٖ فَالْوَصِيَّةُ لِلْاَقْرَبِ مِنْ كُلِّ ذِيْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ وَلَا يَدْخُلُ فِيْهِمُ الْوِلْدَانُ وَالْوَلَدُ وَيَكُوْنُ لِلْاِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا وَاِذَا وَصّٰى بِذٰلِكَ وَلَهٗ عَمَّانِ وَخَالَانِ فَالْوَصِيَّةُ لِعَمَّيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ كَانَ لَهٗ عَمٌّ وَخَالَانِ فَلِلْعَمِّ النِّصْفُ وَلِلْخَالَيْنِ النِّصْفُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى الْوَصِيَّةُ لِكُلِّ مَنْ يُنْسَبُ اِلٰى اَقْصٰى اَبٍ لَهٗ فِي الْاِسْلَامِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যে ব্যক্তি নিজে শহর হতে হজের জন্য বের হলো এরপর সে পথিমধ্যে পরলোক গমন করল এবং হজ করানোর অসিয়ত করে গেল, তখন ইমাম আযম (র.)-এর নিকট তার (মৃত ব্যক্তির) শহর থেকে হজ করানো হবে। এবং সাহেবাইনের নিকট ঐ স্থান হতে হজ করানো হবে যে স্থানে সে মৃত্যুবরণ করল। বাচ্চা এবং না বালেগের অসিয়ত শুদ্ধ নয়। যদিও সে এত সম্পদ রেখে যায়, যা পরিপূর্ণ হয় হজের জন্য। এবং অসিয়তকারীর অসিয়ত থেকে প্রত্যাবর্তন করা জায়েজ। এবং যখন প্রকাশ্য প্রত্যাবর্তন করবে তখন প্রত্যাবর্তন করা হয়ে যাবে। এবং যদি অসিয়ত অস্বীকার করে, তখন এ প্রত্যাবর্তন গণ্য হবে না। এবং যে তার প্রতিবেশীদের জন্য অসিয়ত করল, তখন ইমাম আযম (র.)-এর নিকট অসিয়তকারীর ঘরের সাথে মিলিত লোকজন বুঝাবে। আর যে তার শ্বশুরালয়ের আত্মীয়দের জন্য অসিয়ত করল, তখন অসিয়ত তার স্ত্রীর মাহরামদের জন্য হবে। এবং যে তার জামাতাদের জন্য অসিয়ত করল, তখন জামাতা প্রত্যেক ঐ রেহেম মাহরামের স্বামী হবে। এবং যে তার নিকটস্থ ব্যক্তিবর্গের জন্য অসিয়ত করল, তখন সব চেয়ে নিকটস্থ ব্যক্তিগণদের জন্য হবে। তার রেহেম মাহরামদের থেকে এবং তার মধ্যে পিতা, মাতা, ছেলে অনুপ্রবেশ করবে না। এবং দু'য়ের অধিকদের জন্যই হবে। এবং যদি কেউ এটাই অসিয়ত করল এবং তার দু'চাচা, দু'মামা আছে, তখন ইমাম আযমের নিকট চাচারাই অসিয়তের হকদার। এবং যদি এক চাচা, দু'মামা হয়, তখন চাচার জন্য অর্ধেক এবং দুই মামা দ্বয়ের জন্য অর্ধেক হবে। এবং সাহেবাইনদের নিকট অসিয়ত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্যই হবে যে ইসলামের মধ্যে তার শেষ পিতার দিকে সম্পর্কিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ خَرَجَ مِنْ بَلَدِهٖ حَاجًّا ঃ অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি তার স্বীয় শহর হতে হজ পালন করার উদ্দেশ্যে বের হয়ে পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন, আর তার পক্ষ হতে হজ করার জন্য অসিয়ত করা গেল। এমতাবস্থায় তার শহর হতে তার পক্ষ হতে হজ পালন করতে হবে। ইহা ইমাম আবূ হানীফার (র.) মাযহাব। ইমাম যুফারও এই অভিমত পোষণ করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) ও মুহাম্মদ (র.)-এর মতে ইস্তেহসানের দিক বিচেনায় মৃত ব্যক্তি যথায় পৌছে ছিল তথা হতে হজ করা হবে। এর ওপর ভিত্তি করে ঐ মাসআলায়ও মতবিরোধ রয়েছে যখন বদলী হজ করতে যেয়ে কেউ রাস্তায় মারা যায়। সাহেবাইন (র.)-এর দলিল হলো হজের নিয়তে ভ্রমণ করা নৈকট্য লাভ হিসাবে গণ্য। কাজেই যে পরিমাণ পথ অতিক্রম করেছে সেই পরিমাণ পথের সফর আদায় হয়ে গেছে। আর আল্লাহর নিকট তার ছওয়াবও সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং সে স্থান হতেই আরম্ভ করা হবে। তবে ব্যবসায়ের সফর এটার বিপরীত। কেননা তা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য হয় না। কাজেই উক্ত অবস্থায় অসিয়ত করলে তার নিজ শহর হতে হজ করাতে হবে। ইমাম আবূ হানীফার (র.) দলিল এই যে, তার হজের অসিয়তটি তার নিজ শহর হতে হজ্ করাবার দিকেই ধাবিত হবে। কেননা ওয়াজিবকে ঠিক সেভাবে আদায় করতে হয় যেভাবে উহা ওয়াজিব হয়।

ইমাম আযম (র.) ও সাহেবাইন (র.)-এর মত পার্থক্যের ক্ষেত্রে ঃ

قَوْلُهُ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ مَاتَ الخ ঃ ফোকাহায়ে কেরাম বলেছেন যে, উক্ত লোকটি যে হজ করার নিয়তে বাড়ি হতে বের হয়ে পথে মারা গিয়েছে এবং তার পক্ষ হতে হজ করার অসিয়ত করে গিয়েছে তার সম্পর্কে ইমাম সাহেব (র.) ও সাহেবাইনের (র.) মতবিরোধ তখন প্রযোজ্য হবে যখন লোকটির কোনো নির্দিষ্ট বাড়ি ঘর থাকে। কিন্তু যদি তার নির্দিষ্ট বাড়ি-ঘর না থাকে তাহলে সর্বসম্মত ভাবেই সে যেখানে মারা গেছে সেখান থেকে তার পক্ষ হতে হজ করানো হবে। তদ্রূপ হজের উদ্দেশ্যে না যেয়ে যদি ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে সফরে গিয়ে মারা যায় তাহলে সর্বসম্মতভাবে বাড়ি হতে বদলী হজ করাতে হবে।

প্রতিবেশীর জন্য অসিয়ত করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَوْصٰى لِجِيْرَانِهٖ الخ ঃ অর্থাৎ কেউ যদি তার প্রতিবেশীদের জন্য অসিয়ত করে যায় তাহলে এর কার্যকারিতার ক্ষেত্রের ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মধ্যে শুধুমাত্র যাদের ঘর অসিয়তকারীর ঘরের সংলগ্ন তারাই উক্ত অসিয়তের আওতায় পড়বে। তাঁর যুক্তি হলো جَارٌ শব্দটি مُجَاوَرَةٌ হতে নির্গত হয়েছে। আর مُجَاوَرَةٌ-এর অর্থ হলো সংযুক্তি ও সংলগ্নতা। কাজেই এটা অন্যান্যদেরকে শামিল করতে প্যারে না। তাঁর অপর যুক্তি হলো, ওরফে বা প্রচলিত প্রথায় جَارٌ-এর যেই অর্থ পাওয়া যায় তাতে গোটা দেশবাসীকেই প্রতিবেশী হিসাবে আখ্যায়িত করা যায় অথচ গোটা দেশবাসীর জন্য তার অসিয়ত কার্যকর করা সম্ভব নয়। সুতরাং اَخَصُّ الْخُصُوْصِ তথা বাড়ির সংলগ্নদের জন্যই তা নির্ধারণ করা হবে।

ইমাম আবূ ইউসূফের (র.) ও মুহাম্মদের (র.) মতে বাড়ি সংলগ্ন প্রতিবেশী ও গোটা মহল্লার লোকদেরকে উক্ত অসিয়ত শামিল করবে। কেননা ওরফে তাদের সকলকেই প্রতিবেশী বলে। তা ছাড়া নবী করীমের (সা.) নিম্নোক্ত বাণী ঃ لَاصَلٰوةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ اِلَّا فِى الْمَسْجِدِ-এর ব্যাখ্যায় جَارٌ বা প্রতিবেশী দ্বারা যাদের কর্ণে মসজিদের আজানের শব্দ পৌছায় তাদেরকে প্রতিবেশী বলা হয়েছে। সুতরাং তার মহল্লার অধিবাসী দ্বারা যারা ঐ মসজিদে নামাজ পড়ে যেই মসজিদে সে নামাজ পড়তো তাদেরকে বুঝাবে। কেননা তাদের সাথে তার মেলামেশা ছিল। এতদ্ব্যতীত প্রতিবেশীর জন্য অসিয়ত করার অর্থ হলো তাদের প্রতি ইহসান করা, আর তা শুধু বাড়ির সংলগ্ন লোকদের সাথে খাস নয়; বরং গোটা মহল্লাবাসীকেই তা শামিল করে।

প্রতিবেশীর সীমানা কতটুকু এ প্রসঙ্গে শাফেয়ী (র.)-এর মতামত ঃ প্রকাশ থাকে যে, আলোচ্য মাসআলায় ইমাম শাফেয়ী (র.) দাবি করেছেন যে, চল্লিশ ঘর পর্যন্ত প্রতিবেশী হিসেবে গণ্য হবে। আমাদের হানাফী ফকীহগণ একে মোটেই গুরুত্ব দেননি; বরং এটা সত্য হতে বহুদূরে বলে মন্তব্য করেছেন। তবে ইমাম শাফেয়ীর (র.) উপরোক্ত দাবির ভিত্তি

হলো একটি হাদীস। হাদীসখানা ইমাম বায়হাকী (র.) উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। নবী করীম (সা.) এরশাদ করেন, জিবরাঈল আমাকে অসিয়ত করেছেন প্রতিবেশীর হক আদায় করার জন্য চল্লিশঘর পর্যন্ত। চতুর্দিকে দশঘর দশঘর করে। কিন্তু হাদীস খানার সনদ খুবই দুর্বল। খোদ ইমাম বায়হাকী এর সনদে দুর্বলতা আছে বলে উল্লেখ করেছেন।

صِهْر শব্দের অর্থ ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَوْصٰى لِاَصْهَارِهِ الخ ঃ উল্লেখ্য যে, আরবি ভাষায় صِهْر শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপকার্থক। صِهْرٌ শব্দটি কুরআন মাজীদেও উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা শ্বশুর কুলের ঘনিষ্ট আত্মীয়-স্বজনকে বুঝনো হয়। চাই ব্যক্তির নিজের হোক অথবা পিতার শ্বশুরকুল হোক কিংবা পুত্রের শ্বশুর কুল হোক সকলকেই صِهْرٌ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়।

নিকটাত্মীয়ের জন্য অসিয়তের কতিপয় শর্ত ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَوْصٰى لِاَقَارِبِهِ الخ ঃ আলোচ্য মাসআলায় ইমাম আবূ হানীফার (র.)পক্ষ হতে ছয়টি শর্ত আরোপ করা হয়েছে। (১) অসিয়তকারীর ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ আত্মীয় হতে হবে। (২) পিতা-মাতা উভয় কুলের ওপর সমভাবে প্রয়োগ করা হবে। (৩) এমন ব্যক্তি হবে যে ওয়ারিশদের অন্তর্ভুক্ত নয়। (৪) ধারাবাহিকভাবে নিকট হতে দূরবর্তীর দিকে ধাবিত হবে। (৫) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি এর মধ্যে শামিল হবে। (৬) পিতা ও সন্তান এটার মধ্যে শামিল হবে না। তবে পৌত্র ও দাদা এর আওতায় পড়বে। কিন্তু কারো কারো মতে দাদা ও পৌত্র এর মধ্যে শামিল হবে না।

قَوْلُهُ وَاِذَا اَوْصٰى بِذَالِكَ الخ ঃ অর্থাৎ যদি কেউ তার اَقَارِبُ-এর জন্য অসিয়ত করে আর তার দুই চাচা ও দুই মামা থাকে তাহলে ইমাম আবূ হানীফার (র.) মতে অসিয়ত দুই চাচার জন্য হবে। কেননা তারা যদ্রূপ মিরাসের মধ্যে اَقْرَبُ তদ্রূপ তারা অসিয়তের মধ্যে ও اقرب হবে।

اَقْرِبَاءُ-এর জন্য অসিয়ত করলে غَيْر مَحْرَمْ এতে শামিল হবে কি না ? যদি اَقْرِبَاءُ-এর জন্য অসিয়ত করে তাহলে শুধু ذِىْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ -ই উক্ত অসিয়তের হকদার হবে। অন্যান্যদের বেলায় অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। অবশ্য এটা ইমাম আবু হানীফার (র.) মাযহাব। সাহেবাইন (র.)-এর মতে অসিয়ত বাতিল হবে না। বরং اَلْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ-এর মূলনীতি অনুযায়ী অসিয়তের মাল বণ্টন করে দেওয়া হবে।

وَمَنْ اَوْصٰى لِرَجُلٍ بِثُلُثِ دَرَاهِمِهٖ اَوْ بِثُلُثِ غَنَمِهٖ فَهَلَكَ ثُلُثَا ذٰلِكَ وَبَقِىَ ثُلُثُهٗ وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَابَقِىَ مِنْ مَالِهٖ فَلَهٗ جَمِيْعُ مَابَقِىَ وَمَنْ اَوْصٰى بِثُلُثِ ثِيَابِهٖ فَهَلَكَ ثُلُثَاهَا وَبَقِىَ ثُلُثُهَا وَهُوَ يَخْرُجُ مِنْ ثُلُثِ مَابَقِىَ مِنْ مَالِهٖ لَمْ يَسْتَحِقَّ اِلَّا ثُلُثَ مَابَقِىَ مِنَ الثِّيَابِ وَمَنْ اَوْصٰى لِرَجُلٍ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ وَلَهٗ مَالٌ عَيْنٌ وَ دَيْنٌ فَاِنْ خَرَجَ الْاَلْفُ مِنْ ثُلُثِ الْعَيْنِ دُفِعَتْ اِلَى الْمُوْصٰى لَهٗ وَاِنْ لَمْ يَخْرُجْ دُفِعَ اِلَيْهِ ثُلُثُ الْعَيْنِ وَكُلَّمَا خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّيْنِ اَخَذَ ثُلُثَهٗ حَتّٰى يَسْتَوْفِىَ الْاَلْفَ وَتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ وَبِالْحَمْلِ اِذَا وَضَعَ لِاَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الْوَصِيَّةِ وَاِذَا اَوْصٰى لِرَجُلٍ بِجَارِيَةٍ اِلَّا حَمْلَهَا صَحَّتِ الْوَصِيَّةُ وَالْاِسْتِثْنَاءُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির জন্য তার দিরহামের তৃতীয়াংশের অথবা তৃতীয়াংশ ছাগলের অসিয়ত করল এবং তার মধ্যে থেকে দুই-তৃতীয় ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে এবং বাকি তৃতীয়াংশ এবং উহা বের হবে বাকি মালের তৃতীয়াংশ থেকে, তখন অসিয়তকৃত ব্যক্তির জন্য অবশিষ্ট সমস্ত ছাগলগুলো হবে। এবং যে ব্যক্তি তার কাপড়ের এক-তৃতীয়াংশের অসিয়ত করল এবং দুই-তৃতীয়াংশ নষ্ট হয়ে গেছে এবং এক-তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট রইল যা অবশিষ্ট মালের তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়, তখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি মালিক হবে না; কিন্তু অবশিষ্ট কাপড়গুলোর তৃতীয়াংশের। এবং যে ব্যক্তি কোনো ব্যক্তির জন্য হাজার দিরহামের অসিয়ত করল এবং তার কিছু মাল নগদ এবং কিছু কর্জ। তখন নগদ সম্পদের তৃতীয়াংশের থেকে এক হাজার বের হবে, তখন অসিয়তকৃত ব্যক্তি দিয়ে দেবে। এবং যদি না বের হয় তখন নগদ সম্পদের তৃতীয়াংশ থেকে দেওয়া হবে। এবং যখন কখনো কর্জ উসুল হতে থাকে, তার তৃতীয়াংশ নিতে থাকবে এ পর্যন্ত যে, পূর্ণ এক হাজার নিয়ে নেবে। এবং অসিয়ত হামলের জন্য জায়েজ আছে এবং হামলের অসিয়তও জায়েজ আছে। যখন হামল হওয়া অসিয়তের ছয় মাস থেকে কম হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গর্ভের বাচ্চার জন্য বা গর্ভের বাচ্চাকে অসিয়ত করার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ لِلْحَمْلِ الخ ঃ গর্ভের বাচ্চার জন্য অসিয়ত করা জায়েজ আছে, যেমন মনিবের এরূপ বলা যে, আমি আমার এ দাসীর গর্ভের বাচ্চার জন্য এ পরিমাণ দিরহামের অসিয়ত করছি, এরূপ বলা জায়েজ হওয়ার কারণ এই যে, অসিয়তের মধ্যে প্রতিনিধি বানানো জায়েজ আছে, مُوْصٰى তার সম্পদের অংশের মধ্যে مُوْصٰى لَهٗ -কে যেমন প্রতিনিধি বানানো বৈধ গর্ভের সন্তান উত্তরাধিকারের মধ্যে যেহেতু প্রতিনিধি হতে পারে, তদ্রূপ অসিয়তের মধ্যে হতে পারবে।

গর্ভের বাচ্চার অসিয়ত করার পদ্ধতি এই যে, মনিব এ কথা বলা যে, আমি এই দাসীর গর্ভের বাচ্চাকে অমুক ব্যক্তির জন্য অসিয়ত করছি গর্ভের বাচ্চার মধ্যে যেহেতু উত্তরাধিকার এর বিধান প্রয়োগ হয় তাই অসিয়তও জারি হবে, কারণ অসিয়ত উত্তরাধিকারের সদৃশ।

قَوْلُهٗ اِلَّا حَمْلَهَا الخ ঃ অর্থাৎ দাসীর গর্ভে যে বাচ্চা আছে, তাকে বাদ দিয়ে দাসীকে কারো জন্য অসিয়ত করা জায়েজ আছে, কারণ অসিয়ত উত্তরাধিকারের সদৃশ, অতএব অসিয়তকারী আলোচ্য মাসআলায় দাসীকে অসিয়ত হিসাবে আখ্যায়িত করল আর দাসীর গর্ভের বাচ্চাকে মিরাস বানাল।

وَمَنْ اَوْصٰى بِجَارِيَةٍ فَوَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوْصِىْ قَبْلَ اَنْ يَّقْبَلَ الْمُوْصٰى لَهٗ وَلَدًا ثُمَّ قَبِلَ الْمُوْصٰى لَهٗ وَهُمَا يَخْرُجَانِ مِنَ الثُّلُثِ فَهُمَا لِلْمُوْصٰى لَهٗ وَاِنْ لَمْ يَخْرُجَا مِنَ الثُّلُثِ ضَرَبَ بِالثُّلُثِ وَاَخَذَ بِالْحِصَّةِ مِنْهُمَا جَمِيْعًا فِىْ قَوْلِ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَاْخُذُ ذٰلِكَ مِنَ الْاُمِّ فَاِنْ فَضَلَ شَيْءٌ اَخَذَ مِنَ الْوَلَدِ وَتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ بِخِدْمَةِ عَبْدِهٖ وَسُكْنٰى دَارِهٖ سِنِيْنَ مَعْلُوْمَةً وَتَجُوْزُ ذٰلِكَ اَبَدًا ـ

সরল অনুবাদ ঃ কারো জন্য যদি বাঁদির অসিয়ত করে এবং উহার বোঝার প্রভেদ করল, তখন অসিয়ত এবং প্রভেদ সহীহ হবে। এবং যে কারো জন্য বাঁদির অসিয়ত করল সুতারাং সে অসিয়তকারীর মৃত্যুর পরে বাচ্চা ভূমিষ্ঠ করল। অসিয়তকৃত ব্যক্তি গ্রহণ করার পূর্বে পুনরায় অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়ত গ্রহণ করল এবং উহা উভয় তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়। এখন উহা অসিয়তকৃত ব্যক্তির জন্য হবে। এবং যদি তৃতীয়াংশ থেকে বের না হয়, তখন তৃতীয়াংশের মধ্যে গণ্য করে নেওয়া হবে। এবং অসিয়তকৃত ব্যক্তি সাহেবাইনদের কথা অনুযায়ী ঐ দুইদ্বয় থেকে অংশ নেবে। এবং ইমাম সাহেব (র.)-এর নিকট নিজস্ব অংশ অসিয়তকৃত ব্যক্তি মা থেকে নেবে। সুতরাং যদি কিছু বাকি থাকে তা, বাচ্চা থেকে নেবে। এবং নিজস্ব গোলামের খেদমত নির্দিষ্ট বছর পর্যন্ত ঘরের বসবাসের অসিয়ত জায়েজ আছে, এবং এটা সর্বদা থাকার জন্যও জায়েজ আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কৃতদাসের সেবা ও বাড়িতে বসবাসের অসিয়তের বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَتَجُوْزُ الْوَصِيَّةُ الخ ঃ জমহুর আহনাফের মতে গোলামের সেবা, ঘর-বাড়ির বসবাস (ও গাছের ফল)-এর অসিয়ত করা জায়েজ ও তা কার্যকর হবে। কেননা জীবিত অবস্থায় যখন অন্যদেরকে এদের মালিকানা প্রদান করা যায় তখন মৃত্যুর পরে প্রয়োজনের তাগিদে তা করা যাবে না কেন? আর অসিয়ত মানে তো মৃত্যুর পর অনাত্মীয়কে কোনো কিছুর মালিকানা প্রদান করা। কিন্তু ইবনে আবী লাইলাসহ কতিপয় ফকীহ বলেন– উক্ত ধরনের অসিয়ত চাই তা স্থায়ী ভাবে হোক বা অস্থায়ীভাবে হোক জায়েজ হবে না। তাদের যুক্তি হলো অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর উক্ত বস্তুর উপভোগ তার মালিকানাধীন থাকে না। কাজেই সে উহার অসিয়ত ও করতে পারে না। জমহুরের যুক্তি হলো জীবদ্দশার মালিক যদ্রূপ মূল্যের বিনিময়ে যেমন বিক্রয়ের ও ভাড়ার মাধ্যমে তার বস্তুর বা বস্তুর মুনাফার মালিকানা অন্যকে দান করতে পারে তদ্রূপ মৃত্যুর পরেও অসিয়তের মাধ্যমে তার মালিকানাধীন মূল বস্তু বা বস্তুর মুনাফার মালিকানা অন্যকে দান করতে পারবে। কেননা এতে তার প্রয়োজন রয়েছে। আর তা হলো জীবনের ফাঁকে ফাঁকে যে সব ভুল-ত্রুটি ও পাপকার্য সে করেছে মৃত্যুকালে কিছু নফল সদকা (তথা অসিয়ত)-এর মাধ্যমে সে উহার কাফফরা আদায় করতে চায়।

فَاِنْ خَرَجَتْ رَقَبَةُ الْعَبْدِ مِنَ الثُّلُثِ سُلِّمَ اِلَيْهِ لِلْخِدْمَةِ وَاِنْ كَانَ لَامَالَ لَهُ غَيْرُهُ خَدَمَ الْوَرَثَةَ يَوْمَيْنِ وَالْمُوْصٰى لَهُ يَوْمًا فَاِنْ مَاتَ الْمُوْصٰى لَهُ عَادَ اِلَى الْوَرَثَةِ وَاِنْ مَاتَ الْمُوْصٰى لَهُ فِىْ حَيٰوةِ الْمُوْصِىْ بَطَلَتِ الْوَصِيَّةُ وَاِذَا اَوْصٰى لِوَلَدِ فُلَانٍ فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ الذَّكَرُ وَالْاُنْثٰى سَوَاءٌ وَاِنْ اَوْصٰى لِوَرَثَةِ فُلَانٍ فَالْوَصِيَّةُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَمَنْ اَوْصٰى لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو بِثُلُثِ مَالِهِ فَاِذَا عَمْرٌو مَيِّتٌ فَالثُّلُثُ كُلُّهُ لِزَيْدٍ وَاِنْ قَالَ ثُلُثُ مَالِىْ بَيْنَ زَيْدٍ وَعَمْرٍو وَ زَيْدٌ مَيِّتٌ كَانَ لِعَمْرٍو نِصْفُ الثُّلُثِ وَمَنْ اَوْصٰى بِثُلُثِ مَالِهِ وَلَا مَالَ لَهُ ثُمَّ اكْتَسَبَ مَالًا اِسْتَحَقَّ الْمُوْصٰى لَهُ ثُلُثُ مَا يَمْلِكُهُ عِنْدَ الْمَوْتِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং যদি গোলাম মালের তৃতীয়াংশ থেকে বের হয়, তখন খেদমতের জন্য অসিয়তকৃত ব্যক্তির করে দেবে। এবং যদি গোলাম ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদ না হয়, তখন তার ওয়ারিশের খেদমত করবে একদিন এবং অসিয়তকৃত ব্যক্তির করবে দুই দিন। সুতরাং যদি অসিয়তকৃত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করে তখন গোলাম তার ওয়ারিশদের জন্য হবে। এবং যদি অসিয়তকৃত ব্যক্তি অসিয়তকারীর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করে, তখন অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হবে। এবং যদি অমুকের সন্তানদের জন্য অসিয়ত করে তখন অসিয়ত তার মধ্যে এবং সন্তানদের মধ্যে সমান হবে। এবং যদি অমুকের ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করল, তখন অসিয়ত উহার মধ্যে পুরুষদের জন্য উদাহরণ স্বরূপ দু'জন মহিলার অংশ হবে। এবং যে যায়েদ এবং ওমরের জন্য সম্পদের তৃত্বীয়াংশের অসিয়ত করল এবং ঐ সময়ে মরে গেল, তখন সমস্ত তৃতীয়াংশ যায়েদের জন্য হবে। এবং যদি বলে যে আমার তৃতীয়াংশ মাল যায়েদ এবং ওমরের মধ্যে ভাগ। এবং যায়েদ মরে গেল তখন ওমরের জন্য তৃতীয়াংশের অর্ধেক হবে। এবং যে তৃতীয়াংশের অসিয়ত করল এবং তার কোনো সম্পদ নেই উহার পরে কিছু অর্জন করল, তখন অসিয়তকৃত ঐ সম্পদের তৃতীয়াংশের মালিক হবে, যার মালিক অসিয়তকারী মৃত্যুর সময় হতো।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কারো সন্তানের জন্য অসিয়ত করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاِذَا اَوْصٰى لِوَلَدِ فُلَانٍ الخ ঃ অর্থাৎ কেউ যদি অমুকের সন্তানের জন্য অসিয়ত করে, তাহলে তার পুত্র ও কন্যা সকলেই সমানভাবে উক্ত অসিয়ত হতে মালিক হবে ; নর ও নারী সকলকে সমান অংশ দিতে হবে। কেননা وَلَدٌ শব্দটি তাদের সকলকে শামিল করে। অপরদিকে শুধুমাত্র থাকলেও যদ্রূপ তারা পাবে। শুধু কন্যা থাকলে ও তদ্রূপ তারা পাবে। لِوَلَدِ فُلَانٍ অমুকের সন্তান বলে অসিয়ত করলে তার এক সন্তান থাকলে সে একাই গোটা অসিয়ত তথা এক তৃতীয়াংশ মাল পাবে। কিন্তু لِاَوْلَادِ فُلَانٍ অমুকের সন্তানগণের জন্য (বহুবচন দ্বারা) বললে এক সন্তান থাকলে অর্ধেক অসিয়ত পাবে। মিরাস ও অসিয়তের মধ্যে বহুবচন দ্বারা কমপক্ষে দু'জন উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

কারো ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ اَوْصٰى لِوَرَثَةِ فُلَانٍ الخ ঃ অর্থাৎ কেউ যদি অমুকের ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করে তাহলে তার ওয়ারিশদের মধ্যে উক্ত অসিয়তের মাল এ ভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে, যেন প্রত্যেক নর প্রত্যেক নারীর দ্বিগুণ পায়। উল্লেখ্য যে, যার জন্য অসিয়ত করেছে সে যদি অসিয়তকারীর পরে মারা যায় তাহলে অসিয়ত কার্যকর হবে। আর সে যদি অসিয়তকারীর পূর্বে মারা যায় তাহলে অসিয়ত বাতিল হয়ে যাবে।

كِتَابُ الْفَرَائِضِ
ফারায়েয পর্ব

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) ফরায়েয বা উত্তরাধিকার পর্বকে অসিয়ত পর্বের পর এজন্য এনেছেন যে, অসিয়ত হচ্ছে মানুষের মৃত্যুশয্যার কার্যক্রম আর ফরায়েয হচ্ছে মৃত্যুর পরের কার্যক্রম। – (আত্তানকীহুদ্ব দ্বরুরী)

ফরায়েয পর্বকে সর্বশেষ আনার কারণ ঃ মানুষের অবস্থা দু'টি (১) জীবন (২) মৃত্যু। কিতাবের প্রথম থেকে এ পর্যন্ত জীবিত থাকা অবস্থার বিধানবলী বর্ণনা করা হয়েছে এখন ফরায়েয পর্বে মৃত্যুর পরের বিধানবলী বর্ণনা করা হচ্ছে।

فَرَائِضْ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ শব্দটি فَرِيْضَةٌ শব্দের বহুবচন, এটা فَرْض শব্দ থেকে উৎপন্ন। فَرْض শব্দের আভিধানিক অর্থ–নির্দিষ্ট অংশ, পরিমাণ, বিচ্ছিন্ন করা, নির্দিষ্ট করা, অনুমান করা ইত্যাদি।

فَرَائِض নামকরণের কারণ ঃ ইলমে ফারায়েযে এ সকল অর্থ বিদ্যমান থাকার কারণে তাকে عِلْمُ الْفَرَائِضِ বলা হয়। فَرَائِضْ-এর আভিধানিক অর্থ বিনিময় ছাড়া কোনো কিছু দান করা, নির্দিষ্ট অংশ ইত্যাদি। عِلْمُ فَرَائِض -এর মধ্যে উল্লিখিত অর্থ সমূহের সমাবেশ ঘটার কারণে তাকে عِلْم فَرَائِضْ হিসেবে নামকরণ করা হয়েছে।

فَرَائِضْ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় ইলমে ফরায়েয বলা হয় –

اَلْفَرَائِضُ هُوَ عِلْمٌ بِقَوَاعِدَ وَجُزْئِيَّاتٌ مِنْ فِقْهٍ وَحِسَابٍ تُعْرَفُ بِهَا كَيْفِيَّةَ صَرْفِ التَّرِكَةِ اِلَى الْوَارِثِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهٖ .

অর্থাৎ ইলমে ফরায়েয ইসলামি আইন শাস্ত্র ও হিসাব শাস্ত্রের এ জাতীয় কিছু নিয়ম-কানুন এবং সূত্রাবলী জানার নাম যার দ্বারা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ তার উত্তরাধিকারীদের চিহ্নিত করে তাদের মাঝে বণ্টনের নিয়ম-পদ্ধতি জানা যায়। সাইয়্যেদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র.) বলেছেন– عِلْمُ الْفَرَائِضِ هُوَ عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهٖ كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ عَلٰى مُسْتَحِقِّيْهَا

অর্থাৎ ইলমে ফরায়েয এরূপ বিদ্যা যা দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পদ তার যথা প্রাপক উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টনের নিয়ম-কানুন জানা যায়।

ইলমে ফারায়েযের আলোচ্য বিষয় ঃ ইলমে ফরায়েযের আলোচ্য বিষয় হলো– اَلتَّرِكَةُ وَالْوَارِثُ অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ এবং তার উত্তরাধিকারীগণ। কারণ ইলমে ফরায়েযে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ ও তার উত্তরাধিকারীগণের বিভিন্ন অবস্থা নিয়েই আলোচনা করা হয়।

ইলমে ফরায়েযের উদ্দেশ্য ঃ ইলমে ফারায়েযের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো, উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গত ভাবে নিশ্চিতকরণ এবং তাদের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করে ইহলৌকিক শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তির পথ সুগম করা।

ইলমে ফরায়েযের বিধান ঃ এ পবিত্র ও অত্যাবশ্যকীয় ইলম শিক্ষা করা মুসলমানদের ওপর ফরজে কিফায়াহ। যার অর্থ হলো সমাজের সদস্যগণের মধ্য হতে কিছুসংখ্যক লোক তা শিক্ষা করলে তদ্বারা সমাজের সকলেই ফরজের দায়িত্ব হতে অব্যাহতি লাভ করবে; কিন্তু কেউ তা শিক্ষা না করলে সকলেই গুনাহগার হতে হবে।

ইলমে ফরায়েযের রোকন ঃ ইলমে ফারায়েযের রোকন তিনটি ঃ وَارِثٌ উত্তরাধিকারী বা মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের শরিয়ত নির্ধারিত হকদারগণ। مُوَرِّثٌ উত্তরাধিকার প্রদানকারী বা পরিত্যক্ত সম্পদ রেখে মৃত বরণকারী ব্যক্তি। উত্তরাধিকারীগণের প্রাপ্য হক। আর এ ইলমে ফারায়েযের জন্য তিনটি শর্ত ও রয়েছে। مُوَرِّثٌ তথা উত্তরাধিকার প্রদানকারী ব্যক্তির মৃত্যু চাই তা حَقِيْقِيْ (প্রকৃত) ও বাস্তব রূপে সংঘটিত মৃত্যু হোক। যেমন– সর্বজন বিদিত ও প্রকাশ্যভাবে সংঘটিত মৃত্যু কিংবা তা حُكْمِيْ বা বিধানগত মৃত্যু হোক যেমন দীর্ঘ দিন নিরুদ্দেশের কারণে তার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা না থাকার কারণে তাকে মৃত্যু বলে গণ্য করা। وَارِثٌ তথা উত্তরাধিকারী জীবন চাই তা বাস্তব কিংবা বিধানিক হোক যেমন গর্ভস্থিত সন্তানের জীবন। কারণ বাস্তবে জীবন রূপে স্বীকৃত না হলেও বিধানগতভাবে তাকেও জীবনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। وِرَاثَتٌ তথা উত্তরাধিকারীত্বের কারণ বা যোগসূত্র।

ইলমে ফারায়েযের গুরুত্ব ঃ ইলমে ফারায়েযের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় বিষয় আল্লাহ তা'আলা সুরায়ে নিসায় উত্তরাধিকারীগণের অংশ নির্ধারণ করে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। হাদীস শরীফেও প্রিয়নবী (সা.) এ ব্যাপারে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন– তিনি বলেছেন– اَلْفَرَائِضُ ثُلُثُ الدِّيْنِ وَاِنَّهَا اَوَّلُ سَيُرْفَعُ مِنَ الْعُلُوْمِ

অর্থাৎ ফরায়েয হলো দীনের এক-তৃতীয়াংশ এবং এটা প্রথম জ্ঞান যা ওঠিয়ে নেওয়া হবে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) অন্য হাদীসে বলেছেন- تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوْهَا النَّاسَ فَاِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ অর্থাৎ তোমরা ইলমে ফারায়েয শিক্ষা করো এবং মানুষকে তা শিক্ষা দাও কেননা এটা জ্ঞানের অর্ধেক। এ সকল বাণী দ্বারা ইলমে ফারায়েযের গুরুত্ব প্রতীয়মান হয়।

ইলমে ফরায়েযের সংকলন ঃ ইলমে ফারায়েয ইলমে ফিকহের একটি শাখা। তাই ইলমে ফিকহের সংকলনের সাথে সাথে ইলমে ফারায়েযের সংকলনও সুচিত হয়েছে। সুতরাং ইলমে ফিকহ এবং ইলমে ফারায়েযের সংকলনের কাল এক ও অভিন্ন। ইতিহাসে সাঈদ ইবনে যুবায়ের ইমাম শা'বী ফুকাহায়ে সাব'আ অর্থাৎ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, উরওয়া, ইবনে জুবায়ের, ইবনে আওয়াম, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক, খারেজা ইবনে যায়েদ ইবনে ছাবেত, ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতাবা ইবনে মাসউদ ইবনে সুলাইমান ইবনে ইয়াসার, আবূ সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব ও আবূ বকর ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে হারেছ ইবনে হিশাম প্রমুখের ইলমে ফারায়েযে পাণ্ডিত্যের খবর পাওয়া যায়।

ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর যুগে فَرَائِضُ اِبْنُ اَبِىْ لَيْلٰى এবং فَرَائِضُ اِبْنِ شُبْرُمَةَ-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইমাম মালিক ও ইমাম শাফেয়ী (র.)-এর শিষ্যদের মধ্যে كِتَابُ ثَوْرٍ এবং كِتَابُ الْكَرَابِيْسِىْ-এর আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কিতাব হলো আবুল আব্বাস ইবনে সাবাজী-এর কিতাব। এর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম কিতাব হলো মুহাম্মদ ইবনে নসর মারূযীর কিতাব যার সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন- كِتَابُنَا فِى الْفَرَائِضِ يَزِيْدُ عَلٰى اَلْفِ وَرَقَةٍ আল্লামা ইবনে সাবকী বলেন- هُوَ كِتَابُ بِلَيْلِ الْقَدْرِ لَامَزِيْدَ عَلٰى حُسْنِهٖ ধীরে ধীরে এ শাস্ত্রের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে সাথে সাথে রচিত হয় অগণিত গ্রন্থাবলী।

মৃতের সম্পত্তিতে হকদারগণের অংশ নির্ধারিত হওয়ার হিকমত ও রহস্য ঃ ইসলাম মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে এ জন্য হকদারগণের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত করে দিয়েছে যাতে হকদারগণের প্রাপ্য অংশ নির্ভেজাল ও নিষ্কন্টক থাকে। কেননা মৃতের আত্মীয় স্বজনদের অংশ নির্ধারিত না করে যদি আত্মীয়-স্বজন ও ওলীগণের মধ্যে হতে কোনো একজনের নিয়ন্ত্রণে সকল সম্পত্তির পূর্ণ এখতিয়ার দিয়ে দেওয়া হতো তাহলে এমন বহু ব্যক্তি রয়েছে যারা এই সম্পদকে ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যয় করত। নিজের আরাম আয়েশ ও স্বার্থের বাহিরে অন্যান্য হকদারদের ভরণ-পোষণ লালন-পালন ও তাদের প্রাপ্য হকের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করতো না। সে নিজেই সকল সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করতে আরম্ভ করতো। এমনকি যাবতীয় পরিত্যক্ত সম্পদই নিজের আরাম আয়েশের জন্য গ্রাস করে ফেলতো। কাজেই আল্লাহ তা'আলা এই অন্যায়কে প্রতিহত করার জন্য মৃতের সম্পদের প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্ধারিত ও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে এককভাবে কোনো ব্যক্তি অন্যান্য হকদারের অংশকে নিজের স্বার্থে গ্রাস করতে না পারে। হকদারগণ যেন নিজ নিজ অংশ অনুপাতে সম্পদ গ্রহণ করে স্বাধীনভাবে উহার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। কোনো কোনো এলাকায় এরূপ কুপ্রথা প্রচলিত রয়েছে যে, পিতার মৃত্যুর পর বড় পুত্রই পিতার সমুদয় সম্পদের মালিক হয় অন্যান্য হকদারগণ কেবল পোষ্য হিসাবে পেটে ভাতে দিন গুজরান করে। সুতরাং এ সকল লোকের অন্যায় আত্মসাতের ঘটনা সর্বদাই প্রত্যক্ষ করা যায়। আর এই পেটে ভাতের হকদারদের পক্ষে নিজেদের প্রাপ্য অংশ অতি সহজে ব্যবহার করার কোনো উপায় নেই, তাই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনের মিরাসের অংশ নির্ধারিত করার এই হেকমত বর্ণনা করেছেন যে, এটাতে মৃতের আত্মীয় স্বজনের হক নষ্ট হয়ে উহা দ্রুত নিঃশেষ হয় না। এরশাদ হয়েছে-

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَنِ وَالْاَقْرَبُوْنَ وَلِلنِّسَاۤءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْاَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرَ نَصِيْبًا مَفْرُوْضًا اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِىْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا. يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِىْ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ .

অর্থাৎ পুরুষদের জন্যও উহাতে অংশ রয়েছে, যা পিতা মাতা ও নিকটাত্মীয়গণ রেখে যায় এবং মহিলাদের জন্যও পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অংশ রয়েছে। চাই তা কম বা বেশি তার একটি পরিমাণ নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে। যারা এতিমগণের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা নিজেদের পেটে কেবল আগুনই পুরতেছে। অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এক পুত্র দুই কন্যার সমান অংশ পাবে, উক্ত আয়াতে এতিমদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ এই যে, বহু ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তি তার ছোট ছোট সন্তান রেখে যায়। আর মৃতের বড় ছেলে বা অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যাবতীয় সম্পদ কুক্ষিগত করে নেয়। তাই এরূপ আচরণকারীর প্রতি কঠোর ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। তা ছাড়া উপরোক্ত আয়াতে হকদারগণের অংশ বর্ণনার পূর্বেই يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য ফরজ করে দিয়েছেন। বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। যার আলোচনা পরে করা হবে। এটা তো হলো সম্পদের হকদার কল্যাণের দিক সম্পদের অংশ নির্ধারণের মাঝে খোদ সম্পদের কল্যাণ ও হেফাজতের দিকও রয়েছে। তা এই যে, বৃহৎ সম্পদের মধ্যেও বিভিন্ন অংশীদারগণের হক ও অংশ নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত হওয়া উহার হেফাজত ও স্থায়িত্বের কারণ হয়। কেননা প্রত্যেক অংশীদার স্বীয় নির্ধারিত অধিকার বা হকের কারণে এই যৌথ সম্পদের সার্বিক উন্নতির চেষ্টা করবে। সুতরাং যে সম্পদের হকদার যত বেশি হবে সেই অনুপাতে উহার স্থায়িত্ব লাভের কারণও হবে। অধিক এটা হলো যৌথ সম্পদের বেলায়। পক্ষান্তরে যদি সম্পদ বণ্টন করে নেয়। তাহলে প্রত্যেক অংশীদার নিজের স্বার্থেই উহার উন্নতির নিমিত্ত বিশেষ গ্রহণ করবে। যা এক ব্যক্তি মালিক ও অন্যান্য হকদারগণ, পোষ্য বা পেটে ভাতে শরিক থাকার ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব ছিল না। কারণ এমন কাজে কে পরিশ্রম করবে, যার লাভের সিংহভাগ যাবে অন্যের পকেটে। প্রতিটি ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে সম্পদের মালিকানা স্বত্বের অধিকারী হওয়ার উহা একটি উপকারিতা এখন মালিক হওয়ার পর কেউ যদি নিজের অংশের সম্পদ বিনষ্ট করে দেয় এ জন্য মিরাসের বিধানকে হেকমত পরিপন্থী মনে করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা তার অদক্ষতা ও অদূরদর্শিতাই তার সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী হবে। যদি এটাকে সম্পদ বণ্টনের পরিপন্থী হিসাবে গণ্য করা হয় তাহলে এটা শুধু মিরাস বণ্টনের বেলায়ই প্রয়োজ্য হবে কেন ? কোনো ব্যক্তি যদি তার উপার্জিত অর্থ সম্পদ বিনষ্ট করতে থাকে, তবে তার সকল সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে তার বড় ভাইয়ের হাতে সোপর্দ করে দেওয়া হবে না কেন ? তা ছাড়া এটা একটি স্বভাবগত বিষয় যে নিজের সম্পদ নিজের হাতে ধ্বংস করা ততটা পীড়াদায়ক হয় না যতটা পীড়াদায়ক হয় নিজের সম্পদ অপরের হাতে কুক্ষিগত থাকা অবস্থায় তার করুণার পাত্র হয়ে থাকার বেলায়। তবে কারও যদি রুচিবোধই বিনষ্ট হয়ে যায় তবে তার সম্পর্কে কিছুই বলার থাকে না।

উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টনের তাৎপর্য ঃ মিরাসের মৌলনীতির মধ্যে তিনটি বিষয়ের পূর্ণ স্থানে অপর কেউ তার স্থলাভিষিক্ত হওয়া। কেননা কোনো স্থলাভিষিক্ত রেখে যাওয়ার জন্য মানুষ খুবই সচেষ্ট থাকে। দুই, খেদমত, সেবা, সহমর্মিতা, মুহব্বত, প্রীতি ও শুভেচ্ছা এবং এ সম্বন্ধীয় বিষয়াদি। তিন, আত্মীয়তার সূত্র যা অপর দু'টি বিষয়কেও অর্ন্তভুক্ত রাখে। সুতরাং এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে তৃতীয়টিকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আর সামগ্রিকভাবে এ সকল কিছুর কেন্দ্রস্থল হলো সে ব্যক্তি যে বংশ সূত্রে গভীরভাবে আবদ্ধ। যেমন– পিতা, দাদা এবং পুত্র ও পৌত্র এরাই উত্তরাধিকারের সর্বাধিক হকদার। কিন্তু প্রকৃতিগত ভাবে সৃষ্টির আদিকাল হতে যুগ যুগ ধরে বিশ্বব্যাপী যে নিয়ম চলে আসছে তাতে পিতার পর পুত্রই তার স্থলাভিষিক্ত হয়। এটাই মানুষের ঐকান্তিক কামনা ও আকাঙ্ক্ষা থাকে এ জন্যই মানুষ বিবাহ শাদী করে এবং সন্তান লাভের চেষ্টা করে পিতা পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়া যেমন প্রকৃতির দাবি নয় তেমনি মানুষেরও এটা কাম্য নয়। এমনকি কাউকেও যদি তার সমস্ত সম্পদ নিজের ইচ্ছানুযায়ী বণ্টন করার অধিকার দেওয়া হয় তাহলে নিশ্চিতরূপেই তার অন্তরে পিতার চেয়ে পুত্রের প্রতিই সহমর্তিতা বেশি প্রাধান্য পাবে। এজন্য সকল মানুষেরই রীতি হচ্ছে– তারা সন্তানকে পিতার অপেক্ষা অগ্রবর্তী মনে করে পুত্রের পর মৃতের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার সম্ভবনা থাকে ভাইয়ের। অতঃপর পর্যায়ক্রমে তার বংশের মধ্যে শক্তি-সামর্থ্য ও সহায়তার দিক দিয়ে যে যত নিকটবর্তী হবে, সেই মৃতের স্থলাভিষিক্ত হবে।

খেদমত সেবা ও স্নেহের দিক দিয়ে সর্বাগ্রে যাদের প্রতি নজর পড়ে তারা হলো নিকটবর্তী মহিলা আত্মীয়গণ। এদের মধ্যেও খেদমত ও সেবায় সর্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য মাতা ও কন্যা অতঃপর বংশধারা অনুযায়ী যে যত বেশি ঘনিষ্ট। কন্যাও পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। অতঃপর ভগ্নি ও স্থলাভিষিক্ত হওয়ার অধিকার হতে বঞ্চিত নয়। অতঃপর নিষ্ঠাবান খাদেমা স্ত্রী। অতঃপর মা শরিক ভাই বোন, এ সকল মহিলাদের মধ্যে পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থলাভিষিক্ততা পাওয়া যায় না। কারণ অনেক সময় মহিলাদের বিবাহ ভিন্ন গোষ্ঠী ও বংশের মধ্যে হয়ে থাকে। সে তখন তাদের মধ্যে এই দায়িত্বশীলতা আংশিক হলেও পাওয়া যায়। অবশ্য সকল মহিলার মধ্যেই মহব্বত ও সহমর্মিতা বা আত্মীয়তার বন্ধন অবশ্য ; মহিলাদের মধ্যে পৃষ্ঠপোষকতা ও স্থলাভিষিক্ততা পাওয়া যায় না। কারণ অনেক সময় মহিলাদের বিবাহ ভিন্ন গোষ্ঠী ও বংশের মধ্যে হয়ে থাকে সে তখন তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে কন্যা ও ভগ্নী কিছুটা ব্যতিক্রম; কারণ তাদের মধ্যে এই দায়িত্বশীলতা আংশিক হলেও পাওয়া যায়। অবশ্য সকল মহিলার মধ্যেই মহব্বত ও সহমর্মিতা পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়। তবে এদের মধ্যে প্রথম স্থান হলো নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের যেমন– মাতা ও কন্যা অতঃপর ভগ্নী। আর প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ মৃতের স্থলাভিষিক্ততা পরিপূর্ণ রূপে পাওয়া যায় পিতা ও পুত্রের মধ্যে। অতঃপর ভাই ও চাচার মধ্যে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ স্নেহ ও ভালবাসা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় পিতা ও পুত্রের মধ্যে। অতঃপর আপন ভাই ও মা শরিক ভাইয়ের মধ্যে এই স্নেহ ভালবাসার উৎস হলো নিকটবর্তী আত্মীয়তার সর্পক, তাই চাচার জন্য যে হুকুম ফুফুর জন্য সে হুকুম নয়। কেননা মসিবতের সময় ফুফু ততটা সহায়ক হয় না, যতটা সহায়ক হয় চাচা ফুফু আত্মীয়তার দিক দিয়ে বোনের ও সমপর্যায়ের নয়।

মিরাসের মৌলনীতি হলো যখন পুরুষ ও মহিলা একই পর্যায়ে হয় তখন পুরুষকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কেননা ইজ্জত আব্রু তথা মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার দায়িত্ব পুরুষের। এর আরও একটি কারণ এই যে, পুরুষের ওপর অনেকের ভরণ পোষণের দায়িত্ব থাকে সুতরাং মৃতের সম্পদ লাভের জন্য সেই আগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। পক্ষান্তরে মহিলাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব থাকে তাদের স্বামী পিতা অথবা ভ্রাতার ওপর মিরাসের। আর একটি মৌলনীতি এই যে, যদি কোনো মৃতের একদল ওয়ারিশ থাকে এবং সকলে একই পর্যায়ের হয় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ তাদের সকলের মধ্যেই বণ্টন করা জরুরি। কেননা এখানে

একের ওপর অন্যের কোনো প্রাধান্য নেই। কিন্তু তাই ওয়ারিশগণের পর্যায় বিভিন্ন হলে তা দুই প্রকার হতে পারে। এক হয়তো তারা সকলেই একই নামের ও একই দিকের অন্তর্ভুক্ত হবে। যেমন- মাতা, নানী, দাদী, পরদাদী বা পিতা পিতার পিতা দাদা ও দাদার পিতা পরদাদা ইত্যাদি। এমতাবস্থায় নিয়ম হলো নিকটবর্তী ব্যক্তি দূরবর্তী ব্যক্তির জন্য প্রতিবন্ধক হয়ে তাকে মিরাস হতে বঞ্চিত করবে। দ্বিতীয় প্রকার এই যে, উত্তরাধিকার শাস্ত্রের পরিভাষায় ওয়ারিশগণের নাম ও দিক বিভিন্ন হবে। এমতাবস্থায় নিকটবর্তী ব্যক্তি দূরবর্তী ব্যক্তির জন্য প্রতিবন্ধক হবে। কিন্তু এই প্রতিবন্ধকতা দূরবর্তী ব্যক্তিকে মিরাস হতে বঞ্চিত করবে না বটে তবে তার অংশ কমিয়ে দেবে। মিরাসের আর একটি মূলনীতি রয়েছে তা এই যে, বণ্টনকৃত অংশগুলো ও উহার প্রতিটি হিস্যা এমন স্পষ্ট হতে পারে পণ্ডিত মূর্খ সকলেই যেন প্রথম দৃষ্টিতেই উহা বুঝে নিতে পারে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) তার এক পবিত্র বাণীর মাধ্যমে এই দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি এরশাদ করেন- অর্থাৎ আমরা উম্মি লোক আমরা লিখতেও জানি না এত বেশি হিসাব করতেও জানি না। এর কারণ সকল মানুষকে যে বিষয়টি পালনের নির্দেশ দেওয়া হবে উহা এমন হওয়া জরুরি যেন উহার হিসাব নিকাশের জন্য কোনো গভীর চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন না হয় এবং সাধারণ দৃষ্টিতেই যেন উহার কমবেশির ধারাবাহিকতা অবগত হওয়া যায়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা মিরাসের অংশ বণ্টন করার জন্য দুই প্রকারের সেহাম বা হিস্যা গ্রহণ করেছেন। দুই-তৃতীয়াংশ এক-তৃতীয়াংশ ও ষষ্ঠাংশ, অর্ধেক চতুর্থাংশ ও অষ্ঠমাংশ। কেননা এই প্রকারের হিস্যার মূল উৎস হলো প্রথম দু'টি সংখ্যা অর্থাৎ ২ও ৩ আর এগুলোর উভয় প্রকারের মধ্যে ৩ বার করে পাওয়া যায় অর্থাৎ ওপরের দিকে গেলে দ্বিগুণ হয় আর নিচের দিকে আসলে অর্ধেক হয়। এতে কমবেশি হওয়ার ব্যাপারটি সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও অনুভব যোগ্য।

فَرَائِضْ কিরূপে عِلْم-এর অর্ধাংশ ? প্রিয়নবী (সা.) ইলমে ফারায়েযের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকে ইঙ্গিত করে যে বাণী পেশ করেছেন তাতে একটি প্রশ্ন উথাপিত হতে পারে যে, কুরআন, হাদীস, ফিকহ, আকাইদ, উসূল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ দীনি ইলম বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ইলমে ফারায়েযকে ইসলামের অর্ধাংশ বলা কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে? এ প্রশ্নের একাধিক উত্তর রয়েছে। মানুষের দু'টি অবস্থা, একটি হলো জীবন; অন্যটি হলো মৃত্যু। সকল প্রকারের ইলম মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত শুধুমাত্র ইলমে ফরায়েয মৃত্যুর সাথে সম্পর্কিত। এ বিপরীতমুখী সম্পর্কে বিবেচনায় ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْم বা জ্ঞানের অর্ধাংশ বলা হয়েছে।

যে সকল উপায়ে মালিকানা বা স্বত্বাধিকার সাব্যস্ত হয় তা দুই প্রকার ঃ إِخْتِيَارِىْ বা ইচ্ছাধীন। যেমন- ক্রয় বিক্রয়, দান-হিবা, অসিয়ত ইত্যাদি। غَيْر إِخْتِيَارِىْ বা ইচ্ছাহীন নয়। যেমন উত্তরাধিকারী সূত্রে সাব্যস্ত মালিকানা উত্তরাধিকারী স্বত্ব মানব জাতির মৃত্যুর পর অনিচ্ছাকৃত সৃষ্টি হয়। এ হিসাবে ইলমে ফারায়েযকে দীনি জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়।

ইসলামি বিধান সম্পর্কিত নীতিমালা পবিত্র কুরআন-হাদীসের নসও কিয়াসের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়। আর ইলমে ফারায়েয সম্পর্কিত নীতিমালা শুধুমাত্র নস-এর মাধ্যমে সাব্যস্ত বা এ ক্ষেত্রে কিয়াসের কোনো ভূমিকা নেই, ইলমের উৎস বিবেচনায় ইলমে ফরায়েযকে نِصْفُ الْعِلْم বা ইলমের অর্ধাংশ বলা হয়েছে ।

ইলমে ফারায়েয শিক্ষা করার ফজিলত অন্যান্য ইলমের তুলনায় অনেক বেশি যেমন- ফিকহশাস্ত্রের একটি মাসআলা শিক্ষা করলে দশটি পুণ্য অর্জিত হয়। আর ফারায়েযের একটি মাসআলা শিক্ষা করলে একশতটি পুণ্য অর্জিত হয়। এ পুণ্যাধিক্য হিসাবে ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْم বা জ্ঞানের অর্ধেক বলা হয়েছে।

ইলমে ফারায়েযের প্রতি মানবকুলকে অধিক অনুপ্রাণিত করার নিমিত্তে প্রিয়নবী (সা.) ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْم বা জ্ঞানের অর্ধেক বলেছেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণীর প্রকৃত মর্ম আমাদরে বোধগম্য নয়, আর তা জানা আমাদের অপরিহার্যও নয়। মহানবী (সা.)-এর বাণীর নিগুঢ় রহস্য তিনিই ভাল জানেন; কেন তিনি ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْم বলেছেন তা তিনিই ভালো জানেন। আহলুস সালাসা নামক একটি জামাআত এ অভিমত পোষণ করেছেন।

ইলমে ফারায়েযের শাখা প্রশাখার আধিক্য হেতু প্রিয় নবী (সা.) ইলমে ফারায়েযকে نِصْفُ الْعِلْم বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ইলমে ফারায়েয শিক্ষা করা অধিক কষ্টদায়ক হিসাবে প্রিয়নবী (সা.) একে نِصْفُ الْعِلْم বলেছেন।

হযরত ইবনে সালাহ (র.) বলেন-نِصْفُ الْعِلْم দ্বারা সাধারণত ইলমের একটি অংশকে বুঝানো হয়েছে, সকল জ্ঞানের অর্ধাংশ নয়।

الْجَمْعُ عَلٰى تَوْرِيْثِهِمْ مِنَ الذُّكُوْرِ عَشَرَةٌ اَلْاِبْنُ وَابْنُ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفُلَ وَالْاَبُ وَالْجَدُّ وَاَبُو الْاَبِ وَاِنْ عَلَا وَالْاَخُ وَابْنُ الْاَخِ وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ وَالزَّوْجُ وَمَوْلَى النِّعْمَةِ وَمِنَ الْاِنَاثِ سَبْعٌ اَلْبِنْتُ وَبِنْتُ الْاِبْنِ وَالْاُمُّ وَالْجَدَّةُ وَالْاُخْتُ وَالزَّوْجَةُ وَمَوْلَاةُ النِّعْمَةِ وَلَا يَرِثُ اَرْبَعَةٌ اَلْمَمْلُوْكُ وَالْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُوْلِ وَالْمُرْتَدُّ وَاَهْلُ الْمِلَّتَيْنِ وَالْمَفْرُوْضُ الْمَحْدُوْدَةُ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى سِتَّةٌ اَلنِّصْفُ وَالرُّبُعُ وَالثُّمُنُ وَالثُّلُثَانِ وَالثُّلُثُ وَالسُّدُسُ وَالنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ اَلْبِنْتُ وَبِنْتُ الْاِبْنِ اِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ الصُّلْبِ وَالْاُخْتُ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَالْاُخْتُ لِاَبٍ اِذَا لَمْ تَكُنْ اُخْتٌ لِاَبٍ وَاُمٍّ وَالزَّوْجُ اِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ اِبْنٍ وَاِنْ سَفُلَ وَالرُّبُعُ لِلزَّوْجِ مَعَ الْوَلَدِ وَ وَلَدِ الْاِبْنِ وَاِنْ سَفُلَ وَلِلْمَرْاَةِ اِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا اِبْنٌ وَالثُّمُنُ لِلزَّوْجَاتِ مَعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ وَالثُّلُثَانِ لِكُلِّ اِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِمَّنْ فَرْضُهُ النِّصْفُ اِلَّا الزَّوْجَ وَالثُّلُثُ لِلْاُمِّ اِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلَا وَلَدُ اِبْنٍ وَلَا اِثْنَانِ مِنَ الْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ فَصَاعِدًا ـ

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ যারা উত্তরাধিকারী হওয়ার ওপর (সাহাবায়ে কেরামের) এজমা বা ঐকমত্য আছে তারা পুরুষদের মধ্য থেকে দশজন (১) পুত্র (২) পৌত্র, যদিও নিম্নতম হয় (৩) পিতা (৪) দাদা, যদিও ঊর্ধ্বতম হয় (৫) ভাই (৬) ভাতিজা (৭) চাচা (৮) চাচাতো ভাই (৯) স্বামী (১০) (মৃত ব্যক্তিকে) স্বাধীনকারী। এবং নারীদের মধ্য থেকে সাতজন (১) কন্যা (২) পৌত্রী (৩) মা (৪) দাদী (৫) বোন (৬) স্ত্রী (৭) স্বাধীনকারিনী নারী। আর চার ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হয় না। (১) কৃতদাস (২) হত্যাকারী নিহত ব্যক্তি থেকে উত্তরাধিকারী হয় না (৩) মোরতাদ বা ধর্মদ্রোহী (৪) ধর্মের ব্যাপারে বৈপরীত্ব। এবং ঐ অংশ যা আল্লাহর কিতাব তথা কুরআন শরীফে উত্তরাধিকারীদের জন্য নির্ধারিত আছে ছয়টি (১) অর্ধাংশ (২) চতুর্থাংশ (৩) অষ্টমাংশ (৪) দুই-তৃতীয়াংশ (৫) এক-তৃতীয়াংশ (৬) ষষ্ঠাংশ। অতএব অর্ধাংশ পাঁচ ব্যক্তির অংশ (১) কন্যা (২) পৌত্রী যখন ঔরসজাত কন্যা না থাকে (৩) সহোদর তথা আপন বোন (৪) বৈমাত্রেয়ী বোন যখন আপন বোন না থাকে (৫) এবং স্বামী যখন মৃতের পুত্র, কন্যা না তাকে এবং পৌত্রও না থাকে যদিও নিম্নতম হয়। আর চতুর্থাংশ স্বামীর জন্য, পুত্র বা পৌত্রের সাথে যদিও নিম্নতম হয় এবং স্ত্রীর জন্য, যখন মৃতের পুত্র এবং পৌত্র না থাকে। এবং অষ্টমাংশ স্ত্রীর জন্য, পুত্র বা পৌত্রের সাথে আর দু'তৃতীয়াংশ ঐ সব লোকদের মধ্যে প্রত্যেক দুই বা ততোধিকের জন্য যাদের অংশ অর্ধাংশ শুধু স্বামী ব্যতীত। এবং তৃতীয়াংশ মায়ের জন্য, যখন মৃতের পুত্র না থাকে এবং পৌত্র না থাকে। আবার দুই বা ততোধিক ভাই বোনও না থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

একজন মাত্র কন্যা থাকলে অর্ধাংশ পাওয়ার কারণ ঃ

قَوْلُهُ وَالنِّصْفُ فَرْضُ الخ ঃ মৃত ব্যক্তির একজন মাত্র কন্যা থাকলে মিরাসের অর্ধেক অংশ পাওয়ার কারণ এই যে, মৃতের যদি একমাত্র পুত্র থাকে তাহলে সমস্ত সম্পদই সে পায়। সুতরাং لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ অর্থাৎ পুরুষের জন্য দু'জন নারীর সমান অংশ হবে। এই আয়াতের মর্মানুযায়ী ওয়ারিশ একমাত্র কন্যা হলে সে মিরাসের অর্ধেক অংশের অধিকারিণী হবে।

স্বামী মৃত স্ত্রীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক কখন পাবে?

قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ إِذَا لَمْ يَكُنْ الخ ঃ স্ত্রীর সন্তান না থাকলে স্বামী তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধেক এবং সন্তান থাকলে এক-চতুর্থাংশ পাওয়ার এবং স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদে স্ত্রী এক-চতুর্থাংশ, সন্তান থাকলে অষ্টমাংশ পাওয়ার কারণ, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন–

وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ -

অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের ত্যাজ্য সম্পত্তির অর্ধেক পাবে, যদি তাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের সন্তান থাকে তবে তোমরা স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে, তাদের অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর।

আল্লাহ তা'আলা আরো এরশাদ করেন–

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ -

অর্থাৎ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ পাবে যদি তোমাদের কোনো সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের সন্তান থাকে, তবে তারা তোমাদের ত্যাজ্য সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে, তোমাদের কৃত অসিয়ত ও ঋণ আদায়ের পর।

স্বামী মৃত স্ত্রীর সম্পত্তিতে এ জন্য অংশ পায় যে, স্ত্রী ও তার সম্পদ স্বামীর অধিকারে থাকে। সুতরাং সকল সম্পত্তিই যদি তার অধিকার হতে বের করে নেওয়া হয়, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আর স্ত্রী স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তিতে অংশ পায় তার খেদমত, সমবেদনা ও মহব্বতের বিনিময়ে। তাই অংশ প্রাপ্তির বেলায়ও স্বামীকে স্ত্রীর ওপর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন– اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ অর্থাৎ "পুরুষগণ নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল।" এখানে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক মিরাসের অংশ প্রাপ্তির বেলায় লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এতে যেন সন্তানদের ওপর কোনো প্রভাব না পড়ে। তাই সঙ্গতিপূর্ণ পার্থক্য রেখে অংশ নির্ধারণ করা হয়েছে।

দু'বা অধিক কন্যা সন্তানের দু'তৃতীয়াংশ সম্পদ পাওয়ার রহস্য ঃ

قَوْلُهُ وَالثُّلُثَانِ لِكُلِّ اِثْنَيْنِ الخ ঃ দু'কন্যা থাকলে তারা সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ এজন্য পায় যে, যদি কন্যার সঙ্গে পুত্র থাকতো তাহলে এই কন্যা সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ পেত, তাই দ্বিতীয় কন্যা থাকার কারণে তার অংশও অবশ্যই এক-তৃতীয়াংশের কম হওয়া উচিত নয়। অতএব এই নিয়মটিই অপর কন্যার জন্য কার্যকর হবে। কেননা কন্যাদের জন্য দুই-তৃতীয়াংশের অধিক অংশ নিধারিত হয়নি। যদি কন্যার সংখ্যা অধিক হয় তবুও সকলে এই দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতেই শরিক হবে।

মৃতের মাতা এবং ভাই বোন থাকলে মাতার ষষ্ঠাংশ প্রাপ্তির কারণ যদি মৃতের মাতা ও ভাই বোন মৃতের ওয়ারিশ হয় এবং ভাই বোন একাধিক থাকে তাহলে মাতাকে ষষ্ঠাংশ দেওয়া হবে। কেননা এই ভাই বোন আসাবা নয় বরং অন্য পর্যায়ে আসাবা বিদ্যমান এমতাবস্থায় যেহেতু আসাবিয়্যাত বা স্থলাভিষিক্ততা এবং স্নেহ মহব্বত পরস্পর সমপর্যায়ের নয়। সুতরাং সম্পত্তির অর্ধেক আসাবাদেরকে আর অর্ধেক স্নেহ ও মহব্বত ওয়ালাদেরকে দেওয়া হবে। অতঃপর স্নেহ ও মহব্বতের কারণে প্রাপ্ত

অংশটি মাতা এবং মৃতের ভাই বোনের মধ্যে বণ্টন করা হবে। আর মায়ের অংশ যেহেতু ষষ্ঠাংশের কম হয় না তাই ষষ্ঠাংশ মাতাকে দিতে হবে। অবশিষ্ট অংশ মৃতের ভাই বোনকে দেওয়া হবে। অবশ্য এই ভাই বোনেরা যদি আসাবা-এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে এদের মধ্যে নিকটাত্মীয়তা ও সাহায্য সহায়তা অর্থাৎ মিরাস প্রাপ্তির উভয় কারণ মিলিত হবে। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের সাথে অন্যান্য আরও ওয়ারিশ থাকে যেমন– কন্যা, পুত্র, স্বামী। সুতরাং যদি মাতাকে ষষ্ঠাংশের বেশি দেওয়া হয় তাহলে অন্যদের অংশের পরিমাণ খুবই কমে যাবে।

মৃতের সন্তান থাকলে তার মাতা পিতারা প্রত্যেকের জন্য ষষ্ঠাংশ নির্ধারিত হওয়ার কারণ, আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ اِنْ كَانَ لَهٗ وَلَدٌ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ وَلَدٌ وَوَرِثَهٗ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ ـ فَاِنْ كَانَ لَهٗ اِخْوَةٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ ـ

অর্থাৎ মৃতের পরিত্যক্ত সম্পদ হতে মৃতের মাতা পিতা প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ করে পাবে, যদি মৃতের কোনো সন্তান থাকে। আর যদি মৃতের সন্তান না থাকে এবং মাতা পিতা ওয়ারিশ হয় তবে মৃতের মাতা মিরাসের এক-তৃতীয়াংশ পাবে। আর যদি মৃতের ভাই বিদ্যমান থাকে তবে মৃতব্যক্তির মাতা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে।

এখন পাঠকের সামনে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, মাতাপিতার তুলনায় সন্তান-সন্ততিগণ মিরাস পাওয়ার বেশি হকদার। তাই মৃতের সন্তানদেরকে তার পরিত্যক্ত সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ এবং তার মাতাপিতাকে এক-তৃতীয়াংশ সম্পত্তি দেওয়া হবে, যাতে এ কথা প্রকাশ পায় যে, সন্তান অধিক হকদার। অপর পক্ষে পিতার অংশ মাতার প্রাপ্য অংশ অপেক্ষা অধিক না হওয়ার কারণ এই যে, পুত্রের স্থলাভিষিক্ত হওয়া এবং তার সহায়ক হিসাবে একবার পিতাকে আসাবার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই অংশ দ্বিগুণ পাওয়ার ব্যাপারে দ্বিতীয়বার তার উক্ত মর্যাদা গ্রহণযোগ্য হবে না।

وَيُفْرَضُ لَهَا فِى مَسْئَلَتَيْنِ ثُلُثُ وَهُمَا زَوْجٌ وَابَوانِ وَامْرَأَةٌ وَابَوانِ فَلَهَا ثُلُثُ مَابَقِىَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ اَوِ الزَّوْجَةِ وَهُوَ لِكُلِّ اِثْنَيْنِ فَصَاعِدًا مِنْ وَلَدِ الْاُمِّ ذُكُوْرُهُمْ وَاُنَاثُهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ وَالسُّدُسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْاَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ وَهُوَ لِلْاُمِّ مَعَ الْاِخْوَةِ وَهُوَ لِلْجَدَّاتِ وَالْجَدِّ مَعَ الْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ وَلِبَنَاتِ الْاِبْنِ مَعَ الْبِنْتِ وَلِلْاَخَوَاتِ لِلْاَبِ مَعَ الْاُخْتِ لِلْاَبِ وَالْاُمِّ وَلِلْوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ الْاُمِّ وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالْاُمِّ وَالْجَدِّ وَالْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ بِالْاَبِ وَيَسْقُطُ وَلَدًا لِاُمٍّ بِاَرْبَعَةٍ بِالْوَلَدِ وَ وَلَدِا لْاِبْنِ وَالْاَبِ وَالْجَدِّ وَاِذَا اسْتَكْمَلَتِ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَتْ بَنَاتُ الْاِبْنِ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ بِاِزَائِهِنَّ اَوْ اَسْفَلَ مِنْهُنَّ ابْنُ ابْنٍ فَيُعَصِّبُهُنَّ وَاِذَا اسْتَكْمَلَ الْاَخَوَاتُ لِاَبٍ وَاُمٍّ الثُّلُثَيْنِ سَقَطَتِ الْاَخَوَاتُ لِاَبٍ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَعَهُنَّ اَخٌ لَهُنَّ فَيُعَصِّبُهُنَّ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং মায়ের জন্য দুই মাসআলার মধ্যে অবশিষ্টের তৃতীয়াংশ নির্ধারিত করা যায়, আর উহা এই যে, যখন স্বামী আর পিতামাতা থাকে বা স্ত্রী এবং পিতামাতা থাকে, অতএব মা উহার তৃতীয়াংশ পাবে যা স্বামী বা স্ত্রীর অংশের পর অবশিষ্ট থাকে। আর তৃতীয়াংশ প্রত্যেক দুই বা ততোধিকের জন্য বৈপিত্রেয় ভাই বোনদের থেকে যাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীগণ সমান, এবং ষষ্ঠাংশ সাত ব্যক্তির অংশ। পিতামাতার মধ্য থেকে প্রত্যেকের জন্য পুত্র বা পৌত্রের সাথে, মায়ের জন্য ভাইদের সাথে এবং দাদীগণ ও দাদার জন্য পুত্র বা পৌত্রের সাথে এবং পৌত্রীদের জন্য কন্যার সাথে, এবং বৈমাত্রেয়ী বোনদের একজন সহোদর বোনের সাথে এবং একজন বৈপিত্রেয় বোনের জন্য। এবং দাদীগণ মায়ের কারণে বাদ হয়ে যায়, আর দাদা, ভাই বোন চার উত্তরাধিকারদের কারণে বাদ হয়ে যায় অর্থাৎ পুত্র পৌত্র, পিতা ও দাদার কারণে। আর যখন কন্যারা পূর্ণ দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে যায় তখন পৌত্রীর বাদ হয়ে যায়। হ্যাঁ, যদি তাদের সমকক্ষ বা নিচে পৌত্র থাকে তখন তারা পৌত্রীদেরকে আসাবা করে দেয়। আর যখন সাহোদর বোনেরা পূর্ণ দুই-তৃতীয়াংশ নেয় তখন বৈমাত্রেয়ী বোনেরা বাদ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, যদি তার সাথে তার ভাই থাকে সে তাকে আসাবা করে দিবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ مَعَ الْوَلَدِ وَ وَلَدِ الْاِبْنِ الخ ঃ কারণ আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন– وَلِاَبَوَيْهِ لِكُلِّ مِنْهُمَا السُّدُسُ (الْاٰيَةُ) এ আয়াত প্রমাণ করে যে, সন্তানের সাথে পিতার হক ষষ্ঠাংশ কিন্তু وَلَدٌ শব্দ ইহা পুত্র কন্যা উভয়কেই শামিল করবে। সুতরাং যদি পিতার সাথে পুত্র থাকে তখন পিতার জন্য ষষ্ঠাংশ আর বাদ বাকি পুত্রের জন্য। এর প্রমাণ হুযুর (সা.)-এর বাণী– اَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ لِاَهْلِهَا فَمَا اَبْقَتْهُ فَلِاَوْلٰى رَجُلٍ ذَكَرٍ আর যদি বাপের সাথে কন্যা থাকে তখন পিতার জন্য ষষ্ঠাংশ এবং কন্যার জন্য অর্ধাংশ আর অবশিষ্ট বাপের জন্য।

এ পর্বের কতিপয় শব্দের বিশ্লেষণ ঃ এ পর্বে কোনো স্থানে আছে- اَلْفَرَائِضُ আবার কোনো স্থানে আছে يَفْرِضُ আবার কোনো স্থানে আসবে فَرْضُ الزَّوْجِ কোনো স্থানে আছে فَرْضُ سَبْعَةٍ কোনো স্থানে আছে فَرْضُ الْبَنَاتِ কোনো স্থানে فَرْضُ ذَوِى السِّهَامِ কোনো স্থানে حِسَابُ الْفَرَائِضِ এ ছাড়া ফারায়েয শাস্ত্রের আরো কতিপয় পরিভাষা ও শব্দের বিশ্লেষণ এই ঃ

اَلْفَرَائِضُ এটা فَرِيْضَةٌ শব্দের বহুবচন। فَرِيْضَةٌ শব্দটি فَرْضٌ ক্রিয়ামূল থেকে গঠিত اِسْمُ مَفْعُوْلٍ-এর সীগাহ। এর অর্থ- অপরিহার্যকৃত বস্তু, নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্ধারিত হিস্যা, কোনো বস্তুর পরিমিত অংশ। عِلْمُ الْفَرَائِضِ-এর মধ্যে উল্লিখিত ভাবার্থ فَرَائِضُ শব্দের উপরোক্ত অর্থসমূহ উদ্দেশ্য। কেননা আলোচ্য শাস্ত্রের মধ্যে فَرَائِضُ শব্দ দ্বারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ঐ সব অংশকে বুঝানো হয়েছে যেগুলো উত্তরাধিকারীগণ মৃত ব্যক্তির ত্যাজ্য সম্পদ থেকে অনিবার্যরূপে প্রাপ্ত হয়ে থাকে। উত্তরাধিকারীত্বমূলক অংশসমূহের জ্ঞান লাভ করা যায়।

ذَوِى الْفُرُوْضِ ও اَصْحَابُ الْفُرُوْضِ শব্দটি ঃ فُرُوْضٌ শব্দটি فَرْضٌ-এর বহুবচন। এটি একটি মাসদার, কিন্তু مَفْرُوْضٌ অর্থে- গৃহীত। অর্থাৎ ঐ হিস্যা যা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। অতঃপর ذَوِى الْفُرُوْضِ ঐ সব উত্তরাধিকারীকে বলে যাদের পক্ষে মহান আল্লাহ কুরআন কারীমে পূর্ব পুরুষের ত্যাজ্য সম্পদ থেকে স্ব-স্ব হিস্যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

اَلْمَحْدُوْدَةُ فِىْ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى ঃ আল্লাহর কুরআন নির্ধারিত অংশ ছয়টি – (১) অর্ধেক, $\frac{১}{২}$ (২) এক-চতুর্থাংশ $\frac{১}{৪}$ (৩) এক-অষ্টমাংশ, $\frac{১}{৮}$ (৪) দুই তৃতীয়াংশ $\frac{২}{৩}$ (৫) এক তৃতীয়াংশ $\frac{১}{৩}$ এবং এক ষষ্ঠাংশ $\frac{১}{৬}$।

مُسْتَحِقِّهَا ঃ তথা ছয়টি অংশের অধিকারীদের সংখ্যা মোট ১২ জন লোক। তন্মধ্যে ৪ জন পুরুষ। তাঁরা হলেন (১) পিতা, (২) পিতামহ, (৩) বৈপিত্রেয় ভাই এবং (৪) স্বামী। আর ৮ জন স্ত্রীলোক, তাঁরা হলেন (১) স্ত্রী, (২) কন্যা, (৩) পুত্রের কন্যা যত নিম্নে হোকনা কেন, (৪) সহোদরা ভগ্নি, (৫) বৈমাত্রেয় ভগ্নি, (৬) বৈপিত্রেয় ভগ্নি, (৭) মাতা এবং (৮) মাতামহী।

قَوْلُهٗ فَيُعَصِّبُهُنَّ ঃ এ শব্দটি عَصَبَةٌ শব্দ থেকে গৃহীত, عِلْمُ الْفَرَائِضِ -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, শিরা, উপশিরা, রক্ত ধমনি। عِلْمُ الْفَرَائِضِ-এর পরিভাষায় আল-আসাব বলা হয়, মৃত ব্যক্তির ঐ সব আত্মীয়কে যাদের সাথে মৃতের সরাসরি রক্ত সম্পর্ক রয়েছে এবং যারা কুরআনে উল্লিখিত হিস্যা বণ্টনের পর সমুদয় সম্পদের অধিকারী হয়। যেমন– পুত্র, কন্যা। আসাবা দু'শ্রেণীতে বিন্যস্ত একটি বংশগত আসাবা, আরেকটি কারণগত আসাবা। কারণগত আসাবা যেমন– ক্রীতদাস-দাসীর মুক্তিদাতা।

بَابُ الْعَصَبَاتِ

আসাবা অধ্যায়

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) আসাবা অধ্যায়কে ফারায়েয পর্বের মধ্যে আনার যোগসূত্র প্রকাশ্য, কারণ আসাবাগণও মাইয়্যেতের সম্পদের মালিক হয়। হ্যাঁ সম্পদ বণ্টন করার বিন্যাসে সর্ব প্রথম اَصْحَابُ الْفَرَائِضِ তাই প্রথমে তাদের বর্ণনার পর এখন عَصَبَةٌ -এর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন।

عَصَبَةٌ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ عَصَبَةٌ -এর বহুবচন হচ্ছে– عَصَبَةٌ . عَصَبَاتٌ এর আভিধানিক অর্থ– রগ, শিরা, ধমনি-রক্তধমনি, উপশিরা।

عَصَبَةٌ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরিয়তের পরিভাষায় عَصَبَةٌ বলা হয় ঐ ব্যক্তিকে যে কারো রক্ত মাংসে শরিক হয় ঐ ব্যক্তি কোনো কাজে দুর্নাম হলে বংশের লোকেরাও দুর্নাম হয়। অর্থাৎ নিজ রক্ত সম্পর্কীয় লোককদেরকে عَصَبَةٌ বলা হয়। কেউ কেউ বলেন, ফরায়েযের পরিভাষায় ঐ সকল আত্মীয়দেরকে عَصَبَةٌ বলা হয়, যারা মৃত ব্যক্তির রক্ত মাংসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। কেননা সন্তান-সন্ততিদেরকে পিতার বলা হয়ে থাকে। সুতরাং নিজের কন্যা বা বোন বা ফুফুর সন্তানদেরকে عَصَبَةٌ বলা হয় না, বরং নিজের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রি এবং ভাই, ভাইয়ের পুত্র ও চাচা জেঠা এবং তাদের পুত্র এবং পিতা দাদা ইত্যাদিকে عَصَبَةٌ বলা হয়।

عَصَبَةٌ-এর প্রকারভেদ ঃ আসাবা দু'প্রকার ঃ (১) আসাবায়ে সবব অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি যিনি অন্যকে স্বাধীন করে দিয়েছেন। তাকে আসাবায়ে সববী বলা হয়। (২) আসাবায়ে নসবী অর্থাৎ রক্ত সম্পর্কযুক্ত আসাবা।

আসাবায়ে নসবী তিন প্রকার ঃ আসাবা বিনাফসিহী অর্থাৎ স্বয়ং আসাবা হওয়া অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির ঐ আত্মীয় পুরুষ যিনি কোনো মহিলার মধ্যস্থতায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয় নয় যেমন– মৃত ব্যক্তির বংশের পুরুষ সন্তান-সন্তুতি এবং মৃত ব্যক্তির পিতার বংশের পুরুষ সন্তানাদি এবং মৃত ব্যক্তির দাদার বংশের পুরুষ সন্তানাদি এবং মৃত ব্যক্তির পিতা, দাদা, পরদাদা ইত্যাদি।

আসাবা সম্পর্কে নীতি হলো এই যে, আসাবাদের মধ্যে যিনি মৃত ব্যক্তির বেশি নিকটতম তিনি অন্যান্যদের থেকে অগ্রগামী, অর্থাৎ নিকটতম আসাবার জীবিত অবস্থায় অন্যান্য আসাবাগণ পরিত্যক্ত সম্পদ হতে বঞ্চিত হবে। যেমন– মৃত ব্যক্তির পুত্র মৃত ব্যক্তির বেশি নিকটতম। এ জন্য পুত্র জীবিত থাকা অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পৌত্র, প্রপৌত্র ভাই, চাচা, জেঠা, পিতা, দাদা কেউ আসাবা হবে না। যদি পুত্র জীবিত না থাকে তাহলে প্রপৌত্র আসাবা হবে। এভাবে নীতি নিম্নের দিকে যাবে। যদি মৃত ব্যক্তির বংশধরের মধ্যে কোনো পুরুষ জীবিত না থাকে তাহলে পিতা আসাবা হবে। আর যদি বাপ না থাকে তাহলে দাদা আসাবা হবে। আর দাদা না থাকলে পরদাদা আসাবা হবে। এভাবে এমনিভাবে নীতি দ্বারা ওপরের দিকে যাবে। যদি মৃত ব্যক্তির পিতা দাদা কেউ জীবিত না থাকে তাহলে ভাই আসাবা হবে। কিন্তু সহোদরা ভাই বৈমাত্রেয় ভাই হতে অগ্রগামী। সুতরাং যদি সহোদরা ভাই জীবিত তাকে তাহলে বৈমাত্রেয় ভাই আসাবা হবে না। যখন সহোদরা ভাই জীবিত না থাকে তখন বৈমাত্রেয় ভাই আসাবা হবে। অতঃপর তার পুরুষ সন্তানাদি আসাবা হবে সহোদরা ভাইয়ের সন্তানাদি বৈমাত্রেয় ভাইয়ের সন্তানাদির ওপর অগ্রগামী। যদি তাদের মধ্যে কেউ জীবিত না থাকে তাহলে প্রকৃত চাচা বা জেঠা আসাবা হবে। যদি তাদের মধ্যে কেউ জীবিত না থাকে তাহলে বৈমাত্রেয় চাচাগণ আসাবা হবে। অতঃপর তার পুরুষ সন্তানাদি আর বৈপিত্রেয় ভাই এবং তার পুরুষ সন্তানাদি আসাবার মধ্যে শামিল নয়।

আসাবা বিগাইরিহী অর্থাৎ কেউ যদি আসাবা হওয়ার ব্যাপারে নিজে যথেষ্ট নয় বরং অন্যের মুখাপেক্ষী হয়।

আসাবা মা আ'আ গাইরিহী অর্থাৎ যদি কেউ আসাবা হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যের মুখাপেক্ষী হয় কিন্তু যার মুখাপেক্ষী হলো সে নিজে আসাবা না হয় তাহলে তাকে আসাবা মা'আ গাইরিহী বলা হয়।

وَاَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الْبَنُوْنَ ثُمَّ بَنُوْهُمْ ثُمَّ الْاَبُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ بَنُو الْاَبِ وَهُمُ الْاِخْوَةُ ثُمَّ بَنُو الْجَدِّ وَهُمُ الْاَعْمَامُ ثُمَّ بَنُوْ اَبِ الْجَدِّ وَاِذَا اسْتَوٰى بَنُوْ اَبٍ فِىْ دَرَجَةٍ فَاَوْلٰهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ اَبٍ وَاُمٍّ وَالْاِبْنُ وَاِبْنُ الْاِبْنِ وَالْاِخْوَةُ يُقَاسِمُوْنَ اَخَوَاتِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْعَصَبَاتِ يَنْفَرِدُ بِالْمِيْرَاثِ ذُكُوْرُهُمْ دُوْنَ اُنَاثِهِمْ وَاِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَالْعَصَبَةُ هُوَ الْمَوْلٰى الْمُعْتِقِ ثُمَّ الْاَقْرَبُ فَالْاَقْرَبُ مِنْ عَصَبَةِ الْمَوْلٰى -

সরল অনুবাদ ঃ আসাবাগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিকটতম ছেলে, তারপর পৌত্র, এরপর পিতা অতঃপর দাদা এরপর পিতার ছেলে অর্থাৎ ভাই, তারপর দাদার ছেলে অর্থাৎ চাচা, এরপর দাদার বাপের ছেলে। আর যখন পিতার ছেলে মর্তবায় সমান হয় তখন বেশি অগ্রাধিকার ঐ ভাইয়ের যে পিতা-মাতা উভয়ের দিক থেকে হয়। পুত্র, পৌত্র এবং ভাই স্বীয় বোনদের সাথে পরস্পর ভাগ করে নেয় অর্থাৎ পুরুষদের জন্য দু'নারীর অংশের সমান আর এরা ছাড়া অন্যান্য আসাবা উত্তরাধিকার পাওয়ার মধ্যে তাদের পুরুষ একা, তাদের নারীরা নয়। এবং যখন মৃতের বংশীয় আসাবা না থাকে তবে মুক্তকারী মনিব আসাবা হয়ে থাকে। এরপর মনিবের আসাবাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি নিকটে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَاَقْرَبُ الْعَصَبَاتِ الخ ঃ عَصَبَاتٌ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন عَصَبَةٌ আর عَصَبَةٌ ;শব্দটি عَاصِبٌ এর বহুবচন যেমন- طَلَبَةٌ শব্দটি طَالِبٌ -এর বহুবচন। এর مَصْدَرٌ ব্যবহৃত হয় ; عَصُوْبَةٌ এর অর্থ- জোড়া, টুকরা, নেতা। আর عَصَبَةٌ -এর শাব্দিক অর্থ- শিরা, উপশিরা, রগ, রক্তধমনি, এখানে এসব অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এখানে عَصَبَةٌ বলে ঐসব আত্মীয়দেরকে বুঝানো হয়েছে যারা কুরআনে কারীমে উল্লিখিত হিস্যা বণ্টনের পর সমুদয় সম্পদের অধিকারী হয়, অর্থাৎ যেসব উত্তরাধিকারীদের সাথে মৃতব্যক্তির সরাসরি রক্ত সম্পর্ক রয়েছে। যেমন– পুত্র, কন্যা পৌত্র, প্রপৌত্র, ভাই ভ্রাতুষ্পুত্র, চাচা, জেঠা, চাচাতো ভাই, জেঠাতো ভাই, পিতা, দাদা, দাদামহ এমনিভাবে উপরোক্ত দাদাগণ। কেননা তাদের মধ্যস্থতায় আল্লাহ তা'আলা পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্রদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

আসাবা-এর বিন্যাস ঃ উপরোক্ত বাক্যে اَقْرَبُ الخ-এর অর্থ হলো, আত্মীয়তার দিক দিয়ে যে যত বেশি নিকটতম, তাকে উত্তরাধিকারীত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সন্তানাদির নৈকট্য পিতার চেয়ে বেশি, এ জন্য একে মৃত ব্যক্তির অংশ বলে আসাবা ওয়ারিশী প্রাপ্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পুত্রের নৈকট্য পিতার মোকাবেলায় শরিয়তের দৃষ্টিতেও অপেক্ষাকৃত বেশি। কেননা কুরআনে পিতার অংশ ছেলের উপস্থিতিতে এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো অবশিষ্ট সম্পদ পুত্রই পাবে। শরিয়তের দৃষ্টিতেও অপেক্ষাকৃত বেশি। কেননা কুরআনে পিতার অংশ ছেলের উপস্থিতিতে এক-ষষ্ঠাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হলো অবশিষ্ট সম্পদ পুত্রই পাবে।

قَوْلُهُ الْبَنُوْنَ الخ ঃ بَنُوْنَ শব্দটি اِبْنٌ -এর বহুবচন অর্থ- পুত্রগণ। লেখক اَلْبَنُوْنَ এ জন্য বলেছেন। যে, কন্যাগণ প্রথমত আসাবা হয় না, যদিও তারা আসাবা হয় কিন্তু তাও ভাইদের কারণে হয়ে থাকে।

قَوْلُهُ اَلْاَبُ শব্দটির অর্থ- পিতা। এটা একবচন, বহুবচনে اٰبَاءٌ আসে। পুত্রদের অবর্তমানে পিতাই নিতান্ত নিকটবর্তী এবং পিতার অবর্তমানে পিতামহ এবং তার অনুপস্থিতে প্রপিতামহ এমনভাবে উপরোক্ত দাদাগণ। কেননা তাদের মধ্যস্থতায় আল্লাহ তা'আলা পুত্র, পৌত্র প্রপৌত্রদের পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন।

قَوْلُهُ ثُمَّ الْجَدُّ ثُمَّ بَنُو الْجَدِّ الخ ঃ আসাবা হওয়ার ক্ষেত্রে দাদা ভাইদের অপক্ষো অগ্রাধিকারী এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর মত। এর ওপরই ফতোয়া। তাই গ্রন্থকার দাদাকে ভাইদের ওপর অগ্রাধিকারী বলার সময় মতপার্থক্যের কথা উল্লেখ করেননি। মৃতের ভাই ভ্রাতুষ্পুত্র এবং ভাইয়ের পৌত্র প্রপৌত্র প্রমুখ মৃত ব্যক্তির আসাবা হয় (১) পুত্রত্বের মধ্যস্থতা ব্যতীত, যেমন- পুত্র, আর পুত্রত্বের মধ্যস্থাতায়, যেমন- পৌত্র, প্রপৌত্র ইত্যাদি (২) পিতৃত্বের মধ্যস্থতা ব্যতীত, যথা- পিতা আর পিতৃত্বের মাধ্যমে, যথা- পিতামহ, প্রপিতামহ ইত্যাদি (৩) ভগ্নির মধ্যস্থতায় এবং তার অধঃস্তনদের দ্বারা। (৪) চাচার মাধ্যমে এবং তার অধঃস্তনদের দ্বারা অংশ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উপরোক্ত ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। তবে স্বতন্ত্র আসাবা হওয়ার জন্য পুরুষ হওয়া আবশ্যক। অবশ্য সহোদরা ভগ্নির নৈকট্য বৈমাত্রেয় ভাইয়ের নৈকট্য হতে শক্তিশালী বিধায় এই বোন অপরের সঙ্গে আসাবা হওয়ার ক্ষেত্রেও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের ওপর প্রাধান্য পাবে।

وَاِذَا لَمْ يَكُنْ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ الخ ঃ এখান থেকে গ্রন্থকার (র.) বলছেন যে, যদি কোনো মৃত ব্যক্তির নসবী আসাবা না থাকে সে ক্ষেত্রে তার আসাবা হবে আজাদকারী মনিব। এরপর মনিবের আসাবাদের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশি নিকটে।

প্রকাশ থাকে যে, উল্লিখিত বিধানে এ কথার প্রতিও সতর্ক করা হয়েছে যে, مَوْلَى الْمُعْتِقِ ও তার আসাবাগণ ذَوِى الْاَرْحَامِ -এর ওপর প্রাধান্য পাবে, আর ذَوِى الْفُرُوْضِ এর ওপর رَدْ করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার হবে।

হাজব অধ্যায়

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) প্রথমে ফারায়েয পর্বে যারা উত্তরাধিকার সম্পদ পাবে তাদের আলোচনা করে এখন এ অধ্যায়ে যারা উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে তাদের আলোচনা ও বিধি-বিধান বর্ণনা শুরু করেছেন।

حَجَبْ -এর আভিধানিক অর্থ ঃ حَجَبْ -এর আভিধানিক অর্থ– বাধা দেওয়া, গোপনীয়তা, গুপ্ত, বঞ্চিত।

حَجَبْ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ ফারায়েযের পরিভাষায় حَجَبْ বলা হয় এক ব্যক্তির কারণে অপরজন উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হওয়াকে।

حَجَبْ-এর প্রকারভেদ ঃ حَجَبْ দু'প্রকার ঃ (১) حَجَبْ نُقْصَانْ (২) حَجَبْ حِرْمَانْ উভয় প্রকারের সংজ্ঞা ও বিধান এবং বিস্তারিত বিবরণ সামনে আসছে।

হাজব-এর বিস্তারিত বিবরণ ঃ হাজাব দু'প্রকার যথা– (১) হাজাবে নুকসান অর্থাৎ বাধা প্রদানকারীর কারণে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির অংশ হ্রাস পাবে যেমন সন্তানাদি থাকা অবস্থায় স্বামীর অংশ এক চর্তুথাংশ এবং স্ত্রীর এক অষ্টমাংশ ; অতএব সন্তান প্রতিবন্ধককারী এবং স্বামী স্ত্রী প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত সন্তানাদির কারণে স্বামী স্ত্রীর অংশ কমে গেছে। অনুরূপভাবে মৃত ব্যক্তির সন্তানাদি অথবা তার পুত্রের সন্তানাদি অথবা দুই ভাই বোন জীবিত থাকা অবস্থায় মাতা এক ষষ্ঠাংশের অধিকারিণী হবে। অন্যথা এক তৃতীয়াংশের অধিকারিণী হবে। সুতরাং সন্তানাদি এবং ভাই বোন মাতার জন্য প্রতিবন্ধককারী। পুত্রের কন্যার জন্য কন্যা এবং বৈমাত্রেয় ভাই-এর জন্য সহোদর ভাই প্রতিবন্ধককারী। কেননা কন্যা থাকা অবস্থায় দুই-তৃতীয়াংশের স্থলে এক ষষ্ঠাংশ পাবে, সহোদরা বোন না থাকা অবস্থায় বৈমাত্রেয়ী বোন অর্ধাংশ পাবে। আর সহোদরা বোন থাকা অবস্থায় এক-ষষ্ঠাংশ পাবে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ করার জন্য। (২) প্রতিবন্ধককারীর কারণে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হওয়াকে হাজাবে হিরমান বলা হয়।

হাজাব হিসাবে ওয়ারিশগণ দু' প্রকার ঃ যথা– (১) এক প্রকার লোক যারা প্রতিবন্ধককারী দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ও বঞ্চিত হয় না এমন ওয়ারিশ ছয়জন যথা– ❖ স্বামী ❖ স্ত্রী ❖ মাতা ❖ পুত্র ❖ কন্যা ও ❖ পিতা। ওপরে উল্লিখিত ছয়জন কোনো অবস্থাতেই শরিয়তে বঞ্চিত হয় না। (২) প্রথম প্রকারের ওয়ারিশগণ ব্যতীত অন্যান্য ওয়ারিশগণ প্রতিবন্ধককারীদের দ্বারা কখনো কখনো সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয় না এবং কখনো কখনো প্রতিবন্ধককারী না হওয়ার কারণে উত্তরাধিকারী হয়। এ সকল ওয়ারিশগণ প্রতিবন্ধককারীর দ্বারা বঞ্চিত হয়ে যাওয়াটা দু'টি সূত্রের ওপর ভিত্তি করে হয়। (১) প্রথম সূত্র হলো, যে সকল ওয়ারিশ অন্য ব্যক্তির সম্পর্কের মাধ্যমে মৃতব্যক্তির আত্মীয় হয় তারা ঐ মাধ্যম বর্তমান থাকা অবস্থায় ওয়ারিশ হবে না। যথা– দাদা পিতার সম্পর্কের দ্বারা আত্মীয়। সুতরাং পিতার বর্তমানে দাদা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে। কিন্তু বৈপিত্রেয় ভাই বোন মাতার সর্ম্পক দ্বারা মৃত ব্যক্তির আত্মীয় কিন্তু মাতার বর্তমানে বৈপিত্রেয় ভাই বোন উত্তরাধিকারী হয়। কেননা বৈপিত্রেয় ভাই বোন পূর্ণ পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার কোনো পথ নেই। কেননা একাধিক বৈপিত্রেয় ভাই বোনদের অংশ এক তৃতীয়াংশ ত। এ সূত্রানুযায়ী যদি বৈপিত্রেয় ভাই বোনকে তাদের মাতার সাথে পরিত্যক্ত সম্পত্তি দেওয়া হয় তাহলে তাদের মূল মাতার বঞ্চিত হওয়া আবশ্যক হয় না।

وَيَحْجُبُ الْاُمَّ مِنَ الثُّلُثِ اِلَى السُّدُسِ بِالْوَلَدِ اَوْ وَلَدِ الْاِبْنِ اَوْ اَخَوَيْنِ الْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْبَنَاتِ لِبَنِى الْاِبْنِ وَاَخَوَاتِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَالْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْاَخَوَاتِ لِلْاَبِ وَالْاُمِّ لِلْاِخْوَةِ وَالْاَخَوَاتِ مِنَ الْاَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَاِذَا تَرَكَ بِنْتًا وَبَنَاتِ اِبْنٍ وَبَنِىْ اِبْنٍ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَالْبَاقِىْ لِبَنِى الْاِبْنِ وَاَخَوَاتِهِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ -

সরল অনুবাদ ঃ মা তৃতীয়াংশ থেকে ষষ্ঠাংশের দিকে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যায় পুত্র বা পৌত্র বা দুই ভাই হওয়ার কারণে। আর কন্যাদের অংশ থেকে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে উহা পৌত্র ও তাদের বোনদের জন্য পুরুষের জন্য দু'মহিলার অংশের সমান, এবং আপন বোনদের অংশ থেকে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে তা বৈমাত্রেয় ভাই বোনদের জন্য, পুরুষদের জন্য দুই নারীর অংশের সমান, এবং যখন মৃতব্যক্তি এক কন্যা, কতিপয় পৌত্রী, এবং কতিপয় পৌত্র ছেড়ে যায় তখন কন্যার জন্য অর্ধেক আর অবশিষ্ট পৌত্রদের এবং তাদের বোনদের জন্য, পুরুষের জন্য দুই নারীর অংশের সমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَيَحْجُبُ الخ **ঃ** উত্তরাধিকার প্রতিবন্ধকতা দু' প্রকার ঃ (১) হাজাবে নুকসান অর্থাৎ কোনো ওয়ারিশকে বড় অংশ হতে ফিরিয়ে ছোট অংশের দিকে স্থানান্তরিত করাকে হাজাবে নুকসান বলে। আর এটা যাবিল ফুরূযদের মধ্য হতে পাঁচজনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ❖ স্বামী ❖ স্ত্রী ❖ মাতা ❖ পুত্রের কন্যা ও ❖ বৈমাত্রেয়ী ভগ্নি (২) হাজাবে হিরমান অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত করা। এ পর্যায়ে উত্তরাধিকারীগণ দু'ভাগে বিভক্ত, প্রথম শ্রেণীর লোকেরা কোনো অবস্থায়ই মিরাস হতে বঞ্চিত কিংবা বাধা প্রাপ্ত হয় না। এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ছয়জন পুত্র, পিতা, স্বামী, কন্যা, মাতা ও স্ত্রী দ্বিতীয় শ্রেণীর ঐ সমস্ত লোক যারা কোনো কোনো সময় ওয়ারিশ হয় আবার কখনো বা বঞ্চিত বা বাধাপ্রাপ্ত হয়। এটা দু'টি মূলনীতির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম মূলনীতিটি হলো এই যে, যে ওয়ারিশ মৃত ব্যক্তির সাথে অন্য এমন ব্যক্তির মধ্যস্থতায় সম্পর্কিত তার উপস্থিতিতে সে ওয়ারিশ হয় না, তবে তার বৈপিত্রেয় ভাই বোন তাদের মাতার সাথে ওয়ারিশ হবে। কেননা তাদের মাতা সমুদয় ত্যাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকারিণী নয়। আর দ্বিতীয় মূলনীতি হলো এই যে, নিকটতম আত্মীয় অপেক্ষা অধিকতর হকদার বলে বিবেচিত হবে। আমাদের হানাফী ইমামগণের মতে বঞ্চিত ব্যক্তি প্রতিবন্ধক হতে পারে না। কিন্তু ইবনে মাসউদ (রা.)-এর নিকট আংশিকভাবে অন্যদেরকে বঞ্চিত করতে পারে। যেমন– কাফির হত্যাকারী ও ক্রীতদাস বাধা প্রাপ্ত ব্যক্তি সর্বসম্মতিক্রমে অপরের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টিকারী হতে পারে। যেমন দুই বা ততোধিক ভাই বোন যে দিকেরই হোকনা কেন তারা পিতার সাথে ওয়ারিশ হবে না। কিন্তু এ দুই ভাই বোন মাতার অংশে বাধা প্রধান করে তার অংশ $\frac{১}{৩}$ হতো $\frac{১}{৬}$ অংশের দিকে ফিরিয়ে দেয়; সুতরাং ভাই বোন স্বয়ং বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও মাতার অংশ হ্রাস করে দিয়েছে বিধায় তারা মাতার জন্য বাধা সৃষ্টিকারী হয়েছে।

وَكَذَالِكَ الْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ الْاُخْتِ لِلْاَبِ وَالْاُمِّ لِبَنِى الْاَبِ وَبَنَاتِ الْاَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ وَمَنْ تَرَكَ اِبْنَ عَمٍّ اَحَدُهُمَا اَخٌ الْاُمِّ فَلِلْاَخِ السُّدُسُ وَالْبَاقِى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَالْمُشْتَرِكَةُ اَنْ تَتْرُكَ الْمَرْأَةُ زَوْجًا وَاُمًّا اَوْ جَدَّةً وَاِخْوَةً مِنْ اُمٍّ وَاَخًا مِنْ اَبٍ وَاُمٍّ فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْاُمِّ السُّدُسُ وَلِاَوْلَادِ الْاُمِّ الثُّلُثُ وَلَاشَيْئَ لِلْاِخْوَةِ لِلْاَبِ وَالْاُمِّ ـ

সরল অনুবাদ ঃ এমনিভাবে সহোদর বোনের অংশ থেকে যা কিছু অবশিষ্ট থাকে উহা বৈমাত্রেয় ভাই বোনদের জন্য পুরুষের জন্য দু'জন মহিলার অংশের সমান। এবং যে ব্যক্তি দু'জন চাচাতো ভাই রেখে (মারা) যায় যাদের মধ্য থেকে একজন বৈপিত্রেয় ভাই তখন বৈপিত্রেয় (অর্থাৎ মা শরিক) ভাই-এর জন্য ষষ্ঠাংশ। আর অবশিষ্ট উভয়ের মধ্যে অর্ধাঅর্ধী হিসাবে ভাগ হবে। এবং "মোশতারিকাহ" এই যে, কোনো নারী (মৃত) স্বীয় স্বামী, মা, দাদী আর কতিপয় বৈপিত্রেয় ভাই" ও কতিপয় সহোদর ভাই রেখে যাওয়া, এ ক্ষেত্রে স্বামীর জন্য অর্ধেক, এবং মায়ের জন্য ষষ্ঠাংশ আর বৈপিত্রেয় ভাইদের জন্য তৃতীয়াংশ ও সহোদর ভাইদের জন্য কিছুই নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ الخ ঃ অর্থাৎ মৃতের কন্যাদের সঙ্গে যদি পুত্রও বর্তমান থাকে তাহলে প্রত্যেক কন্যা ছেলের $\frac{১}{২}$ অংশ হিসেবে পাবে।

قَوْلُهُ وَالْمُشْتَرِكَةُ اَنْ تَتْرُكَ الخ ঃ অর্থাৎ যার মধ্যে حَجَبْ نُقْصَانْ ও حَجَبْ حِرْمَانْ উভয়টি পাওয়া যায় ঐ অবস্থাকে مُشْتَرِكَهْ বলে। অতএব কিতাবের উল্লিখিত মাসআলায় ভাই-এর কারণে মা ষষ্ঠাংশ পেয়েছে, আর اَصْحَابُ فَرَائِضْ স্ব-স্ব অংশ নিয়ে নেওয়ার কারণে সহোদর ভাই বঞ্চিত।

<u>যোগসূত্র</u> **ঃ** গ্রন্থকার (র.) আসহাবে ফারায়েয, আসাবা ও হাজাব-এর বর্ণনার পর এখন رَدٌّ -এর আলোচনা আরম্ভ করার যোগসূত্র এই যে, উপরোক্ত বিধি-বিধানের পরই رَدٌّ -এর বিধি-বিধান প্রয়োজন হয়। কারণ رَدٌّ বলা হয় উত্তরাধিকারীদের স্ব-স্ব অংশ বণ্টন করার পর উদ্বৃত্ত অংশ পুনরায় বণ্টন করাকে।

رَدٌّ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ رَدٌّ এটা عَوْل-এর বিপরীত, رَدٌّ-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– প্রত্যাবর্তিত করা। আর عَوْل-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– বৃদ্ধি পাওয়া।

رَدٌّ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায়, ত্যাজ্য সম্পদের যথা বণ্টন সংখ্যা হতে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে স্ব-স্ব অংশ বণ্টন করার পর উদ্বৃত্ত অংশ স্বামী এবং স্ত্রীকে বাদ দিয়ে অন্যান্যদের মধ্যে যথা প্রাপ্যতার বিবেচনায় পুনরায় বণ্টন করাকে رد বলে।

رَدٌّ ও عَوْل-এর পার্থক্য ঃ رَدٌّ এটা عَوْل-এর বিপরীত, عَوْل-এর মধ্যে سِهَام বা অংশ مَخْرَجْ এর থেকে বেশি হয় আর رَدٌّ-এর মধ্যে مَخْرَجْ অংশ থেকে বেশি হয়

عَوْل-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ পরিভাষায় عَوْلٌ বলে উত্তরাধিকারীদের স্ব-স্ব হিস্যা বণ্টনের ক্ষেত্রে বণ্টন সংখ্যার ওপর হিস্যা বেড়ে যাওয়াকে ; যেমন– স্বামী এবং আপন দু'বোনের বণ্টন সংখ্যা ৬, কিন্তু হিস্যা সংখ্যা স্বামী তিন এবং আপন বোনদ্বয় চার, মোট সাত হয়ে যায়।

رَدٌّ-এর বিধান ও সংজ্ঞার মধ্যে মতভেদ ঃ ওপরে رَدٌّ -এর যে সংজ্ঞা ও বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এটা অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরামের মতামত, আর এটাকেই হানাফী ইমামগণ গ্রহণ করেছেন। কিন্তু হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক, ইমাম যুহরী (র.) প্রমুখদের মতে ذَوِى الْفُرُوْض দের ওপর কোনো অবস্থাতেই رَدٌّ হতে পারে না; বরং অতিরিক্ত মাল بَيْتُ الْمَالْ তথা রাষ্ট্রীয় ধনাগারের হয়ে যাবে।

وَالْفَاضِلُ عَنْ فَرْضِ ذَوِى السِّهَامِ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ مَرْدُوْدٌ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ إِلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ وَلَايَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُوْلِ وَالْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ يَتَوَارِثُ بِهِ أَهْلُهُ وَلَايَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ وَمَالُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِيْنَ وَمَا اكْتَسَبَهُ فِيْ حَالِ رِدَّتِهِ فَيْئٌ وَإِذَا غَرِقَ جَمَاعَةٌ أَوْ سَقَطَتْ عَلَيْهِمْ حَائِطٌ فَلَمْ يُعْلَمْ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ أَوَّلًا فَمَالُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْأَحْيَاءِ مِنْ وَرَثَتِهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আসহাবুল ফারায়েযের অংশের অবশিষ্ট সম্পদ যখন আসাবা না হয় আসহাবুল ফারায়েযকে দেওয়া হবে তাদের অংশ অনুযায়ী স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত। এবং হত্যাকারী হত্যাকৃতের ওয়ারিশ হয় না। এবং সমস্ত প্রকারের কুফর একই মাযহাব তার দরুন এক কাফির অপর কাফিরের ওয়ারিশ হবে। এবং মুসলমান ব্যক্তি কাফির ব্যক্তির ওয়ারিশ হয় না এবং কাফিরও মুসলমানের ওয়ারিশ হয় না। মুরতাদ ব্যক্তির সম্পদ তার মুসলমান ওয়ারিশদের এবং সে যেই সম্পদ মুরতাদ অবস্থায় অর্জন করেছে তা গনিমত হবে। যখন কিছুসংখ্যক লোক ডুবে যায়, অথবা তাদের ওপর কোনো প্রাচীর পড়ে যায় এবং এটা অজানা থাকে যে তাদের মধ্যে কে প্রথম মারা গেছে, তাহলে তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের সম্পদ তার জীবিত ওয়ারিশদের হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَيْئٌ الخ ঃ এটা হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর নিকট। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) এর নিকট তার মুসলমান ওয়ারিশদের জন্য হবে। কেননা আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নীতি এই যে, মুরতাদের মালিকানা মুরতাদ হওয়া দ্বারা দূর হয় না। সুতরাং মুরতাদ হওয়ার পর তার অবস্থা তার অর্জনের মধ্যে মুরতাদ হওয়ার পূর্বাবস্থা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর দলিল হচ্ছে যে, মুরতাদ ব্যক্তির খুন মুবাহ সুতরাং যা কিছু তার হাতে রয়েছে ঐ অবস্থায় ঐ জিনিস গনিমত হওয়া আবশ্যক, হরবী ব্যক্তির সম্পদের ন্যায়। অতঃপর হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন, মুরতাদ ব্যক্তির ওয়ারিসের অবস্থা মুরতাদ হওয়ার দিন গ্রহণযোগ্য হবে। সুতরাং মুরতাদ হওয়ার দিন আজাদ ব্যক্তি যদি মুসলমান হয়, তাহলে ওয়ারিশ হবে না। যদি এরপর আজাদ করা হয় অথবা মৃত্যুর অথবা নিহত হওয়ার অথবা দারুল হরবে মিলিত হওয়ার পূর্বে মুসলমান হয়ে যায় তাহলে ওয়ারিশ হবেনা।

وَاِذَا اجْتَمَعَ لِلْمَجُوْسِيِّ قَرَابَتَانِ لَوْتَفَرَّقَتْ فِيْ شَخْصَيْنِ وَرِثَ اَحَدُهُمَا مَعَ الْاٰخَرِ وَرِثَ بِهِمَا وَلَايَرِثُ الْمَجُوْسِيُّ بِالْاَنْكِحَةِ الْفَاسِدَةِ الَّتِيْ يَسْتَحِلُّوْنَهَا فِيْ دِيْنِهِمْ وَعَصَبَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَ وَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مَوْلٰى اُمِّهِمَا وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ حَمْلًا وَقَفَ مَالُهُ حَتّٰى تَضَعَ اِمْرَاَتُهُ حَمْلَهَا فِيْ قَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْجَدُّ اَوْلٰى بِالْمِيْرَاثِ مِنَ الْاٰخِرَةِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَاسَمُ اِلَّا اَنْ تَنْقُصَهُ الْمُقَاسَمَةُ مِنَ الثُّلُثِ وَاِذَا اجْتَمَعَ الْجَدَّاتُ فَالسُّدُسُ لِاَقْرَبِهِنَّ وَيَحْجُبُ الْجَدُّ اُمَّهُ وَلَاتَرِثُ اُمُّ اَبِ الْاُمِّ بِسَهْمٍ وَكُلُّ جَدَّةٍ تَحْجُبُ اُمَّهَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ এবং যখন অগ্নিপূজকের এমন দুই নিকটবর্তী আত্মীয় একত্রিত হয় যে, যদি সে পৃথক দুই ব্যক্তির মধ্যে হয় তাহলে একজন দ্বিতীয়জনের ওয়ারিশ হতো তাহলে অগ্নিপূজক তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকের দ্বারা ওয়ারিশ হবে। এবং অগ্নিপূজক ঐ ফাসাদ বিবাহ দ্বারা ওয়ারিশ হবে না যাকে সে হালাল জানে তার ধর্মে। এবং ব্যভিচারী পুত্র ও অভিশপ্ত পুত্রের আসাবা তার মাতার মাওলা হবে। আর যে ব্যক্তি গর্ভ রেখে মৃত্যুবরণ করল, তাহলে তার সম্পদ মুলতবি থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্ত্রী গর্ভপাত করে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। আর ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট ভাইয়ের পরিবর্তে দাদা ওয়ারিশ পাওয়ার হকদার বেশি। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র.) বলেন যে, সে ভাইয়ের সমপরিমাণ পাবে। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, তাকে বণ্টন করার মধ্যে এক তৃতীয়াংশের চেয়ে কম পাবে। এবং যখন দাদী নানী সব একত্র হয়ে যায় তাহলে ছয় তৃতীয়াংশ সে পাবে যা সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। এবং দাদা থাকা অবস্থায় মৃতের মাতাকে মাহজূব অর্থাৎ ওয়ারিশ পাওয়া থেকে নিষিদ্ধ করে দেয়। এবং নানার মাতা কোনো অংশের ওয়ারিশ হয় না। এবং প্রত্যেক দাদী তার মাতাকে ওয়ারিশ পাওয়া থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ حَمْلًا الخ ঃ যদি কোনো মৃতের স্ত্রী গর্ভবতী হয় তাহলে তার সম্পদ বণ্টন হবে না; বরং গর্ভপাত পর্যন্ত বিরত রাখা হবে কিন্তু এটা তখনই হবে যখন গর্ভ ব্যতীত অন্য কোনো সন্তান না হয়। যদি সন্তান হয় তাহলে নরকে পঞ্চম এবং নারীকে নবম অংশ দেওয়া হবে। বাকি অংশ মওকুফ থাকবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট ছেলেকে অর্ধ সম্পদ দেওয়া হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ দেওয়া হবে। কেননা মহিলা সাধারণত এক গর্ভে দুই থেকে বেশি প্রসব করে না। সুতরাং উপস্থিত ছেলে এক-তৃতীয়াংশের মুসতাহেক। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, সাধারণত এক গর্ভ থেকে এক সন্তানই প্রসব করে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেন যে, বেশি থেকে বেশি চার সন্তান হতে পারে। সুতরাং এটাও সম্ভাব্য যে, গর্ভে চার ছেলে হয়। সুতরাং ছেলে পঞ্চম অংশের মুসতাহেক হবে। এবং কন্যা নবম অংশের মুসতাহেক হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর উক্তির ওপরই ফতোয়া।

بَابُ ذَوِى الْأَرْحَامِ

জাবিল আরহাম অধ্যায়

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) আসহাবে ফরায়েয ও আসাবাদের বিধান বর্ণনা করার পর এখন জাবিল আরহাম-এর বিধান বর্ণনা করার কারণ এই যে, মৃতের ত্যাজ্য সম্পদ সর্ব প্রথম আসহাবুল ফরায়েযের মধ্যে বণ্টন হবে এরপর আসাবাদের মাঝে। যদি আসাবা না থাকে পুনরায় অবশিষ্ট অংশ আসহাবে ফারায়েযের মাঝে তাদের অংশ হিসাবে বণ্টন হবে এখন যদি এমনটি হয় যে, কোনো মৃতের আসহাবে ফরায়েযও নেই আবার আসাবাও নেই তখন তার মালের বিধান সম্পর্কে এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে যে, তার মাল তখন জাবিল আরহামগণ পাবে।

ذَوِى الْأَرْحَامِ-এর আভিধানিক অর্থ ঃ اَرْحَامْ এটা رِحْم-এর বহুবচন رِحْم অর্থ-জরায়ু, গর্ভাশয়, মাতৃকুলের আত্মীয়স্বজন, আর ذَوِىْ অর্থ- ওয়ালা। এখন ذوى الارحام-এর শাব্দিক অর্থ- দাঁড়ায়-জরায়ুর সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজন। এখানে এই আভিধানিক অর্থ উদ্দেশ্য নয়; বরং পারিভাষিক অর্থ উদ্দেশ্য।

ذَوِى الْأَرْحَامْ-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ عِلْمُ الْفَرَائِضْ-এর পরিভাষায় ذَوِى الْاَرْحَامْ ঐ সব নিকটাত্মীয়কে বলে, যারা মৃত ব্যক্তির নিরেট রক্ত সম্পর্কিত নয় কিংবা কুরআনে বর্ণিত হিস্যার অধিকারী নয়, যেমন ভ্রাতুষ্পুত্রী, চাচাতো ভগ্নি।

ذَوِى الْأَرْحَامْ এর প্রকারভেদ ঃ যাবিল আরহাম চার প্রকারের; প্রথম প্রকার ঐ সকল আত্মীয় যারা মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত, তারা হলো মৃতের কন্যাদের সন্তানাদি এবং পুত্রের কন্যাদের সন্তানাদি। দ্বিতীয় প্রকার ঐ সকল আত্মীয় স্বজন যাদের সাথে স্বয়ং মৃত ব্যক্তি সম্পর্কিত, তারা হলো ঐ সব দাদা দাদী যারা মৃতের যাবিল ফুরূয ও আসাবাদের কারণে ত্যাজ্য সম্পদ হতে বাদ পড়েছে। তৃতীয় প্রকার মৃত ব্যক্তির পিতা মাতার দিকে সম্পর্কিত, তারা হলো ভগ্নিদের সন্তান ভ্রাতাদের কন্যাগণ এবং বৈপিত্রেয় ভ্রাতুষ্পুত্র। আর চতুর্থ প্রকার মৃত ব্যক্তির দাদা নানা বা দাদী নানীর দিকে সম্পর্কিত। তারা হলো ফুফীগণ এবং বৈপিত্রেয় চাচাগণ এবং খালাগণ। সুতরাং তারা এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যারা তাদের সাথে আত্মীয় সম্পর্ক তারা যাবিল আরহম-এর মধ্যে পরিগণিত হবে। হযরত আবূ সুলাইমান মুহাম্মদ ইবনে হাসান হতে তিনি আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন– নিশ্চয় নিকটবর্তী শ্রেণীর মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণী যদিও ওপরের দিকে যায় অতঃপর প্রথম শ্রেণী যদিও নিম্নের দিকে যায়। অতঃপর তৃতীয় শ্রেণী যদিও নিম্নের দিকে যায়, অতঃপর চতুর্থ শ্রেণী যদিও তাদের সম্পর্ক অনেক দূরে যায়। ইমাম আবূ হানীফা (র.) হতে আর হযরত ইবনে সামাআ হযরত মুহাম্মদ ইবনে হাসান হতে আর তারা হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.) হতে বর্ণনা করেন যে, যাবিল আরহাম-এর নিকটবর্তী প্রকারের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রথম প্রকার, অতঃপর দ্বিতীয়, অতঃপর তৃতীয়, অতঃপর চতুর্থ আসাবাগণের শ্রেণী বিন্যাসের অনুরূপ এবং তিনি এটিই গ্রহণকারী। আর সাহেবাইনের নিকট মাতামহের ওপর তৃতীয় প্রকার অগ্রগণ্য। কেননা তাঁদের নিকট প্রত্যেক ব্যক্তি তার শাখা হতে বেশি নিকটবর্তী এবং তার শাখা তার আসল হতে বেশি নিকটবর্তী।

إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ عَصَبَةٌ وَلَا ذُوْ سَهْمٍ وَرِثَهُ ذُوو الْأَرْحَامِ وَهُمْ عَشَرَةٌ وَلَدُ الْبِنْتِ وَوَلَدُ الْأُخْتِ وَبِنْتُ الْأَخِ وَبِنْتُ الْعَمِّ وَالْخَالُ وَالْخَالَةُ وَأَبُو الْأُمِّ وَالْعَمُّ لِأُمٍّ وَالْعَمَّةُ وَ وَلَدُ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَمَنْ أَدْلَى بِهِمْ فَأَوْلَاهُمْ مَنْ كَانَ مِنْ وَلَدِ الْمَيِّتِ ثُمَّ وَلَدُ الْأَبَوَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُمْ بَنَاتُ الْإِخْوَةِ وَأَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ ثُمَّ وَلَدُ أَبَوَيْ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدُهُمَا وَهُمُ الْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَالْعَمَّاتُ وَإِذَا اسْتَوَى وَارِثَانِ فِي دَرَجَةٍ فَأَوْلَاهُمْ مَنْ أَدْلَى بِوَارِثٍ وَأَقْرَبُهُمْ أَوْلَى مِنْ أَبْعَدِهِمْ وَأَبُو الْأُمِّ أَوْلَى مِنْ وَلَدِ الْأَخِ وَالْأُخْتِ وَالْمُعْتِقُ أَحَقُّ بِالْفَاضِلِ مِنْ سَهْمِ ذَوِي السِّهَامِ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَصَبَةٌ سِوَاهُ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ يَرِثُ وَإِذَا تَرَكَ الْمُعْتِقُ أَبَ مَوْلَاهُ وَابْنَ مَوْلَاهُ فَمَالُهُ لِلْابْنِ عِنْدَهُمَا .

সরল অনুবাদ ঃ এবং যখন মৃতের আসাবা না হয় এবং আসহাবে ফরায়েযও না হয় তাহলে তার জাবিল আরহাম ওয়ারিশ হবে এবং তারা দশ ব্যক্তি ঃ কন্যার সন্তান-সন্ততি, বোনের সন্তান, ভাইয়ের কন্যা, চাচার কন্যা, মামা, খালা, নানা, আখয়াফী চাচা, ফুফু, আখয়াফী ভাইয়ের সন্তান এবং যারা তাদের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আত্মীয় হয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে মৃতের সন্তান-সন্ততি হয়। তারপর ঐ ব্যক্তি যে মাতা পিতা অথবা তাদের মধ্য থেকে কোনো একজনের সন্তানাদি হয় এবং ভাতিজা ও বোনদের সন্তানাদি হয়। তারপর মাতা পিতার পিতা মাতা হয় অথবা তাদের একজনের সন্তান-সন্ততি হয় এবং তারা হচ্ছে মামা, খালা ও ফুফুগণ। এবং যখন দুই ওয়ারিশ মরতবার মধ্যে সমপরিমাণ হয় তাহলে তাদের মধ্যে উত্তম হকদার ঐ ব্যক্তি যে মৃতের অতি নিকটবর্তী হয় কোনো ওয়ারিশের মাধ্যমে। নিকটবর্তী ব্যক্তি উত্তম হবে দূরবর্তী আত্মীয় থেকে। এবং নানা ভাই ও বোনের সন্তানাদি থেকে উত্তম হবে। এবং আজাদকারী ব্যক্তি অবশিষ্ট মালের আসহাবে ফারায়েয থেকে তখন উত্তম হবে যখন সে ব্যতীত অন্য আর কোনো আসাবা না হয়। এবং মনিবের মনিবগণ ওয়ারিশ হয়। এবং যখন আজাদকৃত ব্যক্তি তার মনিবের পিতা এবং তার মনিবের ছেলে রেখে যায় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট তার সম্পদ মনিবের ছেলের হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ ذَوِي الْأَرْحَامِ الخ ঃ অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম যথা হযরত আলী, হযরত ওমর, হযরত ইবনে মাসউদ, হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল, হযরত আবুদ দারদা (রা.) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম মাতৃকুলের আত্মীয়-স্বজনদের ওয়ারিশ পাওয়া সম্পর্কে বলেছেন। হানাফী ও হানাবেলার মাযহাবও এটাই। হ্যাঁ, শুধু হযরত যায়েদ ইবনে ছাবেত এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)-এর এক রেওয়ায়ত তাদের ওয়ারিশ না হওয়া সম্পর্কে ব্যক্ত করেছেন। ওয়ারিশ না হওয়ার অবস্থায় মৃতের সন্তান বাইতুল মালে একত্রিত করা হবে। শাফেয়ী ও মালেকী মাযহাবও এটাই। কেননা আল্লাহ তা'আলা ওয়ারিশ সম্পর্কীয় আয়াতে শুধু আসহাবুল ফারায়েয ও আসাবা সমূহেরই আলোচনা করেছেন। তাদের প্রমাণের উত্তর হচ্ছে যে, আল্লাহর বাণী– وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ -এর তাফছীর ঃ أَوْلَى بِمِيرَاثِ بَعْضٍ -এর দ্বারা করা হয়েছে।

قَوْلُهُ فَأَوْلَيهُمْ مَنْ كَانَ الخ : মাতৃকুলের আত্মীয়-স্বজনদের তারতীব আসাবা সমূহের তারতীবের ন্যায়। সুতরাং সর্বপ্রথম ঐ ব্যক্তি হবে যে মৃতের নিকটবর্তী হয়; কিন্তু "আকরাব" -এর সংজ্ঞায় রেওয়ায়ত বিভিন্ন রকম আছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) থেকে ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ হচ্ছে যে মৃতের আকরাব অর্থাৎ অধিক নিকটবর্তী হচ্ছে নানা। তারপর কন্যার সন্তান, তারপর বোনদের সন্তান, তারপর ভাইদের সন্তান, তারপর ফুফুগণ, তারপর মামাগণ, তারপর তাদের সন্তান। দ্বিতীয় রেওয়ায়ত বা বর্ণনা হচ্ছে যে, মৃতের অধিক নিকটবর্তী কন্যার সন্তান, তারপর নানা। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.)-এর নিকট মৃতের নিকটবর্তী কন্যার সন্তান, তারপর বোনদের সন্তান এবং ভাইদের সন্তান, তারপর নানা, তারপর ফুফু, তারপর খালা, তারপর তাদের সন্তান। কুদূরীর বর্ণনায় সর্ব প্রথম ঐ ব্যক্তি যে মৃতের সন্তানদের থেকে হবে যথা- দৌহিত্র তারপর যে মৃতের পিতা মাতা অথবা তাদের কোনো একজনের সন্তান হয় অথবা ভাতিজা এবং বোনদের সন্তান, তারপর মৃতের পিতা মাতাদের পিতা মাতার, অথবা তাদের কোনো একজনের সন্তান, অর্থাৎ ভাতিজা এবং বোনদের সন্তান, তারপর মৃতের পিতা মাতাদের পিতা মাতার অথবা তাদের কারো একজনের সন্তান অর্থাৎ মামা, খালা এবং ফুফু, এবং দুই ওয়ারিশ এক দরজায় বরাবর হয় তাহলে তাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি অগ্রাধিকার হবে যে কোনো ওয়ারিশ দ্বারা মৃতের অতি নিকটবর্তী হয়, যেমন কোনো ব্যক্তি চাচার কন্যা এবং ফুফুর ছেলে রেখে যায়, তাহলে সমস্ত সম্পদ চাচার কন্যা পাবে।

قَوْلُهُ وَإِذَا تَرَكَ الْمُعْتِقُ الخ : অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি তার মুক্তিদাতার পিতা এবং পুত্র রেখে মারা গেল, তখন মৃত ব্যক্তির ওয়ালার অধিকারী পিতা হবে কি হবে না এর মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.)-এর নিকট পিতা ওয়ালার এক-তৃতীয়াংশের অধিকারী হবে। আর তারফাইন (র.)-এর নিকট পিতা ওয়ালার কোনো অংশেরই অধিকারী হবে না। আর যদি মৃত ব্যক্তি তার মুক্তিদাতা দাদা এবং পুত্র রেখে মারা যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ এবং তারফাইন (র.)-এর নিকট দাদা ওয়ালার অধিকারী হতে বঞ্চিত হবে।

মৃতের আত্মীয় স্বজনের প্রকারভেদ : মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন মোট তিন প্রকার : (১) ঐ সকল আত্মীয়-স্বজন যাদেরকে নির্দিষ্ট অংশের অধিকারীগণের মধ্যে গণ্য করা হয়। (২) ঐ সকল আত্মীয়-স্বজন যাদেরকে আসাবা -এর মধ্যে গণ্য করা হয়। (৩) ঐ সকল আত্মীয় স্বজন যাদেরকে যাবিল আরহাম বলা হয়। উপরোক্ত তিন প্রকার আত্মীয়-স্বজন ব্যতীত অন্য আত্মীয়গণ সবই স্বীকৃতভাবে মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিশ হয় না।

জাবিল আরহাম ওয়ারিশ পাবে কিনা ? এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হয় কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র.)-এর নিকট ওয়ারিশ হয় না। এ সকল বুজুর্গানে দীন বলেন, মৃত ব্যক্তির নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী এবং আসাবাগণ না হওয়া অবস্থায় মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি রাজ কোষাগারে জমা হবে যদি ইসলামি শাসন এবং রাজ কোষাগারের বন্দোবস্ত থাকে। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা কুরআন শরীফে শুধু নির্দিষ্ট অংশের অধিকারী এবং আসাবাগণের বর্ণনা দিয়েছেন। যাবিল আরহাম-এর বর্ণনা করেননি। যদি তারা ওয়ারিশ হতো তাহলে তাদের কথা অবশ্যই বর্ণনা করতেন। কাজেই ফুফু এবং খালা পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী না অধিকারী নয় ? নবী করীম (সা.)-এর নিকট জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বলেন হযরত জিবরাঈল আমীন আমাকে জানালেন যে, তাদের জন্য কোনো পরিত্যক্ত সম্পত্তি নেই। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র.) উত্তর দেন যে, আল্লাহর বাণী- وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ যাবিল আরহাম ওয়ারিশ হওয়ার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। যেমন যখন হুযূর (সা.) মদীনা শরীফে আগমন করেছেন তখন প্রথম গোলাম ও মনিবের ওপর পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টিত হতো। উপরোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর গোলাম ও মনিবকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মালিক মামা হবে। আর মামা হলো যাবিল আরহাম সুতরাং জানা গেল যে, যাবিল আরহাম আসাবা এবং আসহাবে ফারায়েয না হওয়া অবস্থায় ওয়ারিশ হয়।

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لِلْاَبِ السُّدُسُ وَالْبَاقِى لِلْاِبْنِ فَاِنْ تَرَكَ جَدَّ مَوْلَاهُ وَاَخَا مَوْلَاهُ فَالْمَالُ لِلْجَدِّ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى هُوَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوْهَبُ۔

সরল অনুবাদ ঃ এবং ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) বলেন যে, পিতার জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ হবে। আর অবশিষ্ট সম্পদ ছেলের হবে। যদি আজাদকৃত ব্যক্তি তার মাওলার দাদা এবং তার মাওলার ভাই কে রেখে যায় তাহলে পরিত্যক্ত সম্পদ দাদার জন্য হবে। এটা হযরত ইমাম আযম আবূ হানীফা (র.)-এর নিকট। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র.) বলেন যে, সম্পদ উভয়ের হবে এবং ওয়ালাকে বিক্রিও করা যাবে না, আবার হেবাও করা যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَلَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ الخ ঃ وَلَاءٌ শব্দটি যবর এর সাথে, অর্থ হলো মুক্তি দানকারীর ঐ অধিকার যা তার মুক্তকৃত দাস বা দাসীর পরিত্যক্ত সম্পদের মধ্যে নিহিত আছে। এর কারণ হলো, যেমনিভাবে পিতা পুত্র জীবিত থাকার কারণ অনুরূপভাবে মু'তিক (মুক্তকারী) মু'তাক (মুক্তকৃত)-এর জীবিত থাকার হুকুমের মধ্যে কারণ হয়। তিনি মুক্তি দান করে দাসত্বের শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন জীবন দ্বারা সুন্দর করেছেন এবং দাসত্ব হতে মুক্তি দিয়ে তাকে উত্তরাধিকারীত্বের স্তরে করেছেন, কিন্তু এই ولاء -কে মুক্তি দানকারী আসাবা মহিলাগণ অর্থাৎ আসাবা বিগাইরিহী এবং আসাবা মা'আ গাইরিহী পাবে না। কেননা হুযূর (সা.) বলেছেন যে, মহিলাগণ وَلَاءٌ -এর কোনো অংশে অংশীদার হবে না। কিন্তু ঐ সকল মহিলাগণ وَلَاءٌ -এর উত্তরাধিকারী হবে, যারা নিজে দাসমুক্ত করেছে অথবা তাদের মুক্তকৃত দাসগণ দাসমুক্ত করেছে, তাই মহিলাগণ ঐ সকল দাসের পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে যাদেরকে তারা মুকাতাব করেছে। অথবা তাদের মুকাতাবগণ অন্যকে মুকাতাব করেছে। সুতরাং যখন ওপরে উল্লিখিত মুক্তকৃত দাস বা মুকাতাব মৃত্যুবরণ করবে এবং তাদের কোনো আসাবা না থাকে, তখন এ মুক্তি দানকারী বা মুকাতাবকারী মহিলাগণ অবশিষ্ট সম্পদ অথবা পূর্ণ সম্পদ আসাবায়ে সাবাবী হিসেবে উত্তরাধিকারী হবে।

بَابُ حِسَابِ الْفَرَائِضِ

ফারায়েয-এর হিসাব অধ্যায়

যোগসূত্র ঃ গ্রন্থকার (র.) এ কিতাবের পর্ব শেষ করেছেন ফরায়েয পর্ব দ্বারা আর ফরায়েয পর্বকে শেষ করেছেন ফারায়েযের হিসাব অধ্যায় দ্বারা কারণ উত্তরাধিকার বণ্টন করতে হিসাবের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

اِذَا كَانَ فِي الْمَسْئَلَةِ نِصْفٌ وَنِصْفٌ اَوْ نِصْفٌ وَمَابَقِيَ فَاَصْلُهَا مِنْ اِثْنَيْنِ وَاِنْ كَانَ فِيْهَا ثُلُثٌ وَمَابَقِيَ اَوْ ثُلُثَانِ وَمَابَقِيَ فَاَصْلُهَا مِنْ ثَلٰثَةٍ وَاِنَّ فِيْهَا رُبُعٌ وَمَا بَقِيَ اَوْ رُبُعٌ وَنِصْفٌ فَاَصْلُهَا مِنْ اَرْبَعَةٍ وَاِنْ كَانَ فِيْهَا ثُمُنٌ وَمَا بَقِيَ اَوْ ثُمُنٌ وَنِصْفٌ فَاَصْلُهَا مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَاِنْ كَانَ فِيْهَا نِصْفٌ وَثُلُثٌ اَوْنِصْفٌ وَسُدُسٌ فَاَصْلُهَا مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُوْلُ اِلٰى سَبْعَةٍ وَّثَمَانِيَةٍ وَتِسْعَةٍ وَعَشَرَةٍ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যখন মাসআলার মধ্যে দুই নিসফ অথবা এক নিসফ হয় তখন মাস্আলা দুই দ্বারা করবে এবং যখন মাসআলার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট যা হয় অথবা দুই-তৃতীয়াংশ এবং অবশিষ্ট যা হয় তখন আসল মাসআলা তিনের দ্বারা করতে হবে। এবং যদি মাসআলার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ এবং নিসফ হয় তখন আসল মাসআলা চার দ্বারা করতে হবে। এবং যদি মাসলার মধ্যে আট ভাগের এক অথবা আট ভাগের এক এবং নিসফ হয় তখন আসল মাসআলা আট এর দ্বারা হবে। এবং যদি মাসআলার মধ্যে নিসফ এবং এক-তৃতীয়াংশ অথবা নিসফ এবং ছয়ভাগের এক হয় তখন আসল মাসআলা ছয় দ্বারা হবে। এবং সাত, আট, নয়, এবং দশ এর দ্বারা আওল করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ اِذَا كَانَ الخ ঃ এ অধ্যায়ে গ্রন্থকার (র.) মাখারেজে ফুরূয-এর বর্ণনা শুরু করেছেন। তার জন্য সংক্ষিপ্তভাবে এই মূলনীতি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে, কুরআন মাজীদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা যে অংশসমূহ উল্লেখ করেছেন উহা দু'প্রকারের ঃ نِصْف ـ رُبُعْ ـ ثُمُنْ এক প্রকারের এবং ثُلُثْ ـ ثُلُثَانْ ও سُدُسْ অন্য প্রকারের এখন এগুলোর মাখারেজের বিশ্লেষণ এই যে, نِصف-এর জন্য মাখরাজ দুই এর দ্বারা করবে এবং رُبُعْ-এর জন্য চার এবং ثُمُنْ -এর জন্য আট এবং ثُلُثْ ও ثُلُثَانْ -এর জন্য তিন, এবং سُدُسْ -এর জন্য ছয় দ্বারা মাসআলা করবে। সুতরাং এবং যখন মাসআলার মধ্যে দুটা نِصْف হয় যেমন– মৃত ব্যক্তি একজন স্বামী এবং একজন আপন বোন অথবা একজন মা শরিক বোন রেখে যায়। অথবা এক نِصْف এবং অবশিষ্ট কিছু হয় যেমন মৃত ব্যক্তি একজন স্বামী এবং একজন চাচা রেখে গেল, তবে উহার মাসআলা দুই -এর দ্বারা করবে। এবং যদি মাসআলার মধ্যে ثُلُثْ পানে ওয়ালা ব্যতীত অন্য কেউ থাকে যেমন– মা, এবং চাচা ওয়ারিশ হয় অথবা মাসআলার মধ্যে ثُلُثَانْ এবং অন্য কেউ থাকে যেমন দু'মেয়ে এবং চাচা ওয়ারিশ হয় তখন মাসআলা তিন দ্বারা হবে, এবং যদি رُبُعْ এক-চতুর্থাংশ বাকি থাকে যেমন– একজন স্ত্রী এবং আসাবা হয় অথবা رُبُعْ এবং নিসফ পানে ওয়ালা হয়

যেমন– স্বামী এবং একজন স্ত্রী ওয়ারিশ হয় তখন আসল মাসআলা চারের দ্বারা হবে অর্থাৎ চার দ্বারা মাসআলা করতে হবে। এবং যদি ثُمُنٌ বাকি থাকে যেমন স্ত্রী এবং একজন ছেলে ওয়ারিশ হয় অথবা ثُمُنٌ এবং نِصْفٌ বাকি থাকে যেমন স্ত্রী এবং এক মেয়ে ওয়ারিশ হয় তখন আসল মাসআলা আট দ্বারা হবে। এবং যদি তার কাছে نِصْفٌ-এর ثُلُثٌ হয় যেমন– ওয়ারিশ এক মাতা এবং একজন হাকিকী ভাই অথবা نِصْفٌ এবং ثُلُثٌ হয় যেমন– ওয়ারিশ মাতা এবং এক মেয়ে হয় তখন আসল মাসআলা ছয় দ্বারা হবে।

قَوْلُهُ وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةٍ وَّثَمَانِيَةٍ الخ ঃ আওল-এর মতলব বা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যখন অংশের মাখরাজের সংখ্যা কম হয় কিন্তু প্রাপ্য বেশি হয় তবে মাখরাজের মধ্যে কিছু মিলিয়ে দিবে যাতে করে সকল হিস্যা বা অংশীদারীদেরকে তাদের প্রাপ্য পৌঁছে যায় অর্থাৎ পেয়ে যায়।

এবং ছয়-এর আওল দশ পর্যন্ত হয় জোড় সংখ্যা এবং বেজোড় সংখ্যা উভয়টার দ্বারাই হবে অর্থাৎ সাত, নয়, আট ও দশ-এর মধ্যে হবে। যেমন–

১. ছয় সংখ্যাটি সাত দ্বারা আওল হয়। যেমন–

মাসআলা– ৬ আওল– ৭

মৃত

স্বামী	২ সহোদরা বোন
৩	৪

২. ছয় সংখ্যাটি আট দ্বারা আওল হয়। যেমন–

মাসআলা–৬ আওল– ৮

মৃত

স্বামী	সহোদরা বোন	২ বৈপিত্রেয়ী বোন
৩	৩	২

৩. ছয় সংখ্যাটি নয় দ্বারা আওল হয়। যেমন–

মাসআলা–৬ আওল– ৯

মৃত

স্বামী	২ সহোদরা বোন	২ বৈপিত্রেয়ী বোন
৩	৪	২

৪. ছয় সংখ্যাটি দশ দ্বারা আওল হয়। যেমন–

মাসআলা– ৬ আওল– ১০

মৃত

স্বামী	২ সহোদরা বোন	২ বৈপিত্রেয়ী বোন	মাতা
৩	৪	২	১

وَإِنْ كَانَ مَعَ الرُّبُعِ ثُلُثٌ أَوْ سُدُسٌ فَأَصْلُهَا مِنْ إِثْنَىْ عَشَرَةَ وَتَعُوْلُ إِلَى ثَلَثَةِ عَشَرَ وَخَمْسَةِ عَشَرَ وَسَبْعَةِ عَشَرَ وَإِذَا كَانَ مَعَ الثُّمُنِ سُدُسَانِ أَوْ ثُلُثَانِ فَأَصْلُهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ وَتَعُوْلُ إِلَى سَبْعَةٍ وَّعِشْرِيْنَ وَإِذَا انْقَسَمَتِ الْمَسْئَلَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ فَقَدْ صَحَّتْ وَإِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ فَرِيْقٍ مِنْهُمْ عَلَيْهِمْ فَاضْرِبْ عَدَدَهُمْ فِيْ أَصْلِ الْمَسْئَلَةِ وَعَوْلِهَا إِنْ كَانَتْ عَائِلَةً فَمَا خَرَجَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْئَلَةُ كَامْرَأَةٍ وَأَخَوَيْنِ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَلِلْأَخَوَيْنِ مَابَقِىَ ثَلَثَةُ أَسْهُمٍ وَلَاتُقْسَمُ عَلَيْهِمَا فَاضْرِبْ إِثْنَيْنِ فِىْ أَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فَتَكُوْنُ ثَمَانِيَةً وَّمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْئَلَةُ۔

সরল অনুবাদ ঃ এবং যদি رُبُعٌ-এর সাথে ছুলুছ অথবা সুদুস হয় তখন আসল মাসআলা বারো দ্বারা হবে এবং আওল করবে তের, পনের এবং সতের-এর দিকে। (অর্থাৎ ১৩, ১৫ ও ১৭-এর দ্বারা আওল হবে।) এবং যখন ছুমুন-এর সাথে দুই ছুলুছ অথবা দুই সুদুসু হয় তখন আসল মাসআলা ২৪ -এর দ্বারা হবে এবং আওল করবে ২৭ -এর দ্বারা। এবং যখন মাসআলা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তদের ওপর বরাবরীর সাথে বণ্টন হয়ে যায় তাহলে তা সহীহ হলো। কিন্তু যদি তাদের মধ্যে থেকে কোনো এক ফরীকের হিস্যা বণ্টন না হয় তবে ঐ ফরীকের আদদে রুউসকে আসল মাসআলার মধ্যে পূরণ করবে এবং যদি আওলকারী হয় তাহলে আওলের মধ্যে পূরণ করবে। তারপর যা হাসেলে জরব হয় তা দ্বারা মাসআলা সহীহ হবে। যেমন– একজন স্ত্রী এবং দুই ভাই আছে তাহলে স্ত্রীর জন্য এক হিস্যা অর্থাৎ رُبُعٌ বা এক চতুর্থাংশ ও দুই ভাইয়ের জন্য বাকি তিন হিস্যা যা তাদের ওপর বণ্টন না হয় তাহলে দুইকে আসল মাসআলার দ্বারা পূরণ দেয় তখন উহা আট হয়ে যাবে এবং উহা দ্বারাই মাসআলা সহীহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ وَإِذَا انْقَسَمَتِ الْمَسْئَلَةُ الخ ঃ যদি ওয়ারিশদের মধ্যে প্রত্যেকের হিস্যা ভঙ্গ করা ব্যতীত বণ্টন হয় তাহলে তো ভালো জরব দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু যদি সমানের সাথে বণ্টন না হয় তাহলে জরব বা গুণ করার প্রয়োজন হবে। এবং দেখবে যে ভাঙ্গন কি এক ফরীকের ওপর না বেশির ওপর। যদি এক ফরীকের ওপর হয় তাহলে ঐ ফরীকের সংখ্যাকে আসল মাসআলার মধ্যে গুণ দেবে। যদি আওল হয় তাহলে আওলের মধ্যে গুণ দেবে এবং যা হাসেলে জরব বা গুণ হয় উহা দ্বারা মাসআলা সহীহ হবে। উহার দৃষ্টান্ত হচ্ছে যে, কোনো মৃতব্যক্তি একজন স্ত্রী এবং দুই ভাই রেখে মারা গেল তবে স্ত্রীলোক এক-চতুর্থাংশ এবং বাকি যা থাকে উহা উভয় ভাই পাবে। কিন্তু সমস্যা হলো বাকি তিন হিস্যা যা তাদের ওপর বণ্টন হয় না এজন্য দুইকে আসল মাসআলা অর্থাৎ চারের দ্বারা গুণ দেবে। কেননা মাসআলার মধ্যে এক-চতুর্থাংশ এবং বাকি আরো হিস্যা রয়েছে। এ জন্য দুইকে চারের মধ্যে গুণ দেওয়ার দ্বারা আট হবে। সুতরাং আটের দ্বারা মাসআলা সহীহ হবে অর্থাৎ স্ত্রীকে দুই হিস্যা এবং উভয় ভাইকে তিন তিন হিস্যা মিলবে

قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَتْ عَائِلَةً الخ ঃ অর্থাৎ যদি মাসআলার মধ্যে আওল হয় তাহলে আদদে রুউসকে আওলের মধ্যে গুণ দিবে এবং যা হাসেলে জরব বা গুণ হয় উহা দ্বারা মাসআলা তাসহীহ হবে।

فَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ فَاضْرِبْ وَفْقَ عَدَدِهِمْ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ كَامْرَأَةٍ وَسِتَّةِ اِخْوَةٍ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ وَلِلْاِخْوَةِ ثَلٰثَةُ اَسْهُمٍ لَاتَنْقَسِمُ عَلَيْهِمْ فَاضْرِبْ ثُلُثَ عَدَدِهِمْ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ وَمِنْهَا تَصِحُّ فَاِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُهُمْ فَرِيْقَيْنِ اَوْ اَكْثَرَ فَاضْرِبْ اَحَدَ الْفَرِيْقَيْنِ فِى الْاٰخَرِ ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِى الْفَرِيْقِ الثَّالِثِ ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ فَاِنْ تَسَاوَتِ الْاَعْدَادُ اَجْزَأَ اَحَدُهُمَا عَنِ الْاٰخَرِ كَامْرَأَتَيْنِ وَاَخَوَيْنِ فَاضْرِبْ اِثْنَيْنِ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ وَاِنْ كَانَ اَحَدُ الْعَدَدَيْنِ جُزْءًا مِنَ الْاٰخَرِ اَغْنِى الْاَكْثَرُ عَنِ الْاَقَلِّ كَاَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ وَاَخَوَيْنِ اِذَا ضَرَبْتَ الْاَرْبَعَةَ اَجْزَاكَ عَنِ الْاٰخَرِ فَاِنْ وَافَقَ اَحَدُ الْعَدَدَيْنِ الْاٰخَرَ ضَرَبْتَ وَفْقَ اَحَدِهِمَا فِىْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ كَاَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَاُخْتٍ وَسِتَّةِ اَعْمَامٍ فَالسِّتَّةُ تُوَافِقُ الْاَرْبَعَةَ بِالنِّصْفِ فَاضْرِبْ نِصْفَ اَحَدِهِمَا فِىْ جَمِيْعِ الْاٰخَرِ ثُمَّ مَا اجْتَمَعَ فِىْ اَصْلِ الْمَسْئَلَةِ تَكُوْنُ ثَمَانِيَةً وَّاَرْبَعِيْنَ وَمِنْهَا تَصِحُّ الْمَسْئَلَةُ۔

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং যদি হিস্যা এবং আদদে রুউস বা মাথা পিছু এর মধ্যে মোওয়াফিক হয় তাহলে আদদে ওফককে আসল মাসআলার মধ্যে জরব দেবে। যেমন– কেউ একজন স্ত্রী এবং ছয়জন ভাই রেখে গেল তবে স্ত্রী এক-চতুর্থাংশ এবং ভাইয়েরা তিন হিস্যা পাবে। কিন্তু তিন হিস্যা ভাইদের ওপর বণ্টন হচ্ছে না, তাহলে তাদের ছুলুছে আদদের অর্থাৎ দুইকে আসল মাসআলার মধ্যে জরব বা গুণ দেবে এবং উহা দ্বারাই মাসআলা সহীহ হবে। এবং যদি দুই ফরীক অথবা তার থেকে বেশি ফরীকের হিস্যা বণ্টন না হয় তাহলে এক ফরীকের আদদ বা সংখ্যাকে অন্য ফরীকের মধ্যে এবং হাসিলে জরবকে তৃতীয় ফরীকের আদদের মধ্যে অতঃপর হাসেলে জরবকে আসল মাসআলার মধ্যে গুণ দেবে। সুতরাং যদি সংখ্যাসমূহ বরাবর হয়, তাহলে একে অন্যের থেকে যথেষ্ট হবে। যেমন কেউ দু' জন স্ত্রী এবং দুই ভাইকে রেখে গেল সুতরাং দুইকে আসল মাসআলার মধ্যে গুণ দেবে। এবং যদি এক ফরীকের আদদ অন্য ফরীকের আদদের অংশ হয় তবে অধিকাংশ কমের থেকে কেফায়েত করবে। যেমন– চার স্ত্রী এবং দুই ভাই, যে যখন তুমি চারকে জরব বা গুণ দিয়েছ তবে অন্যের থেকে কেফায়েত করবে অর্থাৎ যথেষ্ট হবে। এবং যদি উভয় ফরীকের আদদের মোওয়াফেক হয়, তাহলে একের ওফককে অন্যের পুরা সংখ্যার মধ্যে গুণ দেবে। পরে হাসেলে জরবকে আসল মাসআলার মধ্যে জরব দেবে। যেমন– চার স্ত্রী এবং এক বোন এবং ছয় চাচা যে ছয় এবং চারের মধ্যে নিসফ এর দ্বারা তাওয়াফুক তবে তাদের মধ্যে থেকে একজনের নিসফকে অন্যের পুরা হিস্যার মধ্যে গুণ দিয়ে পরে আসল মাসআলার মধ্যে গুণ দেবে তখন উহা আটচল্লিশ হবে এবং উহা দ্বারাই মাসআলা সহীহ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَاِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ الخ ঃ যদি দুই অথবা তার চেয়ে বেশি অংশ পূর্ণ বণ্টন না হয় তাহলে এক ফরীকের সংখ্যাকে দ্বিতীয় ফরীকের সংখ্যার মধ্যে অতঃপর জরব এর সারাংশকে তৃতীয় ফরীকের সংখ্যার মধ্যে অতঃপর পরিশিষ্ট জরবের অংশকে আসল মাসআলার মধ্যে পূরণ দেবে। যেমন– দুই স্ত্রী পাঁচ দাদী তিন আখয়াফী বোন এবং একজন চাচা ওয়ারিশ এবং আসল মাসআলা বারো (১২) দ্বারা হবে। চতুর্থ অর্থাৎ তিন অংশ স্ত্রীদের জন্য হবে ছয়ের এক অর্থাৎ দুই অংশ দাদীদের জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ চার অংশ বোনদের এবং অবশিষ্ট তিন অংশ চাচার জন্য হবে। সুতরাং স্ত্রীদের সংখ্যাকে দাদীদের সংখ্যা পাঁচের মধ্যে পূরণ দেবে এবং জরবের সারাংশ দশকে বোনদের সংখ্যা তিনের মধ্যে পূরণ দেবে এবং তার জরবের সারাংশ ত্রিশকে আসল মাসআলা অর্থাৎ বারো এর মধ্যে গুণ দেবে। সুতরাং তিনশত ষাট দ্বারা মাসআলা সহীহ হবে।

فَاِذَا صَحَّتِ الْمَسْئَلَةُ فَاضْرِبْ سِهَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِى التَّرِكَةِ ثُمَّ اقْسِمْ مَا اجْتَمَعَ عَلٰى مَاصَحَّتْ مِنْهُ الْفَرِيْضَةُ يَخْرُجُ حَتَّى الْوَارِثُ وَاِذَا لَمْ تُقْسَمِ التَّرِكَةُ حَتّٰى مَاتَ اَحَدُ الْوَرَثَةِ فَاِنْ كَانَ مَايُصِيْبُهُ مِنَ الْمَيِّتِ الْاَوَّلِ يَنْقَسِمُ عَلٰى عَدَدِ وَرَثَتِهٖ فَقَدْ صَحَّتْ الْمَسْئَلَتَانِ مِمَّا صَحَّتِ الْاُوْلٰى وَاِنْ لَمْ تَنْقَسِمْ صَحَّتْ فَرِيْضَةُ الْمَيِّتِ الثَّانِىْ بِالطَّرِيْقَةِ الَّتِىْ ذَكَرْنَاهَا ثُمَّ ضُرِبَتْ اَحَدُ الْمَسْئَلَتَيْنِ فِى الْاٰخَرِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ سِهَامِ الْمَيِّتِ الثَّانِىْ وَمَا صَحَّتْ مِنْهُ فَرِيْضَةٌ مُوَافَقَةٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর যখন মাসআলা সহীহ হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেক ওয়ারিশের হিস্যাকে পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে গুণ দেবে। পরে হাসেলে জরবকে যার দ্বারা মাসআলা সহীহ হয়েছে তদ্বারা উহাকে বণ্টন করবে তাহলে প্রত্যেক ওয়ারিশের হিস্যা বের হয়ে যাবে। এবং যখন মৃত যা রেখে গেছে উহা বণ্টন না করা যায় এবং হঠাৎ করে কোনো ওয়ারিশ মারা যায় সুতরাং যদি ঐ হিস্যা যা তাকে প্রথম মৃত থেকে পৌঁছেছে তাদের ওয়ারিশ সমূহের সংখ্যার ওপর বণ্টন হয়ে যায় তাহলে উভয় মাসআলা উহা দ্বারাই সহীহ হয়ে যাবে যদ্বারা প্রথম মাসআলা সহীহ হয়েছে। এবং যদি বণ্টন না হয় তাহলে দ্বিতীয় মৃতের ফরীজাহ ঐ ত্বরীকা দ্বারা সহীহ হবে যাকে আমরা উল্লেখ করেছি। তারপর এক মাসআলাকে অন্য মাসআলার মধ্যে গুণ দেবে, যদিও দ্বিতীয় মৃত ব্যক্তির হিস্যার মধ্যে উহার মধ্যে যার দ্বারা ফরীজা সহীহ হয়েছে সামঞ্জস্য না হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهٗ فَاِذَا صَحَّتِ الْمَسْئَلَةُ الـخ ঃ অর্থাৎ যদি মৃতের তারাকাহ্ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করতে হয় তাহলে তাসহীহের মধ্যে যতটুকু একজন ওয়ারিশকে মিলে তাকে সর্বমোট তারাকাহ্ এর মধ্যে গুণ দেবে এবং হাসেলে জরবকে তাসহীহ -এর ওপর তাক্বসীম বা বণ্টন করবে। সুতরাং যা খারেজে বণ্টন হবে উহা পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে থেকে উল্লিখিত ওয়ারিশের হিস্যা হবে। যেমন– মাতা, পিতা এবং দু'জন ছেলে ওয়ারিশ আছে এবং মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তি হলো সাত দিনার। তাহলে মাতার হিস্যা এককে মোট তারাকাহ অর্থাৎ সাত এর মধ্যে গুণ দেবে পরে হাসিলে জরবকে আসল মাসআলা অর্থাৎ ছয় দ্বারা বণ্টন করবে তাহলে বণ্টনের হাসেল ১ $\frac{১}{২}$ সর্ব মোট তারাকাহ এর দ্বারা মা এর হিস্যা হবে।

فَإِنْ كَانَتْ سِهَامُهُمْ مُوَافِقَةً فَاضْرِبْ وَفْقَ الْمَسْئَلَةِ الثَّانِيَةِ فِي الْأُولٰى فَمَا اجْتَمَعَ صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْئَلَتَانِ وَكُلُّ مَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْئَلَةِ الْأُولٰى مَضْرُوْبٌ فِيمَا صَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْئَلَةُ الثَّانِيَةُ وَمَنْ كَانَ لَهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَسْئَلَةِ الثَّانِيَةِ مَضْرُوْبٌ فِي وَفْقِ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ الثَّانِي وَإِذَا صَحَّتْ مَسْئَلَةُ الْمُنَاسَخَةِ وَارَدْتَ مَعْرِفَةَ مَا يُصِيْبُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ حِسَابِ الدَّرَاهِمِ قُسِمَتْ مَاصَحَّتْ مِنْهُ الْمَسْئَلَةُ عَلٰى ثَمَانِيَةٍ وَّأَرْبَعِيْنَ فَمَا خَرَجَ أَخَذْتَ لَهُ مِنْ سِهَامِ كُلِّ وَارِثٍ حَبَّتَهُ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .

সরল অনুবাদ ঃ সুতরাং যদি তাদের হিস্যার মধ্যে মুওয়াফাকাত বা আনুকূল্য হয় তবে দ্বিতীয় মাসআলার ওফক্‌কে প্রথম মাসআলার মধ্যে গুণ দিবে তারপর যা হাসেলে জরব হয় উহা দ্বারা উভয় মাসআলা সহীহ্ হবে এবং তাকে প্রথম মাসআলা থেকে কিছু মিলেছে উহা তার মধ্যে গুণ বা জরব দেবে, যার থেকে দ্বিতীয় মাসআলা সহীহ্ হয়েছে এবং যাকে দ্বিতীয় মাসআলা থেকে কিছু মিলেছে উহাকে দ্বিতীয় মৃতের তারাকার ওফক-এর মধ্যে জরব দেবে। এবং যখন মোনাসাখাহ্-এর মাসআলা সহীহ্ হয়ে যাবে এবং তুমি ঐ হিস্যাকে জানতে চাইছ যা প্রত্যেকে দিরহাম সমূহের থেকে পেয়েছে তাহলে ঐ সংখ্যাকে বন্টন করে নেবে যার ওপর মাসআলা আটচল্লিশ -এর দ্বারা সহীহ্ হয় পরে যা হাসেলে কিসমত বা বণ্টন হয় প্রত্যেক ওয়ারিশের অংশ থেকে হিস্যা নিয়ে নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ سِهَامُهُمْ مُوَافِقَةً الخ ঃ উল্লিখিত মাসআলার সুরত হলো যে মৃত একজন স্বামী এবং দু'জন ভাই রেখে মারা গেল তাহলে চার দ্বারা মাসআলা তসহীহ করতে হবে। পরে স্বামীও মরে গেছে এবং চার জন ছেলে মেয়ে রেখে গেছে তাহলে আসল মাসআলা চার দ্বারা করতে হবে। স্বামী হিস্যা দুই চার এর সাথে তাওয়াফুক বিননিসফর সম্পর্ক বা নিসবত রাখে। সুতরাং নিস্ফকে সমস্ত সংখ্যার মধ্যে গুণ দেবে তাহলে হাসেলে জরব আট হবে এবং আট এর দ্বারাই উভয় মাসআলার তস্হীহ্ হবে। দুই ভাইকে চার এবং স্বামীর চার সন্তান চার মিলবে বা পাবে।

ফায়দা ঃ উল্লিখিত মাসআলা সমূহকে বুঝার জন্য জানা অবশ্যক যে, দুই সংখ্যার মধ্যে চার নিস্বত বা সংযোগ এর কোনো একটা অবশ্যই হবে। চার নিস্বত (১) তামাছুল (২) তাদাখুল (৩) তাওয়াফুক (৪) তাবায়ুন। তামাছুল দু'টি সংখ্যা বরাবর হওয়াকে বলে। যেমন চার, চার। দশ, দশ। এবং তাদাখুল বলে দুই সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা ছোট সংখ্যার ওপর ভঙ্গ করা ব্যতীত বণ্টন হয়ে যাওয়াকে। অথবা এটা যে সংখ্যার মধ্যে ছোট সংখ্যা বের হয়ে যাবে তাহলে দু'বার অথবা তার থেকে বেশির মধ্যে বড় সংখ্যা মিটে যাবে। যেমন– পঁচিশ এবং পাঁচ এর মধ্যে তাদাখুলের নিসবত। কেননা পঁচিশ পাঁচ-এর ওপর পুরা বণ্টন হয়ে যায় এবং পাঁচকে কম করতে করতে পঁচিশ-এর সংখ্যা পাঁচ বারে মিটে যায়।

তাওয়াফুক ঐ নিসবতকে বলে যে, দুই আদদ বা সংখ্যা অন্য কোনো সংখ্যা একবারে থেকে বেশি মিটিয়ে দেয় যেমন– আট এবং বিশ এগুলোকে চারের সংখ্যা মিটিয়ে দেয়। এই তৃতীয় সংখ্যা চারকে ওফক বলে এবং এই উভয় সংখ্যার নিসবতকে তাওয়াফুক বিররুবূ বলে।

তাবায়ুন ঐ নিসবতকে বলে যা একের সংখ্যা ব্যতীত কোনো তৃতীয় সংখ্যা ও ঐ উভয় সংখ্যাকে ধ্বংস করে না। যেমন– নয় এবং দশ যে না এক সংখ্যা অন্য সংখ্যাকে ধ্বংস করতে পারে না কোনো তৃতীয় সংখ্যা।

এই সমস্ত নিসবতকে জানার তরিকা হচ্ছে যে, বড় সংখ্যাকে ছোট সংখ্যার ওপর বণ্টন করবে। যদি প্রথম বণ্টনের মধ্যে কিছু না থাকে তাহলে তাদাখুলের নিসবত। যদি বাকি থাকে তাহলে বাকির ওপর ছোটকে বণ্টন করবে। এবং এরূপ করতে থাকবে। যদি কোনো বণ্টনের মধ্যে কিছু না থাকে তাহলে দেখবে যে, তার মাকসাম আলাইহি কি এবং যদি দুই হয় তাহলে উভয় সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুক বিন্‌নিস্‌ফ হবে এবং যদি তিন হয় তাহলে তাওয়াফুক বিছছুলুছ হবে। এভাবে চলতে থাকবে। এবং যদি প্রথম অথবা অন্য কোনো বণ্টনের মধ্যে একের সংখ্যা বেঁচে যায় তাহলে ঐ উভয় সংখ্যার মধ্যে তাবায়ুন হবে। এখন লক্ষণীয় বিষয় যদি ওয়ারিশদের অংশ এবং তাদের সংখ্যার মধ্যে তাওয়াফুক হয় তাহলে তার সংখ্যার ওফুককে আসল মাসআলার মধ্যে গুণ দেবে। যেমন– একজন স্ত্রী এবং ছয়জন ভাই ওয়ারিশ, তাহলে এক চতুর্থাংশ স্ত্রীর এবং অবশিষ্ট তিন অংশ ভাইদের মধ্যে যা তাদের বণ্টন হয় না তিন এবং ছয় এর মধ্যে তাওয়াফুক, তাহলে ছয় এর ওফক দুইকে আসল মাসআলার মধ্যে গুণ দেবে এবং গুণের হাসেল দ্বারা মাসআলার তসহীহ হবে।